রাজায় রাজায়

প্রাণতোষ ঘটক

এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স্ প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট • কলিকাতা ১২

শ্রদ্ধেয় শ্রীপরিমল গোস্বামী

করকমলেষু

কার পাল্কী ? কোথায় চলেছে ?

এক মহল থেকে আরেক মহলে চলেছে।

যেন এ পাড়া থেকে ও পাড়ায় যাচ্ছে। কোথাও আলো, কোথাও অন্ধকার। ঘর, দালান আর উঠানের সীমাসংখ্যা নেই। যেন গোলকধাঁধা। পর্দা ও জাফরির লজ্জাবরণ যেখানে-সেখানে। ঘরে দালানে কড়িকাঠের নির্লজ্জ আত্মপ্রকাশ। বড্ড বেমানান হয়, কিন্তু উপায় কি! কড়িকাঠের কাঠে আবার উইয়ের বাসা; যেন অদৃশ্য কোন্ দেশের মানচিত্র আঁকা রয়েছে। মহলের পর মহল, অন্দরের পথ যেন শেষ হ'তেই চায় না। কোন্ মহল, কার মহল বোঝা দায়। অসংখ্য ঘর, তাই দরজার মাথায় নম্বর সেঁটে দেওয়া হয়েছে। এক, দুই, তিন—

রাজা বাহাদুরের ঘরে শুধু নম্বর নেই। মহলের নাম রাজমহল। রাজার ঘর রাজঘর, তার আবার তকমা কি? শয়ন-ঘর, বৈঠকখানা, ষ্টাডি-রুম, সবই আছে। কিন্তু কোন ঘরেই নম্বর নেই।

সদর থেকে একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন কোন্ দিক থেকে হঠাৎ ভেসে আসে। অস্ফুট শব্দটা ক্রমে স্পষ্ট হয়। পাল্কী-বেহারাদের পথ চলার ডাক। একটা বিরাটকায় ও সুদৃশ্য পাল্কী বহন করে আনছে দু'দল শক্তিশালী মানুষ। এক মহল থেকে অন্য মহলে চলেছে। ঘর-দালানের আলো-আঁধারে মিশকালো পাল্কী-বেহারাদের দেহের রৌপ্যালঙ্কার চাকচিক্য তুলছে।

কার পাল্কী ? কোথায় চলেছে ?

[illegible]থিবীতে এমন কেউ নেই ঐ পাল্কীর পথ রোধ করে। সম্মুখে যদি কেউ [illegible]হাই নেই। পায়ের তলায় পিষে যাবে। পদদলিত হয়ে যাবে। [illegible]কটা দুর্ঘটনা কোন [illegible] ঘটলো না। পাল্কী-বেহারার [illegible]লেই পথ ছেড়ে দেয় সকলে [illegible] গঙ্গার জোয়ার আসছে যেন

কার পাল্কী ? কোথায় চললো ?

দূরে পাল্কী আসছে দেখে অন্দরের এক প্রায়-অন্ধকার ঘরের জানালা থেকে আচমকা দৌড় দিলো এক নারীমূর্ত্তি। ছায়ার মত সরে গেল যেন। এক পলকে বিদ্যুৎশিখার মত দেখা যায় এক নারীমূর্ত্তি। তার রুক্ষ আলুলায়িত কেশ, পরিধানে ঘন লালপাড় কোরা সূতিবস্ত্র। অপস্রিয়মানার অঙ্গাবরণ আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় শুভ্র। আকৃতি নাতিস্থূল ও নাতিকৃশ। দোহারা।

পাল্কী-বেহারার দল যেন কলে দম দিয়ে এসেছে।

দাঁড়ায় না এক দণ্ড। দমও নেয় না। গতি মন্দ করে না। গন্তব্যে না পৌঁছে যেন দম ফেলবে না। অবিরাম ঘাম ঝরছে তাদের কালো কপাল থেকে। দালান উঠান ঘর—যেতে-আসতে দম বেরিয়ে যায়। উঁচু-নীচু সিঁড়ি-সোপান ওঠা-নামা করতে হয়।

কিন্তু কার পাল্কী ? কোথায় চললো হনহনিয়ে ?

কানাঘুষায় জানাজানি হয়ে গেছে। সদর থেকে অন্দরে রটে গেছে ইতিমধ্যেই, রাজমাতা আসছেন। রাজমাতার নক্সা-কাটা, কারুকার্য্যময় ও নানা রঙে বিচিত্র পাল্কী। বহন করে চলেছে জনা বারো মানুষ। জাতিতে সাঁওতাল তারা। সেই ভোর থাকতে যাত্রা করেছিল পাল্কী। তখন শুকতারা জ্বলছিল পূর্ব্বাকাশে।

পাল্কীর আবার পোষাক ! লাল শালুর আবরণ। লজ্জাবরণ। পরপুরুষের দৃষ্টি পড়ে যদি ! পূজাহ্নিক যতক্ষণ না সমাপ্ত হচ্ছে ততক্ষণ কোন নীচ জাতের মুখদর্শন করবেন না রাজমাতা।

সকালের কাঁচা-মিঠে রৌদ্র ছড়িয়েছে দিকে দিকে।

নিস্তেজ সোনালী রৌদ্রালোকে রাত্রির ক্লান্তি মুছে গেছে সবে[illegible] অন্ধকারের নীরবতা নেই এখন আ[illegible] প্রকৃতির আলো দেখে [illegible] ডাকি করছে। তন্দ্রাহারা[illegible]ের মুখে বুঝি বাক্[illegible] শব্দে [illegible]ণ্ঠের কলধ্বনি[illegible] ঘুম ভেঙেছে শহর কলকাত[illegible] কলকাতার [illegible]রে ঘরে [illegible]স শুরু হয়েছে।

রাজমাতার মহলেও কলধ্বনি শুরু হয়েছিল।

সম্পর্কের আত্মীয়া আর বৃত্তিভোগী দাসীদের কণ্ঠধ্বনি এখানে-সেখানে। রাজমাতার পাল্কী-বেহারাদের সশব্দ নিশানা শোনা মাত্র যে যার মুখ বন্ধ করেছে। মধ্যপথে কথা থামিয়েছে কেউ। কেউ হাসি থামিয়ে স্রেফ গম্ভীর হয়ে গেছে। মুখে যেন কুলুপ এঁটেছে হঠাৎ। চকিতের মধ্যে যেন নিস্তব্ধ হয়ে গেছে মহলটা।

বেহারার দল যথাস্থানে পৌঁছে ধীরে ধীরে নামিয়ে দিলো পাল্কীখানা। ভারী ওজনের পাল্কী, ক'মণ ওজন কে জানে! রাজমাতার মহলের দ্বারপথে পাল্কী নামিয়ে দিয়ে ঐ কালা আদমীর দল হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে চললো নিজেদের আস্তানায়। এতটা পথ অতিক্রম করে যথাস্থানে পাল্কী নামিয়েও এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে জিরোবার অবকাশ নেই। তাদের উপস্থিতিতে রাজমাতা কদাপি পাল্কীর ঘেরাটোপ খুলতে দেবেন না। কোথাকার কে, তাদের চোখে দেখা দেন কখনও রাজমাতা বিলাসবাসিনী?

পাল্কী-বেহারার দল জাতিতে সাঁওতাল। কোল কিম্বা ভিল ভারতের আদিম অধিবাসী। তাই বুঝি তাদের চোখে-মুখে সেই আদ্যিকালের সরলতা। পেশীবহুল বলশালী শরীর, তবুও কেমন ভীত ও বিনম্র। কাকে যেন ভয়!

ওরা অদৃশ্য হতেই দাসীদের আবির্ভাব হয়।

বিলাসবাসিনীর পাল্কীর ঢাকা খুললো অতি সন্তর্পণে। লাল শালুর লজ্জাবরণ উন্মোচিত করলো। পাল্কীর এক পাশের পাল্লা ঠেলে সরিয়ে দিলো। রাজমাতা বিলাসবাসিনীর চেতনা বুঝি লুপ্ত হয়ে গেছে। অনড় অটল হয়ে তিনি বসে আছেন পাল্কীর অভ্যন্তরে। মুদিত চক্ষু। নীরব, নিস্পন্দ!

—মা ঠাকরুণ, পাল্কী মহলের দুয়োরে নামিয়েছে।

[illegible]দের একজ[illegible] বললে ভয়ে ভয়ে। নাতিউচ্চ কণ্ঠে।

[illegible] নেই। অন্য এক জগতে চ[illegible] গেছেন রাজমাতা। জপের মালা [illegible] হাতে। ১০৮ [illegible] মালা।

[illegible] আজ্ঞা হোক! পাল্কী [illegible] গেছে অ[illegible] সভয়ে [illegible] দাসী

ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলিত করেন বিলাসবাসিনী সুদীর্ঘ রক্তবর্ণ চক্ষু। বললেন,—পা ধোয়ার জল এনেছে ?

—হাঁ গো হাঁ। হাত দুটো ভেরে গেল জলের কলসী ধরে থেকে! আপনি নামো দেখি এখন।

দাসী কথা বলে অধৈর্য্য হয়ে। হাতে তার জলপাত্র। গঙ্গোদক পরিপূর্ণ কলসী।

—অজাত কুজাত কেউ নেই তো এখানে? গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করলেন রাজমাতা।

দাসী বললে, —না গো না! কে আবার থাকতে যাবে এখানে! আমিই শুধু আছি। আমি তো আর বেজাত নয়।

বিলাসবাসিনীর দেহ স্থুল। মেদবহুল। নড়তে চড়তেই দশ ঘণ্টা। অতি কষ্টে নিজের দেহকে টেনে-হিঁচড়ে ঠেলে পাল্কীর বাইরে বের করলেন। কলসীর জল উজাড় করে দেয় দাসী। বিলাসবাসিনীর পায়ে!

দাসী ভাগ্যদোষে দাসী হয়েছে। রাজমাতার সেবায় লেগেছে। নয় তো জাতে সে ব্রাহ্মণ। দেশে একদা অকাল হওয়ায় স্বামি-পুত্র-কন্যাকে হারিয়েছে। কবে কোন্ সালে মড়ক হয়েছিল তার শ্বশুরকুলের দেশে। সে-সময়ে মৃত্যু বরণ করেছে তার যত নিকটতম আত্মজন! শোকসন্তপ্ত মনে দাসীবৃত্তি গ্রহণ করেছে রাজমাতার কাছে। বৃত্তি বা বেতন নেই,—খাওয়া, পরা আর বাসস্থান পেয়ে বর্ত্তে গেছে যেন দাসী!

গঙ্গাস্নান সমাপনান্তে ফিরেছেন বিলাসবাসিনী। কর্দ্দমাক্ত পায়ে। পূর্ণ এক কলসী জলেও গঙ্গামাটি বুঝি বা ধুয়ে যায় না। রাজমাতা বললেন,—দাসী, আর এক কলসী জল নে আয় শীঘ্রি। পায়ের কাদা যেমনকার তেমনিই যে রইলো!

সকালের এক ফালি কাঁচা-মিঠে রৌদ্রালোক [illegible]সিনীর [illegible] করেছে। মুর্শিদাবাদের রেশ[illegible] জ্যোৎস্না-আলো[illegible] [illegible]লুব তুলছে। কপালে তাঁর শ্বেত[illegible] শুঙ্ক চিহ্ন। রাজমা[illegible]ত আকৃতিতে যেন [illegible]বতার আভা[illegible] [illegible]ত-চন্দনের সঙ্গে অ[illegible]র শুভ্র [illegible]র পার্থক্য ধরা যায় না [illegible]ক হয়ে [illegible]ন শ্বেত-চন্দন ও গাত্র[illegible]

কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে আর এক কলসী গঙ্গাবারি এনে হাজির করলো দাসী। হাঁপাতে হাঁপাতে এলো। কলসীর জল নিঃশেষ করে দিলো রাজমাতার পদদ্বয়ে। রাজমাতার মহলের প্রবেশ-পথের বিস্তীর্ণ উঠানটা জলে ভেসে গেল যেন। ভিজে পায়েই চললেন বিলাসবাসিনী। জোড়া জোড়া পদচিহ্ন পড়লো তাঁর পেছনে। ভিজে-পায়ের ছাপ। সহসা কাকে দেখলেন অদূরে। গতি মন্দ করলেন সঙ্গে সঙ্গে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। অনুগামিনী দাসীর উদ্দেশে বললেন,—ব্রজবালা, ও এখানে কেন মরতে? ওকে এখন যেতে বল এখান থেকে।

দূরে এক দ্বারের মুখে দাঁড়িয়েছিল সেই শুভ্র নারীমূর্ত্তি।

আলুলায়িত রুক্ষ কেশের বোঝা তার পৃষ্ঠে। পরিধানে কোরা লালপাড় স্থতিবস্ত্র। দণ্ডায়মানা ঐ নারীর অধরোষ্ঠে ক্ষীণ হাস্যরেখা। কিন্তু অশ্রু-সজল চোখ। যেন অস্পৃশ্যা, তাই দূরে দাঁড়িয়ে আছে। কাছে এগোতে সাহসী হচ্ছে না।

দাসীর নাম ব্রজবালা। দাসী বললে নির্দ্দয় কণ্ঠে—তুমি এখন এখান থেকে বিদেয় হও দেখি বাছা! জপ-আহ্নিক হোক আগে রাজমায়ের। একাদশীর উপবাস ভঙ্গ হোক। তারপর এসো।

ব্রজবালা দাসী। দাসীর মুখে বিদায় হয়ে যাওয়ার নির্দ্দেশ শুনে শাড়ীর অঞ্চলে চোখের প্রান্ত মুছলো ঐ সুকেশা রমণী। সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগ করলো সেই স্থান। ঠিক ছায়ার মতই সরে গেল যেন!

—মন্দিরে যাবো দাসী। আজ মন্দিরে গিয়েই আহ্নিক শেষ করবো। পূজো করবো। ফুলের সাজি আর গঙ্গাজলের ঘটিটা আনতে যা দেরী।

চলতে চলতে, মন্থর গতিতে চলতে চলতে কথা বললেন বিলাসবাসিনী। থা বললেন দীপ্ত কণ্ঠে। অন্দর মহলে প্রতিধ্বনি শ্রুত হ'ল তাঁর সজোর কথার।

[illegible]রে আছে[illegible] অষ্টধাতুর গৃহদেবী। মা পতিতপাবনী।

মা [illegible] [illegible]গ্রতা। স্বপ্ন দেন, স্বপ্নে [illegible] । পতিতপাবনীর মন্দির আকাশ স্পর্শ করে[illegible] [illegible]ন্দিরের সুউচ্চ চূড়া [illegible] ত্রিশূল। [illegible]র্য্যালোকের পরশ পেয়ে ঐ [illegible]শূলও যে [illegible] জাগ্রত হয়। স্ব[illegible] বিচ্ছুরিত কা[illegible] [illegible]কাশকে শাসায় যেন।

গত কাল নির্জ্জলা উপবাস করেছিলেন রাজমাতা। একাদশীর উপবাস। মা পতিতপাবনীর পায়ে ফুল না চাপিয়ে জলগ্রহণ করবেন না। আগে মায়ের চরণামৃত মুখে দেবেন, তারপর অন্য কিছু।

অন্দরের সকলে যেন তটস্থ হয়ে আছে।

যতক্ষণ না মিছরির জলটুকু পান করছেন রাজমাতা, ততক্ষণ কারও বা কাড়বার উপায় নেই।

—ব্রজ! ব্রজবালা!—চলতে চলতে হঠাৎ কথা বললেন বিলাসবাসিনী।

—মা ঠাকরুণ, ডাকলে?

হঠাৎ ডাক শুনেছে ব্রজ। হুজুরণীর হঠাৎ আবার কি মনে পড়লো কে জানে! ব্রজবালা এগিয়ে যায় বিলাসবাসিনীর কাছে। বলে,—কিছু বলবেন আপনি?

ইতি-উতি তাকালেন রাজমাতা।

দেখলেন হয়তো কেউ সেখানে আছে না নেই। কথার সুর নামিয়ে বললেন,—একটি বার খোঁজ নে দেখি। যা, তুই-ই যা। সদর থেকে জেনে আয় সাতগাঁ থেকে লোক এসেছে কি না?

কথা শুনে ব্রজবালার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল।

মুখাকৃতির পরিবর্ত্তন হ'ল। মুখের কথা খসালেই হল? বলতে কতক্ষণ? কিন্তু সে কি এখানে? কত দূর, কতটা পথ? কতগুলো মহল পেরিয়ে তবে যেতে হয় সদরে! ব্রজবালা কথা বলে শুষ্ককণ্ঠে,—তা আপনি যখন বলছো, যাই।

বিলাসবাসিনীর গতি রুদ্ধ হয় না।

দরদালান ধ'রে এগিয়ে চলেছেন তিনি। জলের ঘটি [illegible]মার ফুলে[illegible] আনতে চলেছেন নিজের [illegible] থেকে [illegible] অন্য কেউ স্পর্শ করে তা [illegible] না। মহলের লা[illegible]গায়া পূজার [illegible] রাজমাতার। মা[illegible]একল সময়ে যাওয়া-আসার [illegible] হয় না, তাই [illegible]ঠাকুর-ঘর।

[illegible] যা হুজুরণী, তা আমি [illegible] বলে দিয়ে যাচ্ছি।

ব্রজবালা আবার কথা বললে। বললে,—তোমার সাতগাঁ থেকে লোক আর আসবে না। আসতে দেবে না তারা।

রাজমাতা ঝল্‌সে উঠলেন যেন। জলদগম্ভীর কণ্ঠে বললেন,—দাসী, তোকে যা বলছি তুই শোন্‌। এখনই যা।

মুখের কথা খসাতে কতক্ষণ!

কিন্তু সদর কি এখানে? অন্দর আর সদরের মধ্যে আরও কতগুলো মহল। কত সিঁড়ি। কত দালান আর উঠান! পথের দৈর্ঘ্য চিন্তা ক'রে ভীত হয় ব্রজবালা, তবুও যখন রাজমাতার আদেশ, লঙ্ঘন করবে সাধ্যি কার?

ব্রজবালা চললো। পথের কষ্ট, মনের কষ্ট বুকে চেপে চললো তৎক্ষণাৎ।

বিলাসবাসিনী শুধু বললেন,—তুই ফিরলে তবে মন্দিরে যাবো আমি। বেলা কাবার করে এসো না যেন।

ব্রজবালা নিরুত্তর। সে তখন দেহের বাস ঠিক-ঠাক করতে করতে এগিয়েছে বিপরীত মুখে। বিরক্তির সঙ্গে চাপা গলায় কি যেন বকছে বিড়-বিড়। বলছে,—সাতগাঁ থেকে লোক আর এয়েছে! সূয্যি তা হলে পশ্চিমে উঠবে।

—সাতগাঁ থেকে লোক আর আসবে না। আসতে দেবে না তারা।

দাসীর মুখে এই কথাগুলি শুনে বিলাসবাসিনীর আপাদ-মস্তক জ্বলে গেছে বুঝি। অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছেন মনে মনে। চলতে চলতে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন রাজমাতা। দুঃখের শ্বাস ফেললেন।

—মা পতিতপাবনী, দয়া কর মা!

স্বগত করলেন রাজমাতা। বক্ষ মথিত করে কথাগুলি উচ্চারিত হল। রাজমাতার মনশ্চক্ষে পতিতপাবনীর সদাহাস্যময়ী মূর্ত্তির সিন্দুর ও অলক্তকশোভিত [illegible]গল। ঘন-[illegible] চেলী।

—তো[illegible] পায়ে ঠাঁই দাও মা!

আবার স্বগতো[illegible] রাজমাতা। তত [illegible] পৌঁছে গে[illegible] তার পূজার ঘরের সমুখে। ঘরের দ্বা[illegible] রুদ্ধ। শেকল [illegible] প্রবেশ কর[illegible] [illegible] দেখে শিউরে উঠলেন [illegible]াসিনী। তাঁর মুখ[illegible] [illegible]টে উঠ[illegible] [illegible]কাতরতা।

বললেন,—যাঃ, দুধটুকু সব খেয়ে ফেললে তোমরা! এখন উপায়? কি দিয়ে পূজো করি এখন?

যাদের উদ্দেশে বিলাসবাসিনী কথাগুলি বলেন তারা বাক্‌হীন।

বাক্‌শক্তি নেই তাদের। চলৎশক্তি আছে। রাজমাতার কথা শুনেই কি না কে জানে, তারা দুগ্ধপানে বিরত হয়। দুগ্ধপূর্ণ কাংস্যপাত্র প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে। প্রাত্যহিক পূজানুষ্ঠানের মধ্যে নিত্য শিবপূজাও করেন বিলাসবাসিনী। শিবপূজার নিমিত্তে কাঁচা দুধের প্রয়োজন হয়। সেই দুধ শুধু মাত্র উচ্ছিষ্ট হয়নি, নিঃশেষিত হয়েছে। কিছুক্ষণের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে থাকেন বিলাসবাসিনী। তার পর মিনতির সুরে বললেন,—যাও, খাওয়া-দাওয়া হয়েছে, এখন আমার ঘর খালি করে দাও। আমি যে পূজোর জোগাড় করবো!

মানুষের ভাষাও কি বুঝতে পারে তারা? কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে গমনোদ্যত হয়। একে একে ঘরের নালীতে প্রবেশ করে। তাদের বিদ্যুৎ-গতি। মুহূর্ত্তমধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। ধীরে ধীরে, অতি সন্তর্পণে পূজাঘরে প্রবেশ করেন রাজমাতা।

কক্ষমধ্যে ছিল এক-জোড়া সাপ। বাস্তুসর্প!

বিলাসবাসিনী যতকাল এসেছেন তত কাল দেখছেন ঐ সর্পযুগলকে। ঐ সাপ আর সাপিনীকে।

ওদের হিংসা নেই, দ্বেষ নেই, দংশনের স্পৃহাও নেই। গৃহের অন্যান্য মানুষের মতই বসবাস করছে এই বাস্তুগৃহে। লাজুক-লতার মত কোথায় লুকিয়ে থাকে সহসা দেখতে পায় না কেউ। দেখলে চেনা যায় না, ধরা যায় না, কে সাপ আর কে সাপিনী। আকৃতি এবং প্রকৃতিগত কোন পার্থক্য নেই। একত্রে থাকে, একত্রে ঘোরাফেরা করে।

—হুজুরণী, দেবো শেষ করে ও দুটোকে?

ব্রজবালা নয়। অন্য [illegible] জন [illegible] বলে। রাজমাতার পা[illegible]শ্রিতা জনৈকা ব্রাহ্মণী। [illegible]াসবাসিনী [illegible] [illegible]দের অন্যতমা [illegible],—বলতো ইঁটিয়ে মেরে [illegible] নয়তো লাটি[illegible] [illegible]

রাজম[illegible] [illegible]কাটলেন [illegible] [illegible]কুচকে বললেন সবিস্ময়ে,—[illegible] কি কথা! ছিঃ,

এমন কথা মুখে এনো না কোন দিন। ওরা যে সাক্ষেৎ লক্ষ্মী! মা মনসার বাহন যে ওরা! বাস্তুলক্ষ্মী!

আপনার ঐ এক কথা! কোন্ দিন কাকে যে দংশায় তার ঠিক নেই!

বিলাসবাসিনীর মুখাবয়বে ঈষৎ ক্রোধের আভাষ ফুটে উঠলো। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন,—তুই আজকের মানুষ। আর আমি ওদের দুটিকে দেখছি যদ্দিন এই রাজবাড়ীতে এয়েছি। তুই কি জানবি?

পরিচারিকার মুখে আর কথা জোগায় না। চুপ করে যায়।

পূজার ঘরে প্রবেশ ক'রে তৈজসপত্র নাড়াচাড়া করতে থাকেন রাজমাতা। খোঁজাখুঁজি করেন সাজি আর জলপাত্র। ঘটি, পুষ্পপাত্র। ব্রজবালা গেছে সদর থেকে খোঁজ আনতে, ফিরে এসে কি বলে কে জানে! প্রায় রুদ্ধশ্বাস হয়ে আছেন বিলাসবাসিনী। দ্বারের বাইরে পরিচারিকাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন,—যাও দেখি বাছা, কাঁচা দুধ পোয়াটাক নিয়ে এসো গোয়াল থেকে। রাখালকে বল দু'য়ে দেবে'খন।

পরিচারিকা সদ্য-আগতা। মাত্র কয়েক মাস আগে আশ্রয় পেয়েছে রাজমাতার কাছে। অল্প বয়স, সধবা। স্বামিপরিত্যক্তা। হুগলী জেলার দিলআকাশ গাঁয়ে তার শ্বশুরবাড়ী। স্বামী তার যাত্রার দলের শ্রীকৃষ্ণ। যাত্রা করে, পালা গায়। দিনের বেলায় গাঁজা টেনে বেহুঁশ হয়ে থাকে। নেশা ছুটে গেলে মেজাজ রুক্ষ হয়ে যায়। যাত্রার শ্রীকৃষ্ণ তখন আসল মানুষে রূপান্তরিত হয়। কারণে অকারণে মার-ধর করে তার অবলা স্ত্রীকে।

গাল-মন্দ আর মার-ধরের ভয়েই সে পালিয়ে বেঁচেছে।

দিলআকাশ থেকে সুতানুটীতে পালিয়ে এসেছে। রাজমাতা আশ্রয় [illegible]য়েছেন তাকে।

নতুন মা[illegible]। গোলকধাঁধার মতই ম[illegible] হয় [illegible]জবাটীকে। চোখে ধরা পড়ে না ঘর-দেউড়ি[illegible]লান আর এতগু[illegible]

পরিচারিকা বললে,—আপনি অন্য কাউ[illegible]। আমি গো[illegible]নি।

বিলাসবাসিনী বললেন,—কেন? যাবে [illegible] শুনি?

পরিচারিকা ভয়ে জড়সড় হয়ে যায় কেমন। বলে,—আপনার রাখালটি লোক ভাল নয়। গোয়ালে যেতে আমার ডর লাগে।

দুই চক্ষু মুদিত করলেন বিলাসবাসিনী। পাষাণমূর্ত্তির মত স্থির হয়ে গেলেন। বাক্যস্ফূর্ত্তি হ'ল না কিয়ৎক্ষণের মত! কয়েক মুহূর্ত্ত অতীত হলে বললেন,—আচ্ছা, তুমি এখন এসো। কাজে যাও নিজের। গোয়ালে তোমাকে যেতে হবে না। ব্রজকে পাঠিয়ে দাও।

ঐ যে আসছে ব্রজদিদি—বললে, পরিচারিকা।

রাজমাতা আদেশের সুরে বললেন,—তুমি তোমার কাজে যাও। ব্রজর সঙ্গে আমার গোপন কথা আছে।

পূজাঘরের বাতায়ন ভেদ করে এক ফালি রোদ পড়েছিল বিলাসবাসিনীর ঊর্দ্ধাঙ্গে। পরিচারিকার নজরে পড়ে রাজমায়ের গম্ভীর বদন। আয়ত রক্তবর্ণ আঁখিতে ক্রুদ্ধদৃষ্টি। আর এক পাল সেখানে থাকতে সাহসী হয় না পরিচারিকা। শব্দহীন পদক্ষেপে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করে পূজাঘরের দ্বারপথ।

ব্রজবালা আসছে জেনে হাতের কাজ বন্ধ রেখে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন বিলাসবাসিনী। কি বলবে ব্রজবালা কে জানে? রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করলেন—সাতগাঁর লোক এসেছে রে?

ব্রজবালা পথশ্রমে ক্লান্ত। কতটা পথ গেছে। এসেছে।

স্থির থাকতে পারেন না বিলাসবাসিনী। আবার জিজ্ঞাসা করলেন,—কিরে কথা ক'স না কেন? সাতগাঁ থেকে লোক—

ব্রজবালা বললে,—গরীবের কথা বাসি না হলে তো মিষ্টি হয় না! আমা[illegible] মিথ্যে মিথ্যেই দৌড় করালে আপনি। সাতগাঁ থেকে কেউ [illegible]সেনি।

বিলাসবাসিনী আবার [illegible] যেন পাষাণমূর্ত্তির আকার ধারণ [illegible]রলেন। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন [illegible] অসহ্য এক অন্ত[illegible]ন বুকটা দগ্ধ হয়ে যায়। [illegible] চোখের [illegible] দুর রৌদ্রে কিনা কে জানে, চাকচিক্য তুললো। [illegible]নের গরবে [illegible] ধরেছিলেন যেন [illegible]মূর্ত্তি। হাত থেকে

আঁচলটা খসে পড়লো বিলাসবাসিনীর। দু' চোখের প্রান্ত জলসিক্ত হয়ে উঠলো কি! ওষ্ঠাধর কি কাঁপছে বিলাসবাসিনীর?

কোথায় সাতগাঁ? কে আছে সেখানে?

বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ শ্বাপদ-সঙ্কুল সপ্তগ্রামে? সপ্তর্ষির তপস্যাক্ষেত্র সপ্তগ্রামের বাসুদেবপুরে আছেন বিলাসবাসিনীর একমাত্র কন্যা। বাসুদেবপুরের জমিদার কৃষ্ণরামের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন তাঁর কত আদরের মেয়ে বিন্ধ্যবাসিনীর। সেই বিন্ধ্যবাসিনী আছে সাতগাঁয়ের বাসুদেবপুরের জমিদারগৃহের এক নির্জ্জন কক্ষে বন্দিনী হয়ে। কৃষ্ণরাম বন্দী করে রেখেছে রাজকন্যাকে! বিন্ধ্যবাসিনীকে বিলাসবাসিনীর বিন্দুকে।

পূজাঘরে পুনঃপ্রবেশ করলেন রাজমাতা।

আঁচলে চোখ দুটিকে মুছলেন। পুনরায় জলসিক্ত হয়ে উঠলো চক্ষুপ্রান্ত। অশ্রুবন্যা বইলো যেন!

—মা পতিতপাবনী, মুখ তুলে তাকাও মা!

স্বগত করলেন বিলাসবাসিনী। বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে। পূজার জোগাড় করতে আর মন চাইলো না। পূজাঘরের শ্বেতপ্রস্তরের মেঝেয় বসে পড়লেন নিরাশ মনে।

বাসুদেবপুরের জমিদার কৃষ্ণরাম রায়—নামটি মনে উদিত হলেই রাজমাতা বিলাসবাসিনী পর্য্যন্ত আঁৎকে ওঠেন। দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার কৃষ্ণরামের দাপটে বাসুদেবপুরের বাসিন্দাগণ ক্রমেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। দয়ামায়াহীন, কুক্রিয়াসক্ত ও দুরাচারী কৃষ্ণরামের বিবিধ লোমহর্ষক কুকীর্ত্তির জন্য সমগ্র বাসুদেবপুর আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে আছে। তবুও কৃষ্ণরাম রায়ের জমিদারীর চৌহদ্দি বাসুদেবপুর নয়। সেখান থেকে অনেক দূরে—আরামবাগ মহকুমার গড়মান্দারণে। সংকীর্ণকায় স্বচ্ছ-সলিল আমোদর নদের তীরে। কাঁটা[illegible] থেকে [illegible]বল্লভপুর পর্য্যন্ত কৃষ্ণরামের জমিদারীর সীমানা[illegible] কৃষ্ণরামের প্রজারা [illegible]শই মুসলমান। তদুপরি জমিদার কৃষ্ণরাম শোনা যায়, অত্যন্ত প্রক

পৈ পৈ করে[illegible] নিষেধ করেছিলেন বিলাসব[illegible]

কৃষ্ণরামের সঙ্গে বিন্ধ্যবাসিনীর বিবাহে তাঁর ঘোর আপত্তি ছিল। কিন্তু স্বর্গত রাজা, তাঁর স্বামী, সে কথায় কর্ণপাত করেননি। রাজা কৌলীন্য ভঙ্গের ভয়ে বিবাহ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। প্রায় হাত-পা বেঁধেই জলে ফেলেছিলেন আপন কন্যাকে!

আমার বিন্দুকে মুক্তি দাও মা! তার মৃত্যু দাও, আমি প্রার্থনা জানাই তোমাকে। অস্ফুট শব্দে কাতর মিনতি জানাতে থাকেন রাজমাতা। বলেন,—আমার মেয়ে বন্দিনী হয়ে থাকবে মা? তুমি থাকতে তা আমাকে চোখে দেখতে হবে?

মা পতিতপাবনীকে উদ্দেশ্য করেই বোধ করি কথাগুলি উচ্চারণ করলেন।

—চোখে দেখতে হবে কেন? প্রতিকার করবে আপনি।

ঘরের বাইরে ছিল ব্রজবালা। রাজমায়ের করুণ আবেদন হয়তো তার কানেও পৌঁছয়। নেহাৎ যেন অসহ্য হতেই ব্রজবালা বলে,—চোখে দেখবে কেন? প্রতিকার করবে। রাজা বাহাদুর থাকতে তোমার ভাবনা কি?

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বিলাসবাসিনী।

কিয়ৎক্ষণ নিশ্চুপ থেকে বললেন ধীরে ধীরে,—কালীর কম্ম নয় ব্রজ, আমার কাশী যদি রাজা হত দেখতিস এ্যাদ্দিনে একটা লড়াই বাধিয়ে তুলতো কেষ্টরামের সঙ্গে।

জ্যেষ্ঠ কালীশঙ্কর, কনিষ্ঠ কাশীশঙ্কর।

রাজমাতা বিলাসবাসিনীর দুই পুত্র। একমাত্র কন্যা ঐ বিন্ধ্যবাসিনী।

ব্রজবালা তবুও বললে,—আপনি না হয় একবার বলেই দেখো না। যতই হোক তিনিই রাজা। তেনার মানসম্মানই বেশী!

দুঃখের ক্ষীণ হাসি হাসলেন রাজমাতা।

বাতায়নে-পথে দেখা [illegible] বিস্তীর্ণ শুভ্রাকাশ। নতুন প্রভাতের সূর্য্যালোকে সমুজ্জ্বল। আকাশে দৃষ্টি [illegible] রইলেন বিলাসবাসিনী। [illegible]কাশে কাক-চিল। আকাশে [illegible]খেই কথা [illegible] রাজমাতা বলেন,—শুধু নামে রাজা হলেই হয় না ব্রজ [illegible]ায় মট্ক[illegible] দিলেই কি রাজা হওয়া যায়! [illegible] খেতাব থাকলে

কি হবে ? রাজা হয়েও যে একটা সামান্যি জমিদারকে শায়েস্তা করতে পারে না, সে আবার কেমন ধারার রাজা ? তার চেয়ে মরুক আমার বিন্দু !

—বালাই ষাট ! বললে ব্রজবালা।—কি যে বল সাত-সকালে ! এখন জপ-আহ্নিক সেরে নাও দেখি। দেখতে দেখতে বেলা যাচ্ছে উদিকে। মুখে আগে জল দাও। সাতগাঁ থেকে লোক ফিরতে কত সময় লাগে তা জানো ? সে কি হেথায় ? কাকে পাঠিয়েছ শুনি ?

রাজমাতা বললেন,—কেন, জগমোহন লেঠেলকে পাঠিয়েছি।

ক্ষণেক ভেবে ব্রজবালা বলে,—বিথা সময় নষ্ট করবে সে মানুষও জগমোহন নয়। পথ কি সামান্যি ? কদিনের পথ !

—জগমোহনকে শুধু-হাতে পাঠাইনি ব্রজ ! কেমন রুক্ষকণ্ঠে বললেন বিলাসবাসিনী—পাথেয় খরচা দিয়েছি। জগমোহন রণ্-পায়ে যেতে চেয়েছিল, তা আমি যেতে দিইনি। নৌকা-ভাড়া দিয়েছি যাতায়াতের। এখন আমার কপাল আর বিন্দুর ভাগ্যি !

কথার শেষে পুনরায় একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

ব্রজবালা খুশীর সুরে বলে,—তবে আর ভাবনার কি আছে ? জগমোহনকে যখন আপনি পাঠিয়েছ তখন নিশ্চিন্ত থাকো, জগমোহন ঠিক খোঁজ এনে দেবে।

বিলাসবাসিনী বললেন,—খোঁজ না হয় আনবে জগমোহন, কিন্তু আমার বিন্দুকে কি কেড়ে আনতে পারবে ? কথা বলতে বলতে টেনে টেনে নিশ্বাস নেন রাজমাতা। বলেন,—ব্রজ, চটপট যা, পোয়াটাক দুধ এনে দে। শিবপূজার দুধটুকু সব ঐ শাঁখ-শাঁখিনীতে খেয়ে গেছে।

শাঁখ, শাঁখিনী। শঙ্খ ও শঙ্খিনী।

বাস্তসাপ দু'টির মনুষ্যদত্ত নাম ! এই নামকরণ করেছিলেন স্বর্গত রাজা। বিলাসবাসিনীও তাই তার স্বামীর দে[illegible] না[illegible]তেই ডাকেন। সর্প শব্দ উচ্চারণ করেন না। [illegible]মি উচ্চারণ করলে [illegible] কোপ হয় [illegible]

বেলা কত বয়ে গেল ! পূজা শেষ [illegible] ও।

বিলাসবাসিনী যতই চেষ্টা করেন [illegible] বন্দি[illegible] মুখখানি

মানসপটে উদিত না হয়, ততযেন বিন্ধ্যবাসিনীর চিন্তায় অস্থির হয়ে ওঠে তাঁর মনও মস্তিষ্ক।

জগমোহন পৌঁছালো কি না কে জানে!

দুর-পাল্লার নৌকায় যাত্রা করেছিল জগমোহন।

চিৎপুরের ঘাট থেকে হুগলীর তীরে বংশবাটির ঘাটে পৌঁছতে হয়েছে জগমোহনকে। গঙ্গা নদীর তীর থেকে যেতে হবে সপ্তগ্রামে। জলে নয় স্থলে। দুর্গম পথ। শ্বাপদসঙ্কুল, জঙ্গলাকীর্ণ ভয়াবহ পথ। শুধু পশু নয় —দস্যু, তস্কর ও ডাকাতের ভয়ও আছে। সর্ব্বস্ব অপহরণের ভয় আছে। দুর্ব্বিপাকে প'ড়ে মরণের আশঙ্কাও আছে।

চিৎপুরের ঘাট থেকে টানা নৌকা যায়নি। মাঝপথে কত বার থেমেছে। কত ঘাটে কত যাত্রী নামিয়েছে। দিন গত হয়েছে, রাত্রিও গত হয়েছে।

দিনে হাল চলে, রাত্রে হাল চলে না। যাত্রিবাহী নৌকা, জলদস্যুর আক্রমণের ত্রাসে রাত্রে কোন, ঘাটে ভিড়িয়ে রেখে দেওয়া হয়। যতক্ষণ না সূর্য্যোদয় হয় ততক্ষণ নৌকায় রাত্রি যাপন করতে হয়েছে।

নয়তো জগমোহনের পৌঁছতে এতটা বিলম্ব হ'ত না।

পূরা এক দিন আর একটা পূরা রাত নৌকাতেই যে কেটে গেল। গজেন্দ্রগামিনীর মত অত্যন্ত ধীরগতিতে চলেছিল নৌকা। কত যাত্রী ছিল নৌকায়! কত জাতের যাত্রী! নামলো কত ঘাটে!

চিৎপুরের ঘাট থেকে বালীখালের ঘাটে নৌকা ভিড়েছিল প্রথমে। বালী থেকে রিষড়ার ঘাটে। রিষড়া থেকে শেওড়াফুলীর ঘাট। সেখান থেকে ভদ্রেশ্বরের ঘাট ছুঁয়ে হুগলী-ঘাটে ভিড়লো অতি কষ্টে।

হুগলীর ঘাট থেকে [illegible] নৌকা[illegible] বংশবাটি পৌঁছেচে জগমোহন। নৌকা বদল করতে [illegible]য়েছে তাকে[illegible] [illegible]ট পৌঁছতে দিন [illegible] হয়ে গেছে। তখন নদীর তী[illegible] [illegible]কারে প্রায় স[illegible] [illegible]আছে।

কোথা[illegible] [illegible]র চিহ্ন [illegible]নাই। গঙ্গার মধ্যস্থল থেকে বংশবাটি গ্রাম

দৃষ্টিগোচর হয় না। নদীতীরবর্ত্তী কয়েকটি গহনা নৌকার ছইয়ের অভ্যন্তরে শুধু তৈল-প্রদীপ জ্বলছে। মুক্ত বাতাসে অগ্নিশিখা কম্পমান হয়ে ওঠে কখনও। প্রদীপ নিবু-নিবু হয়। ঘনান্ধকারে সেই আলোকবিন্দু বহুদূরস্থিত আকাশের নক্ষত্ররাজির মতই প্রতিভাত হয়।

কোথায় ঘাট? কোথায় গ্রাম?

অন্ধকারে সর্ব্বত্র জনহীন। আকাশ, প্রান্তর ও নদীকূল সর্ব্বত্র ঘনতমসা। কেবল অবিরল কল্লোলিতা গঙ্গানদীর কুলু-কুলু ধ্বনি। আর কদাচিৎ বন্যপশুর চীৎকার। জগমোহনের মত দুর্দ্দান্ত লাঠিয়ালও ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। কোথায় ঘাট? কোথায় বংশবাটি গ্রাম? নদীকূলে ঘনপত্রসন্নিবিষ্ট বৃহৎ বৃক্ষাদির সমাবেশে কিছুই যে দৃষ্টিপথে পড়ে না। রাত্রির নিবিড় আঁধারে বনজঙ্গল কৃষ্ণকায় হয়ে আছে। কোথায় গ্রাম? কোথায় বা গ্রামে যাওয়ার পথ?

বন্য বরাহ ও বন্য-শৃগালের আহ্বান-রবে মুখরিত রাত্রি! মানুষের সাড়া পাওয়া যায় না। রাত্রিচর পক্ষীদের তীব্র ও কর্কশ কণ্ঠ মধ্যে মধ্যে শোনা যায়। পশু ও পক্ষীর মিলিত রবের প্রতিধ্বনি ভেসে যায় মুক্ত হাওয়ায়। জগমোহনের মত বলশালী মানুষও ভীতিকাতর হয়।

এখন উপায়? নৌকার মাঝিরা যদি রাত্রিটুকু নৌকাতে অতিবাহিত করতে দেয়, তবেই রক্ষা। নচেৎ বিষধর ভুজঙ্গ বা শ্বাপদের দংশন অবশ্যম্ভাবী, যার পরিণাম মৃত্যু বৈ অন্য কিছুই নয়। মনে মনে তখন প্রমাদ গণে লেঠেল জগমোহন। এই নিদারুণ অন্ধকারে লাঠি চালনারই বা মূল্য কি? অন্ধকারে লাঠিরে কে ডরায়?

বংশবাটির গঙ্গার তীর থেকে সপ্তগ্রাম মাত্র দেড় ক্রোশ?

সাতগাঁয়ে যাবে জগমোহন! সাতগাঁয়ের বাসুদেবপুরের জমিদারগৃহে, রাজকন্যা বিন্ধ্যবাসিনীর স্বামীর আলয়ে যাবে। কিন্তু আ[illegible] যতক্ষণ না আলো ফুটছে ততক্ষণ নদীতীরস্থ ব[illegible]ঙ্গল ভেদ করা এক[illegible]হ কাজ।

নৌকা বংশবাটির ঘাটে ভিড়তেই জগ[illegible] মনোবাসনা [illegible]সর্দ্দারের কাছে পেশ করল[illegible]। শ্রম-ক্লান্ত সর্দ্দার শুভ্র [illegible]কেশ শ্মশ্রু [illegible]ঙ্গলি চালনা

করে আর শোনে জগমোহনের বক্তব্য। শেষে কি মনে হওয়ায় আপত্তি জানায় না। নৌকার ভাড়ার সঙ্গে আরও কিঞ্চিৎ বেশী দেওয়ার ইচ্ছায় আপত্তি থাকলে জগমোহন নৌকায় রাত্রি যাপন করতে পারে, এরূপ মত প্রকাশ করে মাঝি-সর্দার। জগমোহনও রাজী হয়। তখন উপায় কি ?

মাটির শিব। হাতে-গড়া।

পূজায় বসেও রেহাই নেই যেন। শিবের মাথায় সচন্দন বিল্বপত্র চাপিয়ে চুপচাপ বসেছিলেন বিলাসবাসিনী। শিবমন্ত্র ভুলে গেলেন নাকি রাজমাতা! পূজায় বসে মধ্যপথে এমন স্তব্ধ হয়ে আছেন কেন ? মুখাকৃতিতে ভয় ও উদ্বেগের ছায়া ফুটেছে। চোখে শূন্য দৃষ্টি। বিলাসবাসিনীর মন ক্ষণে ক্ষণে ছুটে চলেছে সেই সাতগাঁয়ে, যেখানে রাজকন্যা বিন্ধ্যবাসিনী বন্দিনী হয়ে আছেন। জগমোহন পৌঁছালো কি না কে জানে!

—হুজুরণী ? পূজো শেষ হয়েছে আপনার ? হঠাৎ কার ডাক শুনে চমকে ওঠেন যেন রাজমাতা।

ডাকছে কে! কেনই বা ডাকছে। সাতগাঁ থেকে ফিরলো নাকি জগমোহন লাঠিয়াল!

আবার ডাকলো ব্রজবালা,—হুজুরণী, কত বেলা আর করবে ?

বিলাসবাসিনী পূজায় বসেছেন, মন্ত্র ব্যতীত অন্য কোন কথা কইবেন না এখন। আহ্বানে সাড়া দেন না, দৃষ্টি সম্প্রসারিত করে দেখেন একটিবার।

ব্রজবালা বললে,—রাজা যে অপিক্ষা করছেন আপনার জন্যি! হাত চালিয়ে নাও, কত বেলা করবে ? মুখে জল দেবে না ? রাজা যে ওদিকে অপিক্ষা করছেন!

রাজা বাহাদুর কালী[illegible]নের প্রতীক্ষায় ব[illegible]ছেন।

[illegible]র মন্ত্রোচ্চার[illegible]র্জিত হয়। অজ্ঞাতে বেলা ক্রমে ক্রমে উত্তীর্ণ হয়ে[illegible]ত! পূ[illegible]ক'রে আবার যেতে হবে রা[illegible]মহলে। রাজা

হাদুরের সমুখে গিয়ে একবার দাঁড়াতে হবে রাজমাতাকে। দর্শন দিতে হবে। কটি প্রাত্যহিক কর্ত্তব্যক্রিয়া পালন করবেন রাজা বাহাদুর কালীশঙ্কর— 'জমাতাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করবেন। জননীর পদধূলি গ্রহণ করবেন পরম ক্তিসহকারে।

শিবের মাথায় আর বেছে-বেছে ফুল চাপানোর সময় নেই। এত ফুল আর বিল্বপত্র, কে বাছে!

রাশি রাশি গন্ধপুষ্প মুঠোয় ভরে তুলে দেন বিলাসবাসিনী। অধিক বিলম্ব সে রাজা বাহাদুরের প্রাতরাশের সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাবে। দ্রুত হাত চলে াজমাতার, দ্রুত মন্ত্র বলেন। পূজায় যেন মন নেই আজ। মন্ত্র ভুল হয়ে যায় ার বার। পূজা-পদ্ধতিরও কোন ঠিক থাকে না। রাজা বাহাদুর প্রতীক্ষায় সে আছেন, মাতৃদর্শন করবেন। এতক্ষণে জগমোহন সাতগাঁয়ে পৌঁছালো কি না জানে!

বন-পথ দুর্গম। গভীর জঙ্গল ভেদ করে সেই পথ অতিক্রম করতে হবে। াকাশের সূর্য্যালোকের চিহ্ন নেই, প্রায়ান্ধকার পথ।

বংশবাটির গঙ্গাতীর থেকে বাসুদেবপুর দেড় ক্রোশের পথ। সর্প ও াপদসঙ্কুল জঙ্গলাকীর্ণ পথে দস্যু, তস্কর বা ডাকাতের প্রাদুর্ভাবও কম নয়। বহু তীক্ষায় দিবালোকের দেখা পেয়ে মনে মনে বল সঞ্চয় করেছিল জগমোহন।

ড়-বাঁধা আহার্য্য থেকে দু মুঠা চিঁড়ে ও যৎসামান্য গুড় কোন প্রকারে ধঃকরণ করে ঐ কূলপ্লাবী গঙ্গার জল আঁচলা ভরে পান করেছিল।

নিবারণের শেষে দুর্গা ও কালীর নাম আওড়াতে আওড়াতে সুদেবপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল জগমোহন। াজমাতা স্বয়ং যখন আজ্ঞা রেছেন!

যাত্রার পূর্ব্বে হাতের লাঠি মাথায় স্পর্শ ক

বিপদ-আপদে ভয় থেকে উদ্ধার পাওয়। পস্মারিণী র্শ করতে

হয়! জগমোহনের হাতে বৃহৎ বাঁশের লাঠি। সেই লাঠি বিস্তার করতে করতে জগমোহন পথ অতিক্রম করছিল। ভীষণ দ্রুতবেগে।

লাঠির এক প্রান্ত মৃত্তিকায়! অন্য প্রান্ত জগমোহনের হস্তে। লাঠিতে সমস্ত শরীরের ভর চাপিয়ে লাফ দিতে দিতে জগমোহন পথ চলেছিল তড়িৎবেগে। তখন জগমোহনের নাগাল পায় সাধ্য কার?

সানাই-মঞ্চে প্রভাতী সুর ধরেছিল বাদ্যকার।

তখন হয়তো নক্ষত্র ছিল আকাশে; দিগ্‌বলয় ছিল তিমিরাচ্ছন্ন; ঘুম-ভাঙা পাখীর ক্ষুধার্ত্ত কণ্ঠ কচিৎ শোনা যায়। মা পতিতপাবনীর মন্দিরের সিংহদ্বারের চূড়োয় আছে সুদৃশ্য ও কারুকার্য্যময় নহবৎখানা। বরাদ্দ নিয়মে প্রতি সকাল-সন্ধ্যায় রাগ-রাগিণীর খেলা চলে সেখানে। নিত্যনূতন সুরে। রাজা বাহাদুরের হুকুমে, গত কালের রাগ আজকে চলবে না কোন মতেই, আজকের রাগিণী আবার আগামী কল্য অচল। এই সানাইয়ের বাদ্যধ্বনি শুনে ঘুম ভাঙবে, ইচ্ছা হয়তো শয্যা ত্যাগ করবেন। বাদ্যযন্ত্রের মিষ্টি আওয়াজ না শুনলে ঘুম ভাঙবে না রাজা বাহাদুরের। আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। শুধু ভোগ বিলাস; এবং বৈভবে মগ্ন থাকলেই চলবে না। নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে। সোনার পালঙ্কে শুয়েও সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছা না থাকলেও পরম আলস্য থেকে মুক্ত করতে হয় নিজেকে। ঘুমে ঢুলু-ঢুলু আঁখি মেলতে হয়। কক্ষ-অভ্যন্তরে কি সূর্য্যালোক প্রবেশ করেছে? রাজা বাহাদুর ঘরের ইদিক-সিদিক দেখেন। চোখে ঘুমের জড়িমা, মিথ্যাই বর্ণশোভা দেখলেন কি! চোখের ভুলে এত রঙ দেখলেন ঘুম-চোখে? লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, বেগুনী রঙের কাচ ঘরের চিত্র-বিচিত্রিত বাতায়নশীর্ষে। বাহির-আকাশে আলো ফুটলেই দেখা যায় ঐ রঙীন ডিজাইন নচেৎ নয়।

রাজপ্রাসাদের কোথায় কারা জয়ধ্বনি তোলে! আকাশ-বাতাস কম্পিত হয়ে ওঠে জয়োল্লাসে। মুদিত চক্ষু পুনরায় উন্মীলিত করলেন রাজা বাহাদুর। চোখ মেলে তাকালেন। দেখলেন চতুর্দ্দিকে হলুদ বর্ণ। কাঁচা হলুদ রঙ স্তূপীকৃত হয়ে আছে কি যত্র-তত্র ?

রাজঘরের চার দেওয়ালের ব্র্যাকেটে সারি সারি সৈন্য।

সৈন্যদের আশে-পাশে গাছ-গাছড়া। পাহারা দিচ্ছে সৈন্য দল। একেক দেওয়ালের সৈন্য দলকে পরিচালিত করছে একেক জন অশ্বারোহী সেনাপতি। বল্‌গা উঁচিয়ে আছে।

সোনার সৈন্য। রূপার সাজসজ্জা, তরোয়াল।

সোনার গাছে রূপার পাতা। মণি-মাণিক্যের ফুলফল। রোপ্যময় অশ্ব। সোনার সেনাপতি। হোক না নির্জীব, ক্ষতি কি ? ভোরের আলো-আঁধারিতে দেওয়ালের ব্র্যাকেটে সসৈন্য সেনাপতিরা যেন মূর্ত্তিমান হয়ে উঠেছে। এখনই বুঝি যুদ্ধারম্ভ করবে,—আক্রমণ করবে।

সোনার পালঙ্ক, সোনার কেদারা।

দেওয়াল-গাত্রে জল-সোনার বাহার-বিন্যাস। ঘরের মেঝেয় সোনার তারের গালচে। তাই বোধ করি রাজা বাহাদুরের চোখে শুধু রাশি রাশি হলুদ বর্ণ দেখা দিয়েছে। চক্ষু উন্মীলনের সঙ্গে সঙ্গে তাই বিস্মিত হয়েছিলেন প্রথম দৃষ্টিতে। চোখে যে নিদ্রার জড়িমা, দেহে আলস্য।

—জয়, রাজা কালীশঙ্কর বাহাদুরের জয়!

আবার কারা জয়ধ্বনি তোলে! সোল্লাসে ? নিদ্রাপ্লুত দুই চক্ষু। জয়ধ্বনির চিৎকারে কালীশঙ্কর যেন প্রকৃতিস্থ হলেন। গত রাত্রির নেশার ঘোর কি তবে নেই এখন আর ? রাজা বাহাদুর ধীরে ধীরে উঠে বসলেন, বহুমূল্য শয্যা ত্যাগ করলেন এবং দণ্ডায়মান হয়ে আড়মোড়া ভা [illegible] অর্থাৎ জড়তানাশের জন্য অঙ্গবিক্ষেপ করলেন। হাই তুললেন গোটা [illegible] আসব পান করেছিলেন রাজা বাহাদুর। চুয়ানো মদ বা [illegible] [illegible] ন করে, মাত্র [illegible] রাখে। কালীশঙ্কর নিদ্রায় অচেতন হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যং [illegible] হলেন [illegible]

পূর্ণপাত্র আসব পান করেছেন। দৈহিক কষ্ট পেয়েছেন ; বুকে জ্বালা ধরেছে ; কপালের দুই তীরে কে যেন হাতুড়ী পিটেছে ; লোক চিনতে পারেননি—তবুও রাজা বাহাদুর ক্ষান্ত হননি। পাত্র শেষ হয়ে গেছে, আবার পাত্র পূর্ণ করেছেন কানায় কানায়। কয়েক চুমুকে নিঃশেষ করেছেন প্রতিটি পাত্র। সোনার পাত্র। যতক্ষণ না জ্ঞানহারা হয়ে শয্যায় লুটিয়ে পড়েছেন ততক্ষণ একের পর এক পাত্র শেষ করেছেন। বাধা দেবে এমন ক্ষমতা কারও নেই, নিষেধ করবে এমন সাহসও কারও ছিল না। বুকের ঠিক মধ্যস্থলে অসহ্য একটা ব্যথা ধরেছিল, শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, শরীরের বল হারিয়েছিলেন—তবুও কোন মতেই পানে বিরত হননি রাজা বাহাদুর। সঙ্গে সঙ্গে চেখেছিলেন মাংস না মাছের গুলী-কাবাব কয়েকটা। আর মেওয়া-ফল। বাদাম, পেস্তা, আখরোট। ছোট এলাচ জৈত্রী, জিরা, জায়ফল।

ঐ তো পড়ে আছে গত রাত্রির উচ্ছিষ্ট পানাহারের সরঞ্জাম।

ভোরের আলো-আঁধারিতে চেকনাই তুলছে পাত্র ক'টা। রঙীন মিনাকরা স্বর্ণময় পাত্র আর রেকাবী।

—খানসামা! খানসামা!

রাজা বাহাদুর কালীশঙ্কর সরবে ডাক দিয়েছিলেন। রাজমহল গম্ গম্ করে উঠেছিল রাজা বাহাদুরের আহ্বানে।

—ডাকতেছ হুজুর ?

কার যেন ভয়ার্ত্ত কণ্ঠ। কক্ষের বাইরে কে কথা বলে এমন ভয়ে ভয়ে! আড়ষ্ট কণ্ঠে সাড়া দেয়!

— হুজুর!

—চান-ঘরে যাবো।

ভয়ার্ত্ত মানুষটি ক[illegible] সস[illegible]চে। প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠে। ভয়ে যেন জড়সড় হয়ে আছে [illegible] চোখের দৃ[illegible]র অনন্যসাধারণ সরলতা। গাত্রবর্ণ ঘনকৃষ্ণ শুভ্র দন্ত[illegible] পরিধানে ক[illegible]নিজাবা, চুড়িদার পায়জামা। আঁটসাঁট বাঁধা। [illegible]া কথা বলে রুদ্ধশ্বাসে। [illegible]লে,—হুজুর সকল

কিছুই প্রস্তুত, হুজুরের যাওয়ার অপিক্ষায় আছে ; হুজুরকে কি ধরে লিয়ে যাওনের প্রয়োজন আছে ?

দূরে, বহুদূরে ব্যাঘ্র-নিনাদ শ্রুত হয়েছিল।

বাঙলার বাঘের হুহুঙ্কার। বাঘের ডাকে গগন ফেটে যায় যায় বুঝি ! রাজা বাহাদুর কিন্তু হাসলেন। একটা হাই তুলতে তুলতে হেসে ফেললেন নিজ মনেই। কর্ণেন্দ্রিয়কে সজাগ করলেন। ব্যাঘ্র-নিনাদ কানে পৌঁছতে তবে যেন কিঞ্চিৎ উৎফুল্ল হলেন রাজা বাহাদুর। ডাকের মত ডাক ডাকছে বটে বাঘটা, পরিতৃপ্তির সঙ্গে কক্ষ ত্যাগ করলেন।

পোষা-কুকুরের মত পিছু পিছু চললো খানসামা। ঈষৎ আনত হয়ে কুর্ণিশ করতে করতে চললো।

—জয়, রাজা কালীশঙ্কর বাহাদুরের জয় !

জয়োল্লাস অস্পষ্ট হয় ক্রমে ক্রমে। রাজা বাহাদুর বিরক্ত হয়ে ওঠেন। বাঘের ডাক চাপা পড়ে যে !

অদূরে রাজপ্রাসাদের সীমানার মধ্যে আছে চিড়িয়াখানা।

সারি সারি শান-বাঁধানো খাঁচা। পাখীর পিঞ্জর। পরিখা-বেষ্টিত উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে মুক্ত পশুপক্ষী। চিড়িয়াখানার শোভা বর্দ্ধন করেছে বাঘ, সিংহ, বনমানুষ, নেকড়ে, হায়না আর হাতী। পাখী আছে অসংখ্য। আর আছে অজগর। মাংসাশী, ফলাশী, শাকাশী, পতঙ্গাশী, স্তন্যপায়ী ও রোমন্থক জীবের এমন একত্র সমাবেশ সহসা দেখা যায় না। রাজা বাহাদুরের সখের চিড়িয়াখানা। সখের বাগানের পাশে সখের চিড়িয়াখানা ?

সুন্দরবন থেকে সদ্য এসেছে অতিবৃহৎ একটি বাঘ।

রাজা বাহাদুরই আনিয়েছেন। তার জ পৃথক্ খাঁচার ব্যবস্থা হয়েছে। পশুর আকৃতি এত মোহময় হয়—বাঘা দেখতে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে যান রাজা বাহাদুর। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ও র গতিপ্রকৃতি লক্ষ। হৃষ্টপুষ্ট আকার, সোনার মত গাত্রবর্ণে কালো ক। ডো। উজ্জ্ব চোখে প্রখর

বক্রদৃষ্টি। এক মুহূর্ত্তের জন্য কি স্থির হয় না! স্বল্পপরিসর খাঁচার মধ্যে সগর্ব্বে পায়চারী করে যায় অবিরাম। মুক্তিলাভের পথ খোঁজে যেন! কোথায় মুক্তি, কোথায় পথ? কোথায় সেই গহন অরণ্য সুন্দরবন?

মোটা লোহার গরাদ নির্ম্মিত খাঁচার দ্বারমুখে বার বার বৃথাই থাবা মারে বাঘটি। কোন ফল হয় না। ব্যর্থকাম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চনিনাদ করতে থাকে।

এই বাঘের ডাক কানে পৌঁছতে তবেই যেন কিঞ্চিৎ আশ্বস্থ হন রাজা বাহাদুর। গম্ভীর মুখাকৃতিতে পরিতৃপ্তির অল্প হাস্যরেখা ফুটে ওঠে। অসম শক্তির অধিকারী একটি পশুকে পিঞ্জরাবদ্ধ করেছেন রাজা বাহাদুর। ঘুমের জড়তা বুঝি মুছে যায় চোখ থেকে।

—বাইরে লোকজন এসেছে কেউ?

স্নান-ঘর থেকে বেরিয়েই প্রশ্ন করলেন কালীশঙ্কর।

গোঁফের দুই শুষ্ক প্রান্ত দুহাতে পাকাতে পাকাতে প্রশ্ন করলেন। ভৃত্য, তাঁবেদার, খানসামাদের অনেকেই ততক্ষণে এসে জড় হয়েছে দরদালানে। কাকে প্রশ্ন করলেন? কে দেবে উত্তর! নীরব মানুষগুলি পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে থাকে ভয়ে সিঁটিয়ে।

অবশেষে একজন বৃদ্ধ গোছের খানসামাই জবাব দেয়। বলে,—হুজুর, অনেকেই আইচেন। হুজুরের ইয়ার-বন্ধুদের প্রায় সকলেই আইচেন।

—ঘোষাল এসেছে?

কাষ্ঠ-পাদুকায় পা গলাতে ' গতে পুনরায় প্রশ্ন করলেন কালীশঙ্কর।

—হাঁ হুজুর। দলবল- ' মেতই আইচেন।

—হালদা' 'পো আসে ন,

রাজা বাহ' শঙ্ক পদক্ষে ' চলতে জিজ্ঞাসাবাদ করে। একজন

ভৃত্য হাওয়া-পাখা দোলাতে দোলাতে অনুসরণ করে তাঁকে। গ্রীষ্মের প্রকোপে সাতসকালেই রাজা বাহাদুর ঘামছেন। তাঁর লোমশ বক্ষে ফুটে উঠেছে ঘর্ম্মবিন্দু। হাতে-কাটা সূতার যজ্ঞোপবীত সিক্ত হয়ে গেছে। হাতের ডান বাহুর নবরত্নের কবচ-কুণ্ডল বড় বেশী এঁটে গেছে যেন! বাম হস্তের তর্জ্জনী সাহায্যে তাবিজটিকে সামান্য নীচে নামিয়ে দিলেন।

খানসামা ভীতিকাতর কণ্ঠে বললে,—তেনাকে হুজুর আসতি দেখি নাই।

—মা জননীকে সংবাদ দেওয়া হোক।

কথা বলতে বলতে কালীশঙ্কর সাজঘরে প্রবেশ করলেন। সাজসজ্জার ঘরে।

পোষাক পরিবর্ত্তন করতে হবে। রাজমহল থেকে যেতে হবে তাঁকে সদরের বৈঠকে। নির্জ্জনতা থেকে জনারণ্যে। বৈঠকখানা এতক্ষণে সত্যই জনাকীর্ণ হয়ে উঠেছে। এসেছে কত কে, চেনা আর অচেনা। তামাক সাজার পালা শুরু হয়ে গেছে। হুঁকোয় কল্‌কে বসেছে। অম্বুরী তামাকের সুগন্ধে বারবাড়ী টইটম্বুর।

সাজঘরের চার দেওয়ালে দীর্ঘকায় দর্পণ। দর্পণে সোনালী লতাপাতার চতুষ্কোণ বেষ্টন। রাজা বাহাদুরের প্রতিবিম্ব দেখা যায়—কত অসংখ্য রাজা বাহাদুর!

ঘরের ঠিক মধ্যস্থলে আছে নিরেট রূপার কেদারা।

যেন একটি সিংহাসন, এমন অপূর্ব্ব কারুকার্য্য! কালীশঙ্কর কেদারায় বসে পড়লেন ক্লান্ত ও অবসন্নের মত। চোখে-মুখে জল পড়লো, তবুও আলস্য যেন ঘুচলো না। চোখ যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন।

—হুজুর, রাজমাতা হুজুরের তরে অপিক্ষা করছেন। হুজুর ইচ্ছা করলেই তাঁর চরণ দর্শন—

ভৃত্যের কথা শেষ করতে দিলেন না কালীশঙ্কর।

কেদারা থেকে তৎক্ষণাৎ উঠে পড়লেন ক্ষিপ্রনিরাতে। নেহাৎ শিশুর মতই মাতৃদর্শনের প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে উঠেছেন রাজা বাহাদুর।

—মা জননী কোথায়? [illegible] আমার মা দর্শনে!

একই কথা বার বার স্বগত করতে করতে [illegible] করলেন।

কাষ্ঠ-পাদুকার শব্দ ছড়িয়ে পড়লো সাদা-কালো চৌকা পাথরের দর-দালানে।

ভৃত্য, তাঁবেদার এবং খানসামার দল হতচকিতের মত দাঁড়িয়ে রইলো, যে যেখানে ছিল। ওদের কারও হাতে হাত-পাখা, কারও হাতে ভিজা গামছা, কারও হাতে হাত-আয়না, চিরুণী। কেউ বা আতরের শিশি, কেউ বা গোলাপ জলের গোলাপ-পাশ হাতে দাঁড়িয়ে রইলো চিত্রার্পিতের মত।

রাজা বাহাদুর গেছেন প্রণাম সারতে। এখনই ফিরে আসবেন, তাই আর কারও মুখে কথা ফোটে না। শঙ্কা ও সঙ্কোচে মূক হয়ে যায় হয়তো!

সাদা-কালো চৌকা পাথরের সুবিশাল দর-দালানের শেষ-সীমানায় প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় দণ্ডায়মানা রাজমাতা বিলাসবাসিনী। মুর্শিদাবাদী রেশমের বস্ত্রাঞ্চল বাতাসে কাঁপছে। রাজমাতার চোখে যেন শূন্যদৃষ্টি। লক্ষ্য করছেন না কিছুই, তবুও নিবদ্ধ দৃষ্টি। বহিরাকাশে সেই দৃষ্টি প্রসারিত।

—মা, মা জননী, তোমার চরণধূলি দেও।

রাজমাতার কাছাকাছি পৌঁছে কাতর আহ্বান জানালেন কালীশঙ্কর। কাষ্ঠ-পাদুকা পরিত্যাগ করলেন। ভূলুণ্ঠিত হয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলেন, বিলাসবাসিনীর পদদ্বয় স্পর্শ করলেন স্বহস্তে। নিজ মস্তকে হাত দিলেন!

—আশীর্ব্বাদ কর মা জননী! তোমার মুখ যেন আমি উজ্জ্বল করতে সক্ষম হই, সেই আশীর্ব্বাদ কর।

রাজা বাহাদুরের কাতর অথচ গম্ভীর কণ্ঠস্বরে দর-দালানের কড়িকাঠের পোষা গোলাপায়রার দল ডানা ঝাপটায়, বক বকম্ করে।

বিলাসবাসিনী কি পাষা[illegible] হয়ে গেছেন!

মুখে তাঁর কথা নেই। [illegible]নিষ্পলক, শূন্য-দৃষ্টি দুই চোখে। নীরব ওষ্ঠ। এক অশেষ দুঃখের নিঃশব্দ অভিব্যক্তি [illegible]বাসিনীর [illegible]বয়বে। কি এক অন্তর্জ্বালায় জ্বলছে যেন [illegible] অন্তর। ধীরে ধী[illegible] একটি হাত পুত্রের মস্তকে স্থাপন করলেন!

কোন আশীর্ব্বচনই উচ্চারণ করলেন না। কালীশঙ্করের ভক্তি ও আবেগময় প্রণাম শেষ হতেই রাজমাতা ত্যাগ করলেন সুবিশাল দর-দালানের শেষ-সীমানা। চললেন যে দিকে নিজের মহল সে দিক পানে।

সাজঘর আবার হাসতে থাকে যেন।

রাজা বাহাদুর রূপার কেদারায় সমাসীন হলেন। মাথার পরে টানা-পাখা দুলে উঠলো। ঘরে বুঝি ঝড় বইতে লাগলো। হেনা আতরের সুগন্ধ ছড়ালো ঘরে। ভৃত্য, তাঁবেদার ও খানসামার দল কিংকর্ত্তব্য ঠাওরাতে পারে না যেন। কারও হাতে মিহি-কোঁচানো জরিদার বেনারসী জোড়, কারও হাতে খিড়কীদার পাগড়ী, কারও হাতে জরির লপেটা-পাদুকা। চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে আছে সকলে। সসম্ভ্রমে।

রাজকাজে যাবেন রাজা বাহাদুর। দরবারে বসবেন।

খানসামাদের একজন ভয়ে ভয়ে বললে,—হুজুর, পোষাকটি যে বদল করতে হয়। বেলা অনেক হয়েছে।

গ্রীষ্মাধিক্যে কালীশঙ্কর ঘর্ম্মাক্ত হয়ে পড়েছেন।

কপালে, বক্ষে ও পৃষ্ঠে ঘর্ম্মবিন্দু দেখা দিয়েছে। টানা-পাখার স্নিগ্ধ হাওয়ায় দুই চক্ষু নিমীলিত করে আছেন রাজা বাহাদুর। খানসামার ডাক শুনে চোখ মেলে তাকালেন ও উঠে দাঁড়ালেন। নধরকান্তি দেহ কালীশঙ্করের। নড়তে চড়তে যেন কষ্ট অনুভব করেন। বিরক্তি সহকারে বললেন,—দাও, জোড় পরিয়ে দাও।

নেহাৎ শিশুর মতই চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন।

খানসামা তড়িৎ গতিতে পোষাক পরিবর্ত্তন করে দেয়। কোমরের কষি এঁটে দেয়। কোঁচা ও কাছা সামলে দেয়। কালীশঙ্কর পুনরায় বসে পড়েন কেদারায়। মাথার অবিন্যস্ত চুল আঁচড়ে টেরী বাগিয়ে দেয় খানসামা। ঢেউ-খেলানো কোঁকড়া চুলের বাঁ পাশে সীঁথি কেটে [illegible] গোঁফ-জোড়াটা আরও একবার নিজেই পাকিয়ে নেন রাজা বাহাদুর। জরির লপেটা-পাদুকা এগিয়ে দেয়

কেউ। কেউ গলায় ঝুলিয়ে দেয় মতির মালা। হেনা-আতরের পরশ পড়ে ভ্রূযুগলে।

রাজা বাহাদুর বললেন,—গায়ত্রীটা সেরে নিই আমি। অন্দরে সংবাদ দেওয়া হোক, আমি ক্ষুধার্ত্ত।

একজন ভৃত্য বললে,—তা আর বলতে হবে না হুজুর! আপনার খাওয়ার ঘরে আপনার প্রাতরাশ প্রস্তুত। আপনি গেলেই দেখতে পাবে।

আকর্ণবিস্তৃত চক্ষু রাজা বাহাদুরের। সমুখ-ঠেলা চোখ।

নিমীলিত চোখ, তবুও শুভ্র কনীনিকা ঈষৎ দেখা যায়। শিবনেত্র যেন!

—ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং—

গায়ত্রীর শুদ্ধমন্ত্র মৃদু গুঞ্জন তোলে সাজঘরে। একবার দুবার নয়, অন্তত দশ বার এই মন্ত্র জপ করতে হবে। ইষ্টদেবী, মন্ত্রদেবীকে স্মরণ করতে হবে। মা পতিতপাবনীকেও স্মরতে হবে!

সাজঘরে হেনা-আতরের সুবাস।

এক-রাশি ধূপ জ্বলছে ধূপদানিতে। ঘরে-দোরে ধুনো পড়েছে, তাই গুগ্‌গুলের সুগন্ধ নির্য্যাস ভাসছে বাতাসে। রাজা বাহাদুর ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারণ করেন। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে পৈতা জড়িয়ে মন্ত্রসংখ্যার গণনা রাখেন।

ঘর কখন শূন্য হয়ে গেছে। একা শুধু রাজা বাহাদুর আছেন।

ওঁ শব্দধ্বনি উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিচারকের পাল ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে, যে যে দিকে পেরেছে। সাজঘরে কত অসংখ্য দ্বার, কত গবাক্ষ! গ্রীষ্মের সকালে সাজঘর আলোকিত হয়ে আছে। টানা-পাখা যে কে কোথায় লুকিয়ে বসে টানছে চট করে ধরা যায় না। ঘরের মধ্যে তুফান বইছে যেন। তবুও ঘাম ঝরছে রাজার। প্রশস্ত ললাটে স্বেদবিন্দু।

মাতৃদর্শন করলেন; মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন, পদধূলি মাথায় ছোঁয়ালেন।

কিন্তু মার মুখে কথা ফোটাতে [illegible] ...দর্শিশঙ্কর। ফিরে এলেন বিষণ্ণ চিত্তে। রূপার কেদারায় বসতে বোধ করি তার মন চাইলো না। কেদারা ত্যাগ

করে কক্ষমধ্যে ঘোরাফেরা করতে থাকেন ইতস্ততঃ। উন্মুক্ত বাতায়ান। রাজপ্রাসাদের সংলগ্ন বহুদূরবিস্তৃত প্রাঙ্গণ দেখা যায়। রাজা বাহাদুর সহসা বাতায়নমুখে দাঁড়ালেন। দেখলেন, আকাশে প্রখর সূর্য্যালোক—রূপালী আকাশ। রাজগৃহের মুক্ত প্রান্তরে বিচরণশীল পশু-পক্ষী। হরিণ, খরগোশ আর জেব্রা; ময়ূর, সারস, উটপাখী। সুবৃহৎ বৃক্ষকাণ্ডের সঙ্গে লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হস্তিযূথ। হাতীর পদসঞ্চালনে লৌহশৃঙ্খলের ঝণৎকার শোনা যায়। গললগ্ন ঘণ্টা ঢং ঢং শব্দ তোলে। পরিখার জলে অবগাহন না খেলা করছে কয়েকটি জলহস্তী।

রাজ বাহাদুরের সম্প্রসারিত দৃষ্টি ব্যাহত হয়ে ফিরে আসে।

কি দুর্ভেদ্য জঙ্গল সুতানুটীর আনাচে-কানাচে। অজস্র গগনস্পর্শী মহীরুহ! বট, অশ্বত্থ, শিমুল, দেবদারু এবং আম্রবৃক্ষের ঘন সন্নিবেশই বুঝি হাওয়ার গতি রোধ করে। মানুষের দৃষ্টি ব্যাহত করে দেয়। ঐ সীমাহীন সবুজবৃক্ষ-রেখার অপর প্রান্তে কি আছে কে জানে! শুধুই কি অরণ্যগহ্বর?

মা ফিরেও দেখলেন না। মন খোলসা করে একটা আশীর্ব্বাদ করলেন না। বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করলেন না। শুভ-অশুভের খোঁজও নিলেন না। পাষাণমূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে ছিলেন রাজমাতা। অসহ্য নীরবতা পালন করেছিলেন। প্রচণ্ড এক অভিমানের দুঃখে রাজা বাহাদুরও কেমন যেন মনমরা হয়ে গেলেন। কোন্ উপায়ে রাজমাতার মুখে হাসি ফোটানো যায়? মায়ের মুখে হাসি?

—রাজা বাহাদুর!

—কে?

আচমকা আহ্বান শুনে চমক লাগে কালীশঙ্করের। ঘোর দুশ্চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। গভীর চিন্তার মধ্যে হঠাৎ ডাক শুনেছেন। বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ সুতানুটীর দিক থেকে চোখ ফেরালেন কালীশঙ্কর। আহ্বানকারীকে দেখেই বললেন,—কে? পুরোহিত মশাই?

—হ্যাঁ, রাজা বাহাদুর! পাণ্ডিত্যোজ্জ্বলীর [illegible] আনয়ন করেছি। স্নিগ্ধ কণ্ঠে কথা বলেন ব্রাহ্মণ।

—আসতে আজ্ঞা হোক। দেন চরণোদক দেন, পান করে জ্বালা জুড়াই।

রাজা বাহাদুর কালীশঙ্করের কণ্ঠ কেন কে জানে দুঃখ-ভারাক্রান্ত। কথার শেষে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। উর্দ্ধমুখ হয়ে হাঁ করলেন। মা পতিতপাবনীর পাদোদকপূর্ণ সোনার কুষি উজাড় করে দিলেন ব্রাহ্মণ অতি সন্তর্পণে। সেই সঙ্গে স্বস্তিবাচন আওড়ালেন। মঙ্গলমন্ত্র বললেন,—রাজা কালীশঙ্কর বাহাদুরের জয় হোক।

—মহাশয়ের পদধূলিও দেন। স্মিতহাস্যে বললেন রাজা বাহাদুর।

পুরোহিতের দুই জানুকাপালিক স্পর্শ করলেন। করজোড়ে নমস্কার জানালেন।

—শুভমস্তু! মঙ্গলমস্তু! বললেন পুরোহিত। হাত তুললেন। বরাভয় মুদ্রা দেখলেন কি কালীশঙ্কর, পুরোহিতের উর্দ্ধহস্তে! হয়তো তাই। যেন অবাক হয়ে লক্ষ্য করছিলেন রাজা বাহাদুর, ঐ যাজককে দেখছিলেন খুঁটিয়ে।

রক্তবর্ণ বস্ত্রপরিহিত দীর্ঘকায় ব্রাহ্মণের মুণ্ডিতমস্তকে সুদীর্ঘ শিখাগুচ্ছ বাহু এবং গলদেশে রুদ্রাক্ষের বন্ধনী। ঘনশ্যাম বর্ণে শোভা পায় শুভ্র যজ্ঞোপবীত। বিস্তৃত ললাটে ঘৃতাক্ত সিঁদুররেখা। শিখাপ্রান্তে একটি রক্তজবা দোদুল্যমান। রাজা বাহাদুর দেখে যেন আচ্ছন্ন হয়ে যান। কি ভয়াবহ রূপ ব্রাহ্মণের!

যাজকের মুখে যেন হাসির মৃদু রেখা সদাই লেগে আছে।

এই জড়জগতের অতীত কোন্ এক জগতে মন যেন তাঁর নিমগ্ন হয়ে আছে। এই মনুষ্যলোকের মধ্যে নয়, কোথায় কোন্ স্বর্গলোকে ধাবমান পুরোহিতের মনশ্চিন্তা! কার যেন ঐশ্বরিক রূপ ব্রাহ্মণের দৃষ্টিপথে দেখা যায়, অথচ সেই রূপাতীতের সন্ধান বুঝি মিলছে না? গুন্ গুন্ শব্দে অবিরাম মন্ত্র বলে চলছেন যাজক, অস্ফুট উচ্চারণে। আর থেকে থেকে, থেমে থেমে হাসছেন মৃদু মৃদু ব্রহ্ম-দর্শনানন্দের হাসি হাসছেন কি?

কালীশঙ্করের পলকহীন দৃষ্টি মুহূর্তের জন্যও ফেরে না।

সাগ্রহে লক্ষ্য করেন ব্রাহ্মণকে যেন ... বহির্জগতের মানুষ এই পুরোহিত ব্রাহ্মণ! মা পতিতপাবনীর পূজারী।

—মহাশয়ের রাজকার্য্যে গমন হবে না? ব্রাহ্মণ গুরুগম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

—অবশ্যই হবে, বললেন কালীশঙ্কর।

পুরোহিত স্থানত্যাগ করেন। কক্ষ থেকে নতমস্তকে বহির্গত হন। ,দ্বারের যদি মাথা ছুঁয়ে যায়!

সুগন্ধি ফুল ও চন্দনের মিশ্রিত একটি গন্ধও যেন সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে উবে যায়।

—তারা! তারা!

তারা নাম ডাকতে ডাকতে দর-দালানে অদৃশ্য হন পুরোহিত। বেশ দূর থেকেও ভেসে আসে সেই কণ্ঠধ্বনি। তারা! তারা! তারা—আ—আ।

যাজক ব্রাহ্মণ কেমন যেন আচ্ছন্ন করে দিয়ে গেলেন রাজা বাহাদুরকে। উত্থানশক্তি বুঝি তাঁর লোপ পেয়ে গেছে। পুরোহিতের মুখে কেন এই রহস্যময় হাসি! অপার্থিব কি এক আনন্দের অনুভূতিতে পুরোহিত যেন বিমুগ্ধ হয়ে আছেন। ব্রাহ্মণের রক্তবর্ণ চক্ষুর্দ্বয়ে কি অপূর্ব্ব ভাবাবেশ! কালীশঙ্কর ভাবছিলেন, সাধনার কোন্ মার্গে পৌঁছলেন ঐ ঘনকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ!

ব্রাহ্মণের মানসলোচনে নীলা তারামূর্ত্তি বিরাজ করে।

দশমহাবিদ্যার এক মহামায়া। তরুণবল্লরী ও তনুক্ষীণ-পয়োধরা উগ্রতারার অট্টহাস্য শুনছেন কি পুরোহিত? বলিপ্রিয়া, বলিরতা, রক্তপ্রিয়া, রক্তাক্ষী ও রুধিরাস্থবিভূষিতা মহাদেবপ্রিয়ার উগ্রমূর্ত্তির পূজায় যে সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়। তারা নাম স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে পলায়নপর হয় যতেক ভূতপ্রেত-পিশাচ-রাক্ষস। তারার পূজা করলে সর্ব্বশাস্ত্রে দক্ষ হওয়া যায়, মোক্ষলাভ হয়।

ব্রাহ্মণ সেই মহামূর্ত্তির কল্পনায় যেন বিভোর হয়ে আছেন!

—রাজা বাহাদুর!

আবার চমকে ওঠেন কালীশঙ্কর। তারা নামের আহ্বান শুনে তিনিও যেন সম্মোহিত হয়েছেন।

— প্রাতরাশ প্রস্তুত, উঠতে আজ্ঞা হোক।

ভৃত্যদের একজন রাজা বাহাদুরের চেতনা ফিরিয়ে আনতে প্রয়াসী হয়। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে হাতে হাত কচলায় আর কথা বলে।

—চলো যাই, বললেন রাজা বাহাদুর। অত্যন্ত ধীরে ধীরে ত্যাগ করলেন সাজঘর, অত্যন্ত বিষণ্ণচিত্তে। ক্ষুধার তাড়না অনুভব করছেন কালীশঙ্কর, কিন্তু আহারে বসতে ইচ্ছা হয় না আদপেই।

জন্মদাত্রী জননী বিলাসবাসিনীর মুখে হাসি নেই।

মৌনব্রত অবলম্বন করেছেন রাজমাতা, পরম দুঃখে। কোন্ উপায়ে মাতৃমুখে হাসি ফোটানো যায়? কালীশঙ্করের অন্তর দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে আছে। মা অসুখী থাকবেন, আর তিনি কি না হাসতে হাসতে রাজত্ব করবেন! কালীশঙ্কর অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করেছেন, জামাতা কৃষ্ণরামের কবল থেকে ভগিনী বিন্ধ্যবাসিনীকে উদ্ধার না করলে মা আর ইহজীবনে হাসবেন না। বিন্ধ্যবাসিনীর দুঃখেই হয়তো কোন্ দিন মৃত্যুপথযাত্রী হবেন। কিন্তু উপায় কি? স্বেচ্ছাচারী কৃষ্ণরামের দাবী যে অসামান্য! কৃষ্ণরাম যা চায় তা কি সহজে দেওয়া যায়? কিয়ৎকাল পূর্ব্বে জমিদার কৃষ্ণরাম কয়েকটি সর্ত্তসহ একখানি পত্র প্রেরণ করেছেন। সেই পত্রের প্রতিটি সর্ত্ত যথাযথ পালিত হলে তবে বিন্ধ্যবাসিনীর মুক্তিলাভ সম্ভব। নচেৎ নয়। পত্রটি রাজা বাহাদুর কালীশঙ্করকে লেখা।

কৃষ্ণরামের পত্রের সারমর্ম্ম এই :—

'আমাদের মধ্যে যে পূর্ণ-মৈত্রী ও সৌহার্দ্য স্থাপিত আছে তাহাকে বজায় রাখিতে হইলে এবং আমার অন্যতমা সহধর্ম্মিণী বিন্ধ্যবাসিনী দেব্যাকে পিত্রালয়ে গমনের অবাধ অধিকার দিতে হইলে আমাকে অন্ততঃ পঞ্চসহস্র মোহর অগ্রে যৌতুক দিতে হইবেক। আমার অন্যতমা সহধর্ম্মিণী বিন্ধ্যবাসিনীর পরলোকগত পিতার সঞ্চিত ও রক্ষিত হীরা-মুক্তামণি-মাণিক্যের অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ আমাকে উপঢৌকন হিসাবে দিতে হইবে। এই সঙ্গে কুড়িটি অশ্ব ও পাঁচটি হস্তী দিতে হইবে। উপরিউক্ত দ্রব্যাদি সমস্ত প্রেরিত হইলে আমার অন্যতমা সহধর্ম্মিণী বিন্ধ্যবাসিনীর উপর আমার পূর্ণ অধিকার লাঘব করিতে পারি।

বিন্ধ্যবাসিনীও যদৃচ্ছা পিত্রালয়ে যাইয়া যত দিন খুশী থাকিতে পারে, তাহাতে আমি আপত্তি করিব না। কারণ, একজন স্ত্রী গতায়ু হইলেও আমার কোনরূপ ক্ষতি নাই। জিন্নেৎ-উল্-বেলাৎ (স্বর্গের সমতুল্য) বঙ্গভূমিতে বিবাহের জন্য রূপবতী কন্যার অভাব হইবে না।'

পত্রখানি সেদিন হাতে পৌঁছলে কালীশঙ্কর পত্র পাঠ করতে করতে শিউরে উঠেছিলেন। পত্রটি হস্তচ্যুত হয়ে ভূমিতে পতিত হয়েছিল। চোখে অন্ধকার দেখেছিলেন রাজা বাহাদুর। মনে মনে ভেবেছিলেন,—কৃষ্ণরাম কি দুর্দ্দান্ত, কি নিষ্ঠুর, কি নির্লজ্জ!

রাজমাতা বিলাসবাসিনী পত্রমর্ম্ম অবগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞানাবস্থায় ধরাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন। বহুক্ষণ অতীত হওয়ার পর প্রকৃতিস্থ হয়েছিলেন রাজমাতা। মুখে-চোখে জল দিতে হয়েছিল। মাথায় গোলাপ-জল ঢালতে হয়েছিল। জ্ঞান ফিরে আসতে বলছিলেন,—কালীশঙ্কর, জামাই কেষ্টরাম যা চায় দিয়ে দাও। আমার মেয়ের জীবন রক্ষা করো। সহোদরার প্রতি তোমার কর্ত্তব্য পালন করো।

মায়ের কথা শুনে চোখে অন্ধকার দেখেছিলেন রাজা বাহাদুর। বলেছিলেন,—আমি সামান্য ভুঁইয়া, আমি কোথা হতে পাবো এই বিপুল ধনসম্পদ? আমি কি সর্ব্বস্বান্ত হব?

—তা হলে আমার একমাত্তর মেয়েটা অত্যাচারে অত্যাচারে দগ্ধ হোক, মরুক।

রাজমাতা বিলাসবাসিনী আর অন্য কোন বাক্যব্যয় করেননি। সে দিন রাজমহল থেকে কাঁপতে কাঁপতে নিজের মহলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলেন। মৃত রাজার অভাব প্রকটরূপে অনুভব করেছিলেন। আহা, তিনি যদি জীবিত থাকতেন!

প্রাতরাশে বসে রাজা বাহাদুর যতই ভাবেন ততই যেন তিনি ভাবনার কুলকিনারা হারিয়ে ফেলেন। মায়ের মুখের হাসি দেখতে হলে কালীশঙ্করের নিজেকে বিকিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়। পঞ্চসহস্র মোহর, হীরামুক্তা-মণি-

মাণিক্যের এক-তৃতীয়াংশ অশ্ব ও হস্তী—কোথা থেকে দেবেন রাজা বাহাদুর? কেনই বা দেবেন? কোন্ আইনে?

—আনারসের জারক সর্ব্বাগ্রে পান করুন রাজা বাহাদুর।

মধুমিষ্ট নারীকণ্ঠ শুনলেন কালীশঙ্কর। কে কথা বললে এমন স্নিগ্ধ কোমল ধ্বনিতে!

—কে?

শ্বেতপাথরের পাত্রসমূহ থেকে চোখ তুললেন রাজা বাহাদুর।

প্রাতরাশের আহার, তা-ও কতগুলি ভোজনপাত্র! নানা আকারের পাথর-বাটি পাশাপাশি অর্দ্ধবৃত্তাকারে সাজানো। সর্ব্বমধ্যে একটি পাথর-থালি। রাজা বাহাদুরের ডাইনে কৃষ্ণপ্রস্তরের জলকলসী, জলের ঘটি। বাম দিকে মুখপ্রক্ষালনের পাত্র। পেতলের ছিলিমচি।

চোখ তুলে দেখলেন রাজা বাহাদুর।

ভৃত্য, তাঁবেদার, খানসামা কেউ নেই সেখানে।

মুহূর্ত্তের মধ্যে সকলে অদৃশ্য হয়ে গেছে। কালীশঙ্কর সম্মুখদ্বারে দেখলেন রাজমহিষী আবির্ভূতা। রাজা বাহাদুরের প্রধানা মহিষী। পাটরাণী।

—কে? উমারাণী?

—হাঁ, রাজা বাহাদুর! সর্ব্বাগ্রে আপনি আনারসের জারকটুকু পান করুন। প্রখর গ্রীষ্ম, জারক পানে আপনি তৃপ্ত হবেন। আমি স্বহস্তে প্রস্তুত করেছি এই পানীয়।

কথা বলতে বলতে রাজমহিষী দ্বার অতিক্রম করে ঘরে প্রবেশ করলেন। দেহের অলঙ্কারের ঝঙ্কার উঠলো ঘরে। কত অলঙ্কার রাজমহিষীর দেহে, কত ঐশ্বর্য্য! তদুপরি কি অনন্যসাধারণ রূপ রাজরাণীর! যেন স্বর্গের অপ্সরী!

রাজা বাহাদুরও ভাবছিলেন কোন্ পাত্রটি সর্ব্বাগ্রে মুখে তুলবেন। কি খাবেন সব আগে? ফল, পানীয়, না মিষ্টান্ন? প্রাতরাশের কত আয়োজন! শুধু

আনারসের জারক নয়, আরও এক প্রকার পানীয় ছিল। শ্বেতচন্দন পানীয়। মিছরী, গোলাপজল ও শ্বেতচন্দনচূর্ণের সাহায্যে প্রস্তুত। ফলের রেকাবীতে গ্রীষ্মদিনের নানাবিধ ফল—আম, জাম, জামরুল, তালশাঁস, লিচু, পানিফল, পেঁপে, তরমুজ, আরও কত কি! কত মিষ্টান্ন! মোতিচুর, বালুসাহী, পেরাকী, বাদামের মোহনভোগ।

জারকের পাত্রটি মুখে তুললেন রাজা বাহাদুর।

কি অপূর্ব আস্বাদ! কালীশঙ্করের মুখাকৃতির পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করলেন রাজমহিষী। তিনিও যেন পরিতৃপ্ত হলেন। রাজরাণীর তরমুজ-রাঙা ঠোঁটের দুই প্রান্তে পরিতৃপ্তির হাস্যোদ্রেক হয়।

ঘরের কড়িকাঠের টানা-পাখার ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ ঘরের নীরবতাকে ভঙ্গ করে দেয়। ঘরে যেন ঝড় বইতে থাকে পাখার হাওয়ায়। কালীশঙ্করের বেনারসী জোড়ের উত্তরীয়-অঞ্চল ওড়াওড়ি করতে থাকে। শুভ্র ও মিহি রেশমের জোড়। উত্তরীয়-অঞ্চলে স্বর্ণসূত্রের বেনারসী কারুকাজ চিকণ তোলে ঘন ঘন!

বেশ ক্ষুধার্ত্ত হয়েছিলেন রাজা বাহাদুর।

কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে জারকপাত্র শেষ করে পাত্রটি ভূমিতে রেখে দিলেন। তৃপ্তির শ্বাস ফেললেন। ফলের রেকাবী থেকে তুললেন গোলাপজামের কয়েকটি কুচি।

রাজা বাহাদুরের মুখাকৃতির পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করতে করতে রাজমহিষী মনে মনে ভাবছিলেন, কথাটি পাড়বেন, না পাড়বেন না। কোন এক অপ্রিয় প্রসঙ্গ বর্ত্তমানে উত্থাপন করা কি উচিত হবে? কিন্তু কখনই বা বলবেন রাজা বাহাদুরকে, সময় কোথায়? দিবা-রাত্রির মধ্যে কতটুকু সময়ের জন্যই বা সাক্ষাৎ হয়! কথা হয় পরস্পরে! রাজরাণীর মুখখানি ক্রমে ম্লান থেকে ম্লানতর হয়। আঁখির কোণে কি অশ্রুর চাকচিক্য দেখা দেয়?

অবশেষে বলেই ফেলেন রাজমহিষী উমারাণী। বলেন,—আমি তো আর চোখে দেখতে পারি না!

—কেন, কি হয়েছে?

প্রশ্ন করলেন রাজা বাহাদুর।

উমারাণী বললেন,—রাজমাতা একাদশীর উপবাস ভাঙতে চাইছেন না। সাতগাঁ থেকে বিন্ধ্যবাসিনীর খোঁজ আনতে লোক পাঠিয়েছেন। সে লোক না ফিরলে জলগ্রহণ করবেন না শপথ করেছেন।

কালীশঙ্কর বললেন,—মা কি লোক পাঠিয়েছেন? সপ্তগ্রামে?

—হাঁ। কাকে যেন পাঠিয়েছেন। আমি সঠিক কিছুই জানি না। উমারাণী কাতর কণ্ঠে কথা বলে যান।

একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন রাজা বাহাদুর।

রাজমহিষীর প্রতি তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ। কিন্তু মুখে কোন কথা নেই। কালীশঙ্কর নীরব, নির্বাক্।

কি দেখছেন কি? এমন স্থির দৃষ্টিতে! রাজরাণীর সালঙ্কারা রূপ এই কি দেখবার সময়? চুনী-পান্নার অলঙ্কার উমারাণীর উর্দ্ধাঙ্গে। চুড়ি, বালা, তাবিজ। মুক্তার পাঁচনরী কণ্ঠদেশে। সীঁথিতে হীরার সীঁথি। হীরার অঙ্গুরীয়। পায়ে রূপার পদালঙ্কার। ঝুটো পাথরের নক্সাতোলা রূপার পাঁয়জোর। ফিকে সবুজ রেশমের জংলা শাড়ী। বক্ষে ঘন লাল ভেলভেটের খাটো কাঁচুলী।

কিছুই দেখছেন না রাজা বাহাদুর কালীশঙ্কর।

তাঁর চোখে শূন্যদৃষ্টি। কিংকর্ত্তব্য কিছুই ঠাওরাতে পারেন না তিনি। ভেবে ভেবে কোন কূল-কিনারা খুঁজে পান না যেন। বলেন,—কাকে পাঠিয়েছেন মা? কে গেছে সপ্তগ্রামে?

—আমি সঠিক কিছুই জানি না। পুনরায় বললেন উমারাণী।

কে গেছে সপ্তগ্রামে?

জগমোহন লেঠেল কোমর বেঁধে গেছে।

ততক্ষণে বংশবাটির জনাকীর্ণ পথ অতিক্রম করে সপ্তগ্রামের বাসুদেবপুরে পৌঁছে গেছে জগমোহন। লাঠিতে ভর দিয়ে দিয়ে লাফ দিতে দিতে গেছে। কৃষ্ণরামের জমিদারীর চৌহদ্দীতে পৌঁছেছে।

অনতিদূরেই জমিদার কৃষ্ণরামের বৃহৎ আবাস-বাটী। গগনস্পর্শী গাছের অভ্যন্তরে যেন লুকানো।

সু-উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত ঘন লাল রঙের ইমারতী গৃহ। বাহির থেকে কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। জগমোহন দেখলে, গৃহের বৃহৎ মূল ফটকের দু' পাশে দু'জন অশ্বারোহী পাহারাদার। নিশান উড়িয়ে ধরে আছে। অশ্বারোহীদ্বয়ের পৃষ্ঠদেশে ঝুলছে দেশী বন্দুক।

জগমোহন বুঝলো, জমিদার-গৃহে প্রবেশ লাভের কোন আশাই নেই। কোন পথও নেই। বৃথা চেষ্টা।

কৃষ্ণরামের গৃহসীমানার কিঞ্চিৎ দূরে দাঁড়িয়ে উপায় নির্দ্ধারণের প্রয়াস পায় জগমোহন। এতটা পথ এসেছে, ক্লান্ত, অবসন্ন ও ঘর্ম্মাক্ত হয়ে উঠেছে সে। একটি জটাজুটধারী বটবৃক্ষের ছায়ায় আপাততঃ বসে পড়লো জগমোহন। ক্লান্তির মোচন হোক আগে। গায়ের ঘাম শুষ্ক হোক।

গ্রীষ্মদিনের দাবাগ্নি যেন বাতাসে। কি প্রখর উত্তাপ আকাশচারী সূর্য্যের! জগমোহন ঘন ঘন শ্বাস ফেলে। হাঁফায়।

রেশমী ঝালর-দেওয়া লাল-শালুর টানা-পাখার বিরামবিহীন শব্দ। ঘরে যেন ঝড়ের বাতাস বইছে। সত্যসকালে ঐ পাখা টানার কাজে লেগেছে কোন্ এক চাপরাসী না আরদালী। নতুন উদ্যম ও উৎসাহে ক্ষণিকের তরেও থামছে না। বড় বেশী শব্দ হচ্ছে, টানা-পাখার ক্যাঁচ্-ক্যাঁচ্ শব্দ। কি করবে চাপরাসী, পাখা থামিয়ে দেবে তাই বলে? ঘরের জানালা ও দরজার পাতলা পর্দা থেকে থেকে দুলছে হাওয়ার বেগে। রাজাবাহাদুর কালীশঙ্করের বেনারসী জোড়ের উত্তরীয়-অঞ্চলও পতাকার মতই পৎ-পৎ উড়ছে যেন। শুভ্ররঙ মিহি রেশমের জোড়। উত্তরীয়-অঞ্চলে স্বর্ণসূত্রের বেনারসী কারুকাজ চিকণ তুলছে তখন। প্রাতরাশে বসেছেন রাজা-বাহাদুর, এখন কখনও পাখার গতি মন্দ করা যায়? চাপরাসী সোৎসাহে

দড়ি টানে আর ছেড়ে দেয়। ছাড়ে আর টানে। যখন টানে তখন প্রায় শুয়ে পড়ে বুঝি দরদালানে। যখন ছাড়ে তখন মাথাটি তার দুই জানুতে প্রায় স্পর্শ করে। কতটা শক্তির প্রয়োজন হয় টানা পাখার দড়ি টানতে? শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়, ঘাম ঝরতে থাকে। তবুও ক্ষণিকের জন্য থামে না চাপরাসী। মধ্যে মধ্যে হাত বদল করে শুধু। ডান হাতের দড়ি বাম হাতে ধরে।

এটা-সেটা মুখে তোলেন রাজাবাহাদুর।

কখনও ফল, কখনও মিষ্টান্ন। যেটি খেতে ভাল লাগে খান, যেটি খেয়ে অতৃপ্ত হন সেটি মুখে ছুঁইয়ে পুনরায় নামিয়ে রাখেন। শ্বেতচন্দনের পানীয় আস্বাদ করেন কখনও কখনও। বারে বারে অতি সামান্যই পান করেন। পানপাত্রটি যেমন গভীর তেমনই ভারী। পানীয় শেষ হতে চায় না যেন। এটা-সেটা খেতে খেতে একেক বার গলা-খাঁকারির শব্দ করেন রাজবাহাদুর। কণ্ঠ সাফ করে নেন। আর মাঝে মাঝে সম্মুখে দণ্ডায়মানা রাজমহিষীর প্রতি দৃষ্টি তোলেন।

রাজাবাহাদুর কালীশঙ্করের প্রধানা মহিষী।

সাবগুণ্ঠনে নম্রমুখী হয়ে স্থির দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। তাঁর মুখাকৃতি ঈষৎ গম্ভীর, আঁখির কোণে যেন বিস্ময়ের আবেশ। রাজাবাহাদুর একেক বার সাগ্রহে লক্ষ্য করেন মহিষীর বেশভূষা। বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত পরিচ্ছদ। প্রতি অঙ্গে রত্নাভরণ-পারিপাট্য। সদ্যঃস্নাতা রাণীর পৃষ্ঠে আলুলায়িত ও তৈল-চিকণ কেশের রাশি। প্রায় জানু স্পর্শ করেছে এলো কেশের শেষ।

দরদালানের নূপুর বাজলো হঠাৎ।

নূপুর না ঘুঙুর কে জানে! ঘুন্টি-দেওয়া পায়ের গহনা শব্দ তুললো কক্ষের বাইরে। অতি নিকট থেকে শব্দ কানে পৌঁছে। যেমনকার তেমনি দাঁড়িয়ে থাকেন রাজরাণী। স্তব্ধ গম্ভীর তিনি, যেন চাঞ্চল্যহীন। রাজাবাহাদুর একবার দ্বারপথে দৃষ্টি ফেরালেন। কিন্তু কে [illegible] কৈ কেউ নেই, তবুও নূপুরের স্পষ্ট-ধ্বনি শুনলেন না কালীশঙ্কর?

রাজাবাহাদুর বললেন,—একটি বার দেখো, কে যেন এসেছে ঘরের বাইরে!

ঠিক মূর্তিমতীর মতই দাঁড়িয়েছিলেন রাজমহিষী।

রাজ-আজ্ঞা সহসা কানে পৌঁছতে হতজ্ঞান ফিরে পেলেন বুঝি। প্রথম কর্ণপাত করতেই রাজাবাহাদুরের উক্তি ঠিক বোধগম্য হয়নি তাঁর। অপ্রস্তুতের লজ্জায় ব্যস্ত হয়ে ফিস-ফিস বললেন,—কে! কে কোথায় এসেছে?

—ঐ যে নূপুরধ্বনি শুনি! কে সেখানে?

শ্বেতচন্দনের পানপাত্র মুখে তুলতে তুলতে বললেন রাজাবাহাদুর। গলা-খাঁকারির শব্দ করলেন। গলা সাফ করে নিলেন।

স্মিতহাসির রেখা ফুটলো রাজমহিষীর অধরোষ্ঠে।

মুক্তার মত দন্তপাঁতি দৃষ্টিপথে দেখা দিলো। ভেসে-আসা নূপুরের রুনুঝুনু তাঁরও কানে পৌঁছেছে। তবে তিনি জানেন, ঘরের বাহিরে কে এমন ঘুন্টি-দেওয়া পায়ের অলঙ্কার বাজায়। রাজরাণী জানেন, তাই প্রসন্ন হাসির মৃদু আভাষ পাওয়া গেল তাঁর ওষ্ঠাধরে।

—কে সেখানে?

পুনরায় প্রশ্ন করলেন রাজাবাহাদুর। কৌতূহলী কণ্ঠে।

সহাস্যে বললেন রাজমহিষী,—রাজপুত্তুর সেখানে আছে। এখানে আসতে ভীত হয়েছে হয়তো।

কালীশঙ্কর বললেন,—কে? রাজপুত্র শিবশঙ্কর?

—হ্যাঁ রাজাবাহাদুর, আমার ছেলে। মুচকি হাসির সঙ্গে আবার কথা বললেন রাজমহিষী। অনিমেষ চক্ষুতে চেয়ে থাকলেন। দেখলেন, দ্বারপথে তাকে দেখতে পান কি না পান।

শিশু পুত্র ঘরে প্রবেশ করতে ভীত হয় শুনে রাজাবাহাদুর মৃদু মৃদু হাসলেন। কোন কথা বললেন না। শ্বেতচন্দনের পানপাত্রের অবশিষ্টটুকু প্রায় এক চুমুকে পান করে পাত্রটি রাখলেন যথাস্থানে।

—এ কি! আপনি যে আসন ত্যাগ করছেন?

রাজাবাহাদুরকে আসন ত্যাগ করতে উদ্যোগী দেখে বললেন মহিষী। টানা-পাখার দুরন্ত হাওয়ায় উড়ে-যাওয়া গুণ্ঠন ঈষৎ টানলেন। হস্তচালনায় হাতের হীরকমণ্ডিত বালা ঘরের আলো-অন্ধকারে জল্-জল্ করলো। গুণ্ঠনের আড়াল থেকে উঁকি দিলো নাকের নথ। নথে একটি দোদুল্যমান লালাভ মুক্তা! নথের নোলক।

—হ্যাঁ তাই। প্রচুর খেয়েছি, আর নয়।

কথা বলতে বলতে সত্যিই আসন ত্যাগ করে উঠলেন কালীশঙ্কর। ঘরের বাইরে পদার্পণ করেছেন, তখন রাজরাণী বলেন,—রাজমাতার জন্য কি ব্যবস্থা করলেন? তিনি যে দ্বাদশীর উপোষ ভাঙ্গতেই নারাজ। গৃহস্থের কর্ত্তব্য কি তাই বলুন।

দ্বারের বাহিরে পদার্পণ করে রাজমহিষীর বক্তব্য কানে শুনে চলতে চলতে আপন গতিরোধ করলেন রাজাবাহাদুর। চিন্তিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলেন কতক্ষণ। বললেন,—সহোদর ছোটকুমারের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করতে চাই। অতঃপর জানাবো কি করা কর্ত্তব্য। ভাই কাশীশঙ্কর যেমন বলে তেমন বন্দোবস্ত হবে।

—তবে তাই হোক্।

ফিসফিসিয়ে বললেন রাজমহিষী, সভয়ে, সন্ত্রাসে। মাথার ঘোমটা টানলেন।

দরদালান ধরে এগিয়ে যেতে জলদগম্ভীর কণ্ঠে বললেন রাজাবাহাদুর,—কোথায় গেল রাজপুত্র? কোথায় শিবশঙ্কর?

কোথায় কে? কিশোর শিবশঙ্কর রাজার পদধ্বনি শুনেছিল। শোনা মাত্র দৌড়ে পালিয়ে গেছে কোথায় কোন্ ঘরে না দালানে। ইদিক-সিদিক দেখলেন রাজরাণী। কোথাও কেউ নেই। কেমন যেন লজ্জানুভব করছেন উমারাণী। ফিস ফিস সুরে বললেন,—হয়তো ভীত হয়েছে আপনার পদশব্দে। ভয়ে কোথায় দৌড় দিয়েছে।

—বেশ কথা।

মৃদু হাসি হেসে বললেন রাজাবাহাদুর। ঘরের মুখেই ছিল কালীশঙ্করের কাষ্ঠ-পাদুকা। পা চালিয়ে পরেছেন কখন এই ফাঁকেই। পাদুকার বিকট শব্দ দরদালানে মিলিয়ে গেল।

আর কত দূর পিছু পিছু এগোবেন উমারাণী ?

কিছু দূর এগিয়ে ধীরে ধীরে ফিরলেন। কোথায় যাবেন রাজার সঙ্গে সঙ্গে ! রাজাবাহাদুর তো এখনই দরবারে যাত্রা করবেন। সমস্ত দিনটির মধ্যে যে আরেকটি বারও সাক্ষাৎ হবে না পরস্পরে। রাত্রেও হবে কি না কে জানে ! হয়তো নয়।

রাজাবাহাদুর কালীশঙ্করের দরবারে যাওয়ার সুখাসন রাজমহলের দ্বারে কখন থেকে অপেক্ষা করছে। কি সুদৃশ্য সেই সুখাসন ! কত জন তার বাহক !

দ্বাদশ জন কাফ্রী। মিস্ কালো রঙ, আলো ব্যতীত দেখা যায় না অন্ধকারে। দ্বাদশটি কাফ্রী অধীর প্রতীক্ষায় সুখাসন ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে রাজমহলের বড় দরজায়। আর আছে রাজাবাহাদুরের দুজন দেহরক্ষী। সশস্ত্র। কটিদেশে তাদের বাঁকা তরোয়াল।

আর কত দূর রাজাবাহাদুরের সঙ্গে সঙ্গে যেতে পারেন রাজমহিষী ? সহোদর ভাই, ছোটকুমার কাশীশঙ্করের সঙ্গে আলোচনা করতে চেয়েছেন রাজাবাহাদুর। শেষ পর্যন্ত এই আলাপ ও পরামর্শের কি পরিণাম হবে কে জানে ! উমারাণী নানা কথা চিন্তা করতে করতে বিষণ্ণচিত্তে নিজের মহলের দিকে চললেন। একবার মনে পড়লো রাজপুত্র শিবশঙ্করকে। কোথায় গেল সে, কোথায় লুকালো ! রাজমহিষী দেখলেন অদূরে তাঁরই আগমন-প্রতীক্ষায় উন্মুখ দাঁড়িয়ে তাঁরই এক পরিচারিকা। মহিষী তাকে দেখে আশা লাভ করলেন কিঞ্চিৎ। বললেন,—দাসী, তুই যা, রাজপুত্তুরকে খুঁজে আন্। কোথায় যে আছে, আমি তো কিছুই জানি না।

পরিচারিকা বললে,—বড়রাণী, আপনি নিশ্চিন্ত হোন। রাজপুত্তুর আপনার মহলেই ফিরে গেছে।

রাজমহিষীর চিন্তাকুল দৃষ্টি। রুদ্ধশ্বাস কণ্ঠ। বললেন,—ভুল দেখলি না তো? ঠিক জানিস্?

পরিচারিকা কথায় জোর দিয়ে বললে,—আমি যে স্বচক্ষে দেখেছি বড়রাণী! রাজপুত্তুর ফিরে গেছে, এই পথ ধরেই গেছে।

আর এক মুহূর্ত সেখানে তিষ্ঠোলেন না উমারাণী। চললেন, দ্রুত পদে চললেন আপন মহল যে দিকে। পরিচারিকা অনুসরণ করলো রাণীকে। বড় রাণীর কি কমনীয় রূপ, কি উজ্জ্বল গাত্রবর্ণ! দেখতে দেখতে কত দিন, কত সময়ে বিমুগ্ধ হয়ে গেছে পরিচারিকা।

পদ্ম-পাপড়ির মত দুই নয়ন। ক্ষুদ্র নাসারন্ধ্র। তিন রেখাযুক্ত বিভূষিত কণ্ঠ। কুঞ্চিত কেশকুন্তল। প্রমাণ শরীরে কোমল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। ঐশ্বর্য ও পদগর্বে আত্মহারা নয়, মুখে মৃদুহাসির ক্ষীণ রেখা সর্বক্ষণ।

রাজাবাহাদুরের সহোদর, ছোটকুমার, দেবর কাশীশঙ্কর কি বলতে কি বলবেন, সেই সকল কথার কল্পিত আলোড়ন বক্ষমধ্যে। কাশীশঙ্কর যে ধরণের মানুষ, তাতে ভয় হয় উমারাণীর। বাক্যালাপ, তর্ক-বিতর্ক ও বাক্-বিতণ্ডার ধার ধারেন না ছোটকুমার—কথায় কথায় ছোরা-ছুরির ব্যবহার করেন—ক্রোধ বৃদ্ধি হলে আর কোন উপায় থাকে না। যতক্ষণ ক্রোধ থাকে না ছোটকুমার ততক্ষণই মানুষ। রাজমহিষী ভাবছিলেন,—আহা, রাজাবাহাদুরকে যদি একবার বলবার অবকাশ পেতেন, তবে বলতেন যে, ননদিনী বিন্ধ্যবাসিনীর স্বামী জমিদার কৃষ্ণরামের সঙ্গে যেন আপোষে রফা করেন। ছোটকুমার যেন কোন হিংস্র উপায় অবলম্বন না করেন।

ছেলে কোথায় গেল?

কোথায় গেল শিবশঙ্কর? রাজপুত্র চক্ষের নিমেষে কোন্ অন্তরালে গিয়ে লুকালো? ত্রস্ত পদক্ষেপে নিজের মহলের দিকে যেতে যেতে কত কথাই মনে পড়ে রাজমহিষীর। ছেলেকে চোখের আড়াল করতে পারেন না একটি মুহূর্ত। কার মনে কি আছে কে বলতে পারে? বহুবিস্তৃত এই রাজপ্রাসাদের কোন্

অন্ধকারে কে লুকিয়ে আছে কে জানে! বিষের পাত্র থাকে যদি তার হাতে। অলক্ষ্য থেকে যদি কেউ অস্ত্র নিক্ষেপ করে!

আহা, ছোটকুমার যদি ননদিনী বিন্ধ্যবাসিনীর স্বামী কৃষ্ণরামের সঙ্গে আপোষে মিটমাট করেন তবেই রক্ষা।

কাফ্রীর দল গলদঘর্ম হয়ে উঠেছে।

রাজাবাহাদুরের সুখাসন তবুও এখনও রাজমহলের সীমা ত্যাগ করেনি। এখনও যেতে হবে কত দূরে! রাজমহল থেকে যেতে হবে রাজ-কাছারীতে। যেন এক গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যেতে হবে। এতগুলি কাফ্রী একসঙ্গে সুখাসন বয়ে নিয়ে চলেছে, তবুও ঘর্মাক্ত হয়ে উঠেছে প্রত্যেকে। রাজার সুখাসন, যদি দুলে ওঠে। কাঁধ বদল করতে পাবে না কেউ। বদলের জন্য সচেষ্ট হলেই রাজগৃহের জল্লাদের লৌহকণ্টকময় কশাঘাত সহ্য করতে হবে। সেই ভয়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আছে কাফ্রী দল।

সুখাসন হলে কি হয়, যেমন সুদৃঢ় তেমনই গুরুভার।

ক্ষত্রিয় জাতীয় কাষ্ঠে নির্মিত সুখাসন। সোনার পাত আগাপাশতলায়। উঁচু-নীচু কারুশিল্প সর্বত্র। মোগলমুসলমানী নক্সা সুখাসনের যত্র তত্র। রাজা-বাহাদুরের শিরোদেশে মুক্তার-ঝালর ঝোলানো রাজছত্র।

রাজ-কাছারীতে আসছেন স্বয়ং রাজাবাহাদুর।

দেওয়ানজী কখন এসে যাত্রায় যোগ দিয়েছেন, কারও দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু রাজাবাহাদুরের নজর এড়ায় না। কালীশঙ্কর ঠিক চোখ রেখেছেন। দেখেছেন দেওয়ানকে। আজ তার মুখাকৃতি যে কেমন তাও লক্ষ্য করেছেন একাগ্রদৃষ্টিতে।

বেগুনী ভেলভেটের জরিদার তাকিয়া পিষ্ট হতে থাকে। রাজাবাহাদুর দেহ হেলিয়েছেন। বললেন,—দেওয়ানজী, বাহকদের গতি রোধ করা হোক্।

সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখের অস্ত্রধারী দুজন দেহরক্ষীর কি এক সঙ্কেত দেখে কাফ্রীর দল থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো! রাজাবাহাদুর স্বয়ং যখন হুকুম করেছেন।

—দেওয়ানজী, ছোটকুমারকে এত্তেলা দেন, আমি সাক্ষাতের অভিলাষী। পুনরায় কথা বললেন রাজাবাহাদুর কালীশঙ্কর। গম্ভীর কণ্ঠে।

কথা শুনে দেওয়ান বোধ করি খুসী হন না। মাথার শিরোপা যথাস্থানে বসিয়ে দিতে দিতে দেওয়ান কি যেন বলতে চেয়ে বলতে পারেন না। মুখের আগায় কথা, তবুও মুখ খুলতে পারেন না। সঙ্কোচ বোধ করেন।

রাজাবাহাদুর বললেন,—দেওয়ানজী, আপনি কি আমার প্রস্তাব গ্রহণে অনিচ্ছুক?

শিরোপার অঞ্চলে হাত বুলাতে থাকেন দেওয়ান। বললেন,—রাজাবাহাদুর, আপনার পক্ষে এ কার্য সমীচীন হবে না। আপনিই জ্যেষ্ঠ, আপনি সকল সম্মানের অধিকারী, আপনি কেন ওপরপড়া হয়ে সাক্ষাতের প্রার্থনা জানাবেন? কি বা প্রয়োজন?

সুখাসনের গতি কি চিরদিনের মত বন্ধ হয়েছে?

কাফ্রীর দল কৃষ্ণবর্ণ পাষাণ-মূর্তির মত অচঞ্চল দাঁড়িয়ে আছে। কঠোর কষ্ট-ভোগের ম্লান চিহ্ন ওদের মুখাবয়বে। আরও কতক্ষণ বহন করতে হবে এই গুরুভার সুখাসন? আরও কতদূরে যেতে হবে? রাজপুরীর সুবিশাল প্রাঙ্গণের পথ ধরে ধীরে ধীরে চলেছিল সুখাসন। অনুজ কাশীশঙ্করের মহলের প্রধান দ্বারের সম্মুখে পৌঁছতেই রাজাবাহাদুর সুখাসনের গতি রোধ করতে আদেশ করেছেন।

ছোটকুমার কাশীশঙ্করের নাম শুনলেই দেওয়ান কম্পিতবক্ষ হন। তাঁকে দেখলে এতই ভীত হন যে বাক্যস্ফূর্তি হয় না কোন মতেই। এই প্রাতঃকালেই ছোটকুমারকে কি বা প্রয়োজন?

রাজাবাহাদুর বললেন,—আমার পরম আরাধ্যা মাতৃদেবী এখনও পর্যন্ত নিরম্বু উপোষী আছেন। রাজকুমারী বিন্ধ্যবাসিনীর জন্য মর্মাহত হয়েছেন। এজন্য কিছু পরামর্শ করণের ইচ্ছা করি।

দেওয়ানজী ভয়ার্ত দৃষ্টিতে কাশীশঙ্করের বাসগৃহের আপাদমস্তক লক্ষ্য করেন। যেন এক অপরাধী, কারাগৃহ দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে দেওয়ানজী

বললেন,—বেশ কথা। খুবই ভাল কথা। তবে এ স্থলে, এই প্রাঙ্গণমধ্যে সকলের চোখের সম্মুখে, আপনি স্বয়ং কিনা রাজাবাহাদুর, আপনার পক্ষে সাক্ষাতের প্রত্যাশায় তীর্থের কাকের ন্যায় অপেক্ষা করা সত্যই লজ্জার ও অনুকম্পার বিষয়। সাক্ষাৎ করতেই যদি হয়, রাজাবাহাদুর আপনি দরবারে বসে এত্তেলা পাঠান না কেন ছোটকুমারকে!

রাজাবাহাদুর কালীশঙ্কর একান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে বললেন,—তথাস্তু।

দেওয়ানের আদেশে দেহরক্ষিদ্বয় পুনরায় কি এক সঙ্কেত করতেই সুখাসন সচল হল তৎক্ষণাৎ। কাফ্রীর দল স্বস্তির শ্বাস ফেললো। রাজপুরীর প্রাঙ্গণ-পথ ধরে ধীরে ধীরে অগ্রসর হল সিপাই, শান্ত্রী ও সুখাসন। রাজছত্রের মুক্তার ঝারা আবার দোদুল্যমান হয়। নতুন সূর্যালোকের স্পর্শ পেয়ে সুখাসন দ্যুতি ঠিকরোয়; মোগল-মুসলমানী স্বর্ণশিল্পের ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করে।

দেওয়ান যেতে যেতে বারে বারে ফিরে ফিরে দেখেন পিছু পানে। ছোটকুমার কাশীশঙ্করের গৃহের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করেন ভয়-কাতর চোখে। বাহির থেকে গৃহাভ্যন্তরে দৃষ্টি চলে না। গৃহের সুউচ্চ ও বিশাল প্রাচীরে ব্যাহত হয় দৃষ্টি। হাওদা-সমেত হাতীর গমনাগমন চলতে পারে কাশীশঙ্করের গৃহের সিংহদ্বার এমনই বৃহৎ।

উন্মুক্ত লৌহফটক সিংহদ্বারে। তবুও কারও অবাধ গতি সেখানে নেই।

দুজন সশস্ত্র দেহরক্ষী ফটকের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে বিপরীতমুখে যাওয়া-আসা করছে। পাহারা দিচ্ছে, পথ আগলাচ্ছে।

কোথা থেকে অশ্বের পদধ্বনি ভেসে আসছে, রাজাবাহাদুরের কর্ণেন্দ্রিয় সজাগ হয়ে ওঠে। কোথায় কোন্ পথে দুরন্ত বেগে ছুটেছে কার অশ্ব? একটি দুটি নয়, একসঙ্গে বেশ কয়েকটি খুরের খটাখট শব্দ পাওয়া যায় যেন। রাজাবাহাদুর দেখলেন ছোটকুমারের সিংহদ্বারের চলমান প্রহরিদ্বয় সহসা প্রস্তরীভূত হয়ে যায়। ফটকের দুপ্রান্তে যে যার স্থানে দাঁড়িয়ে পড়ে। ইতি-উতি দেখেন রাজাবাহাদুর। কোথায় অশ্ব, কোথায় কে!

এমন সময় কাশীশঙ্করের সিংহদ্বার ভেদ করে তড়িৎ গতিতে বেরিয়ে পড়লো আরোহীসহ অশ্বের সারি। বঙ্কিমগ্রীবা অশ্বসমূহ পূর্ণোদ্যমে ছুটছে—পিছন-পথে ধূলি উড়ছে—উড়ছে অশ্বারোহীদের উষ্ণীষপ্রান্ত। সর্ব্বপ্রথমে চলেছেন ছোটকুমার কাশীশঙ্কর। দুর্নিবার বেগে ঘোড়া ছুটিয়েছেন। অন্যান্য অশ্বারোহী তাঁকে অনুসরণ করছে। কাশীশঙ্করের অশ্বকে ছেড়ে এগিয়ে যাবে এমন সাধ্য বা সাহস কার আছে? অশ্বের সারি রাজপ্রাসাদের প্রধান প্রবেশদ্বার অতিক্রম করে সবেগে বেরিয়ে গেল।

রাজাবাহাদুর বললেন,—দেওয়ানজী, অশ্বোপরি কাশীশঙ্করকে দেখছি কি?

—যথার্থ ই দেখেছেন রাজাবাহাদুর।

দেওয়ানের প্রায় শুষ্ক কণ্ঠ। বিস্ফারিত চোখে শিশুসুলভ ভয়ার্ত্ত চাউনি।

—কোথায় চলেছে সদলবলে? এমন প্রখর সূর্যতাপে?

একাগ্র কৌতূহলের সুর কালীশঙ্করের কথায়। আয়ত আঁখিযুগলে ফুটে উঠেছে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি। কুঞ্চিত দুই ভ্রূ, যেন দুটি বাঁকা তরোয়াল।

দেওয়ান বললেন,—গড়গোবিন্দপুরে চলেছেন অনুমান হয়।

—গড়বোবিন্দপুরে?

সবিস্ময়ে নিজের মনে নিজেকেই প্রশ্ন করলেন রাজাবাহাদুর। কিন্তু কেন, কি কারণে যে গড়গোবিন্দপুরে চললো ছোটকুমার, অনুধাবন করতে পারলেন না কিছুতেই। সুতানুটী থেকে গড়গোবিন্দপুর, কতটা দীর্ঘ পথ! গড়গোবিন্দপুরে কাশীশঙ্করের কি প্রয়োজন? কে-ই বা আছে সেখানে! রাজাবাহাদুর যেতে যেতে আকাশ-পাতাল কত কথাই ভাবেন। কিন্তু কোন কিছু সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন না। দুই ভ্রূ সরল হয় না আর সহজে, বাঁকা তরোয়ালের মতই বক্র হয়ে থাকে।

—গড়গোবিন্দপুরে! কেন সেখানে কে আছে? কোন্ অন্তরঙ্গ?

নিজের মনে নিজেকেই প্রশ্ন করলেন রাজাবাহাদুর। কিন্তু কোন সদুত্তরই খুঁজে পেলেন না।

কাফ্রীর দল তাদের গতি দ্রুত করলো।

গুরুভার সুখাসন আর বুঝি বওয়া যায় না। কাফ্রীদের ঘর্মাক্ত দেহে তাজা সূর্যালোক পড়েছে। যেন ঘাম-তেল মেখেছে সর্বাঙ্গে। রৌদ্রালোকে চিক চিক করছে ওদের বলিষ্ঠ শরীর। তবুও মুখে কথা নেই, ভাবভঙ্গীতে কোন প্রকাশ নেই। মনে হয়, তবে কি ওরা মূক, বধির?

ভিন্‌দেশের মানুষ। ভাগ্যের ফেরে পড়ে ক্রীতদাস হয়েছে। ক্ষুধা আর অভাবের তাড়নায় বিকিয়ে দিয়েছে নিজেদের। দাসত্ব করছে। পাছে কোন দিন চোখে ধূলি দিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায় তাই কাফ্রীদের কারও বাহুতে, কারও পৃষ্ঠদেশে লেখা আছে নাম। উর্দু ভাষায় লেখা। যে অজ্ঞাতকুলশীল, যার কোন পরিচয় নেই; যে অনাথ, যার পিতা-মাতার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই, তার পিঠে এঁকে দেওয়া হয়েছে পরিচয়-চিহ্ন হিসাবে সংখ্যার সঙ্কেত।

কালির দাগ, জলে ধুয়ে যায়।

উল্‌কির কালো রেখা, অস্ত্রের সাহায্যে চেঁচে তুলে দেওয়া যায়। তাই জ্বলন্ত লৌহ-সূচী বিদ্ধ করে কাফ্রীদের দেহে ফুটিয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের আত্মপরিচয়। যতদিন না ঐ দেহ আগুনে দগ্ধ হয়, ততদিন আত্মগোপনের কোন উপায় নেই। পলায়নেরও পথ নেই।

সুখাসনের ভারে ঊর্দ্ধাঙ্গ নত হয়ে গেছে কাফ্রীদের। গতি দ্রুত করেছে ওরা। এই গুরুভার আর বুঝি বওয়া যায় না। কত দূরে রাজকাছারী?

ঐ তো গাছ-গাছালির ফাঁক থেকে উঁকি মারছে কাছারী-বাড়ী! এখনও অনেকটা পথ। রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণের আঁকা-বাঁকা পথ ধরে যেতে হবে আরও কতক্ষণ।

ঘন ও কুঞ্চিত-কেশ কাফ্রীদের মধ্যে একজন হঠাৎ তারস্বরে চীৎকার করলো। রাজাবাহাদুর ছিলেন চিন্তাকুল। গগন-বিদারক শব্দ শুনে কালীশঙ্কর পিছনে দৃষ্টিপাত করলেন। বড় জোর লেগেছে আচম্‌কা। কাফ্রীদের মধ্যে একজন মাত্রাতিরিক্ত ভার বহনে অক্ষম হয়ে কাঁধ বদল করতে সচেষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রীতদাস-সর্দার সজোরে চাবুক চালিয়েছে। সব শেষে ছিল যে কাফ্রীটি, তারই পিঠে চাবুকের ঘা পড়েছে। শঙ্কর মাছের লেজের সুদীর্ঘ চাবুক আচমকা

লাগতেই চীৎকার করেছে তারস্বরে। কি বিশ্রী আর কর্কশ কণ্ঠধ্বনি! কি গম্ভীর!

একেই আদুড় গা।

নীল বনাতের খাটো জাঙ্গিয়া ছাড়া আর কিছুই নেই পরনে। গলায় কালো শুতোর হারে ঝুলছে তামার চাকৃতি। যার যার আত্মপরিচয় খোদাই আছে ঐ চাকতিতে। যার যা সংখ্যা।

রাজকাছারীর কাছাকাছি পৌঁছে দেওয়ান বললেন,—হুজুর, তবে এখন দরবারেই গমন হবে তো, না মা পতিতপাবনীর মন্দির দর্শন করতে যাবেন?

—উঁহু, দরবারেই যাওয়া হোক্‌।

রাজগৃহের প্রাঙ্গণের ইদিক-সিদিক দেখতে দেখতে বললেন রাজাবাহাদুর। দেওয়ানের কথায় কর্ণপাত করেছেন মাত্র, দৃষ্টি তাঁর বিচরণ করছে হেথায়-সেথায়। বহুদূর-বিস্তৃত বৃহৎ প্রাঙ্গণের একদিকে সারি সারি রাজপ্রাসাদ। একদিকে চিড়িয়াখানা। এক দিকে মন্দির ও তৎসংলগ্ন ঝিল। এক দিকে রাজকাছারী। গাছ-গাছড়ার ফাঁকে ফাঁকে লুকিয়ে আছে কোথাও জেলখানা, কোথাও তোশাখানা, কোথাও মালখানা। আর যেন লুকিয়ে আছে কত সশস্ত্র দ্বাররক্ষী। যত বন্দুকধারী।

রাজকাছারীর দরদালানে সুখাসন নামিয়ে রেখে কাফ্রীর দল রেহাই পায়। দম ফেলে বাঁচে। এখন বহুক্ষণ আর তাদের প্রয়োজন নেই, যতক্ষণ না দরবার শেষ হয়। কেউ ডাকবে না তাদের। এখন এতটুকু ছায়া চাই। গাছ-গাছড়ার ঝোপ-ঝাড়ের কালো অন্ধকারে মিলবে শীতলতা, অন্যত্র কোথাও নয়। কাফ্রীর দল নিঃশব্দ পদক্ষেপে ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে প্রবেশ করলো। কি অসহ্য সূর্যোত্তাপ! মুক্ত আকাশের নীচে কেবল প্রখর রৌদ্র। খরতাপে কি প্রচণ্ড দাহিকা!

রাজ-কাছারীর দরদালানে পদার্পণ করেছেন কি করেননি, অনুগৃহীত ও আশ্রিত জনের প্রতি প্রতি-নমস্কার জানাচ্ছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে দেওয়ান বললেন, —ঘটনাটি রাজাবাহাদুর স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন নিশ্চয়ই?

বিস্ময়াবিষ্ট চোখে তাকালেন রাজাবাহাদুর। সবিস্ময়ে বললেন,—কোন্ ঘটনা?

হে হে শব্দে হাসলেন দেওয়ান। মাথার শিরোপার প্রান্তভাগ ঈষৎ টানাটানি করতে করতে বললেন,—আপনার স্নেহপুষ্ট সহোদরের ব্যবহার লক্ষ্য করলেন না? স্নেহে আপনি একেবারে অন্ধ হয়ে আছেন, তাই চোখে পড়ে নাই অনুমান করি।

আরও অধিক বিস্ময়ের জড়তায় আচ্ছন্ন হন রাজাবাহাদুর। বলেন,—সহোদরের কি অসৎ আচরণ আপনি দেখেছেন?

আবার হাসলেন দেওয়ান। কৃত্রিম হাসি।

হাতে হাত কচলাতে লাগলেন। চতুর্দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে রাজাবাহাদুরের কাছাকাছি এগিয়ে গেলেন। কণ্ঠস্বর নত করে বললেন,—ঐ যে আপনার সহোদর, আপনার সমুখ দিয়ে দল-বল সাঙ্গোপাঙ্গ সমেত আপনাকে উপেক্ষা করে টগবগিয়ে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করলো! এ অপমানের প্রতিকার হওয়া প্রয়োজন। আপনার পক্ষে রাজাবাহাদুর, এরূপ ব্যবহার মেনে নেওয়া অত্যন্ত সম্মানহানিকর। অন্ততঃ আমি তাই মনে করি।

কথা শুনে রাজাবাহাদুর হাসলেন। ভেবে ছিলেন না জানি দেওয়ান কত কথাই শোনাবে। কথা শুনে সহাস্যে বললেন,—ও, এই কথা? তজ্জন্য আপনি চিন্তিত হবেন না, ছোটকুমার সে মানুষ নয়। কাশীশঙ্কর আর যাই হোক, আমাকে কদাচ অসম্মান করে না।

দেওয়ানের মুখাকৃতির চকিতে পরিবর্ত্তন হয়। চোখে-মুখে হতাশা ফুটে ওঠে। মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। চোখের তারা যেন ঠেলে বেরিয়ে পড়তে চায়। থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন দেওয়ান।

দরবার-ঘরের দ্বারে পৌঁছে পিছনে দেখলেন রাজাবাহাদুর। দেখলেন কোথায় দেওয়ান।

কিঞ্চিৎ দূরেই ছিলেন দেওয়ান।

রাজাবাহাদুরের চোখে চোখ পড়তেই সভয়ে দ্রুত এগিয়ে গেলেন। বললেন,—কিছু হুকুম আছে রাজাবাহাদুরের?

—হাঁ। বললেন কালীশঙ্কর। সহজ সরল কণ্ঠে। বললেন,—সহোদরকে আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আপনি যেন অবিলম্বে খোঁজ লওয়ার ব্যবস্থা করেন, ছোটকুমার কোথায় গেলেন, কখন ফিরবেন। আপনি তখন জানালেন ছোটকুমারের গন্তব্য স্থান না কি গড়গোবিন্দপুর! সত্য কিনা সঠিক জ্ঞাত হোন। আমাকেও জানান।

কথার শেষে দরবার-ঘরে প্রবেশ করলেন কালীশঙ্কর।

লাল ভেলভেটের গালচেয় পা দিলেন। এক লহমায় দেখে নেন দরবার-ঘরে কোন্ কোন্ ব্যক্তির অবস্থিতি। কে কে আছে।

কেউ আনত হয়ে প্রণাম জানায় দূর থেকে। কেউ সনমস্কার অভিবাদন জানায়। কেউ আবার সেলাম জানায়, কেউ কুর্নিশ করে। মাথার টুপী খোলে কেউ; কেউ বা পাগড়ী খুলে রাখে। সম্মান প্রদর্শন করে সকলে। সসম্ভ্রমে।

দরবার-মঞ্চে উঠলেন রাজাবাহাদুর। গদিতে বসলেন।

ঘন লাল ভেলভেটের জরিদার তাকিয়ায় দেহ এলালেন। দুপাশ থেকে দুজন নির্বাক মানুষ চামর খেলানো আরম্ভ করে। বাতাস খেলায়। কতটা পথ এসেছেন রাজাবাহাদুর এই দারুণ গ্রীষ্মের দিনে। কালীশঙ্করের কপালে স্বেদবিন্দু। তদুপরি দরবার-ঘরের দেওয়ালের শীর্ষে গবাক্ষ, দ্বার মাত্র একটি। বাতাস নেই বললেই চলে।

ছোটকুমার কাশীশঙ্কর কি কারণে গড়গোবিন্দপুরে যাত্রা করলেন, তা যতক্ষণ না জানছেন ততক্ষণ স্থির হবেন না রাজাবাহাদুর। দরবারের কাজে হয়তো ভুল হয়ে যাবে।

—ঘোষাল আসে নাই?

হঠাৎ কথা ধরলেন কালীশঙ্কর। পরিপাটি করে বসলেন। হাতের আঙটি জৌলুষ তুললো।

দরবার-ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে সাদা বেলোয়ারী কাচের আধারে বাতি জ্বলছে কত অসংখ্য! মোমবাতি জ্বলছে। কালনার মোম, যে মোমের মূল্য, প্রতি মণ পঞ্চান্ন সিক্কা টাকা!

—আমি হাজির আছি, রাজাবাহাদুর।

ঘোষাল কথা বললেন। নিজের বুকে হাত রেখে নিজেকে দেখিয়ে দিলেন। বললেন,—দরকারী কাজ ক'টা আগেভাগে শেষ করেন, রাজাবাহাদুর। তারপর কথা হবে।

—ঠিক কথা। বললেন রাজাবাহাদুর।

অপেক্ষমান সেরেস্তাদারের প্রতি চোখ ফেরালেন। পেশকারকে একবার দেখলেন। পেশকার রাজাবাহাদুরকে আদাব জানালে। পেশকারের হাতে কাগজ-পত্র। কানে কলম।

দরবার-ঘরের এক পাশে নির্দিষ্ট ফরাস। ঢালোয়া সতরঞ্চিতে সারি সারি তাকিয়া। পোদ্দার আর বেনেরা সেখানে এসে বসেছে কখন সেই সূর্যোদয়ের সময় থেকে। কেউ কেউ ঢুলছে। কেউ ঘুমোচ্ছে।

দরবার-ঘরে চন্দ্রাতপ। লাল রেশমের চাঁদোয়া।

রাজাবাহাদুর ঐ চন্দ্রাতপে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। কালীশঙ্করের মস্তিষ্কে অন্য কোন চিন্তা নেই। দরবারের কাজে মন বসে না যেন।

—পেশকার, দেওয়ানজীকে সেলাম দাও। রাজাবাহাদুর কথা বললেন ঐ চন্দ্রাতপে চোখ তুলে। কথার সুরে গাম্ভীর্য ফুটিয়ে।

—বহুৎ আচ্ছা হুজুর!

পেশকার বললে সেলাম জানিয়ে। মৃদু হাসি হাসতে হাসতে। দরবার-ঘরের দরজার কাছাকাছি গিয়ে প্রহরীদের এক জনকে রাজ-আদেশ ব্যক্ত করলে চুপি চুপি। প্রহরীদের এক জন দেওয়ানের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো। ছুটলো।

রাজাবাহাদুরকে আনমনা হতে দেখেছে ঘোষাল!

দরবারে বসলে কি হবে, ঘোষাল দেখেই বুঝেছে যে রাজা যেন আজ অস্থির হয়ে আছেন। তাঁর মুখাবয়বে চিন্তার কালো ছায়া পড়েছে। তিনি একভাবে অধিকক্ষণ বসতে পর্যন্ত পারছেন না।

—রাজাবাহাদুর, বৃথা কালক্ষেপ করেন কেন? জরুরী কাজকর্ম শেষ করেন না কেন?

ঘোষাল কথা বললে কথায় কাকুতি মাখিয়ে।

আকাশ থেকে পড়লেন বুঝি কালীশঙ্কর। এতক্ষণ তিনি যেন ভুলে গিয়েছিলেন তাঁর সমুখের পৃথিবী। দরবারে বসেছেন বেমালুম ভুলে গেছেন। ঘোষালের কথায় কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হন রাজাবাহাদুর। সুস্থির হয়ে বসেন। চামরের অবিরাম হাওয়ায় খিড়কিদার পাগড়ির প্রান্তভাগ নাচানাচি করছে। পাগড়ির এক পাশে একটি রত্নময় ধুকধুকি। এক খণ্ড বৃহৎ হীরা, টুকরো চুনী আর মুক্তার বেষ্টনে আবদ্ধ। চামরের হাওয়ায় ধুকধুকির সংলগ্ন সাদা ময়ূরের পালক কাঁপছে থরো থরো। বেলোয়ারী লণ্ঠনের অসংখ্য বাতির উজ্জ্বল আলোয় জ্যোৎস্নাকাশে নক্ষত্রের মত ধুকধুকিটা জল্-জল্ করছে।

এক পাশে বেণে, ঠাকুর আর পোদ্দারের দল। অন্য পাশে ভয়ে আড়ষ্ট দেনাদারের দল। অভাবের সময় টাকা ধার নিয়েছে। মাথা যেন তাদের বিকিয়ে আছে। দেনার দায়ে ভিটে-মাটি বিকিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা। সুদ বাকী রাখলেই সমূহ বিপদ!

কয়েক মুহূর্ত চিন্তাবিষ্ট থেকে কালীশঙ্কর বললেন,—দেনাদারদের মধ্যে কে কে হাজির?

—আমরা সকলেই প্রায় আছি, রাজাবাহাদুর! তবে কেউ কেউ অনুপস্থিত আছে—দেনাদারদের মধ্য থেকে এক জন কথা বললে উঠে দাঁড়িয়ে।

রাজাবাহাদুর বললেন,—তহবিলদারকে দেখি না কেন? সে কোথায়? আসে নাই কেন এখনও?

—আমি তো আছি, রাজাবাহাদুর! হুজুরের কৃপাদৃষ্টি লাভে বঞ্চিত হয়েছি কি?

তহবিলরক্ষক সবিনয়ে কথা বলে।

দরবারের গদীতে বসেছেন রাজাবাহাদুর। কে কখন তাঁর ঠিক সমুখে গদীর পরে রেখে দিয়ে গেছে তাঁরই ঢাল-তরোয়াল। কালীশঙ্কর তরোয়ালটি নাড়াচাড়া করতে করতে বলেন —পাওনা টাকা জমা করে নেন মশায়!

দেনাদারদের মধ্যে কেমন যেন একটা মৃদু গুঞ্জন হতে থাকে। পরস্পরের কথা

বলতে থাকে। ফরাস ত্যাগ করে ওঠে কেউ কেউ। রাজাবাহাদুরের পায়ের সন্নিকটে কেউ খুলে রাখে মাথার শিরোপা। কেউ রাখে টাকাভর্ত্তি থলি। শিরোপার খাঁজে খাঁজে আছে টাকার তোড়া।

কালীশঙ্কর বললেন তহবিলদারকে,—পাওনা টাকা উঠায়ে নেন মশায়! দেনাদারদের লয়ে যান কাছারিতে। ঠিকঠাক রাখতে ভুল না হয়, নজর রাখবেন। একের ঘরে যেন অন্যের টাকা জমা না করেন।

তহবিলদার বলেন,—এ কথা আমাকে বলতে হবে না, রাজাবাহাদুর! চিত্রগুপ্তের ভুল হতে পারে, আমার ভুল হয় না। আপনি নিশ্চিন্ত হন।

—দেনাদারদের মশায়ের সঙ্গে লয়ে যান, কেমন? কালীশঙ্করের কথা অন্যমনস্কের মত। কথা বলছেন, কিন্তু কথা বলায় মন নেই আজ। এত মানী ও সম্মানী লোকের সমাগম হয়েছে দরবারে, দেখেও যেন দেখছেন না। কালী-শঙ্করের ললাটের বক্ররেখাগুলি কোন মতেই সরল হয় না। কাছেই ছিল আতরদান, মেওয়ার রেকাবী, গোলাপপাশ। যত ঢাকাই কাজের সোনার সরঞ্জাম! আতরদান থেকে ভিজে আতরের তুলো তুললেন কালীশঙ্কর। উগ্র মৃগনাভির আঘ্রাণে ক্ষণকালের জন্য দু'চক্ষু নিমীলিত করলেন। কি উগ্র সুগন্ধ! দরবার-ঘর মৃগনাভির জোরালো সুবাসে যেন টইটম্বুর হয়ে আছে। ঘরের কোণে রূপার নক্সাতোলা ধুনা জ্বালাবার পাত্র। ধুনুচিতে শালবৃক্ষের নির্যাস পুড়ছে। সর্জরস ও গুগ্‌গুল পুড়ছে। ধোঁয়ার শিখা চন্দ্রাতপ স্পর্শ করেছে।

—দেওয়ানজী কেন আসেন না এখনও?

হঠাৎ মিহিকণ্ঠে স্বগত করলেন কালীশঙ্কর। দরবার-ঘরের দ্বারপথে বারে বারে চোখ ফেরান। দেওয়ান আসে কিনা দেখেন। দেখেন, তহবিলরক্ষকের পিছু পিছু দেনাদারের পাল বেরিয়ে গেল।

ঘোষাল বললেন,—জহুরীদের সঙ্গে কাজ চুকায়ে লন রাজাবাহাদুর! একে একে কাজ মিটায়ে লন।

কালীশঙ্কর মনের বিরক্তি গোপন করে বললেন,—জহুরীদের আদেশ করেন আমার নিকট যেন আসে। দূর থেকে কি জহর চেনা যায়?

তিন জন জহুরী ফরাস ছাড়লো। উঠলো।

—রাজবাহাদুর, বিচারটা শেষ করে নন। এটা ঝামেলার কাজ নয় তেমন। একজন মাত্র আসামীর বিচারের কাজ। হুজুরের একটা হুকুম, হাঁ কিম্বা না, যা হয় একটা বলে দেন।

কারারক্ষককে দরবারে দেখে এবং তার কথা শুনে কি যেন ভাবলেন রাজা-বাহাদুর। পরিপাটি হয়ে বসতে বসতে বললেন,—আসামী কে? অপরাধ কি?

কারারক্ষক বললে,—আসামীর নাম রহমন। আপনার রাজপ্রাসাদেরই এক খানসামা। অপরাধ গুরুতর।

—আসামী হাজির হোক। বললেন কালীশঙ্কর।

উগ্র মৃগনাভির সতেজ আঘ্রাণের আস্বাদ নেন কথার শেষে।

কারারক্ষক সরবে ডাকলো,—সিপাহীলোক, রহমনকে হাজির!

দরবারকক্ষে কারারক্ষকের উচ্চ রবের প্রতিধ্বনি ভাসলো।

সঙ্গে সঙ্গে কয়েক জন সিপাই ঠেলা দিতে দিতে এনে উপস্থিত করলে রহমনকে। হস্তপদশৃঙ্খলাবদ্ধ রহমন। তকমা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। কোমর-বন্ধনী শূন্য।

কালীশঙ্কর সোজা হয়ে বসলেন। মৃগনাভির সুগন্ধি রেখে দিয়ে বললেন,—আসামীর অপরাধ?

কারারক্ষক বললে,—নাচঘর থেকে হুজুর একজোড়া সোনার ফুলদান চুরি। ফটকের সিপাইরা বামালসমেত আসামীকে গিরিফ্‌তার করে।

—চুরি! বললেন রাজাবাহাদুর। সবিস্ময়ে বললেন,—চুরি! নাচঘর থেকে সোনার ফুলদান চুরি!

—হাঁ রাজাবাহাদুর! বললে কারারক্ষক। রহমনকে একটা সজোর ধাক্কা মেরে বললে,—হাঁ হুজুর! কুত্তার বাচ্ছাটাকে কুত্তা লেলিয়ে দিই হুজুর? যা আপনি হুকুম করেন।

ছিটকে পড়ে গিয়েছিল রহমন। হস্তপদশৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় মুখ থুবড়ে পড়লো দরবার-ঘরের মেঝেয়। দু'টো সিপাই রহমনের গর্দান ধরে হিঁচড়ে তুললো।

রাজাবাহাদুর বললেন,—সাজা এক বছর কয়েদবাস।

কারারক্ষক ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললে,—শাস্তিটা হুজুর কিছুই হল না। কুত্তার বাচ্ছার রক্ত দেখবো না হুজুর ?

কথার শেষে আবার এক'ঠেলা মারলো কারারক্ষক। এবার হাত দিয়ে নয়, কোমরে পা দিয়ে সজোরে ঠেললো। আবার ছিটকে পড়লো রহমন। সাত হাত দূরে গিয়ে পড়লো। দরবার-ঘরের দেওয়ালে ঠুকলো রহমনের মাথা। সশব্দে।

রাজাবাহাদুর বললেন,—আমার বিচারই শেষ কথা।

অগত্যা কারারক্ষক সিপাইদের বললে,—নিকালো শালা শয়তানকো !

সিপাইরা দরবার-ঘরের সাজসজ্জা দেখছিল এতক্ষণ। বিমুগ্ধ হয়ে দেখছিল। কারারক্ষকের কথা শুনে চমকে ওঠে তারা। রহমনকে টেনে তোলে। টানতে টানতে দরবারের বাইরে নিয়ে যায় রহমনকে। কারারক্ষকও অগত্যা দরবার ত্যাগ করে। ফুঁসতে ফুঁসতে বিদায় নেয়। ঘর অতিক্রমের আগে নামে মাত্র সেলাম ঠোকে।

রাজাবাহাদুর কালীশঙ্কর সহসা দু'চক্ষু বিস্ফারিত করেছেন। আসামীকে দেখছেন কি এমন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে? কি, দেখছেন কি? রাজাবাহাদুর দেখছেন দেখে ইয়ার-বন্ধু ও তোষামুদেরাও চোখ বড় করলো তৎক্ষণাৎ। রাজাবাহাদুরের দৃষ্টি অনুসরণ করলো।

রাজাবাহাদুর দেখলেন আসামীর ঊর্দ্ধাঙ্গ রক্তাক্ত। ঘোর লাল রক্তের একটি ধারা নেমেছে কোথা থেকে।

খানসামা রহমনের মাথা থেকে রক্তপাত হচ্ছে অঝোরে। দেওয়ালের সঙ্গে মাথাটা ঠোকাঠুকি হয়েছে। চিড় খেয়েছে কতটা কে জানে! রক্ত ঝরছে অঝোরে। ঘোর লাল রক্ত।

জহুরী তিন জন নিজ নিজ পণ্য সারি সারি সাজিয়ে ফেলেছিল রাজাবাহাদুরের গদীতে। দরবার শব্দহীন হওয়ায় দেখলেন রাজাবাহাদুর, নীরবে দেখলেন।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন যত রত্নসম্ভার। দেখা শেষ করে তাচ্ছিল্যভরে ও সহাস্যে বললেন,—পাততাড়ি গুটাও!

মন উঠলো না রাজাবাহাদুরের। চোখে পড়লো না তেমন। জহুরীরা যা এনেছে তেমন অনেক দেখেছেন কালীশঙ্কর। এমন একটিও কিছু নেই, যা তিনি এ যাবৎ দেখলেন না। সবই মামুলী।

অগত্যা জহুরী তিন জন যার যার পণ্য গুটিয়ে তুলে একেকটি সেলাম ঠুকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল। জহুরী তিন জন বাঙ্গালী নয়। ভিন্ন প্রদেশবাসী।

দরবারের কারও মুখে কোন কথা নেই। সব চুপচাপ।

ঘোষাল নীরবতা ভঙ্গ করলেন। বললেন,—রাজাবাহাদুরকে আজ কেন এমন মনমরা দেখছি? কারণ কি?

—সকল কারণ সকলের সমক্ষে ব্যক্ত করা যায় না ঘোষাল! রাজাবাহাদুর ঘোষালের কথা শুনে হাসতে হাসতে বললেন। বললেন,—তবে ঘোষাল, তোমার অনুমান মিথ্যা নয়। আমার মন আজ ঠিক নাই। মন চঞ্চল। কথা বলতে বলতে থামলেন কালীশঙ্কর। শ্বাস ফেললেন একটি। দীর্ঘশ্বাস। আবার বললেন,—দেওয়ানজী যে কোথায় যায়! বার্দ্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে লোকটির কার্যক্ষমতাও লুপ্ত হতে বসেছে।

কথা শেষ হতেই রাজাবাহাদুর চক্ষু মুদিত করলেন।

চোখ বন্ধ করে সূক্ষ্ম গোঁফের এক প্রান্ত পাকাতে থাকেন। হাতের হীরকাঙ্গুরীয় ঝলমলিয়ে ওঠে। কণ্ঠের মুক্তামালা আভা ছড়ায়।

ঘোষাল বললে,—দেওয়ানজী পৌঁছলেন, রাজাবাহাদুর কি কিছু আদেশ করবেন?

—দেওয়ানজী!

তৎক্ষণাৎ চোখ মেললেন রাজাবাহাদুর। ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

—রাজাবাহাদুর।

কালীশঙ্কর ইসারায় ডাকলেন দেওয়ানকে। কাছাকাছি আসতে তবে

বললেন,—কি জেনেছেন? ছোটকুমার কখন প্রত্যাগমন করবেন? কেন, গড়গোবিন্দপুরেই বা তিনি স্বয়ং যান কি জন্য?

দেওয়ান রহস্যময় ও নিঃশব্দ হাসির সঙ্গে বললে,—কোম্পানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেছেন।

ভ্রূ-কুঞ্চিত করলেন কালীশঙ্কর। বললেন,—কোম্পানীর ফ্যাক্টরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেছেন? কিন্তু কি প্রয়োজনে গেলেন?

রহস্যময় হাসি দেওয়ানের মুখে। চোখে তির্যক্ দৃষ্টি। বললেন,—ছোট-কুমারের সরকারে খোঁজ লওয়ার কারণ যে কি তা কেউই স্পষ্টত বলে না। কেবল জানায়, হুজুর গেছেন গড়গোবিন্দপুরে। কোম্পানীর সঙ্গে সাক্ষাতের অভিপ্রায়ে। বেলা দ্বিপ্রহর নাগাদ ফিরতে পারেন।

মুখে কোন কথা জোগায় না। ঘোর নীরবতায় মগ্ন হয়ে পড়েন রাজাবাহাদুর। কুঞ্চিত ভ্রূ সরল হয় না।

কালীশঙ্কর নির্বাক। চন্দ্রাতপে চোখ।

গড়গোবিন্দপুরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাউস আছে। দিল্লীশ্বর মোগল বাদশাহের অনুমতি নাই বা পৌঁছালো! ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দ। জব চার্ণকের মনোনীত সুতানুটীতেই ডেরা বাঁধতে হবে—তাই ইংরেজের পক্ষ থেকে স্যর জন গোলড্-সুবোরা নগর পরিদর্শন করতে এসে একটি অট্টালিকা নগদমূল্যে কিনেছেন—আর কিনেছেন কিছু জায়গা-জমি। অট্টালিকায় অফিস বসেছে কোম্পানীর। সওদাগরী অফিস। জমিতে কাদা-মাটির প্রাচীর তোলা হয়েছে। ফ্যাক্টরী বানানো হবে সেখানে। দুর্গ না আরও কি কি যেন তৈয়ারী হবে। কেউ জানে না এখনও। কাকপক্ষীও নয়।

রাজাবাহাদুর বললেন, অত্যন্ত ধীরকণ্ঠে বললেন,—দেওয়ানজী, আপনার অনুমানই যথার্থ। খানসামাদের আদেশ দেন আসবের সরঞ্জাম দিক। দরবার স্থগিত থাক আজ। অপ্রত্যাশিতদের বিদায় করুন।

দেওয়ান কার প্রতি কি ইঙ্গিত করলেন।

সুসজ্জিত অপরাসীদের হাতে আসবপানের সাজসরঞ্জাম!

কালীশঙ্কর চাঞ্চল্যে অস্থির হয়ে পড়েছেন। হস্ত প্রসারিত করলেন বিনা বিলম্বে। চাপরাসী পানপাত্র ধরলো। স্ফটিকের পানপাত্র। ঘন লাল রঙের পানীয়। আসবের পাত্র ধরলেন রাজাবাহাদুর। রূপালী ঝিলিক তুললো স্ফটিকের পানপাত্র। পাত্রের কানায় কানায় পূর্ণ চুয়ানো মদ বা নির্জলা স্পিরিট চলকে চলকে ওঠে।

স্ফটিকের রূপালী পানপাত্র পুনরায় মুখে তুললেন কালীশঙ্কর। পান করলেন নির্জলা চুয়ানো মদ বা স্পিরিট। ইয়ার, বন্ধু ও তোষামুদের দল বসে রইলো! তীর্থের কাকের মত।

স্ফটিকের পাত্রের সরঞ্জামে নাকি ফ্রান্সের শিল্পনৈপুণ্য। কোন এক ফরাসী সওদাগরের পণ্যসম্ভার দেখে রাজাবাহাদুর ক্ষান্ত থাকতে সক্ষম না হওয়ায়, অত্যন্ত উচ্চমূল্য সত্ত্বেও ক্রয় করেছিলেন ক্রাইষ্টালের পেগ-গ্লাশ, ডিকেণ্টার। একটি পুরা সেটই পেয়েছিলেন কালীশঙ্কর; কমপক্ষে অন্ততঃ দশ জন একত্রে ও একাসনে বসে যাতে পান করতে পারেন। জলশুভ্র স্ফটিকের পাত্রের সুবিধা এই যে, পানীয়ের রঙ ও পরিমাণ দৃষ্টিগোচর হয়—চোখে দেখা যায় স্পষ্ট। রঙ দেখে নাকি চক্ষুর তৃপ্তি হয়; পরিমাণের হ্রস্ব-দীর্ঘতায় নির্ভর করে আনন্দানুভূতির বিকাশ। স্ফটিক এবং ধাতব পাত্রে তফাৎ অনেক। পাত্র যতক্ষণ পূর্ণ থাকে ততক্ষণই সুখ, পাত্র যতই শূন্য হয় ততই নিরানন্দ! রাজাবাহাদুর কালীশঙ্কর পাত্রসমূহের যা মূল্য দিয়েছিলেন, তা নাকি মূল্যই নয়। জলের দর। ফ্রান্সের কোম্পানী ডেশ্ ইণ্ডিশের জনৈক অনুমোদিত এজেণ্ট মসিঁয়ে ডি আলভায়েলার সঙ্গে রাজাবাহাদুরের দহরম-মহরম আছে। ফরাসী কোম্পানীর অজ্ঞাতে, কোম্পানীর যৎপরোনাস্তি ক্ষতিসাধন করেও ডি আলভায়েলা কত কি মহার্ঘ বস্তুই না দিয়েছে, যৎসামান্য মূল্যে! মোকাম ফ্রান্স থেকে একেক জাহাজে রাজা-বাহাদুরের জন্য আমদানী হয়েছে ডি আলভায়েলার মাধ্যমে। এসেছে পান-পাত্র, চাইমিং ক্লক্, ঘড়ি, ঘড়ির চেন, দিক্-নির্ণয়যন্ত্র ও আরও কত দুর্মূল্য ফরাসী মণিকারি—ব্যাঙ্গেল, ব্রেসলেট, ইয়ার রিং, আর্মলেট, নোজ-পিন।

—রাজাবাহাদুর!

কার কাতর আহ্বান শুনে পাত্র থেকে মুখ তুললেন কালীশঙ্কর। গতরাত্রির নেশার জের উত্তীর্ণ হতে না হতে পুনরায় পানারম্ভ করলেন! এখনও যে দুই চক্ষু ঘোর রক্তবর্ণ হয়ে আছে। কথায় জড়তার প্রকাশ!

—রাজাবাহাদুর!

কে যেন বিনম্র ও কাতরকণ্ঠে ডাকলো। কালীশঙ্কর চক্ষু বিস্ফারিত করলেন। পাত্র থেকে চোখ তুললেন।

—আমি রাজাবাহাদুর! আমি আপনার মহাফেজখানার একজন মুহুরী। নাম চন্দ্রনাথ মুন্‌শী। হুজুরের সমীপে কিঞ্চিৎ নিবেদন ছিল।

—কি বক্তব্য তাই বলেন।

কালীশঙ্কর কথা শেষ করে পাত্র মুখে তোলেন।

মুন্‌শীর মুখাগ্রে কথা, তথাপি সে নির্বাক। কি যেন বলতে চায় সে। কিন্তু সহজে বাক্যস্ফূর্তি হয় না—আমতা আমতা করে মুন্‌শী,—সাহসে কুলায় না হয়তো। তবুও অতি কষ্টে, জড়িতকণ্ঠে বললে,—রাজাবাহাদুর, অপরাধ যদি হয় মার্জনা করবেন। হুজুর, আপনি স্বয়ং যে নিয়ম-কানুন সৃষ্টি করেছেন, সেই নিয়ম রক্ষা করা হবে না?

কালীশঙ্কর এক চুমুক পানের সঙ্গে সঙ্গে মুখাকৃতি বিকৃত করলেন।

পানীয়ের আস্বাদ তিক্ত না কষায় কে জানে! রাজাবাহাদুরের মুখবিম্বে অতৃপ্তির আভাস পাওয়া যায়। তবুও কি সুখে যে পান করছেন কে বলবে!

—কে কি নিয়ম ভঙ্গ করেছে? রাজাবাহাদুর প্রশ্ন করলেন একাগ্র দৃষ্টিতে। ব্যগ্রকণ্ঠে।

মুন্‌শী সসঙ্কোচে বললে,—হুজুরের নিকট নিবেদন করি, দরবার-ঘরে পানের মজলিস নাই বা বসলো। হুজুর, আপনার দরবার-ঘরের লাগোয়া আরও বহু প্রকোষ্ঠ আছে, মজলিস-ঘর আছে, আসর আছে। দরবার-ঘরের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে অনুরোধ জানাই।

—ভাল কথা। বললেন রাজাবাহাদুর—হক্ কথা বলেছো মুন্‌শী। সিপাই

খানসামাকে কও, আমি এখনই মজলিস-ঘরে যেতে চাই। দরবার-কক্ষ ত্যাগ করতে চাই। মুন্‌শী, তুমি কিছু অন্যায় বল নাই।

রাজাবাহাদুর সম্মত হয়েছেন দেখে মুন্‌শী যেন বুকে বল সঞ্চয় করে। খুশীর মৃদু হাস্যরেখা দেখা যায় ওষ্ঠাধরে। বিগলিত হয়ে পড়ে সে যেন। সাহসে ভর দিয়ে বলে,—হুজুর, আপনার সমুখে কেউই কিছু বলে না। হুজুরের অসাক্ষাতে নিন্দা রটনা করে। কথা চালাচালি করে। হুজুরের কার্যের সমালোচনা চালায়। আমি হুজুরের নিমক খাই, হুজুরের কাজকর্মের বিরূপ আলোচনা আদপেই সহ্য করতে পারি না।

রাজাবাহাদুর স্ফটিকের শূন্য পাত্র নামিয়ে রাখতে রাখতে গদী ত্যাগ করলেন। দেওয়ানজী কাছেই দণ্ডায়মান ছিলেন। কালীশঙ্কর এক অঙ্গুলি সঙ্কেতে ডাকলেন দেওয়ানকে। কাছাকাছি পৌঁছতেই বললেন,—দেওয়ানজী, আমি মজলিস-ঘরে গিয়ে অবস্থান করবো। আপনি আমার সাঙ্গোপাঙ্গদের তথায় আসতে অনুরোধ জানান। আর ঐ চন্দ্রনাথ মুন্‌শীকে একখান মোহর বকৃশিশ দেন। সে আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। মুন্‌শীর কথার যথেষ্ট মূল্য আছে।

দেওয়ানজী সসম্ভ্রমে বললেন,—তথাস্তু হুজুর! যো হুকুম। কিন্তু রাজা-বাহাদুর, আপনাকে যে বিব্রত দেখছি! কি কারণ? আপত্তি যদি না থাকে আমি কি শুনতে পাই?

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকেন কালীশঙ্কর।

দরবার-ঘরের চন্দ্রাতপে চোখ তুললেন। কিয়ৎক্ষণ চিন্তাকুল থেকে বললেন—বড় কষ্টে আছি দেওয়ানজী। আমার সহোদর, ছোটকুমার কাশীশঙ্কর কি আমাকে ত্যাগ করতে চান? কিছুই বুঝি না। আমার পক্ষ থেকে কিছু হয়তো ত্রুটি হয়েছে। একমাত্র ঈশ্বর জানেন। দেওয়ানজী, কাশীশঙ্কর যদি আমাকে সত্যই ত্যাগ করে?

—এই সকল কথা কেন যে হুজুরের মনে উদিত হয়েছে, আমি কিছুই অনুমান করতে পারি না। দেওয়ানজীও কথা বলেন চিন্তাগ্রস্ত হয়ে। বলেন,—হুজুর কি তার কোন আভাস পেয়েছেন?

আবার কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তায় আকুল হয়ে পড়লেন কালীশঙ্কর। বললেন, তবে কাশীশঙ্কর গড়গোবিন্দপুরে কেন যায়? কোন্ প্রলোভনে? কার আকর্ষণে? কথা বলতে বলতে ক্ষণিকের জন্য কথা বলায় বিরত হয়ে পুনরায় বললেন,—দেওয়ানজী, মনে বড় কষ্ট পাই। কাশীশঙ্করের জন্য আমার আহারে সুখ নাই, নিদ্রায় সুখ নাই। সে যে কি চায় যদি স্পষ্টাস্পষ্টি বলে আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করতে পারি।

—ছোটকুমারের মাথাটির হুজুর কিছু ঠিকঠাক নাই। কখন যে কি করেন, কখন যে কাকে কি বলেন কিছুই ঠাওর করা যায় না। তাঁর নাম শুনলে ভয় হয়, তাঁকে দেখলে হৃদকম্প উপস্থিত হয়। দেওয়ানজী বলতে থাকেন,—হুজুর, শুনছি, ছোটকুমার নাকি ইংরেজ কোম্পানীর সঙ্গে ব্যবসায়-সূত্রে আবদ্ধ হতে চান। কি কি মাল সরবরাহ করবেন, তারই চুক্তি করতে গেছেন শুনতে পাই কানাঘুষায়।

বাঁকা তরোয়ালের মতই ভ্রূ দু'টি বক্র হয়ে উঠলো রাজাবাহাদুরের। আকাশ থেকে পড়লেন যেন তিনি। একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন,—ইহা কি সত্য?

—হ্যাঁ রাজাবাহাদুর! আমি যা বলছি তা মিথ্যা নয়। মিথ্যাকথনে আমার কোনই লাভ নাই। আমি যা শুনেছি আপনার নিকট তাই ব্যক্ত করেছি।

কালীশঙ্কর গমনোদ্যত হয়ে বললেন,—ঈশ্বরের যেমন ইচ্ছা তেমনই হোক। আমি মজলিসে চলেছি দেওয়ানজী! সহোদর কাশীশঙ্করের প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যেন আমাকে জ্ঞাত করা হয়।

আফসোস ও হতাশার মুখভঙ্গি করলেন দেওয়ান।

সব হারানোর দুঃখ পেয়েছেন যেন, চোখে এমনই করুণ নিরাশা। বললেন,—হুজুরের সেই এক কথা! যে আপনাকে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করতে বদ্ধপরিকর, তার জন্য কেন যে এত চিন্তা-ভাবনা! হুজুর, আপনাকে আবার স্মরণ করিয়ে দিই, আপনার ঔরসজাত পুত্র আছে। কুমারবাহাদুর অবশেষে যেন বঞ্চিত না হন!

কোথায় রাজাবাহাদুর! কোথায় কালীশঙ্কর!

তিনি বোধ করি এতক্ষণে মজলিস-ঘরে পদার্পন করেছেন। দেওয়ানের বক্তব্যে কর্ণপাতও করলেন না। ক্ষিপ্রতার সঙ্গে দরবার-কক্ষ ত্যাগ করলেন, মজলিস-ঘরের দিকে চললেন।

রাজাবাহাদুর কালীশঙ্করের গাত্রোত্থানের সঙ্গে সঙ্গে উপবিষ্ট সমবেত ইয়ার-বন্ধু ও তোষামদকারীদের মধ্যে ব্যস্ততা লক্ষ্য করা যায়। ক্ষীণ আলোড়নের সৃষ্টি হয় যেন। কেউ কেউ ফরাস ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। মজলিস-ঘরের দ্বারপথের প্রতি তাকিয়ে থাকে সতৃষ্ণ নয়নে।

দেওয়ান বললেন,—রাজাবাহাদুর মজলিস-ঘরে আছেন। সেখানেই এখন অবস্থান করবেন। মহাশয়গণের মধ্যে যদি কেউ হুজুরের সন্দর্শনে যাওয়ার অভিলাষী হন, যেতে পারেন।

হতচকিতের মত ঘোষাল বললেন,—দেওয়ানজী, আপনাদের রাজাবাহাদুরকে আজ যেন কেমন চঞ্চল দেখছি। ব্যাপারটি কি তাই বলেন তো?

ইদিক-সিদিক দেখলেন দেওয়ান।

শিরোপার অঞ্চল-প্রান্ত পাকাতে থাকেন। কণ্ঠস্বর নত করে বললেন,—রাজমাতা নাকি তাঁর একমাত্র কন্যার অদর্শনে স্নানাহার পরিত্যাগ করেছেন। ওদিকে সহোদর ভাই, আমাদের ছোটকুমার কাশীশঙ্কর, ফিরিঙ্গী কোম্পানীর সঙ্গে মোলাকাত করতে গেছেন গড়গোবিন্দপুরে। এই সকল নানা কারণে রাজাবাহাদুর যেন কিছুতেই স্থির থাকতে পারছেন না। কথা বলতে বলতে খানিক থেমে পুনরায় বললেন,—শুনতে পাচ্ছি, রাজমাতা নাকি একাদশীর উপবাস ভঙ্গ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন। রাজকুমারী বিন্ধ্যবাসিনীর জন্য তিনি নাকি মর্মাহত হয়ে আছেন। তা মহাশয়গণ, আপনারা আর কি করতে পারেন, রাজা-বাহাদুরকে যৎকিঞ্চিৎ প্রসন্ন রাখতে সচেষ্ট হোন। হুজুর তো দেখলাম আজ প্রাতঃকাল থেকেই মদিরার পাত্র হাতে তুলেছেন। আজ যে কি হবে তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন!

ঘোষাল বললেন,—আমরা না হয় আপনার হুজুরকে খুশী রাখছি, কিন্তু রাজমাতা যদি উপোস ভঙ্গ না করেন?

কয়েক মুহূর্ত্ত ভেবে-চিন্তে দেওয়ান বলেন,—আমি তো কিছুই ভাবতে পারছি না। রাজমাতা যে ধরনের তেজস্বী নারী, কি জানি কি হয়!

রাজমাতা বিলাসবাসিনী তখন তাঁর খাসমহলে।

পূজা-পর্ব শেষ করে আপন কুঠরীতে ফিরে গেছেন। গ্রীষ্মের প্রকোপ, তাই ঘরের সকল বাতায়নই রুদ্ধ। হাওয়ায় যে অগ্নির উত্তাপ বইছে! কি প্রচণ্ড সূর্যালোক! রৌদ্রেরই বা কি উগ্রতা!

রাজমাতার ঘরের দ্বার শুধু উন্মুক্ত। কক্ষমধ্যস্থ দেওয়ালে তৈলালোক জ্বলছে। বিনা অনুমতিতে সে-ঘরে প্রবেশ করে কেউ, এমন সাহস কারও নেই। এই প্রায়-রুদ্ধ ও প্রায়-অন্ধকার ঘরে একা একা কি করছেন বিলাসবাসিনী? তৈলালোক যেন নিস্তেজ, ক্ষীণপ্রভ। কক্ষমধ্যে আলো আছে কিনা ভ্রম হয়। সুবিশাল ঘর, অসংখ্য বাতায়ন যার, তেমন ঘরে সামান্য ঐ তৈলালোক কতটুকু আলোক দান করবে? কিন্তু, রাজমাতা বিলাসবাসিনী ফাঁকা ঘরে একলা বসে কি কাজে যে মগ্ন আছেন! ঘরে যেন কি এক গুঞ্জন। তবে কি কোন দেবমন্ত্র পাঠ করছেন বিলাসবাসিনী? জপ করছেন?

ঘরের বাহিরে, দ্বারের বাহিরে কে যেন অধীর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। সেদিকে দৃষ্টিই নেই রাজমাতার। এত একাগ্রচিত্তে যে কি মন্ত্র বলছেন, তা একমাত্র মন্ত্রের অধীশ্বরই হয়তো জানেন!

—মা!

কে সাড়া দেবে! শুনছে কে! বিলাসবাসিনীর কান নেই কারও ডাকে। ফুরসৎ নেই, কে ডাকলো কি না ডাকলো তাই শুনবেন! জপের মন্ত্র বলছেন, এখন কখনও কেউ ডাকে! তবুও চেষ্টার ত্রুটি হবে না। রাজবাড়ীতে এতগুলি নর-নারী, রাজমাতা কিনা শুধু মাত্র খেয়াল এবং অভিমানের বশে নিরম্বু উপবাসী থাকবেন?

দ্বারের বাহিরে দরদালানের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছিল ব্রজবালা সর্বহারার মত গভীর নিরাশা দাসীর চোখেমুখে। চোখের দৃষ্টি স্থির, শূন্যে নিবদ্ধ ভগ্নহৃদয়।

—মা! রাণীমা!

আবার কে ডাকে কুঠরীর বাহির থেকে? বিলাসবাসিনী একটিবার চোখ ফেরালেন, দ্বারপানে তাকালেন আয়ত আঁখি তুলে। তৈলালোকের স্বল্প আলোয় রাজমাতার চোখ দু'টি যেন রাত্রির দূরাকাশের নক্ষত্রবিন্দুর মত জ্বল-জ্বল করে। রাজমাতা দেখলেন, কিন্তু সাড়া দিলেন না, চোখ তুলে তাকালেন মাত্র।

ঘরের বাহিরে, দ্বারমুখে ছিলেন রাজরাণী। রাজাবাহাদুর কালীশঙ্করের প্রধানা মহিষী। রাজগৃহের জ্যেষ্ঠবধুরাণী। পুনরায় ডাকলেন উমারাণী,—রাজমাতা, ঘরে প্রবেশের অনুমতি দিন। আমার কিছু কথা আছে।

কোন্ গুরুতর কাজে মগ্ন ছিলেন বিলাসবাসিনী?

দৃষ্টি প্রসারিত করে বেশ মনঃসংযোগ সহকারে দেখলেন। অনেকক্ষণ ধরে দেখতে দেখতে বললেন,—প্রয়োজন থাকে, অন্য কোন এক সময়ে বলা যায়। এখন আমি ব্যস্ত আছি।

দ্বারমুখ থেকে কুঠরীর মধ্যে প্রবেশ করলেন রাজমহিষী।

আজ্ঞা বা আদেশের জন্য অপেক্ষা করলেন না আর, শব্দহীন পদক্ষেপে ভেতরে গেলেন। বললেন,—রাণীমা, রাজগৃহের শান্তি আর তো রক্ষা করা যায় না!

—কেন? আমি কার শান্তির বিঘ্ন হয়েছি?

বিলাসবাসিনীর বাষ্পরুদ্ধ কথা। কোথায় গেল রাজমাতার সেই তেজোদীপ্ত কণ্ঠ!

কথায় কথায় রাজমহিষী কুঠরীর মধ্যস্থলে পৌঁছে গেছেন।

দুঃখ-কাতর কথার সুর রাজরাণীর। বললেন,—এ আপনি কি করেন? বিন্ধ্যবাসিনীর শৈশবের পোষাক আর খেলার পুতুল পেড়ে ছড়িয়ে এ আপনি কি করছেন?

মন্ত্রের গুঞ্জন আর নেই। বিলাসবাসিনীর সুবৃহৎ আঁখি দু'টি অশ্রুসজল। চক্ষুপ্রান্তে জলের বিন্দু টলমল করছে। তবে কি রাজমাতা এতক্ষণ মন্ত্র না বলে ক্রন্দনে রত ছিলেন?

বিলাসবাসিনী এক মনে কি সব কথা বলছিলেন। মৃদু কান্নার সুরে কথা বলতে বলতে নিজ মনেই তোলাপাড়া করছিলেন এক রাশি পোষাক। কখন কাঠের সিন্দুকটি খুলে ফেলেছেন রাজমাতা! কত পোঁটলা-পুঁটলি ছড়িয়েছেন। দেরাজ থেকে নামিয়েছেন কতগুলি পুতুল। হস্তি-দন্ত ও কাচের পুতুল, মাটির পুতুল। বিন্ধ্যবাসিনীর শৈশবের নিত্যসঙ্গী, তার খেলাঘরের যত খেলনা-পত্র।

বিলাসবাসিনী ক্রন্দনের বেগ সামলে বললেন,—পোকা ধরেছে যে বিন্দুর পোষাকগুলোয়! বিন্দুর পুতুলের গায়ে যে ধুলো জমেছে!

রাজমহিষীর চোখের কোণেও অশ্রুর চাকচিক্য। প্রায়-রুদ্ধ কুঠরীতে লেশ-মাত্র বাতাস নেই। মাথার গুণ্ঠন মোচন করলেন উমারাণী, অসহ্য নিদাঘে। ক্লান্তকণ্ঠে বললেন,—রাজগৃহে কি আর অন্য কেউ নেই? ঐ তো ব্রজবালা আছে দালানে, তাকে আদেশ করলে সে তো—

বস্ত্রাঞ্চলে চোখ-মুখ মুছলেন বিলাসবাসিনী। বললেন,—নাঃ, অন্য কেউ করে তা আমি চাই না।

রাজমহিষী মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বললেন,—আমার অনুরোধ রক্ষা করুন। উপবাস ভঙ্গ করুন, নয় তো রাজগৃহে আর শান্তি থাকে না।

কথায় কর্ণপাত করেন না রাজমাতা। দর-দর অশ্রুপাতের সঙ্গে এটা-সেটা তোলাপাড়া করেন। খেলনার পুতুলকে বক্ষে চেপে ধরেন সযত্নে। পুতুলগুলি যেন জীবন্ত এমনই তাঁর আদর-যত্নের আন্তরিকতা। অসাবধানে হস্তচ্যুত হলে যদি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় বিন্ধ্যবাসিনীর শৈশবসঙ্গী!

রাজরাণী ধৈর্যসহকারে পুনরায় বললেন,—আপনার মেয়ে কুলীনকন্যা। ভুলে যান কেন কুলীনের ঘরেই তার বিয়ে হয়েছে? কৌলীন্যের জ্বালা থেকে কোন মেয়ের কি মুক্তি আছে? আপনি তো সকল কিছুই জানেন, আমি আর কি বলবো!

কুলীনকন্যার কৌলীন্যের জ্বালা !

শূন্যদৃষ্টিতে আঁখি তুললেন বিলাসবাসিনী। কথাগুলি যেন তাঁর বোধগম্য হয় না। পাষাণের মতই তিনি যেন স্থির ও অচঞ্চল হয়ে গেলেন। কি এমন কথা বললেন রাজমহিষী ! কি শোনালেন ! বিলাসবাসিনীর মুখাকৃতিতে আতঙ্কের আভাস এবং দৃষ্টিতে বুঝি বা ভয়ার্ত্তভাবের লক্ষণ প্রকাশ পায়। অশ্রুপতনও বোধ করি রোধ হয়ে যায়। মন্ত্রমুগ্ধের মত একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন।

কুলীনকন্যার কৌলীন্যের দুঃসহ জ্বালা কি তবে অনুভব করেছেন রাজমাতা বিলাসবাসিনী ? ভূমিপাল বল্লালসেনের কুলবিধি, না, দেবীবরের কৃত মেলী-কুলীন-কন্যার জন্য সেই নিদারুণ ব্যবস্থার সঙ্গে রাজমাতার পরিচয় আছে ? কি নির্দয় আর নিষ্ঠুর কুলাচার্য দেবীবর ! কি কঠিন সেই দেবীবরের ব্যবস্থা !

মেল-প্রচলনের অব্যবহিত পরে সর্বদ্বারী বিবাহ রহিত হওয়ায় ক্রমে বঙ্গ-দেশে ঘোর পাত্রাভাব হয়। প্রকৃতি এবং পালটীর সংখ্যা সীমাবদ্ধ থাকায় ক্রমে ক্রমে ঘর পাওয়াও দায় হয়। একেই বাঙলা দেশে কি কারণে কে জানে, চিরদিন পুত্রাপেক্ষা কন্যাসন্তানই সাধারণতঃ অধিক জন্মে। এই ক্ষতস্থানে আবার লবণের ছিটা দিলেন অদূরদর্শী দেবীবর। নিয়ম রচনা করলেন তিনি ; বঙ্গের ব্রাহ্মণ-কন্যাদের সর্বনাশ করলেন কঠোর নিয়মের প্রবর্ত্তনে।

স্বেচ্ছাচারী দেবীবর নিয়ম করলেন, মেলী-কুলীন-কন্যাগণ অর্পিত হবে এক-মাত্র করণীয় কুলীন-পাত্রে। যদি তাদের আজীবন বিবাহ না-ও হয় তথাপি শ্রোত্রিয় বা বংশজের সঙ্গে বিবাহ হবে না। সর্বনাশা দেবীবর আবার মনুর দোহাই পাড়লেন। মনু নাকি লিপিবদ্ধ করেছেন,

"কামমরণাৎ তিষ্ঠেদ্‌গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেৎ তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ ॥" (৯।৯৮)

রাজমাতা বিলাসবাসিনী যেন শিউরে শিউরে ওঠেন।

শূন্যদৃষ্টিতে আঁখি মেলে থাকতে থাকতে চক্ষুর্দ্বয় বন্ধ করলেন। শ্রোত্রিয় অথবা বংশজের ঘরে যদি কন্যাদান করতেন, তা হলে বিন্ধ্যবাসিনীর স্বামী জমিদার

কৃষ্ণরামের এত দাপট সহ্য করতে হতো না। কৃষ্ণরামের এত দাবীদাওয়াই বা কে পালন করতো! আহা, এর চেয়ে বিন্ধ্যবাসিনী যদি 'ঠেকা-মেয়ে' হয়েও থাকতো! রাজমাতার মনে কত কথাই উদিত হয়। জমিদার কৃষ্ণরামের মৃত্যু হলেও বিন্দুর জীবনটা রক্ষা পায় এখন। কিন্তু দুরাচারীর কি মরণ আছে!

—বৌরাণী, তুমি আর বলো না আমাকে। কথা বলতে বলতে চোখ মেললেন রাজমাতা। বললেন,—আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা সব গেছে। কৌলীন্যের মুখে ছাই পড়ুক!

যেন ক্রন্দনের স্বরেই সহসা কথা বললেন বিলাসবাসিনী।

সত্যই তাঁর মুখাবয়বে বিতৃষ্ণা ও বিরক্তির বিকাশ লক্ষ্য করা গেল। বুকের পুতুল নামিয়ে রাখলেন ভূমিতে।

রাজমহিষী বললেন,—কুলীনকন্যার কপালের দুঃখ কে ঘোচাবে? আপনিই বা অধৈর্য হন কেন? আমি আজ রাজাবাহাদুরের কাছে তো বিষয়টি উত্থাপন করেছি।

এক পাষাণমূর্ত্তি যেন চেতনাময় হয় ক্ষণিকের মধ্যে। মৃতদেহে যেন জ্ঞানসঞ্চার হয়! বিলাসবাসিনী ব্যস্ত হয়ে বললেন,—কালীশঙ্কর কি বলে? সে কি তবে কেষ্টরামের প্রস্তাবে সম্মত হয়েছে?

ঈষৎ লজ্জানত হন বধূরাণী। মিহি কণ্ঠে রাজমহিষী বলেন,—তিনি ছোট-কুমারের পরামর্শ মতই কাজ করতে চান, এই কথা আমাকে জানালেন।

বিলাসবাসিনীর মুখে ক্ষীণ হাস্যরেখা ফুটলো। ক্ষণপ্রকাশ খুশীর হাসি। বললেন,—ঈশ্বরের ইচ্ছায় ছোটকুমার যদি এখন রাজী হয় তবেই। কাশীশঙ্কর কি সহজে সম্মত হতে চাইবে, সে যে ধরণের মানুষ! বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমি কাশীশঙ্কর দেবে? মনে হয় না। কথার শেষে একটি তপ্ত শ্বাস ফেললেন। বললেন,—তবুও বৌরাণী, তুমি একটা সুখের কথা শোনালে।

রাজমহিষী উমারাণীর মুক্তার মত দন্তশোভা। তরমুজলাল অধরোষ্ঠ। প্রসন্ন হাসি হাসলেন তিনি। বললেন,—তবে আর চিন্তার কি কারণ? আপনি উপবাস

ভঙ্গ করুন। আমি ব্রাহ্মণীদের আদেশ করি, আপনার জলাসনের ব্যবস্থা করুক।

রাজমাতা বলেন,—বেশ তাই হোক। দুই ভাই যদি একমত হয় আর আমার চিন্তার কি আছে? কিন্তু বৌরাণী, সাতগাঁ থেকে জগমোহন লেঠেল এখনও কেন ফেরে না বলতো?

বিলাসবাসিনীর মৌখিক সম্মতি লাভ করছেন রাজমহিষী।

একাদশীর নির্জলা উপোস ভাঙতে সায় দিয়েছেন রাজমাতা, তাই উমারাণীর হাসির মাত্রা ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হতে থাকে। মুক্তার মত দাঁতের শোভা প্রস্ফুটিত হয় লাল ঠোঁটের ফাঁকে। উমারাণী উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন,—কতটা পথ যাবে, কতটা পথ আসবে, যাওয়া-আসায় কত সময় নেবে, তার ঠিক কি! খোঁজ-খবর পেতেও বিলম্ব হতে পারে। আপনি এত শীঘ্র অধৈর্য হন কেন? আমি যাই, পাচক-ব্রাহ্মণীদের বলে পাঠাই।

আকাশের পরী যেন ডানা মেলে উড়ে গেল!

শাড়ীর আঁচল উড়িয়ে বিদ্যুৎবেগে চলে গেলেন রাজমহিষী। গায়ের অলঙ্কারের ঝনঝন ধ্বনি কোথায় মিলিয়ে যায় নিমেষের মধ্যে। উমারাণীর দ্রুত পদক্ষেপের শব্দ আর শোনা যায় না। এক অসাধ্য সাধন করেছেন রাজরাণী, সেই আনন্দেই আত্মহারা হয়ে গেছেন।

শূন্য ঘরে বিলাসবাসিনী মাত্র একা।

ঊর্দ্ধমুখী হয়ে রাজমাতা বললেন,—পতিতপাবনি, মুখ তুলে চাও মা! দুই ভাই যেন একমত হয়। আমার বিন্দুর জীবনটা যেন রক্ষা হয়। সাতগাঁ থেকে জগমোহন লেঠেল যেন ভালয় ভালয় ফিরে আসে।

একটি জটাজুটধারী বটবৃক্ষের ছায়ায় বসেছিল পথক্লান্ত জগমোহন।

বংশবাটী থেকে সপ্তগ্রামের বাসুদেবপুরে পৌঁছতে সে দস্তুরমত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সর্প ও শ্বাপদসঙ্কুল জঙ্গলাকীর্ণ পথে দস্যু, তস্কর ও ডাকাতের ভয় ছিল পদে পদে। নেহাৎ একটি বৃহৎ বাঁশ ছিল জগমোহনের হাতে, তাই রক্ষা পেয়েছে।

সেই বংশদণ্ডেই শরীরের ভর চাপিয়ে লম্ফ দিতে দিতে পথ চলেছিল ভীষণ দ্রুতবেগে। বাঁশের এক প্রান্ত ছিল মৃত্তিকায়, অন্য প্রান্ত জগমোহনের হস্তে। এই বংশদণ্ড বিস্তার করতে করতে তড়িৎবেগে ছুটেছিল। রাজমাতা স্বয়ং আদেশ করেছিলেন, তাই জগমোহন বুঝি মরিয়া হয়েই পথ অতিক্রম করেছে। কালঘাম ছুটে গেছে তার।

জগমোহন বুঝেছিল, অধিকক্ষণ বটবৃক্ষের ছায়ায় অবস্থান করলে যদি কারও সন্দিগ্ধ দৃষ্টি পড়ে তার প্রতি! জমিদার কৃষ্ণরামের বসতবাটী অদূরেই। জমিদার-গৃহের লোকজন সদাক্ষণই গমনাগমন করবে। যদি কারও দৃষ্টি পড়ে! যদি কেউ দেখে! আর কেউ যদি দেখতে পেয়ে কোন প্রশ্ন করে, তখন?

দূরে জমিদার কৃষ্ণরামের লাল ইমারতের চতুর্দিকে সু-উচ্চ প্রাচীর। বাহির থেকে কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। কেবল মাত্র দেখা যায়, গৃহ-শীর্ষে গৈরিক বর্ণের একটি ত্রিকোণ পতাকা উড়ছে। আর দেখা যায়, চতুষ্কোণ গৃহের চতুঃশীর্ষে সোনার কলস চারটি।

আর অধিকক্ষণ থাকলে যদি কারও সন্দিগ্ধ দৃষ্টি পড়ে, সেই ভয়ে জগমোহন ক্ষণেক ভীত হয়। অতঃপর ভাল-মন্দ চিন্তাশেষে ধীরে ধীরে ও অতি সন্তর্পণে ঐ জটাজুটধারী বটবৃক্ষের উচ্চতম শাখায় আরোহণের জন্য সচেষ্ট হয়। যদি দৃষ্টিপথে পড়ে জমিদারগৃহের অভ্যন্তর! এক শাখা থেকে অন্যশাখায় পদার্পণ করে। পত্রবহুল গাছের শাখায় ও শাখার কোটরে ছিল কত অসংখ্য রাত্রিচর পশু-পক্ষী! তক্ষক, পেচক ও বাদুড়ের পাল শাখায় শাখায় বসে ছিল অনাগত রাত্রির প্রতীক্ষায়।

প্রায় বৃক্ষচূড়ায় যখন পৌঁছেছে তখন চোখে পড়লো কৃষ্ণরামের গৃহাভ্যন্তর। কিন্তু কোথায় কে! কোথায় জমিদার কৃষ্ণরাম, কোথায় রাজকুমারী বিন্ধ্যবাসিনী! জমিদার-বাড়ীর কর্ম্মচারী, পাইক, সিপাই ও ভৃত্যেরা ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করছে। কৃষ্ণরামের গৃহের আঙিনার এক প্রান্তে সারি সারি অশ্ব। কয়েকটি হস্তী। কয়েক জন নিম্নপদস্থ ঐ পশুদের পরিচর্যায় রত।

উদ্দেশ্য সাধন্ হয় না।

যাদের দেখার অছিলায় জগমোহন এত কষ্ট করলো, কোথায় তারা ! কোথায় জমিদার কৃষ্ণরাম, কোথায় তস্য পত্নী রাজকুমারী বিন্ধ্যবাসিনী ! অনন্যোপায় হয়ে ধীরে ধীরে নিঃশব্দে জগমোহন বৃক্ষশীর্ষ থেকে নীচে নামতে থাকে। কয়েকটি লাল পিপীলিকা অজ্ঞাতে কখন দংশন করেছে—শরীরের যত্র-তত্র জ্বালা ধরেছে। খেয়ালই নেই জগমোহনের। নীচে নামে আর ইতি-উতি দেখতে থাকে সে। যতদূর দেখা যায় শুধু গাছ আর গাছ। একটি মানুষও চোখে পড়ে না। দূরে, বহুদূরে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে বেশ কয়েকটি গৃহস্থের বাস্তু। জনমানবহীন ও পরিত্যক্ত গৃহসমূহ প্রাচীন ভগ্নাবশেষ ব্যতীত আর কিছুই নয়। মড়ক, মহামারী ও দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে হয়তো গৃহবাসিগণ নিশ্চিহ্ন ! মারীজ্বরের প্রাদুর্ভাবে সপ্তগ্রাম যেন খাঁ-খাঁ করছে। মনুষ্যালয়ে শৃগাল ও কুকুরের বাসস্থান হয়েছে। বিস্তীর্ণ প্রান্তরের স্থানে স্থানে মনুষ্যকঙ্কাল ও নরকপালের স্তূপ ! জগমোহন লাঠিয়াল হলে কি হয়, সে-ও কিঞ্চিৎ সন্ত্রস্ত হয় সহসা স্তূপীকৃত নরকপাল দেখে। মড়ক, মহামারী বা দুর্ভিক্ষের দান হয়তো ! রোগ এবং খাদ্যাভাবের শোচনীয় পরিণাম বঙ্গদেশবাসীর।

বৃক্ষশীর্ষ থেকে বেশ কিঞ্চিৎ নীচে নামতেই জগমোহন অনড় অটল হয়ে গেল। জগমোহন দেখলো, জমিদার কৃষ্ণরামের গৃহের ফটক থেকে কারা যেন নিক্রান্ত হয়। একদল মানুষ। একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করে জগমোহন। ফটকের মুখ থেকে মানুষগুলি যে এই পথেই আসে ! মানুষগুলিকে দেখে মনে হয়, নিতান্তই সাধারণ মানুষ। গ্রামবাসী।

আর কালবিলম্ব করে না জগমোহন। তরতরিয়ে নীচে নামতে থাকে। ক্ষিপ্রগতিতে। রুদ্ধশ্বাসে !

বৃহৎ মহীরুহ। জটাজুটধারী বৃদ্ধ বটবৃক্ষ। বহুদূরবিস্তৃত শাখা-প্রশাখা। জগমোহনের এত দ্রুত অবতরণেও বৃক্ষটির কোন অঙ্গসঞ্চালন নেই।

ঐ মানুষের দল নিকটতম হলে জগমোহন ব্যগ্র দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে। মানুষগুলির বেশভূষা একান্তই নগণ্য। ধূলিমলিন গ্রাম্য আকৃতি। অনুমান, দলে সাত-আট জন আছে। কিন্তু মানুষগুলিকে দেখে মনে হয়, যেন বিক্ষুব্ধ। পরস্পরে বাক্‌বিতণ্ডা করছে। প্রতিহিংসার দৃষ্টিতে দেখছে, পেছনে ফেলে-আসা কৃষ্ণরামের

আবাসগৃহ।

এমন সুবর্ণ সুযোগ হেলায় কে নষ্ট করে! বৃক্ষমূলে ঠেকানো বংশদণ্ড হাতে নেয় জগমোহন। ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। বলে,—মশায়গণ, শুনছেন?

—কে?

এক সঙ্গে কয়েক জন মানুষ উত্তর দেয়। ফিরে দাঁড়ায়।

মানুষগুলির ভাবভঙ্গী দেখে এবং বাক্যবিনিময়ের ভাষা শুনে জগমোহন আন্দাজে বুঝেছিল, তারা যেন কেমন ক্ষুব্ধ হয়ে আছে। প্রতিবাদের কণ্ঠে পরস্পরে যেন কথা বলছে।

—আমি একজন পথিক। বললো জগমোহন।

—কোন্ পথে যেতে চাও? পথের কোন গোল হয়েছে কি?

—না মশায়গণ, সে সকল কিছুই নয়। বললো জগমোহন, বিনম্র সুরে।

—তবে কি চাও?

ফিরতি প্রশ্ন আসে। দলের এক জন মাতব্বর মত লোক কথা বলে। অন্যান্যরা কৌতূহলী চোখে চেয়ে থাকে। নিষ্পলক দৃষ্টিতে।

জগমোহন বললে,—মশায়গণ, আমি বহু দূর থেকে আসছি। সেই সুতানুটী থেকে। এই প্রাচীর-ঘেরা ইমারত কি জমিদার কৃষ্ণরামের?

—হাঁ।

এক সঙ্গে অনেকেই উত্তর দেন।

জগমোহন মনুষ্য-দলটির নিকটে এগোয়। ইদিক-সিদিক লক্ষ্য করতে করতে নিম্নকণ্ঠে বলে,—আমি আসছি কৃষ্ণরামের শ্বশুরকুল থেকে। আমি তাঁদেরই এক-জন ভূমিদানের প্রজা। আমাদের রাজকুমারীর খোঁজ লওনের নিমিত্তে এসেছি। মশায়গণ, আপনারাই বা কে?

মানুষগুলি পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চোখ ফেরায়। জগমোহনের পরিচয় জেনে মাতব্বর মত লোকটি বললে,—তোমাদের রাজকুমারী তো এখানে নাই!

—তবে কোথায়? সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো জগমোহন, ব্যাকুল কণ্ঠে।

লোকটি ক্ষীণ হাসলো। সকাতর হাসি। বললে,—তোমাদের রাজকুমারীকে তো নেয় না কৃষ্ণরাম জমিদার! তেনা তো গড়-মান্দারণে আছেন। জমিদার কৃষ্ণরামের জমিদারীর চৌহদ্দীতে কোন এক ভাঙা পোড়োবাড়ীতে রেখেছে তেনাকে। শুনতে পাই তোমাদের রাজকুমারীকে তো এক রকম ত্যাগই করেছে। শালার জমিদার!

মুখাগ্রে যেন কথা আসে না জগমোহনের। লোকটি মিথ্যা বলছে না তো! শোনা মাত্র কেমন যেন অন্য মানুষে পরিণত হয়ে গেল জগমোহন। কপালের ঘাম মুছলো দুই হাতের তালুতে। কি দুর্বিষহ সূর্যোত্তাপ! হাওয়ার লেশ মাত্র নেই।

—মশায়গণ, আপনাদের পরিচয় কি? শুষ্ক কণ্ঠে বললে জগমোহন। হতাশ স্বরে।

ইতিমধ্যে দলস্থ একজন অকস্মাৎ গগনবিদারক শব্দে চীৎকার করে,—আমার সর্বনাশ হয়ে গ্যাছে! আমার জাত-কুল-মান আর নেই।

জগমোহন রীতিমত বলশালী। তবুও চমকায় হঠাৎ এই অপ্রত্যাশিত ও সুতীব্র কণ্ঠস্বর শুনে।

মাতব্বর গোছের লোকটিই কথা বলে। মিনতি সহকারে বলে,—দত্তমশাই, আপনি উতলা হন কেন? লোকলজ্জার ভয় নাই আপনার, আকাশ ফাটিয়ে চেঁচাবেন? শেষে মেয়েটার বে দেওয়া যে দায় হবে! কথা বলতে বলতে জগমোহনের প্রতি দৃষ্টিপাত করে। বলে,—আমাদের পরিচয়? আমরা পাশের গ্রামের বাসিন্দা। ঐ দত্তমশাইয়ের একমাত্র বিধবা মেয়েকে গত রাত্রে ঘর থেকে পাইক পাঠিয়ে ধরে এনে জমিদার কৃষ্ণরাম আটকে রেখেছে। খবরটি কৃষ্ণরামের শ্বশুরকুলকে জানিও। কি লজ্জার কথা! তিন দিন অতীত না হলে খালাস দেবে না।

হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থাকে জগমোহন।

শুনে কানে আঙুল দিতে ইচ্ছা হয়। বলে,—হাঁ, শুনেছি মানুষটি না কি নীচ! তবে তো মশায়দের ঘোর বিপদ?

পৃথিবী কত বিশাল!

সমগ্র দুনিয়ায় এত দেশ ছিল, আর কোথাও ঠাঁই মেলেনি! রাজকুমারী বিন্ধ্যবাসিনী আছেন গড়-মান্দারণে? কৃষ্ণরামের জমিদারীর চৌহদ্দীতে,—এক পরিত্যক্ত ভগ্নগৃহে নির্বাসন-বাস করছেন রাজকুমারী? কৃষ্ণরাম কি নির্দয় ও হৃদয়হীন! গড়-মান্দারণ, সে যে অনেক দূরের পথ। জগমোহন লাঠিয়ালের সকল আকাঙ্ক্ষা চকিতে ধূলিসাৎ হয়ে যায়। নৌকা এবং পদব্রজে এতটা পথ জগমোহন বৃথাই অতিক্রম করলো! পণ্ডশ্রম করলো! সপ্তগ্রামে যদিও বা অতি কষ্টে পৌঁছালো, রাজকুমারীর দর্শন পাওয়া গেল না! রাজকুমারীর শুভাশুভ কিছুই জানা গেল না! জগমোহন বুঝি চোখে অন্ধকার দেখে হতাশার আবেগে। এখন কি কর্ত্তব্য? সুতানুটীতে প্রত্যাবর্ত্তন ব্যতীত আর কি কর্ত্তব্য?

বিক্ষুব্ধ মানুষগুলি কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যায়। পথের বাঁকে তাল, খেজুরের সারি। কুলগাছের বন। মানুষগুলি দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলেও তাদের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। জগমোহন অবিচলিতের মত দাঁড়িয়ে থাকে। রাজমাতাকে সে মুখ দেখাবে কোন্ লজ্জায়? পরম অস্বস্তির শ্বাস ফেললো জগমোহন। ইদিক-সিদিক দেখলো আশাহত দৃষ্টিতে। কেউ কোথাও নেই, কেবলমাত্র উচ্চ-নীচ সবুজ বৃক্ষরাজি—যেন স্বেচ্ছায়, যার যেথা খুশি মাথা তুলেছে—বহু বিচিত্র বৃক্ষপত্রসমূহ ধূলায় ধূলায় ম্লান হয়ে আছে। আসল রঙ সহজে দেখা যায় না। বর্ষার জল বিনা এ মলিনতা হয়তো মোচন হবে না।

যন্ত্রচালিতের মতই অগ্রসর হতে থাকে জগমোহন।

অত্যন্ত ধীর পদক্ষেপে এগোয়। বংশবাটীর গঙ্গার তীর যেদিকে, সেদিকের পথ ধরে ধীরে ধীরে এগোতে থাকে। এবার আকাশে চোখ তোলে জগমোহন। বেলা এখন কত, তাই দেখে হয়তো। শুভ্র সমুজ্জ্বল আকাশে কি তীব্র সূর্য্যালোক!

বিলাসবাসিনীকে মুখ দেখাবে কি সাহসে? পথে যেতে যেতে জগমোহন পিছন দিকে দেখে। জমিদার কৃষ্ণরামের বসতবাটী পিছনে। লাল ইমারত—উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত যেন এক দুর্গপুরী!

সপ্তগ্রাম থেকে গড় মান্দারণ প্রায় পঁচিশ ক্রোশের পথ। আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত, আমোদর নদের তীরদেশে গড়-মান্দারণ অবস্থিত। বিন্ধ্যবাসিনী আছেন সেখানেই—এই দুঃসংবাদ জ্ঞাত হলে রাজমাতা যেমন আদেশ করেন তেমনই করা যাবে। আপাততঃ অন্য কোন উপায় খুঁজে মেলে না।

হাতের বংশদণ্ড বিস্তার করলো জগমোহন।

এক প্রান্ত তার হাতে, অন্য প্রান্ত মৃত্তিকায়। লাফ দিতে দিতে চললো লাঠিয়াল। জঙ্গলাকীর্ণ পথে দস্যু ও তস্করের ভয়—শ্বাপদের ভয়। গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হল। বিদ্যুৎবেগে একেক লম্ফ দেয় জগমোহন। ক্ষণিকের মধ্যে কতকটা পথ অতিক্রান্ত হয়। আর এক মুহূর্ত্ত বৃথা কালক্ষেপ নয়। রাজমাতা যে অধীর প্রতীক্ষায় দিন গুণছেন সুতানুটীতে! দুর্বার-গতিতে চললো জগমোহন। সশব্দ পদক্ষেপে।

গাছে গাছে পাখীর বাসায় পক্ষিশাবক সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে লাঠিয়ালের পদশব্দে। বন্য-বরাহ এবং শৃগালের পাল ছুট দেয়, গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করে ভয়ে ভয়ে।

মায়ের মন! রাজমাতা বিলাসবাসিনী ক্ষণেকের জন্যও স্থির হন না। অধিকক্ষণ কোন কিছুতে মন বসে না। একাদশীর উপবাস ভঙ্গ করতে বসেও থেকে থেকে অস্থিরচিত্ত হন। ক্ষুধা-তৃষ্ণা বিলুপ্ত হয়েছে। নিয়ম রক্ষা করতে হয়, তাই বুঝি আহারে বসেছিলেন। রাজমাতার দুই চক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে আছে। অবিরাম কান্নার প্রতিফল ফুটেছে চোখে।

তল্লাটে এখন যেন কোন শূদ্রজাতি না আসে। দ্বারে দ্বারে পাহারা বসেছে।

রন্ধনশালার সংলগ্ন একটি কক্ষে রাজমাতা আহারে বসেছেন। দুগ্ধ, ফল আর মিষ্টান্নের ভিন্ন ভিন্ন পাত্র তাঁর সমুখে। রাজগৃহের অন্দরমহলে এখন সাড়াশব্দ নেই—শান্ত ও গম্ভীর আবহাওয়া। পাকশালায় নিযুক্ত ব্রাহ্মণকন্যা-গণের মধ্যে ব্যস্ততা লক্ষ্য করা যায়। পালিত আত্মীয়াদের কেউ কেউ

বিলাসবাসিনীর পরিচর্যায় রত। কেউ হাত-পাখা দোলায়। কেউ ছিলিমচি এগিয়ে দেয়। কেউ পানীয় গঙ্গাজল পরিবেশন করে।

—মেজরাণী, তোমার ছোট বোনকে দেখি না কেন? ছোটরাণী কোথায়?

কথায় কথায় প্রশ্ন করলেন রাজমাতা বিলাসবাসিনী। কাকে যেন খুঁজলেন দৃষ্টিচালনায়। দেখতে না পেয়ে আহারের পাত্রে চোখ ফেরালেন।

রাজমাতার আসনের অদূরে পৃথক এক আসনে যিনি নীরবে বসেছিলেন এবং সকল কিছু পর্যবেক্ষণ করছিলেন, তাঁর মুখে এতক্ষণে বাক্যস্ফূর্তি হয়। তিনি অন্য আর কেউ নন, রাজাবাহাদুর কালীশঙ্করের দ্বিতীয়া পত্নী সর্বমঙ্গলা দেবী। তিনি সলাজকণ্ঠে বললেন—ছোটরাণী সর্বজয়ার ধর্মে-কর্মে বড় বেশী আগ্রহ। ঘরে সে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি স্থাপনা করেছে। এখনও রাধাকৃষ্ণের পূজাতেই হয়তো ব্যস্ত আছে।

সর্বমঙ্গলা ও সর্বজয়া। মেজরাণী ও ছোটরাণী। রাজাবাহাদুর কালীশঙ্করের আরও দুই সহধর্মিণী। ধর্মপত্নী। একই গৃহের দুই সহোদরা কুলীনকন্যা।

রাজমাতা আনন্দাতিশয্যে মৃদু হাসলেন। পরিতৃপ্তির হাসি। বললেন,—বেশ ভাল কথা। ঈশ্বর সর্বজয়াকে সুখী করুন। কথা বলতে বলতে কিয়ৎক্ষণ বিরত থেকে বললেন,—জান মেজরাণী, আমরা ঘোর শাক্ত। আমাদের নাটমন্দিরে এ জন্য শক্তির প্রতিষ্ঠা। মা পতিতপাবনী আছেন নাটমন্দিরে। পূজা-পার্বণে মায়ের মন্দিরে তাই মোষবলি হয়।

মেজরাণী সর্বমঙ্গলার মুখে কোন কথা নেই। স্বভাবতই তিনি স্বল্পভাষী।

তিনি কোন কথা বলেন না। শ্বশ্রুমাতার কথা শোনেন। আর মেঘনীল রঙের ঢাকাই শাড়ীর অঞ্চল-প্রান্ত আঙুলে জড়াতে থাকেন। মেজরাণীর কাজল-কালো চোখে গভীর দৃষ্টি। রাশি রাশি কুঞ্চিত এলোকেশে যেন আকাশের বিস্তার। শুভ্র দেহবর্ণে স্বর্ণ-আভা। দেহের কুত্রাপি অলঙ্কারের প্রাচুর্য নেই। হাতের মণিবন্ধে শুধু মাত্র জড়োয়া কঙ্কণ। লোহা এবং শাঁখা। কণ্ঠের এক সারি মুক্তাহার বক্ষমধ্য স্পর্শ করেছে। সর্বমঙ্গলার অধরোষ্ঠ তাম্বুলরাগে রঞ্জিত। গান এবং তাম্বুলের প্রতি তাঁর নাকি সবিশেষ আসক্তি। মেজরাণী পানচর্বণে

ক্ষণেক বিরত হয়ে বললেন,—ননদিনী বিন্ধ্যবাসিনীর জন্য কি কোন পাক ব্যবস্থা হল ?

নিশ্চিন্তার পরিতৃপ্ত হাসির উদ্রেক হয় বিলাসবাসিনীর মুখে। তিনি বললেন,—বড়রাণী আজ বলেছে কালীশঙ্করকে। রাজা নাকি আজই পরামর্শ করবে আমার কাশীর সঙ্গে। দেখা যাক্ কি হয়। জগমোহন লেঠেলটা এলেই তো বুঝি ? সে-ও তো ফেরে না !

চুপচাপ থাকেন সর্বমঙ্গলা।

মুখের মধ্যে পান, চর্বিতচর্বণ থামে না। ঈষৎ চঞ্চল ওষ্ঠাধর। ঢাকাই শাড়ীর আঁচল আঙুলে জড়াতে থাকেন আনতদৃষ্টিতে।

রাজমাতা ফলের হাত ধৌত করেন। ছিলিমচিতে জল দেয় এক ব্রাহ্মণকন্যা। বিলাসবাসিনী বললেন,—মা পতিতপাবনীর দয়ায় এখন দুই ভাই একমত হয় তবেই না !

মুখে কথা নেই মেজরাণীর। হাঁ, না কিছুই বলেন না।

চর্বিতচর্বণও বন্ধ হয় না। মুখের চঞ্চলতায় নাকচাবির হীরা চিক-চিক করে। হাত-পাখার ঘন ঘন হাওয়ায় মেজরাণীর মেঘনীল ঢাকাই শাড়ীর প্রান্ত উড়তে থাকে। এলোকেশের গুচ্ছ দুলতে থাকে। যদিও সর্বমঙ্গলা নীরব।

বিলাসবাসিনী মিষ্টান্নের পাত্র টেনে নিলেন। বললেন, নিজ মনেই বললেন, দুই ভাই তো এক জাতের নয় ! সেই তো আমার দুঃখু।

এক কান দিয়ে কথা প্রবেশ করে, অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যায়। মেজরাণী শোনেন কি শোনেন না। তাঁর মুখের চাঞ্চল্যে নাকচাবির হীরা চিক-চিক করে। এখনও কতক্ষণ এই এক ভাবে বসে থাকতে হবে কে জানে ? যতক্ষণ না রাজমাতার আহার শেষ হয়। কতক্ষণ ধরে কত খুটিয়ে খুটিয়েই না খান বিলাসবাসিনী !

—দুই ভাই তো এক জাতের নয় !

রাজমাতার এই ক'টি কথা কিন্তু কানে দিয়েছেন সেজরাণী। তিনিও মনে মনে চিন্তিত হয়েছেন দুই ভাইয়ের প্রকৃতির বিভিন্নতার কথা শুনে।

দুই ভাই, দুই প্রকৃতির।

কালীশঙ্কর ও কাশীশঙ্কর যেন দুই পৃথিবীর মানুষ। আকৃতির সামঞ্জস্য ব্যতীত আর কোন সমতা নেই।

তা না হলে রাজাবাহাদুর কাশীশঙ্কর, দরবারের লাগোয়া মজলিস-ঘরে এই দিন দুপুরেই পার্ষদসহ পানক্রিয়ায় আত্মমগ্ন আর ছোটকুমার কাশীশঙ্কর কি না অশ্বপৃষ্ঠে গড়-গোবিন্দপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন! বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে ব্যবসায়-সূত্রে আবদ্ধ হতে গেছেন!

সুতানুটী থেকে গড়-গোবিন্দপুর।

আঁকাবাঁকা বন্ধুর ও দুর্গম পথ। গড়খাত ও পরিখা যেখানে সেখানে। উঁচু-নীচু, কর্দমাক্ত, পিচ্ছিল কালীঘাটের পথ ধরে সদলবলে অশ্ব ছুটিয়েছিলেন কাশীশঙ্কর। অশ্বের দুরন্ত বেগে উষ্ণীষধারী ছোটকুমারের দেহের সম্মুখভাগ ঝুঁকে পড়েছিল।

গড় গোবিন্দপুরের গঙ্গাতীরে তখন সে কি উত্তেজনা! ঘাটের খালাসীদের চীৎকার। মাঝি-মাল্লাদের হামলা।

ইংরাজ কোম্পানীর হাউসের কাছাকাছি কাদামাটির প্রাচীর উঠছে। আত্মরক্ষা না নিরাপত্তার মাড্-ওয়াল্ উঠছে? বর্ষার আগেই কাজ শেষ করতে হবে। কুলি আর মজুরের ঠিকা লোকের অভাবে, যত সব দেশী চোর, জুয়াচোর, দাঙ্গাবাজ আর খুনী আসামী কাজে লেগেছে। এক দল কাদার ঝুড়ি বয়ে আনে গঙ্গাতীর থেকে। গঙ্গামাটি আনে আর ঢেলে দেয় মাটির স্তূপে। এক দল প্রাচীর গড়ে।

একেক দলে ত্রিশ জন আসামী! বিলকুল কালা আদমী। কলকাতা, সুতানুটী ও গোবিন্দপুরের ভাবী ইংরাজ জমিদার, অর্থাৎ বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষের গ্রেফ্তারী আসামী। যত সব চোর, জুয়াচোর, দাঙ্গাবাজ আর খুনী আসামী। একেক দলে ত্রিশ জন। ত্রিশ জনের একেক পা একই লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ। প্রতি ত্রিশ জনের জন্য একেক জন বন্দুকধারী দেশী ফৌজ।

ঘাটের মাঝি-মাল্লা ও খালাসী আর কোম্পানীর আসামীদের উত্তেজনা ও

আর্তনাদে কাক-চিল বসতে পায় না কোথাও। কত অসংখ্য মাস্তুল দেখা যায় ভাগীরথীবক্ষে। হরেক রকম সদাগরী নৌকার ভীড়ে গঙ্গার জল দেখা যায় না। খালাসী আর আসামীদের চীৎকারে কান পাতা দায়!

কোম্পানী হাউসের সন্নিকটে পৌঁছে অশ্বের গতি সংযত করেছেন কাশীশঙ্কর। সজাগ কর্ণে মানুষের কণ্ঠরোল শুনছেন। মাঝি-মাল্লা ও খালাসীদের কি উচ্চ কণ্ঠস্বর! কালো আসামীগুলোর মুখে অশ্রাব্য ভাষা। ইংরাজকে গাল পাড়ছে কালো রং নেটিভ প্রিজ্‌নার!

অশ্বপৃষ্ঠ থেকে ধীরে ধীরে অবতরণ করলেন কাশীশঙ্কর। কর্দমাক্ত, পিচ্ছিল, আঁকা-বাঁকা ও উঁচু-নীচু পথ বহু ক্লেশে অতিক্রম করতে হয়েছে দ্রুততর গতিতে। অশ্ব ঘন ঘন শ্বাস ফেলতে থাকে। শুভ্র ফেনপুঞ্জ অশ্বমুখে। বাহনের গ্রীবাদেশে চাপড় মারেন ছোটকুমার। সজোরে ও সশব্দে। ভূমিতে একেক বার একেক পা ঠুকছে অশ্বটি। কোম্পানীর হাউসের অনতিদূরে এক দেবদারু বৃক্ষের নিম্নস্থ শাখায় বাহনকে বেঁধে দেন কাশীশঙ্কর। ততক্ষণে অনুগামী সহচরের কেউ কেউ এসে উপস্থিত হন। ছোটকুমারের সঙ্গে একত্র অশ্বচালনায় অন্য কারও জয় হয় না কখনও। যেন পক্ষীরাজের মত দ্রুততম গতিতে অগ্রগামী হয় ঐ অশ্ব। হঠাৎ দেখা দেয়, হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়—বিদ্যুতের মত। কপালের স্বেদবিন্দু উত্তরীয়-অঞ্চলে মুছতে মুছতে কাশীশঙ্কর কোম্পানীর হাউসের উদ্দেশে অগ্রসর হন। সহচরবৃন্দকে বললেন,—ক্ষণকাল তিষ্ঠ। রামনারায়ণের সাক্ষাৎ পাই তো কাজ হয়। নচেৎ আমাদের বৃথাই আগমন।

কথা শোনা যায় কি না যায়, এতই কলরোল। নৌকার মাঝিমাল্লা, জাহাজের খালাসী, কুশীদ শেঠ, ফড়ে আর ঠিকাদারদের হৈ-হল্লায় কাক-চিল বসতে পায় না কোথাও। শব্দের প্রতিশব্দ ভেসে ওঠে বাতাসে। ধ্বনির প্রতিধ্বনি। সেই সঙ্গে যত সব চোর, জুয়াচোর, দাঙ্গাবাজ ও খুনী আসামীদের এলোপাথাড়ি চীৎকার। কুলী-মজুর পাওয়া যায় না। দেশী মজুর বিদেশীর অধীনে কাজ করতে চায় না। তাই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষ থেকে যত গ্রেফতারী

আসামীদের বন্দুকের ভয় দেখিয়ে কাজে লাগানো হয়েছে। একেক দলে ত্রিশ জন আসামী। সেই ত্রিশ জনের পা একটি শৃঙ্খলে আবদ্ধ। প্রতি ত্রিশ জনের জন্য একেক জন বন্দুকধারী দেশী ফৌজ।

কোম্পানীর হাউসের কাছাকাছি বিস্তীর্ণ ভূমির গড়খাত ও পরিখাসমূহে মাটি পড়ছে চুবড়ি চুবড়ি। বন্ধুর জমিকে সমতল করতে হবে এই বর্ষার আগেই। কাদামাটির প্রাচীর শেষ করতে হবে।

ছোটকুমার কাশীশঙ্কর লক্ষ্য করেন, দিগন্তবিস্তৃত ধূসরতা। ডাইনে বামে সম্মুখে পিছনে যে দিকেই দৃষ্টি যায়, শুধু সীমাহীন মাটি-রঙ। মধ্যাহ্ন-সূর্যের প্রচণ্ড আলোকরশ্মি, অধিক দূর দেখা যায় না একদৃষ্টে। রৌদ্র-ঔজ্জ্বল্যে দৃষ্টি ব্যাহত হয়। তবুও যতটা চোখে পড়ে, শুধু ধূসর, ধূসর, ধূসর!

গড়-গোবিন্দপুরের ভূমি কর্দমময়। বিপুলকায়া গঙ্গার জলও কর্দমযুক্ত ঘোলাটে-বর্ণ। তাই আপাতদৃষ্টিতে চতুর্দিক ধূসরতায় পরিপূর্ণ মনে হয়।

কোম্পানীর হাউস যথার্থ হাউসই নয়। হোম, হাউস, রেসিডেন্স্, ভিলা, কটেজ কিছুই নয়। একেবারে মৃন্ময়-কুটির। বলা যায় থ্যাটজ্-কটেজ্ মাটির ঘরে মাটির দেওয়াল, গোলপাতার ছাউনি। কাঁচা বাঁশের কাঠামোয় দাঁড়িয়ে আছে কোন রকমে। চাঁচাড়ির ছোট ছোট জানালা। খসখস-টাটির দরজা।

কত ঝড়ের রাতে ঐ পর্ণকুটিরের কাঠামো ভেঙ্গে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে ইতিপূর্বে। গঙ্গানদীর বুক থেকে উড়ে-আসা হাওয়ার বেগে তাল রাখতে পারে না পাতার ছাউনি। বাঁশের কাঠামো যুঝতে পারে না দুরন্তগতি বাতাসের সঙ্গে। প্রবল বর্ষণে মাটির দেওয়াল মাটির সঙ্গে মিশে যায় রাতারাতি।

বর্ষার আকাশ কি ভয়ঙ্কর! বাঙলার করাল-কালো গম্ভীর মেঘাচ্ছন্ন আকাশকে দেখে ইংরেজের অন্তরাত্মা যেন ধুকপুক করতে থাকে। স্থলে যুদ্ধ চলে, জলেও ইংরেজ যুদ্ধ চালায়, কিন্তু আকাশের সঙ্গে কে লড়াই করবে কোন্ বলে! প্রকৃতির সঙ্গে?

কাশীশঙ্কর হাসলেন মৃদু মৃদু। ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় উইলিয়ামের নাম স্মরণ করলেন মনে মনে। তৃতীয় উইলিয়ামের দেশবাসীর এ কি দুর্দশা গড়-গোবিন্দপুরে!

সম্মুখে আসন্ন বর্ষাঋতু, কোম্পানীর মাটির ঘরে মাটির প্রলেপ পড়ছে। পাতার ছাউনি, পাতা বদলানো চালিয়েছে ঘরামি। পুরানো নারিকেলদড়ি বাতিল হয়ে যাচ্ছে।

হাত পেতেছে ইংরাজ। আবার হাসলেন কাশীশঙ্কর। মৃদু মৃদু হাসলেন। সওদাগর ইংরাজ, দেশে চুলো নেই কোন, মরণের ঠাঁই নেই, এসেছে ভূ-ভারতে। তাও শূন্য হাতে নয়। সরাসরি ভিক্ষাপাত্র নয়। এক নিয়ে এক দিতে এসেছে। রাজার জাত ভিক্ষা মাগে না।

এক দিয়ে এক নেয় না। একের বদলে একশো নেয়। কোটির বদলে লক্ষ দেয়। কাচের বদলে কাঞ্চন নেয়।

কোম্পানীর কুটিরে যদি রামনারায়ণ থাকে তবেই কাজ হবে, নয়তো নয়। ছোটকুমার কুটিরের কাছাকাছি পৌঁছে দেখলেন, কুটিরের সীমানায় বন্দুকধারী পাহারা। কুটিরের দাওয়ায় ইংরাজ কর্মচারী। যে যার কাজ করছে। খাতা লিখছে যত সব রাইটার। জমা আর খরচের খাতা। কর্মচারীদের হাতে চিলের পালখের কলম। তালপাতার পাখা। বৈশাখী উত্তাপে হাওয়া খায় আর কলম চালায়। মাটির পাত্রে জল খায় কেউ। কলসী থেকে জল ঢালে আর খায়।

—রামনারায়ণ?

—আছে।

শেঠ রামনারায়ণ ইংরাজ কোম্পানীর বেতনভুক্ দালাল। রামনারায়ণ সাহাকে ইংরাজের পক্ষ থেকে বাণিজ্য-দ্রব্যের সন্ধান রাখতে হয়। কি পাওয়া যায়, আর কি পাওয়া যায় না। সমুদ্রপারে রপ্তানির জন্য প্রয়োজন যত কিছু দ্রব্যের। যেমন লবণের চাঁই, লাক্ষা, শোরা, হরিতাল, তামাকের পাতা, আফিম, মৌচাকের মোম, সরিষার তেল, যব, সুপারী, চিনি, শুকনো আদা, তামা, শিশা, টিন। বাঙলা দেশের সুতা আর রেশমজাত বস্ত্র চাই। চাই তাফতা, মুগা, তসর, মসলিন, তাঞ্জেব, ডুরিয়া, জামিয়ার, মলমল।

কোম্পানীর কুটিরের অভ্যন্তর থেকে রামনারায়ণ শেঠ বেরিয়ে আসে। কে

আবার ডাকলো তাকে! কোন্ মহাজন? জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে এধার-সেধার দেখলো। ছোটকুমার কাশীশঙ্করকে অপেক্ষমান দেখে ঈষৎ আনত হয়ে নমস্কার করলো। যুক্ত দুই হাত বুকে ঠেকালো।

—কুমার বাহাদুর, স্বয়ং আপনি কি না এই অধীনের খোঁজ করতে আসবেন, তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না! হুকুম করেন কি করতে হবে।

সহাস্তে কথা বললে রামনারায়ণ শেঠ। মাথার পাগড়ী যথাস্থানে বসায় আর কথা বলে। গঙ্গাতীরের প্রবল বাতাসে কাঁধের লম্বমান চাদর উড়তে থাকে তার। গোঁফের সূক্ষ্মতম প্রান্ত উড়তে থাকে। শেঠের দুই কানে সোনার মাকড়ি। সূর্য-আভায় চিক-চিক করছে। রেশমের চিত্র-বিচিত্র বেনিয়ান চকনাই তুলছে।

কাশীশঙ্কর বললেন,—রামনারায়ণ, তোমাকেই প্রয়োজন।

—বলেন হুজুর, বলেন। কি হুকুম তাই বলেন।

রামনারায়ণ কথা বলে আর মাথার পাগড়ী সামলায়। পরনের কাপড় সামলায়। গঙ্গাতীরের দুর্দান্ত হাওয়ায় বড় বেশী ওড়াওড়ি করছে কাপড়চোপড়।

—রামনারাণ, আমি মহাজনের কাজ করতে চাই। ইংরাজ কোম্পানীকে মাল-মসলা বিক্রী করতে চাই, তুমি বিলিব্যবস্থা করে দাও।

ছোটকুমার কথার শেষে হাসলেন, খুশীর ক্ষীণ হাসি। রামনারায়ণের হাত ধরলেন নিজের হাতে। মিনতির ভাব প্রকাশ করলেন মুখে।

রামনারায়ণ বললেন,—সে কি কথা হুজুর! আপনি করতে চান মহাজনের কর্ম? কোন্ দুঃখে? আপনি যে রাজার ছেলে হুজুর!

আবার হাসলেন কাশীশঙ্কর। রামনারায়ণ শেঠের কথা শুনে হো-হো শব্দে হাসলেন। হাসতে হাসতে বললেন,—হাঁ রামনারাণ! তুমি যদি আমার সহায় হও, আমিই করবো মহাজনের কাজ। তুমি সহায় হলে আমার কোন চিন্তা নাই।

স্বকর্ণে শুনেও যেন বিশ্বাস করতে চায় না রামনারায়ণ শেঠ। তার কপালের রেখাগুলি কুঞ্চিত হয়। সবিস্ময়ে বলে,—সহায় হব কি হুজুর! আপনারা রাজা

লোক, আমরা আপনাদের অধীনের গোলাম।

কাশীশঙ্কর হাসি সম্বরণ করলেন। শেঠের দুই স্কন্ধে হাত রেখে বললেন,—না রামনারাণ, তুমি আমাদের গোলাম নও, তুমি আমার হিতকামী বন্ধুজন। তুমি আমাকে পথ দেখাও।

রামনারায়ণও কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে যায়। বিস্ময়মিশ্রিত কণ্ঠে বললে,—সত্য কথা হুজুর? মহাজনের কাজ করতে ইচ্ছা করেন?

—হাঁ রামনারায়ণ! আমি তোমাকে মিথ্যা বলি নাই। মিথ্যা বলা আমার ধর্ম নয়। তোমার অবশ্যই অজানা নাই, আমার পিতা ছিলেন রাজা। পিতার অবর্তমানে আমার অগ্রজ রাজা হয়েছেন, সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। আর আমি?

ছোটকুমারের কথায় অন্তরের সুর। কেমন যেন দুঃখ-ভারাক্রান্ত কণ্ঠ। কথা বলতে বলতে সহসা মধ্যপথে থামলেন তিনি। বিস্ময়ের ঘোর কিছুতেই কাটে না রামনারায়ণের। বিশ্বাসই করতে চায় না যেন। অদূরে প্রবহমান গঙ্গানদীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। বলে,—হুজুর, আপনি আর এই খাঁ-খাঁ রোদে কষ্ট পান কেন? আপনি গৃহে ফিরে যান। আমিই যাবো হুজুরের সমীপে, সাক্ষাৎ করবো। যতেক কথা সেখানেই হবে।

—ভাল কথা। বললেন কাশীশঙ্কর। কথার শেষে নিজের কণ্ঠ থেকে কি এক অলঙ্কার খুলে তুলে ধরলেন। বললেন,—রামনারায়ণ, তোমার পুরস্কার

হাত পাতলো রামনারায়ণ শেঠ। কাশীশঙ্কর তার হাতে অর্পণ করলেন একটি বহুমূল্য কণ্ঠাভরণ। লাল মুক্তার মালা এক ছড়া। সহাস্যে গ্রহণ করলো শেঠ। ছোটকুমারকে অভিবাদন জানালো নতমস্তকে।

কাশীশঙ্কর বললেন,—সাক্ষাৎ কবে হবে, রামনারায়ণ?

শেঠ খুশীর হাসি হাসতে হাসতে বললে,—আগামী কল্য প্রাতে।

—তথাস্তু। বললেন ছোটকুমার। অপেক্ষমান সহচরবৃন্দ যেদিকে, সেদিকে চললেন প্রফুল্লচিত্তে।

গড়গোবিন্দপুরের গঙ্গাতীরে তখনও সে কি উত্তেজনা!

নৌকার মাঝি-মাল্লা, জাহাজের খালাসী, ফ'ড়ে আর ঠিকাদারদের সরব চীৎকারে কান পাতা দায়। কাক-চিল বসতে পায় না কোথাও। ভাগীরথী-বক্ষে কত হরেক রকমের জলগামী পোত। ইংরাজ কোম্পানীর জাহাজ, শ্লুপ আর কার্গো। দেশী নৌকা, পানশি, বজরা, গহনা নৌকা। গঙ্গার বুক থেকে আকাশের বুকে উঠেছে কত অসংখ্য মাস্তুল। ইংরাজদের বিখ্যাত জাহাজ 'রয়াল জেমস্ এণ্ড মেরী' নোঙর ক'রেছে। জাহাজের সারেঙ, কি কারণে কে জানে থেকে থেকে ভেরী বাজিয়ে চলেছে।

তদুপরি জোর কাজ চলেছে গঙ্গাতীরে ইংরাজ কোম্পানীর পক্ষ থেকে। পর্টুগীজ আর ইংরাজ নাবিকদের মধ্যে যারা কর্মিতকর্ম্মা, তাদেরই লাগানো হয়েছে গড়গোবিন্দপুরের গঙ্গাতীরে রানা বাঁধার দুঃসাধ্য কাজে। আসন্ন বর্ষার আগে নিশ্চয়ই কাজ শেষ করতে হবে। বর্ষার বর্ষণে ও বিপুলকায়া গঙ্গার একত্র উৎপীড়নে রানা ভেসে যাওয়া বিচিত্র নয়। তাই পোড়ামাটির ইট আর চুনের সাহায্যে কাজ চলেছে দ্রুততম গতিতে। কাজ করছে গ্রেফ্-তারী আসামীর দল। তদারক করছে পর্টুগীজ ও ইংরাজ নাবিকগণ। নাবিক-দের হাতে চাবুক। কুলি-মজুরদের গাফিলতি দেখলেই চাবুকের সদ্ব্যবহার করছে নাবিকেরা।

মধ্যে মধ্যে লোহার শিকলের ঝনন্ ঝনন্ শব্দ পাওয়া যায়। কেউ নোঙর করছে, কেউ নোঙর খুলছে। জাহাজ আর বজরার সঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ নোঙরের ঝন্ ঝন্ শব্দে সামুদ্রিক শ্বেতপক্ষীরা সন্ত্রাসে উড়ে পালায়। আবার আসে। ঝাঁকে-ঝাঁকে।

দ্রুত যাওয়ার তাড়া নেই।

কাশীশঙ্করের অশ্ব দুলকি চালে চলে। অনুচরগণ অনুসরণ করে ছোট-কুমারকে। সহগামী সাঙ্গোপাঙ্গরা কাশীশঙ্করের মুখাকৃতি লক্ষ্য করে দেখেছে! দেখেছে তাঁর হাসি-হাসি মুখ। প্রফুল্ল বদন। সহচরের দল বেশ বুঝেছে যে

এত কষ্টের ছোটাছুটিতে কাজ হয়েছে। তারা লক্ষ্য করে, কাশীশঙ্করের কণ্ঠের লাল মুক্তার মালা কোথায় গেল! হয়তো আনন্দের প্রাবল্যে পুরস্কারস্বরূপ দান ক'রেছেন শেঠ রামনারায়ণকে। ছোটকুমার যেমন ইচ্ছা হয়েছে তেমনই ক'রেছেন। কে কি বলবে তাঁর কাজে! তেমন সাধ্য আছে কার?

ছোটকুমারের পোষমানা বাহন চললো দুলকি চালে। সে-ও কি বুঝেছে মনিবের মনোগত ভাব! কাশীশঙ্করের মত সে-ও কি খুশী হয়েছে! মনুষ্যজাতির মত পশুও হয়তো আনন্দে উৎফুল্ল হয়।

রামনারায়ণ শেঠের মৌখিক সম্মতি পেয়ে হাতে যেন স্বর্গ পেয়েছেন কাশীশঙ্কর! ইদিক-সেদিক দেখতে দেখতে অশ্বপৃষ্ঠে চলেছেন খুশীমনে। ছোটকুমার সাগ্রহে দেখছেন, [illegible]পানীর কুটিরের আশ-পাশে দূরে কাছে ইংরাজরা আপন আপন বসতি গেড়েছে। ইট-চুনের ঘর তুলেছে, যে যেখানে পেরেছে। নালা, নর্দ্দমা আর পানীয় জলের পুকুর কেটেছে। কূয়ো খুঁড়েছে।

ইংলণ্ডের কোর্টের আদেশ অমান্য ক'রেছেন দরাজমন জব চার্ণক—শহর কলকাতার জন্মদাতা। চার্ণকের নির্দ্দেশেই তাঁর স্বজাতিগণ গৃহ নির্ম্মাণ ক'রেছে—যে যেখানে পেরেছে।

ঐ তো মিষ্টার রশের বাংলো; মিষ্টার আয়ার, জ্যাকশন, গ্রিফিথস্ আর উইলিয়ামসনের ইঁট-চুনের কোঠা! স্যর রবার্ট নাইটিঙ্গেলের আবাস।

অশ্বপৃষ্ঠে ছোটকুমার কাশীশঙ্কর দুলকি চালে চলতে চলতে অনুগামীদের উদ্দেশ্যে অঙ্গুলি-সঙ্কেত করলেন, বললেন,—ঐটি রশ সাহেবের গৃহ। ঐটি আয়ার সাহেবের, ঐ গৃহটি জ্যাকশন সাহেবের, ঐটিতে উইলিয়ামসন থাকে। আর ঐ অদূরে স্যর রবার্ট নাইটিঙ্গেল বাস করেন

অনুগামীদের মধ্যে সকলেই যেন একই ধাতুর মানুষ, একই ধাতুতে গড়া। তাঁদের প্রত্যেকেরই মুখাকৃতিতে যেমন কঠোরতা তেমনই গাম্ভীর্য্য। সুবাধ্য ও নির্ব্বোধ সৈনিকের মত পিছনে পিছনে চলেছেন, কাশীশঙ্করের অভিন্নহৃদয় সহচরের দল। ছোটকুমারের অঙ্গুলি-সঙ্কেতে তাঁদের প্রত্যেকেই চোখ ফেরান। পরম নির্লিপ্তের দৃষ্টি প্রত্যেকের চোখে।

কাশীশঙ্কর আকাশে দৃক্‌পাত করেন ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে। আকাশে আবার কার গৃহ আছে! অমন ব্যগ্র দৃষ্টিতে কি দেখছেন! কাশীশঙ্কর আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে বললেন,—বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর, আমরা সকলেই এখনও অনাহারী। এসো, আমরা দ্রুত অশ্ব ছোটাই নচেৎ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সূতানুটিতে পৌঁছানো সম্ভব হবে না।

কথা উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক পাল অশ্ব মুহূর্ত্তমধ্যে একই সঙ্গে তড়িৎগতিতে ছুট দেয়। পিছনের পথ অন্ধকার হয়ে যায় ধূলা-কাদায়।

উঁচু-নীচু, আঁকা-বাঁকা, পিচ্ছিল ও কর্দ্দমাক্ত পথ রোড টু কালীঘাট। চিৎপুরের মা চিত্রেশ্বরীর সমুখ দিয়ে এসে সোজা চলে গেছে কালীমাতার দরজায়, কালীঘাটে। সূতানুটি থেকে বাজার কলকাতা বরাবর সোজা গড়-গোবিন্দপুর পেরিয়ে কালীঘাটে গেছে বহু বিস্তৃত এই পথ।

পথ চেয়ে বসেছিলেন রাজাবাহাদুর। মজলিস-ঘরের গবাক্ষ থেকে রাজ-প্রাসাদের প্রধান প্রবেশ-দ্বারে ব্যাকুল দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলেন। কালীশঙ্করের হাতে ক্রাইষ্টালের পেগ্‌গ্লাশ! টলমল করছে লোহিত-রঙ পানীয়। সমুখে ডিম্বাকৃতি গবাক্ষ। একটি নাতিবৃহৎ উপাধানে দেহ হেলিয়ে নির্নিমেষ নয়নে দেখছিলেন রাজাবাহাদুর। হাতে তাঁর টলটলায়মান পানপাত্র। দু'জন কৃষ্ণকায় ক্রীতদাস সন্নিকটে, দুটি সুবিশাল তালপাতার বাহারী ও জরিদার পাখা চালনা করেছে।

রাজাবাহাদুরের দৃষ্টি ব্যাহত হয় কখনও। কি প্রচণ্ড সূর্য্যালোক! চক্ষুর্দ্বয় ঝলসে ওঠে কখনও। তবুও পথ চেয়ে আছেন তিনি। কে যেন আসবে! ওষ্ঠ থেকে পানপাত্র নামিয়ে রাজাবাহাদুর বললেন,—মল্লার রাগ ধরো। দারুন গ্রীষ্মে আর পারি না! অন্য সুরে কর্ণেন্দ্রিয় সাড়া দেয় না এখন।

—যো হুকুম রাজাবাহাদুর।

সেলাম শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুর বদলালো। এক সুর থেকে অন্য সুর ধরলো ওস্তাদজী। রাজাবাহাদুরের নির্দ্দেশ শুনে দ্বিগুণ উৎসাহিত হয়ে উঠলো যেন। ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটলো ওস্তাদের। সুরবাহারের সুর বদলাচ্ছে

থাকলো হাস্যসহকারে। তবলচী রূপার হাতুড়ী পিটতে লাগলো ডান আর বাঁয়া তবলার বুকের কিনারায়। তানপুরার বাদ্যকার ন'ড়ে-চড়ে বসলো। পানদানি থেকে পান পুরলো মুখে।

ঘোষাল বললেন,—রাজাবাহাদুর, রাজগৃহে ফিরে যান। বেলা আর নাই। মহাশয়ের আহারে বিলম্ব হবে অকারণে।

চোখ ফেরালেন কালীশঙ্কর। চোখে তাঁর শূন্য দৃষ্টি। দেখছেন কি দেখছেন না। বললেন—যথার্থ ই বলেছো ঘোষাল! কিন্তু কোন উপায় দেখি না। ছোট-কুমার বাহাদুর যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ আমার আহার-নিদ্রা নাই।

ঠোঁট ওলটালেন ঘোষাল। কথা শুনে মনে মনে অসন্তুষ্ট হলেন। কাশীশঙ্করের আগমনের কথায় মনে মনে ভীষণ অখুশী হলেন ও মুখ বিকৃত করলেন অতৃপ্তিতে।

ওস্তাদের সুরবাহারের সুরঝঙ্কারে মজলিস-ঘর রনরনিয়ে ওঠে যেন ক্ষণকালের-মধ্যে! বিলম্বিত তালে সুর ধরেছে ওস্তাদ। ওষ্ঠপ্রান্তে ক্ষীণ হাসি মাখিয়ে বাজিয়ে চলেছে। অতি সন্তর্পণে।

রাজাবাহাদুর নিস্পলক চোখে তাকিয়ে আছেন। দেখছেন, সাগ্রহে ও ব্যগ্রদৃষ্টিতে দেখছেন। রাজপ্রাসাদের প্রধান প্রবেশ-পথে রাজাবাহাদুরের চোখ। কে যেন আসবে, তারই প্রতীক্ষায় আছেন।

ঘোষাল বললে,—রাজাবাহাদুর, নির্জ্জলা আসব পানে শরীর অসুস্থ হয়। আপনি এই সঙ্গে কিছু মুখে দেন না কেন।

অত্যন্ত ধীরে ধীরে চোখ ফেরালেন কালীশঙ্কর। প্রগাঢ় আলস্যের সঙ্গে ঘোষালের কথাগুলি কানে নিলেন। কাছাকাছি ফরাসের প'রে ছিল মেওয়ার রেকাবী, ছোট একটি পাত্রে গোটাফলের স্তূপ। রেকাবীতে বাদাম, পেস্তা, আখরোট, কাজু, বড় এলাচ, লবঙ্গ। কাংস্যপাত্রে আঙুর, আপেল, ডালিম, কদলী, পিচফল।

এক গুচ্ছ আঙুর হাতে তুললেন রাজাবাহাদুর। ডান হাতের ক্রাইষ্টালের পেগ-গ্লাস নামিয়ে রাখলেন ফরাসে। একেকটি আঙুর মুখে দিতে থাকেন একেক বারে। কালীশঙ্করের চোখের চাউনিতে যেন শূন্যতা ফুটেছে। মুখভাবে

গাম্ভীর্য্য। চক্ষুপ্রান্ত রক্তবর্ণ হয়েছে। নির্জ্জলা আসবের প্রতিক্রিয়ায় সোজা বসতে পারেন না রাজাবাহাদুর। হৃদ্‌যন্ত্রের গতি কেমন যেন দ্রুততর হয় ক্রমেই। নেশার ঘোরে মন তাঁর আনন্দ আর উল্লাসে পরিপূর্ণ হ'লেও কালী-শঙ্কর সোজা বসতে পারেন না। হস্তপদে শিথিলতা যেন!

—ঘোষাল!

উপাধানে এলিয়ে পড়ে বুক চিতিয়ে চিতিয়ে কথা বললেন রাজাবাহাদুর। মজলিস-ঘরের আলো-আঁধারে কালীশঙ্করের খিড়কিদার জরির পাগড়ী আর কণ্ঠহারের মণি-মাণিক্য ঝলমল করে!

ঘোষাল বললেন,—হুকুম করেন রাজাবাহাদুর। বলেন কি বলতে চান।

কথার শেষে মুখে পানপাত্র তোলেন ঘোষাল। পর পর কয়েকটা চুমুক দেন স্ফটিকের পাত্রে।

কত চেষ্টা করেছেন কালীশঙ্কর। নেশাধিক্যে নিজেকে আয়ত্তে রাখতে পারেন না। কত চেষ্টা সত্ত্বেও উঠে সোজা বসতে পারেন না। কথাও তেমন স্পষ্ট বলতে পারেন না। কখনও গম্ভীর হয়ে থাকেন। কখনও বা আপন খেয়ালে প্রচণ্ড শব্দে হাসতে থাকেন। অকারণে। রাজাবাহাদুরের ইয়ার-বন্ধু আর তোষামুদের দলও বাদ যায় না। এক যাত্রায় পৃথক ফল হবে? তাঁদেরও দেওয়া হয়েছে পানপাত্র। কানায় কানায় আসবপূর্ণ ডিকেণ্টার। তাঁদের কেউ কেউ এক মনে একের পর এক পাত্র শেষ ক'রে চলেছেন। পানপাত্র হাতে কেউ কেউ ওস্তাদকে ঘিরে ব'সেছেন, সুরবাহারের সুরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মাথা দুলিয়ে চলেছেন একনাগাড়ে।

ঘোষাল শুধু রাজাবাহাদুরের পাশটিতে আছেন। কালীশঙ্কর কখন কি বলেন, মন্তব্য কাটেন বা ফরমাস করেন, সেই অপেক্ষায় আছেন ঘোষাল। রাজাবাহাদুরের সঙ্গে সমানে তাল রেখে পান করছেন তিনিও।

জড়িয়ে জড়িয়ে কথা ধরলেন রাজাবাহাদুর। বললেন,—ঘোষাল, মিঞাকে কও, বিলম্বিত লয় আর ভাল লাগে না। তবলায় জলদ চলে, তবেই তো!

ওস্তাদ বাম হাতে আবার সেলাম ঠুকলো সহাস্যে। খোদ রাজাবাহাদুরের

আজ্ঞা শুনেছে; কৃতার্থ হয়ে গেল যেন। বললে,—হুকুম রাজাবাহাদুর!

রাজার পায়ে যেন ওস্তাদ বিকিয়ে দিয়েছে নিজেকে। মিঞার ভাবভঙ্গীতে আত্মসমর্পণের আবেগ সদা-জাগ্রত। মাস-মাহিনার চাকরী ওস্তাদের। খেয়ালী রাজার কখন কি খেয়াল হয়, কে বলতে পারে? ওস্তাদ জানে আরও অনেক গাইয়ে-বাজিয়ে আছে দেশে। আরও অনেক ওস্তাদ আছে। মিঞা যেন সন্ত্রস্ত হয়ে আছে তাই।

ঘোষাল লোভাতুর চোখে কি যেন দেখে। রাজাবাহাদুরের কণ্ঠে মতির হার। মুক্তার মালা। ঘোষালের ঈষৎ লাল চোখে লোভার্ত্ত চাউনি। মুখে নকল হাসি। ঘোষাল বললেন,—মতির মালায় যা মানিয়েছে রাজাবাহাদুরকে!

ক্ষণিকের জন্য হাসি ফুটলো কালীশঙ্করের মুখে। ক্ষীণ হাসি হাসলেন। জড়িত কণ্ঠে বললেন,—ঘোষাল, মতির মালায় তোমার লোভ আছে?

—বিলক্ষণ আছে রাজাবাহাদুর। বললেন ঘোষাল, গদগদ কণ্ঠে। বললেন,—তবে, আমার কি আর লোভ? সহধর্ম্মিণীকে পরাতে সাধ জাগে যে! আমার গলায় মতির মালা দেখে লোকে যে হাসবে রাজাবাহাদুর! বলবে, বাঁদরের গলায়—

আবার হাসলেন কালীশঙ্কর। শব্দহীন ক্ষীণ হাসি। ঘোষালের কথায় হাসলেন। সূক্ষ্ম দুই ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটিয়ে নিজের কণ্ঠ থেকে মতির মালা খুলে বললেন,—ঘোষাল, এটি তুমি নাও!

ইতি-উতি দেখলেন ঘোষাল। সাঙ্গোপাঙ্গদের তির্য্যক্ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে করতে একান্তই নির্লজ্জের মত হাত পাতলেন। গ্রহণ করলেন মতির মালা। আঙরাখার অভ্যন্তরে লুকিয়ে রাখলেন।

অনেক বার হাসলেন রাজাবাহাদুর। ক্ষীণ হাসি হেসে মজলিস-ঘরের দেওয়ালে চোখ ফেরালেন। দেওয়াল-গিরিতে কত অসংখ্য মোমবাতি জ্বলছে। ঘরের প্রবেশ মুখে একটি মশাল, দাউ-দাউ জ্বলে।

দেওয়াল-গিরির মোমের আলো অধিকক্ষণ চোখে দেখা যায় না। চোখ ঝলসায়। রাজাবাহাদুরও ধীরে ধীরে চক্ষু মুদিত করলেন। যেন গভীর

নিদ্রায় মগ্ন হলেন। হাতের পানপাত্র কখন নামিয়ে রেখেছেন ফরাসে! মোমবাতির ঐ লেলিহান শিখার মতনই রাজাবাহাদুরের হৃৎপিণ্ড যেন দপ্‌দপিয়ে জলছে অবিরাম! নেশার উগ্র-জ্বালায় থেকে থেকে বিকৃত মুখভঙ্গী করেন।

সুরবাহারের সুর থামে না। হাত দু'টো ব্যথিয়ে ওঠে না ওস্তাদের! দ্রুত লয়ে বাজিয়ে চলেছে ওস্তাদ, হুজুরের নির্দ্দেশে। তবলায় জলদ চলেছে। মজলিস-ঘর যেন গম-গম করছে যন্ত্রসঙ্গীতের মল্লার রাগে।

কিন্তু রাজা শুনছেন কৈ? তাঁর কর্ণেন্দ্রিয় এখন সম্পূর্ণ বধির। নেশার উগ্রতায় মুদিতচক্ষু। ভেলভেটের উপাধানে দেহ এলিয়ে দিয়েছেন কালীশঙ্কর। হস্তপদ যেন শিথিল হয়ে গেছে। যেন কি এক অন্তর্জ্জ্বালা বক্ষে ধারণ করে সম্পূর্ণ নীরব হয়ে আছেন।

—রাজাবাহাদুর !

মৃদু কণ্ঠে ডাকলেন ঘোষাল। রাজার কানে যেন মন্ত্র পড়লেন। কিন্তু সাড়া মিললো না। রাজাবাহাদুরের এই অবস্থা দেখে দু'জন হঠাৎ অট্টহাসি ধরলো গলা ফাটিয়ে। একজন আরেক জনের অঙ্গে ঢ'লে পড়লো হাসতে হাসতে।

ঘোষাল আবার ডাকলেন, রাজাবাহাদুর,—অসময়ে নিদ্রা যাবেন না।

কে কার কথা শোনে! ঘোষালের মিনতিপূর্ণ কথা কানে পৌঁছয় না কালীশঙ্করের। তিনি যেন ইহলোক ভুলে গেছেন। নেশার উগ্রতায় আচ্ছন্ন হয়ে আছেন। দু'জন পাঙ্খাবেহারা হরদম পাখা দুলিয়ে চলেছে। তবুও রাজাবাহাদুরের কপালে দেখা দিয়েছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। শরীর যেন তাঁর আড়ষ্ট হয়ে আছে। বিষণ্ণ মুখাকৃতি।

নেশার উগ্রতায় না সুরবাহারের সম্মোহনী সুরে গভীর নিদ্রায় অচেতন হয়েছেন কালীশঙ্কর! সুরবাহারের তার ছিঁড়ে যাবে নাকি? ওস্তাদের হাত দু'টি এক নজরে দেখা যায় না। এতই দ্রুত বাজায় ওস্তাদ।

মিঞা লক্ষ্ণৌয়ের পশ্চিমা মুসলমান। পঞ্চাশের ঊর্দ্ধে বয়স—ইতিমধ্যেই তার মেহেদী-মাখানো দাঁড়ি-গোঁফে পাক ধরেছে। শুধু সুরবাহার নয়, বীণ

আর সেতারেও মিঞা সিদ্ধহস্ত। মিঞার নাম মহম্মদ আজিমুল্লা খাঁ।

এক সুর শেষ করে অন্য সুর ধরলো ওস্তাদ। 'মেঘমল্লার' শেষ করে ধরলো 'মিয়া কী মল্লার'। তবলচী রূপার হাতুড়ী ঠুকতে থাকে তবলায়।

মজলিস-ঘর দক্ষিণমুখী। দক্ষিণের উন্মুখ গবাক্ষ থেকে আকাশ দেখা যায়। মেঘের লেশমাত্র নেই, শুভ্র রূপালী আকাশ। হাওয়ার যেন অগ্নিবাণ ছুটছে। আকাশের বুকে চাতক পাখী চক্কর খায়। মল্লার রাগে বর্ষার কোন আভাস মেলে না।

—ঘোষাল মশাই!

—কে? দেওয়ানজী?

ঘোষাল কি এক গুরুতর কাজে লিপ্ত ও ব্যস্ত ছিলেন। ডাক শুনে চমকে উঠলেন ঠিক ধরা-পড়া চোরের মত। নেশাচ্ছন্ন রাজাবাহাদুরের ডান হাতের একটি অঙ্গুরীয় সকলের অজ্ঞাতে খুলছিলেন ঘোষাল। নবরত্নের অঙ্গুরীয়।

দেওয়ানজী বললেন,—ঘোষাল মশাই, রাজাবাহাদুরের মধ্যাহ্ন-আহারের সময় অতিবাহিত হয়ে যায় যে! রাজ-অন্দর থেকে ডাক এসেছে! আহার্য্য প্রস্তুত।

ঘোষাল বললেন,—আমি তো কোন উপায় দেখি না। দেওয়ানজী, আপনিই ডাকেন রাজাবাহাদুরকে।

শিউরে উঠলেন দেওয়ান। নেতিবাচক মুখভঙ্গী করলেন। বললেন,—না, না, ঘোষাল মশাই! আমি এ কার্য্যে অক্ষম। আমার সাহসে কুলায় না। আপনিই ডাকেন না কেন!

ঘোষাল পুনরায় ডাকলেন,—রাজাবাহাদুর!

চক্ষুর্দ্বয় অর্দ্ধ উন্মীলিত করলেন কালীশঙ্কর। দুই হাতের বজ্রমুষ্টি ধীরে ধীরে শিথিল করলেন।

ঘোষাল বললেন,—রাজাবাহাদুর, গাত্রোত্থান করেন! স্নানাহারের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায় যে!

দুই চোখ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করলেন কালীশঙ্কর। স্থিরদৃষ্টিতে কি যেন দেখলেন ঘোষালের মুখাবয়বে। কি যেন লেখা পড়লেন ঘোষালের মুখ পানে চেয়ে। গম্ভীরকণ্ঠে ও ধীরে ধীরে বললেন.—ঘোষাল, তুমি যদি ক্ষুধার্ত্ত হও, বিদায় লও। জননী এখনও উপবাসী।—অদ্য দ্বাদশী, তথাপি তিনি মুখে জল দেন নাই। সহোদর ছোটকুমার কাশীশঙ্কর যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ আমিও অভুক্ত থাকি তো ক্ষতি কি?

দক্ষিণমুখী মজলিস-ঘরের প্রায় মধ্যস্থলে পশ্চাতের দেওয়ালে লাগা এক তক্তাপোষে কিংখাবের গদীর ওপর রাজার নিজের আসন আছে। আসনের পিছনে তাকিয়া, দুই পাশে তাকিয়া। আসনের সন্মুখে একটি হাত-বাক্স, দোয়াত, ও সহী-মোহর। দরবারের সংলগ্ন মজলিস-ঘর, রাজার হাতের কাছে থাকে কাজের জিনিষ। মজলিসে বসে যদি প্রয়োজন হয় কোন জরুরী চিঠিতে সই লিখতে!

রাজার নির্দ্দিষ্ট আসন, কিন্তু কালীশঙ্কর আজ আর নিজের আসনে নেই। রাজগৃহের প্রধান প্রবেশ-পথের তোরণ যে দিকে, সে দিকের গবাক্ষ সম্মুখে রেখে আসনের নীচের চাদর-বিছানো ফরাস-সতরঞ্চিতেই আসন গ্রহণ করেছেন। মজলিস-ঘর না বালাখানা? দরবার আম্ না দরবার খাস্? না সদর-বৈঠকখানা?

ঘোষাল আমতা-আমতা করেন। বলেন,—রাজাবাহাদুর, তবে আমি বিদায় লই। বেলা আর নেই।

কেমন যেন বিরক্তির ভাব প্রকাশ করলেন কালীশঙ্কর; তাঁর মুখের সর্ব্বত্র কুঞ্চিত রেখা ফুটলো। দুই হাতের মুষ্টি কঠোর করলেন। নিজের উর্দ্ধাঙ্গ উঠাতে সচেষ্ট হয়ে বললেন,—ঘোষাল, তোমরা সকলেই বিদায় লও। আগামী কল্যের দরবারে আমাদের পুনরায় সাক্ষাৎ হবে।

ঘোষাল মতির মালা হাতিয়েছে। ঘোষাল স'রে পড়তে পারলে বেঁচে যায়। ঘোষাল বললেন,—তথাস্তু রাজাবাহাদুর!

কালীশঙ্কর সম্পূর্ণ আসীন হলেন বহু চেষ্টায়। পায়ের ওপর পা চাপিয়ে -

বসলেন সহজ মানুষের মত। বললেন,—দেওয়ানজী, বাদ্যসঙ্গীত যেন না থামে। ওস্তাদজীকে অনুরোধ করুন সেই মত। আমাকে তামাকু দিতে আদেশ করেন খেদমতগারকে।

বালাখানার এক কোণে জলচৌকী।

জলচৌকীতে সোনা আর রূপায় বাঁধানো সারি সারি ফরসী হুঁকা, পানদানী, পিকদান। রাজাবাহাদুরের পৃথক্ আলবোলা। ঢাকাই রূপার কারুকার্য্যখচিত ধূমপানের ফরসি।

তৈরীই ছিল। মুখ থেকে কথা খসানোর সঙ্গে সঙ্গে রূপার গুড়গুড়ি বসিয়ে দিয়ে গেল খেদমতগার। শীর্ষে মণিমুক্তার ঝারি।

গলাখাঁকারির শব্দ হয় কালীশঙ্করের কণ্ঠে। বালাখানার প্রবেশ-পথে দেখেন চোখ ফিরিয়ে। ঘন লাল বিশাল দুই চোখ। সম্পূর্ণ আঁখি মেলেছেন রাজাবাহাদুর, টেরিয়ে টেরিয়ে দেখলেন দেওয়ানজী। মুখের কাছে, হীরামুক্তা-বসানো সোনার মুখ-নল। সোনালী তার-জড়ানো সটকা। কালীশঙ্কর দেখলেন, মজলিস-ঘর থেকে কে কে নির্গত হয়। কে থাকে আর কে যায়।

রাজাবাহাদুর বললেন,—দেওয়ানজী, দরবারে কে কে আছেন।

হাতে হাত কচলালেন দেওয়ান! হঠাৎ ডাক শুনে হকচকিয়ে গেলেন। বললেন,—রাজাবাহাদুর, মুন্‌সীখানার আমলারা ব্যতীত অন্য কেহ নাই।

বালাখানার প্রবেশ-পথে মশাল জলছে। সেখানে অপেক্ষমান এক পাল কালো কালো মানুষ! খানসামা, খেদমতগার, মশালচী; আবদার, হুকাবরদার, বেহারা, পেয়াদা।

ওদের কারও কারও দেহে রূপার অলঙ্কার। হাতে রূপার বালা, গলায় হাঁসুলী। মশালের আলোয় চক-চক করছে কত দূর থেকে।

দরবারে মুন্‌সীখানার আমলারা ব্যতীত অন্য কেউ নেই। শুনে যেন নিশ্চিন্ত হন রাজাবাহাদুর। খাতার লেখার কাজ চলছে যখন তখন আর চিন্তার কি কারণ আছে? রাজাবাহাদুর মুখ-নল মুখে দিলেন।

মুনসীখানার আমলারা কাজ করছে দরবারে। লেখা-পড়ার কাজ। খাতা

লেখার কাজ। দরবারে রাজাবাহাদুরের গদীর বাম দিকের মেঝেয় চাটাই পাতা। চাটাইয়ের পরে শতরঞ্চ ও চাদর বিছানো মুনসীখানা। সর্বসাধারণের গতিবিধি নেই দরবারে। কত গুপ্ত কাজ হয়, কত গুপ্ত পরামর্শ চলে। তাই প্রধান কার্য্যকারক ছাড়া অন্য কেউ নেই।

হুজুরের মুখের আদেশ, শুনে বর্ত্তে গিয়েছিল ওস্তাদ। প্রবল উৎসাহে পান-খাওয়া ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি মাখিয়ে সুর ধরেছে সুরবাহারে। মল্লার রাগ।

বাহিরে দুঃসহ আবহাওয়া। উত্তপ্ত দ্বিপ্রহর! মাঠ-ঘাট গাছ-পালা প্রখরতম রৌদ্রে দগ্ধ হয় বুঝি! গবাক্ষপথে বাহিরাকাশ দেখলেন কালীশঙ্কর। মুখ থেকে তামাকের প্রচুর ধূম নির্গত করতে করতে দেখলেন শুভ্র আকাশ। সুগন্ধি তামাকের গন্ধ বইতে থাকে বালাখানায়।

বাহিরে প্রকৃতি। দেখলেন রাজাবাহাদুর। প্রকৃতির সবুজ শোভা। এই প্রচণ্ড সূর্য্যরশ্মিতেও দগ্ধ হয়ে যায় না। ঘন জঙ্গলাকীর্ণ সুতানুটির প্রান্তভাগ গবাক্ষ-পথে দৃষ্টিগোচর হয়। কালীশঙ্করের দৃষ্টি থমকে যায় সহসা। কি দেখছেন রাজাবাহাদুর, এমন ব্যগ্র দৃষ্টিতে! মুখ থেকে মুখ-নল নামালেন তিনি। আশার ক্ষীণ হাসি ফুটলো ওষ্ঠপ্রান্তে! রাজা দেখলেন এক দল অশ্বারোহী আসছে। পুরোভাগে কাশীশঙ্কর।

নিশ্চয়ই ছোটকুমার ফিরেছেন। নয়তো হাসি কেন রাজার মুখে। ভয়ে যেন শিউরে শিউরে ওঠেন দেওয়ান। তাঁর পদতলের ভূমি কাঁপতে থাকে যেন।

কালীশঙ্কর বললেন,—দেওয়ানজী, ঐ দেখেন সহোদর সদলে ফিরে আসে। ছোটকুমারকে অবিলম্বে এত্তেলা পাঠান। আমি এখানেই সাক্ষাৎ করতে চাই। জরুরী প্রয়োজন আছে।

হন্‌হনিয়ে দেওয়ানজী বেরিয়ে গেলেন বালাখানা থেকে। হৃদ্‌কম্প হয় দেওয়ানের, ছোটকুমার যদি আসেন সদলবলে। দরবার থেকে চিরকুট লিখে পাঠাতে হয় দেওয়ানকে। রাজাবাহাদুরের এত্তেলা পাঠাতে হয় পেয়াদা মারফৎ।

পেয়াদা ছুটতে ছুটতে ফিরে আসে নিমেষের মধ্যে। বলে,—দেওয়ানজী, ছোট রাজা ইদিকেই যে আসেন দেখতে পাই। দলবল সমেত দরবার অভিমুখেই আসতে দেখেছি।

—আঁ? বিস্ময় প্রকাশ করলেন দেওয়ান। বললেন,—সে কি কথা হে!

—হাঁ দেওয়ানজী! ঐ দেখেন কে আসেন। পেয়াদা অঙ্গুলি সঙ্কেত করলো।

দরবার-কক্ষের দ্বারমুখে কয়েক জন বলিষ্ঠ মানুষের প্রবেশ দেখলেন দেওয়ান, অপলক দৃষ্টিতে। দলের প্রত্যেকেব একই ধরণের পোষাক। একই প্রকৃতির মানুষ হয়তো, একই ভাবভঙ্গী, একই আদব-কায়দা। পদক্ষেপেও কি একতা! দলের পুরোধা ছোটকুমার কাশীশঙ্কর। দৃপ্ত ভঙ্গীতে প্রবেশ করেই রাজা-বাহাদুরের দরবারী গদী শূন্য দেখে হাঁকলেন,—দেওয়ান, মুনসী, বড়নায়েব, তোমাদের রাজামশাই গেলেন কোথায়? দেখি না কেন তাঁকে?

ধড়ে প্রাণ আসে দেওয়ানের। উঁচানো তরোয়ালের পরিবর্তে সামান্য দু-চারটি কথায় দেওয়ান যেন প্রকতিস্থ হ'লেন। বললেন,—তেনার কথা বাদ দিন ছোটরাজা। দরবারে বসে তো কাজ চালাতেই পারলেন না। কোথায় ছোটকুমার আর কোথায় ছোটকুমার করছেন! আপনার তরেই কাতর প্রতীক্ষায় আছেন কখন থেকে! হুজুর, আপনার কাছারীতে কয়েক বার ছুটে ছুটে গিয়ে খোঁজ নিয়ে এসেছি। কিন্তু আপনার পাত্তা মেলে নাই। কোথায় গিয়েছিলেন ছোটরাজা? রাজাবাহাদুর তো ভেবে ভেবেই সারা হয়ে গেলেন।

দেওয়ানের কথার কোন জবাবই দেন না কাশীশঙ্কর। বলেন,—কোথায় আপনাদের রাজাবাহাদুর, তাই বলেন।

দেওয়ান ভয়ে ভয়ে বললেন,—হুজুর, তিনি বালাখানাতেই অবস্থান করছেন। ওস্তাদের বাদ্যযন্ত্র শুনছেন।

ওপরে-নীচে মাথা দুলিয়ে বালাখানার দিকে এগিয়ে গেলেন কাশীশঙ্কর। সহচরগণ অপেক্ষায় থাকলেন দরবারকক্ষে।

বালাখানা যেন আলোয় আলো হয়ে আছে। মোমবাতি আর মশালের

সোনালী আলোয় দিনের আলো ফুটেছে যেন বালাখানায়। প্রবেশ-পথে দাঁড়িয়ে ছোটকুমার হাঁকলেন,—প্রবেশের অনুমতি হোক।

আসন থেকে উল্লাসে উঠে পড়তে চেষ্টা করলেন রাজাবাহাদুর। কিন্তু পারলেন না। আসবের উগ্র নেশায় তাঁর হস্তপদ আর দেহে যেন জড়তার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। গলা খাঁকরে কালীশঙ্করও হাঁকলেন,—সুস্বাগতম্, সুস্বাগতম্। আসতে আজ্ঞা হোক। এসো, ছোটকুমার এসো। আমার সন্নিকটে এসো, কিছু গোপন কথা আছে।

ছোটকুমার বালাখানার দ্বারে দাঁড়িয়ে সহাস্যে ও নতমস্তকে অভিবাদন জানালেন। হাসি-হাসি মুখ কাশীশঙ্করের। এতটা পথ অশ্বারোহণে এসে যদিও তিনি ক্লান্ত। তবুও মুখ হাসি-খুসী। আনন্দে উৎফুল্ল। ছোটকুমার সোজা এগিয়ে আসেন সশব্দ পদধ্বনিতে। হাসতে হাসতে।

কাশীশঙ্করের দেহে সাদা রেশমের জোব্বা। মুগার ধুতি মালকোছা দেওয়া, ইরাণী পায়জামা যেন। কটিদেশে একটি নাতিবৃহৎ তরোয়াল। জরিদার খাপে ভর্ত্তি। হাতীর দাঁতের হাতল উঁকি মারে। কুমারের চলনের সঙ্গে মাথার উষ্ণীষ হেলে-দোলে।

রাজাবাহাদুর উঠে দাঁড়ানোর জন্য কত চেষ্টাই না করেন। কিন্তু বৃথা চেষ্টা! ওস্তাদকে উদ্দেশ করে বললেন,—এক্ষণে বিরত হন ওস্তাদজী! ঐ আমার সহোদর আসে। আমাদের পরস্পরে কথা কওনের প্রয়োজন। গুহ্য কথা।

সুরবাহারের তার ছিন্ন হয় যেন আচমকা। ওস্তাদের ক্লান্ত হাত, তবু সেই হাত তুলে সেলাম জানালো ওস্তাদ। কপালে চার আঙুল ঠেকালো।

দাঁড়ানো সুরবাহার তার তানপুরা শুয়ে পড়লো যেন শতরঞ্চি-ফরাসে। তবলা বুঝি ফুটো হয়ে থেমে গেল।

কাশীশঙ্কর বসলেন রাজাসনের সমুখে। রাজাবাহাদুরের পায়ের কাছটিতে। মুখে স্বচ্ছ হাসি। বললেন,—রাজা, তুমিই আজ রাধানগরের প্রকৃত রাজা, তদুপরি তুমি আমার বয়ঃজ্যেষ্ঠ, সহোদর। তুমি আমাকে আশীষ দাও। আমি তোমার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি।

বর্ষারম্ভের এলোমেলো হাওয়ায় মোমবাতি আর মশালের শিখা লকলকিয়ে ওঠে। জল-অর্ণবের মত জলমধ্যে যেন বালাখানা দোলাদুলি করে। সুগন্ধি তামাকের খোশবায় ভাসতে থাকে বালাখানার কোণে কোণে। গুড়-মিশানো অম্বুরী তাম্রকূট।

কেমন যেন শিশুর মত গুমরে গুমরে উঠলেন রাজাবাহাদুর। চকিতের মধ্যে তাঁর ঘোর লাল চোখ দুটি সজল হয়। নাসিকামূলে কে যেন সিঁদুরের গুঁড়া ছড়িয়ে দেয়। রাজাবাহাদুর কথা বলেন বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে,—কাশীশঙ্কর, এতক্ষণ কোন্ কাজে ব্যস্ত ছিলে তাই শুনি সর্ব্বাগ্রে! আশীষের কিবা প্রয়োজন? আমি তোমাকে এত্তেলা পাঠায়েছি।

রাজাবাহাদুরের এক পদের অঙ্গুলিসমূহ ধীরে ধীরে ধারণ করলেন কাশীশঙ্কর। বললেন,—তুমি বিমর্ষ হও কেন অনর্থক? তোমার পদধূলি দাও। কথা বলতে বলতে অন্য পদও স্পর্শ করলেন।

কালীশঙ্কর সাশ্রুলোচনে বললেন,—সেই প্রাতঃকালে কোথায় যাত্রা করলে তুমি?

নতমস্তক হন ছোটকুমার। সলজ্জায়। সসঙ্কোচে। বললেন,—কোম্পানীর কুঠীতে। গড় গোবিন্দপুরে।

—কি কারণ।

—কারণ সওদাগরী?

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠলেন রাজাবাহাদুর। রুদ্ধকণ্ঠে বললেন,—রাজার সন্তান তুমি, সদাগর হওয়ার বাসনা কেন? তুমিও তোমার পরিবার কি অভুক্ত থাকে? তোমাদের যদি কোন দুঃখকষ্ট থাকে তাও ব্যক্ত কর।

ছোটকুমারের আনত দৃষ্টি। যেন নাসিকাগ্রে দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে। তিনি বললেন,—আমার বক্তব্য তুমি মন দিয়া শুন।

—কও, তোমার কি বক্তব্য আছে?

কাশীশঙ্কর অল্প হেসে বললেন,—রাজাবাহাদুর, তোমার উত্তরাধিকারিগণ আছে। আমি তাদের বঞ্চিত করবো কোন্ লজ্জায়? হিন্দু বিধিতে জ্যেষ্ঠই

সকল কিছুর উত্তরাধিকারী। আর যে কনিষ্ঠ, সে জ্যেষ্ঠের দয়া-দাক্ষিণ্যের পাত্র ছাড়া আর কি?

বক্ষপিঞ্জর মথিত হয় রাজাবাহাদুরের। কনিষ্ঠের কথায়। কথা বলার সুরে। বলেন,—আমার অবস্থা এখন তেমন নয় যে তোমার সকল কথা শুনি। তোমাকে আমি সর্ব্বক্ষণ আশীর্ব্বাদ করি, এ বিষয়ে পরে আমার মতামত শুনিও।

কথা বলতে বলতে কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হয়ে আসে। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বলেন,—তুমি হয় তো অবিদিত আছো, আমাদের মাতৃদেবী এই দ্বাদশীতে এখনও উপবাসে আছেন? জলগ্রহণে অনিচ্ছা তাঁর।

ভ্রূ-যুগলে আকুঞ্চন ফোটে ছোটকুমারের। বলেন,—সহোদরা বিন্ধ্যবাসিনীর জন্য কি?

—হাঁ, তজ্জন্যই। এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? জমিদার কেষ্টরামকে পরিতুষ্ট করি কোন্ উপায়ে?

চিবুক স্পর্শ করলেন কাশীশঙ্কর। কি যেন চিন্তা করলেন কুমার। গভীর চিন্তা। অগ্রজের পদদ্বয় ত্যাগ করে ফরাস থেকে উঠে পড়লেন। বললেন,—ভ্রাতঃ, তুমি এই কারণে চিন্তিত না হও। আমি মাতৃদেবীর নিকট এখনই যাই। দেখি কি হয়। কথা বলতে বলতে ক্ষণকাল থামলেন। আবার বললেন,—রাজাবাহাদুর, তুমি এখন নেশায় কাতর আছো? আপাতদৃষ্টিতে তাইতো মনে হয়। কৃষ্ণরামের কথা ধর্ত্তব্যই নয়। সে একটা পাষণ্ড! পশু!

—হাঁ, তাই। তবে নেশা আর নাই। তুমি অবিলম্বে রাজ-অন্দরে মাতৃদেবীর নিকট যাও। তাঁর উপবাস ভঙ্গ করাও। নতুবা আমাদের উভয়কেই মহাপাপের ভাগী হতে হবে। আমার শারীরিক তেমন সামর্থ্য নাই যে, তাঁকে অনুরোধ জানাতে যাই।

অগ্রজের পা-ছোঁয়া হাত দুটি উষ্ণীষের পরে রাখলেন ছোটকুমার। বললেন,—অধিক পানে শরীরটাকে বিনষ্ট করতে চাও?

রাজাবাহাদুর নীরব, নির্ব্বাক্! যেন নিস্পন্দ। কাতর দৃষ্টিতে দেখেন সহোদরের মুখখানি। বাক্যস্ফূর্তি হয় না যেন চেষ্টা সত্ত্বেও। স্তিমিত কণ্ঠে

বললেন,—আর কালবিলম্ব নয়, তুমি এখনই যাও ভাই !

কথা উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গেই পিছন ফিরলেন ছোটকুমার। সামরিক কায়দায় অর্ডার শুনে পিছু ফিরলেন যেন। ততঃপর চললেন ক্ষিপ্রগতিতে। ভূমি কাঁপিয়ে।

ক্রাইষ্টালের পানপাত্র পুনরায় ওষ্ঠে তুললেন রাজাবাহাদুর। ডিকেণ্টার থেকে পানীয় ঢেলে পেগ-গ্লাশ মুখে তুললেন অতি ধীরে ধীরে। রাধানগরের রাজা, রাজা কালীশঙ্কর বাহাদুর কি জন্য কে জানে, যেন নির্জীব হ'য়ে পড়েছেন এই সামান্য সময়ের মধ্যেই ! বিক্ষিপ্ত মন, চঞ্চল মস্তিষ্ক। কিছু কি ভাল লাগে এখন ? গভীর নিরাশায় তাঁর দেহ-মন যেন ভেঙ্গে প'ড়েছে।

রাজমাতা বিলাসবাসিনী এখনও কি অনাহারী আছেন ? নাঃ, আর তাঁর কোন দুঃখই নেই। রাজাবাহাদুরের প্রধানা মহিষী বড়রাণীর মুখে শুনেছেন, ভাইয়ে ভাইয়ে পরামর্শ হবে। সেই কথা শোনা মাত্র রাজমাতার যত ক্ষোভ আর দুঃখ কর্পূরের মত জলেই নিবে গেছে যেন। তিনি উপবাস ভঙ্গ ক'রেছেন। মুখে জল দিয়েছেন। মেজরাণী সর্ব্বমঙ্গলা কাছে ব'সে ব'সে রাজমাতাকে খাইয়েছেন।

আহারা'ন্তে ছেঁচা পানের কয়েকটি ক্ষুদ্রাকার গোলক মুখে দিয়ে রাজমাতা আপন কক্ষে ফিরে শুয়েছেন নিজ শয্যায়। বিলাসবাসিনীর কেমন যেন অবসন্ন শরীর। উপবাসের অত্যাচারে হয়তো ক্লিষ্ট দেহ। নিজের পালঙ্কে শুয়েছিলেন তিনি। দু'জন দাসী পদসেবায় রত ছিল। আর কাছেই, শিয়রের কাছেই বসেছিলেন কালীশঙ্করের প্রাধনা মহিষী। উমারাণী। বড়রাণী।

ছোটকুমারের কণ্ঠ না ? কে এমন মা মা শব্দে ডাক দেয় ? কারই বা এমন গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর ?

—মা, মা গো !

কালীশঙ্কর যেন বুকের ভিতর থেকে ডাকেন। কথায় এমনই আন্তরিকতা।

সন্তানের ডাক। কানে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে ধরমড়িয়ে উঠে বসলেন, রাজমাতা বিলাসবাসিনী। শরীরে অবসন্নতা, কে বলবে! স্বগত করলেন বিলাসবাসিনী,—কে? আমার কাশীর ডাক না? ছোটকুমার ডাক না?

দাসীরা দু'জন ঘর ছেড়ে পালায়। লজ্জায় আর ভয়ে। পালে বুঝি বাঘ পড়েছে, এমনই ব্যস্ত ও ত্রস্ত হয়ে ছুট দেয় দাসীরা। রাজমাতার পালঙ্ক থেকে নেমে পড়লেন বড়রাণী। ভূমিতে নেমে দাঁড়ালেন সলজ্জায়।

প্রায় হাঁফাতে হাঁফাতে প্রবেশ করলেন ছোটকুমার। মাথার উষ্ণীষ খুলে ফেললেন এক হেঁচকা টানে। কপালে তাঁর স্বেদবিন্দু। বিলাসবাসিনীর পদদ্বয়ের কাছাকাছি নামিয়ে রাখেন মাথার উষ্ণীষ। বলেন,—মা, তুমি এখনও জলগ্রহণ কর নাই কোন্ দুঃখে? কেষ্টরামের ব্যবহারে তুমিও চঞ্চলা হও, তবে তো তার জেদ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হবে!

এক গাল হাসলেন বিলাসবাসিনী। কেঁদে কেঁদে ফুলে ওঠা চোখ তাঁর। থমথমে মুখ। তবুও হাসলেন খুশীমনে। বললেন,—এসো, আমার বাছা এসো। আমি তো বহুক্ষণ উপোস ভেঙ্গেছি।

—তবে আমি কি ভুল জেনেছি! সবিস্ময়ে বললেন কাশীশঙ্কর। কথার শেষে জননীর পদ স্পর্শ করলেন। বললেন,—অগ্রজ, রাজা কালীশঙ্করই শোনালেন। তিনিই আমাকে ত্বরায় পাঠালেন।

—সে হয়তো জানে না। বড়রাণী উমার মুখে শুনি যে রাজা নাকি তোমার সঙ্গে শলা-পরামর্শ করবে জামাই কেষ্টরামের দাবীদাওয়া নিয়ে। তাই শুনে আর আমার কোন ক্ষোভ নেই। কোন দুঃখু নেই। আমি এখন নিশ্চিন্ত। বড়রাণীর কথাতেই উপোস ভেঙেছি। কি বল' উমারাণী!

মুক্তার মত শুভ্র দন্তপাঁতি দেখা যায় প্রধানা মহিষীর। তরমুজ-লাল ঠোঁটের ফাঁক থেকে চোখে পড়ে সারি সারি মুক্তার মত উজ্জ্বল দাঁত।

—তাই নাকি বধূরাণী?

কৌতুক-কণ্ঠে বললেন ছোটকুমার। চোখ ফিরিয়ে দেখলেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূকে। সুসজ্জিতা উমারাণীর আপাদমস্তক দেখলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

উমারাণী কোন কথা বলেন না, নতমুখী হয়ে থাকেন। হাসির রেখা ফোটে লাল অধরের সীমানায়। কি মিষ্টি সেই মুক্তা-ঝরা হাসি! স্ব:র্গের দ্যুতি ছড়ায় যেন রাণীর হাসিতে। লজ্জা না ব্রীড়ায় উমারাণী তৎক্ষণাৎ রাজমাতার কুঠরী ত্যাগ করলেন। আঁচল উড়িয়ে বেরিয়ে গেলেন হাসিমুখে। মুক্তা ঝরিয়ে গেলেন যেন রাশি রাশি।

বিলাসবাসিনীর বিস্তৃত আঁখিযুগলে স্নেহাপ্লুত দৃষ্টি।

কনিষ্ঠ পুত্র কাশীশঙ্করকে কাছে পেয়েছেন, পরম আনন্দে বুক যেন তাঁর ভরে যায়। শয্যায় শায়িত ছিলেন রাজমাতা, ধীরে ধীরে উঠে বসেছেন। অনেক প্রতীক্ষা ও প্রত্যাশার চাঁদ যেন হাতে পেয়েছেন, এমনই হাসী-খুশী ভাব। আপন শিশুসন্তানকে জননী যে স্নেহার্দ্র চক্ষে দেখেন, বিলাসবাসিনীর চোখেও সেই দৃষ্টি ফুটেছে। মায়ের চোখে হয়তো ছেলের বয়স ধরা পড়ে না, কাশীশঙ্করের পৃষ্ঠে হাত রাখলেন রাজমাতা। ডান হাতে আঁচলের সাহায্যে মুছিয়ে দিলেন ঘর্ম্মাক্ত পুত্রের অনিন্দ্য মুখবিম্ব। বিলাসবাসিনীর পদদ্বয় দুই হাতে ধরে আছেন ছোটকুমার—একান্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধাভরে। পুত্রের চিবুক স্পর্শ করলেন মা। সেই হাত নিজের ওষ্ঠে ঠেকিয়ে চুমা খেলেন। দর-দর ঘামছেন কাশীশঙ্কর—অসহ্য গ্রীষ্মের উত্তাপে। পুত্রের প্রশস্ত ললাট মুছিয়ে দিতে দিতে রাজমাতা বললেন,—কোথায় ছিলে তুমি? এত শ্রান্ত-ক্লান্তই বা কেন? কার সঙ্গে যুদ্ধ করে এলে?

মার কথা শুনে স্মিতহাসি হাসলেন কাশীশঙ্কর। তখনও তিনি ভাবছিলেন, ইংরাজ কোম্পানীর কুঠীতে যাওয়ার কথা ভাঙবেন কি ভাঙবেন না। কে জানে, স্নেহময়ী রাজমাতা হয়তো শুনে আপত্তি জানাবেন, ঘোর অসম্মতি প্রকাশ করবেন। ছেলের কাজে হয়তো দুঃখ পাবেন। যেমন করেই হোক, হয়তো বাধা দেবেন কাশীশঙ্করের কাজে। বিলাসবাসিনীর কাছে চলবে না কোন' ওজর-আপত্তি, মিথ্যা অজুহাত। বিলাসবাসিনীর কথা অকাট্য, অনড়, অটল।

চিন্তার রেখা, ঘোর চিন্তার রেখা ফুটলো ছোটকুমারের প্রশস্ত ললাটে।

ধনুকের মত দুই ভ্রূ আরও যেন বক্র হয়ে ওঠে। বেশ কয়েক মুহূর্ত্ত গভীর চিন্তায় নিবিষ্ট থাকেন কাশীশঙ্কর। মাতৃদেবীর সমুখে তিনি কোন মতেই মিথ্যা বলতে পারবেন না। অদ্যাবধি কখনও বলেননি! কিন্তু কী-ই বা বলা যায়! সত্যকে গোপন করে মিথ্যাভাষণেই বা কী লাভ আছে? বেশ কিয়ৎক্ষণ চিন্তাবিষ্ট থেকে সাহসে বুক বেঁধে কাশীশঙ্কর বললেন,—ইংরেজ কোম্পানীর কুঠীতে গিয়েছিলাম।

—কেন? সেখানে কেন? পৃথিবীতে এত জায়গা থাকতে ঐ ম্লেচ্ছদের কাছে কেন? সবিস্ময়ে শুধোলেন রাজমাতা। নিষ্পলক চোখে চেয়ে রইলেন উত্তরের প্রত্যাশায়।

জননীর পদধূলি দুই হাতে মাথায় মাখলেন কাশীশঙ্কর। সহাস্যে বললেন, —মা গো, তুমি যেন অসম্মত হ'ও না। আমাকে বাধা দান ক'র না! আমি—

কথার মাঝেই কথা ধরলেন রাজমাতা। দীপ্তকণ্ঠে বললেন,—কি এমন দুষ্কার্য্যে রত হয়েছো যে বাধা দেবো?

—আমি, আমি মা ব্যবসা অর্থ খাটাতে চাই। সওদাগরীতে প্রচুর অর্থ লাভ করা যায়। ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসা করতে চাই। মহাজনের কারবার। সেই কারণেই আমি গিয়েছিলাম ইংরেজদের কুঠিতে।

অনেক ভয়ে ভয়ে কথাগুলি শেষ করলেন ছোটকুমার।

চকিতের মধ্যে বিলাসবাসিনীর অপূর্ব মুখশ্রী বিলুপ্ত হয়ে যায় বুঝি! স্তব্ধ ও ধীরকণ্ঠে তিনি বললেন,—রাজার ছেলে ব্যবসা করতে যাবে কোন্ দুঃখে? তোমার অভাব কি?

যেন শিশুসুলভ কণ্ঠে কথা বলেন কাশীশঙ্কর। বলেন,—মা, আমি রাজার ছেলে ঠিক কথা, অভাব যে আমার নেই তাও ঠিক! তবে—

—তবে?

রাজমাতার একটি মাত্র কথায় বিপুল আগ্রহ। উদগ্রীবতা।

কুঞ্চিত ভ্রূ। বিব্রত মুখকান্তি। কী যেন ভাবতে ভাবতে বললেন রাজ-

কুমার,—রাধানগরের প্রকৃত রাজা আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর। তাঁর স্ত্রীপুত্র-পরিবার আছেন, ভরণপোষণের বহু লোক আছে। আমিও যদি তাঁর আয়ের অঙ্কে চিরকাল ভাগ বসাই, আয়ের অংশ দিনের পর দিন হস্তগত করে যাই, অন্যায় হবে না?

মাথায় যেন বজ্রপাত হয় রাজমাতার—চোখে যেন আঁধার দেখেন—শরীর যেন তাঁর থর-থর কাঁপতে থাকে প্রবল উত্তেজনায়! একটি সুদীর্ঘ শ্বাস ফেললেন অত্যন্ত ধীরে ধীরে। বললেন,—রাজা কালীশঙ্কর কি কোন দিন তোমাকে মন্দ কথা বলেছে? সে কি চায় না যে, তোমরা একই পরিবারে বসবাস কর? আমার এমন একান্নবর্ত্তী সংসার ভেঙে ছারখার হয়ে যাবে!

জিভ কাটলেন কাশীশঙ্কর, অবাক-বিস্ময়ে। আফসোসের সঙ্গে বললেন,—কদাপি নয়, কোন দিন নয়। আমার অগ্রজ তেমন ধাতুর মানুষই নন। তিনি প্রকৃতই দেবতা! কেবলমাত্র এই কারণেই তো আমি তাঁর স্কন্ধে থাকতে নারাজ। আমি তাঁকে অব্যাহতি দিতে চাই। সর্ব্বোপরি, একটা নির্দ্দিষ্ট আয়ে আমার চলে না, কোন মতে দিন গুজরাণ করি।

বিলাসবাসিনীর উগ্র কণ্ঠ দুঃখভারাক্রান্ত। তিনি বললেন,—একেই আমার মেয়ের জ্বালায় দিবা-রাত্র আমি জ্বলছি। তোমার আবার এ কি মতি-গতি? তার চেয়ে আমাকে তোমরা দু' ভাইয়ে রাধানগরে পাঠিয়ে দাও। রাধাশ্যামের সেবা করবো আমি। তারপর তোমরা যা মন চায় কর। আমি বাধা দিতে আসবো না। আমাকে পাঠিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে ভিন্ন হও, সদাগরী করতে চাও আমি দেখতে আসবো না।

মৃদু মৃদু হাসির সঙ্গে কাশীশঙ্কর বললেন,—মা, তুমি এখনই রুষ্ট হও কেন? ব্যবসা ছাড়া গতি কি? অদূর ভবিষ্যতে রাজা আর রাজত্ব কি থাকবে তুমি মনে কর?

—আমি জ্যোতিষ জানি না যে ভবিষ্যতের কথা বলবো। আমাকে আর কিছু জানিও না। আমাকে রাধানগরে পাঠিয়ে দিয়ে যা খুশি কর তোমরা।

বিলাসবাসিনীর কণ্ঠ যেন বাষ্পরুদ্ধ। কি কথা শুনছেন তিনি! এক অশ্রুতপূর্ব্ব কথা! মন যেন তাঁর আঁকুপাঁকু করতে থাকে।

—রাধানগরে যাবে কি মা ? সেখানে কি মানুষ থাকতে পারে ? সে যে এক পাণ্ডববর্জিত স্থান !

—আমার রাধাশ্যাম সেখানে আছেন, আর আমি থাকতে পারবো না ? কাশীশঙ্কর, তুমি আমাকে কিছু শুনিও না ! আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি, তুমি দীর্ঘজীবী হও, সুখে থাকো।

—রাজমাতা, আমার প্রতি কি তুমি বিরূপ হয়েছো ?

আকুল আগ্রহের সঙ্গে বললেন কাশীশঙ্কর। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন। পায়ের পরে পা দিয়ে আসনপিঁড়ি হয়ে বসলেন।

রাজমাতার কুঠরীর দোরগোড়ায় যেন কার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ! গ্রীষ্মদিনের নিস্তব্ধ দুপুরের নীরবতায় মনে হয় বুঝি সর্পের ফোঁসফাঁসানি !

—বিরূপ আমি কারু প্রতি হইনি। তবে জন্মাবধি যাকে বুক বেঁধে মানুষ করেছি সে যদি আমার শেষ বয়সে—

কথা বলতে বলতে বিলাসবাসিনীর আঁখিপ্রান্ত চিক-চিক করে। অধর-ওষ্ঠ কাঁপতে থাকে ক্ষোভের আতিশয্যে। কুঠরীর আড়কাঠে দৃষ্টি তুলে বসে থাকেন তিনি নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে, স্থাণুর মত।

কাশীশঙ্কর চিন্তাগ্রস্ত হন বড় বেশী। দু'হাতে মাথার ভর রেখে বসে থাকেন নিশ্চুপ। বিলাসবাসিনীর কুঠরীর আলো-অন্ধকারে রাজকুমারের দুই হাতের অঙ্গুরীয়গুলি রঙ বিকীরণ করে। জ্বল-জ্বল করে হীরা-মুক্তা-মাণিক্য। ধীরে ধীরে মুখ তোলেন ছোটকুমার। গাত্রোত্থানের সঙ্গে সঙ্গে বলেন,—আমার এই কাজে তুমি কি মনে এমন ব্যথা পাবে আগে কি জানতাম ? তবে তো আমি নিরুপায় ! কিংকর্ত্তব্য এখন আমার ?

নিজেকে যেন নিজেই প্রশ্ন করলেন কাশীশঙ্কর। শেষ কথাগুলি যেন জিজ্ঞাসা করলেন নিজেকেই।

কম্পমান কণ্ঠে রাজমাতা বললেন,—হ্যাঁ অথবা না, আমি মুখ দিয়ে উচ্চারণ করবো না। তোমরা ভাইয়ে ভাইয়ে ভিন্ন হবে, তা আমি দেখতে পারবো না !

কথা বলতে বলতে ক্ষণেক থেমে আবার বললেন,—এখন যাও, বেলা অনেক হয়েছে, স্নানাহার শেষ কর'গে যাও।

দোরগোড়ায় আবার কার ফোঁসফোঁসানি!

রাজগৃহের দুই বাস্তসর্প কি এসেছে এ দিক্‌পানে? তাদেরও কি আছে কোন বক্তব্য? রাজমাতার কাছে কোন নালিশ জানাতে আসেনি তো শাঁখ-শাঁখিনী?

—রাজমাতা, আমাকে ঘরে প্রবেশের অনুমতি দিন। আমার কিছু কথা বলবার আছে, নিবেদন করবো। অনুমতি দিন।

দরজার বাইরে অদৃশ্যে থেকে কে এক নারী কথা বলে, মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে।

—কে তুমি?

হঠাৎ কথা শুনে, এক আকুল নারীকণ্ঠ শুনেই চমকে উঠেছিলেন বিলাস-বাসিনী। নিজেকে সামলে নিয়ে বলেন,—কে গা তুমি?

—আমি, রাজমাতা! যদি আদেশ করেন তো ঘরে সিঁদোই।

—তুমি কে তাই শুনি?

বিলাসবাসিনীর বিরক্তিপূর্ণ কথায় ক্রোধের আভাস!

—আমি শিবানী।

নামটি শুনেই মুখখানি বিকৃত করলেন রাজমাতা। কেমন যেন বিব্রত বোধ করলেন। বললেন,—এখন তুমি যাও, পরে এসো। আমার ছেলে এখন ঘরে আছে, এখন বিদেয় হও।

কুঠরীর দ্বারে এক শুভ্র নারীমূর্ত্তির আবির্ভাব হয়।

আলুলায়িত রুক্ষ কেশের বোঝা তার পৃষ্ঠে। পরিধানে কোরা লালপাড় সুতিবস্ত্র। দণ্ডায়মানা ঐ নারীর অধরোষ্ঠে ক্ষীণ হাস্যরেখা। রাজমাতার মুখে বিদায় হয়ে যাওয়ার নির্দ্দেশ শুনে শাড়ীর আঁচলে চোখের প্রান্ত মুছলো ঐ দীর্ঘ এবং সুকেশা রমণী। তার ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা, তবুও চোখ দুটি যেন অশ্রুসজল। কয়েক মুহূর্ত্ত চুপচাপ থেকে ঐ শুভ্রকায়া নারী কথা বলে সুমিষ্ট সুরে। বললে,—রাজমাতা, তুমি যে বলেছিলে আমার বিয়ে দিয়ে দেবে, কবে হবে সেই বিয়ে? কার সঙ্গে দেবে?

—বিদেয় হ, বিদেয় হ, এখনই! ও মা, লাজলজ্জার বালাই নেই! আচ্ছা আটকপালে মেয়ে তো তুমি! বিয়ে কি হাতের মোয়া না কি?

বিলাসবাসিনী কথা বলেন রুক্ষকণ্ঠে। বিকৃত মুখভঙ্গী তাঁর। সহানুভূতি-হীন কথা।

—সীঁথিতে আমি সিঁদুর পরবো না, বলতে চাও? ফুলশয্যে হবে না আমার? কনে-বৌ সাজবো না আমি? অত্যন্ত ব্যথাতুর সুর শিবানীব কথায়। নালিশের মতই সকাতর আবেদন জানাচ্ছে যেন আদালতে।

শিবানীর কথাগুলি শুনে কাশীশঙ্করের মনে যেন দয়ার উদ্রেক হয়। দু' হাতে মাথা রেখে চিন্তাগ্রস্তের মত বসে থাকেন নীরবে। আনতদৃষ্টিতে।

বিলাসবাসিনী বললেন ক্ষুব্ধ ও রুষ্টকণ্ঠে,—শুনছো তো কাশীশঙ্কর? মেয়ের কি নির্লজ্জ কথা! কি বেহায়াপণা! পাগল আর সাধে বলে!

ছোটকুমার বললেন,—আমি আর কি বলতে পারি?

—এ জীবনে অনেক ন্যাকামি আমি দেখেছি কাশীশঙ্কর! এমনটি কখনও দেখিনি, কস্মিন্‌কালেও নয়। দূর কর' দূর কর' ওকে এখান থেকে দূর ক'রে দাও এই মুহূর্ত্তে!

রাজমাতা বললেন উদ্ধত সুরে। বিরক্তির চরমে পৌঁছেছেন তিনি যেন!

—বিদেয় আমি একেবারে হব। আমাকে রাধানগরে পাঠিয়ে দাও। সেখানে যেমন ছিলুম তেমনি থাকবো। রাধাশ্যামের মন্দিরে থাকবো সেবাদাসী হ'য়ে। আমি জানি, বিয়ে আমার হবে না, তোমাদের সমাজ বাধা দেবে।

কথাগুলি বলতে বলতে হাঁপিয়ে ওঠে বুঝি শিবানী। দ্বারের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল, কথায় কথায় কুঠরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করলো নির্ভয়ে। নিঃসঙ্কোচে। বিনা দ্বিধায়।

এ সকল কথা আশা করেননি বিলাসবাসিনী। ক্রোধের আতিশয্যে নির্ব্বাক্ হয়ে যান তিনি। শিবানীর প্রতি এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন।

কাশীশঙ্কর অনন্যোপায় হয়ে বললেন,—আমি এখন যাই—স্নানাহার করি, যাই।

—হ্যাঁ, তাই যাও। তুমি, তুমি এখানে আছো শুনেই আবাগীর বেটি এসেছে, তা কি তুমি বোঝ না কাশীশঙ্কর ? আমি সব বুঝি।

বিলাসবাসিনীর রুষ্ট কথায় অস্থিরতা প্রকাশ পায়। অসহ্য মনে হয় তাঁর। তিতিবিরক্ত হয়ে পড়েন যেন।

শিবানী কথা বলে দুঃখকাতর সুরে। যেন কাঁদছে! বললে,—আমি পাগল, আমার মাথার ঠিক নেই। বয়েস কালে বিয়ে না হলে কার আর মাথার ঠিক থাকে ? কথা বলতে বলতে থেমে আবার বললে,—রাজমাতা, তুমিই আমাকে আমার ছেলেবেলায় বলেছিলে যে তোমার ছোট রাজকুমারের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে, আমাকে ঘরের বৌ করবে। কথা রাখলে না তুমি। আমি এখন তোমার চক্ষুশূল হয়েছি, তা কি বুঝি না ?

লজ্জায় অধীর হয়ে উঠেন কাশীশঙ্কর। কানে আঙুল দেন। বলেন,—মা, আমি তবে যাই।

—যাচ্ছি নয়, আসছি বলতে হয়। বললেন বিলাসবাসিনী, সস্নেহে। বললেন,—ওকে এখন এখান থেকে যেতে বলে দাও কাশীশঙ্কর।

—মা, তোমার যা বক্তব্য তুমিই বল।

কথা বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন কাশীশঙ্কর। শিবানীকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেলেন কুঠরী থেকে। সলজ্জায়। দ্রুতপদে।

—মরছি আমি শতেক জ্বালায়! এ আবার কি কাটাঘায়ে নুণের ছিটে! রাজমাতা স্বগত করলেন। আপন মনেই বললেন কথাগুলি। বললেন,—বিয়ের আশা তুমি ত্যাগ কর শিবানী! পাগলকে কে বিয়ে করবে ? তুমি এখন যাও, আমি বিশ্রাম করবো এখন।

—আমার যা হয় একটা বিলি-ব্যবস্থা করে দিলেই আমি চলে যাই। শিবানী বললে দুঃখ-কাতর কণ্ঠে। চোখের জল মুছতে মুছতে।

যতই হোক বিলাসবাসিনী নারী। শিবানীর আবেদন-নিবেদনে মন যেন তাঁর ঈষৎ সিক্ত হয়। বেশ কিছুক্ষণ নীরবতা পালনের পর নিম্নসুরে বললেন,—জানিস শিবানী, যে যার কপাল নিয়ে আসে এই পিথিবীতে। তোর কপাল পুড়েছে,

আমি কি করতে পারি বল্ ? আমার কি সাধ হয় না তোর বিয়ে দিয়ে দিই ? তোর মতন রূপসী মেয়ের বিয়ে আমি দিতে পারিনি, এ দুঃখু রাখবার জায়গায় আমার নেই। তোর মাথাটা যদি ঠিক থাকতো শিবানী !

সজল চোখে শিবানী বললে,—মাথা আমার ঠিকই আছে রাজমাতা ! তোমার পায়ে ধরি। তুমি আজ আছো, চিরকাল তুমি থাকবে না। তখন কে দেখবে আমাকে ?

—ভগবান দেখবেন ! যিনি পাঠিয়েছেন পিথিবীতে, তিনিই দেখবেন।

এলো চুলের খোঁপা দু' হাতে জড়াতে জড়াতে বিষণ্নসুরে শিবানী বলে,— তাই বলে আমি সীঁথিতে সিঁদুর পরবো না ? শ্বশুর-ঘর করবো না ?

নিশ্চুপ থাকেন বিলাসবাসিনী।

কুঠরীর আড়কাঠে চোখ তুলে চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে বললেন,— লোকে যে শুনলে হাসবে শিবানী ! লাজলজ্জার বালাই নেই তোর ? মান-অপমানের ?

কেমন যেন শূন্যদৃষ্টি ফুটলো শিবানীর চোখে। বিকৃতমস্তিষ্কের মতই পলকহীন চোখে চেয়ে রইলো কতক্ষণ। এমন শূন্যদৃষ্টিতে কি দেখছে শিবানী ! দেখছে না হয়তো কিছুই, লক্ষ্যহীন চোখে তাকিয়ে আছে শুধু।

—খাওয়া-দাওয়া করেছিস্ শিবানী ?

হেসে ফেললো শিবানী। কাতর হাসি। মুখে হাসি মাখিয়ে বললে,—না, খাইনি। সকাল থেকে এখনও কিছু মুখে দিইনি। খেতে আর মন চায় না। একেবারে চিতায় শুয়ে খাবো।

—বালাই ষাট ! এমন কথা কি বলতে আছে ? বেশ তো আছিস তুই, মাঝে-মিশেলে এমন মাথা খারাপ কেন করিস যে বুঝি না !

কথা বলতে বলতে শুয়ে পড়লেন রাজমাতা বিলাসবাসিনী। নিজের শয্যায় এলিয়ে পড়লেন।

শিবানী বললে চাপা-কণ্ঠে,—আমি চলে যাবো রাজবাড়ী থেকে। তুমি রাজমাতা, আমাকে শুধু বলে দাও, কে আমার মা ? আমাকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দাও।

—ছিঃ শিবানী, ও সব কথা মুখে আনতে নেই। তোমার মাও নেই, বাবাও নেই, তাঁরা স্বর্গে গেছেন তোর জন্মের পরেই। আমাকে দিয়ে গেছেন তোকে, গড়ে-পিটে মানুষ করতে। রাজমাতা কথা বলেন ফিস-ফিস। চুপি চুপি। পাছে কেউ শুনতে পায় সেই ভয়ে ধীর কণ্ঠে বললেন।

মিটি-মিটি হাসলো শিবানী। অর্থহীন হাসি। ফ্যাল-ফ্যাল চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললে,—তুমি যে বলেছিলে, ছোট কুমারের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে, তার কি করলে? আমাকে মিথ্যে কথা—

—ছ্যাখ্ শিবানী, আমাকে আর জ্বালাসনে! ঈষৎ ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললেন বিলাসবাসিনী। বললেন,—আকাশের চাঁদ চাইলেই কি পাওয়া যায়? আমার কাশী সে-ছেলে নয় যে গণ্ডায় গণ্ডায় বিয়ে করতে যাবে!

—তবে তুমি আমাকে রাধানগরে পাঠিয়ে দাও, তোমার দুই পায়ে আমি গড় করছি। সেখানে আমি বেশ থাকবো তোমাদের রাধাশ্যামের মন্দিরের সেবাদাসী হয়ে। ছোটরাজাকে দেখলে যে আমার বুকে কষ্ট হয়, জ্বালা ধরে। কথায় কথায় শিবানীর বুকের জ্বালা যেন তার মুখাবয়বে প্রতিফলিত হয়!

বিলাসবাসিনী বলেন,—আমার কাশীর জন্যে তোর যদি এতই কষ্ট, তবে তার পানে দৃষ্টি দিস কেন? এখন যা খাওয়া-দাওয়া কর্‌গে যা।

—খেতে আমার মন চায় না। ক্ষুধা মরে গেছে, মুখে কিছু রোচে না!

—তবে মর্‌গে যা। আমি আর পারি না। বাতের যন্ত্রণায় আমার পিঠ-কোমর টন-টন করছে। রাজমাতা কথা শেষ করে দেখলেন কথা শোনার মানুষ চলে গেছে। কুঠরীতে তিনি এখন একা। উদাস-চোখে বসে থাকেন তিনি। চিন্তা-জ্বরে কাহিল তাঁর চাউনি!

/

কুঠরীর বাইরের দরদালানে ছিলেন বড়রাণী। রাজাবাহাদুরের প্রধানা মহিষী উমারাণী। পলকহীন চোখে দেখছিলেন আকাশ আর দূরের দৃশ্য—

যেখানে শুধু ঘন সবুজের বন্যা। দ্বিপ্রহরের শুভ্র আকাশ। দূরে, শুধু গাছ আর গাছ—মাটির বক্ষ ভেদি মহাশূন্যে মাথা তুলেছে। কত রকমের, কত ধরণের ছোট-বড় গাছ। খেজুর, তেঁতুল, পলাশ, বাবলা, পালতেমাদার, শিমুল, পিপুল, শিশু, তাল, নারকেল আর বাঁশঝাড়। উমারাণীর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল প্রকৃতির খেয়ালে, কিন্তু মন তাঁর প্রকৃতির পিছু-পিছু ধাওয়া করেনি! সজাগ কানে শুনছিলেন শিবানীর কথাবার্তা। কি বলতে চায় সে রাজমাতাকে!

—বড়রাণী!

—কে?

ডাক শুনে চমকে ওঠেন যেন উমারাণী! প্রকৃতি থেকে চোখ ফিরিয়ে যেন প্রকৃতিস্থা হন নিজে। মিহি ও মিষ্টি সুরে বলেন,—ডাকছো শিবানী? বল, কি বলবে?

—বলবার কিছু নেই। তোমাকে দেখছি, তুমি কত রূপবতী। হাসতে হাসতে বললে শিবানী।

উমারাণীও হাসলেন। শব্দহীন, মৃদুমন্দ, মুক্তা-ঝরানো হাসি! ডালিম-রাঙা ঠোঁটের ফাঁক থেকে চোখে পড়ে মুক্তার মত দাঁতের সারি! মৃগনয়না উমারাণীর চোখে কি অন্তরস্পর্শী দৃষ্টি!

—তোর কত কষ্ট শিবানী! সহানুভূতির সুরে বলেন রাজরাণী।—তোর দুঃখের কথা যেন কানে শোনা যায় না! তা তুই আমাকে দেখছিস, তুইও বা কম কি?

হাসলো শিবানী। দুঃখের হাসি হাসলো উদাস চোখে! বললে,—আমি আবার সুন্দর, তার আবার রূপ! শুনলে তো বড়রাণী, বাইরে থেকে রাজমায়ের কথা তুমি শুনলে তো?

—হ্যাঁ, শুনেছি বৈ কি। সব শুনেছি। কথা বলতে বলতে ক্ষণিকের জন্য থামলেন উমারাণী। বৈশাখের এলোমেলো হাওয়ায় উড়ন্ত আঁচল টেনে ত্রস্তে বুকের বসন ঠিকঠাক করলেন। বললেন,—কিন্তু, আমি কি করতে পারি বল?

—তুমি আর কি করবে বড়রাণী! তুমি আর কি করতে পারো? কাঁপা-কাঁপা গলায় শিবানী বলে যায়। —ভগবানও হয়তো কিছু করতে পারবেন না। আমি চলে যাব রাজবাড়ী থেকে, এখানে আর থাকবো না।

অসীম আগ্রহের সঙ্গে উমারাণী শুধোলেন,—কোথায় যাবি শিবানী? কে তোকে ঠাঁই দেবে? এত চঞ্চল হ'স কেন?

—রাধাশ্যাম ঠাঁই দেবে, আর কে দেবে! যিনি সর্ব্বহারার ত্রানকর্ত্তা সেই বিষ্ণু দেবেন। পরম বিজ্ঞের মত বললে শিবানী। বলতে বলতে ছল-ছল দুই চক্ষু নিমীলিত করলো, অদৃষ্ট কোন্ দেবতাকে স্মরণ করলো কিনা কে জানে! বললে,—চলে যাবো তোমাদের রাধানগরে, রাধাশ্যামের বিগ্রহের সেবাদাসীর কাজ করবো। বেশ থাকবো আমি।

রাধানগরে আছে রাধাশ্যামের বিগ্রহ। নিরেট স্বর্ণমূর্ত্তি। যুগলমূর্ত্তি।

উমারাণীর চোখ দুটিও সিক্ত হয়। লালপদ্মে শিশির বিন্দুর মত দু' ফোঁটা জল দু' চোখে টলমল করে। বলেন,—না রে শিবানী, তুই যাস্‌নে। আমি জানি সেবাদাসীদের কত কষ্ট, মানুষ হয়েও তারা মানুষের মত থাকতে পায় না। বড্ড কড়াকড়ি!

—তা হোক বড়রাণী। কাঁপা-কাঁপা কণ্ঠ শিবানীর। বলে,—কষ্টভোগ না করলে তো বিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মে ঠাঁই মিলবে না। সুখভোগ যে আমার পোড়াকপালে নেই।

—তাই বলে তুই সন্ন্যাসিনী হয়ে যাবি?

ঈষৎ বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন রাজমহিষী। কথার শেষে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। গভীর দীর্ঘশ্বাস।

—হ্যাঁ। উপায় কি আর বল বড়রাণী! কথা বলতে বলতে ক্ষণেক থেমে আবার বলে,—অন্যায় নয়? তুমিই বল না। শিশুকাল থেকে শুনে আসছি যে, ছোট রাজকুমারের সঙ্গে আমার বিয়ে হবে, আমি রাজবাড়ীর বৌ হব। কোথা থেকে কি হয়ে গেল! কিন্তু আমি যে তাঁকে ছাড়া আর কাকেও জানি না, চিনি না। তাঁকেই যে আমি আমার—

কথা বলতে বলতে কাকে দেখলো শিবানী। কথা থামালো সহসা। কাকে দেখলো সে। লজ্জা ও সঙ্কোচের আধিক্যে পলকের মধ্যে শিবানীর মুখাকৃতি আরও স্তব্ধ ও ম্লান হয়ে যায়। দৃষ্টি স্থির হয়ে থাকে।

উমারাণী সলজ্জায় ঈষৎ গুণ্ঠন টানলেন। বড়রাণীর পশ্চাদ্ভাগ থেকে অনিমেষ চক্ষুতে দৃষ্টিপাত করে শিবানী—যেন এক অভাবনীয়ের দর্শন পেয়ে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে থাকে সে।

—বধূরাণী, তুমি কি কিছু অবগত আছো?

কাশীশঙ্করের ব্যগ্র কণ্ঠ। আবার কোথা থেকে ফিরে আসেন ছোটকুমার। সশব্দ পদক্ষেপে। ব্যগ্রব্যাকুল দৃষ্টি কাশীশঙ্করের সুদীর্ঘ চক্ষে। অধিক চাঞ্চল্যে কিঞ্চিৎ অস্থিরচিত্ত। উদ্বিগ্ন ও উত্তেজিত।

রাজমহিষীর শুষ্ক কণ্ঠনালী। মুখে কথা ফোটে না সহসা। দেবরের প্রশ্নে যেন বিস্ময়ের ঘোর নামে রাণীর মনে। নিজেকে সম্বরণ করেন অতি কষ্টে। অস্পষ্ট কণ্ঠে উমারাণী বললেন,—কি অবগত আছি আমি?

কাশীশঙ্কর ততক্ষণে কাছাকাছি পৌঁছেছেন। উদ্বেগ ও উত্তেজনায় চাঞ্চল্য প্রকাশ পায় তাঁর চলনে-বলনে। বলিষ্ঠ আকৃতি তাঁর, পেশীবহুল শরীর। ক্রোধ না আবেগে দেহ বুঝি তাঁর স্ফীত হতে থাকে ক্রমেই ক্রুদ্ধ স্বরে তিনি বললেন,—জগমোহন লেঠেলটাকে সপ্তগ্রামে কে পাঠালে?

—আমি তো জানি না ছোটরাজা! আমাকে আপনার এ প্রশ্ন কেন? উমারাণী বললেন অবিচলিতের মত।

—তবে কি মাতৃদেবীর আদেশে জগমোহন গেছে?

ফিরতি প্রশ্ন করেন কাশীশঙ্কর। ক্রোধ না আবেগের আতিশয্যে কাঁপতে থাকেন যেন। আকাশে দ্বিপ্রাহরিক উজ্জ্বল দিনমণি। প্রখর তাপে মাঠ-ঘাট দগ্ধ হয়ে যায় দিকে দিকে! গ্রীষ্মের আধিক্যে কাশীশঙ্করের ঘর্মাক্ত মুখমণ্ডল। কপালে স্বেদবিন্দু। শ্বেতচন্দনের ন্যায় শুভ্রকান্তি, ক্ষোভ না ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করেছে যেন।

সাবগুণ্ঠনে নম্রমুখী হন রাজরাণী। ধীরে ধীরে বললেন,—রাজমাতা কখন কাকে কি আদেশ করেন, আমাকে ব্যক্ত করেন না। আমি কিছুই জানি না।

উদাত্ত কণ্ঠে কাশীশঙ্কর বললেন,—মান-মর্য্যাদা লজ্জা-সম্ভ্রম কিছুই থাকে না যে দেখি! জগমোহনের সাধ্য কি যে কৃষ্ণরামের গৃহে প্রবেশের অনুমতি পায়? বিন্ধ্যবাসিনীর খবরাখবর সে কোথা থেকে সংগ্রহ করবে তাও জানি না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে কি মাতৃদেবীর বুদ্ধিভ্রংশ হতে চলেছে?

—ছোটরাজা, আমি কিছুই জানি না।

উমারাণীর টুকরো টুকরো কথা। যেন সঙ্গীতের ঝঙ্কার।

রাজমাতা বিলাসবাসিনীর কুঠরীর দিকে অগ্রসর হলেন কাশীশঙ্কর। সশব্দ পদক্ষেপে। কোথা থেকে শুনেছেন কাশীশঙ্কর! কে যেন তাঁর কানে তুলে দিয়েছে কথাটি। লাঠিয়াল জগমোহন রাজপ্রাসাদের বিনা অনুমতিতে, কেবল মাত্র রাজ-অন্দরের মেয়েলী আদেশে সপ্তগ্রাম যাত্রা করেছে বিন্ধ্যবাসিনীর প্রকৃত সমাচার সংগ্রহার্থে। জমিদার কৃষ্ণরাম যে প্রকৃতির মানুষ, তাতে ভয় ও আশঙ্কা হয়—বিনাবিচার ও বিবেচনায় হয়তো বিন্ধ্যবাসিনীর অত্যাচারের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। বিতাড়িত কুকুরের মত কি না কে জানে, ফিরতে হবে হয়তো ঐ জগমোহনকে।

রাজমাতার কুঠরীর দ্বারে কাশীশঙ্কর বিলীয়মান! গম্ভীরকণ্ঠে কি যেন বলতে বলতে চলেছেন, দীর্ঘ পদক্ষেপে! কাশীশঙ্কর বলছেন,—জগমোহন আসুক, তাকে আমি গারদে চালান করবো? ব্যাটা বেল্লিক বদমায়েস বেয়াদবকে বন্দী করবো আমি!

কাছাকাছি কোথাও যেন গুরু-গুরু মেঘগর্জ্জন হয়, এমনই ক্রোধগভীর কাশীশঙ্করের কণ্ঠস্বর! কথার শেষে তিনি কটিদেশের ঝুলন্ত অস্ত্র স্পর্শ করলেন বজ্রমুষ্টিতে।

পাষাণীর মত অচঞ্চল যেন শিবানী। পলকহীন দৃষ্টি! বিমুগ্ধা শিবানীকে উদ্দেশ করে রাজমহিষী সহসা সহাস্যে বললেন,—দর্শন পেয়ে চক্ষু সার্থক হয়েছে তো?

—কি যে বল বড়রাণী! আমার কি অধিকার? তার চেয়ে চল, এ স্থান ত্যাগ করাই ভাল। কাতরস্বরে কথা বলে শিবানী, কেমন সিক্তকণ্ঠে। বললে,—খুনোখুনি না হয়, আমার তো সেই ভয় হয়! জগমোহন ভালয় ভালয় ফিরে আসে তবেই মঙ্গল!

কথা বলতে বলতে দু'জনে চললেন সন্ত্রস্তের মত। রাজমহিষীর মুখের হাসি মিলায় না। তিনি বলেন,—শিবানী, দেখলি তো মনের সুখে? দেখে খুশী হয়েছিস তো?

—কি যে বল তুমি! বললে শিবানী। উদাস সুরে বললে,—চোখ দুটিকে উপড়ানো যায় না, তাই তো দেখতে হয়!

আবার হাসলেন বড়রাণী! শব্দহীন হাসি হাসলেন! হাসতে হাসতে বললেন,—চোখ উপড়ালে কি হবে? মানস-চক্ষু আছে না?

ক্ষীণ হাস্যরেখা শিবানীর মুখের কোথায়! হাসি চাপতে প্রয়াসী হয় সে! বলে,—বড়রাজার আহার হয়েছে? খুব তো নিশ্চিন্তায় আমাকে দংশানো হচ্ছে!

হঠাৎ যেন মনে পড়লো! মুখের হাসি মিলিয়ে গেল উমারাণীর! চোখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে আকাশ দেখলেন। বৈশাখের খটখটে রূপালী আকাশ! শুভ্র মেঘের পাল তুলে সপ্তডিঙা চলেছে যেন আকাশে! উত্তপ্ত রৌদ্রকিরণে দিগঞ্চল ধিকি-ধিকি কাঁপছে বুঝি।

স্তিমিতকণ্ঠে উমারাণী বললেন,—রাজাবাহাদুর আজ এখনও অন্দরে আসেন না কেন কে জানে?

পরস্পর পরস্পরের প্রতি সন্দিহান চোখে দেখেন! রাজমহিষীর কথায় যেন দুশ্চিন্তার আভাষ পাওয়া যায়! নিম্নস্বরে বললে শিবানী,—হয়তো রঙ্গলীলায় মত্ত এখন তিনি!

বিষের জ্বালা ধরে যেন রাজরাণীর বক্ষ-মাঝে। শিবানীর অনুমান সত্য হলেও হতে পারে, তবুও রাজমহিষীকে যেন উন্মনা দেখায়। কালবৈশাখীর কালো-মেঘ নামে যেন তাঁর মুখাবয়বে। দালানের পর দালান পেরিয়ে নিজের মহলের দিকে এগিয়ে চলেন উমারাণী।

—জগমোহনকে আমি বন্দী করবো !

কথাটি ঠিক কাণে পৌঁছেছে। ভাবনার আলোড়নেও থেকে থেকে কাশীশঙ্করের সক্রোধ উক্তি বাজে যেন কাণে কাণে। বন্দী করার পণ শুনে চমকে শিউরে ওঠেন রাজমহিষী। স্মৃতিপটে দেখতে পান, রাজগৃহের গারদখানা। লোহার গরাদের তমসাচ্ছন্ন খাঁচা একেকটি, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। কেবল মাত্র আগ্রহ ও কৌতুহলের বশবর্ত্তী হয়ে কত দিন উমারাণী দেখেছেন গারদঘর —উপরতলার জাফরির ঝিলিমিলির অন্তরালে থেকে দেখেছেন স্বচক্ষে। দেখতে দেখতে অন্তরাত্মা আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। উমারাণী নিজে দেখেছেন, কয়েদী ঘানি টানছে চক্রাকারে পাক দিতে দিতে। ঘানির বিশ্রী কর্কশ ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ কাণে শুনেছেন। স্বকর্ণে। দেখেছেন সরষের তেলের ঘানিতে বলদের কাজ করছে কয়েদী। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে এক নাগাড়ে সরষে পিষছে। তৈল নিষ্কাশন করছে তিলে তিলে। কিম্বা গম ভাঙছে পাথরের জাঁতায়।

ওদিকে রাজমাতার কুঠরীতে কি বাক্‌যুদ্ধ চলেছে! কে জানে! দালানের পর দালান পেরিয়ে চলেছিলেন বড়রাণী। বিষণ্ণ সুরে তিনি বললেন,—শিবানী, রাজমহলে যেতে হচ্ছে ভাই আমাকে। রাজাবাহাদুরের আহারের সময় উত্তীর্ণ হতে চলেছে।

শিবানী হাসলো মৃদু মৃদু। কষ্টের ক্ষীণ শুষ্কহাসি। বললে,—বৌরাণী, আমাকে তুমি বিষ জোগাড় করে দাও। খেয়ে আমি সকল জ্বালা জুড়াই।

—বিষ ?

—হ্যাঁ বিষ ! যা খেলে মানুষের ঘুম আর ভাঙে না।

ধমকে উঠলেন উমারাণী। বললেন,—ছিঃ শিবানী, অমন কথা মুখে আনে না। আত্মহত্যা যে পাপ !

আবার হাসলো শিবানী। রুখু চুলের চূর্ণকুন্তল কপাল থেকে সরিয়ে দিতে দিতে শুষ্কহাসি হাসলো। বললে,—বৌরাণী, তোমাদের জগমোহনকে কে কোথায় পাঠালে ? ছোট রাজকুমারের এত রাগ কেন ?

ফিস-ফিস কথা বলেন রাজমহিষী। ইদিক-সিদিক দেখে ফিস-ফিস বললেন,—মা তাকে পাঠিয়েছেন সাতগাঁয়ে, ননদিনী বিন্ধ্যবাসিনীর ভাল-মন্দ জানতে পাঠিয়েছেন।

চোখ বড় ক'রলো শিবানী। শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে থাকলো কতক্ষণ। চিন্তার সূত্র যেন ছিঁড়ে যায়, খেই হারিয়ে ফেলে মনের গতির—শিবানী পাষাণমূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে থাকে। নিষ্পলক চোখে দেখে, গমনোদ্যতা রাজমহিষীকে।

এক দালানের শেষ প্রান্তে পৌঁছে শিবানীকে একা ফেলে রেখে কেমন যেন আনমনার মত উমারাণী চললেন রাজমহলের পথে। তাঁর হাতের অলঙ্কার, চুড়, কঙ্কণ না বলয়ের কিঙ্কিণী শোনা যায়। চরণচাঁদের রিণিঝিনি ভাসে দালানের বাতাসে।

ওদিকে রাজমাতার কুঠরীতে কি মাতা-পুত্রে বাক্‌বিতণ্ডা চলেছে! কথা-কাটাকাটি! দেবর কাশীশঙ্করের চণ্ডমূর্ত্তি দেখে কেমন যেন ভয় ভয় করছে বড়রাণীর। কি উগ্র মূর্ত্তি! ক্রোধেরই বা কি অভিব্যক্তি! রাজাবাহাদুরই বা কোথায় এখন! দরবার কি তবে এখনও শেষ হয়নি আজ?

দরবার শেষ হয়ে গেছে কোন্ কালে। দরবারে যদি রাজা না থাকেন, কে চালাবে দরবার? গদীতে যদি রাজা না বসেন, দরবার করবে কে! রাজাবাহাদুর তখনও বালাখানায়, টানা-পাখার হাওয়ায় আর নেশায় সমাচ্ছন্ন হয়ে আছেন। পাশে দাঁড়িয়ে খানসামা গোলাপপাশ থেকে গোলাপজল ছড়ায় কালীশঙ্করের শিরে। খিড়কিদার পাগড়ী খুলে ফেলেছেন রাজা, গ্রীষ্মাধিক্যে। পাশে প'ড়ে আছে পাগড়ী, বালাখানার সতরঞ্চি-ফরাসে পাগড়ীর রত্নময় শির-প্যাঁচ বালাখানার অসংখ্য মোমবাতির আলোয় ঝলমল করছে। রাজাবাহাদুরের কর্ণ-কুহরে তখনও সুর-বাহারের সুর—রাগ মল্লার। ওস্তাদ, মিঞা মহম্মদ আজিমুল্লা খাঁ সুর শুনিয়েছে রাজাকে, মন্ত্র শুনিয়ে মুগ্ধ করেছে যেন। চৌদ্দ-তারের তার-যন্ত্র সুরবাহার—আজিমুল্লার অঙ্গুলি সঙ্কেতে কী মধুর ঝঙ্কারই না তোলে!

দেওয়ানজীর সাহসে কুলায় না। রাজাবাহাদুরকে বার বার ডাকতে পারেন না কোন মতেই। এমন সময় সহসা পুনরায় চক্ষু উন্মীলিত করলেন কালীশঙ্কর! বালাখানার সর্ব্বত্র দৃষ্টি ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। এলানো দেহ তুলে সোজা বসলেন ধীরে ধীরে! দেওয়ানজী ছিলেন বালাখানার দ্বারে। রাজার সঙ্গে চোখাচোখি হ'তেই নকল হাসি হাসলেন সামান্য।

কালীশঙ্কর জড়িতকণ্ঠে বললেন,—মাতৃদেবী কি উপবাস ভঙ্গ ক'রেছেন?

দেওয়ানজী হঁ্যা না কিছুই বলেন না। চোখে জিজ্ঞাসা ফুটিয়ে যেমনকার তেমনই দাঁড়িয়ে থাকেন। রাজা-বাহাদুরের খানসামা জবাব দেয়। বলে,—হঁ্যা হুজুর, রাণীমার খানা হয়েছে। অন্দর থেকে ব'লে গেছে। হুজুর ঘুমিয়ে ছিলেন, তাই আর—

নিশ্চিন্ত হ'লেন যেন কালীশঙ্কর এতক্ষণে! বললেন,—দেওয়ানজী, আমি এখন দরবার ত্যাগ করছি। যদি কোন জরুরী কাজ থাকে তো বলেন কাগজে-পত্রে সই করবার থাকে তো দেন, কাজ মিটাই।

দেওয়ান ব্যস্ত হয়ে বললেন,—মুনসীখানার আমলাদের জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে হুজুরকে এখনই জানাই, যদি কোন গুরুতর কাজ বকেয়া থেকে যায়!

দরবারের একদিকে মুনসীখানা। রাজ-বেদীর বাম দিকের মেঝেয় চাটাই পাতা! চাটাইয়ের পরে সতরঞ্চ ও চাদর বিছানো মুনসীখানা। আমলারা ব্যতীত অন্য কেউ নেই মুনসীখানায়। আমলারা খাতা লিখছে। তুলট কাগজের খাতায় খাগের কলমে লেখালেখি করছে।

দেওয়ান ফিরে আসেন বালাখানায়। কৃত্রিম হাসির সঙ্গে বলেন,—রাজাবাহাদুর, তেমন কোন জরুরী কাজ নেই। বাকী কাজ, সই লেখা, আগামী কাল হ'লেও চলবে। আপনি গাত্রোত্থান করেন, আহারের সময় অতিক্রান্ত হয়ে যায়।

—সুখাসন কোথায় আমার? কেমন যেন আচ্ছন্নের মত প্রশ্ন করলেন কালীশঙ্কর। বললেন,—বাহকগণই বা কোথায়?

দেওয়ানজী বলেন,—সবই প্রস্তুত আছে রাজাবাহাদুর! শুধু হুজুরের হুকুমের অপেক্ষায় আছে!

কালীশঙ্করের কপালে কেন কে জানে কুঞ্চিতরেখা ফুটলো। কাণ পেতে কি যেন শুনলেন তিনি, সাগ্রহে! কোন্ এক অতি পরিচিতের কণ্ঠধ্বনি শুনলেন কি! বললেন,—সহোদর কাশীশঙ্করের কণ্ঠ শুনি কি?

ছোটকুমার কাশীশঙ্করের মেঘ-গম্ভীর কণ্ঠস্বর। কি এক বিশেষ প্রয়োজনে তিনি পুনরায় দরবারের আসেন! ঝড়ের মত, হাওয়ার বেগে আসেন যেন! দরবারে দ্বারে পৌঁছে ডাকেন সরবে,—দেওয়ানজী, দেওয়ানজী! রাজাবাহাদুর কোথায় আছেন?

বালাখানায় দেওয়ান। ভয়ে যেন সিঁটিয়ে উঠলেন উদাত্ত আহ্বান শুনে! স্বগত করলেন,—আবার যে ছোটরাজকুমার ডাক দেন শুনি!

মুহূর্ত্তের মধ্যে বালাখানার দ্বারে দেখা যায় মূর্ত্তিমান কাশীশঙ্করকে! দুর্দ্দান্ত বেগে তিনি আসছেন, দীর্ঘ পদক্ষেপে! বালাখানার অভ্যন্তরে পৌঁছে বললেন,—রাজাবাহাদুর! মাতৃদেবীর জন্য যে আমাদের মাথা নত হতে চলেছে! তিনি লেঠেল জগমোহনকে তোমার আমার অজ্ঞাতে সপ্তগ্রামে পাঠিয়েছেন!

—সে কি কথা!

রাজাবাহাদুর প্রকৃতিস্থ হন যেন ছোটকুমারের কথায়। বলেন,—সে কি কথা! কেষ্টরাম অবশ্যই আরও অধিক রুষ্ট হবে। কেষ্টরাম জানবে যে, আমরাই হয়তো তাকে অসম্মান করতে পাঠিয়েছি জগমোহনকে। কুটুম্বের গৃহে কি ভৃত্যকে পাঠায় কেউ?

—জগমোহনেরই বা কি দুঃসাহস! কাশীশঙ্কর কথা বলেন, যেন সিংহের গর্জ্জন। বালাখানার চন্দ্রাতপে তাঁর কথার প্রতিধ্বনি ভাসতে থাকে। তিনি বলেন,—জগমোহন আসুক, আমি তাকে বন্দী করবো, তুমি যেন বাধা দিও না। নচেৎ এই তরবারির সাহায্যে তাকে আমিই দ্বিখণ্ডিত করবো।

কথা বলতে বলতে ক্রুদ্ধ কাশীশঙ্কর কটিদেশের ঝুলানো অস্ত্র স্পর্শ করলেন!

কনিষ্ঠ সহোদরের পৃষ্ঠে হাত রাখলেন রাজাবাহাদুর! কোন ক্রমে উঠে দণ্ডায়মান হন তিনি। পদদ্বয় কাঁপতে থাকে হয়তো। বললেন, সস্নেহে

বললেন,—উত্তেজিত হও কেন? জগমোহনকে আমিই শাস্তি দেবো। মাতৃদেবীই বা কেন যে এত উতলা হন! কেষ্টরাম যে কোন প্রকৃতির মানুষ তা কি তিনি অবগত নন? ঐ জগমোহনকে কেষ্টরাম কখনও আমল দেয়? সামান্য একটা লেঠেলকে! তার গৃহে প্রবেশের অনুমতি পাবে কোথায় জগমোহন? কেষ্টরাম নিশ্চয়ই অপমান করবে, বিতাড়িত করবে জগমোহনকে!

স্তব্ধ গম্ভীর কণ্ঠে কাশীশঙ্কর বলেন,—এই কারণে সহোদরা বিন্ধ্যবাসিনীকেও হয়তো কত অত্যাচার সহ্য করতে হবে কে জানে!

—যথার্থ ই বলেছো। বিন্ধ্যবাসিনীও বাদ যাবে না!

কথা বলতে বলতে রাজাবাহাদুর বালাখানা ত্যাগ করতে উদ্যোগী হন। কথায় যেন তাঁর নিশ্চয়তার সুর। আক্ষেপের আবেগ। বালাখানার দ্বারে এগিয়ে ক্ষণেক দাঁড়ালেন। বললেন,—তুমি অধৈর্য্য হও কেন? যাও, স্নানাহার কর বেলা আর নাই। আমিও যাই।

অগত্যা কাশীশঙ্করকে শান্ত হ'তে হয়। জ্যেষ্ঠ সহোদরের অনুগামী হন তিনি। সমগ্র মুখে তাঁর ক্রোধ এবং দুশ্চিন্তার কালো ছায়া নামে। বুকের পরে দুই হাতের আলিঙ্গন। আনতদৃষ্টি। চলতে চলতে তিনি বললেন,—আমি কেবল বিন্ধ্যবাসিনীর জন্য ব্যস্ত হই। না জানি কত কষ্টেই না সে দিনযাপন করে!

গড় মান্দারণের আকাশের মধ্যস্থলে সূর্য্যের গতি যেন চিরদিনের মত থেমে গেছে। যেদিকে দৃষ্টি যায় শুধু জনহীন, সীমাহীন প্রান্তর। কোথাও কোথাও গাছ-গাছড়ার বনজঙ্গল। তিন্তিড়ী ও মাধবীলতার ঘন আবেষ্টনে হেথায় সেথায় কুঞ্জবনের সৃষ্টি হয়েছে। কুঞ্জের অভ্যন্তরে লতাবৃক্ষের শাখা-প্রশাখায় জড়িয়ে আছে অসংখ্য বিষধর ভুজঙ্গ। বনজঙ্গলে দিবালোকে লুকিয়ে আছে চিতাবাঘের দল। বর্ত্তমানে মান্দারণ একটি ক্ষুদ্র গ্রাম, কিন্তু পূর্ব্বে এই স্থানে

নাকি এক সৌষ্ঠবশালী নগর ছিল। মান্দারণে পুরাকালে কয়েকটি প্রাচীন দুর্গ ছিল; যেজন্য গ্রামের নাম গড়মান্দারণ।

মান্দারণের মধ্য দিয়ে স্রোতস্বিনী আমোদর নদী প্রবাহিত হয়ে চলেছে, কুলু কুলু রবে। নদীর গতি কোথাও সরল, কোথাও বা বক্র। নদী যেখানে বক্রাকারে প্রবহমান, সেখানে খণ্ড খণ্ড ত্রিকোণ ভূমি তীরদেশে 'বিরাজ করে। এমনই এক ত্রিকোণ ভূমিতে জমিদার কৃষ্ণরামের এক পরিত্যক্ত অট্টালিকা আছে। কালের গ্রাসে জীর্ণ ও ভগ্নপ্রায় অট্টালিকার আমূলশিরঃ প্রস্তরে নির্ম্মিত। অট্টালিকার নিম্নভাগ আমোদরের জলে সদাক্ষণ ধৌত হয়। সম্মুখভাগে সিংহদ্বার। সেখানে বন্দুকধারী পাহারাদার—জমিদার কৃষ্ণরামের নির্দ্দিষ্ট ও বিশ্বস্ত এক পাঠান মুসলমান—মর্ম্মরমূর্ত্তির মত সর্ব্বদাই দণ্ডায়মান আছে। সিংহদ্বারের ফাটল দেখা যায়। বট আর অশ্বত্থের চারা ফাটলের স্থানে স্থানে। আপাতদৃষ্টিতে অট্টালিকা মানুষহীন মনে হয়। কিন্তু—

কিন্তু অট্টালিকার যে ভাগে গৃহমূল বিধৌত ক'রে আমোদর নদী কুলু কুলু রবে বহে চলে, সেই অংশের এক কক্ষ-বাতায়নে ব'সে বিন্ধ্যবাসিনী জলাবর্ত্ত নিরীক্ষণ করেন প্রহরের পর প্রহর। মধ্যাহ্নকাল অতীত হ'তে চলে তবুও খেয়াল নেই বিন্ধ্যবাসিনীর। আমোদর-স্পর্শে শীতল নৈদাঘ বাতাসে বিন্ধ্যবাসিনীর অলককুন্তল ও পট্টবস্ত্রাঞ্চল কাঁপতে থাকে। প্রথম দর্শনে মনে হয়, বুঝি এক সন্ন্যাসিনী, কঠোরব্রত উদ্‌যাপনের জন্য একাকিনী হয়ে আছেন। বি[illegible] মুখাবয়বে বালিকাভাব। আয়ত দুই চোখে শুধুই সরলতা। দেহের পশ্চাদ্ভাগে অন্ধকারময় কেশরাশি নিতম্ব স্পর্শ করেছে। বিন্ধ্যবাসিনী কখনও দৃষ্টি প্রসারিত করেন, দেখেন আমোদরের জলাবর্ত্ত। জলের ঘূর্ণী। কখনও বা শুভ্র পট্টবস্ত্রের ঘন লাল-পাড় অঞ্চল হাতের আঙুলে জড়াতে থাকেন। নির্ব্বাসিতা রাজকন্যার নিরাভরণ গাত্র। নিয়মরক্ষার জন্য দুই হাতে শঙ্খবলয়। সীমন্তে অস্পষ্ট সিঁদুররেখা। সধবা নারীর দুই লক্ষণ মাত্র বজায় রেখেছেন রাজকুমারী।

অট্টালিকায় আরও এক নারী আছে। সে পরিচারিকা, জনৈক ব্রাহ্মণ-

কন্যা। তার নাম যশোদা। নির্দ্দোষ জমিদার-পত্নীর নির্ব্বাসনের দুঃখে সেও বিগলিতচিত্ত। মনে তার সুখ নেই।

মান্দারণের মধ্যগগনে সূর্য্যের অবস্থান লক্ষ্য করে পরিচারিকা। বিন্ধ্যবাসিনী এখনও অভুক্ত ও অনাহারী। সেই প্রাতঃকালে নদীশোভা নিরীক্ষণে বসেছেন, এখনও সেই এক ভাবেই ব'সে আছেন। নির্নিমেষ চক্ষে দেখছেন তো দেখছেনই—জনহীন, সীমাহীন সবুজ প্রান্তর আর স্রোতস্বিনী, বেগবতী আমোদর নদী।

পরিচারিকা যশোদা পিছন থেকে কথা বলে সহসা। বলে,—বৌ, গতকাল একাদশী গেছে, আজ দ্বাদশী। গত কাল তুমি মুখে কিছু তুললে না। এয়োস্ত্রী হয়ে একাদশী পালন করলে! আজও কি অভুক্ত থাকতে চাও?

বিন্ধ্যবাসিনীর গোলাপী ওষ্ঠাধরে স্মিত-হাসির রেখা ফুটলো। ক্লান্ত-হাসি। বিন্ধ্যবাসিনী বললেন,—এ বেলায় আর জ্বালাসনে আমাকে যশোদা। সন্ধ্যা উৎরে যাক, তারপর।

গড়মান্দারণে সন্ধ্যা নামতে তখনও অনেক দেরী। সূর্য্য এখন সবে মধ্যাকাশে পৌঁছেছেন।

গ্রীষ্মের প্রকোপে আমোদর এখন ঈষৎ ক্ষীণকায়। তবুও নদীর বেগ প্রবল, দুই কূলে যেন প্লাবনের ইশারা। জল কোথাও দুরন্ত গতিতে ধাবমান। কোথাও স্থির। কোথাও বা চক্রাকার ঘূর্ণী। নদীর মধ্যস্থলে অথৈ জল। কিনারার কাছাকাছি এক-পাল কালো হাঁস। কখনও জলে ভাসতে থাকে ঐ হংসযূথ, কখনও ঊর্ম্মিমালায় নিশ্চিহ্ন হয় মুহূর্ত্তের মধ্যে। শুভ্র ফেনিল আমোদরের দেহবল্লরীতে যেন কয়েকটি কৃষ্ণতিল। এই আছে এই নেই। রাজকুমারী বিন্ধ্যবাসিনীর নিষ্পলক দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে আছে। তিনি সাগ্রহে লক্ষ্য করছেন—কৌতূহলী মনে দেখছেন হংসবিহার। সূর্য্যের আলোয় ডানার কালো পালখ চিকচিকিয়ে ওঠে। তরঙ্গের আঘাতে অস্থির হয়ে থাকে জলচরের ঝাঁক। আমোদরের উভয় তীরে পূর্ব্বে ছিল বহুসংখ্যক সমৃদ্ধ গ্রাম,

নগর, হাট-বাজার। প্রতি গ্রামের সমুখে নদীর তীরে তীরে ছিল কত শত দেবালয়, দেব-দেবীর মন্দির। আমোদরের তীর তখন স্বর্গতুল্য। দুধের মত শুভ্র সুমিষ্ট জল আমোদরের বুকে। আর আজ? বিন্ধ্যবাসিনীর ভাগ্য হয় নি নদীর সেই প্রবল প্রতাপ মহিমময় রূপদর্শনের। সে আজ বহু দিনের কথা!

নদীর অপর তীরের দিগন্ত ছুঁয়ে সুদীর্ঘ এক-পাল সাদা বক উড়ে চলেছে। কোথায় চলেছে কে জানে! মানুষের মধ্যেই একতার অভাব। আকাশচারী পাখীর দল এক-দল হয়ে উড়ছে। আকাশে উড়ন্ত, তবুও ছাড়াছাড়ি নেই। যেন এক সুতোর মালা, সাদা বকফুলের। আকাশ পারাপারের তাড়ায় মালাটি বুঝি কখন ছিন্ন হয়েছে। বকফুলের একটি দীর্ঘ সারি, রেখার আকারে উড়ে যায় শ্বেতপক্ষীর সারি। সেই দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করলেন বিন্ধ্যবাসিনী। নির্নিমেষ দৃষ্টি রাজকুমারীর ঘুম-ঘুম চোখে। বাসি কাজলের বিলীয়মান আভাস। চোখের প্রান্তভাগে, সূক্ষ্ম সুর্মারেখার মতই ভ্রম হয়। বিন্ধ্যবাসিনীর আলুলায়িত কেশরাশি শুষ্ক, রুক্ষ। বর্ষার কালো মেঘ যেন ঈশান-কোণে। নদী তীরের এলোমেলো হাওয়ায় রাশি রাশি কুন্তল, থেকে থেকে কাঁপছে কিশলয়ের মত।

আমোদরের তীরে আজ শুধু ধ্বংসাবশেষ! বিগত ঐতিহ্যের ভগ্নাংশ! গড়মান্দারণে গড় নেই!

দেবালয়ের চিহ্ন নেই, আছে শুধু মন্দিরস্তম্ভ। দেব-দেবীর ভগ্নমূর্তি ধুলায় গড়াগড়ি খায়। মানুষের বসতি নেই, দাঁড়িয়ে আছে প্রাসাদ-প্রাচীর। ঘর-বাড়ী কবে নিশ্চিহ্ন হয়েছে, তোরণ-মঞ্চ যেমনকার তেমনি আছে। আগাছার ঘন জঙ্গল দেওয়ালের কন্দরে।

—চল্ বৌ, দীঘির জলে স্নান করবি?

শিউরে উঠলেন যেন রাজকুমারী। ভয়ে যেন শিউরে উঠলেন। একেই সরীসৃপের ভয়। সাপের ফোঁস-ফোঁস ধ্বনির মতই কি ফিস-ফিস কথা বলছিল পরিচারিকা ব্রাহ্মণকন্যা যশোদা।

চোখ ফিরিয়ে তাকালেন বিন্ধ্যবাসিনী। নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে। ঘুম-ঘুম চোখে।

দীঘির নাম আসমান-দীঘি। জমিদার কৃষ্ণরামের প্রথম যৌবনের দিনে এই দীঘির জল ছিল নীল আকাশের মতই স্বচ্ছ। কালে জমিদার গড়-মান্দারণে আসতেন। আসমান-দীঘিতে মহাসমারোহে নৌ-বিহার চলতো দিনের পর দিন। নৌকাবিহার না নৌকাবিলাস! দীঘির অধিকাংশ এখন পানা আর শালুকে পরিপূর্ণ। যেন এক কৃষ্ণাঙ্গিনী, সবুজ ওড়নার আবরণে আত্মগোপন করেছে সলজ্জায়। দীঘির এক তীরে আছে সুবৃহৎ পাকা ঘাট। পৈঠাগুলি এখন জীর্ণ-শীর্ণ, পদার্পণে কাঁপতে থাকে বুঝি। ধাপে ধাপে ফাটল ধরেছে। দীঘির তীরে বন্য বৃক্ষের জটলা।

দীঘির নাম আসমান-দীঘি। আকাশের সঙ্গে যে কি কোথায় যোগাযোগ কে জানে, তবে আমোদরের সঙ্গে নাকি অন্তরে অন্তরে যোগ আছে। বর্ষার দিনে দীঘির কাকচক্ষু জল আমোদরের মতই ঘোলাটে রূপ ধারণ করে। আমোদর থেকে দু'-চারটি কুমীরও তখন ছিটকে আসে দীঘিতে। জমিদার কৃষ্ণরামের নৌবিহারের ময়ূরপঙ্খী দীঘির এক তীরে বাঁধা আছে এখনও। ভগ্নপ্রায় নৌকাটিতে এখন কাক-পক্ষীর বাসা; মাছরাঙ্গা পাখীর মৎস্যশিকারের লক্ষ্যকেন্দ্র। নৌকার পাটাতন চুরি হয়ে গেছে কবে কেউ জানে না। ময়ূরমুখী নৌকার ময়ূরের সূক্ষ্ম চঞ্চু ভোঁতা হয়ে গেছে। বিলাসগৃহের জানালা-কপাট ভেঙ্গে চুরমার।

বিন্ধ্যবাসিনী ক্ষণেক চিন্তিত থেকে বললেন,—তাই চল। আসমান-দীঘিতে ডুব দিয়ে জ্বালা জুড়াই। নানান ভাবনায় যেন অস্থির হয়ে আছি আমি।

যশোদার মুখে সহানুভূতির স্নেহস্নিগ্ধতা ফুটে ওঠে। সে কৃষ্ণরামের মনোনীতা, সে আর কি বলবে! চুপচাপ থাকে যশোদা। সকরুণ চোখে তাকিয়ে থাকে।

বিন্ধ্যবাসিনী বলেন,—দোষ কি আমার, তুমিই বল না যশো?

—আমাকে শুধিও না কোন কথা। তোমার দুঃখের কথা শুনিও না।

কম্পমান কণ্ঠে কথা বললে পরিচারিকা। বিন্ধ্যবাসিনীর বক্ষে যেন অহোরাত্র হাতুড়ির ঘা পড়ছে। মনের ভাব প্রকাশ করা যায় না কারও কাছে

বুক ফেটে যায় তবু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেন না। কুলীনকন্যা, রাজকুমারী থামেন না। বলেন,—আমার পিতৃপুরুষের সম্পত্তি, ধন-দৌলতের ভাগ কেন ছাড়বে তারা? তোমাদের জমিদারের দাবী অনর্থক নয় কি?

শূন্য দৃষ্টিতে শূন্যের প্রতি চোখ রেখে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে পরিচারিকা। তার মুখে কোন কথা জোগায় না। যার নুণ খায় তার গুণ না গাইতে পারে, স্পষ্টত তার বিরুদ্ধাচরণ করবে কোন্ সাহসে? কোন্ লজ্জায়? যশোদা বললে,—বৌ, মনে রাখতে নেই এ সব কথা। ভুলে যেতে দাও। যার কর্ম্ম সেই বুঝবে। কর্ম্মফল আছে না? অন্যায়ের জয় হয় না কোন দিন। আজও হবে না।

—তবে আমার কেন এই শাস্তিভোগ? আমার কি অপরাধ? কেন এই নির্ব্বাসন?

কথা বলতে বলতে দু' চোখ ছলছলিয়ে ওঠে বিন্ধ্যবাসিনীর। প্রখর দিবালোকে হীরকখণ্ডের মতই চোখ দুটি দ্যুতি ছড়ায়। সজল আঁখি নত করলেন তিনি। অসম্মানের লজ্জায়।

পরিচারিকা সাগ্রহে দেখেন গৃহবধূকে। অন্তর্জ্বালায় সে-ও যে জ্বলছে! তুষের আগুন জ্বলছে তারও হৃদয়ে। যশোদা যে একান্তই নিরুপায়! বুকের কষ্ট বুকেই পুষে রাখতে হয়। জিহ্বাগ্রে কত কথাই না আসে, কিন্তু কিসের সঙ্কোচ যেন তার কণ্ঠকে রোধ করে দেয়। যশোদা ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে থাকে। মূক, বধিরের মত।

ক্রন্দনের বেগ সামলে বিন্ধ্যাবাসিনী বলেন,—দয়া-মায়াও কি থাকতে নেই মানুষের? কুলীনের স্ত্রীর মৃত্যুই ভাল! চিতায় উঠে তবেই তার শান্তি!

—ছিঃ, এ সব মুখে আনতে নেই বৌ! উতলা হতে নেই মেয়েমানুষকে। সান্ত্বনা দেওয়ার সুর যশোদার কথায়। সহানুভূতির স্নেহস্নিগ্ধ মুখভঙ্গী।

—আর যে পারিনে! খানিকটে বিষ এনে দাও তুমি আমাকে। কেউ জানবে না, কেউ শুনবে না।

কথার শেষে পট্টবস্ত্রের অঞ্চলে চেপে চেপে চোখ মুছলেন রাজকুমারী। বাসি কাজলমাখা মৃগনয়ন!

কেউ কোথাও নেই। তবুও ইতি-উতি দেখলো যশোদা।

অশ্রুসিক্ত চোখে বললে,—তার চেয়ে তোমার ভেয়েদের রাজী করাও, যদি কিছু নগদ টাকা হাতছাড়া করে। তাদের জামাইকে দেয়।

অনেক ভাবলেন বিন্ধ্যাবাসিনী। চিন্তাকুল থাকলেন ক্ষণকাল। বললেন,—এখানে কে কোথায় আছে! কাকে বলবো আমি? একবার যদি যেতে পাই সুতনুটীতে, তবে গিয়ে বলতে পারি। চাই কি রাজীও করাতে পারি তাঁদের? কিন্তু মুক্তি কোথায়? কে আমাকে যেতে দেবে? প্রহরী মোতায়েন আছে যে ফটকে।

বন্দুকধারী পাঠান প্রহরী!

এ কথার কি জওয়াব দেবে পরিচারিকা, ভেবে পায় না। করুণাভরা চোখে তাকিয়ে থাকে শুধু। নির্ব্বাক, নিস্পন্দের মত।

আঁচলের আবরণ চোখে। মুখ দেখাতেও বুঝি লজ্জা পান রাজকুমারী। বলেন,—তিনি কেমন আছেন কে জানে? তাঁকে একবার দেখতে বড় সাধ হয়। কত দিন দেখিনি। তাঁর কাছে আমি চক্ষুশূল হতে পারি, তবুও তিনি আমার স্বোয়ামি, তিনি আমার ইষ্টদেব, তিনিই আমার—

মুখের কথা কেড়ে নেয় যশোদা। বলে,—একখানা পত্র লিখে দাও না তাঁকে। হপ্তায় হপ্তায় সাতগাঁ থেকে লোক আসছে, ভাঁড়ারের সামগ্রী নিয়ে। তাদের দিয়ে পাঠিয়ে দেবো'খন। কত খুশী হবেন আমাদের জমিদার।

সপ্তগ্রাম থেকে লোক আসে। আহার্য্য আসে। গো-শকটে ভাণ্ডার আসে প্রতি সপ্তাহে।

চাল, ডাল, তৈল, লবণ, ঘৃত আসে। সীতাভোগ, আতপ, বাঁকতুলসী আর দাদখানি চাল আসে। কলাই, বিউলী আর সোনামুগ আসে! সর্ষপ তৈল আর সৈন্ধব লবণ, আসে গব্য ঘৃত। গোযানে আসে।

এত কিছুর কি প্রয়োজন বিন্ধ্যবাসিনীর?

তার চেয়ে যদি সামান্যতম বিষ কিংবা হলাহল পাঠাতেন জমিদার কৃষ্ণরাম কত কাজে লাগতো কে বলবে! সপ্তগ্রাম থেকে যা যা আসে তার সকল কিছু ব্যয় হয় না। উদ্বৃত্ত থাকে। তাই ভাণ্ডারও পরিপূর্ণই থাকে সর্ব্বসময়ে।

রাজকুমারী বলেন,—তাঁর কাছে আমার পত্র কি মূল্য পাবে? হয়তো পাঠ করবেন না, খণ্ড খণ্ড করে ফেলে দেবেন।

—তা-ও বটে। বললে যশোদা।

স্বামি-স্ত্রী। পুরুষ আর প্রকৃতি। বৃক্ষ আর লতা।

অভিন্ন সম্পর্কের সুসম্বন্ধ। তবে কেন এই অবহেলা, অপমান, অবিচার? বিন্ধ্যবাসিনী তবুও কেন যে মন থেকে মুছে ফেলতে পারেন না কে বলবে? মধ্যে মধ্যে বুকের মাঝে প্রবল বাসনা জাগে, একটি বার যদি দেখতে পাওয়া যায় তাঁকে। জলভরা চোখ তুলে তাকালে হয়তো সেই অশ্রুজলে তাঁর মনটি সিক্ত হতে পারে।

পুরুষ ত্যাগ করে। ভোগের পর ত্যাগ। নারীর শুধু আকর্ষণ। ঘরণী ঘর করতে চায়। হাতছানি দেয়। ডাকে অন্তরের ডাক।

সত্যিই তাঁকে একটি বার দেখতে ইচ্ছা জাগে বিন্ধ্যবাসিনীর। মধু-জোছনার রাতে শয্যায় একাকিনী হওয়ার দুঃখ কে জানবে? রাত্রির ঘুমঘোরে অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে, রাজকুমারী চাঁদের আলোয় যেন স্পষ্ট দেখতে পেয়েছেন, তিনি এসেছেন। এসে দাঁড়িয়ে আছেন শিয়রের কাছে। কত রাতে দেখেছেন বিন্ধ্যবাসিনী!

সেই সুগঠিত সবল শরীর। ঈষৎ স্থূলকায়, কিন্তু কিঞ্চিৎ লম্বা ছাঁদের জন্য স্থূল বোধ হয় না। চুলে কোন বিন্যাস নেই, মাথায় শিখা। বর্ণ শুভ্র। পরিধানে লাল চেলীর ধুতি-চাদর। কানে সোনার কুণ্ডল, কণ্ঠে সোনায়-গাঁথা রুদ্রাক্ষের মালা। দক্ষিণ হস্তে সোনার ইষ্টকবচ, রূপার বলয়, রত্নাঙ্গুরীয়। বাম হস্তে সোনার তাগা। কোমরে রূপার বিছা। পায়ে শিশুকাঠের খড়ম। কপালের মধ্যস্থলে চুয়া ও চন্দনের মঙ্গলতিলক।

জমিদার কৃষ্ণরাম স্বয়ং এসেছেন! রাজকুমারীকে স্বহস্তে মুক্তি দিতে এসেছেন!

বিন্ধ্যবাসিনী স্বচক্ষে দেখেছেন। তাঁর পরম পুরুষকে দেখে প্রসারিত করেছেন শুভ্র বাহুযুগল। আত্মসমর্পণ করেছেন। কিন্তু—

কাকজ্যোৎস্নার উজ্জ্বল সোনালী আলোয় কি দেখতে কি দেখেছেন রাজকুমারী! দৃষ্টির বিভ্রমে হয়তো ভুল দেখেছেন।

—চল্ বৌ স্নান সেরে আসি আসমান-দীঘিতে। বেলা আর নেই।

মনে উত্তাপ। মনস্তাপের আগুনে যেন সর্ব্বাঙ্গ জ্বলছে। একটি উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বিন্ধ্যবাসিনী। ভূমি-আসন ত্যাগ করলেন ধীরে ধীরে। বললেন,—যশোদা, আসমান নাম আর শুনিও না আমাকে। দোহাই তোমার।

দোষ করেছে পরিচারিকা। সঙ্কোচ নামে তার দুই চোখে। উচ্চারণ করেছে এমন একটি নাম, যে-নাম কানে তুলতে চান না বিন্ধ্যবাসিনী। আসমানের নাম।

—ক্ষমা কর বৌ! ভুল হয়েছে আমার। সলজ্জায় বললে যশোদা। অপ্রতিভ কণ্ঠে।

আসমান-দীঘির আসমান ছিল মুসলমানী। জমিদার কৃষ্ণরামের প্রথম যৌবনের লীলাসঙ্গিনী সে! চৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশ মত যে-কোন নারীর কানে 'হরিনাম' শুনালে আর গলায় তুলসীর মালা পরালেই সেই নারী বৈষ্ণবী হয়। আসমান ছিল মুসলমানী। তার সঙ্গে একত্রে বসে পানাহার দুষ্য, তাই কৃষ্ণরাম আসমানের কানে হরিনাম বর্ষণ করেছিলেন। অকালে নাকি মৃত্যু হয় সেই মুসলমানী বৈষ্ণবীর। কৃষ্ণরামের কোন্ এক প্রতিদ্বন্দ্বী তরবারির আঘাতে খণ্ড-বিখণ্ড ক'রেছিল আসমানের দেহ। গভীর নিশীথে ছদ্মবেশে কে প্রবেশ করেছিল আসমানের ঘরে? ক্রোধ আর আক্রোশে পরম নির্দ্দয়ের মত তরোয়াল চালিয়েছিল?

জমিদার কৃষ্ণরাম তখন ছিলেন সপ্তগ্রামে। জমিদারীর প্রয়োজনে গিয়ে-

ছিলেন। আসমানের অপঘাতে মৃত্যুর সংবাদ শুনে বড় ব্যথা পেয়েছিলেন মনে মনে। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও হত্যাকারীর সন্ধান মেলেনি।

সেই মুসলমানী বৈষ্ণবীর স্মৃতি অক্ষয় থাকবে। শোকার্ত্ত কৃষ্ণরাম তাই এই দীঘির নাম রাখেন আসমান-দীঘি।

এই নামটি কানে শুনলে আর স্থির থাকতে পারেন না বিন্ধ্যবাসিনী। কেমন যেন জ্বালা ধরে বুকে। অসহ্য এক জ্বালা!

রুক্ষ কেশের রাশি উড়িয়ে রাজকুমারী দীঘির ঘাটে চললেন। শ্রান্তি ও ক্লান্তিতে চললেন মন্থর গতিতে। পাছে পাছে চললো যশোদা। প্রহরীর মত। পরিচারিকার হাতে তৈলপাত্র ও গামছা।

যেতে যেতে রাজকুমারী বলেন,—যশো, আমার মাকে বড় দেখতে সাধ হয়। কত দিন মাকে দেখতে পাইনি তার ঠিক নেই! কেমন আছে কে জানে?

—আহা!

বললে যশোদা। স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বললে,—কি করবে বল বৌ! মন শক্ত কর। ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। আজই না হয় আমাদের জমিদার বিরূপ হয়েছেন। ভবিষ্যতে তাঁর কি মনোভাব হয়, কে বলতে পারে?

এ কথার কোন প্রত্যুত্তর দেন না বিন্ধ্যবাসিনী। যেমনকার তেমনি চলেন; ধীরে ধীরে, অতি সন্তর্পণে। কৃষ্ণরামের এই আবাসগৃহ একেই জরাজীর্ণ, ভগ্ন-প্রায়। অপরিচ্ছন্ন। আবর্জনা যেখানে-সেখানে। আগাছা আর জঞ্জাল। তদুপরি সরীসৃপের ভয়।

পদশব্দ পেয়ে দীঘির পথের লম্বমান দালানের শেষ প্রান্ত থেকে কয়েকটি তক্ষক ছুটে পালায়। ভয়ে যেন জড়সড় হয়ে আছেন বিন্ধ্যবাসিনী। প্রায় রুদ্ধশ্বাসে এগিয়ে চলেছেন।

পরিচারিকারও নয়নগোচর হয় ঐ তক্ষক-পাল।

যশোদা বলে,—কপালে দু'হাত ছুঁইয়ে পেরণাম কর বৌ। তক্ষক দেখা যায় না যখন-তখন। বাসুকির সহোদর ভাই ঐ তক্ষক। অর্জ্জুনের ছেলে

অভিমন্যু, অভিমন্যুর ছেলে পরীক্ষিৎ। সেই পরীক্ষিৎ ব্রহ্মহত্যা করেন, তক্ষক তাঁকেই দংশন ক'রেছিল।

বিন্ধ্যবাসিনীর বুক্তকর কপাল স্পর্শ করে। শিউরে শিউরে ওঠেন যেন তিনি। গায়ে কাঁটা দেয়। নিবিষ্টচিত্তে ছিলেন তিনি, সুতানুটীতে ফেলে-আসা মায়ের চিন্তাতে বিভোর হয়ে ছিলেন। তক্ষকের ইতিবৃত্ত শুনে ভয় হয় তাঁর। মৃত্যু-ভয় নয়, দংশন-জ্বালার ভয়। আর কি বিকট ভয়াবহ রূপ ঐ তক্ষকের! কি বিশ্রী!

সুতানুটির মধ্যাকাশ থেকে সূর্য্য তখন হেলে পড়েছে পশ্চিম দিকে।

গ্রীষ্মের আতিশয্যে কুঠরীতে সিঁদিয়েছেন রাজমাতা বিলাসবাসিনী। হিমশীতল কুঠরী। দিনমণির অগ্নি-আলো প্রবেশের কোন পথ নেই সেখানে। আলোর চিহ্ন মাত্র নেই। তাই কুঠরীর দেওয়ালে দেওয়াল-গিরি জ্বলছে দিনমানে। রাজপুরীর বিনা অনুমতিতে, রাজা বাহাদুরের অগোচরে কন্যার শুভাশুভ জানতে চেয়ে সামান্য একজন লেঠেলকে সপ্তগ্রামে পাঠিয়েছেন রাজমাতা। সেই কারণে ক্ষুব্ধ হয়েছেন কনিষ্ঠ পুত্র কাশীশঙ্কর। ভাল-মন্দ কথা বলে গেছেন বিলাসবাসিনীকে। কত তর্জ্জন-গর্জ্জন ক'রে গেছেন। সেই দুঃখে উপুড় হয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন রাজমাতা। সকলের অলক্ষ্যে কাঁদছিলেন উপাধানে মুখ রেখে। চোখ ঢেকে।

দু'জন দাসী ছিল পায়ের দিকে। রাজমাতার পদসেবায় রত ছিল।

অন্য দিন এমন সময়ে বিলাসবাসিনী বলতেন,—দাসী, একটা গল্প শোনা দেখি।

গল্প বলতে হয় দাসীদের। দাসী গল্প বলে আর রাজমাতা শোনেন। কোন কোন দিন আগ্রহ প্রকাশ করেন। থামতে দেন না, যে গল্প বলে তাকে। কোন কোন দিন শুনতে শুনতে কখন নিদ্রায় অচেতন হয়ে পড়েন। রাজ-মাতাকে নিদ্রামগ্ন রেখে পালায় দাসীরা। পদসেবায় ফাঁকি দিয়ে পালায়।

আজও গল্প বলছিল একজন দাসী। দাসী জানে না আজ আর গল্প শোনার মন নেই রাজমাতার। মাতায়-পুত্রে দ্বন্দ্ব হয়ে গেছে। ঝগড়া হয়েছে মায়েয়-ছেলেয়। এই খানিক আগে অনেক কথা-কাটাকাটি হয়ে গেছে। অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে কথা বলেছেন ছোটকুমার কাশীশঙ্কর। কড়া কড়া অনেক কথা বলে গেছেন।

বিলাসবাসিনী তাই উপাধানে মুখ রেখে, চোখ ঢেকে সকলের অলক্ষ্যে ফুলে ফুলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন। বক্ষসুধা পান করিয়ে যাকে লালন পালন ক'রেছেন, সেই বলে গেল কিনা আঁকা-বাঁকা কথা! ঘর ব'য়ে অপমান ক'রে গেল!

দাসী বলছিল,—দক্ষমুনি যাগ করলেন, দেবযাগ করলেন, সকল দেব-দেবীকে ডাক পাঠায়ে শিবকে আর ডাকলেন না। বাপ যজ্ঞি করছে শুনে সতী শিবের কাছে গিয়ে বায়না ধরে। শিবঠাকুরের একেই তিন চক্ষু! বিনা আমন্ত্রনে সতী বাপের বাড়ী যেতে চায় দেখে শিবের তিন চোখ বে'য়ে আগুন ঠিকরোতে লাগে। সতী বললে, বাপের ঘরে আবার কন্যার আমন্ত্রন কি? শিবঠাকুর আপত্তি করছে দেখে সতী ক্রোধে মুক্তকেশী কালীর করাল কালো রূপ ধারণ করলে। পথমে ধরলে শ্মশানকালীর রূপ! শ্মশানে শবের গাদায় বসে থাকে সতী, গলায় মুণ্ডুমালা, রক্ত ঝরছে মুণ্ডুমালা থেকে। বাম হাতের করতলে একটা কাটা মাথা! এক হাতে খড়্গা। দক্ষিণের দু' হাতে অভয় বর। লক্‌লকে জিব থেকে তাজা রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। সতীর শ্মশানকালী রূপ দেখে শিবঠাকুর ভয়ে মুখ ফেরায়।

বিলাসবাসিনী শুনছেন কি শুনছেন না।

অন্যান্য দিন গল্প শুনতে কত আগ্রহ প্রকাশ করেন। বলতে বলতে মুহূর্ত্তের জন্য বিরত হলে কত বিরক্ত হন! দাসীদের শ্বাসত্যাগের ফুরসত মেলে না। একটি কাহিনী শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য কাহিনী বলতে হয়। দেব-দেবীর আখ্যান, রূপকথার কাহিনী, রাজা-বাদশার উপাখ্যান, সত্যিকার গল্প—যেদিন যেমন খুশি হয় তেমন শুনতে চান! পদসেবা করতে করতে গল্প

বলে দাসী। কোন দিন পলকহীন চোখে, ব্যাকুল-মনে শুনতে থাকেন। কোন দিন গল্পের মধ্যপথেই হয়তো নিদ্রায় অচেতন হন! দিবানিদ্রায়।

আজ ঠিক বোঝা যায় না, রাজমাতা শুনছেন কি শুনছেন না।

উপাধানে মুখ রেখে, চোখ ঢেকে, ফুঁপিয়ে উঠছেন থেকে থেকে। সজল চোখ রাজমাতার, লজ্জায় যেন লুকিয়ে আছেন। দাসীর কথায় কর্ণপাত করছেন না। অভিমানিনীর মত মুখ ফিরিয়ে আছেন যেন। কখনও দর-দর বেগে অশ্রুপাত করেন। কখনও মনে মনে খতিয়ে নেন জামাতার দাবী-দাওয়া। হিসাব করেন। হিসাব কষেন। কি অন্যায় কৃষ্ণরামের! দাবী তাঁর কত!

ছোটকুমার কাশীশঙ্কর বলে গেছেন,—কিছুই পাবে না কেষ্টরাম। এক কপর্দ্দকও নয়! যতক্ষণ আমার তরবারি চালনার শক্তি থাকবে ততক্ষণ সে দুরাচারীকে ভিক্ষাপ্রার্থী হয়েই থাকতে হবে। সম্মুখ যুদ্ধে সে যদি আমাকে পরাস্ত করতে পারে কোন দিন, তবেই তার দাবী স্বীকৃত হবে, নতুবা নয়। ঐ কেষ্টরামকে আমি জীবন্ত দগ্ধ করবো! ভূগর্ভে প্রোথিত করবো!

কথা বলতে বলতে কুঠরী ত্যাগ করেছেন কাশীশঙ্কর। ক্রোধের আতিশয্যে শরীর তাঁর রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছিল! তাঁর সজোর কণ্ঠস্বরে কুঠরী গমগম করছিল। যেন এক আগ্নেয়গিরির ধূমানল বিস্ফোরিত হতে দেখছিলেন বিলাসবাসিনী। চোখ দু'টি তাঁর ঝলসে গেছে যেন সেই উত্তাপে। কর্ণকুহরে যেন ঘন ঘন বজ্রপাতের শব্দ পৌঁছেচে।

কৃষ্ণরামের দাবী কি পর্ব্বতপ্রমাণ!

মনে পড়লে যে হৃৎকম্প হয় রাজমাতার! অগ্রে যৌতুক দিতে হবে পঞ্চ সহস্র মোহর! স্বর্গত রাজার সঞ্চিত ও রক্ষিত হীরা-মুক্তা-মাণিক্যের পূর্ণ এক-তৃতীয়াংশ উপঢৌকন দিতে হবে! তৎসহ এক শত অশ্ব ও বিংশতি হস্তী উপহার চাই! একমাত্র কন্যা রাজকুমারী বিন্ধ্যবাসিনীর মুক্তিলাভের কোন পথই দেখতে পান না রাজমাতা।

তাই নিরুপায়ের মত উপাধানে মুখ রেখে, চোখ ঢেকে অশ্রুপাত করেন অবিরাম।

অত্যাচারক্লিষ্ট, মলিনমুখ বিন্ধ্যবাসিনীকে বার বার মনে পড়ে তাঁর। আকুল কণ্ঠের চীৎকার যেন কানে শোনেন অহরহ। জামাই যে বেঁধে রেখেছে তাঁর কন্যাকে! আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে দড়া-দড়ির নিষ্ঠুর বন্ধনে!

দাসী আজ আর ফাঁকি দেয় না।

কুঠরীর অভ্যন্তরে অশান্তির ছায়া দেখে, রাজমাতাকে কাতর দেখে. দাসী আর থামে না। পদসেবা করতে করতে দাসী বলছিল,—শ্মশানকালীর রূপ থেকে তারার রূপ ধারণ করেন সতী। নীল বরণ, লোল জিব, করাল দন। সতীর জটাজুট কেশে সাপের বাসা। পরনে বাঘছাল—

সহসা উন্মাদিনীর মত ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন বিলাসবাসিনী।

সজল লাল দীর্ঘ আঁখি মেলে ধরলেন দাসীর দিকে। কয়েক মুহূর্ত্ত স্থির তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললেন,—আমি শুনতে চাই না! দাসী, তুই থামবি কি না বল্?

ভয়ার্ত্ত কণ্ঠ যেন রাজমাতার। কেন কে জানে, হয়তো কন্যার কথা ভেবে হঠাৎ ভীত হয়ে পড়েন বিলাসবাসিনী। দক্ষ-কন্যার কাহিনী আর শুনতে না। দাসীর মুখ চেপে ধরেন নিজের হাতে। বলেন,—দাসী, তুই থাম্! বিদেয় হ'! বেরিয়ে যা কুঠরী থেকে!

দাসী তো অবাক! রাজমাতার কাণ্ড দেখে প্রায় হতজ্ঞান।

অত-শত বোঝে না দাসী। কোথা থেকে কি হয় কিছু বোঝে না। অপমানের সুরে বিদায় হয়ে যাওয়ার কঠোর নির্দ্দেশ পেয়ে মনের দুঃখে ম্লান মুখে কুঠরী থেকে বেরিয়েই যায় দাসী। কি দোষে যে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে, বোঝে না কিছুতেই। দক্ষকন্যার কাহিনী বলছিল দাসী, রাজকন্যার কথা তো বলেনি! রাজকন্যা বিন্ধ্যবাসিনীর কাহিনী। দাসী শুধু এইটুকু বুঝেছিল, রাজমাতা দুঃখ পেয়েছেন। মনে ব্যথা পেয়েছেন অসীম। ছোটকুমারের বাক্যবাণে জর্জ্জরিত হয়েছেন!

কাশীশঙ্কর তেমন মানুষ নন যে কাকেও ব্যথা দেবেন। অন্ততঃ রাজমাতাকে। ●

নিজের মহলে ফিরে গিয়ে মহলের অন্দরে আর প্রবেশ করতে পারেন না কাশীশঙ্কর। প্রধান তোরণ অতিক্রম করেন কোন মতে। হয়তো অনুশোচনায় কপালে করাঘাত করেন বার দুই। মাতৃচক্ষে কি অশ্রুর চাকচিক্য দেখলেন কাশীশঙ্কর? মা কি তাঁর কাঁদলেন মনোব্যথায়? ধূমায়মান ও প্রজ্বলিত আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণে বিরতি পড়ে। শান্ত হয় অগ্নিগিরি। দ্রুত পদক্ষেপে আরও কিছু দূর অগ্রসর হন কাশীশঙ্কর। অন্দরের আঙিনায় পৌঁছে এক নিম্ববৃক্ষের ছায়াতলের শিলাসনে বসে পড়েন। দুই হাতের পরে রাখেন অবনত মাথা।

বেলা কত হয়েছে, তবুও আজ এখনও ছোটকুমারের দেখা নেই, সেই দুশ্চিন্তায় আকুল হয়ে তোরণ-পথে চোখ রেখে অধীর প্রতীক্ষায় ছিলেন কাশীশঙ্করের ধর্ম্মপত্নী। শ্বেতপ্রস্তরের এক জাফরি-জানালার অন্তরালে ছিলেন মহাশ্বেতা।

প্রথম দর্শনে নিজের চোখ দু'টিকে বিশ্বাস করতে পারলেন না তিনি।

এমন দুর্ভাগ্য হবে কেন যে, কাশীশঙ্কর নিমগাছের ছায়াতলের শিলাসনে এক দণ্ডের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করতে বসবেন। এ কি দুর্লক্ষণ।

মহাশ্বেতার দুই নয়নের পল্লব পড়ে না। ঘোর বিস্ময়ে যেন অভিভূতা হন ঐ অবরোধবাসিনী। শ্বাস যেন তাঁর রুদ্ধ হয়ে যায় ক্ষণেকের মধ্যে। জাফরি-জানালায় দেহের ভর রেখে কোন মতে সামলে নেন নিজেকে। এ কোন ব্যাধি না ব্যথা? মস্তকে হাত কেন মহাশ্বেতার পুরুষ-প্রতিমের!

ধীরে ধীরে আঙিনায় দেখা দিলেন মহাশ্বেতা।

দুগ্ধফেননিভ শুভ্র মসলিন-সাড়ীর অঞ্চল সামলে আঙিনায় পা দিলেন। মহাশ্বেতার পায়ে ঝাঁজর। মুহুর্মুহু ঝঙ্কার তুললো। ঝন-ঝন শব্দ। অন্তরের অঙ্গনে আছে অনাবিল ছায়া। বৃক্ষের সমারোহ এখানে। নিম্ব ও ঝাবুক। নিম আর ঝাউ গাছের শাখায় শাখায় শালিকের কলকাকলী।

মহাশ্বেতার ঝাঁজরের শব্দে এক ঝাঁক শালিক আকাশে উড়ে পালায়, এক ঝাঁক তীরের মত।

—কুমারবাহাদুর!

নম্র ধীর কণ্ঠে ডাকলেন মহাশ্বেতা। মধুমিষ্ট কণ্ঠে।

কাশীশঙ্কর মাথা তুললেন। চোখ তুললেন। মহাশ্বেতার আকর্ণবিস্তৃত চোখে চোখ রাখলেন। পলকহীন রক্তবর্ণ চোখ।

ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করলেন মহাশ্বেতা! তাঁর পটলাকৃতি চোখে জিজ্ঞাসু। কপালে অল্প কয়েকটি কুঞ্চিত রেখা, স্খলিত কুন্তলের আড়ালে।

ডাইনে-বাঁয়ে মাথা দোলাতে থাকেন কাশীশঙ্কর।

বলেন,—না, অসুস্থ নয় রাতরাণী। অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত আমি। দ্রুত অশ্বচালনায় ক্লান্ত।

আকাশের বিদ্যুতের মত চমকে উঠলেন যেন মহাশ্বেতা।

নিমেষের মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন। অন্দরে ফিরলেন এক দৌড়ে। পায়ের ঝাঁজর ঝনঝনিয়ে উঠলো। এক সুমিষ্ট রাগের দ্রুত ধ্বনি বেজে উঠলো যেন চকিতের মধ্যে। কোন্ এক বাদ্যযন্ত্রের দ্রুত লয়!

এক ঝাঁক নয়, ঝাঁকে ঝাঁকে শালিক, চড়াই আকাশে উড়লো সেই শব্দে। কাশীশঙ্কর ঐ ধাবমানাকে দেখলেন একদৃষ্টে। মহাশ্বেতা বিদ্যুৎলতার মত যেন ছুটছেন! বিমুগ্ধ চোখে দেখেন ছোটকুমার। শুভ্র দিনের আলোয় শুভ্র মসলিনের কি অপূর্ব্ব ঔজ্জ্বল্য! রূপালী জরির অঞ্চল যেন রাশি রাশি রৌপ্যচূর্ণ ছড়ায়।

গ্রীষ্মের খররৌদ্রে অশ্বচালনা ক'রেছেন কাশীশঙ্কর। দ্রুততম বেগে গেছেন। এসেছেন।

কালীঘাটের পথ ধ'রে গিয়েছিলেন গোবিন্দপুরে। ইংরেজের কুঠিতে। ইংরেজের বেতনভুক দেশীয় প্রতিনিধি রামনারায়ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। তার দেখা পাওয়া গেছে। এক ডাকেই সাড়া দিয়েছে সে। এক ডাকে বেরিয়ে এসেছে কুঠির ভেতর থেকে। রামনারায়ণের পায়া এখন ভারী, তবুও ছোটকুমারকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেছে। মান রক্ষা করেছে কাশীশঙ্করের।

বিনিময়ে তৎক্ষণাৎ পেয়েছে মুক্তামালা। লাল মুক্তার মালা। পুরস্কার

মহাজনের কারবার করবেন ছোটকুমার। ব্যবসা করবেন। এককে একশো করবেন! টাকা খেলিয়ে টাকা করবেন। জলে জল বাঁধবেন। পথ দেখাবে, সহায়তা করবে ঐ রামনারায়ণ শেঠ। শোনা যায়, শেঠ নাকি এখন ইচ্ছা করলে ফকিরকে বাদশা বানাতে পারে। আবার যার আছে ভূরি ভূরি, তাকে রাতারাতি পথের ভিখারীতে পরিণত করতে পারে। কেবলমাত্র রামনারায়ণের যৎকিঞ্চিৎ কৃপাদৃষ্টি লাভ করতে পারলে বহু লাভ।

কাশীশঙ্করের জাগ্রত চোখে সেই অনাগত দিনের সুখস্বপ্ন। জেগে জেগেও স্বপ্ন দেখেন।

স্বপ্ন দেখেন, তিনি একজন বিরাট মহাজন হয়েছেন, ব্যবসার বাজারে লক্ষ লক্ষ টাকা খেলাচ্ছেন। কাঁচা মালের ব্যবসায়। বাজার-দর খতিয়ে মাল ছাড়ছেন, চেপে রাখছেন।

স্বপ্নকে সার্থক করবেন কাশীশঙ্কর। নিমগাছের ছায়ায়, শিলাসনে ব'সে আরেক বার শপথ করলেন মনে মনে। পণ করলেন। সহাস্যে।

সমুদ্রপারে চালান দেওয়ার জন্য, স্বদেশে সরবরাহের জন্য যত কিছুর প্রয়োজন ইংরেজের। যে যত পারো দাও, শূন্য জাহাজ দেশে ফিরবে না, জাহাজ ভর্তি পণ্য চাই। বঙ্গ বিহার আর উড়িষ্যার পণ্যদ্রব্য!

লবণের চাঁই আছে? সল্ট্-পিটার? যত দেব তত নেবো।

লাক্ষা আছে? আছে তামা, শিশা, টিন? শোরা আর হরিতাল আছে? আফিম? যার কাছে যা আছে দাও। যত পারো দাও। দাও, আর সমুচিত মূল্য বুঝে নাও। যব, সুপারী, চিনি, শুকনো আদা আর সরিষার তৈল আছে? ছিটে-কোঁটা নয়, পূর্ণকুম্ভ চাই। তামাকের পাতা আর মৌচাকের মোম আছে? টোবাকো লীফ্ এণ্ড্ বী-ওয়াক্স্! বড় বেশী দুষ্প্রাপ্য! স্কেয়ার্শ! ভেরী ভেরী স্কেয়ার্শ!

—কুমারবাহাদুর!

মহাশ্বেতার অন্তরের আহ্বান শুনলেন যেন কাশীশঙ্কর। দুই হাতের পরে পুনরায় মাথা রেখেছিলেন। তৃষ্ণার্ত হয়েছেন অত্যন্ত। পথশ্রমে যত না ক্লান্ত হয়েছেন ততোধিক উত্তেজিত হয়েছেন। রাজমাতা বিলাসবাসিনীর সঙ্গে বাক্যদ্বন্দ্ব হওয়ায় উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছিলেন যেন। কণ্ঠতালু শুকিয়ে গেছে।

রক্তাভ চোখ মেললেন কাশীশঙ্কর। মহাশ্বেতার ডাকে।

রাণী বললেন,—শুধু পানীয় নয়। দু'চার-খণ্ড সন্তানিকা খাও। তোমার এক প্রিয় সুখাদ্য। বেলা এখন অনেক। নাগরঙ্গের পানীয় খাও, পিত্ত নাশ হবে।

কাশীশঙ্কর তৃষ্ণার্ত। ক্ষুধার্তও বটে।

মুখের কাছে আহার দেখে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হন ছোটকুমার। পরিতৃপ্তির হাসি হাসলেন। সোনার থালিকায় দুগ্ধশুভ্র সন্তানিকা। কষ্টিপাত্রে নাগরঙ্গের পানীয়।

পাত্র দু'টি শিলাসনে রাখেন মহাশ্বেতা। নামিয়ে রাখেন হাত থেকে।

ওষ্ঠপ্রান্ত থেকে খুশীর হাসি যেন মোছে না। সত্যই কাশীশঙ্কর ক্ষুধা বোধ করছেন। সমুখে এমন সুখাদ্যের ডালি দেখে রসনা বুঝি সিক্ত হয় তাঁর!

ব্যাধি নয়, ব্যাথাও নয়। কাশীশঙ্করের মুখে হাসি দেখে চিন্তামুক্ত হয়েছেন মহাশ্বেতা।

হৃদয়ের কম্পন এতক্ষণ থেমেছিল যেন। ভয়ে আর ভাবনায়। একটি বুকভরা শ্বাস ফেললেন মহাশ্বেতা। কোথাও যদি কেউ থাকে, দাসী-ভৃত্য লুকিয়ে যদি কেউ দেখে, তাই সলাজে গুণ্ঠন টানলেন সামান্য। মুখ ঢাকলেন। কপালের পরে নেমে-আসা চূর্ণকুন্তল গুণ্ঠনের আবরণ মানতে চায় না। কর্ণভূষার আভা লুকোয় না। চুণী আর পান্নার কান আছে কানে। কুচো মুক্তার ঝারি-দেওয়া ঝুমকো ঝুলছে কান থেকে।

সোনার থালিকা বুঝি উজাড় হয়ে যায়। সন্তানিকা শেষ হয়ে যায় পলকের মধ্যে। সর-ভাজা ফুরিয়ে যায়। ঘিয়ে ভাজা সর, ছোট-এলাচের দানা ছড়ানো।

—আহা !

অবশেষে পানীয় মুখে তুলেছেন। কষ্টিপাত্র। নাগরঙ্গের পানীয় সেই গুরুভার পাত্রে। কাশবিনাশক, পিত্তনাশক, অন্তঃকরণের প্রাশস্ত্যকারী নাগরঙ্গ লেবুর সুগন্ধি পানীয়। কিঞ্চিৎমাত্র পান করার সঙ্গে সঙ্গে তৃপ্তি সহকারে কাশীশঙ্কর বললেন—আহা !

মহাশ্বেতা আরেকটি বুকভরা শ্বাস ফেললেন ! আনন্দের ছোঁয়া লাগলো যেন তাঁর মনে।

মহাশ্বেতাও হাসলেন এতক্ষণে ! হাসিমুখে শুধোলেন,—কুমারবাহাদুর, যাত্রা সার্থক হয়েছে ? যার খোঁজে যাওয়া, দেখা মিলেছে তার ?

পানীয়ের পাত্র নিঃশেষ করলেন কাশীশঙ্কর। প্রায় মুহূর্তের মধ্যে।

আকণ্ঠ পান করলেন যেন পরম তৃষ্ণায়। কৌতুকপূর্ণ হাসি হাসলেন। বললেন,—ঠিক এই ক্ষণেই ব্যক্ত করতে চাই না।

মহাশ্বেতা হেসে হেসে বললেন,—তবুও বল।

—না। বললেন কাশীশঙ্কর। মুচকি হাসলেন। বললেন,—তুমি যে রাতরাণী, গহন রাত্রে কথা হবে তোমার সহ। দিবালোকে নয়।

অগত্যা আর অনুরোধ করলেন না। হেসে হেসে মেনে নিলেন স্বামীর কথা। কেন কে জানে, রাতরাণী ডাকটি শুনলে গর্ব্বে যেন বুক ফুলে ফুলে ওঠে মহাশ্বেতার। এত মধু বুঝি আর অন্য নামে নেই। এ নামে যে আর কেউ কখনও ডাকলো না ! নামে কত মধু !

সলজ্জায় ইদিক সিদিক দেখতে থাকেন মহাশ্বেতা।

কেউ দেখলো না তো ! কেউ শুনলো না তো ! সমগ্র পৃথিবীর কাছে গোপন থাক এই নাম, কেউ যেন না জানে। না শোনে কখনও। জানাজানি থাক শুধু দু'জনার মধ্যে। দু'জন সুজনের অন্তরে অন্তরে।

—তোমাকে সত্যকার রাণী করবো রাতরাণী !

কি আনন্দে বলে ফেললেন কাশীশঙ্কর। কোন্ এক সুখের স্বপ্ন সার্থক হওয়ার ইঙ্গিত দেখলেন তিনি ! তারপরই যেন কথাগুলি বলে ফেললেন মুখ

াকে। কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতের তর্জনী দংশন করলেন জের। কথাটি ঠিক এই মাত্র বলা যেন উচিত হ'ল না। তবুও কি আনন্দে ার ভাবটি ব্যক্ত করে দিলেন।

গর্ব্বে উঁচু বুক মহাশ্বেতার। ঠোঁটে যেন অফুরন্ত হাসি! মিশি-মাখানো তের সারি দেখা যায় থেকে থেকে। গভীর লাল অধরে মৃদু-মন্দ হাসি নাচা-চি করে! কি যেন বলতে চান মহাশ্বেতা। আরও কি যেন শুনতে চান!

বৃক্ষের ছায়া দেখে সূর্য্যের গতি নির্ণয় করেন কাশীশঙ্কর! দিনের গতি ক্ষ্য করেন। বলেন,—স্নানাহারের সময় যে যায়! আমার জন্য তুমি এখনও ভুক্ত আছো রাতরাণী?

নীরব হাসি হাসেন মহাশ্বেতা। তিনি এখনও অভুক্ত,উপোসী, কে বলবে! তার কোন চিহ্ন নেই! মুখে শুধু অম্লান হাসি। যেন কোনদিন এ হাসি াবে না! মহাশ্বেতা বললেন,—কুমারবাহাদুর, যাও, স্নানার্থে যাও। ার বিলম্ব নয়। কথা বলতে বলতে তিলেকের জন্য হাসি গোপন করে বললেন, -আমার বুঝি ক্ষুধা-তৃষ্ণা নেই?

কৌতুকমিশ্রিত হাসি ফুটলো কাশীশঙ্করের ওষ্ঠপ্রান্তে। এ কথার প্রত্যুত্তর লেন না কোন। মহাশ্বেতার আকর্ণবিস্তৃত চোখে চোখ রেখে হাসলেন মৃদু কেমন এক অজ্ঞেয় রহস্যের হাসি! শিলাসন ত্যাগ করে উঠে পড়লেন। নলেন,—আমি বেশ পরিবর্ত্তন করে আসি। স্নান শেষ করে আসি। অতি ঘ্র ফিরবো। রাতরাণী, আর কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা কর, তুমি।

কথা বলতে বলতে চললেন কাশীশঙ্কর। দীর্ঘ পদক্ষেপে দ্রুত এগিয়ে লেন।

সদর মহলের খাসকামরায় চললেন। বেশভূষা পরিবর্ত্তন করতে হবে হুমূল্য রত্নাভরণ, যেখানে সেখানে ত্যাগ করা যায় কি?

দাস-ভৃত্য সকলই আছে। খানসামা-তাঁবেদারও আছে।

কিন্তু কারও যে সাহসে কুলায় না কাশীশঙ্করের সম্মুখে আসতে ! না ডাকতে আসবে ! সাড়া দেবে না ডাকতেই ?

গলা ছেড়ে কে এখন ডাক দেয় ? কে এখন চীৎকার করে ? একের জনের নাম ধ'রে কে এখন ডাকে ? কিন্তু শুধু ডাক দেওয়ার অপেক্ষায় আ যত সেবক-ভৃত্য। ডাক শুনলেই আসবে দুড়দাড়িয়ে ! পর পর তিনব কুর্ণিশ করে দাঁড়াবে। ঘুরবে ফিরবে পায়ে-পায়ে। পান আর তামাক ব'(বয়ে' ফিরবে। ফরসি আর নল !

সদরের খাসকামরায় পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে একটি ঝুলন্ত ছোট ঘড়ি পিটতে থাকেন কাশীশঙ্কর। একবার, দু'বার, তিনবার—

ব্যস, আর ডাকতে হবে না। ঘড়ি পিটতে হবে না আর অযথা।

কাশীশঙ্করের খাস-কামরা মোগলাই বৈঠকখানা বৈ কিছুই নয়। হিন্দুরীতি সঙ্গে ইরাণী রীতি মিশেছে এখানে। দক্ষিণমুখী এই কক্ষের চন্দ্রাতপ থেবে ঝুলছে নানা রঙের বেলোয়ারী ঝাড়। মেঝেয় পারশ্যের রঙীন গালিচা লতাপাতা ফলফুলের নক্সা-কাটা। দেওয়ালে দেওয়ালে মোগল-চিত্র। বাদশ আর বেগমের ছবি। এক দেওয়ালের কুলঙ্গীতে কষ্টির লক্ষ্মীমূর্ত্তি। বঙ্গভাস্কর্যে এক টুকরো নমুনা। লক্ষ্মীর মুখে যেন হাসি মাখানো।

দক্ষিণ-খোলা ঘর। বৈশাখী দিনের তপ্ত বাতাস আসে বাতায়ন-পথে আগুনের লেলিহান শিখা যেন অঙ্গে অঙ্গে পরশ বুলায় ! কাশীশঙ্কর বললেন,— কামতার, জানালার কপাট দাও ! বদলের পোযাক দাও।

ঘড়ির আওয়াজ শুনে অন্য কেউ আসতে সাহস পায়নি। কামতার খাঁ এসেছে। ছোটকুমারের পেয়ারের খানসামা ! ডাক শুনে এসে কক্ষের দ্বা দাঁড়িয়ে কামতার খাঁ সব প্রথম পর পর তিনবার কুর্নিশ ঠুকেছে। তার প কক্ষাভ্যন্তরে এসে দেখা দিয়েছে কুমারকে।

জানালায় কপাট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তদ্বারের অল্প আলোয় ঘরের মধে অরণ্যচারী পশুদের চোখ জ্বলতে থাকলো। আগুনের কতকগুলি বিন্দু, ঠিব অন্ধকারে আকাশের তারার মত জ্বল-জ্বল করে। কক্ষের কোণে কোণে লোলু

চোখে দাঁড়িয়ে আছে চিতাবাঘ, ভল্লুক আর বন্য মহিষ! শিকার ধরতে ওৎ পেতে আছে যেন!

যৌবনের প্রথম উদ্দামতায় অস্ত্র-সাহায্যে ওদের হত্যা করেছেন কাশীশঙ্কর। এখনও যেন ঐ পাশব চোখে তাই প্রতিহিংসার কুটিল দৃষ্টি। নেহাৎ ওদের হৃদয়ের স্পন্দন নেই তাই রক্ষা! তেজ নেই দেহে, শক্তি আর সামর্থ্য নেই—চর্ম্মের আবরণের ভিতর শুধু খড় আর খড়!

পোষাক-বদল শেষ হতে না হতে ঐ কুলঙ্গীর দিকে অগ্রসর হন কাশীশঙ্কর। মূর্ত্তির পদতলে মাথা রাখেন। চক্ষু মুদিত করেন। কি যে বলেন মনে মনে, কেউ শুনতে পায় না। হাস্যময়ী লক্ষ্মী শুধু হাসেন।

কাশীশঙ্কর মাথা তুলতেই কামতার খাঁ বললে,—হুজুর, দরোয়াজায় কে তাই দেখেন।

ব্যগ্রব্যাকুল চোখ ফেরালেন ছোটকুমার। বললেন,—কে?

কামতার আরেকটি কুর্ণিশ ঠুকে বললে,—রাজাবাহাদুরের দেওয়ান হুজুর!

ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে উঠলো কাশীশঙ্করের। গালিচায় আসীন হয়ে বললেন,—দেওয়ানজী, কি সমাচার? আসেন, ভিতরে আসেন।

দেওয়ানজী কক্ষের বাইরে দাঁড়িয়ে বললেন,—হুজুরদের গেরস্থালী কথা। এখানে তৃতীয় ব্যক্তি না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

কাশীশঙ্করের চোখে-মুখে ব্যস্ততার লক্ষণ প্রকাশ পায়। বললেন,—কামতার, বাহিরে যাও। ডাকলে আসিও।

দেওয়ানজী ভয়ে কি না কে জানে, কাঁপছেন ঠকঠকিয়ে।

ঘরের মৃত পশুদের জ্বল-জ্বলে চোখ দেখে হয়তো কাঁপছেন। ভয়ে ভয়ে প্রবেশ করেন দেওয়ানজী। যুক্তকরে বলেন,—সাতগাঁ থেকে একজন রমণী এসেছে রাজবাড়ীতে। নাপিতানী বলেই মনে হয়।

কি বলে সে? অধীরকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন কাশীশঙ্কর। বলেন,—কোন সংবাদ আছে?

—হাঁ কুমারবাহাদুর। বললেন দেওয়ানজী। বললেন,—আমাদের

রাজাবাহাদুর সাক্ষাৎ দিয়েছেন ঐ রমণীকে। সে না কি বলছে যে, আমাদের মহামান্য রাজকুমারী বিন্ধ্যবাসিনীকে না কি গড় মান্দারণে চালান দেওয়া হয়েছে! সেখানে তিনি না কি বন্দিনী হয়ে আছেন?

—সে কি কথা!

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন কাশীশঙ্কর।

—হাঁ কুমারবাহাদুর! সে তো তাই বলে।

দেওয়ানজী কম্পমান সুরে কথাগুলি শেষ করে দম ফেললেন।

কাশীশঙ্কর বললেন,—আপনাদের রাজা সকল বৃত্তান্ত অবগত আছেন? তিনি কি বলেন?

দেওয়ানজী বললেন,—রাজাবাহাদুর কি ঠিক প্রকৃতিস্থ আছেন কুমারবাহাদুর! তিনি এই সংবাদ কুমারবাহাদুরকে জানাতে নির্দ্দেশ করেছেন। লোক মারফৎ নির্দ্দেশ পাঠিয়েছেন।

ভীষণ এক চিন্তায় চিবুক ছুঁলেন কাশীশঙ্কর।

বাঁকা তরোয়ালের মত দুই ভ্রূ আর সরল হয় না। কাশীশঙ্করের দৃষ্টি ভূমিতে নিবদ্ধ হয়। ঘটনা শুনে থমকে যান চকিতের মধ্যে। নিজ মনেই স্বগত করেন,—গড়মান্দারণে বিন্ধ্যবাসিনী! এ কেমন কথা! তা হবে, তা হবে। গড়মান্দারণে যে কৃষ্ণরামের ভগ্ন অট্টালিকা আছে এক!

কুলিনশ্রেষ্ঠ জমিদার কৃষ্ণরামের গৃহসংলগ্ন বহু বিশাল আসমান-দীঘির ঘাটের জল চলকে চলকে ওঠে। কাকচক্ষু জল। পানায় পরিপূর্ণ অধিকংশ দীঘি। জল দৃষ্ট হয় না আপাতচোখে। দীঘির ঘাটের হিমশীতল জল চলকে চলকে ওঠে। আলোড়ন ওঠে জলে।

বর্ষার মেঘের মত রুক্ষ-চুলের বোঝা নিয়ে অতি সন্তর্পণে ঘাটে নেমেছেন বিন্ধ্যবাসিনী। ঘাটের ধাপে ধাপে শৈবাল। কখন পা পিছলায় ঠিক নেই। আকণ্ঠ জলে নেমেছেন রাজকুমারী। অবগাহন করবেন। মনের জ্বালা, দেহের জ্বালা জুড়াবেন আসমান-দীঘির শীতল জলে। পরিচারিকা যশোদা

বলে,—হ্যাঁ বৌ, চুলে তেল না দিয়েই ডুব দেবে? এসো আমি তেল দিয়ে দিই চুলে। রুখু চুলে কি স্নান হয়?

—না, থাক যশোদা। চুলে আর তেল দেবো না। ইহজন্মে আর নয়।

রাজকুমারীর অভিমানী কথা ভেসে আসে দীঘির জল থেকে। দীঘির জলে সহসা আর এক রাজকুমারীর ছায়া দেখেন বিন্ধ্যবাসিনী। নিজের ছায়া দেখেন, নিজের রূপের ছায়া।

বিতৃষ্ণায় চোখ ফিরলো। রাজকুমারী আর দেখলেন না। অবগাহনের ডুব দিলেন তৎক্ষণাৎ।

আসমান-দীঘির ঘাটের কাজল-কালো জল চলকে চলকে উঠলো। স্থির-গম্ভীর দীঘির জলে তরঙ্গের দোলা!

ফটকে কতগুলি পাহারা! বারুদভর্ত্তি সঙ্গীন তাদের হাতে। তাদেরও চোখে পড়লো না? গাদা-বন্দুকের বারুদ ফুরিয়ে গেছে কি?

বিনা অনুমতিতে, বিনা পরিচিতিতে যদি কোন কেউ রাজগৃহে প্রবেশ করে এবং অতঃপর যদি তেমন কোন নির্ভরযোগ্য কারণ দর্শাতে না পারে—তাকে তোমরা বন্দুক দাগতে পারো—এই কঠোরতম নির্দেশ স্বয়ং রাজাবাহাদুরের। গদীপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই এক গোপন দরবারে, রাজা বাহাদুর কালীশঙ্কর অনুমোদন করেছিলেন এই আদেশ-আজ্ঞা। যাঁর মাথায় কিরীট, সেই মুকুটধারীর মাথার মূল্য কত? অবারিত দ্বারপথে আসে যদি কোন হত্যাকারী, গুপ্তঘাতক! কোন ষড়যন্ত্রের অধিনায়ক ছদ্মবেশে এসে যদি দেখে যায় রাজপ্রাসাদের অলি-গলি; অন্দর আর বাহির। এই সুবিশাল রাজগৃহের অ্যানাটমিটা যদি কেউ মনোমুকুরে এঁকে নিয়ে যায়? রাজবাড়ীর গোপন মানচিত্র, চোখে পড়ে যদি কোন' দুর্জ্জনের?

ফটকে কতগুলি পাহারাদার! কতগুলি সশস্ত্র রক্ষাকর্ত্তা প্রধান রাজ-তোরণের! কতগুলি পাঠান প্রহরী! তাদের সঙ্গীনের বারুদ বুঝি ফুরিয়েছে!

লাল শালুর চাপকান। সাদা মলমলের চুড়িদার পায়জামা। মাথায়

গোলাপী আদ্দির পাগড়ীতে রাজতকমা। পায়ে নাগরা। হাতে হাতে গাদা-বন্দুক। এতগুলি তোরণরক্ষীর কেউ দেখলো না ?

কাশীশঙ্কর সজোর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন,—ঐ নাপতিনীকে রাজ-অন্দরে প্রবেশের অনুমতি দান করলে কে দেওয়ানজী ?

বৃহৎ প্রকোষ্ঠ। কাশীশঙ্করের দক্ষিণমুখী বৈঠকখানা গড়ে-প্রস্থে সুদীর্ঘ। তেমনই উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত। কক্ষশীর্ষ বহু উচ্চে। কাশীশঙ্করের কথার প্রতিধ্বনি উঠলো রুদ্ধবাতায়ন, প্রায়ান্ধকার কক্ষে! কেমন যেন গর্জ্জে গর্জ্জে কথাগুলি বললেন তিনি। চিন্তা-গম্ভীর কণ্ঠে।

একেই চোখে আঁধার দেখেন দেওয়ান। আর দেখেন বন্যজন্তুর জ্বল-জ্বলে চোখ। মরা জানোয়ার, তবুও কি করালকুটিল দৃষ্টি! প্রতিহিংসার ছায়া যেন পাশব চোখে।

বক্ষে বল সঞ্চয় করে দেওয়ান বললেন,—আমি সঠিক অবগত নই কুমার বাহাদুর!

আবার সেই তর্জ্জন-গর্জ্জন। আবার সেই প্রতিধ্বনি।

কাশীশঙ্কর বলেন,—দেওয়ানজী, এই কর্ত্তব্য আপনার। রাজপুরিতে কে আসে না আসে আপনি যদি অবগত না থাকেন, তবে এ তো আপনারই কর্ত্তব্যহীনতার পরিচয়! আপনি অবগত নন, এ কথা কি সম্পূর্ণ সত্য ?

কথা বলতে গিয়ে আর বলতে পারে না দেওয়ান।

তালু শুকিয়ে যায় হয়তো। টাকরা শুকিয়ে যায় ভয়ের আতিশয্যে। অস্পষ্ট সুরে বললেন,—হাঁ কুমার বাহাদুর, আমি মিথ্যা বলি নাই। মনে হয় নাপতিনী—

কথা বলতে বলতে কথা থেমে যায়। কেমন থমকে থেমে যায় দেওয়ান, কথার মধ্যপথে।

—মনে হয় নাপতিনী—

দেওয়ানের অসম্পূর্ণ কথাগুলি পুনরাবৃত্তি করলেন কাশীশঙ্কর। প্রশ্নের সুরে।

ভীতিকাতর ও কম্পিত কণ্ঠ দেওয়ানের। কোন রকমে সাহসে বুক বেঁধে বললেন,—মনে হয়, নাপতিনী সপ্তগ্রামের জমিদারের নামোল্লেখ করায় তাকে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছে ফটকের রক্ষী।

নীরব-গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করলেন কাশীশঙ্কর। চিবুক স্পর্শ করলেন নিজের। চিন্তাকুল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলেন। কিঞ্চিৎ বিরক্তি ফুটলো মুখভঙ্গীতে। বেশ কয়েক মুহূর্ত্ত নিশ্চুপ থেকে বললেন,—এখনও পর্য্যন্ত আমার স্নানাহার চুকাতে পারি নাই! সাতগাঁওয়ের ঐ নাপতিনী যেন রাজ-মাতার সমীপে না যায়। সহোদরা বিন্ধ্যবাসিনীর এই নির্ব্বাসনদণ্ড তাঁর সহ্য হবে না। শ্রবণ মাত্রে হয়তো মূর্চ্ছাগ্রস্ত হবেন। হাঁ, আপনাদের রাজার সহ সাক্ষাৎ হবে বৈকালে। তৎপূর্ব্বে নয়।

—ঠিক কথা। যথার্থই বলেছেন কুমার বাহাদুর! আমিও যাই, সেই মত ব্যবস্থা করি। কুমার বাহাদুর যদি অনুমতি দেন আমি প্রস্থান করি।

দেওয়ান এক নিশ্বাসে কথা ক'টি শেষ করলেন। যেন মুখস্থ বলে গেলেন।

কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে আছেন কাশীশঙ্কর। চিবুক স্পর্শ করে আছেন তো আছেনই। দেওয়ানের কথাগুলি শুনেছেন কি শোনেননি, বোঝা যায় না। কক্ষময় ছড়িয়ে আছে বন্যপশু—বাঘ, ভল্লুক, বন্যমহিষ। ওদের দৃষ্টির মতই প্রতিহিংসার চাউনি ফুটেছে কাশীশঙ্করের আয়ত দুই চোখে। কার প্রতি ক্রোধ, কার তরে প্রতিহিংসা! তাকে যদি একবার হাতের নাগালে পেতেন! হয়তো নকল নখরের সাহায্যে তার বক্ষ বিদীর্ণ করতেন। টুঁটি কামড়ে ধরতেন!

কিন্তু এখন কোথায় পাবেন জমিদার কৃষ্ণরামকে ?

শিকার কখনও স্বেচ্ছায় শিকারীর হাতে ধরা দেয়! জীবিতাবস্থায়!

ভাবনার রঙীন জাল ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় থেকে থেকে। ছোটকুমারের চিন্তায় পূর্ণচ্ছেদ পড়ে না, তবু ছেদ পড়ে। কাশীশঙ্কর বললেন,—আর বৃথা কালক্ষেপ নয়। আপনি এই মুহূর্ত্তে যান, সেই মত ব্যবস্থা করুন। নাপতিনী যেন মাতৃদেবীর মহলে প্রবেশ করতে না পারে। বিলাসবাসিনী সামান্য কারণে বড় অস্থির হন, সাবধান!

মুক্তির আনন্দে দেওয়ান যেন স্বস্তির শ্বাস ফেললেন। চকিতের মধ্যে দ্বারের বাহিরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

যেন এক সুখস্বপ্ন! একটি সুমিষ্ট সঙ্গীত! এক রঙ-লাগা মনের রঙীন কল্পচিন্তা!

স্বপ্নের মধু-রাতে যদি বারে বারে তন্দ্রাভঙ্গ হয়! গানের যদি তাল কেটে যায়! ক্ষণে ক্ষণে যদি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় মানসচিন্তা! মনে মনে বিরক্ত হন কাশীশঙ্কর।

যেন শুক্লারাতের জ্যোৎস্নালোকিত সোনালী আকাশ,—কালো মেঘের শ্যামছায়ায় বারে বারে বিলীন হয়ে যায় দৃষ্টির অন্তরালে। অনাগত ভবিষ্যদিনের ছায়া ; ছায়াছবি—মরমতুলিকায় যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে!

অতীতের নাকি কোন রূপই নেই।

মহাকালের নির্ম্মম শোষণে অতীত নিশ্চিহ্ন। ফুরিয়ে-যাওয়া অতীত শুধু নিরাশার, শুধু অনুশোচনার। আর কত আনন্দের মঙ্গল-আলো বহন করে আনে সেই অনাগত! আনে কত আশা আর আশ্বাস! তমসাচ্ছন্ন অতীত তো দেউলিয়া , আর ভবিষ্যৎ পরিপূর্ণ।

কাশীশঙ্করের মনের মণিকোঠায় আশার প্রদীপখানি সদাই জ্বলছে। না-আসা দিনের কত কথাই না মনে জাগে তাঁর। জেগে জেগেও স্বপ্ন দেখেন। কত আশার স্বপ্ন কাশীশঙ্করের!

স্বপ্নে দেখেন, তিনি একজন বিরাট মহাজন হয়েছেন। ব্যবসার বাজারে।

লক্ষ লক্ষ টাকা খেলিয়ে চলেছেন নিজ হাতে। বাজারদর খতিয়ে খতিয়ে মাল ছাড়ছেন, চেপে রাখছেন। চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ।

বুড়ো শিবের বাজার আছে গোবিন্দপুরের কাছাকাছি, গঙ্গার তীরে, রাজ্যের যতেক পণ্য বিকিকিনি হয় সেখানে। উৎপাদকের হাত থেকে মাল চলে যায় মহাজনের হাতে। মহাজনের কবল থেকে পাইকারদের হাতে। সেখান

থেকে খুচরা-বিক্রেতাদের কাছে। মধ্যগ বা দালাল শুধু দালালি ভোগ করে। কিছু না ঢেলেই ঘরে তোলে কত শত টাকা!

বুড়ো শিবের বাজার থেকে কেউ মাল ঘরে তোলে, কেউ দূরে পাঠায়। নিকাশ-ঘর থেকে মাল চালান হয়ে যায় নৌকা আর জাহাজে। যায় দেশে আর বিদেশে। শহর থেকে দূরের গ্রামে যায়। বাজারে আসে উৎপাদকের নিয়োজিত জন; আসে দালাল আর মহাজন। পাইকার আর খুচরা ব্যবসায়ী আসে। ক্লিয়ারিং হাউস কখনও পরিপূর্ণ, কখনও শূন্য থাকে।

কাশীশঙ্করের মনের চিন্তা, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা যেন ভেঙে খান খান হয়ে যায় একেক ঘটনায়। মনে মনে বিরক্ত হন তিনি। চিন্তার জাল ছিন্ন হয়ে যায়। যেন স্বপ্ন ভঙ্গ হয়! গানের যেন তাল কেটে যায় বারে বারে।

ঘরে তিনি একা। যেন নীরব নিথর। সাড়া-শব্দ নেই কোন।

কৃষ্ণরামের অমানুষিকতায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন ছোটকুমার। বজ্রের মত কঠোর যাঁর মন আর দেহ, তিনিও যেন কথঞ্চিৎ বিচলিত হয়ে পড়েন দেওয়ানের অপ্রত্যাশিত কথায়।

—কামতার খাঁ!

উচ্চকণ্ঠে ডাক ছাড়লেন কাশীশঙ্কর। ঘরে প্রতিধ্বনি ভাসলো তাঁর উদাত্ত আহ্বানের।

ঘরে সিঁদিয়ে উপরি উপরি তিনবার কুর্ণিশ ঠুকলো অর্দ্ধ-আনত কামতার খাঁ। বললে,—হুজুর, বেয়াদপি মাফ করবেন। আমি এখানেই আছি হুজুর, আপনার ডাক শুনেই হাজিরা দিয়েছি। কসুর মাফ করবেন।

কামতার খাঁ বলশালী ব্যক্তি। যেমন দৈর্ঘ্যে, তেমনি প্রস্থে।

যেন এক অতিমানব, ক্ষুধার জ্বালায় মানুষ-সমাজে এসে পড়েছে। কামতারের বুকের ছাতি প্রায় সাত বিঘত। বলিষ্ঠ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। এত যার বলবিক্রম, সে যেন মূষিক-প্রায় হয়ে গেছে। সসম্ভ্রমে। সিংহের কাছে যেন মূষিকপুঙ্গব।

ঘরের ফরাসে পায়চারী করতে থাকেন কাশীশঙ্কর। কেমন যেন হতাশ পদক্ষেপ।

তাঁর পদাঘাতে ফরাসের লতা-পাতা-ফুল বুঝি পিষ্ট হয়ে যায়! ঘরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্য্যন্ত যান আর আসেন। সুখস্বপ্ন ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেছে। দেওয়ানজীর কথা শুনে যেন স্তব্ধ হয়ে গেছেন।

সওদাগরী ময়ূরপঙ্খীতে পাল তুলে দিয়ে বাণিজ্যযাত্রা,—দেশ থেকে দেশান্তরে পাড়ি জমিয়ে পণ্যবিনিময়ে রাশি রাশি অর্থলাভ, লক্ষ্মীলাভ—দেওয়ানের কথায় কাশীশঙ্করের হাসি-হাসি মুখ শান্ত হয়ে যায়। অর্থগৃধ্নু কৃষ্ণরাম কি অমানুষ। কি বর্ব্বর!

দাঁতে দাঁত চাপলেন কাশীশঙ্কর। তাঁর বিশাল বক্ষের কোথায় যেন ব্যাথার আঘাত পড়েছে, বুকে জ্বালা ধরেছে। ক্রোধ আর আক্রোশে জ্বলছেন। গড়-মান্দারণের কোন্ এক পাষাণপুরীতে বিন্ধ্যবাসিনী, কত কষ্ট আর কত যন্ত্রণা ভোগ করছে কে জানে? কেঁদে কেঁদে ভাসছে হয়তো আঁখি-সলিলে!

কুলের অসম্মান। একই দেহশোণিতের নির্দ্দয় অবমাননা।

হাতের মুঠো কঠোর কঠিন হয়। ক্রোধ আর আক্রোশে যেন ফুলতে থাকেন কাশীশঙ্কর। ভূমিতে নিবদ্ধ দৃষ্টি ফিরিয়ে, পায়চারী থামিয়ে উদাসনম্র কণ্ঠে ডাকলেন,—কামতার খাঁ!

সাড়া দেয় না কামতার। দেখা দেয় শুধু।

কুমারবাহাদুরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সাড়া দেবে কোন্ সাহসে? কাশীশঙ্কর দ্বার-প্রান্তে দৃষ্টি প্রসারিত করেন। দেখেন, কামতার খাঁ কুর্ণিশ ঠুকছে। এক মুক্তদ্বারের মুক্ত আলোয় দেখা দেয়। কুর্ণিশ শেষ হয়ে যায়, তবু অবনত মাথা তোলে না। এতই সম্ভ্রম!

তেমনই উদাস-গম্ভীর স্বরে কাশীশঙ্কর বলেন,—পবিত্র বস্ত্র দাও স্নানঘরে। কেশতৈল দাও। গা মোছার গামছা দাও। জলে চন্দনচূর্ণ দাও।

কামতার খাঁর মুখে হাসির রেখা। অকৃত্রিম হাসির আভাস। শব্দহীন হাসির সঙ্গে কামতার বলে,—বিলকুল বন্দোবস্ত আছে হুজুর! মেহেরবাণি ক'রে এখন আপনি গুসলখানায় গেলেই দেকবেন যে বিলকুল ঠিকঠাক।

কাশীশঙ্কর শুনলেন কি শুনলেন না। মনে হয়, কথায় যেন কর্ণপাত করলেন

না। অন্যমনা হয়ে থাকলেন। দুই পলকহীন চোখে হতচকিত দৃষ্টি ফুটেছে। বাক্য যেন রোধ হয়ে গেছে। সহসা কথা বললেন, আপন মনেই, বললেন,— কুলীনকন্যার মৃত্যুই ভাল।

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সংযত করেন। এ কি কথা বলেন কাশীশঙ্কর? জিহ্বা দংশন করলেন। কত স্নেহের, কত আদরের, কত যতনের রাজকুমারী বিন্ধ্যবাসিনী! সহোদরার সরল-সুন্দর মুখচ্ছবি চক্ষুপথে ভেসে ওঠে বুঝি। সেই সদাহাস্যময়ী বিন্ধ্যবাসিনী হয়তো সেই যক্ষপুরীতে কেঁদে কেঁদে সারা হয়ে গেল!

কাশীশঙ্করের বিশাল বক্ষের কোথায় যেন ব্যথার আঘাত লাগে।

রুদ্ধঘরে হঠাৎ যেন ঝড় বইতে থাকে। টানাপাখা টানতে থাকে কে কোথায় থেকে। ক্রোধ আর উত্তেজনায় উদ্বিগ্ন কাশীশঙ্কর তবুও দর-দর ঘামতে থাকেন। আঁটসাঁট পোষাক ছিল দেহে, মাথায় ছিল উষ্ণীষ, তাই ঘর্ম্মাক্ত কলেবর। কপালে স্বেদবিন্দু, হীরার কুচির মত জ্বল-জ্বল করে।

—সুপ্রভাত! তোমার যে সাক্ষাৎই মেলে না কুমারবাহাদুর!

কে এক বয়োবৃদ্ধের কাঁপা-কাঁপা কথা শুনলেন কাশীশঙ্কর। দুয়ার পানে তাকিয়ে দেখলেন। সসম্ভ্রমে অগ্রসর হলেন সেদিকে।

আগন্তুকের পদদ্বয়ে হস্ত স্পর্শ করলেন। বললেন,—লালা-ভাই, চরণাশীর্ব্বাদ দিন। আমার গোবিন্দপুর যাত্রা সফলকাম হওয়ার পুরস্কার দিন।

—জয় হোক! জয় হোক!

বৃহৎ প্রকোষ্ঠে অশীতিপর বৃদ্ধের কম্পিতকণ্ঠ রণরণিয়ে ওঠে। উপবীতসহ হাত কাশীশঙ্করের কপালে রাখলেন তিনি। বললেন,—নিশ্চিত জয় হবে। তবে, আমি সামান্য জন, আমার আশীষে কি ফল হবে? আমিই যে তোমার দয়ার প্রত্যাশায় থাকি কুমারবাহাদুর।

দুই বাহুর আলিঙ্গনে বেঁধে ফেললেন কাশীশঙ্কর ঐ বৃদ্ধকে। বক্ষে জড়িত রেখে বললেন,—লালা-ভাই, তুমি সামান্য নও, তুমি অসামান্য, তুমি মহৎ,

তোমার অন্তর প্রশস্ত, তোমার আশীষ যে আমার নিকট জয়টীকা! তা কি
তোমার অজ্ঞাত?

লালা-ভাই দন্তহীন মাড়ি বের করে মৃদু মৃদু হাসতে থাকেন। শিশুর মত
হাসি। কাশীশঙ্করের বক্ষলগ্ন হয়ে সহাস্যে বললেন,—তবে আমার প্রতি
তোমার এই অবিচারের কারণ কি কুমারবাহাদুর? আমার মৃত্যু হোক, এই
কি তোমার অভিপ্রায়?

শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন কাশীশঙ্কর। বাহুপাশ শিথিল করলেন। বললেন,
—এমন কথা কেন লালা-ভাই? তোমার অনুমান সর্ব্বৈব মিথ্যা। তোমাকে
যে এক তিল না হেরিলে, শত যুগ মনে হয়! কেন এই অভিযোগ?

লালা-ভাইয়ের মুখের হাসি মিলায় না। শিশুর মত সহজ সরল হাসি
হেসে বললেন,—আমার দৈনন্দিন প্রাপ্য আরক থেকে তবে আমি কেন বঞ্চিত
হই? আমার কি অপরাধ?

হো-হো শব্দে হাসলেন কাশীশঙ্কর। অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন যেন।
বেশ কয়েক মুহূর্ত্ত হাসির পর বললেন,—লালা-ভাই, আমিই নিষেধ করেছি যেন
তোমাকে এত ঘন ঘন আরক পানীয় না দেয়। তুমি কি বিস্মৃত হও যে
তোমার শরীরে পূর্ব্বের মত আর সেই জোর নাই? তুমি এখন প্রায় অক্ষম
তদুপরি যদি তুমি আরক-পানের মাত্রা ক্রমেই বর্দ্ধিত কর, তবে তো বিপদের
আশঙ্কা আছে!

লালা-ভাইয়ের মুখাকৃতির ঈষৎ পরিবর্ত্তন হয়। বিষাদ নামে মুখে
বার্দ্ধক্য-ভরা দুই চোখ যেন ছলছলিয়ে ওঠে। বলেন,—পরপারের যাত্রী আমি,
আমার আবার বিপদ কি? মৃত্যু যার সুনিশ্চিত তার জন্য—

—লালা-ভাই! ধমকে উঠলেন কাশীশঙ্কর। বললেন,—অযথা অর্থহীন
প্রলাপ বকেন কেন?

ছোটকুমারের সশব্দ কণ্ঠে চমকে ওঠেন যেন বৃদ্ধ। বলেন,—মানুষ বাল্যে
পিতার অধীনে থাকে, যৌবনে স্ত্রীর অধীনে এবং বার্দ্ধক্যে পুত্র-পৌত্রাদির
অধীনে। আমার তো এ সকল বালাই নাই। ত্রিভুবনে তুমি ব্যতীত কো

আমার আপন নাই। তোমার বিচারে আমি কোথা যাই এই বুড়ো বয়সে? আরক বিনা যে আমার চলে না কুমারবাহাদুর!

কাশীশঙ্কর গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করেন হঠাৎ। বজ্রগম্ভীর সুরে বললেন,—লালা-ভাই, আমার মন আজ অস্থির। তোমার আরক-পানের চিন্তা আমার মনোমধ্যে নাই। এইক্ষণে জ্ঞাত হলাম, সহোদরা বিন্ধ্যবাসিনীকে গড়-মান্দারণে চালান পাঠিয়েছে জমিদার কৃষ্ণরাম।

কোটর থেকে নেত্রগোলক ঠেলে যেন বেরিয়ে আসে বৃদ্ধের। বিস্ময়চকিত হয়ে বলেন,—যাই বল; ছোটকুমার, এই জগৎ মনুষ্য-সাম্রাজ্য! দেবতার বিধান, শাস্ত্রের অভিমতের কোন মূল্য নাই মানবের পৃথিবীতে। তুমি দেখিও, মানুষই যত প্রকার কু-কর্ম্মের কারক হবে। তজ্জন্য বিচলিত হওয়ার অর্থ কি?

কাশীশঙ্করের বিশাল বক্ষের কন্দরের কোথায় যেন ব্যথার বীণা ঝনঝনিয়ে ওঠে। দূর, বহুদূর গড়-মান্দারণের পাষাণ-পুরীর অন্তর থেকে কোন্ এক নির্য্যাতিতার ক্রন্দন যেন হাওয়ায় ভেসে আসে! কাশীশঙ্কর যেন কানে শোনেন, কার তীব্র করুণ রোদনধ্বনি এই রাজভবনের আশে-পাশে প্রতিধ্বনিত হয় থেকে থেকে।

ছোটকুমারকে নিস্তব্ধ দেখে লালা-ভাই পুনরায় বললেন,—শাস্ত্রমতে জাতিপাত অপমৃত্যুর তুল্য। তোমাদের জামাতা জমিদার কৃষ্ণরামের জাতিনাশ হওয়ায় সমস্ত স্বত্ব নাশ হয়েছে। আমি ভালই জানি, কৃষ্ণরাম আজ নয়, বহু কাল পূর্ব্বেই পতিত হয়েছে। স্ত্রীজাতির মধ্যে সে হিন্দু-মুসলমানের তফাৎ দেখে না। তবু, আমাদের রাজকুমারীর প্রতি এই নির্য্যাতন কেন?

দুই হাতের দশ নখর যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে। বক্ষ স্ফীত হয়।

কা'কে যেন সম্মুখে পেতে চান কাশীশঙ্কর। কার যেন বুক চিরে ফেলতে চান নখর সাহায্যে। সেই বিদীর্ণ বক্ষ থেকে উপড়াতে চান তার হৃৎপিণ্ড! দাঁতে দাঁত চেপে বললেন,—কৃষ্ণরাম আমাদের পৈতৃক ধন-সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ গ্রাস করতে চায়। আমাদিগের পক্ষ থেকে অসম্মতি শুনেই হয়তো এই নৃশংস কার্য্যে লিপ্ত হয়েছে।

লালা-ভাই আরেক মুহূর্ত্ত থাকলেন না সেখানে। ঐ ন্যুব্জ-কুব্জ বৃদ্ধ দারুণ মনঃকষ্ট বুকে বহন করে নিয়ে হনহনিয়ে চলে গেলেন। এক মুক্ত দ্বারপথে নিষ্ক্রান্ত হ'লেন। কাশীশঙ্কর দেখলেন, দুগ্ধ-শুভ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত লালা-ভাই, অশ্রু সম্বরণ করতে পারলেন না আর। ছল-ছল চক্ষে বিদায় নিলেন তৎক্ষণাৎ।

কেমন যেন অসহায়ের মত চীৎকার করলেন কাশীশঙ্কর। ডাকলেন উচ্চ কণ্ঠে,—লালা-ভাই, যাও কোথা? তুমি আমাদিগের পিতৃবন্ধু, একটা সৎপরামর্শ দিয়ে যাও এ-হেন বিপদে!

কত অধিক বয়স, তবুও এখনও বর্ণ তাঁর অম্লান। শুভ্র গৌরবর্ণ।

ফুরফুরে সাদা দাড়ি-গোঁফ। মাথায় সাদা মলমলের তাজ-টুপী। গায়ে কাশী-রেশমের ঝলঝলে জোব্বা। তসরবস্ত্র, পায়জামার মত মালকোঁচা দিয়ে পরেছেন লালা-ভাই। ছেঁচা পান খেয়েছেন কোন্ সকালে, তারই রক্তিমা অধরে।

লালা-ভাই বিদায় সত্যিই নিলেন!

কাশীশঙ্করও ত্যাগ করলেন বৈঠকখানা। কিছুক্ষণ স্তব্ধ দাঁড়িয়ে তিনিও চললেন। কামতার খাঁ অনুসরণ করলো শুধু কপালে সেলাম ঠুকতে ঠুকতে।

কক্ষের বাইরে বেরিয়ে কাশীশঙ্কর প্রাঙ্গণ-শেষের অন্দরপ্রান্তে চোখ মেললেন।

গৃহশীর্ষের দিকমুক্ত হাওয়াখানায় কুমারের ব্যগ্র-দৃষ্টি থমকালো। কে ঐ হাওয়াখানায়? আকাশচারী পরী না কি! নয়তো কোন সুন্দরী উপদেবতা হয়তো আকাশে ডানা মেলে উড়ে উড়ে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে হাওয়াখানায় আশ্রয় চেয়েছে। হাওয়াঘরের ওপারে বৈশাখের স্বচ্ছ নীল আকাশ। মুক্তমধুর বাতাসে অপ্সরীর কেশের রাশি উড়ছে।

প্রথমে স্বচোখের দৃষ্টিকে বিশ্বাস হয় না কাশীশঙ্করের।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে চিনতে পারেন যেন আকাশের পরীকে।

—রাতরাণী!

মুখের আগল ভেঙ্গে কথা উচ্চারিত হয়। একটি মাত্র শব্দ।

—আমার কি ক্ষুধা-তৃষ্ণা নেই ?

কাশীশঙ্করের মনে পড়লো, তাঁর সহধর্ম্মিণী মহাশ্বেতা এখনও উপবাসী, অভুক্ত। ক্ষুধায় কাতর হয়তো। তৃষ্ণায় আকুল।

কুমারের প্রত্যাবর্ত্তনে বিলম্ব দেখে, প্রতীক্ষায় থেকে থেকে, ক্ষুধায় অধীর হয়ে কুমার-পত্নী ঐ হাওয়া-ঘরে উঠেছেন। সেখান থেকে দেখা যায় সদর-বৈঠক। দেখা যায় যদি রাতরাণীর রাতের রাজাকে! কি এমন গুরুতর কার্য্য এখন তাঁর!

আরেক পল কালক্ষেপ নয়। ব্যস্তপদে কুমার চললেন গোসলে। কামতার খাঁ-ও চললো, সেলাম ঠুকতে ঠুকতে, পেছন পেছন :

মহাশ্বেতার ক্ষুধা-তৃষ্ণা সত্যিই নেই। তাঁর অভিযোগ মিথ্যা। একেই ব্রাহ্মণের ঘর। চাকর-চাকরাণী দ্বারা ব্রাহ্মণের গৃহে বিশেষ কি-ই বা সুবিধা! পাকের ঘরে শূদ্রের জল অচল, পূজার ঘরেও অব্যবহার্য্য। মহাশ্বেতা নিজে পাক করেন, পূজার ব্যবস্থাদি করেন। তার পর আছে নিজের শিবপূজা, ইষ্টমন্ত্র জপ ;—বেলা তৃতীয় প্রহর নাগাদ শালগ্রামশিলার ভোগ। স্বয়ং নারায়ণ উপোসী থাকবেন, প'ড়ে থাকবেন অস্নাত অবস্থায়, শয়নের দেরী হয়ে যাবে তাঁর—আর মহাশ্বেতা হেসে-খেলে দিন কাটাবেন!

আহার শেষেও এক মুহূর্ত্ত বিশ্রামের যো নেই।

সাংসারিক আয়-ব্যয় দেখতে হয় মহাশ্বেতাকে। আরও কত কি করতে হয়! টাকার সুদ, আসল আদায়ের চেষ্টা করতে হয়! রাইয়তের কাছে খাজানা আদায় আর তার সরঞ্জাম খরচা দেখতে হয়। খামার জমিতে বর্গাদার পত্তন ক'রে বিছন দিতে হয়। বর্গাদারী শস্য-ফসলের ভাগ বুঝে নিতে হয়। অতিথি অভ্যাগত কুলজনের যথোচিত অভ্যর্থনা জানাতে হয়।

কাজের অবসর মিললে, পাঠ দিতে হয় মহাশ্বেতার দশম বর্ষীয়া নিজ কন্যাকে! এক ফুটফুটে মেয়ে, বনলতাকে!

বর্ণমালার সঙ্গে পরিচয় আছে মহাশ্বেতার। কলা আর বানানের সঙ্গে! আলাপ আর ব্যাকরণের সঙ্গে! সাহিত্যের সঙ্গে! বৈষ্ণবী সাহিত্য!

মনের মানুষকে দেখতে পেয়ে, হৃদয়ের চোখে দেখতে পেয়ে কিছু বা স্থির হন মহাশ্বেতা। চার চোখ এক হ'তে লজ্জা ভুলে দুই বাহু মেলে ইশারা ডাক দিয়েছিলেন কুমারবাহাদুরকে। লজ্জা ভুলেছিলেন ক্ষণেক তরে।

এই ভরা দুপুরে কে আর দেখবে, কাকপক্ষী ছাড়া!

—মা গো, তুমি কোথায়?

হাওয়া-ঘরে এক ঝলক মিষ্টি হাওয়ার মত যেন কোথা থেকে উড়ে এলে বনলতা। বললে,—আমি তো খুঁজে খুঁজেই সারা!

—আহা, বাছা আমার!

কন্যাকে বুকে জড়ালেন মহাশ্বেতা। হাসিভরা মুখে বনলতার কপালে চুমুর টিপ পরিয়ে দিলেন কথার শেষে।

বনলতার অভিমানী মুখ। ঐ ফুটফুটে মুখে আবার গাম্ভীর্য। কাজলপর চোখে দুঃখের ছায়া! বনলতা অভিমানের সুরে কথা বলে। বলে,—মা গো দাসীকে তুমি শাস্তি দাও।

—কেন রে বন? কি করলে দাসী?

ব্যগ্রব্যাকুল প্রশ্ন করলেন মহাশ্বেতা। বনলতাকে আরও কাছে টে নিলেন। চিবুক তুলে ধরলেন মেয়ের।

বনলতা বলে,—দাসী যে আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়!

—সে কি কথা! বললেন মহাশ্বেতা। বললেন,—ঘুম পাড়িয়ে দে ভালই তো করে দাসী। ঠিক দুপুর বেলা, ভূতে মারে ঢেলা—

মায়ের বুকে ভয়ে মুখ লুকায় মেয়ে।

দু' হাতে মায়ের মুখ চেপে ধরে। বলে,—আর ব'ল না, ব'ল না। আ তবে যাই, ঘুমিয়ে পড়ি?

আর সম্মতির অপেক্ষা নয়, পরনের খাটো লাল-পাড় সুতির শাড়ীর আঁচ খোঁজে বনলতা। চোখে চেপে এক দৌড়ে পালায় হাওয়া-ঘর থেকে! দু

পিশাচ যদি কোথাও থেকে ঢেলা-ফেলা ছোঁড়ে! তাই কোথাও অপেক্ষা নয়, একেবারে নিজের সাজানো শয্যায় চলে যায়।

বনলতার পায়ের রূপার তোড়ার ঝন-ঝন শব্দ কোথায় মিলিয়ে যায় হাওয়া-ঘরের মুক্ত বাতাসে। মহাশ্বেতাও ত্যাগ করেন হাওয়াখানা! কেমন এক ক্ষুণ্ণ মন নিয়ে।

কেনই বা এমন অসময়ে রাজা বাহাদুরের দেওয়ান এলেন আর গেলেন! হাওয়া-ঘর থেকে স্তম্ভের অন্তরালে নিজেকে লুকিয়ে মহাশ্বেতা যে দেখলেন! কুমারবাহাদুরের স্নান এবং আহারের সময়ে, এমন অসময়ে কেন দেওয়ানজীর আগমন! রাজ-গৃহের কোন দুঃসংবাদ নেই তো!

রাজাবাহাদুর কালীশঙ্করের রাজ-আদেশ, তবুও ঘোর আপত্তি জানিয়েছেন দেওয়ান।

কোন ওজর-আপত্তি চললো না। কোন জবাব-কৈফিয়ৎ টি কলো না। শুনলেন না কালীশঙ্কর। নাপতিনীর কথা শুনতে শুনতে অধীর, চঞ্চল হ'তে থাকেন। সপ্তগ্রামেরই একজন নারী! সাতগাঁওয়ের জমিদার কৃষ্ণরামের কীর্ত্তি-কলাপ শুনিয়েছে! ব্যথা আর বিস্ময়ে কেমন যেন অস্থির হন ক্রমেই। সহোদরার নির্য্যাতন আর নির্ব্বাসনের করুণ কাহিনী শুনে জড় তুল্য হয়ে যান। দীর্ঘ দুই চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে যায়!

দরবার শেষ ক'রে কালীশঙ্কর অন্দরের খাস-কামরায় বসে জিরান যেন খানিক। রূপার কেদারায় ব'সে ফরসিতে তামাক খান। অম্বুরির গন্ধ ভুর-ভুর করে রাজ-অন্দরে! আহারের আসনে যাওয়ার অগে তামাকের সুখসেবন চলে।

আসব না আরক পান করেছেন রাজাবাহাদুর! স্পিরিট! নির্জলা চুয়ানো মদ। রূপার কেদারায় আসীন নেশাচ্ছন্ন কালীশঙ্কর! লাল ভেলভেটের পা-দানে দুই পা। বামহাতের মুঠিতে রূপালী তারের ফরসি-নলের সোনার নল-মুখ! একটি হাঙরমুখ!

খাস-কামরার দ্বারে বাতায়নে খসখসের পর্দা।

পিচকারীর জলে কে যেন সিক্ত করে দিয়ে যায়। ঝুলন্ত খসখস থেকে শিশিরবিন্দু পড়তে থাকে ঝিরি-ঝিরি। টানাপাখার হাওয়া বয় যেন শীতের দেশের! কে বলবে বাহিরে রুদ্রবৈশাখের তাণ্ডব চলেছে! বাতাসে আগুনের ঝলসানি। প্রচণ্ড সূর্য্য, আকাশের পশ্চিম-প্রান্তে প্রায়।

ঘরে আলো ফুটলো। ঘরে আলো ছড়ালো, চক্ষের নিমেষে! দুয়ারের খসখস কে সরালো! সাড়া না দিয়ে কে প্রবেশ করলে! কার এত দুঃসাহস যে ঘরের তমসা বিনষ্ট করে!

—কস্তং? কে?

রাজাবাহাদুর বললেন হঠাৎ ক্রোধের সুরে। দৃষ্টি না ফিরিয়েই। ঘরের কড়িকাঠ থেকে নেমে-আসা ঝুলানো বেলোয়ারী কাচের ঝাড়-লণ্ঠনের দিকে তাকিয়ে। কালীশঙ্কর নেশায় কাতর এখন, দেখলেও হয়তো চিনতেন না রক্তরাঙা চোখে।

—সাড়া কৈ? কে?

আবার গর্জ্জন করলেন রাজাবাহাদুর। বেলোয়ারী লণ্ঠনের কাচের জল-কোঁটার সারি, ঠুংঠাং বেজে উঠলো যেন রাজার কণ্ঠনিনাদে।

দেওয়ালের সোনা-রূপার সৈন্যসামন্ত আর অশ্বারোহী যেন চমকে উঠলো!

—সর্ব্বমঙ্গলা!

হাতের চুড়ির রিণিঝিনি শুনে চিনেছিলেন হয়তো কালীশঙ্কর। অনুমান সত্য না মিথ্যা তারই পরীক্ষায় রক্তিম চোখ ফেরালেন। মেজরাণীকে দেখে তবেই ক্রোধ পড়ে।

চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও সাড়া নেই দেখে রাজাবাহাদুর ঠাওরেছিলেন অন্য রকম ভেবেছিলেন হয়তো কোন গুপ্তঘাতক, চুপিসাড়ে এসে তরবারির একটি আঘাতে যদি তাঁর গণ্ড উড়িয়ে মুণ্ডপাত করে!

—সাতগাঁ হ'তে এক নাপতিনী রাজপুরীতে এসে হাজির হয়েছে।

রাজাকে নেশায় টইটম্বুর দেখে আর কাছে অগ্রসর হন না সর্ব্বমঙ্গলা। করমচার মত চোখ দেখে। কিছু দূরের ব্যবধানে থেকে কথা বললেন।

কালীশঙ্করের কাণে কথা পোঁছে না। একটিও কথা নয়।

নির্জলা স্পিরিটে বুঝি জলিয়ে দিয়েছে ইন্দ্রিয়স্থান!

কথা কাণে যায় না। রাজাবাহাদুর ভরানয়নে দেখেন,—সর্ব্বমঙ্গলার নবঘন-মেঘনীল রঙের ঢাকাই শাড়ীর আঁচল, উড়ছে টানাপাখার ঘন ঘন হাওয়ায়। কোঁকড়ানো কেশের খসা-কুন্তল দুলছে। মেজরাণীর চঞ্চলতায় ফরাস-ঢাকা ঘরের অল্প আলো-অন্ধকারে নাকচাবির হীরা জৌলুস তুলছে। সর্ব্বমঙ্গলার অধর তাম্বূললাল। মুখমধ্যে পানের খিলি। একগাল পান হয়তো।

ভয়ে ভয়ে সর্ব্বমঙ্গলা আবার ডাকলেন,—রাজা বাহাদুর!

একেই স্বল্পভাষী রাণী। বড় একটা কথাই বলেন না। তবুও তাঁর কথায় যেন বীণার ঝঙ্কার তোলে।

বঙ্কিম গ্রীবায় বিমুগ্ধ চোখে দেখতে দেখতে কালীশঙ্কর মুখ থেকে মুখ-নল সরিয়ে বলেন,—মেজরাণী, কিছু বক্তব্য আছে? তুমি এত বিমর্ষ কেন? শরীর-গতিক শুভ নয় না কি?

রাজার করমচার মত রক্তরাঙা চোখ দেখে সর্ব্বমঙ্গলা ভীষণ ভয় পান। মাত্রাতিরিক্ত যদি কিছু ক'রে বসেন রাজাবাহাদুর? কোন নির্লজ্জ উক্তি করেন যদি তামাসার ছলে? কিংবা যদি দিনমানে, এই মুক্তদ্বার ঘরে সর্ব্বমঙ্গলার হাতখানি ধ'রে টানেন?

লজ্জা, ভয় আর সঙ্কোচে তটস্থ হয়ে থাকতে হয় রাণীকে। আনত চোখে উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকতে হয়। বিশুষ্ক কণ্ঠে রাণী কথা বলেন, মেঘনীল শাড়ীর প্রান্ত আঙুলে পাকাতে পাকাতে। বলেন,—রাজাবাহাদুর, সাতগাঁ থেকে এক নাপতিনী এসে রাজ-অন্দরে যে হাজির হয়েছে!

কালীশঙ্কর প্রায় জড়িতকণ্ঠে শুধোলেন,—কেন? কি প্রয়োজনে? কি বলে নাপতিনী?

বিমর্ষ সুর রাণীর কথায়। রাণী বললেন,—ননদিনী বিন্ধ্যবাসিনীকে যে ঠাকুরজামাই গড়-মান্দারণে চালান করেছে। গড়-মান্দারণের এক ভগ্নগৃহে বন্দিনী হয়ে আছে সে!

নেশার প্রাবল্যে নিমীলিত আঁখি রাজার।

সেই চোখ সহসা বৃহৎ হয়। বিস্ফারিত হয়। বিস্ময়ে!

হাত থেকে বুঝি খ'সে পড়ে যায় রূপার তার-জড়ানো ফরসি-নল। সোনার হাঙর-মুখ দেওয়া সটকা। অত্যন্ত বিরক্তি সহকারে ভ্রূ পাকিয়ে রাজা বাহাদুর বললেন,—ফ্যাসাদ বটে! কেষ্টরাম তো আচ্ছা জ্বালানে লোক! কোথায়, সাতগাঁর নাপতিনী কৈ?

—আছে সে অন্দরের নীচের তলায়। দাসীদের সঙ্গে কথা ক'চ্ছে। মেজরাণী সর্ব্বমঙ্গলার শঙ্কা ও সঙ্কোচমিশানো কথার স্বর। কেমন যেন ভয়ার্ত্ত। বল্লেন,—সাক্ষাৎ দেবেন নাপতিনীকে? তাকে কি ডাকাবো রাজাবাহাদুর?

নির্জলা স্পিরিটে অকেজো হয়েছে বুঝি জ্ঞানেন্দ্রিয়! বোধ-শক্তি আর নেই না কি! নির্জীবের মত চাউনি কেন রাজার দুই চোখে? কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায় চকিতের মধ্যে, বৃহৎ চোখের বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টি! নার্ভ-গ্রন্থি কি আলগা হয়েছে? কেন এত সজোর শ্বাস-প্রশ্বাস ঘন ঘন? স্বরযন্ত্র কি বিকল না কি? শ্বাসপথ বন্ধ?

কথার কোন উত্তর না পেয়ে দূরে দাঁড়িয়ে মেজরাণী ভয়ে ভয়ে বলেন,—তবে আমি নাপতিনীকে ডাকাই রাজাবাহাদুর?

—হ্যাঁ-আ-আ, এই মুহূর্ত্তে ডাকাও। নাপতিনীর বক্তব্য শুনে তবেই আহারে বসবো।

বহু কষ্টে নিজেকে সামলে, বহু কষ্টে যেন কথা ক'টি ব্যক্ত করলেন কালীশঙ্কর। বুকে হাত চেপে চেপে কথা বললেন অনেক চেষ্টায়।

কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'তে হ'তে আড়নয়নের বঙ্কিম কটাক্ষে রাণী দেখলেন, রাজার মুখমুকুরে যেন কষ্টের কুঞ্চনরেখা। বক্ষে হাত কেন রাজাবাহাদুরের? কোথায় কষ্ট! কিসের এত মনঃকষ্ট? শুভ্র মুখ রক্তাভ যে!

কালীশঙ্করের ফুস্‌ফুস্ কি জ্বলছে? স্পিলিন আর কিডনী দুটোয় কি দংশনের ব্যথা ধরছে থেকে থেকে? বৃক্ক আর প্লীহায় স্পিরিটের প্রতিক্রিয়া ফললো না কি এত দিনে, এত ক্ষণে?

—নাপতিনী হাজির রাজাবাহাদুর!

পুনঃপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে কথা ধরলেন সর্ব্বমঙ্গলা। দুয়ারের ঝুলানো-খসখস সরিয়ে দাঁড়ালেন মর্ম্মরমূর্ত্তির মত।

বড় বড় লাল চোখ ফিরালেন রাজাবাহাদুর। নেশায় কাতর থমকানো চাউনি। রাজা দেখলেন, যেন এক রঙ্গমঞ্চের যবনিকা সরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক রূপবতী নটীনর্ত্তকী,—যার অধর ঘন লাল। ডালিম-রাঙা। তার নাসিকাপ্রান্তের কি এক রত্নে শুভ্র দ্যুতি!

জানুর পরে খসে-পড়া সটকা, খুঁজে খুঁজে ফের মুখে তুললেন কালীশঙ্কর। সোনার হাঙর-মুখ দাঁতে ধরলেন। কোথায় কোন্ অন্তরালে লুকিয়ে থেকে আলবোলা বোল বললো। রাজাবাহাদুরের মুখমণ্ডলের চতুষ্পার্শ্বে ধোঁয়ার জাল বিস্তার করলো।

সামান্যা নাপতিনী, তাকে আর চোখে দেখে না। কে এক পরস্ত্রী, দেখতে নেই তাকে। উচিত নয়। তাই কড়িকাঠে চোখ তুললেন রাজা বাহাদুর। লাল ভেলভেটের পা-দানে ভাল ক'রে পা ছড়ালেন।

ভিজে খসখস আর অম্বুরি তামাকের কেমন এক মোহমাখা খুশবু ছড়ায় টানাপাখার জোরালো হাওয়ার নকল ঝড়ে!

কড়িকাঠে চোখ তুলেই বললেন কালীশঙ্কর,—কও সর্ব্বমঙ্গলা, নাপতিনীকে কও আসল কাহিনীটা বিবৃত করুক। আমি শুনি।

আরও যেন কেউ কেউ ঘরে সিঁদোলো। অলঙ্কারের মৃদু-মন্দ আওয়াজ পেয়ে এক লহমায় দেখে নেন কালীশঙ্কর। কড়িকাঠের চোখ কড়িকাঠেই ফিরিয়ে নেন তক্ষুণি। পরস্ত্রী, যদি চোখ প'ড়ে যায়!

আকাশী-রঙ ছাঁপা কাচের বেলোয়ারী ঝাড়-লণ্ঠনে সূক্ষ্ম চিত্র-বিচিত্র। কাচের কারুকাজ। আঙুরপাতা আর ফলের স্তবক। ঘরের আলো-আঁধারে ঐ আকাশী নীলিমার ফাঁকে ফাঁকে লুকিয়ে-থাকা তারা উঁকি দেয় যেন।

ব্যগ্র-ব্যস্ত মনের দুঃখের কৌতূহল, পুষে আর রাখতে পারলেন না রাণী মায়েরা। রাজাবাহাদুরের খাস-কামরায় একে একে সিঁদিয়েছেন আরও দুই

রাণী। পাটরাণী |আর ছোটরাণী। উমারাণী, সর্ব্বজয়া। আর সর্ব্বমঙ্গলা তো আছেনই। খসখস সরিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন নটীনর্ত্তকীর মত। নাপতিনীকে ডাকতে গিয়ে খেয়ে এসেছেন শুধু আরও কয়েকটি তাম্বুলমিশানো পানের খিলি। মৃদু মৃদু চর্ব্বন করছেন। অধর থেকে থেকে শুধু চঞ্চল হয়ে ওঠে।

নাপতিনীর কথায় নাকেকান্নার সুর। নাপতিনী ইনিয়ে-বিনিয়ে বলতে থাকে,—রাজামশাই, রাজামশাই, কি আর আমি কই! আপনাদের রাজকন্তের দুখের কথা ব্যক্ত করতে চোখ দু'টা জলে ভ'রে যায়। তেনাকে আমাদের জমিদার কি না বিভূঁয়ে চালান করে দিলেন!

—কোথায় বিন্ধ্যবাসিনী? ঠিক এইক্ষণে কোথায় তার অবস্থিতি?

সাগ্রহে শুধোলেন রাজাবাহাদুর। প্রশ্নের পর রুদ্ধশ্বাসে ব'সে থাকলেন উত্তরের অপেক্ষায়।

—রাজামশাই, রাজামশাই, কি আর আমি কই! নাপতিনী যেন কেঁদে কেঁদে কথা কয়। বলে,—রাজকুমারী আছেন, বেঁচে জীইয়ে আছেন কোন প্রকারে!

—কুত্র? কোথায়?

অধীর আগ্রহের সঙ্গে কালীশঙ্কর চীৎকার করলেন।

হঠাৎ সপ্তমে-ওঠা কণ্ঠধ্বনি শুনে হয়তো চমকে উঠলো নাপতিনী। বললে, ভয়ে ভয়ে চাপা গলায় বললে,—রাজামশাই, তেনাকে তো গড়-মান্দারণে রাখছেন আমাদের জমিদার, বলেন কেন আর!

—সেথায় কে আছে?

কথার শেষে রুদ্ধশ্বাস ত্যাগ করলেন রাজা। সুর নামিয়ে কথা বললেন।

—কেউ নাই রাজামশাই! আছে এক দাসী! সঙ্গে গেছে রাজকুমারীর। আর আছে না কি এক পাঠান প্রহরী। ফটকে মোতায়েন থাকে দিন নেই রাত্তির নেই।

নাপতিনী বাষ্পরুদ্ধ সুরে যেন কথা বলে। সাদা থানের একগলা গুণ্ঠনে মুখ ঢেকে কথা বলে কান্নার সুরে।

—বিন্ধ্যবাসিনীর অপরাধ?

নাপতিনী যেন কাঁদে আর বলে,—রাজামশাই, অপরাধ আর কি ! আমাদের জমিদার যা দাবী করেন তা না পেয়ে এই কঠোর সাজা দিয়েছেন সেই মাটির ময়েটিকে। আহা ! অপরাধের কি জানবে আপনাদের রাজকুমারী ? ফুলের মত ময়ে তিনি।

সপ্তগ্রামের একজন নারীর মুখে সাতগাঁয়ের জমিদারের কীর্ত্তিকলাপ শুনতে শুনতে অস্থির হয়ে রাজাবাহাদুর বললেন,—উমারাণী, দেওয়ানকে পাঠানো হাক অনুজের কাছে। এ দুঃখের বোঝা আমি একা কেন বই ? নাপতিনী যাক, অন্দরে যাক। অধিক আর কি শুনাবে সে !

উমারাণীর ঢলঢল মুখে বিষাদ-কালিমা যেন !

সাবগুণ্ঠনে নম্রমুখী হয়ে স্থির দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। তাঁর মুখভাব ঈষৎ গম্ভীর, আঁখির কোণে যেন বিস্ময়ের আবেশ। বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত পরিচ্ছদ। তাঁর প্রতি অঙ্গে রত্নাভরণ-পারিপাট্য। সদ্যঃস্নাতা রাণীর পৃষ্ঠে আলুলায়িত ও তেল-চিকণ কেশের রাশি। প্রায় জানু স্পর্শ করেছে এলোকেশের শেষ।

ঠিক মূর্ত্তিমতীর মতই দাঁড়িয়েছিলেন রাজমহিষী উমারাণী। রাজ-আজ্ঞা কাণে পৌঁছতে হতজ্ঞান ফিরে পান যেন। অপ্রস্তুতের লজ্জায় ব্যস্ত হয়ে কক্ষের বাইরে চলে গেলেন। তাঁর হস্তচালনায় হাতের হীরকমণ্ডিত বালা জল-জল করলো। গুণ্ঠনের আড়াল থেকে উঁকি দিলো নাকের নথ। নথে একটি দোদুল্য লালাভ মুক্তা। নথের নোলক।

রাজার নির্দ্দেশ পেয়ে দেওয়ানজী আপত্তি জানান। বলেন,—এই অসময়ে কুমারবাহাদুরকে মিথ্যা আহ্বান কেন ? তাঁর এখন স্নানাহারের সময়। আমার সাহসে কুলোয় না যে তাঁকে ডাকি !

তা হোক। কালীশঙ্করের মুখ থেকে যখন বাক্য খসেছে তখন আর অন্য কারও কথা টিঁকবে না। রাজাবাহাদুরের যা কথা তাই কাজ। মুখের কথা নয়, যেন বিধান।

দেওয়ানজীর অনুমানও মিথ্যা হয় না।

কুমারবাহাদুর সকল বৃত্তান্ত শুনেও গোসলে গেলেন স্নানার্থে। হাওয়াখানায় প্রতীক্ষমানা মহাশ্বেতাকে দেখেছেন! মহাশ্বেতা এখনও যে এক বিন্দু জলপান পর্যন্ত করেননি। এত বেলা, তবুও রাজরাণা উপোসী, অভুক্ত। আর কাশীশঙ্কর কি এতই নির্দয়-নিঠুর যে আর অন্য কাজে কালবিলম্ব করবেন?

তাই ফিরে আসেন দেওয়ান। বিফল-মনোরথ হয়ে ফিরে আসেন ক্ষুন্ন মনে। সহোদরার প্রতি কাশীশঙ্কর বিরূপ নয় কোন দিনই। তিনিও আন্তরিক স্নেহ করেন বিন্ধ্যবাসিনীকে। বিন্দুর দুঃখে বজ্রসম কঠোর কুমার বাহাদুরেরও অন্তর সিক্ত হয়। কুমারের সুবিশাল বক্ষের কোথায় যেন থেকে থেকে ব্যথার বীণা বাজতে থাকে!

কিন্তু উপায় কি? এক কথায় কি মিটবে এই সমস্যা? আর সমস্যা শান্তিতে মিটিয়ে নেওয়ার মানুষ কি সেই দোর্দ্দণ্ড, দুরাচারী কৃষ্ণরাম? সেই কৌলীন্যের মুকুটমণি? সেই ব্যভিচারী জমিদার?

তবে কেন রাজকুমারীর অপূর্ব্ব সুন্দর মুখচ্ছবি, এত বার বার কেন কাশীশঙ্করের স্মৃতিপটে জাগরূক হয়! তার আকুল ক্রন্দন যেন কানে বাজে যখন-তখন! তবু, তবু কোন উপায় যেন খুঁজে মেলে না কোন মতেই! গড়-মান্দারণের বন-জঙ্গলময় পাষাণপুরী থেকে কোন্ উপায়ে উদ্ধার করা যায় নির্ব্বাসিতা ও বন্দিনী রাজকন্যাকে?

ফটকে আছে বন্দুকধারী পাঠান প্রহরী। কে ধুলো দেবে তার চোখে, যতক্ষণ তার হাতে আছে বারুদঠাসা গাদা-বন্দুক?

আসমানদীঘিতে ডুব দিয়ে কি জ্বালা জুড়ায় বিন্ধ্যবাসিনীর! তাঁর মনের উত্তাপ, দেহের জ্বালা! অবগাহন স্নানেও দুর্ভাবনার অবসান হয় না! আসমানদীঘির জল আবার নিথর, নিষ্কম্প হয়ে যায়। কাকচক্ষু জল!

ভিজে কেশের রাশি রাজকন্যার পিঠে।

বিনা তেলের রুক্ষ কেশের রাশি ছড়িয়ে প্রাচীরহীন ছাদে বসেছিলেন

বিন্ধ্যবাসিনী। সদ্যঃস্নাতার পরিধানে লালপাড় গরদ-শাড়ী। সীমন্তে টাটকা সিন্দুর-রেখা। ছাদে বসে চুল শুকাতে থাকেন আর নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে থাকেন—সম্মুখে প্রবাহমান আমোদরের পানে! রৌদ্রকিরণে আমোদরের স্বচ্ছসলিল চিকচিকিয়ে ওঠে।

ছাদের একদিকে গাছ-গাছড়ার অবাধ্য শাখা, যেন বাহু মেলেছে। ছায়া সৃষ্টি করেছে, ছাদের এক কিনারায়! কয়েকটি কাঠবিড়ালী বৃক্ষশাখা থেকে নেমেছে ছাদের পরে। জামরুল ফুল পড়েছে যে ছাদের এক প্রান্তে! যেন পুষ্পবর্ষণ হয়েছে।

জামরুল-ফুলের সুবাস ভাসছে বাতাসে। ফুলের গন্ধে যেন কি এক লোভানি! কাঠবিড়ালীর ভিড় হয়েছে তাই।

সহসা চোখ পড়লো রাজকুমারীর।

সমুখে আমোদরের তীরে, এক সুদর্শন পুরুষকে দেখলেন যেন। নধরকান্তি, শুভ্রবর্ণ এক যুবাপুরুষ! স্নানার্থেই হয়তো আমোদরের উত্তপ্ত বালিয়াড়ি তীর ধ'রে এগিয়ে চলেন। পট্টবস্ত্র পরনে। বক্ষে উপবীত। মস্তকে দীর্ঘ শিখা।

মনুষ্যের মুখ দেখা যায় না যেখানে, সেখানে কা'কে দেখলেন বিন্ধ্যবাসিনী! কে ঐ অপরিচিত ব্রাহ্মণ?

ব্রাহ্মণ তাঁর দুই হাতে কী যেন ধারণ করে আছেন। প্রখর সূর্য্যালোক, তবুও হাতে এক খণ্ড লাল শালু ব্যতীত কিছুই চোখে পড়ে না!

দেখে বিমুগ্ধা হন বিন্ধ্যবাসিনী।

কেমন এক আবেগে, কিসের এক আবেশে উঠে পড়লেন রাজকুমারী যদি চোখাচোখি হয় সেই লজ্জায় ত্বরায় ছাদ ত্যাগ করলেন!

ব্রাহ্মণের হাতে নারায়ণ। নদীর তীরের কুড়িয়ে-পাওয়া এক কৃষ্ণবর্ণ শালগ্রামশিলা। বৈশাখের খর তাপে আমোদরের স্নিগ্ধবারিতে স্নান হবে পাষাণ-মূর্ত্তির!

—কে ঐ ব্রাহ্মণ

বিন্ধ্যবাসিনী ছাদ ত্যাগ করেন বটে, তবে তাঁর মনের আর চোখের উগ্র

কৌতূহল মিটে না। আর একটি বার কি দেখা যায় না? মাত্র আর একবার?

রাজপুরীর হাওয়া বদল হয়ে যায়! কেমন এক থমথমে আবহাওয় রাজ-অন্দরের। যেখানে অব্যাহত সুখ সেখানে এখন অশান্তির স্রোত প্রবহমান। অর্থলালসায় অন্ধ কৃষ্ণরামের হাতে যেন রাজগৃহের সুখ আর শান্তি নির্ভর করে। হিতাহিতজ্ঞানশূন্য কৃষ্ণরামের পর্ব্বতমান দাবী শিশুর চাঁদ-চাওয়ার মতই অযৌক্তিক মনে হয়, তবুও তাঁরই হাতে জীবন-কাঠি, রক্ষাকবচ। কোন্ অতল জলের অজানা গহ্বরে যে কৃষ্ণরাম লুকিয়েছেন মরণ-ভোমরার কৌটা, তাঁর চাহিদা না মিটলে তার সন্ধান পাওয়া যাবে না। পৃথিবীতে শুধু মাত্র বাহুবলে সকল কিছুর সমাধা হয় না। বুদ্ধিবলে হয়। বুদ্ধি যার বল তার। সরাসরি প্রস্তাবে যখন ফল পাওয়া গেল না, তখন কৌশল অবলম্বন করেন জমিদার কৃষ্ণরাম। বুদ্ধি প্রয়োগ করেন। যেখানে ব্যথা সেখানে আঘাত করেন! কুটিলকৌশলের প্রচণ্ড আঘাত। নবাবের বাঙলা, সম্রাটের রাজত্ব বাঙলা দেশ! জমিদার কৃষ্ণরাম কি ঘরোয়া বিবাদে নেমে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন! তদুপরি রাজাবাহাদুর কালীশঙ্কর যখন নবাবের অন্যতম বিশিষ্ট প্রিয়পাত্র, দিল্লীশ্বর বা জগদীশ্বরের অনুগ্রহভাজন! কৃষ্ণরামের লোকবল নেই বললেই হয়। কয়েকটি মাত্র গাদা-বন্দুক আর জনপঞ্চাশেক পাঠান প্রহরী সম্বল মাত্র। জমিদারীর পাইক-পেয়দা সামান্য দাঙ্গা-হাঙ্গামার সহায়ক হতে পারে, যুদ্ধনীতির কি জানবে! জমিদারের যত দাপট জমিদারীর চৌহদ্দীতে সীমানির্দ্দিষ্ট, তার বাইরে নয়। যত জারিজুরি নিজের এলাকায় চলবে, অন্যত্র নয়। তাই কৃষ্ণরাম কৌশল প্রয়োগ ক'রেছেন। চাল চেলেছেন একটা।

আছে অনেক। একাধিক আছে। তাদেরই একজনকে, কাদের যেন দুঃখের আর কষ্টের আঘাত হানতেই, পাঠিয়ে দিয়েছেন মান্দারণের সেই

নহীন ও অরণ্য-সঙ্কুল ভগ্ন-দেউলে। অনেক আছে কৃষ্ণরামের, প্রয়োজনের তিরিক্তই আছে। একজনের অভাব তো অনেক আয়ের কিঞ্চিৎ মাত্র পব্যয়েরই সামিল—যাতে কিছুই যায় আসে না!

যে অনাহারী তার কাছেই এক গ্রাস অন্নের বহু মূল্য। আর যার উদর রিপূর্ণ, অতিভোজনে যে ক্লান্ত, সে কখনও বোঝে না, বোঝে না এক মুঠা ধানে চাল হয়!

আজকের দ্বিপ্রাহরিক সন্ধ্যা সারতে পূজা-ঘরে আর যেতে পারেননি জাবাহাদুর। নিরালা খাস-কামরার কেদারায় বসে বসেই সেরে নিয়েছেন সন্ধ্যার জপ-অহ্নিক। শুদ্ধিমন্ত্র উচ্চারণে আসনশুদ্ধি ক'রে নিয়ে, নিজেকে দ্ধ ক'রে, মনে মনে শেষ করেছেন গায়ত্রী-জপ!

সন্ধ্যা শেষ হ'তেই কয়েক বার গলা-খাকরানির পর ডাক দিয়েছেন। হাতের শে যত্নে-রাখা পেতলের ঘণ্টা তুলে বাজিয়ে বাজিয়ে ডাক দিয়েছেন। সহসা জ অন্দরকে চমকে দিয়ে ঘন ঘন ঘণ্টা বেজে উঠতেই অন্তঃপুরবাসিনীরা সন্ত্রস্ত য়ে উঠলেন।

নিমেষের মধ্যে কোথা থেকে যেন এক ঝলক আলোর মত এসে পড়লেন াজমহিষী উমারাণী। খসখসের ভিজে পর্দা সরিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন ভয়ে একেই নাপতিনী দুঃসংবাদ পৌঁছে দিয়ে গেছে রাজার কানে! সেই ঃখবেদনের অংশ গ্রহণ করতে আহ্বান জানালেন সহোদরকে, তিনিও সাড়া লেন না, এলেনই না। রাজা বাহাদুরের কষ্টকাতর ডাক অমান্য করলেন!

নিদাঘ-দিনের তপন-তপ্ত এক ঝলক রৌদ্র-রশ্মি দেখলেন যেন কালীশঙ্কর। য়েক মুহূর্ত্ত নীরবে তাকিয়ে রাজমহিষী স্নিগ্ধ কোমলকণ্ঠে বললেন,—রাজা াহাদুর, আপনার আহার্য্য প্রস্তুত। নির্দ্দেশ পাই তো আসন পাতিগে।

কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে ছিলেন রাজাবাহাদুর। শুধু মুখাকৃতিতে নয়, তাঁর থাতেও জড়তা প্রকাশ পায়। দু একবার গলা-খাঁকরে বললেন,—হাঁ, আমিও ধার্ত্ত।

—আপনি গা তোলেন সবই প্রস্তুত। আসন পাতার কাজও তাই

মিষ্টি মিষ্টি কণ্ঠ উমারাণীর। না অতি উচ্চ, না অতি নিম্ন কণ্ঠস্বর। কথার শেষে কক্ষ ত্যাগ করলেন অতি দ্রুত। হয়তো অন্দরে ছুটলেন। রাজাবাহাদুর আহারে আসছেন, তাই হয়তো কথাটি শোনাতে ছুটলেন।

রাজা-বাদশার ক্ষুধা! কত অধিক কে জানে! কত আয়োজন, কত উপকরণ।

রাজাবাহাদুর কালীশঙ্কর জাতিতে কুলীন ব্রাহ্মণ। দেব-দ্বীজের পূজা করেন। ভিন্ন গোত্রের হাতের রন্ধন স্পর্শ করেন না। রন্ধনশালায় কাজ করতে হয় রাণীমায়েদের। রাজরাণী হ'লে কি হয়, উনুনের ধারে গিয়ে বসতে হয়। পরম পবিত্র দেহ-মনে পাক করতে হয় নানাবিধ সামগ্রী

অনেক আশা আর অনেক আনন্দ মনে পুষে, অতি কষ্টের অগ্নিতাপ সহ্য করতে হয়। পাকঘর তো নয়, রন্ধনশালা তো নয়, যেন অগ্নিকুণ্ড! বৈশাখী গ্রীষ্মে আগ্নেয়গিরির মতই রূপ ধারণ করে রণ্ডইশালা। ঘেমে নেয়ে ওঠেন রাণীমায়েরা।

তারপর, স্নাতা বিশুদ্ধবসনা নবধূপিতাঙ্গী কর্পূর সৌরভমুখী নয়নাভিরামা মন্দস্মিতা; অর্থাৎ, স্নান করি, সুন্দরী শোভন বস্ত্র পরি, সুচারু নূতন ধূপগন্ধে অঙ্গ ভরি, কর্পূর সৌরভ মুখে অনঙ্গ বিভোল্ ও মৃদু মৃদু মধুরহাসিনী রূপে পরিবেশিকার কাজ করতে হয়। নৃপপরিবেশিকার কাজ।

আসনে প্রাঙমুখো ভোক্তোপরিশেদ্বাপ্যুদঙমুখঃ।

অর্থে, পূর্ব্ব বা উত্তরমুখে বসিবে আসনে। কাঠ-পিঁড়ার উত্তর মুখ আসনে বসতে বসতে রাজাবাহাদুর গলা-খাঁকরানির শব্দ করলেন কয়েকবার। কেমন এক স্তব্ধ বিষণ্ণ সুরে বললেন,—আহারে স্পৃহা নাই, তথাপি ক্ষুধাও আছে।

কথা বলতে বলতে রাজাবাহাদুর তাঁর কণ্ঠে ঝুলানো সুগন্ধী ফুলের মালায় হাতের পরশ দেন। গোলাপী গোলাপের কণ্ঠহার। চাঞ্চল্যে দুলছে।

পিঁড়ায় আসন লওয়ার আগে ফুলের মালা পরেছেন রাজা। চরণ ধৌত করেছেন। শুভ্র বস্ত্র পরেছেন।

রাজার স্বগত উক্তিতে আহার-কক্ষ যেন কেঁপে কেঁপে উঠলো। তবুও কত ীরে ধীরে কথাগুলি উচ্চারিত হয়েছে। এত পরিশ্রমের এত আয়োজন কি ব্যর্থ হয়ে যাবে! রাজা যদি মুখে কিছু না তোলেন! স্বাদ না পান, এত উপকরণের! রাণীমায়েরাও যেন কেঁপে কেঁপে উঠলেন।

—এ তো সামান্য আয়োজন! রাজাবাহাদুর, আপনার মন আজ এত চঞ্চল, ীরে সুস্থে আহার করুন।

মধুমিষ্ট কণ্ঠে কথা বললেন রাজমহিষী। স্নিগ্ধকোমল ভঙ্গিমায়।

কথায় যেন কর্ণপাত করেন না কালীশঙ্কর। রাঙা দুই চোখের শূন্য দৃষ্টিতে দেখেন সমুখের আহার্য্য-সামগ্রী—নৃপতি-ভোজন-যোগ্য রজতের থালে শোভা পায়। রজতের থাল যেন এক গোলাকার দর্পন, এমনই স্বচ্ছ! যেন আকাশের সূর্য্য!

প্রশস্ত, নির্ম্মল ও মনোহর থালের মধ্যভাগে অন্নের চূড়া। দাইল ঘৃত মাংস শাক পিষ্টকান্ন মৎস্য ভোক্তার দক্ষিণে। সূপ আদি দ্রব্য সর্ব্ব দুগ্ধ পেয় জল প্রভৃতি চোষ্য লেহ্য আহার বামভাগে! মধ্য দুই পংক্তিতে পকান্ন, পায়স ও দধি, ইক্ষু গুড়।

আহারের উপকরণ ব'হে আনতে ভারী হয়েছিলেন সর্ব্বজয়া। ভারবাহকের কাজ করেছিলেন। রন্ধনশালা থেকে আহার-ঘরে পৌঁছে দিয়েছেন কাঁধে ভার চাপিয়ে।

আহারে বসেই আহার্য্য মুখে তোলেন না রাজা বাহাদুর। আচমন করেন। গণ্ডূষের মন্ত্র বলেন, রাঙা দুই চোখ বন্ধ করেন। নেশার ঘোরে কি জানি না, পৃথিবীর যতেক অভুক্তকে খাদ্যার্ঘ্য নিবেদন করেন, মনে মনে।

রজতের থালে নিজের মুখের প্রতিচ্ছায়া দেখতে দেখতে কার মুখ যেন দেখতে পেয়েছেন রাজা বাহাদুর। না কি মনোদর্পণে দেখতে পেয়েছেন কার এক মুখচ্ছবি!

সহোদরা বিন্ধ্যবাসিনীর মুখখানি দেখলেন কি কালীশঙ্কর—সেও কি এখনও গড়-মান্দারণের এক ভগ্ন অট্টালিকায় রাজকুমারী কি এখনও অনাহারে আছেন!

ফুলের মালায় হাতের পরশ লাগে। রাজাবাহাদুরের বুকের পিঞ্জর থেকে থেকে মোচড় দেয়, মনোবেদনায়। মনের চোখে কাকে দেখলেন যে, কোন্ এক নিকটতমার চাঁদমুখ!

রজতের থালের মধ্যভাগে পীতবর্ণ মিষ্টি অন্ন। শাকপাক। প্রলেহ আর দাইল কাঞ্চনপাত্রে। ঘণ্টপাক। নানাবিধ মৎস্য প্রকরণ—দমপোক্ত, কাবাব মাহী, জেরবিরিয়ান মাহী। মাংসের তাহিরী, হরীসা আর ছাগমুণ্ড। শর্করকন্দ ও মুদ্গ পিষ্টক। সারপায়স। ক্ষীরের আম্রগোলক। মালপূয়া। মিষ্টপূরিকা। পানিফলের টিকরশহি। কাঁচা আমের চাটনি। ভাপাদধি।

কেমন যেন অন্যমনে আহার করেন কালীশঙ্কর। মধ্যে মধ্যে গলা-খাঁকরানির শব্দ করেন আর আহার্য্য মুখে তোলেন। উমারাণী সম্মুখে ব'সে হাতপাখার বাতাস দেন। নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকেন সর্ব্বজয়া। সাগ্রহে লক্ষ্য করেন রাজার আহারের রীতি। একেক প্রস্থ আহারের শেষে হস্ত প্রক্ষালন করেন কালীশঙ্কর। ছিলিমচি ধরেন মেজরাণী, রাজার হাতে জল ঢালেন। অবসর পেলেই মুখভর্ত্তি তাম্বুল চর্ব্বিতচর্ব্বণ করেন। সর্ব্বমঙ্গলার নাসিকা প্রান্তের ক্ষুদ্র হীরকখণ্ড চিক-চিকিয়ে ওঠে তাঁর আপন চাঞ্চল্যে।

—রাজাবাহাদুর! আজ আমার ডাক পড়লো না কেন?

কার কথা শুনে রাঙা চোখ তুললেন কালীশঙ্কর। দুয়োরে দণ্ডায়মানা নারী-মূর্ত্তিকে দেখলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। বেশ কিছুক্ষণ দেখে দেখে যেন চিনতে পারলেন। কয়েকবার গলা-খাঁকরে বললেন,—আয় শিবানী। তুই আসিস না কেন? প্রত্যহ কি তোকে ডাকতে হবে না কি?

শিবানীকে দেখতে পেয়ে কেমন যেন অস্থির হয়ে পড়লেন দুই রাণী। উমারাণী ও সর্ব্বজয়া বিব্রত বোধ করলেন। শিবানীর মুখের কোন অর্গল নেই —কি বলতে সে যে কি বলবে কে জানে! হয়তো রাজার আহারে বাধা পড়বে। আসন ত্যাগ করবেন কালীশঙ্কর—তখন কারও অনুরোধ টিঁকবে না।

রাজাবাহাদুরের আসনের কাছাকাছি বসে শিবানী। ভিজে এলো কেশের বোঝা সামলায়। চুলের রাশি জড়িয়ে এলো খোঁপা তৈরী করে দুই হাতে

মাথায় তুলে। খোঁপা জড়াতে জড়াতে বলে,—আর যেন পারি না চুলের বোঝা বইতে! কোন্‌দিন কেটে ফেলবো!

বিমর্ষ হাসি হাসলেন কালীশঙ্কর। বললেন,—ছিঃ শিবানী, ও কথা বলতে নাই।

রজতের থাল আর কাঞ্চনপাত্রগুলি দেখলো শিবানী। বললে,—রাজাবাহাদুর, তোমার আহারে বুঝি আজ রুচি নাই? পাতের ভাত যেমনকার তেমনি তো প'ড়ে আছে!

—রুচি নাই, তবে ক্ষুধা আছে। ক্ষীণ হেসে বললেন রাজাবাহাদুর। সস্নেহে বললেন,—তোর কি কিছু খাওয়ার সাধ আছে?

খিল খিল শব্দে হেসে উঠলো শিবানী। হেসে যেন গড়িয়ে পড়লো রাজার কথা শুনে। আহার-কক্ষে কে যেন রাশি রাশি মুক্তা ছড়িয়ে দেয়, এমনই হাসির শব্দ। হাসতে হাসতেই বললে,—খাওয়ার আর সাধ থাকবে না? আছে বৈকি! তার আগে একটা বিয়ার সাধ আছে। তোমরা তো কিছুই করলে না! একটা পাত্র পর্য্যন্ত দেখলে না! আমি শ্বশুর-ঘর করবো না?

কেমন যেন চিন্তাকুল দৃষ্টি ফুটলো কালীশঙ্করের রাঙা চোখে। ছুই রাণী শিবানীর কথা আর হাসির ধরণ দেখে শিউরে উঠলেন। রাজাবাহাদুর ভেবে ভেবে বললেন,—তুই যে কুলিন-ঘরের মেয়ে! কুলিনকন্যের পাত্র পাওয়া বড়ই দুর্লভ যে!

—তবে আমাকে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দাও না কেন?

হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে যায় শিবানী। চাপা স্বরে কথাগুলি বলে। কেমন যেন দুঃখভারাক্রান্ত কণ্ঠস্বরে।

রাজাবাহাদুর বললেন,—তুই এত অধীর হ'স কেন? তবে চেষ্টার ক্রটি নাই জানবি। ফুল ফুটলেই বিয়া হবে তোর। ভাবিস্ কেন?

আবার সেই খিল খিল হাসি। হাসতে হাসতেই শিবানী বললে,—কুড়ির কোঠায় পা পড়েছে, আর কবে ফুল ফুটবে!

একটি কাঞ্চনপাত্র ঠেলে দিলেন কালীশঙ্কর। বললেন,—শিবানী তুই খা। মালপুয়াখানা তুই খেয়ে নে।

ভিখারিণীর মতই হাত পাতলো শিবানী। দুই হাত পাতলো। বললে,
—দাও রাজাবাহাদুর, তোমার প্রসাদই দাও, খাই। ক্ষুধায় আমি জ্বলছি। বেলা কত হয়েছে তা জানো!

এ কথায় কর্ণপাত করলেন না রাজাবাহাদুর। খেতে খেতে বললেন,—বিয়া তো করতে চাস, বিয়ার দুঃখুটা কি তুই জানিস?

—বিয়ার আবার দুঃখু কি? বিয়া তো সুখের! মেয়ে জাতের কাছে শ্বশুরঘরই তো স্বর্গ, ইহকাল পরকাল।

মুখে মালপুয়া পুরে কথা বললে শিবানী। দংশন করতে করতে বললে।

মুখের আহার্য্য গলাধঃকরণের পর কালীশঙ্কর নিম্নকণ্ঠে বললেন,—বিন্ধ্যবাসিনীর বিয়া তো ভাল ঘরেই দেওয়া হয়। কত কষ্টে বিন্দু আছে তাতো শুনলি তুই!

রহস্যময় হাসির সঙ্গে শিবানী বলে,—শুনি নাই। জানতেও চাই না। বিন্দু দিদির এই অবস্থা, সে তো আমারই কষ্টে। আমার পানে ফিরেও দেখলে না কেউ। সেই পাপের শাস্তি এখন পোহাও!

বলে কি শিবানী! যা মুখে আসে তাই বলে যে!

তার কথা আর কথার ভঙ্গী শুনে লজ্জা পান দুই রাণী। উমারাণী ও সর্ব্বজয়া, থেকে থেকে বিচলিত হন। ভয় পান, শিবানীর দুঃসাহসের কথা শুনে। তবুও মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেন না। বাধা দিতে পারেন না। নিষেধও করতে পারেন না।

মৃদু মৃদু হাসলেন রাজাবাহাদুর! সহজ, সরল হাসি। হাসি চেপে কি যেন বলতে চাইলেন, অথচ বলতে পারলেন না। শুধু বললেন,—ঈশ্বর জানেন!

কথার শেষে একবার দেখলেন চোখ ফিরিয়ে। দেখলেন শিবানীকে। কি অপূর্ব্ব রূপ তার! দুধের মত দেহবরণ। নিটোল মুখ! মোমের গড়ন যেন দেহের। পরিপূর্ণ যৌবন!

গাছভরা ফুল যেন। বৃথাই ফুটেছে। দেবতার পূজায় লাগে না। অবহেলায় ঝ'রে যায় ফুলের পাপড়ি। হাওয়ায় উড়ে যায়—মাটিতে মিশে যায়

শিবানীর কথায় সহসা ব্যথাভরা সুর শোনা যায়। শিবানী বললে,—আমাকে রাধানগরে পাঠিয়ে দাও রাজাবাহাদুর। তোমাদের রাধানগরের মন্দিরে থাকবো আমি সেবাদাসীর মত।

—কি যে তুই বলিস্। বললেন কালীশঙ্কর। ক্ষণেকের জন্য আহারে বিরতি দিয়ে বললেন,—অন্যায় কথা বলিস্ কেন?

শিবানী বললে,—অন্যায় কথা নয় রাজাবাহাদুর। আমি কারও সংসারের গলগ্রহ হয়ে থাকতে চাই না। কথা বলতে বলতে উমারাণীর দিকে তাকায়। বলে,—বল' না বড়রাণী, তুমিই বল' না, আমার কথা কিছু অন্যায় বলা হয়েছে?

নীরব থাকেন উমারাণী। হাঁ কিংবা না কিছুই বলেন না। অপলক চোখে তাকিয়ে থাকেন।

স্বল্পভাষিণী সর্ব্বজয়া, পান চিবানো থামিয়ে, আর থাকতে না পেরে বললেন, -দেখ শিবানী, কথা কওয়ার একটা স্থানকাল থাকে। সব কথা কি সকল সময়ে বলা যায়? রাজাবাহাদুর আহারে বসেছেন, এখন এ সব কথা বলে না। বলা উচিত নয়।

সর্ব্বজয়ার প্রতি দৃকপাত করলো শিবানী। ব্যথায় কাতর দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে বললে,—রাজাবাহাদুরকে পাই কখন যে মনের কথাগুলো বলবো? এই আহারের সময়টুকুই তাঁকে যা অন্দরে পাওয়া যায়। আমার একটা হিল্লে ক'রে দাও তোমরা, কোন' কথাটি আর বলতে আসবো না। কখনও নয়।

—তবুও রাজা যখন আহারে বসেছেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে না বললেও চলে। সর্ব্বজয়া কথাগুলি বললেন নম্র-গম্ভীর কণ্ঠে।

অকৃত্রিম হাসির সঙ্গে শিবানী বলে,—তোমার আর ভাবনাটা কি বল' মেজরাণী! রাজরাণী হয়ে উড়ে এসে তো জুড়ে বসেছো! বুঝবে কি আমার মনের কষ্টটা!

এত দুঃখেও হেসে ফেললেন রাজাবাহাদুর। সহজ, সরল হাসি। সহাস্যে বললেন,—ঠিক কথা কয়েছিস্ শিবানী! এতক্ষণে একটা কথার মত কথা তুই বললি বটে।

আহার-কক্ষ অন্ন-ব্যঞ্জনের সুগন্ধে টইটম্বুর। কত দূরে ভেসে যায় মসলার গন্ধ।

রাজগৃহ। দিকে দিকে সশস্ত্র প্রহরী। তবুও তাদের চোখ ফাঁকিয়ে কোথা থেকে যে রাজ-অন্দরে উড়ে আসে সামান্য একেকটি মাছি।

হাতের কাজ ভুলে পরস্পরের কথার আদান-প্রদান শুনছিলেন উমারাণী। তাঁর হাতের হাত পাখা স্তব্ধ হয়েছিল।

রজতের থালের কাছাকাছি মাছি উড়তে দেখে কালীশঙ্কর বললেন,—হাত-পাখা দেখেই মক্ষিকা পালায় না। পাখা যে চালনা করতে হয়!

অসম্ভব অপ্রস্তুত হন উমারাণী। লজ্জাবনত মুখে ঈষৎ হাসির রেখা দেখা দেয়। রাজার কৌতুক-কথা শেষ হওয়া মাত্র পুনরায় পাখা চালাতে শুরু করেন। সলজ্জায়। পরস্পরের কথা শুনে হাতের কাজ ভুলে গিয়েছিলেন তিনি।

শিবানীর কথায় বোধ করি অপমান বোধ করেন সর্বজয়া। শিবানীর কথা ইঙ্গিতে! মেজরাণীর চোখে না তাম্বুলরক্ত ওষ্ঠাগ্রে যেন ক্রোধের না অভিমানের আভাস ফোটে। একেই তিনি অল্পভাষিণী, আরও যেন গম্ভীর হয়ে যান।

জলের পাত্র তোলেন রাজা বাহাদুর। পরিপূর্ণ এক পাত্র জলপানের পর বারকয়েক গলা-খাঁকরে বললেন,—ইতি আহারপর্ব।

এমন সময়ে কোথা থেকে কার কণ্ঠ-নিনাদ শোনা যায়। কে যেন কাকে ডাক দেয় গর্জনের স্বরে। রাজ-অন্দর মুখরিত হয়ে ওঠে সেই কণ্ঠধ্বনিতে।

—বড় বধূরাণী কোথায় গো!

কার ডাক শুনে উমারাণী তাঁর অসংযত বসন ঠিকঠাক করেন। গুণ্ঠ কপালের পরে টেনে দেন। কোন এক পুরুষ-কণ্ঠ শুনেছেন।

—কে ডাকে!

হাতের পাত্র নামিয়ে রেখে শুধোলেন রাজাবাহাদুর।

—ছোটকুমার ডাকলেন কি?

নিজেকেই যেন প্রশ্নটি করলেন, ফিসফিসিয়ে বললেন রাজমহিষী।

—তোমাদের রাজা বাহাদুর কৈ, কোথায়?

আবার সেই কণ্ঠনিনাদ। ঘুমন্ত রাজপুরী জেগে উঠলো যেন। কেঁপে উঠলো।

আহার-পর্ব্ব যখন শেষ হয়েছে তখন আর বৃথা অপেক্ষা কেন! এই ডাকাডাকির ফাঁকে, সর্বজয়া কখন নিঃশব্দে বেরিয়ে যান। যেন ঠিক ছায়ার মত হটাৎ স'রে গেলেন আহার-কক্ষ থেকে।

—কাশীশঙ্কর কথা বলে না?

রাজাবাহাদুর সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন প্রথমাকে। রাঙা দুই চোখে জিজ্ঞাসা ফুটিয়ে। কুঞ্চিত ললাটে।

রাজমহিষী বললেন,—হাঁ, তাই তো মনে হয়। আমি যাই, তাঁকে ডাকি গিয়ে। তিনি কত খোজাখুঁজি করবেন কারও দেখা না পেয়ে। কথা বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন রাণী।

—তাই যাও। সম্মতির সুরে বললেন কালীশঙ্কর। বললেন,—শিবানী, হস্ত-প্রক্ষালনের জল দাও। কথার শেষে ছিলিমচির পরে প্রসারিত করলেন উচ্ছিষ্ট হাত।

নলযুক্ত ঝারি থেকে জল ঢালতে ঢালতে শিবানী ফিসফিস বলে,—রাজাবাহাদুর, তুমি আমার একটা উপায় ক'রে দাও। রাধানগরে পাঠিয়ে দাও, বেশ থাকবো আমি সেখানে। রাজমায়ের সিন্দুকে আমার গয়নাপত্র আছে, দিয়ে দাও আমাকে। আর কিছু চাই না আমি।

লাল দুই চোখে রাজা বাহাদুর দেখলেন শিবানীর আপাদমস্তক। কি যেন লক্ষ্য করলেন, যা কখনও তাঁর চোখে পড়েনি। যাকে স্নেহের চোখে দেখতেই অভ্যাস, তার দেহে দেখলেন যৌবন টলোমলো। এই প্রথম যেন রাজার দৃষ্টি-পথে পড়লো। চোখ নামিয়ে কালীশঙ্কর বললেন,—রাধানগরে বাস করতে পারবি না তুই। পর্ত্তুগীজ জলদস্যুরা তোকে রাখবে না। জাত-জন্ম খোয়াবি?

কথা শুনে অবাক মানে শিবানী। হাঁ হয়ে যায়। হতভম্বের মত ফ্যাল্‌ফ্যাল তাকিয়ে থাকে একদৃষ্টে। এমনি তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলে,—আমার আবার জাত-জন্ম! আজও জানি না কে আমার জন্মদাতা পিতা, কার গর্ভে আমার জন্ম!

রাজাবাহাদুরের মত জনও এ কথায় ঈষৎ যেন বিচলিত হয়ে ওঠেন। লজ্জা না সঙ্কোচের ছায়া নামে যেন তাঁর মুখমণ্ডলে। মুখাকৃতি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে যায়। কালীশঙ্কর বললেন,—তোর জ্ঞানোন্মোষের বহু পূর্বেই তাঁরা গতায়ুঃ হন। তুই সম্পর্কে আমাদের ভগ্নী। তুই ভদ্র ঘরের মেয়ে, তাই তোর পাত্র মেলে না।

—এই পোড়াকপালীও যে গেল না কেন কে জানে!

নিজেই যেন নিজেকে কথা ক'টি শোনায় শিবানী। কথা বলতে বলতে নিজেকে দেখায় চিবুকের ইঙ্গিতে। পরম বিরক্তির সঙ্গে।

—এখানে থাকতে তোর কিসের কষ্ট তাই শুনি।

রাজাবাহাদুর কণ্ঠস্বর নত ক'রে শুধোলেন। কথা বলতে বলতে শুভ্র ও সিক্ত একটি গামছা তুলে নিলেন, পাশেই ছিল। হাত মুছলেন।

—অনেক কষ্ট রাজাবাহাদুর। কষ্টে কষ্টে বুক আমার জ্বলছে অহোরাত্রি। কেমন যেন কথায় ব্যথা ফুটিয়ে ফুটিয়ে কথা বলে শিবানী। বলে,—রাজমাতা আমার সঙ্গে তোমাদের ঐ কাশীশঙ্করের গাঁট-ছড়া বাঁধার ঠিকঠাক ক'রে কি করলে বল'তো?

—ছিঃ শিবানী। বললেন রাজা বাহাদুর। গোপন-কথা বলার সুরে ও ভঙ্গীতে বললেন,—কাশীশঙ্কর যে তোর সহোদর ভাইয়ের সামিল! ঈশ্বরে মন দে তুই। যার কেউ নাই তার জন্য আছেন ঈশ্বর।

কথার শেষে রাজা শূন্যের প্রতি তর্জ্জনী সঙ্কেত করলেন।

কেমন এক তাচ্ছিল্যভরা হাসি হাসলো শিবানী। বললে,—তাই তো বলি, দাও আমাকে রাধানগরে পাঠিয়ে দাও। তোমাদের মন্দিরের সেবাদাসীর কাজে লাগবো!

—বড় ভয়ের স্থান রাধানগর! কাশীশঙ্কর কথা বলেন, আর নিম্ন সুরে নয়, স্বাভাবিক কণ্ঠে। বললেন,—নদীর ঠিক মোহানায় রাধানগর, তাই পর্ত্তুগীজ জলদস্যুদের বড় উৎপাত! তারা দলে দলে আসে, আক্রমণ করে, ধন-দৌলত ছিন করে, বসতি জ্বালিয়ে দেয়, পুরুষদের ধর্মান্তরিত করে বা দাস-ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রী করে, নারী ও শিশুদের হরণ করে! স্বজাতির মধ্যে বিলায়ে দেয়।

অবার অবাক মানে শিবানী! ঘোর বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকায়। ভয়ে যেন সিঁটিয়ে যায়। ঘরের দুয়ার হ'তে অদূরে কার খড়মের শব্দ শোনা যায়! কার সশব্দ পদক্ষেপ! কেন কে জানে, শিবানীর অঙ্গ যেন কেমন শিথিল হ'তে থাকে সেই শব্দে! খড়মের খটাখট আওয়াজ যত কাছে আসে তত যেন শঙ্কা জাগে শিবানীর বুকে।

—রাজাবাহাদুর কৈ, কোথায়?

আবার সেই উচ্চকণ্ঠের ধ্বনি, নিকট থেকে নিকটতর হয়। দূর থেকে নিকটে আসে।

অঙ্গে অঙ্গে শৈথিল্য নামে শিবানীর। অবশ হয়ে যায় যেন হস্তপদ। বুকের স্পন্দন যেন তার থেমে যেতে চায়! মুখ শুকিয়ে যায়! চোখে ফোটে বিহ্বল চাউনি। ছোটকুমার কাশীশঙ্করকে বড় একটা দেখতে পায় না শিবানী, কোথায় কখন থাকেন তিনি, জানতে পারে না। আর দেখতে পেলে কি এক সলাজ-সঙ্কোচে সে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলে! শুধু চোখের দেখা দেখতে কত সাধ হয় কত সময়ে অসময়ে, কিন্তু দেখা পেলে শিবানীর দৃষ্টি নত হয়ে যায়। আঁখি মেলে তাকাতে পর্য্যন্ত পারে না।

—রাজাবাহাদুর, কিবা প্রয়োজন মোরে?

আহার-কক্ষের দ্বারে দেখা দেন কাশীশঙ্কর! সূর্য্যের পূর্ণ-উদয়ের মত দেখায় যেন। কাশীশঙ্কর সদ্যঃস্নাত। লাল চেলীর ধুতি ও উত্তরীয় তাঁর পরিধানে। সুবিশাল ও লোমশ বক্ষমধ্যে শোভা পায় রুদ্রাক্ষর মালা! কুমারের আবির্ভাবের

সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে খস-খসের স্নিগ্ধশীতল সুগন্ধ। দারুণ গ্রীষ্মে খস-আতর ছিটিয়েছেন নিজ অঙ্গে।

কালীশঙ্কর আহার-আসন ত্যাগ করলেন, গাত্রোত্থান করলেন ধীরে ধীরে। বললেন,—ভ্রাতঃ, তোমার আহার-পর্ব্ব চুকেছে কি ?

শিবানীকে হয়তো কক্ষমধ্যে দেখে ঘরে আর প্রবেশ করলেন না কাশীশঙ্কর। ঘরে প্রবেশ করতে করতে বিরত হন। দ্বারের বাহিরেই দাঁড়িয়ে পড়েন। বলেন,—হাঁ, আহার সেরেছি! এখন কি আদেশ আছে তাই কও!

—একটা গোপন পরামর্শ আছে তোমার সহ! রাজাবাহাদুর কিছু ক উদ্যমের সঙ্গে প্রফুল্লচিত্তে বললেন,—দেওয়ানজীর নিকট তুমি কিছু শুন নাই ?

কাশীশঙ্কর এসেছিলেন বেশ খুশী মনে। শিবানীকে দেখে কিনা কে জানে, কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে যান। তাঁর মুখের আনন্দ-ভাব বিনষ্ট হয়ে যায়। অধরপ্রান্তের হাস্যরেখা অদৃশ্য হয় ক্ষণিকের মধ্যে!

একটিবার শুধু লজ্জার বাঁধ ভেঙ্গে চোখ মেলে তাকিয়েছিল শিবানী! বহু কষ্টে নিজেকে সংযত করে সে। শুধু অবাধ্য দুই চোখ নিষেধ মানলো না— কটাক্ষে দেখলো একবার। দেখলো, তিনি কেমন, তাঁর রূপ আর আকৃতির শোভা!

কুমারবাহাদুর বললেন,—হাঁ শুনেছি বৈ কি। তোমার বক্তব্য কি তাই ব্যক্ত কর, সেই মত ব্যবস্থা করা যায়।

আহার-কক্ষ ত্যাগ করতে করতে কালীশঙ্কর বললেন,—বিন্ধ্যবাসিনীর মুক্তির কি উপায় করা যায় ? তোমার অভিমত কি ? মান্দারণে থেকে বাঁচবে কি রাজকুমারী ? সেই পাণ্ডববর্জিত স্থানে ?

আবার একবার দেখলো শিবানী। আনত দৃষ্টি তুললো। বিলোল কটাক্ষে দেখলো রাজাবাহাদুরের পিছন থেকে। কুমারের সঙ্গে চোখা-চোখি হ'তেই চোখ নামালো ফের। কিছুতেই বোঝে না শিবানী, কেন এই অসম লজ্জা! চোখ তুলে তাকাতেও কেন আসে সঙ্কোচ! এত আশঙ্কা কেন!

যত দোষ রাজমাতার। মনে মনে তাঁকে অভিসম্পাত দেয় শিবানী। যে-মধুর

সম্পর্ক কোনদিনের তরেও গড়ে উঠে না আর, শুধু মুখের কথায় কেন যবে রাজমাতা ঘোষণা করেছিলেন সেই অসম্ভব রূপকথার অলীক কাহিনী! কাণে সুবর্ষণের মত কেন যে শিবানীর কাণে শুনিয়েছিলেন তাদের মধুমিলনের কল্প-গল্প!

—চল আমার কামরায় চল। কথা হবে তোমাতে আমাতে। দালানে পদার্পণ ক'রে বললেন কালীশঙ্কর। বললেন,—এই স্থানে, এই মুক্ত স্থানে দেওয়ালেরও কাণ থাকে!

পরম অনুরক্ত পরিচারিকার মত দালানের এক পাশে দাঁড়িয়েছিলেন রাজমহিষী, উমারাণী। তাঁর পদ্মের মত করপুটে ধারণ করেছিলেন রূপার পানদানি। মুখশুদ্ধির উপকরণ।

পানদানি থেকে পানের খিলি তুললেন রাজাবাহাদুর। গোটা কয়েক।

ভদ্রতা ও ভব্যতার খাতিরে, অর্ঘ্য দেওয়ার মত, রাজমহিষী তুলে ধরলেন পানদানি। ছোটকুমারকেও দেখালেন।

আমার মুখে আছে হরীতকী। খুশীর হাসি হেসে কাশীশঙ্কর বলেন। বলেন,—পান আমি খাই না। অভ্যাস নাই।

স্মিত হাস্যরেখা দেখা দেয় রাজরাণীর ডালিম-লাল অধরে। কৌতূহলী দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেন গমনোদ্যত দুই সহোদরকে। জ্যেষ্ঠকে দেখায় যেন কিঞ্চিৎ বিমর্ষ, চিন্তাকুল, উদ্বিগ্নমানস। কনিষ্ঠের মুখভাবের কোন বিকৃতি নেই, বরং প্রসন্ন-প্রশান্ত।

রাজ-অন্দরে যেন অন্ধকার নামে। সাড়াশব্দহীন নীরবতা বিরাজ করে। অন্ন-ব্যঞ্জনের সুগন্ধ শুধু যায় না।

দুই ভাইকে দালানের শেষ প্রান্তে অদৃশ্য হ'তে দেখে উমারাণীর স্তব্ধতা ভঙ্গ হয়। তিনিও পা চালান। রাজমহিষী বিপরীত চলেন। আহারকক্ষের দিকে চলেন।

রাজাবাহাদুরের ভুক্ত খাদ্য-সম্ভারের অবশিষ্ট ভাগ-বাঁটোয়ারা করতে হবে। প্রসাদ গ্রহণ করবেন রাণীমায়েরা। দেবতার প্রসাদ! শিবানী ব'সে ব'সে মাছি তাড়ায়।

সমুখে যে-কক্ষ উন্মুক্ত দেখলেন সেই ঘরেই প্রবেশ করলেন রাজাবাহাদুর। ঠিক মধ্যাহ্ন-ভোজনের অব্যবহিত পরেই অধিক চলাফেরা অনুচিত। তাই আর অধিক অগ্রসর হতে চাইলেন না হয়তো, গেলেন না তাঁর সুসজ্জিত খাস-কামরায়, রাজমহলে।

আসো, এই কুঠুরীতেই বসা যাক। অধিক গমনের সামর্থ্য এখন আমার নাই।

কালীশঙ্কর কথা বললেন বেশ যেন কষ্টের সঙ্গে। প্রায় হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে। কুঠরীতে সিঁদিয়ে।

কাশীশঙ্কর অনুসরণ করেন অগ্রজের। বলেন,—তথাস্তু। তাই হোক।

কুঠরীর অভ্যন্তরে একটি দীপ জ্বলছে। মধ্যে একটি তিন খানি কাষ্ঠের প্রায় দুইহাত উর্দ্ধ পাদপীঠ বা বৃহৎ চৌকী। কুঠরীর অপর দিকে দু'টি পর্য্যঙ্ক। পালঙ্কের প্রাচীরে কয়েকটি বন্দুক ঝুলানো। তাদের পাশে বারুদ ও গুলীর তোবড়া দশটা। অপর পার্শ্বে পাঁচটি ধনু, কুড়িটি আন্দাজ তূণ, সুতীক্ষ্ণ শরপূর্ণ। দু'টি তরবারি, একখানি চর্ম্ম, একটি কৃপাণী। কুঠরীর একদিকের দেওয়াল-প্রাচীরে ছিপ, বর্শা, ভীষণ খড়্গা।

অন্দরের একটি নাতিবৃহৎ অস্ত্র-ঘর হয়তো এই কুঠরী। দীপালোকে অস্ত্রসমূহকে জীবন্তরূপে ভুল হয়।

চৌকীতে আসন গ্রহণ করলেন কালীশঙ্কর।

কুমারবাহাদুর আর বসলেন না। সুসজ্জিত অস্ত্রাদি দেখে মন যেন তাঁর অস্থির হয়ে ওঠে আনন্দের আধিক্যে! কুঠরীর দেওয়ালে দৃষ্টি বুলায়ে পায়চারী করতে থাকেন। প্রত্যেকটি অস্ত্র ব্যগ্রচোখে দেখেন, তাদের কাছাকাছি যান।

ভীষণতম অস্ত্র। সম্মুখ-যুদ্ধের ক্ষুরধার সাজসরঞ্জাম। কি ভীষণ তীক্ষ্ণ, ধারালো! নক্সা-কাটা চিত্রবিচিত্র খড়্গের বুকে আঁকা সুদীর্ঘ চক্ষু—হননেচ্ছার নৃসংশ দৃষ্টিতে যেন তাকিয়ে আছে।

দীপালোকে চিক চিক করছে তীর, তরবারী, বর্শা ও কৃপাণীর ফলা। ঠিক কাঁদছে, নীরব-কান্না। অব্যবহারে, অব্যবহারে ম্লান হয়ে আছে যে!

কুমার কাশীশঙ্করের দেখা যেন শেষ হয় না। এত প্রেম, এত ভালবাসা, এত মিতালী ওদের সঙ্গে—দেখে দেখে তাই যেন আশা আর মিটে না। খড়্গের চোখে যে ফুটে আছে আকুল তিয়াস, কি এক আবেদনের আবেশভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। উষ্ণ শোণিত-সুধার আস্বাদ চায় যেন! কোন গর্দানের তাজা মাংসের আর উষ্ণ রক্তের স্বাদ চায়!

চৌকীতে বসে থাকতে থাকতে রাজাবাহাদুরের মত প্রতাপশালীও হঠাৎ একবার চমকে উঠলেন কোন্ এক অস্ত্রের হঠাৎ ঝঙ্কারে। হাতের মুক্ত অস্ত্রকে আর মুখের বাক্যকে নাকি বিশ্বাস করতে নেই—এমনই তারা মুক্তিলোভী। মুখ আর হাত ফসকে যথাক্রমে কথা আর অস্ত্র বেরিয়ে গেলেই গেল! হঠাৎ যেন মৃত্যুক্ষণের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তকে অনুভব করলেন রাজাবাহাদুর! শিউরে শিউরে উঠলেন, শরীর তাঁর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। চোখ ফিরিয়ে দেখলেন তিনি, দেখলেন কনিষ্ঠের ভাবগতিক, কোন কাজে ব্যাপৃত কাশীশঙ্কর!

মাথায় মুকুট, তাই মৃত্যুভয় অপরিসীম। স্থির ভেবেছিলেন রাজাবাহাদুর, তিনি নিশ্চিত দেখবেন, উদ্যত হত্যাকারী তাঁরই ঐ কনিষ্ঠ ভ্রাতা। চোখ ফিরিয়ে তা দেখলেন না। দেখলেন কাশীশঙ্কর এক ভীষণ খড়্গের ভার এক হস্তে পরীক্ষা করছেন মুখে হাসি মাখিয়ে। তাঁর লাল চেলীর উত্তরীয় স্কন্ধচ্যুত হয়ে খ'সে পড়েছে! অস্ত্রটির ভার-পরীক্ষার ভারে কুমারের ঊর্দ্ধাঙ্গের পেশীগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

রাজাবাহাদুর বললেন,—এখন কি কর্ত্তব্য তাই বল! বড়ই বিব্রত আছি আমি।

কুঠরীতে অন্য তৃতীয় ব্যক্তি নেই! কাশীশঙ্কর হাতের খড়্গটি যথাস্থানে রাখতে রাখতে বললেন,—আদেশ দাও তো আমিই যাই মান্দারণে! খড়্গ, কৃপাণ, বর্শা থাক সঙ্গে। প্রহরীকে ঘায়েলের পর বিন্ধ্যবাসিনীকে উদ্ধারের পথে কোন অন্তরায় থাকবে না!

ঘোর-লাল চোখ কালীশঙ্করের। শিবনেত্র যেন।

সেই চোখ দু'টি বিস্ফারিত হয়ে উঠলো। রাজা আরেকবার দেখলেন অনুজকে, বঙ্কিম গ্রীবায়!

—হুঁকা-বরদার, হুজুর!

স্নিগ্ধশীতল কুঠরীর বাইরে থেকে কথা বললে হুঁকার বাহক, এক হুকুমদার।

তামাকপায়ী রাজা এতক্ষণ যেন এই বিশেষ বস্তুটির অভাবেই আনচান করছিলেন। আহারের পরমুহূর্ত্তে তাম্রকূটসেবন না হ'লেই এমন হয়, কিছুই যেন ভাল লাগে না—মেজাজ তিতিবিরক্ত হয়ে ওঠে—ঝিমানি ধরে। ঘুম পায়।

—আলবোলা কৈ?

চেঁচিয়ে উঠলেন রাজা বাহাদুর। সজোরে বললেন।

—হাজির হুজুর।

সাড়া পাওয়া যায় বাইরের দালান থেকে! সাড়া পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাহকও প্রবেশ করে। এক হাতে তার ইরানী আলবোলা, অন্য হাতে জরি-তারের সটকা! রূপার আলবোলার শিখরে রত্নের ঝারি ঝুলছে। পান্নার নোলক দুলছে!

সটকাটি রাজাবাহাদুরের হাতে ধরিয়ে দিয়ে যায় হুঁকাবরদার!

এবং তৎক্ষণাৎ মুখনল মুখে তুলে ঘন ঘন টানতে থাকেন কালীশঙ্কর। আহারের ঠিক পরে আলবোলায় কয়েকটা টান না দিলে আহারের তৃপ্তি পাওয়া যায় না যেন পূর্ণমাত্রায়!

—জবাব নাই কেন?

আঙুলের পরশে অত্যন্ত সন্তর্পণে একটি তরবারীর ধার পরীক্ষা করতে করতে বললেন কুমার বাহাদুর।

ঘন ঘন ধোঁয়া ছাড়েন রাজাবাহাদুর! আরও কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে বললেন,—অন্য কোন পথ নাই?

—আমি তো দেখি না।

কালীশঙ্কর কথা বলেন,—আর সতর্ক অঙ্গুলি-স্পর্শে তরবারীর ধার পরীক্ষা করেন।

মুখ থেকে মুখনল নামিয়ে রাজা বাহাদুর বলেন,—তুমি যদি সম্মত হও,

তবে আমি কেষ্টরামের দাবীর কিছু পূরণ করি। সহজ পথে কাজ হয়!

ডাইনে বাঁয়ে মাথা দোলালেন কাশীশঙ্কর! অসম্মতির মুখভঙ্গীতে বললেন, —আমার মত নাই। কৃষ্ণরাম এক লোভী, অর্থপিশাচ, দুশ্চরিত্র জমিদার! তোমার সমগ্র ভূসম্পত্তি আর ধনরত্ন লাভেও সে তৃপ্ত হবে না! কদাচ যদি কিছু পায়, বারম্বার দাবী জানাবে।

—তবে কি উপায়? কিং কর্ত্তব্যম্?

রাজাবাহাদুরের ব্যাকুল প্রশ্ন শুনে কুমারবাহাদুর বললেন,—বলং বলং বাহুবলম্! অন্য উপায় তো দেখি না!

—নাপতিনীকে কি বলা যায়? কথার শেষে মুখনল মুখে তুললেন রাজাবাহাদুর।

একটি গাদা-বন্দুক হাতে তুলেছিলেন কাশীশঙ্কর।

চকিতের মধ্যে সেটিকে নামিয়ে রেখে দিলেন পালঙের পরে, একান্ত বিরক্তির সঙ্গে। কাশীশঙ্করের কাছে বারুদের বন্দুকের কোন দামই নাই। এই জাতীয় মারণ-অস্ত্রের কোন মূল্য দেন না তিনি। শত্রুর অসাবধানতার সুযোগে বন্দুক দাগতে পারে যে কেউ, তাতে বীরত্ব কি! সম্মুখ যুদ্ধ ব্যতীত অন্য কোন পথে শক্তি-পরীক্ষা হয় না। সামনাসামনি, হাতাহাতি লড়াই না চললে কার কত শক্তি কে জানবে! কার দেহে কত বল, কার কত মুরদ!

—নাপতিনীকে বিদায় কর! গর্জ্জে উঠলেন যেন কালীশঙ্কর। তাচ্ছিল্যের কড়া সুরে বললেন। বললেন,—বোঝ না কেন, সে একটা কুটনী! কৃষ্ণরামেরই অনুচরী!

—ইহা কি সত্য?

কালীশঙ্কর মুখনল জানুর পরে নামিয়ে রেখে বললেন, ব্যস্ততার সুরে। বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে।

—অকাট্য সত্য! দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন কুমারবাহাদুর। আত্ম-প্রত্যয়ের জোরালো কণ্ঠে বললেন,—সত্য না হয়ে যায় না। কৃষ্ণরামই ঐ নাপতিনীকে

সকল সমাচার দিয়ে রাজগৃহে প্রেরণ করেছে, তা তুমি নিশ্চিত জানিও। কৃষ্ণরামের অকরণীয় কিছুই নাই।

—আমি এতটা খতিয়ে ভাবি নাই। মনে হয়, তোমার অনুমানই সত্য। কথা বলতে বলতে সটকা মুখে তোলেন রাজাবাহাদুর।

আলবোলা বোল বলতে থাকলো। শব্দ উঠলো গড় গড়, গড় গড়—

স্নিগ্ধ শীতল কুঠরীতে সুগন্ধি তামাকের খুশবু ছড়ালো।

—নাপতিনীকে কুলার বাতাস দিয়ে বিদায় করতে হুকুম দেও! কাশীশঙ্করের সজোর কণ্ঠে কুঠরী যেন ফেটে পড়তে চায়। তিনি বলেন,—অর্থদানেও আমি তো লোকসান বৈ লাভ দেখি না। কৃষ্ণরাম বহুভোগী, বিন্ধ্যবাসিনীকে কদাপি সেই অহ্‌মক গ্রহণ করবে না!

খসে-যাওয়া লাল চেলীর উত্তরীয় কাঁধে ফেলতে ফেলতে পর্য্যঙ্কে বসে পড়লেন কুমারবাহাদুর। দৈহিক শ্রমে তিনি ক্লান্তি বোধ করেন না, কথা বলে বলে যেন শ্রান্ত হয়ে পড়েন। অধিক বাক্যব্যয়ে ক্লান্ত হন।

—তুমি এত সামান্যে ব্যস্ত হও কেন! কোথায় গেল তোমার সেই ব্যাঘ্র-বিক্রম? কাশীশঙ্কর কথাগুলি বলেন বিনম্র কণ্ঠে। বিচলিত হয়েছেন যেন, ললাটে ও বক্ষে তাঁর বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটেছে। দীপালোকে জ্বলছে স্বেদবিন্দু।

রাজাবাহাদুর সহাস্যে বলেন,—ত্বং হি মে বলবিক্রমঃ! তুমিই আমার বলবিক্রম, আমার এই প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় তুমিই আমার ভরসা!

—এ তোমার অতিবাচন রাজাবাহাদুর!

কাশীশঙ্করও কথা বলতে বলতে হাসলেন, প্রসন্ন-হাসি।

—কদাপি নয়। আমি মিথ্যা বলি নাই।

আবার সটকা খসে পড়লো জানুর পরে। আলবোলার বোল থামিয়ে বসলেন রাজাবাহাদুর। তাঁর মুখে অমলিন আন্তরিকতার ভাব ফুটে ওঠে। কেমন যেন ব্যথা-কাতর সুরে কথাগুলি বলেন।

কাশীশঙ্করের হাতে অনেক কাজ। তাঁর সময় অল্প। পর্য্যঙ্ক ছেড়ে

উঠলেন তিনি। বললেন,—বড় আনন্দ হয় তোমার এ কথায়। তোমাকে একটি কথা বলি, তুমি আদপেই ত্রব না হও। বিন্ধ্যবাসিনীকে উদ্ধারের চেষ্টা ব্যর্থ হবে না জানিও। আমি স্বয়ং যাবো মান্দারণে। তজ্জন্য ভাবিও না।

—তুমি রক্তপাতের পক্ষেই সায় দাও ?

কথার সুর নামিয়ে চুপি চুপি বললেন রাজাবাহাদুর। প্রশ্ন করলেন।

—বিনা রক্তপাতে শাস্তি নাই! মুক্তি নাই!

কথা বলতে বলতে কুমারবাহাদুর কুঠরী ত্যাগের উদ্যোগ করেন। বলেন, —শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ। আমি তো অন্য কোন উপায় দেখি না।

—কৃতকার্য্য হওয়ার আশা রাখো ?

আবার চুপি চুপি বলেন কালীশঙ্কর। ব্যস্ত কণ্ঠে।

কিয়ৎক্ষণ নীরব থেকে কুমারবাহাদুর বললেন,—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। তবে কোন কার্য্যই ঝটিতি হয় না, আমি সময় চাই। তোমার ধৈর্য্যধারণের প্রয়োজন, তুমি ব্যস্ত না হও। দেখই না শেষ পর্য্যন্ত কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়!

রাজাবাহাদুরের ঝিমুনি ধরে যেন! দিবানিদ্রার ঝিমুনি। তিনি বললেন, —বিন্ধ্যবাসিনী কোনক্রমে যদি একবার রাজপুরীতে আসতে পায়, আমি আর তাকে ত্যাগ করবো না। বিন্দু জানবে যে, সে বৈধব্য পালনে ব্রতী হয়েছে! আমি ব্যস্ত হই মা জননীর মনঃকষ্টে, নতুবা আমার আর কি!

—আমি চিন্তা করি, দেখি কি করা যায়। পদধূলি দাও, আমি এখন যাই। আমার অনেক কাজ ফেলা আছে। ভুলিও না, বিন্দু আমারও সহোদরা!

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে প্রণাম সেরে কুঠরী ত্যাগ করেন কাশীশঙ্কর। তাঁর কাষ্ঠ-পাদুকার শব্দ ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হ'তে থাকে। কাশীশঙ্কর দ্রুতপদে রাজ-অন্দর ত্যাগ করেন। কত বাকী কাজ ফেলে এসেছেন!

ভবিতব্যতা কে খণ্ডন করতে পারে! ললাটের লিখন মুছতে পারে কেউ!

বিন্ধ্যবাসিনী যতক্ষণ ছাদে থাকেন, যতক্ষণ ঐ প্রবহমান আমোদর দেখেন, যতক্ষণ ঐ দিগন্তবিস্তৃত মুক্ত আকাশের তলে থাকেন, ততক্ষণই সুস্থির থাকেন।

তখন, তাঁর মনে হয় না তিনি পরিত্যক্তা, নির্ব্বাসিতা, বঞ্চিতা-বন্দিনী! আর যখন এই জীর্ণ ও ভগ্ন প্রাসাদের কোন কক্ষে থাকেন, তখন যেন যত রাজ্যের দুশ্চিন্তা তাঁর মনকে অধিকার করে। তখন তিনি যেন সন্তপ্তা, বিচ্ছেদ-শোকে মুহ্যমানা।

যেখানে বিস্তার সেখানেই মুক্তি। মুক্ত শুভ্র আকাশের দিগন্ত বিস্তার যেন ভুলিয়ে দেয় পৃথিবীর যত দুঃখ-সুখ। বদ্ধ ঘরে গেলেই আবার তাদের সেই দুঃসহ আক্রমণ।

ছাদ ত্যাগ করে একটি কক্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিলেন বিন্ধ্যবাসিনী! সামান্য ফলাহার করেছিলেন। অন্ন গ্রহণ করেননি। ভূ-দৃষ্টিতে বসেছিলেন নিথর, নিস্পন্দের মত। ঘন ঘন শ্বাস পড়ছিল। তাঁর দীর্ঘ দুই নেত্র থেকে বিন্দু বিন্দু অশ্রুপাত হয়। চোখের জল। বিচ্ছেদ শোক এমনই দুষ্ট যে সে সান্ত্বনা মানে না। অতীব শোকানল শোচনীয় ঘৃতাহুতিতে যেমন অধিক প্রজ্জ্বলিত হয়, আবার সান্ত্বনাবারি সিঞ্চনেও তেমনিই জ্বলে ওঠে।

পরিচারিকা যশোদা সান্ত্বনা দানে আর প্রবৃত্ত হয় না। কোন ফল পাওয়া যায় না যে! কোন সান্ত্বনা বাক্য কানে তোলেন না জমিদার-নন্দিনী!

নিঃশব্দে অশ্রু বিসর্জন করেন রাজকুমারী। মধ্যে মধ্যে অঞ্চলে চোখ মোছেন। আঁচল সিক্ত হয়ে যায় অশ্রুকণায়!

—বৌ।

যশোদা মিহিকণ্ঠে ডাক দেয়। ভয় আর শঙ্কাভরা সুরে।

জলভরা চোখ তোলেন রাজকুমারী। ভূতল থেকে দৃষ্টি ফেরান।

যশোদা বললে—আমোদরে স্নান সারতে গিয়ে এক ব্রাহ্মণের দেখা মিললো।

—কে ব্রাহ্মণ! কি বলেন তিনি?

প্রায় বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে শুধোলেন বিন্ধ্যবাসিনী। জলভরা চোখ আঁচলে মুছলেন।

যশোদা বললে,—ব্রাহ্মণ আমার অচেনা! এই জমিদারগৃহে মানুষের বসতি আছে, ব্রাহ্মণ জানে না। ব্রাহ্মণ বলে যে—

আমোদরের তীর থেকে আসছে যশোদা। পথশ্রমে পরিচারিকা তাই হাঁপায়। কথার মধ্যপথে কথা থামায়।

কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বের দেখা সেই ব্রাহ্মণের সৌম্যমূর্ত্তি রাজকুমারীর নয়নপথে ভাসে। তিনি অদম্য কৌতূহলের সঙ্গে শুধালেন,—কি বলেন ব্রাহ্মণ? কি চান?

যশোদা বললে,—কিছু চান না, বরং দিতে চান।

আর কোন প্রশ্ন করেন না বিন্ধ্যবাসিনী। সজল চোখের পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন।

টেনে টেনে শ্বাস নেয় যশোদা। হাঁপাতে হাঁপাতে বলে,—একটি শালগ্রাম-শিলা দিতে চান। চল না তুমিও আড়াল থেকে ব্রাহ্মণের বক্তব্য শুনবে'খন।

—প্রহরী যদি বাধা দেয় যশো?

কতক্ষণ ভেবে ভেবে কেমন যেন ভয়ে ভয়ে বলেন রাজকুমারী।

যশোদা অবজ্ঞার হাসি হাসে। বলে,—প্রহরী তো আছে সেই সমুখের কটকে! আসমানদীঘির ঘাটের দুয়োর তো উন্মুক্ত। সেখানে কেউ নাই। ব্রাহ্মণ সেখানেই অপেক্ষায় আছেন। তুমিও চল; আড়াল থেকে স্বকর্ণে শুনবে।

কিসের এক আবেশে যেন কান্না ভুলে যান বিন্ধ্যবাসিনী। কেন কে জানে। ধীরে ধীরে ওঠেন। অনুসরণ করেন, যশোদার পিছু পিছু চলেন অবশ পদে।

সেই সৌম্যকান্তি শুভ্রবর্ণ ব্রাহ্মণ! চোখে দেখে দেখে কেমন এক তৃপ্তির শ্বাস ফেলেন রাজকুমারী।

দূর থেকে এক নজরে দেখে নেন জমিদারনন্দিনী।

ব্রাহ্মণ দেখতে পান না, কে তাঁকে বিমুগ্ধ নয়নে দেখলো। ব্রাহ্মণের সিক্ত-বাস। দুই হাতের করপুটে লাল শালুর বস্ত্রাধারে কি যেন ধারণ ক'রে আছেন। স্কন্ধে এক খণ্ড বস্ত্র, হয়তো গা মোছার গামছা। দারুণ রৌদ্র-তাপে ব্রাহ্মণের শুভ্র দেহবর্ণ রক্তিম আকার ধারণ করেছে।

আরেকবার দেখা যায় না!

এক ঝুলান চিকের আড়ালে দাঁড়াতে হয়, অবগুণ্ঠন টেনে। লুকিয়ে দেখার চেষ্টায় বাধা পড়ে, গুণ্ঠন বাধা দেয়। দৃষ্টির পথ রোধ করে।

যশোদা বললে,—জমিদারনী এসেছেন, কি বলতে চান বলেন।

হয়তো অন্য মনে ছিলেন ব্রাহ্মণ। কোন এক চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। পরিচারিকার কথা কানে পৌঁছতেই আশ্বস্থ হলেন। অপ্রতিভ হাসি হেসে বললেন, —আমি এক চতুষ্পাঠীর আচার্য্য। এই দীঘির অপর প্রান্তে আমার পর্ণকুটীর। কিঞ্চিদধিক পক্ষকাল পূর্ব্বে আমোদরের তীরে সহসা দর্শন পাই এই শালগ্রামশিলার। শিলাটি আমি দান করতে চাই কোন গৃহস্থকে—যাঁর গৃহে নিয়মানুযায়ী পূজা পাবেন তিনি।

বিন্ধ্যবাসিনী ফিসফিসিয়ে যশোদার কানে বললেন,—নিজেই তো রক্ষা করতে পারেন ঐ নারায়ণকে! ত্যাগ করবেন কেন?

যশোদা সেই কথাগুলি আওড়ায়। বিন্ধ্যবাসিনীর উক্তির পুনরুক্তি করে।

ব্রাহ্মণ আবার হাসলেন। প্রশান্ত হাসি। বললেন,—আমিই তো নারায়ণ! নরনারায়ণ। এই দরিদ্র দেশে খাদ্যাভাবে নিজেই যে কতদিন অভুক্ত থাকি! আহার্য্য মিলে না। শালগ্রামশিলার নিত্যভোগ চাই। সযত্ন সেবা চাই। ওঁ নমো নারায়ণায়!

রাজকুমারী যশোদাকে বললেন,—শিলা স্থাপনে কোন ক্ষতির আশঙ্কা আছে কি?

যশোদা পুনরাবৃত্তি করে বিন্ধ্যবাসিনীর কথা।

ব্রাহ্মণ হো হো শব্দে হাসলেন। হাসতে হাসতে বললেন,—অযুতসূর্য্যসম প্রভা তাঁর, সেই মেঘশ্যাম চতুর্বাহু অব্যক্ত ও শাশ্বত! তিনিই সর্ব্বরূপ, সর্ব্বেশ, সর্ব্বজ্ঞ! তিনিই বাসুদেব, জনার্দ্দন, নরকান্তক! দেবসেবায় কভু কারও ক্ষতি হয়! তিনি যে মঙ্গলময়!

—পূজার বিধি কি? সেবার নিয়ম কি?

রাজকুমারী ফিস-ফিস বলেন। যশোদা পুনরুল্লেখ করে।

ব্রাহ্মণ আকাশ দেখেন, শূণ্যে দৃষ্টি তোলেন। দেখেন হয়তো সূর্য্যের গতি-প্রকৃতি। বলেন,—পূজাবিধি কথনের মত সময় আমার বর্তমানে নাই। আপাততঃ এই শিলা স্থাপিত হোক্। শিষ্যের দল প্রতীক্ষায় আছে আমার। অবকাশ মত কোন এক ক্ষণে পুণরায় এসে' সেবাপদ্ধতি ব্যক্ত করবো।

—তাই হোক্।

ব্রাহ্মণের কথা রুদ্ধশ্বাসে শুনতে শুনতে যেন মুখ ফসকে বলে ফেললেন, রাজকুমারী!

যশোদাও তৎক্ষণাৎ উচ্চারণ করলো সেই দুটি কথা।

ব্রাহ্মণের মুখবিম্বে প্রফুল্ল হাসি ফুটলো। ব্রাহ্মণ যশোদাকে উদ্দেশ করে বলেন,—পরিচারিকা, তুমি কি জাতে ব্রাহ্মণ।

—হাঁ গো হাঁ!

সগর্ব্বে বললে যশোদা। ওপরে নীচে মাথা দুলিয়ে।

ব্রাহ্মণ সহাস্যে বলেন,—তবে ধারণ কর এই শিলাখণ্ড।

শিলা-নারায়ণকে হস্তান্তরিত করার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ আসমান-দীঘির বক্ষে এক ঝাঁপ দিলেন। হঠাৎ আঘাত পেয়ে দীঘির পানায় পরিপূর্ণ কাকচক্ষু জল লাফিয়ে উঠলো। আসমান কেঁপে উঠলো যেন!

চিকের আড়াল থেকে মাথার গুণ্ঠন খসিয়ে রাজকুমারী উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে দেখলেন, আসমান দীঘির বুকে সশব্দ আলোড়ন। ব্রাহ্মণ তীর বেগে সাঁতরে চলেছেন।

দীঘির অপর তীরে চতুষ্পাঠী? ব্রাহ্মণ অদৃশ্য হতে রুদ্ধশ্বাস ফেললেন রাজকুমারী। বিস্ময়, বিভ্রম না বিমোহনের ঘোরে দেহবল্লরী অবশ হয়। কেমন যেন হতচেতনের মত নিশ্চুপ হয়ে যান ঐ অবরোধবাসিনী অবলা!

চরকায় তেল পড়ে, পাছে শব্দ হয় ক্যাঁচ ক্যাঁচ!

কেঁদে কেঁদে কখন যে ঘুমে অচেতন হয়েছেন বিলাসবাসিনী, কেউ জানতে

পারে না। সেবিকা আর পরিচারিকার দল কারণে-অকারণে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করেও ত্যাগ করে না তাদের রাজমাতাকে। দশমহাবিদ্যার কাহিনী শুনতে শুনতে কেন কে জানে, বড় বেশী ভীতা হয়ে উঠেছিলেন রাজমাতা। সক্রোধে বিতাড়িত করেছেন পদসেবায় রত সেবিকাদের। তিরস্কারের সুরে কথা বলেছিলেন। দক্ষকন্যার কাহিনী কথনে বিরতি দিয়ে স্নিগ্ধ-শীতল কুঠরীর বাহিরের দালানে তারা জড় হয়েছে। আবার কখন রাজমাতা ডাক পাড়বেন কে জানে! ওদের কেউ কাঁথায় নক্সা তোলে, কেউ সুপারী কুঁচায়, কেউ চরকা কাটে। সকলেই নীরব নির্ব্বাক। কথা বলাবলিতে ঘুম ভেঙ্গে যায় যদি, ঘুমের যদি ব্যাঘাত হয় রাজমাতার! একেই তিনি মর্ম্মাহত, বিষণ্ণ, অশান্ত। রাগারাগি কান্নাকাটি বকাবকি থামিয়ে এতক্ষণে তিনি চোখে-পাতায় এক করেছেন, সেবিকার দলও নিশ্চিন্ত হয়েছে। হাঁফ ছেড়ে যেন বেঁচেছে। তবুও রাজমাতার মহল ত্যাগ করতে সাহসী হয় না কেউ, কখন কাকে ডাকেন তার ঠিক নেই। কখন ঘুম ভাঙ্গে। ঘুম ভাঙ্গলেই তিনি ডাক ছাড়বেন। চোখের সম্মুখে হাজির না থাকলে, কণ্ঠস্বর সপ্তমে তুলবেন। কত কটু কথা বলবেন! সেই ভয়ে কেউ আর এক দণ্ডের তরে বিশ্রাম নিতে যায় না। কুঠরীর দালান ছেড়ে যায় না।

খোলা দালানে কাঠ-ফাটা রৌদ্র। তপ্ত বাতাস। কুঠরীর ছাদে এক জোড়া চিল, পরিত্রাহি চীৎকার করছে। বৈশাখের থমথমে অপরাহ্ণ চিল-চেঁচানোর বিরাম বিহীন শব্দে মুখর হয়ে ওঠে। সূর্য্যের তাপে জ্বালা ধরে দেহে, সহ্য করতে হয় দাসীদের, মুখ বুঁজে। চরকার চাকা ঘুরালে পাছে ক্যাঁচ ক্যাঁচিয়ে ওঠে, তাই তেল দিতে হয় ঘন ঘন। কেউ কাঁথায় নক্সা তোলে, কেউ সুপারী কুঁচায়, কেউ কেউ চরকার সুতো কাটে।

—ব্রজ কমনে গেলে? ব্রজবালা!

দাসীরা একসঙ্গে সচকিত হয়ে ওঠে। হাতের কাজ বন্ধ করে। থেমে যায় চরকার ঘূর্ণণ! চিলের একটানা একঘেয়ে ডাক শুনে উঠে পড়লেন না কি রাজমাতা!

—পোড়ারমুখো চিল! ফিসফিসিয়ে বললে এক দাসী।

খাস-চাকরাণী ব্রজবালা চরকায় বসেছিল। উঠে পড়লো সাত তাড়াতাড়ি। বিনম্র কণ্ঠে সাড়া দিলো,—যাই হুজুরণী! এই এলাম বলে।

কুঠরীর দ্বার না পেরোতেই বিলাসবাসিনী কেমন যেন খুশী খুশী কথা বলেন। বললেন,—হ্যাঁ রে ব্রজ, সাতগাঁ থেকে জগমোহন এলো?

বস্ত্রাঞ্চলে কপালের ঘাম মুছতে থাকে ব্রজবালা। বলে সাতগাঁ কি একদিনের পথ হুজুরণী! তুমি ব্যস্ত হও কেন?

কাট-ফাটা রোদের আলো থেকে একেবারে অন্ধকার কুঠরীতে। চোখে যেন আঁধার দেখে ব্রজ। চোখ রগড়ায়।

—গ্যাখ ব্রজবালা, ইষ্টদেবীকে স্বপ্ন দেখেছি এই দুপুরে।

রাজমাতার হাসিমাখানো কথা, বলেন যেন কত পরিতৃপ্তির সুরে! কোথায় গেল বিলাসবাসিনীর উগ্রমূর্তি, ভাবলো ব্রজবালা। বললে,—হুজুরণী, আপনার কি ভাগ্যি! তা কি দেখলে কি?

চোখের প্রান্ত আঁচলে মুছলেন রাজমাতা। আনন্দাশ্রু মুছলেন। বললেন, —আমার ইষ্টমূর্তিকে দেখেছি, হাতে বরাভয় মুদ্রা। মুখে একমুখ হাসি।

—তোমার কি সৌভাগ্য হুজুরণী? কোন আদেশ পে'ছ নাকি?

সাগ্রহে শুধোলে ব্রজবালা, মুখে সরল হাসি ফুটিয়ে।

এতক্ষণে যেন তাঁর চোখে পড়লো রাজমাতাকে। স্বচ্ছ চোখে দেখলো, বিলাস-বাসিনীর প্রসন্ন বদন, অধরে হাস্যরেখা।

রাজমাতা সহাস্যে বললেন,—তা তোকে বলবো কেন? বললে ফলে না। স্বপ্ন মিথ্যে হয়ে যায়।

খিল-খিল হাসলো ব্রজবালা। হাসি থামিয়ে বললে,—শুনতে আমি চাই না হুজুরণী! তোমার মুখে হাসি দেখেছি, আর কিছু চাই না আমি।

শয্যা ত্যাগ করে উঠে বসেছেন বিলাসবাসিনী। কুঠরীতে একটি মাত্র দ্বার। হাওয়া খেলে না কুঠরীতে। হাত-পাখা চালনা করেন রাজমাতা স্বয়ং।

পাখার বাতাস খেতে খেতে বললেন,—সাধ যায়, সাতগাঁ চলে যাই। দেখে আসি আমার বিন্দুরাণীকে। বাছা আমার কেমন আছে কে জানে!

ব্রজবালা বললে,—দাও পাখাখানা আমাকে দাও। আমি বাতাস করি। সাতগাঁ যাওয়া-আসা কি মুখের কথা হুজুরণী! হুট বলতেই কি যাওয়া যায়? নৌকায় যেতে একদিন, আসতে একদিন।

—অনেকটা পথ নয় রে ব্রজ? একান্ত অজ্ঞের মত শুধোলেন বিলাসবাসিনী।

—তা আর নয়? বললে ব্রজবালা। পাখার বাতাস দিতে দিতে বললে,—নৌকায় গেলে এলে আপনার কষ্ট হবে। আপনার শরীরে কুলোবে না।

অগত্যা সপ্তগ্রামে গমনের প্রসঙ্গ ত্যাগ করলেন রাজমাতা। খানিক চুপচাপ থাকতে থাকতে বললেন,—কেষ্টরাম মরে না কেন? বিন্দু আমার বিধবা হলেও সুখে থাকবে।

নকল তিরস্কারের সুরে ব্রজবালা বললে,—কি যে ছাই বল হুজুরণী! মেয়ে বিধবা হোক্, এমন কথা বলতে আছে না কি?

হতাশ শ্বাস ফেললেন বিলাসবাসিনী, দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন,—কত দুঃখে যে এমন কথা মুখে আসে! বিন্দু আমার কখনও সুখ পায়নি। কেষ্টরাম ঘর করে না তার সঙ্গে। কুলাঙ্গারটা শুনতে পাই কুলাচার্য্য হয়েছে। বনগাঁয়ে শেয়াল রাজা হয়েছে। কথা বলতে বলতে ক্ষণেক থেমে বললেন,—ব্রজ রোদ পড়েছে? চল্ ঘাটে যাই।

—না হুজুরণী! বললে ব্রজবালা।—কুঠরীর দুয়োরে এখন রোদ্দুর। দালান পেরোতে পা তোমার সেঁকে যাবে। রোদ পড়লে যেও। সবে এখন বোশেখ মাস, তাতেই এই চড়া রোদ! না জানি কত গরম পড়বে এখনও।

যেন কিছুতেই ভুলতে পারেন না রাজমাতা। মন থেকে মুছতে পারেন না। বললেন,—কেষ্টরাম মলে আমি হরির লুঠ দেবো!

কথায় কথায় কথাই বাড়ে। ব্রজবালা নিরুত্তর থাকে। পাখা চালিয়ে

বাতাস দেয়। চমকে ওঠে হঠাৎ ব্যাঘ্র-নিনাদ শুনে। রাজার পশুশালায় মাংস-লোলুপ বাঘ ডাকছে। ক্ষুধা পাওয়ার ডাক ডাকছে।

কুলীনশ্রেষ্ঠ জমিদার কৃষ্ণরাম যেন অব্যয়, অক্ষয়। দুর্দ্দমনীয়!

উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত কৃষ্ণরামের গৃহের ফটকে হাতী বাঁধা। সজ্জিত হাতী। তাদের গলে রৌপ্যখচিত ঘণ্টামালা। মস্তক খড়িরেখায় অঙ্কিত। কর্ণদ্বয় সিন্দুর-লিপ্ত। ললাটে সিঁদুরের সুবৃহৎ ফোঁটা। পৃষ্ঠের উপর আমাড়ি-হাওদা, বন্ধনরজ্জু রক্তবর্ণ। স্কন্ধের পরে খর্ব্বপ্রায় মাহুত। তার হাতে যমদণ্ডের মত বক্র অঙ্কুশ। জমিদার-গৃহের দ্বারের সম্মুখে সারি সারি শ্বেতবর্ণ অশ্ব। নানা রত্নের শোভা অশ্বের বেশ ভূষায়। অশ্বসমূহ অত্যন্ত তেজস্বী। পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ। গ্রীবা বক্র। কর্ণ উচ্চ। পদবিক্ষেপে ধরা খনন করে। অশ্বসমূহের সোনার খলীন ও জরীর বল্‌গা। অশ্বের বল্‌গা ধরে দাঁড়িয়ে আছে এক এক সুসজ্জিত পুরুষ। অদূরে আরও একজন—স্বর্ণদণ্ডে রেশমের পতাকা ধরেছে। গৈরিক পতাকা। পতাকায় মধ্যাহ্ন সূর্যচিহ্ন। জমিদার-গৃহের প্রাঙ্গণে আশা ও সোটাধারী প্রায় পঞ্চাশ জন ইতস্ততঃ বিচরণ করছে।

গ্রীষ্মদিনের উষ্মাধিক্য কতক্ষণে হ্রাস পায়, সেই প্রতীক্ষায় আছেন জমিদার কৃষ্ণরাম। সপ্তগ্রামের কুলীনশ্রেষ্ঠ কুলাচার্য্য, গৃহপ্রাঙ্গণের এক বহুবিস্তৃত বট-বৃক্ষের ছায়াবেদীতে বসে অশ্ব এবং হস্তিযূথকে নিরীক্ষণ করছিলেন। সগর্ব্ব দৃষ্টিতে দেখছিলেন ওদের সাজ-সজ্জা, বেশভূষার রত্নশোভা। জমিদার-গৃহের প্রাঙ্গণ ছায়া-শীতল। বট আর অশথের বিস্তারিত শাখা-প্রশাখা ভেদ করতে পারে না সূর্য্যরশ্মি। আম, জাম, নোনা আর লিচু গাছে কাক, কোকিল আর কাঠ-ঠোকরার সমাগম হয়েছে। ফল ধরেছে গাছে গাছে।

গ্রীষ্মের উষ্মা। স্পন্দমাত্র বাতাস নেই। প্রাঙ্গণে শুধু অশ্বের পদাঘাত-শব্দ। কখনও বা হাতীর ঘণ্টামালার কণ্ঠহার ঢঙ ঢঙ শব্দ তোলে। কচিৎ কখনও হয়তো অঙ্গ সঞ্চালন করে হাতী।

জমিদার কৃষ্ণরামের অনতিদূরে দণ্ডায়মান এক শটকাধারী। তাম্রকূট সেবন করেন কৃষ্ণরাম, মৌতাত করেন। তাঁর দুই পার্শ্বে দু'জন শ্বেত চামরধার।

তারা সুবেশ, সুকান্ত। চামরের মৃদু-মন্দ বাতাসে জমিদারের আঙরাখার প্রান্ত কম্পমান হয়। কৃষ্ণরামের বেদীর পাদমূলে বিশ্রামরত দু'টি চিতা। চোখ বাঁধা চিতাবাঘ। শিকারী চিতা। ওদের কণ্ঠলগ্ন শৃঙ্খল কৃষ্ণরামের হাতে। আরেক হাতে শটকার নলমুখ। হীরামুক্তা-শোভিত সোনার সর্পমুখ।

শীতের রাত্রি ফুরায় না। গ্রীষ্মের দিনও যেন শেষ হয় না। পৃথিবী প্রদক্ষিণ শেষ হয় না সূর্য্যের! অদূরের প্রাচীরগাত্র লক্ষ্য করেন কৃষ্ণরাম! লক্ষ্য করেন রৌদ্ররেখা, কোথায় উঠলো! কোথায় অস্তগামী সূর্য্য!

—কুলাচার্য্য, যাত্রায় দেরী কি?

কোথা থেকে এলো কথার সুর! প্রাঙ্গণের স্তব্ধতা ভঙ্গ করলো।

কৃষ্ণরাম বঙ্কিম গ্রীবায় দেখলেন। বললেন,—রঙ্গলাল, তোমরা প্রস্তুত?

—হাঁ কুলীনপ্রধান! দলবলসমেত প্রস্তুত। যাত্রা করলেই হয়।

রঙ্গলাল কথা বলে প্রসন্ন কণ্ঠে। কটিদেশের বন্ধনী শিথিল করে, কথা বলতে বলতে। বলে,—সময় দেন তো দু'-এক পাত্র শেষ করে লই।

চক্ষু পাকালেন কৃষ্ণরাম। স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন,—এই দিনমানে? এই দারুণ গ্রীষ্মে? এখনই?

জমিদারের জলদ-গম্ভীর কণ্ঠ শুনে যেন চমকে চমকে ওঠে রঙ্গলাল। তবু ভয় জয় করে বললে,—পেয়ালা পানের দিন-ক্ষণ থাকে নাকি? কুলাচার্য্য, তোমার কুলবেদের কুলবিধি আমার পরে চাপাও কেন?

হেসে ফেললেন কৃষ্ণরাম। তাঁর সমগ্র দেহ হাসির বেগে কেঁপে কেঁপে ওঠে। হাসতে হাসতেই বললেন,—মত্ত না হও, নতুবা আমার আর কি! রঙ্গলাল, তুমি আমাদের সহগামী হবে, দেখিও আমার অসম্মান না হয়। সমাজের নিকট যেন মাথা নত না হয়।

তাচ্ছিল্যের হাসি হাসে রঙ্গলাল। বলে আমি কি তেমনই যে তোমার অসম্মানের নিমিত্ত হবো?

কৃষ্ণরাম বললেন,—তথাপি সাবধান হতে দোষ কি? যাও শীঘ্র আসিও। অধিক বিলম্ব না হয়।

পত্রবহুল শাখা-প্রশাখার মধ্য দিয়ে একটুকরো রৌদ্ররশ্মি পড়ে জমিদারের অঙ্গে। রঙ্গলাল স্থানত্যাগ করে না। বিমুগ্ধ চোখে জমিদারকে দেখে। কৃষ্ণরামের সুগঠিত সবল শরীর। ঈষৎ স্থূলকায়, কিন্তু কিঞ্চিৎ লম্বা ছাঁদের জন্ত তত স্থূল বোধ হয় না। কেশের কোন বিন্যাস নেই, মাথায় শিখা। বর্ণ শুভ্র। পরিধানে লাল চেলীর ধুতি-চাদর। কানে সোনার কুণ্ডল, কণ্ঠে স্বর্ণসূত্রে গাঁথা রুদ্রাক্ষের মালা। দক্ষিণ হস্তে সোণার ইষ্টকবচ, রূপার বলয়, রত্নাঙ্গুরীয়। বক্ষে উপবীত। বাম বাহুতে সোণার তাগা। কোমরে রূপার বিছা। পায়ে শিশুকাঠের খড়ম। কপালের মধ্যস্থলে চুয়া ও চন্দনের মঙ্গল তিলক।

জমিদার পুনরায় কথা বলেন।—বৃথা কালক্ষেপ কর কেন?

রঙ্গলাল মিটি-মিটি হাসে। বলে,—কুলাচার্য্য, বৃথা কালক্ষেপ নয়, তোমার নয়নাভিরাম মূর্ত্তি দেখে দেখে আশা আমার মিটে না। তাই দেখি।

কৃষ্ণরাম নীরব হলেন। দেখলেন, প্রাঙ্গণের শেষ সীমায় উচ্চ প্রাচীরগাত্র; দেখলেন, রৌদ্রকিরণ আরও কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে উঠেছে। শট্‌কার মুখনলে ঘন ঘন টান দেন আর দেখেন।

রঙ্গলাল আবার কথা বলে।—কুলাচার্য্য, দত্ত-কন্যা যে বড় বেশী কান্নাকাটি করে। এখন উপায়?

জমিদার নড়ে চড়ে বসেন। প্রচুর ধূম্র উদ্‌গিরণ করতে করতে বললেন,—কোন এক সৎপাত্রে দত্ত-কন্যাকে দান করা ব্যতীত উপায়ান্তর দেখি না। সপ্তগ্রামে জমিদার কৃষ্ণরাম জীবিত থাকতে মুসলমানের গৃহে হিন্দু রমণীর বিবাহ দেওয়া চলবে না। তা তুমি নিশ্চিত জানিও। পাত্রাভাবে দত্ত মশাই মুসলমানের সহ তাঁর কন্যার বিবাহ দিতে চান।

রঙ্গলাল বললে,—সৎপাত্র কোথায়? আমাদের হিন্দু পাত্রগণ অভাবের দুঃখে বর্ত্তমানে বিবাহের তেমন পক্ষপাতী নয়।

কৃষ্ণরাম কেমন যেন উগ্র চোখে তাকালেন। বললেন,—তবে মুসলমানের ঘরেই যাক যতেক হিন্দুকন্যা? জাত, কুল, মান কিছুই তবে তো রক্ষা হয় না!

রঙ্গলাল বললে,—অভাবের তাড়নায় মানুষ কি আর করে!

কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তাকুল থাকেন জমিদার। বলেন,—তবে দত্ত-কন্যাকে আমার গৃহেই রাখি, যত দিন না তাকে এক সৎপাত্রে দান করা যায়। গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত হোক সে।

রঙ্গলাল নিম্ন কণ্ঠে বলে,—লোকে মন্দ বলবে যে! কুলাচার্য্য, তোমার চরিত্রে দোষ পড়বে।

হাসলেন কৃষ্ণরাম। নিশ্চিন্ততার পরিতৃপ্তি হাসি, বললেন,—এমন হাস্যকর কথা আর বল না। লোকের বলাবলির আমি তোয়াক্কা করি না, তা তোমার অজানা নয়। যে যা বলে বলুক!

রঙ্গলাল হঠাৎ ঘুরে-ফিরে নাচতে থাকে। এক হাত মাথায় এক হাত কোমরে দিয়ে নর্ত্তকীর ঢঙে ঘুরে-ঘুরে নাচে আর গায়,—

লোকের কথায় কান পাতি না কানে দিছি তুলো,
লোকের মারের ভয় করি না, পিঠে বেঁধেছি কুলো,
আমি কানে দিছি তুলো।

তেমন সুরেল কণ্ঠ নয় রঙ্গলালের। তবুও যেন শুনতে ভাল লাগে। দেখতে কৌতুক হয় নর্ত্তকীর অনুকরণে রঙ্গলালের নাচ। জমিদার হেসে ফেললেন গান শুনে আর নাচ দেখতে দেখতে। নাচ শেষ হতে বললেন,—আর বিলম্ব নয়, আমি এখনই যাত্রা করব।

—অদ্যকার গন্তব্য কি? রঙ্গলাল প্রশ্ন করলো সহাস্যে।

জমিদারের ওষ্ঠে হাস্যরেখা ফুটেছে, তাই তার আনন্দ যেন আর ধরে না। কৃষ্ণরাম বললেন,—সপ্তগ্রামের চার ক্রোশ উত্তরে পরমানন্দ রায়ের বসতি। পরমানন্দ নৈকষ্য কুলীন, তদুপরি প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী। পরমানন্দর দুই কন্যা বর্ত্তমান।

রঙ্গলাল বলে,—দুই কন্যাই কি অনূঢ়া?

ওপরে-নীচে মাথা দোলালেন কৃষ্ণরাম! বললেন,—হ্যাঁ। গত পরশু পরমানন্দ স্বয়ং আসেন। তাঁর দুই কন্যাকে দেখার জন্য অনুরোধ জানান।

দেখাই যাক্ না সুরূপা না কুশ্রী। অদ্য বৈকাল থেকে শুভসময় আছে। উত্তরমুখে যাত্রা শুভ।

রঙ্গলাল বলে,—কুশ্রীর লক্ষণ কি কুলাচার্য্য ?

কৃষ্ণরাম ধূমপান করেন। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন,—লক্ষণ এক নয়, বহু।

জমিদারের কাছাকাছি এগিয়ে চোখবাঁধা শিকারী চিতা দুটির সান্নিধ্যে পৌঁছে ভয় পেয়ে পিছু হটে রঙ্গলাল। বলে,—সখা ?

কৃষ্ণরাম বুঝি বিরক্ত হন। ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত করেন। অবাধ্য একটুকরো রৌদ্র-রশ্মির আলোয় কৃষ্ণরামের ঘোর লাল চেলীর ধুতি-চাদর জৌলুস ছড়ায়।

সোনার গাত্রালঙ্কার চিকচিকিয়ে ওঠে। রত্নাঙ্গুরীয় দ্যুতি ঠিকরোয়! নব-রত্নের অঙ্গুরীয়। কৃষ্ণরাম বিরক্ত সুরে বললেন,—রঙ্গলাল, তবে আমি যাত্রা করি। তুমি নাচন কুঁদন দেখাও।

এক লম্ফ দিয়ে সুস্থির হয়ে দাঁড়ালো রঙ্গলাল। বললে,—অধীর হও কেন কুলাচার্য্য ? আমার গমনাগমনে কতই বা সময় যায়! যাবো আর আসবো। এই চললাম তো। আমি কি জানবো যে আমাদের সপ্তগ্রামের কুলশ্রেষ্ঠ নারীলক্ষণম্ অবগত নন ?

হাসলেন কৃষ্ণরাম! মৃদু হাসি। অপেক্ষমান বাহকের হাতে সমর্পণ করলেন হাতের শটকা, রূপালী জরি জড়ানো। চোখ-বাঁধা চিতাদের গললগ্ন শৃঙ্খল নিজ পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলে বেষ্টন করতে করতে বললেন,—যথাকালে বিবৃত করবো। যাও, শীঘ্র আসিও, নচেৎ তুমি বিনাই·········

রঙ্গলাল প্রায় দৌড়ানর কায়দায় পা চালালো। দ্রুত-গতি-চলন না দৌড় ঠিক বোঝা যায় না! জমিদার-গৃহের আঙিনায় কর্ম্মচারী, পাইক সিপাই, ও ভৃত্যেরা ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করে। প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে সারি সারি অশ্ব। হস্তিযূথ। কয়েকজন নিম্নপদস্থ ঐ পশুদের পরিচর্য্যায় রত। রঙ্গলালের চলনের ভঙ্গী দেখে কেউ কেউ হাসলো, শব্দহীন হাসি।

কৃষ্ণরামও হাসলেন। একটি চিতার মাথায় হাতের পরশ বুলাতে বুলাতে

তিনিও মৃদু মৃদু না হেসে থাকতে পারলেন না! জমিদার কৃষ্ণরাম আজ অন্যান্য দিনের তুলনায় বেশ হাসি খুশী। চোখে গর্বময় দৃষ্টি ফুটিয়ে আছেন সদাক্ষণ। তাঁর অঙ্গভঙ্গীতে স্কন্ধ ও বাহুর পেশী সমূহ কখনও কখনও স্ফীত হয়ে উঠছে। ডান হাতের নবরত্নাঙ্গুরীয় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছেন।

কুলচূড়ামণি কৃষ্ণরাম। কুলীনশ্রেষ্ঠঃ।

হাঘরের বওয়াটে বাউণ্ডুলে নয়, জমিদার। ভূস্বামী। বিত্ত প্রচুর, তাই চিত্ত বৈকল্য নেই। মুখে নেই চিন্তার মলিন কালিমা। হাওড়া, হুগলী, বীর-ভূমের যত নৈকষ্য, শ্রোত্রিয় আর বংশজদের বংশে কৃষ্ণরামের নাম সুপরিচিত! জমিদার কৃষ্ণরাম, শোনা যায়, সেই সাবর্ণ-গোত্রধারী বেদগর্ভের উত্তর-পুরুষ। কৃষ্ণরাম দীঘড়ী গাঞি। হুগলী জেলার জাহানাবাদ থেকে আড়াই ক্রোশ দক্ষিণে দারুকেশ্বর নদীতীরের দীর্ঘ বা দীঘড়া গ্রামে কৃষ্ণরামের আদিপুরুষের বাস।

হরিমিশ্রকৃত কুলপঞ্জিকায় আছে, এই দীঘড়ী বা দীর্ঘাঙ্গ বা দীর্ঘ গাঞির নাম। বন্দ্যঘটি, কুসুমকলি, কেশরকোনী, মুখৈটি, চট্ট, সিমলাই, ভূরসুট, পিপ-লাই, ঘোষাল আর পাকড়াশীর সঙ্গে আছে দীর্ঘ নামের উল্লেখ। হরিমিশ্রের কুলপঞ্জিকার এক নকল আছে কৃষ্ণরামের কাছে। তালপত্রের একটি পুঁথি। হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে বের করেছেন কৃষ্ণরাম, কুলজ্ঞদের সাহায্যে পেয়েছেন দীঘড়ি গাঞির নাম।

বল্লালসেন বহুকাল গতায়ু হয়েছেন। গৌড়াধিপ বল্লাল অতুলনীয়। তিনিই তো প্রথম, আদি কুলাচার্য্য। কুলশাস্ত্রের সূত্রপাত তিনি। তারপর দেবীবর। তারপর ধ্রুবানন্দ মিশ্র, বাচস্পতি মিশ্র, মহেশ আর দনুজারি মিশ্র, তারপর হরি-কবীন্দ্র, হরিহর ভট্ট। তারপর?

নৈকষ্য, শ্রোত্রিয়, বংশজদের সমাজে তারপর কৃষ্ণরামের নাম। কুলাচার্য্য কৃষ্ণরামের কুলবিচার জ্ঞান না কি অসামান্য! জটিল ও দুর্ব্বোধ্য কুলশাস্ত্রসমূহ নাকি তাঁর নখদর্পনে!

সমাজে নানা ভাব। নানা থাক। নানান শ্রেণী।

কুলীন-সমাজ এখনও মেলী কুলীন-সমাজে পরিণত। কত দোষে ভারাক্রান্ত।

প্রকৃত কুল আছে কি নেই বোঝা যায় না। সেই সমাজের চূড়ায় বসে আছেন কৃষ্ণরাম, সেই ছত্রভঙ্গ সমাজের চূড়ামণি তিনি। গর্ব্বের হাসি ফুটবে না কৃষ্ণ-রামের অধরে! তাঁর পেশী স্ফীত হবে না!

দোষ করলে প্রতিকার আছে। দোষ ধরবেন কৃষ্ণরাম, প্রায়শ্চিত্তের বিধান দান করবেন। তথাপি কুল নষ্ট হতে দেবেন না। বিবিধ দোষে দোষীদের কানে কানে কৃষ্ণরাম বলেন,—

আর গুণ যার গুণ তার সঙ্গে যায়।
কুলগুণ মহাগুণ পুরুষক্রমে পায়॥

যারা দোষ করে তারা শাস্তি চায় না, পতিত হতে চায় না, হতে চায় না সমাজচ্যুত। প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়। কৃষ্ণরাম তাদের কানে বলেন,—

দোষ পায় যদি তার প্রায়শ্চিত্ত ধরে।
কুলবেদে প্রায়শ্চিত্ত যদি কুল ধরে॥
অসৎ করয়ে সৎ কুলের এই কর্ম্ম।
লোহারে করয়ে সোনা পরশের ধর্ম্ম॥

কুলীন-সমাজের পরশমণি কৃষ্ণরাম!

—আমিও তৈয়ার কুলাচার্য্য! আপনি গাত্রোত্থান করেন।

রঙ্গলালের বিকৃত কণ্ঠস্বর। পেয়ালা-পানের সঙ্গে সঙ্গে, কথার ধরণের সঙ্গে সুরেরও বিকার হয় রঙ্গলালের। যেন মন্ত্রবলে ফিরে পায় হারানো উদ্যম। মুখে খুশীর হাসির ঝিলিক তুলে বলে—এক শুভকাজে যাওয়া, দেখি ভাল হয় না মন্দ হয়। কন্যা দু'টি মহাশয়ের মনে যদি ধরে, তবে কি বিবাহে ইচ্ছা করেন?

—বাহক-ধারীদের বিদায় দেও রঙ্গলাল!

কথা বলতে বলতে নিজ পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে জড়ানো শৃঙ্খল—চোখ-বাঁধা চিতার গললগ্ন শেকল খুলতে থাকেন। কথা শেষ হতেই সেই শেকল হস্তান্তরিত করলেন এক বাহককে। বেদী ত্যাগ করে উঠলেন ধীরে ধীরে।

বাহক আর ধারীদের বলতে হয় না। এ আজ্ঞা তাদের অতি পরিচিত বলা মাত্র তারা চঞ্চল হয়।

চোখ বাঁধা চিতাদের গলায় টান পড়লো। তারাও উঠলো। বাহকদের পিছু পিছু চললো। লোহার খাঁচায় ঢুকতে চললো।

সপ্তগ্রামের আশে-পাশে বন-জঙ্গল। বাদা আর জঙ্গল। ব্যাঘ্র বরাহ নেকড়ে শৃগাল হায়েনার বসতি সেই গভীর অরণ্যে। গণ্ডার, বন্যমহিষেরও সাক্ষাৎ মেলে বনের গহ্বরে। এই হিংস্র-করাল অরণ্যচারীদের ভয়ে ভয়ার্ত্ত শূকরের পাল জঙ্গলের সীমানা থেকে ছিটকে আসে মানুষের চোখে, তখন ঐ চোখ-বাঁধা চিতার চোখের আবরণ উন্মোচন করে দেন—কৃষ্ণরাম, যেদিন তিনি শিকারে যান সদলবলে।

কৃষ্ণরাম বললেন,—বিবাহে বাধা কি? কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ যদি দায় উদ্ধার হয়?

রঙ্গলাল শুধোয়,—ব্রাহ্মণ কোন্ গাঞি?

—সিধলা গাঞি। হুগলীর সিঙ্গুর গ্রামে ব্রাহ্মণের আদি নিবাস। কৃষ্ণরাম কথা বলেন পরিতৃপ্তির সুরে। বলেন,—বিবাহে তোমার আপত্তি কেন রঙ্গ-লাল?

—বিবাহ করবেন কুলাচার্য্য আপনি। রঙ্গলাল কথা বলে হেসে হেসে। কৌতুক মিশ্রিত হাসি হেসে বলে,—আপত্তি হবে এই অধমের? কদাচ নয়। কথা বলতে বলতে বারেক থেমে আবার বলে,—ব্রাহ্মণের সাতশতীর সংস্রব ঘটে নাই কি না জানেন? আপনাদিগের রাঢ়ীয়শ্রেণী ব্রাহ্মণে বহু দোষ স্পর্শেছে, ভাগ্য ভাল যে দেবীবর মেলবন্ধনের প্রচার করেন!

—দোষ দেখতে নাই রঙ্গলাল! বললেন কৃষ্ণরাম। সাজানো হাতী যেদিকে সেদিক ধরে এগোলেন। বললেন,—প্রায়শ্চিত্তে দোষ কাটে।

—ব্রাহ্মণ মুখ্যকুলীন না গৌণকুলীন? প্রশ্ন করলে রঙ্গলাল। বললে,—না কি শূদ্রদানগ্রহণকারী বংশজ কুলীন? আপনি তো মুখ্যকুলীন-বংশোদ্ভব!

—গৌণকুলীন। সহাস্যে বললেন কৃষ্ণরাম।

—তবে উপায় ?

নকল চিন্তা ফোটে রঙ্গলালের মুখাকৃতিতে। নকল গাম্ভীর্য্যের সুরে কথা বলে।

হাসলেন কৃষ্ণরাম। পরাজয়ের শুষ্কহাস্য নয়, বিজেতার গর্ব্বভরা হাসি। বললেন,—মহারাজ দনৌজমাধবের নাম জানো রঙ্গলাল ?

—খুব জানি মহাশয়! সহগামী রঙ্গলাল বলে। বলে,—বল্লালসেন আর আপনাদিগের লক্ষ্মণসেনের মত ব্যবস্থা দনৌজমাধবই পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন।

কৃষ্ণরাম হাতীর কাছাকাছি পৌঁছে বললেন,—মহারাজ দনৌজমাধব যেমন তিন পুরুষের মধ্যে যে কোন পুরুষে হোক পরিবর্ত্ত দ্বারা কুলরক্ষার ব্যবস্থা করেন, সেই সঙ্গে এরূপও নিয়ম করেন যে, পরস্পর মুখ্যকুলীনের মধ্যে বিনিময়ের সুবিধা না হয় তো গৌণকুলীনের সহিতও পরিবর্ত্ত চলতে পারে।

—বংশজ না হয়, আমার সেই ভয়!

রঙ্গলালের চিন্তাকুল কণ্ঠ। পেয়ালা-পানের পর কিছু বা গম্ভীর।

হাতী আর দাঁড়িয়ে নাই। মাহুতের নির্দ্দেশে ভূমিতে আসীন। হাওদার রূপার হাতলে হাত দেন কৃষ্ণরাম। বলেন,—না, বংশজ নয়। তুমি নিশ্চিন্ত হও রঙ্গলাল! আমি অর্থ চাই, অর্থদানে সে ব্রাহ্মণের কার্পণ্য নাই।

কথার শেষে হাওদায় উঠতে সচেষ্ট হন।

—মহাশয়ের সহগমনে কে বা কারা যাবে বলেন নাই তো ? রঙ্গলাল কথা বলতে বলতে নিজের নির্দ্দিষ্ট অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করলো।

ক্ষণেক চিন্তার পর ইতি-উতি তাকিয়ে দেখতে দেখতে জমিদার কৃষ্ণরাম বলেন,—লোকবল চাই। পথও সামান্য নয়, চার ক্রোশটাক। পারিষদ পদাতিক সঙ্গে লওয়া চাই।

—যথা আজ্ঞা। বললে রঙ্গলাল। নির্দ্দিষ্ট এক অশ্বের পৃষ্ঠে চাপড় দিতে দিতে বললে,—মহাশয় আপনি এক খ্যাতিমান ব্যক্তি, আপনকার তাঁবে কত রেসালা, পেয়াদা, সিপাহী! যেমত হুকুম হয় তেমত ব্যবস্থা পাকা হোক্। আপনি যাত্রা করেন, সমারোহের কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হবে না।

সসজ্জ হাতীর ঘণ্টামালার ঢঙ্ ঢঙ্ শব্দ। হাতীর গলচালনে দুরন্তো নিনাদ শোনা যায়। রক্তবর্ণ বন্ধন রজ্জুতে আবদ্ধ আমাড়ি-হাওদায় বসেছেন কৃষ্ণরাম। সগর্ব্বে দেখছেন ইতি-উতি। মাহুতের অঙ্কুশ আঘাতে হাতী সচল হয়। ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়।

সর্ব্বাগ্রে দুই অশ্বারোহী যায়। সশস্ত্র ও নিশানধারী। মধ্যাহ্ন সূর্য্যচিহ্ন অঙ্কিত রেশমের গৈরিক পতাকা তাঁদের হাতে। কৃষ্ণরামের কীর্ত্তিপতাকা উড়ছে যেন! অতঃপর স্বয়ং কুলাচার্য্য যাত্রা করেন! জমিদার-গৃহের তোরণ-ফটকে পৌঁছে কৃষ্ণরাম পিছু ফিরে একবার দেখলেন। সারি সারি সশস্ত্র অশ্বারোহী অনুসরণ করে। কারও হাতে পানপত্রাকৃতি বিচিত্র অভয়। সকলেরই বামকোটি থেকে সকোষ তীক্ষ্ণ তরবারি ঝুলছে। অশ্বসারির পেছনে খাসা খাসা খাসগোলাপওয়ালা খাসবরদার, আসাবরদার, চোপদার, জমাদার, পদাতিক, সিপাহী।

জমিদার কৃষ্ণরামের জয়!

সম্মিলিত জয়ধ্বনির সঙ্গে জগঝম্প আর তাসাকড়কা বেজে উঠলো। গাছে গাছে পাখীর কলরোল শুরু হয়। হঠাৎ মনুষ্যকণ্ঠের চিৎকার ও যুগপৎ বাদ্য-ধ্বনি শুনে হয়তো ভীত হয় পক্ষিকুল। সর্ব্বশেষে তার নির্দ্দিষ্ট অশ্বপৃষ্ঠে চললো রঙ্গলাল। পেয়ালা পানের প্রথম নেশাটুকু মাত্র ধরেছে এতক্ষণে,—রঙ্গলালের মুখে চপল হাসি ফুটেছে তাই। গুন্ গুন্ শব্দে গান ধরেছে রঙ্গলাল। কি এক রসের গানের কলি ধরেছে, অস্পষ্ট সুরে।

—জমিদার কৃষ্ণরামের জয়!

জয়ধ্বনি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোরণ-ফটক অতিক্রম করে শোভাযাত্রা। সপ্তগ্রামের মলিন-বন্ধুর পথ অশ্বের পদাঘাতে ধূলি উড়ায়। অস্তগামী সূর্য্যের রক্তিম আলোয় চাকচিক্য তোলে গৈরিক নিশান। জমিদারের রূপার আমাড়ি-হাওদা আলো ঠিকরোয় মুহুর্মুহুঃ।

পথের পথিক সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে পথিপার্শ্বে দাঁড়ায়। আনত মস্তকে অভিবাদন জানায় কুলাচার্য্যকে।

জমিদার কৃষ্ণরাম কত গণ্যমান্য, তবুও কথায় কথায় যখন তখন তাঁকে গালিবর্ষণ করেন রাজমাতা। সময় আর অসময়ের বাছ-বিচার করেন না। স্থান, কাল আর পাত্র বাছেন না। যেমন খুশী যা মুখে আসে বলেন। কৃষ্ণরামের মৃত্যু কামনা করেন। কন্যা বিন্ধ্যবাসিনীর বৈধব্য প্রার্থনা করেন।

বাতায়নহীন স্নিগ্ধ-শীতল কুঠরী রাজমাতার। একটি মাত্র দ্বার কুঠরীতে।

মুক্ত দ্বারপথে দেখলেন বিলাসবাসিনী, শুভ্র ও নীল মেঘাবৃত আকাশ দেখলেন। দেখে অনুমান করতে পারলেন না, বেলা শেষ হতে কত দেরী আর। সূর্য্যাস্তের বিলম্ব কত! শয্যা ত্যাগ করে উঠতে চেষ্টা করলেন, পারলেন না। পুরানো বাতের ব্যথা দুই পায়ে। পায়ের গ্রন্থিসমূহ টনটনিয়ে উঠলো যেন।

ইষ্টমূর্ত্তি স্বপ্নে দেখেছেন রাজমাতা। মূর্তির হাতে অভয়মুদ্রা দেখেছেন গভীর ঘুমের ঘোরে। মনের জ্বালা বুকের ক্ষোভ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হয়েছে। ইষ্টদর্শনে এখন তাঁর হৃষ্টচিত্ত। শান্তকণ্ঠে বিলাসবাসিনী বললেন,—দ্যাখ্ ব্রজ, আমার কাশীকে আজ অযথা অনেক অকথা-কুকথা বলেছি। ছোটকুমারের জন্যি মনটা কেমন আঁকুপাঁকু করছে। একেই সে কিছু চাপা প্রকৃতির, না জানি কত কষ্টই না পেয়েছে!

ব্রজবালা ক্ষীণ হাসি হাসলো। বললে,—রাগ্‌লে যে তোমার জ্ঞানগম্যি কিছুই থাকে না।

—যা বলেছিস ব্রজ! বললেন রাজমাতা। বহু কষ্টে শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন। ব্যথার কষ্টে কি না কে জানে মুখ বিকৃত করলেন। বললেন, —পায়ের রক্ত যে আমার মাথায় উঠে যায়! ঐ তো রোগ আমার! সর্ব্বাঙ্গে বাত আর মাথায় রক্তের চাপ—তাতেই তো মলাম আমি!

সহজে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারলেন না বিলাসবাসিনী। ব্রজবালার কাঁধে হাত রাখলেন। নিজের দেহের বিপুল ভার সামলাতে পারেন না, যেন অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বললেন,—আগে একটু সামলাই, তারপর ঘাটে যাবো। কথা থামিয়ে আবার কথা বললেন,—আমার কাশীকে কাছে

পেলে কিছু সান্ত্বনা দিই, বাছাকে আমার অনেক কটু কথা বলেছি রাগের মাথায়!

ব্রজবালা বললে,—এত কোপ তোমার রাজমাতা! কোনদিন মাথাটি না বিগড়ে যায়! কুমার বাহাদুর আপনাকে কত শ্রদ্ধাভক্তি করেন তা কি জানেন না?

বিলাসবাসিনী বললেন,—যা বলেছিস ব্রজ! কাশীকে একবার না দেখলে মনটা কিছুতেই স্থির হবে না।

কথার শেষে পা চালালেন তিনি। অত্যন্ত ধীরে ধীরে, অত্যন্ত সন্তর্পনে।

পশ্চিমাকাশে সিঁদুর ছড়ালো যেন! রৌদ্রের রঙে লালিমা ফুটলো যেন রাজার পশুশালায় বাঘ ডাকলো কয়েকবার। প্রতিদিন ঠিক এই বেলাশেষে ক্ষণে বাঘের ডাক শোনা যায়। ক্ষুধার্ত্ত হয় হয়তো দিনশেষে। কাঁচা মাংসের লোভানি জাগে লোলুপ রসনায়। লালা ঝরে মুখ থেকে।

আকাশের পশ্চিম-প্রান্তে হেলে পড়ে বৈশাখের প্রখর সূর্য্য! পূর্ব্বপ্রান্তে আঁধারের কৃষ্ণরেখা উঁকি মারে। দিগ্বলয়ে যেন কলঙ্ক পড়ে।

এত কথা, এত কটু কথা শুনিয়েছেন রাজমাতা, কাশীশঙ্করের কোন বিকার নেই তবু।

কুমারের ওষ্ঠপ্রান্তের হাসি যেন মিলায় না। যেন তিনি রাগ, দ্বেষ আর অভিমান বিসর্জন দিয়েছেন। অন্দর মহলের এক কক্ষে, মহাশ্বেতার খাস-কামরায় তখন ভূতলশায়ী কাশীশঙ্কর! অগ্নিবাহী উষ্ণ প্রবাহ বইছে বাইরে। মাঠ-ঘাট তেতে উঠেছে! অন্দরের দালান-প্রাচীর পর্য্যন্ত তপ্ত হয়ে ওঠে। দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যায় শয়ন করতে ইচ্ছা হয় না, যে জন্য ভূতলেই বিশ্রাম করেন কুমার বাহাদুর। ময়ূর-পালকের এক হাত-পাখা সঞ্চালনে ব্যজন করেন মহাশ্বেতা! তেজারতি কারবারের চিন্তায় সদাই আকুল কাশীশঙ্কর! সেরেস্তা-ঘরে খাতা-লেখার কাজ চুকিয়ে অন্দরে ফিরেছেন, বেলা যখন শেষাশেষি! এক পাত্র গোলাপ-শরবৎ পান করে ভূতলেই আশ্রয় নিয়েছেন।

মহাশ্বেতার ক্রোড়ে মাথা রেখেছেন। ময়ূর-পালকের হাত-পাখার বাতাস দিতে দিতে কি এক কথার উত্তরে মহাশ্বেতা মিষ্ট-নম্র কণ্ঠে বললেন,—কুমার-বাহাদুর, ধান-চালের কাজে ব্রাহ্মণের অধিকার আছে তো ?

কক্ষে তৃতীয় লোক কেউ নেই। কুমার-পত্নীর মিষ্ট কণ্ঠ যেন তানপুরার ধ্বনি তুললো। হাত-পাখার মিষ্ট বাতাসে সুগন্ধের তরঙ্গ খেলতে থাকে ঘরে। কোথা থেকে সুবাস ভাসে কে জানে! পিতলের ফুলদানিতে গন্ধরাজের স্তবক। গন্ধবারি-সিঞ্চিত ময়ূর-পালকের হাত পাখা। ময়ূরপুচ্ছে দিলরুবার নির্য্যাস ছিটিয়েছেন মহাশ্বেতা! বকুল ফুলের কেশতৈল মেখেছেন মেঘবরণ রাশি রাশি কেশে। অধরও তাম্বুলরাগরক্ত। তাম্বুলীতে মুস্কী হেনার ছিটা দেওয়া!

—হয়তো নাই। কাশীশঙ্কর বললেন, ঊর্দ্ধদৃষ্টে চেয়ে। সহধর্ম্মিণীর রাঙা অধরপানে তাকিয়ে!

টকটকে লাল সীমন্ত মহাশ্বেতার। সিঁদুরের উজ্জল লাল রেখা সীঁথিতে সেদিকে চোখ পড়ে না কুমারের। এত ঘোর লাল, তবুও দৃষ্টি পড়ে না। নজরে পড়ে শুধু ঐ মুখবিম্বের টুকটুকে লাল অধরোষ্ঠ!

মহাশ্বেতা বললেন,—অধিকার যদি না থাকে, তবে কি হবে ?

—রাতরাণী আগে কও, ব্রাহ্মণ কি ব্রাহ্মণ আছে আর ? আমিও সে বড়াই করি না। কাশীশঙ্কর দীপ্তকণ্ঠে কথা বলেন। কক্ষ কাঁপিয়ে যেন কথা বললেন।

—এ কেমন কথা ? কি এমন অন্যায় করলেন ?

কথা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মহাশ্বেতার সূক্ষ্ম দুই ভ্রূ সঙ্কুচিত হয়ে উঠলো। ঠোঁটেও যেন কুঞ্চন ফুটলো।

কাশীশঙ্কর বললেন,—উপবীতই ব্রাহ্মণের লক্ষণ নয়! ব্রাহ্মণ শব্দের বিশেষণ যে তোমার অজানা। ব্রাহ্মণ ছিল সেই বৈদিক যুগে। এ যুগে ব্রাহ্মণ কৈ ?

—তবু, কাজে লাভ-লোকসান আছে। বললেন মহাশ্বেতা! মিহি মিষ্ট কণ্ঠে বললেন,—কথায় বলে, যার কর্ম্ম তারই সাজে। ধান-চালের কারবারে যদি কোন অমঙ্গলই হয়?

মহাশ্বেতার একখানি নধর-নরম হাত নিজের হাতের মুঠোয় ধরলেন কুমার-বাহাদুর। বললেন,—মঙ্গলামঙ্গলের ভয় আমি করি না রাতরাণী! বঙ্গলক্ষ্মী ধান্যশালিনী, বাঙলায় ধান-চালের ব্যবসায় তাই মোটা আয়! সমগ্র পৃথিবীর প্রায় অর্দ্ধাংশ লোকের প্রধান খাদ্য এই ধান!

কেমন যেন নীরব নিথর হন মহাশ্বেতা। নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ। কুমার-বাহাদুরের কথাগুলি শুনে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হন।

কাশীশঙ্কর মহাশ্বেতার হিমশীতল হাতখানি নিজের কপালে রাখলেন। বললেন,—ধানের কিছুই ফেলা যায় না। শস্য থেকে গাছের কিছুই বিনষ্ট হয় না।

—কেন?

কেমন যেন বিমুগ্ধের মত বললেন কুমারপত্নী। একটি মাত্র কথায় একটি মাত্র প্রশ্ন করলেন। অভিধানে এই কেন শব্দটি না থাকলে না জানি পৃথিবীতে আরও কত কথাই সৃষ্টি হ'ত!

কাশীশঙ্কর বললেন,—একে একে গণনা কর রাতরাণী! প্রথমতঃ শস্য থেকে ধান হয়, চাল হয়। আবার তা থেকে মুড়ি হয়, চিড়া, খুদ হয়, কুঁড়ো হয়, আবার তুষ, মাড়, সবেদা হয়, মদ্য তৈয়ারী হয়, ধানের গাছ থেকেই খড়-বিচালী হয়।

এক নিশ্বাসে যেন কথাগুলি বলে গেলেন কুমারবাহাদুর। বলতে বলতে মুখে যেন তাঁর আত্মগর্ব্বের আভাস ফুটলো। বললেন,—ধান-চালের কাজ খুব লাভজনক।

মহাশ্বেতা বললেন,—ব্যবসা কেমন ধারায় চলবে?

কুমারপত্নীর সুডৌল হাতখানি ধীরে ধীরে সচল চঞ্চল হয়ে ওঠে। কুমারের কপালে হাতের পরশ বুলাতে থাকেন।

—ধান-চালের আড়ৎ ক'টায় কোন প্রকারে সিঁদানোই কাজ। কথা বলতে বলতে চোখের দৃষ্টি বিস্ফারিত হয় কাশীশঙ্করের! এ যেন এক কষ্টকঠোর ব্রত, যার উদ্‌যাপনে অনেক মেহনতের প্রয়োজন। বললেন,—সুতানুটীর আশ-পাশেই সাত-সাতটা আড়ৎ আছে।

মহাশ্বেতার কথায় কৌতূহলের সুর। বললেন,—কোথায়?

কাশীশঙ্কর বলেন,—হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর চড়াহাট, চিৎপুরের হাট, উল্টাডিঙ্গি, বেলেঘাটা, চেতলার হাট, মুন্সীগঞ্জ, জানবাজারের হাট। এই সব আড়ংএ খরিদ-বিক্রয় হয়। তামাম বাঙলা দেশের ধান-চালের কেনাবেচা চলে হাটগুলোয়।

কুমারের কথা শুনতে শুনতে, ধান আর চালের বৃত্তান্ত শুনতে শুনতে মহাশ্বেতা অবাক মানেন যেন! কাশীশঙ্করের সুদীর্ঘ চোখে যেন চোখ রাখতে পারেন না অধিকক্ষণ। কি ব্যাকুল দৃষ্টি কুমারবাহাদুরের চোখে! কোন্ এক লজ্জায় রাতরাণী আপন নাসিকাপ্রান্তে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। অঙ্কশায়ীর ললাটে শীতল করস্পর্শ দেন।

—মা গো তুমি কৈ?

দুয়োর থেকে কে যেন কথা বলে। আধো-আধো কণ্ঠস্বরে।

অচিরাৎ উঠে পড়লেন কাশীশঙ্কর! উঠে বসলেন।

মহাশ্বেতা বলেন—আয় বনলতা।

আকাশের পরীর মত কোথা থেকে উড়ে আসে যেন কিশোরী। শুধু পাখনাই নেই! লালপাড় সুতিবস্ত্র বনলতার দেহে, সাপের মত পাক খেয়ে জড়িয়ে আছে যেন। লাল রেশমী পাড়।

দুই বাহু প্রসারিত করলেন কাশীশঙ্কর। কন্যাকে বক্ষে জড়ালেন।

বনলতা বললে,—ঘুম ছাড়তে উঠে দেখি, মা তুমি নেই। আমি কত কেঁদেছি তোমাকে না দেখে!

বনলতার কাজল-কালো চোখের পাতায় জল। কান্নার করুণ সুর যেন তার কথায়।

বনলতার একটি পোষা বিড়াল আছে। বনলতা যা খায় তাই তাকে খাওয়ায়। বনলতা যখন যেখানে যায়, সে-ও সেখানে যায়। বিড়ালটি দ্বারের বাইরে থেকে মিউ-মিউ শব্দে ডাকে!

বনলতা বললে,—যাও পুষি, দাসীর কাছে যাও। দাসী তোমাকে দুধ দেবে।

বিড়াল শোনে না। হয়তো বনলতার ভাষা বোঝে না। আবার ডাক দেয়, মিউ-মিউ। যেন বনলতার কথায় সাড়া দেয়।

কাশীশঙ্কর হাসলেন, প্রায় অট্টহাসি। বক্ষে ধারণ করলেন বনলতাকে। যেন এক পুতুল ধরলেন। মহাশ্বেতাও হাসলেন, মৃদু-মন্দ হাসি। বৈকালী আলো-ছায়ায় আর তাঁর হাস্যচাঞ্চল্যে দেহের অলঙ্কাররাজি ঝলমলিয়ে উঠলো। এতক্ষণ কুমারের কথা শুনতে শুনতে যেন ঠিক পাষাণের মত অনড় অচল হয়েছিলেন।

মেঘ ডাকলো না বাঘ ডাকলো!

পশুশালায় পশু ডাকছে, না আকাশে মেঘ ডাকছে! সিংহ, বাঘ, হাতী—ডাকাডাকি করছে যখন তখন। আস্তাবলে চিঁহি-চিঁহি ঘোড়া ডাকছে! খাঁচার পাখী কিচির-মিচির শুরু করেছে। খাসির গলায় কোপ পড়ছে, তাই চীৎকার করছে মৃত্যুপথের যাত্রী। শেষবারের মত যেন ডাকছে বিধাতাকে। এই আকুল আহ্বান, অন্তরের ডাকে কর্ণপাতও করবেন না তিনি। ধারালো খড়্গের আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে দেহ থেকে ছিন্ন মুণ্ড। উষ্ণ রক্তের স্রোত বইবে রাজপ্রাসাদের ঘাস-জমিতে। একটা খাসি কাটা পড়ে, অন্য ক'টা দেখে ফ্যালফেলিয়ে, বোবা চোখে। পরিত্রাহি ডাকতে ডাকতে শেষ হয়ে যায় একে একে। রক্তের যেন লাল বন্যাধারা—লালে লাল হয়ে যায় সবুজ-ঘাস, কালো-মাটি। তীক্ষ্ণধার ছুরির ফলায় ছালচামড়া ছেঁড়াছেঁড়ি করতে যতটুকু সময় লাগে! তবুও বারে বারে গর্জ্জে ওঠে বাঘের খাঁচায় বাঘ! মাংসলোলুপ সিক্ত রসনা থেকে লালা ঝরতে থাকে। কচি কলাগাছেও কাটারীর কোপ পড়ছে। স্তূপীকৃত করা হয়েছে কাঁটাল পাতা—হস্তীশালের হাতীদের শুঁড়ের কাছে এগিয়ে দিলেই হয়। এক-আধ খণ্ড খাসির কলৃজে কিংবা রাং—সিংহ আর সিংহীর সামনে যদি কেউ ফেলে দেয়! হরিণের পাল মুখ তুলে খাড়া দাঁড়িয়ে পড়েছে। ক্ষুধার্ত্ত, তাই হয়তো আর ছোটাছুটি করছে না—কাতর চোখে তাকিয়ে আছে—এক মুঠো ধান-চাল যদি মিলে যায়!

মেঘ ডাকলো না বাঘ ডাকলো, নিদ্রা ভঙ্গ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক ঠাওর

করতে পারেন না রাজাবাহাদুর কালীশঙ্কর! গুরু-গুরু গর্জ্জনে নিদ্রা ভেঙে যায়। অসম্পূর্ণ ও ভগ্ন-নিদ্রার আবেশে কিছুকাল যেন তিনি স্তব্ধ হয়ে থাকেন। দুধের মত শুভ্র শয্যা মনে হয় যেন অগ্নিবিকীর্ণবৎ। রাজাবাহাদুরের হৃদয়মধ্যেও আগুন জলছে! যত দিন মেধা আছে, যত দিন অস্থি-মজ্জা-শোণিতের শরীর আছে—ততদিন আছে এই অন্তর্জ্বালা—যদি না বিন্ধ্যবাসিনীর জীবন রক্ষা হয়! কালীশঙ্করের মনের স্থিরতা দূর হয়েছে, বুদ্ধিরও যেন অপভ্রংশ হ'তে ব'সেছে, স্মৃতির শৃঙ্খলা থাকে না আর! ধীরে ধীরে শয্যায় উঠে বসেন রাজাবাহাদুর। দুই হাতে মস্তক ধারণ ক'রে ব'সে থাকেন। মস্তিষ্ক কি ঘুরছে!

মেঘ ডাকলো না বাঘ ডাকলো! সিংহ ডাকলো।

এক ভাবে ঠায় বসে থাকায় কালীশঙ্করের অঙ্গবেদনা দেখা দেয়। মানসিক যন্ত্রণার প্রগাঢ়তায় দেহে যেন জ্বরের মত সন্তাপ জন্মেছে। শয্যা ত্যাগ করলেন রাজাবাহাদুর। কক্ষের এক বাতায়ন সন্নিধানে গিয়ে দাঁড়ালেন, টলতে টলতে। নিদ্রাবসন্নতায় এখনও যেন টলো টলো! এক করাঘাতে মুক্ত করলেন বাতায়ন—সঙ্গে সঙ্গে রাজার চোখে-মুখে ছড়িয়ে পড়লো বৈকালী-সূর্য্যের হলুদ-রঙ। নিষ্প্রভ দিনের আলো।

আকাশে কি মেঘ ডাকছে! না, বাঘ ডাকছে? সিংহ ডাকছে?

নিদ্রাপ্লুত চোখ তুললেন কালীশঙ্কর। আকাশ দেখলেন। কালো মেঘের চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই। নীল-আকাশে শ্বেততরঙ্গ মেঘের। পশ্চিম দিগন্তে ডুবন্ত সূর্য্যের হলুদ-রঙ-আলো আসে বাতায়নপথে। বৈশাখের বৈকালী বাতাস আসে, ঝড়ের আভাস নিয়ে!

গুমোট গেছে দিনভোর! অসহ্য গরম। গ্রীষ্মের প্রথম, তবুও। গাছের পাতার নড়ন-চড়ন ছিল না যেন! এই গুমোট দিনটির মতই রাজার মনোমধ্যে নৈরাশ্য যেন স্থিরতর হয়। নিরাশার মৃদুতর যন্ত্রনা ছাই-চাপা আগুনের মত ধিকি-ধিকি জলতে থাকে। বাতায়নে হস্তরক্ষা পূর্ব্বক তদুপরি কালীশঙ্কর মাথা ন্যস্ত করেন। রাজার মুখে যেন ভ্রূকুটি, ক্লেশব্যঞ্জক ভঙ্গী, প্রশস্ত ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম!

বিন্ধ্যবাসিনী বন্দিনী, নির্ব্বাসিতা। রাজমাতা সেই দুঃখদহনে প্রায় অর্দ্ধমৃতা হয়ে আছেন। সহোদর কাশীশঙ্কর সওদাগরী আর মহাজনীবৃত্তি অবলম্বনে উদ্যোগী, বদ্ধপরিকর। রাজ-গৃহে আছে কত কে! অন্দরে আছেন তিন রাণী। বেতনভোগী আর ভূমিদানের প্রজা আছে অসংখ্য। তথাপি যেন বড় বেশী একা মনে হয় নিজেকে! কখনও কখনও মনে হয়, সহায়সম্বলহীন। নাতিউষ্ণ বায়ু সংলগ্নে দৈহিক সন্তাপ দূর হয় কিঞ্চিৎ।

—রাজাবাহাদুর!

চমকের সঙ্গে যেন নিদ্রা ভঙ্গ হয়। নিদ্রা না তন্দ্রা! অতি ব্যস্তে কালীশঙ্কর মাথা তুললেন। দেখলেন দৃষ্টি ফিরিয়ে।

—রাজাবাহাদুর!

কালীশঙ্কর গলা খাঁকরে কথা বলেন। বললেন,—

—শরীরগতিক ভাল লাগে না উমারাণী। মানসিক ব্যাধির বড়ই জ্বালা!

প্রধানা-মহিষীর ভ্রূযুগল বক্র হয়ে উঠলো। বললেন,—দিবানিদ্রার শেষে শরীর এমন হয়। আপনি চোখে জল দিন। দুশ্চিন্তা ত্যাগ করুন দেখি।

—কাশীশঙ্কর রক্তপাতের পক্ষে, তাইতো এত ভাবনা! আমি কোন মতেই রক্তপাত চাহি না!

কালীশঙ্কর কথা বললেন নম্রকণ্ঠে। বিকৃত মুখভঙ্গীতে।

—আপোষে মিটে না? মিহিমিষ্টি স্বরে প্রশ্ন করলেন রাজরাণী। বললেন,—রাজাবাহাদুরের কথা কি অমান্য করবেন ছোটকুমার? আদেশ লঙ্ঘন করবেন?

বাতায়ন ত্যাগ করলেন কালীশঙ্কর! তাঁর উর্দ্ধাঙ্গের হলুদ-আলো কখন বিলীন হয়ে গেছে। সূর্য্যের শেষ রশ্মি ম্লান থেকে ম্লানতর হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। আকাশে নেই আর সেই দিবালোকের শুভ্রতা। পূর্ব্বদিগঞ্চলে কৃষ্ণরেখা উঁকিঝুঁকি দেয়, সন্ধ্যার অঞ্চলপ্রান্ত দেখা দেয় যেন!

রৌপ্যময় কেদারায় ধীরে ধীরে বসলেন রাজাবাহাদুর। পাদানিতে

রাখলেন পদদ্বয়। লাল শালুর গদী চতুষ্কোণ পাদানিতে। চার কোণে চারটি রূপালী জরির কলকা।

কালীশঙ্কর বললেন,—আমি তো আপোষেই মিটাতে চাই। কিছু ধনসম্পত্তি যায় যাক্। কিন্তু সহোদর একান্তই নারাজ। এক্ষণে আমার কি যে কর্ত্তব্য কিছুই স্থির করতে পারি না।

রাজার পদতলে পারশ্যের রঙদার গালিচা। বহু চিত্র-বিচিত্র আঁকা।

রাজমহিষী আসন গ্রহণ করলেন গালিচায়,—রাজাবাহাদুরের ঠিক পায়ের কাছে। একটি দীর্ঘ-শ্বাস ফেললেন উমারাণী। বললেন,—অধিক চিন্তায় শরীর নাশ হয়। ভাবনা পরিহার করুন।

কথার শেষে রাজার দুই পায়ে হাত ছোঁয়ালেন। করস্পর্শ।

কোন কথা বলেন না রাজাবাহাদুর। অনিমেষ নয়নে দেখেন পাটরাণীকে। কি এক অপূর্ব্ব সুবাস বহন করে এনেছে রাণী। অপরাহ্নে বেশভূষা পরিবর্ত্তনের ক্ষণে অঙ্গে মেখেছেন কি! কে জানে, গন্ধবারির সুগন্ধ না তাম্বুলগন্ধ! পুষ্পনির্য্যাস না গন্ধতেল! কোঁকড়া কোঁকড়া চুল উমারাণীর; সীঁথিতে সূক্ষ্ম সিঁদুররেখা, কপালের মধ্যভাগে উজ্জ্বল লাল টিপ গোলা-সিঁদূরের। কেশরাশির ভার ক্রমে শিথিলমূল হয় যেন। কবরী আলগা হয়। আকাশের তারা জ্বলছে দপদপিয়ে, ঘনকালো কেশের ফাঁকে ফাঁকে। সোনার কাঁটা উমারাণীর খোঁপায়। কাঁটায় কাঁটায় হীরা বসানো একেকটি। পলকি হীরা—তিন তিন রতির। অন্ধকার-আকাশের বুকে যেন জ্বলন্ত গ্রহ-নক্ষত্র।

পায়ে হাত বুলিয়ে দেন রাজমহিষী। সযতনে, সন্তর্পণে।

রাজাবাহাদুর বললেন,—জয়া আর মঙ্গলাকে দেখি না! কোথায়?

—নাটমন্দিরে রাজাবাহাদুর! পূজার আয়োজনে গেছে দু' জনে।

রাজমহিষীর কথা যেন বাদ্যযন্ত্রের ক্ষীণ ঝঙ্কার। তারের বাজনা যেন কথা কইলো। সেতার বাজলো যেন বিলম্বিতে!

ফুল বাছতে গেছেন হয়তো তারা! দূর্ব্বা, তুলসী আর বিল্বপত্র বাছতে! চন্দন ঘষতে গেছেন। শ্বেত আর রক্ত-চন্দন। নৈবেদ্য গড়ছেন, ফল আর

চালের। পুষ্পপাত্র সাজাতে গেছেন। সন্ধ্যারতির উপকরণ সাজাতে। লাল পাড় পট্টবস্ত্র পরিধানে, গেছেন নাটমন্দিরে, মাথায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে। পুজার জোগাড়ে লেগেছেন সর্ব্বমঙ্গলা আর সর্ব্বজয়া—দুই রাণী। দুই বোন।

—তামাক দেয় না কেন ?

কেদারায় এলিয়ে পড়লেন কালীশঙ্কর। রূপার কেদারা। হাতলে বাম হাত রাখলেন। হাতে মাথা রাখলেন।

পায়ে হাত বুলাতে বুলাতে উঠে পড়লেন উমারাণী। শিথিলমূল কেশরাশির অলকগুচ্ছ সরিয়ে দিলেন কপাল থেকে। হৈমকার্য্যখচিত বসনের গুণ্ঠন টানলেন চোখের 'পরে।

না ডাকলে আসে না। ডাক না পড়লে কক্ষে প্রবেশের অনুমতি নেই। আর ডাক পাড়লেই আসে। এক অনুপলও বিলম্ব হয় না।

কক্ষের বাহিরে নিষ্ক্রান্ত হয়ে বললেন রাজরাণী, কার বা কাদের উদ্দেশ্যে। বললেন,—আলবোলা দে যাও। রাজাবাহাদুরের ঘুম ভেঙ্গেছে, খেয়াল নেই ?

ঘোমটার ভেতর থেকে, মুখ না দেখিয়ে, চোখ না দেখিয়ে, মৃদু তিরস্কারের সুরে, বললেন উমারাণী।

কিন্তু না ডাকলে কে আসবে ? ডাক না পড়লে ! হুজুরের বিনা হুকুমে কক্ষে প্রবেশ করবে, কার এমন দুঃসাহস !

কড়িকাঠে টানাপাখা ঝুলছে ! দুলছে !

তবুও কি দুর্ব্বিসহ উত্তাপ ! টানাপাখার বাতাস তপ্ত, যেন আগুনের স্পর্শমাখা ! কক্ষের দেওয়াল-গাত্র পর্য্যন্ত উষ্ণ।

রাজাবাহাদুরের প্রশস্ত ললাটে আর গণ্ডদেশে ঘর্ম্মরেখা ফুটেছে। তিনি যেন কিছু হাঁসফাঁস করছেন। কালীশঙ্কর একবার গলা খাঁকরে বললেন,— বড়রাণী, তুমি কোথাও যাইও না। কিয়ৎক্ষণ থাকো ! আমি যেন শ্বাসকষ্ট পাই।

ফিরলেন রাজমহিষী। দালান থেকে কক্ষে। রাজার কথা শুনে ব্যস্ত হন মনে মনে। বললেন,—যাই তবে, সরবৎ এনে দিই। পান করুন, কষ্টের লাঘব হবে।

—না ! কালীশঙ্কর বললেন।—তুমি যাইও না। তোমাকে দেখেই আমার কষ্ট দূর হবে। তুমি থাকো।

আবার হাসলেন উমারাণী। পারশ্যের গালিচায় বসলেন, রাজাবাহাদুরের পদপ্রান্তে। রাণীর চঞ্চলতায় তাঁর হাতের গোছা-গোছা চুড়ি ঝুন ঝুন বেজে উঠলো। রাজার পায়ে হাত দিলেন। হাত বুলাতে থাকলেন অতি সন্তর্পণে ! রাজার কথায় ঈষৎ গর্ব্ব বোধ করেছেন ! কাঁচুলী-আঁটা স্থূল বক্ষ আরও যেন স্ফীত হয়েছে। উমারাণীর নতদৃষ্টি, হাসিমাখানো মুখে গুণ্ঠনের আবরণ।

বাহক-ভৃত্য আলবোলা বসিয়ে দিয়ে যায়। মুখনল ধরিয়ে দিয়ে যায় রাজার হাতে। ভয়ে ভয়ে, সসম্ভ্রমে। টানাপাখার হাওয়া যেন ভারী হয়ে ওঠে তামাকের সুগন্ধে ! নড়া-চড়ায় আলবোলার মুক্তার ঝারি এখনও মৃদু-মন্দ দুলছে !

গুণ্ঠন মোচন করলেন রাজমহিষী। ব্যাকুল দৃষ্টি তুলে বললেন,—সরবৎ আনি যাই ? যাবো আর আসবো, অনুমতি করুন রাজাবাহাদুর !

—তবে যাও বিলম্ব না কর। একা থাকায় আরও কষ্ট পাই।

কথার শেষে মুখে মুখনল তোলেন কালীশঙ্কর। তিনি কত একা ! দিন আর রাত্রির মধ্যে রাজা যখন অবকাশে একা থাকেন, তখন যেন তাঁর নিজেকে বড় বেশী একা মনে হয়। ত্রিভুবনে কেউ যেন তাঁর নেই !

তিন রাণী। রাজপুত্র।

দেওয়ান, নায়েব। কত আমলা গমস্তা ! সিপাহী, পাইক, বরকন্দাজ ! দাস-দাসী কত অসংখ্য। ভৃত্য আর তাঁবেদার ! ভূমিদানের মানুষই বা কত ! রাজার দরবারে পরামর্শদাতা ! বৈঠকখানা ভর্ত্তি ইয়ার-মোসাহেব। গাইয়ে-বাজিয়ে।

তবুও রাজাবাহাদুর একা ? অবসর-সময়ে যখন একা একা থাকেন, তখন বড় বেশী যেন একা মনে হয় নিজেকে। এত বল-ভরসা, এত লোকবল, এত ধনসম্পদ—তবুও মনে হয় কেউ যেন কারও নয়, কেউ নয় আপনার। যৌবন-জোয়ারের বেগ যতদিন প্রবলতর ছিল ততদিন এসকল চিন্তা মনেই উদয় হত

না। এখন জোয়ার হয়তো ভাঁটার দিকে, মুখর দিনের চপলতা এখন প্রায় স্থির। এখন সময়ে সময়ে বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী, মন-আকাশে উড়ে বেড়ায়, তত যেন সংসারের প্রতি, পৃথিবীর প্রতি ঔদাস্য আসে। মনে হয়, যে একা এসেছে নগ্নকায়া, সে একা চলে যাবে। কেউ যাবে না সঙ্গে পর-পারের যাত্রায়।

মদের পেয়ালা। রাণীদের হাসি-হাসি মুখ! গায়কের গান, নর্ত্তকীর নাচ, আসরফি মোহরের গদি—তবুও একা ঠেকে রাজাবাহাদুরের? এই দুনিয়ায় কত কি দেখলেন স্বচোখে! দেখে দেখে অভিজ্ঞ হয়েছেন—মানুষকে চিনেছেন—বুঝেছেন, কারও জন্য কেউ নয়। আপন বলতে কেউ নেই।

বছরের পর বছর ঘুরে গেছে। যুগের পর যুগ!

কত নিদাঘের দাবদাহ গেছে! কত ঝটিকার প্রলয় তাণ্ডব দেখেছেন রাজা! ভূমিকম্পের প্রচণ্ড আলোড়ন!

সম্মুখের মুক্ত বাতায়ন-পথে দৃষ্টি প্রসারিত করলেন কালীশঙ্কর।

বাহিরে দিবাশেষের ম্লান আকাশ। ঘন-সবুজ বৃক্ষশীর্ষ! আকাশের বুকে টিয়া পাখীর ঝাঁক। যেন এক রাশ সবুজ পাতা, সাঁতারু—মেঘের সঙ্গে সঙ্গে ভেসে চলেছে।

ঐ তো সেই বটবৃক্ষ। ঐ তো সেই দেবদারু। শাল, তাল, তমাল,—সেই বিরাট অশ্বত্থ—আজই তারা আকাশকে চুমা খেতে মুখ উঁচিয়েছে। তাদের দৈনন্দিন বিকাশ দেখেছেন রাজাবাহাদুর—যখন তাদের ছেলেবেলা, তখন থেকে দেখেছেন।

—রাজাবাহাদুর! আমি এসেছি।

লজ্জা-নম্র কথার সুর রাজমহিষীর। তাড়াতাড়ি যাওয়া-আসায় দ্রুত শ্বাস পড়ে যেন। ক্ষণেক ব্যবধানে বক্ষ ওঠে নামে। রাণীর ডান হাতে হিম-শীতল পানপাত্র। কৃষ্ণকষ্টিপাত্রে টলমল পানীয়—কাস্তুরা আর মৌরী

ভাসছে পোড়া কাঁচাআমের সরবতে। রাজমহিষী গেছেন আর এসেছেন। যেতে আর আসতে যতটুকু সময় লেগেছে।

রাণীর কথায় যেন মন নেই রাজাবাহাদুরের। কান নেই।

উন্মুক্ত বাতায়নে চোখ মেলেছেন কালীশঙ্কর। বহুকাল যেন দৃষ্টি পড়েনি —ঐ তাল-তমাল-শাল-দেবদারু-বট-অশ্বত্থ যেন নজরে পড়েনি! আজ তারা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, পল্লবিত শাখা-প্রশাখায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে,— আকাশকে চুমা খেতে মাথা তুলেছে আকাশের বুকে।

—রাজাবাহাদুর!

আবার ডাকলেন রাজমহিষী। মিষ্টি মিষ্টি কণ্ঠে। কি এক বাদ্যযন্ত্র বাজলো যেন। তারের ঝঙ্কার যেন।

সাড়া নেই রাজার। কান নেই রাণীর কথায়। খেয়ালই নেই কে ডাকছে না ডাকছে।

কত নবাব এলো গেলো! বঙ্গের শাসনকর্তা একেক জন। যেন এক এক মহাজন। ভারতের সম্রাট ছিলেন জাহাঙ্গীর। তাঁর পর এলেন শাহজাহান। এখন ঔরঙ্গজেবের কাল চলেছে। তিনিই এখন দিল্লীশ্বর বা ভারত সম্রাট।

বাঙলার শাসনকর্তাও কত বার বদল হয়। এক যায়, আর এক আসে। রাজাবাহাদুরের জীবদ্দশাতে তিনিই দেখলেন একে একে কত জনকে। এলো আর গেলো, টিঁকলো না কেউ বেশী দিন—কেন কে জানে, ভাবছিলেন কালীশঙ্কর। এই অলস অপরাহ্ণে স্তব্ধ-মৌন-নীরব-অতীতের স্মৃতি মন্থন করতে যেন এক রকম ভালই লাগে। এই ভগ্ননিদ্রার জরো জরো শরীরে। অবশ অঙ্গে।

নির্জলা আসব পান করেছিলেন রাজাবাহাদুর। দিনমানেই পান করেছেন 'রবার থেকে উঠে গিয়ে। চুয়ানো মদিরা পানে না কি তীব্রতম নেশা হয়। এক-আধ পাত্র ব্যতীত পান করা চলে না, এতই জোরালো। যেন তরল আগুন সেই চুয়ানো আসব। কালীশঙ্কর কুলদেবতাকে অর্ঘ্য দান করে পর

পর তিন পূর্ণপাত্র পান করেছেন, কিছুক্ষণের মধ্যে। কেমন যেন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে দিনকে দিন। রাজাবাহাদুর ছাড়তে পারেন না এই আত্মঘাতী নেশা—এই নির্জলা চুয়ানো মদ খাওয়া। বিষ খাওয়া! কত দিনের অভ্যাস কে জানে!

কত নবাব এলো গেলো। কালীশঙ্করের অতীতের সঙ্গে তাঁরাও যেন জড়িয়ে আছেন বাঙলার নবাবদের সঙ্গে।

অবশ অঙ্গ রাজাবাহাদুরের। এখনও চোখে-মুখে নেশা ফুটে আছে। প্রশস্ত ললাটের দুই তীর ঝিম-ঝিম করছে। কেমন এক বিকারের ঘোরে যেন চোখের দৃষ্টি ঝাপসা ঠেকছে। মুখে মুখনল, তাই গুরু গুরু মেঘগর্জ্জন রাজার কক্ষে। সশব্দ আলবোলা, যেন জীবন্ত। গমগমে আঁচ আলবোলার চূড়োয়। শিরোভূষণে নানা রত্ন, মুক্তার ঝারি।

এক নবাব যায়, আর আর এক নবাব আসে।

রাজাবাহাদুরই দেখলেন কত জনকে, তাঁর জন্মের অব্যবহিত পর থেকে। যায় আর আসে, আসে আর যায়। কে জানে কেন, টিঁকতে পারে না অধিক কাল।

মুকারেম খাঁ যেতে না যেতে ফিদাই খাঁ বাঙলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন। মুকারেম সপরিবারে জলে নিমজ্জিত হন। পারিষদবর্গ আর অন্তঃপুরবাসিনী-দিগকে সঙ্গে ল'য়ে মুকারেম তখন নৌকাবিহারে বেরিয়েছিলেন—নদীবহুল ঢাকা শহরের আনাচে-কানাচে। শুনলেন দিল্লী থেকে সম্রাট রাজদূত প্রেরণ করেছেন। জরুরী পত্র আনছে রাজদূত। চড়ায় নৌকা লাগতে না লাগতে ঝড় উঠলো ভীষণ। মুকারেমের নৌকা অকস্মাৎ ঝড়ে জলের অতল তলে ডুবে গেল। তার পর এলো ফিদাই খাঁ। সম্রাট হিজরী ১০৩৬ সালে নবাব ফিদাইকে বঙ্গদেশের শাসক নিযুক্ত করলেন। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শাহজাহান দিল্লীর সিংহাসনে বসলেন। নূতন সম্রাট, নবলব্ধ সাম্রাজ্য,—শাহজাহান বরবাদ করে দিলেন ফিদাই খাঁয়ের কাতর প্রার্থনা। সম্রাট তাঁর প্রিয়পাত্র কাসিম খাঁ যবানীকে শাসনকর্ত্তা করলেন বাঙলার।

—রাজাবাহাদুর!

আবার, আবার ডাকলেন উমারাণী। নাতিউচ্চকণ্ঠে ডাকলেন।

—আঁ!

কেমন যেন হতচেতনের মত সাড়া দিলেন কালীশঙ্কর। আকাশে প্রসারিত দৃষ্টি ফিরলো না। মুখে উঠলো মুখনল। আলবোলা গর্জ্জাতে থাকলো বার বার।

রাজমহিষী এক বার লক্ষ্য করলেন রাজার মুখভাব। সে মুখে নেশার পরিস্ফুট চিহ্ন; চিন্তার বক্ররেখা কপালে। চোখে নিদ্রার জড়তা। রাজা-বাহাদুরের মুখাকৃতি দেখলে কথা বলতে যেন সাহস হয় না। ভয় আর সম্ভ্রমের সঙ্গে উমারাণী তবুও বললেন,—রাজাবাহাদুর, এই সরবৎটুকু পান করুন!

—দেও! বললেন কালীশঙ্কর। এক হাত বিস্তার করলেন!

যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল বড় বড় ঝোপ। আকাশের বুকে মুখ তুলেছে। সকলই প্রায় সমান উচ্চ। কোন কোন গাছের পর্ণগুলি চিত্রিত; কোন গাছের পর্ণ ঘোর রক্তবর্ণ; কোন পত্র দীর্ঘ, আপনার ভার সহ্য করতে পারে না, তাই নিম্নমুখী। কোন কোন বৃক্ষ দম্ভে যেন পত্রসমূহকে উর্দ্ধমুখ করেছে। কোন গাছের পাতা ক্ষুদ্র, গোলাকার। কারও বা পত্র হরিৎবর্ণ।

কত নবাব এলো আর গেলো! টিঁকলো না কেউ বেশী দিন। বাঙলার মাটিতে।

রাজাবাহাদুর কালীশঙ্করই দেখলেন কত জনকে, এত কাল ধরে। কাসিম খাঁ যবানী ছিলেন পর্ত্তুগীজ-বিদ্বেষী। বাঙলায় পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি দিল্লীর সম্রাটকে লিখে পাঠালেন: "আপনি যে কতিপয় ইউরোপীয় প্রতিমা-পূজক জাতিকে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে হুগলীতে বসবাস করিবার অনুমতি দিয়াছেন, তাহাদের উপদ্রবে এ অঞ্চলের অধিবাসিগণ এক প্রকার উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে; রাজকার্য্য পরিচালনা করাও কঠিন হইয়াছে। তাহারা দিনে দিনে এতই উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছে যে, আপনার প্রজাদিগের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করিতেও সঙ্কুচিত হয় না।"

সম্রাট শাহজাহানের মনের কোণেও ছিল নিদারুণ বিদ্বেষ ঐ পর্ত্তুগীজদের প্রতি। সিংহাসন অধিকারের পুর্ব্বে সম্রাট যখন বিদ্রোহী হন, পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাবার অভিপ্রায়ে যখন পর্ত্তুগীজ শাসনকর্ত্তা মাইকেল রড্রিজের সাহায্য প্রার্থনা করেন—তখন তিনি নিরাশায় বিমুখ হন। রড্রিজ সাহায্য দানে অস্বীকার করেন। কাসিম খাঁর অনুযোগ-পত্র পাঠে এই সকল কথাই সম্রাটের স্মৃতিপটে ভাসে।

কাসিম খাঁ আরও লিখলেন: "বহু সময়ে পর্ত্তুগীজেরা এই দেশ হইতে ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে ধরিয়া লইয়া যায়। কখনও বা কিনিয়া লইয়া ক্রীতদাস-দাসীরূপে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিক্রয় করে। এইরূপে তাহারা ব্যবসা চালাইতেছে। পর্ত্তুগীজ জলদস্যুগণ গঙ্গার পুর্ব্ব-তীরের বহু প্রদেশে অমানুষিক দৌরাত্ম্য চালাইতেছে।"

সম্রাটের মন তৈরীই ছিল। পুর্ব্বস্মৃতি স্মরণে পুরানো অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হন। সম্রাট শাহজাহান কাসিম খাঁকে আদেশ প্রেরণ করেন—"আপনি অবিলম্বে প্রতিমাপূজক পর্ত্তুগীজগণকে আমার অধিকারের বহির্ভূত করিয়া দিবার আয়োজন করুন।"

সম্রাটের আদেশ পাওয়া মাত্র—হিজরী ১০৪১ সালে—কাসিম খাঁ হুগলী আক্রমণের উদ্যোগ করলেন। উদ্দেশ্য পর্ত্তুগীজ-উৎখাত, তাদের বংশনিধন। হুগলী অবরোধের আরম্ভ থেকে শেষ পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে অন্যূন এক হাজার পর্ত্তুগীজ মুসলমান হস্তে নিহত হয়। ক'জন যাজককে আর পাঁচশো সুশ্রী যুবককে আগ্রায় পাঠানো হয়—বিচারার্থে। বন্দীদের মধ্যে ছিল শত শত সুন্দরী বালিকা—তাদের অধিকাংশই সম্রাটের অন্তঃপুরে স্থান পায়। অবশিষ্টদের সম্রাটের সভাসদেরা নিজেদের মধ্যে বণ্টন করেন।

কাসিম খাঁ যবানীর মৃত্যু হয়। তার পর হিজরী ১০৪২ সালে আসেন আজিম খাঁ বাঙলার নতুন শাসকরূপে। আজিম ছিলেন সম্ভ্রান্ত বংশসম্ভূত, সম্রাটের প্রিয়পাত্র। এই আজিম খাঁর কন্যার সঙ্গেই যুবরাজ সুজার বিবাহ হয়। আজিম খাঁ ছিলেন অপদার্থ, নিষ্কর্ম্মা। আজিমই সর্ব্বপ্রথম ইংরাজদের

বঙ্গদেশে জাহাজসহ বাণিজ্য করবার 'ফারমান' বা অনুমতিপত্র আনিয়ে দেন দিল্লী থেকে। বাঙলা দেশকে তুলে দেন মগ আর আসামীদের হাতে। মগ-আসামী দু' দল একত্রে বাঙলায় লুঠপাঠ চালিয়ে চলে। বাঙলার বহু অধিবাসীকে তারা ক্রীতদাসরূপে চালান দেয়। শেষ পর্য্যন্ত সম্রাট পদচ্যুত করেন অকৃতকার্য্য আজিম খাঁকে। বাঙলা থেকে এলাহাবাদে পাঠিয়ে দেন। তার পর বাঙলায় এলেন ইসলাম খাঁ মুসেদী। তিনি যেমন বহুদর্শী রাজনীতিক তেমনই এক সুদক্ষ সেনানী। শাসন-কার্য্য, বিচার-কার্য্য ও সামাজিক কার্য্যে সমান সুপটু তিনি। এই ইসলাম চট্টগ্রামের শাসক মগ-সর্দ্দার মুকুট রায়ের হাতে হাত মিলিয়েছিলেন। আরাকান-রাজের অধীনের শাসক মুকুট রায়। ইসলাম খাঁ মুসেদীর নাম থেকেই চট্টগ্রামের নামান্তর হয় ইসলামাবাদ। এই ইসলাম খাঁ—

—রাজাবাহাদুর, আজ আপনার বিশ্রাম।

হঠাৎ কথা বললেন উমারাণী। সেতারের ঝঙ্কার তুললেন যেন। আরও যেন কিছু বলবেন, তেমনি ব্যগ্র চোখে তাকালেন। বললেন,—আজ আর বৈঠকে যায় না। অন্দরেই বিশ্রাম কর।

শেষের কথাগুলি রাণী বলেন যেন ফিসফিসিয়ে। চুপি চুপি। বাতাস পর্য্যন্ত যেন না শোনে। হাওয়ায় যেন কথা উড়ে না যায় অন্য কানে। ঘরের দেওয়াল যেন না শোনে।

—নাঃ।

ক্ষীণ হেসে ফেললেন রাজাবাহাদুর। বললেন,—নাঃ, বড়রাণী। অন্দরে আজি থাকা চলে না।

—কেন? বাধা কি?

পুনরায় হাসলেন রাজা। ক্ষীণ হাস্য। হাসিমুখেই বললেন,—অন্ততঃ আজি নয়!

ইদিক সিদিক চাইলেন রাজমহিষী। মৃগনয়না উমারাণী, চোখে যেন কত

ভাব, কত ভাষা! কত আবেগের আবেশ-ভরা সেই চোখ তুললেন রাজরাণী। রাজার চোখে চোখ রাখলেন—লজ্জাভরা দৃষ্টি। বললেন,—বাধা কি তাই বল। তোমার শরীর ক্লান্ত—

—বল না বড়রাণী।

—কেন? আমার অধিকার ছাড়ি কেন?

কথায় কথায় যেন সজীব হয়ে ওঠেন কালীশঙ্কর। এতক্ষণ ছিলেন মৃত-প্রায়ের মত। উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে একদৃষ্টে তাকিয়ে কত কি যেন ভাবছিলেন, কতক্ষণ ধরে। বঙ্গদেশের বিগত শাসকদের স্মরণ করছিলেন একে একে। মুখের হাসি চাপলেন রাজাবাহাদুর। সানন্দ কণ্ঠে বললেন,—আজি দু'টা ইরাণী নর্ত্তকীর আসার ঠিকঠাক আছে।

লজ্জাবতী-লতার গায়ে কিসের যেন স্পর্শ লাগে।

পল্লবিতা লতা, নিমেষের মধ্যে যেন সঙ্কুচিতা হয়। উমারাণীও যেন পলকের মধ্যে নিজেকে সম্বরণ করে নেন। উচানো দৃষ্টি নত করেন গালিচায়। মুখখানি যেন চকিতের মধ্যে মলিন হয়ে যায়। তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলেন ধীরে ধীরে। আনত-চোখে হতাশ-দৃষ্টি।

দু'জন ইরাণী নর্ত্তকী আসবে। ইরাণের রাণী আসবে। সব ঠিকঠাক।

রাজাবাহাদুর কালীশঙ্কর সোজা হয়ে বসলেন, কেদারায়। মুখ থেকে মুখনল নামিয়ে আছড়ে ফেলে দিলেন গালিচায়, কেমন যেন সদম্ভে। মুখের ক্ষীণ হাসিতেও গর্ব্বরেখা ফুটলো যেন। ইরাণী নর্ত্তকী দু'জন এই সবে মাত্র পা দিয়েছে গড় গোবিন্দপুরের জাহাজ-ঘাটে—মাত্র ক'দিন আগে। এখনও কোথাও মুজ্‌রো নেয় নি। মুজ্‌রোও নয়, হুজ্‌রো তো নয়ই।

হঠাৎ-হাওয়ায় হঠাৎ-নিবে-যাওয়া প্রদীপ যেন উমারাণী।

কিয়ৎক্ষণ আগেও দপদপ জলছিল দীপশিখা। এখন রূপের জৌলস-ম্লান হয়ে গেছে যেন নিরাশা-ব্যথায়।

ঠিক যে-সময়ে, সুতানটির ঘরে ঘরের তুলসীমঞ্চে সন্ধ্যাদীপ দেওয়ার কাজ

শুরু হয়েছে, সেই ভরাসন্ধ্যা নামতে না নামতে একটি অতি উজ্জ্বল দীপশিখা যেন রাজ-অন্তঃপুরে দপ্‌ করে নিবে যায়।

আবার একটি তপ্ত নিঃশ্বাস ফেললেন উমারাণী। বুক-ভাঙ্গা শ্বাস ফেললেন।

—সূর্য্য অস্তাচলে, তথাপি এখনও কি অসহ্য উত্তাপ!

কারও উদ্দেশে নয়, আপন মনেই কথা ক'টি বললেন রাজাবাহাদুর। আবার চোখ ফেরালেন বাতায়নে। মুক্ত আকাশে! নীড়লোভী পাখীর ঝাঁক উড়ছে তীরের বেগে। আঁধার নামতে না নামতে বাসায় আশ্রয় চাই। টিয়া পাখীর পাল উড়ছে, ডাকতে ডাকতে। যেন এক-রাশ সবুজ পাতা, উড়ে চলেছে হাওয়ার বেগে। কবুতরের দল উড়ছে, পাক খেয়ে খেয়ে! গাছে গাছে কাক আর চড়াই মুখর করে তোলে যেন অলস-অপরাহ্নকে। ডেকে ডেকে!

অদূরে ধোঁয়ায় ধূসর এক রেখা—ভূমি থেকে শূন্যে উঠছে সর্পিল গতিতে! দৃষ্টিপথে দেখতে পেয়েছেন কালীশঙ্কর! সন্ধ্যার বস্ত্রাঞ্চল যেন আকাশ থেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে! অত্যন্ত ধীর আর মন্থর গতি সচল ধূম্ররেখার। দেখায় যেন স্থির, অচঞ্চল! যেন গতিহীন।

অবনতমুখী উমারাণী, লজ্জা না সঙ্কোচে ম্রিয়মানা পদ্মের মত হয়ে আছেন যেন। মুক্তাহারবেষ্টিত তাঁর গণ্ডদেশ এখনও ঈষৎ আরক্ত। অর্দ্ধমুদ্রিত দুই আঁখিতে নতদৃষ্টি! ওষ্ঠদ্বয় স্থির। টানাপাখার হাওয়ায় রাজমহিষীর গুণ্ঠন যেন থাকে না।

—ব্যাটা সলোমন, চুল্লীতে আগুন লাগালো হয়তো!

আবার স্বগত করলেন রাজাবাহাদুর, ঐ সচল ধূমরেখায় চোখ রেখে। রাজার হঠাৎ-কথায় একবার যেন বিচলিত হয়ে ওঠেন উমারাণী। যেন চমকে ওঠেন।

রাজপ্রাসাদের অনতিদূরে চার্লস সলোমনের কুঠি। কুঁড়ে ঘর। সলোমনের পূর্বপুরুষ না কি সুদূর ইংলণ্ডের বাসিন্দা ছিল। সলোমনই সাগরে ভাসতে

ভাসতে কবে কোন্ কালে ভারতমহাসাগরের তীরে এসে পৌঁছায়! জাহাজে আসে আর ফেরে না। সাদা আদমী হয়ে সে কালোজাতির প্রেমে পড়ে গেছে, আশ্চর্য্য! লণ্ডনের পথে পথে হয়তো ভিক্ষা করতে বাধ্য হত এত দিনে, সলোমন বেঁচে গেছে পুণ্যতীর্থ ভারতের ধূলি মাথায় রেখে! সেখানে ছিল দুর্দ্দশা, আর এখানে? সলোমন রুটির বেকারী করেছে নিজে। তন্দুর বসিয়েছে—তনুর বসিয়েছে—পাঁউরুটি সেঁকবার চুল্লী বসিয়েছে। বেকিং ওভেন্ বসিয়েছে গোটা কয়। চুল্লীতে ফাঁপা রুটি সেঁকে চার্লস সলোমন—পাঁউরুটি তৈরী করে! লোফ!

পাঁউরুটি বিক্রী করে সলোমন। রুটি-বিক্রীর পয়সায় রুটির সংস্থান করে নিজের! কুঠিয়াল রাইটারদের জন্য রুটি সরবরাহ করে কোম্পানীর হাউসে। ঝড়তি-পড়তি থাকলে সাধারণ খদ্দেরকে বিক্রী করে! আর্ম্মাণী; গ্রীশ্চান আর পর্ত্তুগীজ প্রতিবেশীদের কাছে বিকিকিনি করে!

বাঙলার শ্যামল মাটিকে না কি অন্তর থেকে ভালবেসে ফেলেছে চার্লস সলোমন! হিম আর কুয়াসা-দেখা চোখ তার, চিরসবুজের দেশ দেখে দেখে যেন তাই সাধ আর মেটে না! স্বচ্ছ আকাশ দেখতে দেখতে কত সময়ে তন্ময় হয়ে পড়ে সলোমন। নাবিক-নীল আকাশে কেমন নীরেট রূপোর সূর্য্য দেখা যায়! কলোরাতের আকাশে সোনার চাঁদ, সীমাসংখ্যাহীন নক্ষত্র-বিস্তার! বর্ষায় কেমন ঝরো ঝরো বর্ষণ!

উর্ব্বর-মাটিকে ভালবেসেই শুধু তৃপ্ত নয় চার্লস সলোমন। বাঙলার এক গভীর-চোখ মেয়ের প্রেমে পড়ে গেছে সে। এক অকূলকন্যার, প্রেমে মজে গেছে যাকে বলে। ডোমপাড়ার সেই মেয়েটি, যখন বেলাশেষে গাগরী ভরণে চলে দিগ্‌বধূদের সঙ্গে, তখন সেই কালোমেয়েটির প্রতি অঙ্গে টলমল যৌবন দেখতে দেখতে মোহমুগ্ধ হয়ে ওঠে সলোমনের বিলাতী-মন। চুলের খোঁপায় কলকে-ফুল, মিশ্‌কালো রঙে রূপার অলঙ্কার—কত দূরে থেকেও দেখতে পায় সলোমন—অপলক দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে বিভোর হয়ে যায় যেন! শরীর তার রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে তখন। থ্রোইং কিস ছোঁড়ে সলোমন! উড়ন্ত চুমু!

বসেছিলেন রাজমহিষী, অলঙ্কার বাজিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। হঠাৎ দুই হাতের গোছা-গোছা চুড়ির রিণিঝিনি শুনে রাজাবাহাদুর মুখ ফেরালেন। দেখলেন রাণী গমনোদ্যতা, দুয়ারের দিকে পা বাড়িয়েছেন।

কালীশঙ্কর বললেন,—বড়রাণী, যাও কোথায় ?

ফিরে দাঁড়ালেন মলিনমুখ রাজমহিষী। উড়ে-যাওয়া গুণ্ঠন টানলেন কপালের পরে। আনত চোখে জিজ্ঞাসু চাউনি ফুটলো। আবার কেন ডাক পড়লো অকারণে ? যাকে ছেড়ে চলে-যাওয়া, তাকে আবার ডাকা কেন ? অহেতুক আহ্বান কেন ?

—আমিও যাই নাট মন্দিরে।

অভিমানের স্পর্শ যেন কোথায়, রাণীর কথার সুরে। উমারাণী বললেন—নাট মন্দিরে যাই, সেখানে ভাগবত-পাঠ শুনি গিয়ে। কি আর করি !

ভাগবত পাঠ। শ্রীমদ্‌ভাগবতের পাঠ। কৃষ্ণবিষ্ণুর লীলা পাঠ।

আকাশ প্রায় কালো আকার ধারণ করছে। আর যেন চোখে পড়ে না কিছু। সলোমনের চুল্লীর ধোঁয়া আর গোচরে আসে না। আকাশ অদেখা হতে থাকে।

রাজকক্ষের দ্বারমুখে সহসা উজ্জ্বল আলো ঠিকরোয়। আলোর আভায় রাজকক্ষ ঝলসে উঠলো যেন। চার দেওয়ালের সোনা-রূপোর সৈন্যসামন্ত জল্-জল্ করে। কাচের ঝাড়লণ্ঠন নিষ্প্রদীপ, তবুও আলোর ছায়াপাতে চিকচিকিয়ে ওঠে। রাজমহিষীর মলিনমুখেও আলোর ঝলক লাগে। গুণ্ঠন আরও টেনে দিলেন তিনি ! এই ম্লান মুখ আর কাকে দেখাবেন !

রাজাবাহাদুর, গলা খাঁকরে বললেন,—আলো ! আলো দিতে কও বড়রাণী !

মশালচি এসেছে দ্বারপ্রান্তে। এসে দাঁড়িয়ে আছে মশাল-হাতে। জ্বালিয়ে দিয়ে চলে যাবে সাঁঝের বর্ত্তিকা। আলো, আরও আলো ! দাউ দাউ জ্বলছে মশাল, লেলিহান শিখায়। বায়ুপ্রবাহে আঁকাবাঁকা শিখা।

রাজমহিষীর ম্লানমুখ আরও যেন শান্ত ও ম্লান দেখায়, মশালের

আলোকপাতে। তাঁর নয়নপল্লব যেন জলভারস্তম্ভিত। টানাপাখার হাওয়ায় কপালের পরে নেমেছে নিবিড়-কালো কুঞ্চিতালক! রাতের আকাশে তারা যেন! অন্ধকারময় শিথিলমূল কেশকবরী হীরার কাঁটায় গ্রথিত—এতক্ষণ যেন দৃষ্টিপথে পড়েনি রাজাবাহাদুরের। উমারাণীর সুগঠন কণ্ঠের রত্নকণ্ঠী চিক-চিক করে! অঙ্গুরীয় ঝলমল করে।

রজতের প্রদীপ জ্বললো রাজকক্ষে। সু-উচ্চ পিলসুজের শীর্ষে। আলোয় যেন আলোকময় হয়ে ওঠে রাজকক্ষ। কাঞ্চন আর রজতের চাকচিক্যে যেন চোখ ঠিকরে যায়।

দু'জন ইরাণী নর্ত্তকী আসবে আজ। রাণী ভগ্নমনে ত্যাগ করলেন কক্ষ, অবশ পদক্ষেপে।

ইরাণী নর্ত্তকী! আসছে কত দূর থেকে। সেই ইরাণ থেকে।

বাগদাদ থেকে দু'টি তাব্রিজ-কন্যা এসেছে। নীল-চোখ, টিকালো-মুখ, সোনালী-কেশ, বসরাই গোলাপের মতই রাঙা কপোল। ভেনাস যেন!

বাগদাদ থেকে ক্যারাভান ছেড়েছিল বিরাট এক দলের। বাগদাদ থেকে ইস্পাহানে পৌঁছে থেমেছিল কয়েক পক্ষ। ইস্পাহান থেকে কান্দাহার। কত দিন আর কত রাত ফুরিয়ে যায়! লাহোরে পৌঁছতে পৌঁছতে আরও কত দিন অতীত হয়। লাহোর থেকে ভাতিন্দা—দিল্লী—আগ্রা—লক্ষ্ণৌ—পাটনা—

পায়ে-চলা ক্যারাভান মরুচারীদের। উঠের পিঠেই শুধু নারী আর শিশু।

কখনও থামে, কখনও এক নাগাড়ে পথ চলে! পথেই দিন আর রাত্রি শেষ হয়ে যায়। ঠিক মাথার পরে চন্দ্র-সূর্য্যের আলো পড়ে। পাটনা থেকে বাঙলা আর কত দূর, ক'দিনের পথ বৈ নয়।

সূর্য্যের খর আলো দগ্ধ করতে পারে না। পিপাসায় মৃত্যু হয় না। ঝড়জলে অনাশ্রয়ে ভেসে যায় না! তিলে তিলে কষ্ট বরণ করেও না কি ঐ তাব্রিজ-কন্যাদের রূপ এক তিলও টসকায়নি। বোরখার আবরণে আছে যেমনকার তেমনি। এসেছে কোথা থেকে কোথা, কত দেশ পেরিয়ে,—

তবুও যেন ক্লান্তি নেই দেহে। তেমনি সজীব আছে। বসরাই গোলাপ, এততেও পাপড়ি খসলো না, শুকালো না, মরলো না?

সরবৎটুকু পান করায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন রাজাবাহাদুর। চেতনাসঞ্চার হয় যেন। রজতদীপের উজ্জ্বল আলোয় কেমন যেন খুশী খুশী দেখায় রাজাকে। কেদারা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন। সরবৎপানে মুখের স্বাদ মিষ্ট হয়ে যায়।

দেওয়ালের কোণে তেকাঠা। মুখশুদ্ধি আছে তেকাঠায়। ঢাকাই কাজের চাঁদির ডিবা আছে, পান-মসলার। জর্দ্দা-সুর্তির কৌটা আছে। তাম্বুল আছে।

টানাপাখার জোরালো হাওয়া চলছে। কে কোথায় কোন্ অন্তরালে থেকে পাখার দড়ি টানছে নতুন উদ্যমে। দিবানিদ্রা ভঙ্গ হয়েছে—রাজা না কি জেগেছেন।

রজতদীপের শিখা নেচে নেচে উঠছে সর্পিল ভঙ্গিমায়। বিপরীত দেওয়ালে রাজাবাহাদুরের বিরাট ছায়া পড়েছে।

আবার কোথা থেকে ঝড়ের মত যেন উড়েই আসেন রাজমহিষী।

অলঙ্কারের সজোর রিণিঝিনি শোনা যায় হঠাৎ। রুদ্ধশ্বাসে দৌড়ে আসেন যেন উমারাণী! কক্ষে প্রবেশ করেই ভয়ার্ত্তকণ্ঠে বললেন,—রাজাবাহাদুর! রক্ষা করুন!

—কেঃ!

বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখ কালীশঙ্করের। গর্জ্জে উঠলেন যেন। ব্যাঘ্রবিক্রম যাঁর, তিনিও বুঝি আচমকা ভীতিকাতর নারীকণ্ঠের ডাক শুনে চমকে উঠেছিলেন বারেক। বললেন,—বড়রাণী?

—হাঁ, রাজাবাহাদুর!

বাষ্পরুদ্ধ কথার স্বর রাজমহিষীর। দ্রুত পদচালনায় অবিন্যস্ত হয়ে গেছে বেশবাস—হৈমকান্তখচিত বস্ত্রাঞ্চল। স্থানচ্যুত হয়েছে কণ্ঠহার। কি এক ভয়ে রাণীর অনিন্দ্য মুখশ্রী যেন রক্তহীন দেখায়। থর থর কাঁপতে থাকে উমারাণীর কোমল অঙ্গ।

—ভয় পাও কেন বড়রাণী ? কোন দুর্ঘটনা—

আকুল আগ্রহের সঙ্গে প্রশ্ন করলেন রাজাবাহাদুর। দুই হাতের মুষ্টি কঠিন হয়ে উঠেছে। দীর্ঘ দুই চোখে অনন্যসাধারণ ব্যগ্র-ব্যাকুল দৃষ্টি ফুটেছে। প্রশস্ত ললাটে কুঞ্চনরেখা।

—পথ রোধ করে যে!

কেঁদে কেঁদে বললেন যেন রাজমহিষী। করুণ স্বরে বললেন।

—কোন্ দুরাত্মা! কে: ?

রাজার বিস্ময়ের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়। কথা বলেন সহসা উচ্চকণ্ঠে! চেঁচিয়ে।

করাল কিছু দেখেছেন রাজরাণী। মৃত্যুকে দেখেছেন যেন। তাঁর নয়নতারা স্থির হয়ে আছে এখনও। কণ্ঠ যেন রোধ হয়ে গেছে। থরথরিয়ে কাঁপছে কোমল বাহু। চরণাঙ্গুলি। বক্ষের স্পন্দন যেন থেমে আছে। বললেন,—মহেশনাথ!

—মহেশনাথ ?

অসাবধানে হাতের ডিবা গালিচায় পড়লো সশব্দে। সিংহের মত গর্জ্জন করলেন যেন কালীশঙ্কর।

—হাঁ রাজাবাহাদুর, মহেশনাথ।

—কি বলে মহেশনাথ ?

আসবের নেশায় শরীর এখনও টলছে। কোন মতে নিজেকে সামলে নেন রাজাবাহাদুর। উত্তেজনায় হয়তো পদস্খলন হতে পারতো।

রুদ্ধশ্বাস মুক্ত হয় কতক্ষণ পরে। ঘন ঘন শ্বাস পড়তে থাকে। হাঁফ ধরে যেন উমারাণীর। থেকে থেকে স্ফীত হয় বক্ষ, শ্বাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে। প্রায় শুষ্ককণ্ঠে বললেন রাণী,—কি বলে আমি কাণ দিই নাই। পথ আগলায় কেন ? কি ভয়ঙ্কর তোমাদের ঐ মহেশনাথ!

শিউরে শিউরে ওঠেন বড়রাণী। নয়নতারা আবার স্থির হয়ে যায়। মুখাকৃতি রক্তহীন।

—কোথায় মহেশনাথ ?

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, উত্তর না শুনেই কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন রাজাবাহাদুর। ভূমি কেঁপে উঠলো যেন কালীশঙ্করের পদক্ষেপে। রাজমহল কাঁপতে থাকলো বুঝি !

দালানে পদার্পণ করে দৃষ্টিপথে কাকে যেন খুঁজতে থাকেন কালীশঙ্কর। কোথায়, কোথায় সেই দুরাত্মন্ !

—মহেশনাথ !

সিংহগর্জ্জন। দালানে প্রতিধ্বনি ভাসলো রাজার ডাকের। কণ্ঠ সপ্তমে তুলে তিনি ডাক দেন।

ভৃত্য-খানসামা যে-যেখানে ছিল, দাঁড়িয়ে পড়ে প্রস্তর-মূর্ত্তির মত। এমন কণ্ঠস্বর কদাচিৎ শোনা যায় হয়তো। যখন রাজাবাহাদুর মারমূর্ত্তি হয়ে ওঠেন তখনই শোনা যায়। নচেৎ নয়। কালীশঙ্করের চীৎকারে সন্ধ্যার অন্ধকার চমকায়। বাতাস পর্য্যন্ত যেন থমকে থাকে। মহেশনাথের দেখা পাওয়া যায়, কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া যায় না। দালানের অদূরে এক দুয়োর আগলে দাঁড়িয়ে আছে মহেশনাথ। ব্যাঘ্রবিক্রম যাঁর, তাঁকে সামনাসামনি দেখেও হাসছে, মৃদু মৃদু।

—কি বক্তব্য মহেশনাথ ?

গম্ভীর কথা বললেন রাজাবাহাদুর। কয়েক পা এগোলেন। সুদীর্ঘ দালানের শেষপ্রান্তে মহেশনাথ। হাসছে। নীল বেলোয়ারী কাচের রঙীন আলো পড়েছে মহেশনাথের আপাদমস্তকে। কত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন রাজাবাহাদুর, মহেশনাথকে সমুখে দেখে যেন স্তিমিত হয়ে পড়েন। বলেন,—জবাব নাই কেন ?

মহেশনাথ কে ? রাজঅন্দরে যার গমনাগমন ?

মৃদু মৃদু হাসি হাসে মহেশনাথ। নীরব হাসি। রাজাকে সমুখে দেখেও তার মুখের হাসি মিলায় না। যেন ভয়লেশহীন। ঐ দূরে থেকেই একটি নমস্কারে অভিবাদন জানায় মহেশনাথ। বলে,—পেন্নাম লন।

—কি বক্তব্য তাই বল? অন্দরে কি চাও?

কালীশঙ্কর কেমন যেন পূর্ব্বাপেক্ষা নতস্বরে কথা বলেন। রাজার ক্রোধ যেন উবে যায় কর্পূরের মত। মহেশনাথকে চোখাচোখি দেখে মনে বুঝি তাঁর করুণার উদ্রেক হয়। দুই হাতের কঠিন মুষ্টি নরম হয়ে যায়। অধিকক্ষণ যেন চোখ রাখতে পারেন না মহেশনাথের চোখে। যেন চোখ মেলে আর দেখতে পারেন না মহেশনাথকে। মনে যেন বিকার আসে।

যেন এক মূর্ত্তিমান বিভীষিকা, এমনই ভয়াবহ!

মহেশনাথের বিকল অঙ্গ। শরীরের ডান দিকটা পক্ষাঘাতগ্রস্ত। অনড়, অচল। ডান চক্ষু নেই, শ্মশ্রুবহুল মুখে, রেখা আছে শুধু চোখের। ডান হাত ওঠে না। ডান পা চলে না। তবুও বিশাল বপু, প্রায় কাজল-কালো দেহবর্ণ। যেন অগ্নিদগ্ধ। রাজমহিষী দেখে তাই আঁৎকে উঠেছিলেন।

মহেশনাথকে দেখলে ভয় করে। কাছে এগোতে সাহস হয় না। দেখলে মন যেন বিকারগ্রস্ত হয়ে ওঠে। আপনি চোখ বন্ধ হয়ে যায়, চোখে যেন দেখা যায় না।

ডান পা চলে না, তাই মহেশনাথের হাতে অন্ধের যষ্টির মত বাঁশের লাঠির অবলম্বন। বাক্‌শক্তি নেই তেমন, অবশ জিহ্বা। মহেশনাথ কেমন যেন জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলে অদ্ভুত স্বরে। যারা তাকে চেনে না, জানে না, তারা বুঝবে না মহেশনাথের জড়ানো কথা।

তবুও হেসে হেসে কথা বলে। মহেশনাথ বললে,—আমি কি বাঘ না ভাল্লুক। রাণীমা আমাকে দেখেই ছুটে পালিয়েছেন।

রাজাবাহাদুর স্তব্ধ হয়ে থাকেন। ভীষণ ক্রোধ কোথায় মিলিয়ে যায়। সিংহগর্জ্জন আর থাকে না। বলেন,—তুমি কিছু বলবে মহেশনাথ? কিছু বক্তব্য আছে?

মহেশনাথ আবার বাম হাত কপালে তুললো। নমস্কার করলো। কেমন যেন ভীতিজনক হাসি হাসতে হাসতে বললে,—গণনা শেষ হয়েছে রাজাবাহাদুর। তিনি এক রকম ভালই আছেন।

—কে ?

সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলেন কালীশঙ্কর। স্পষ্ট তাকিয়ে।

মহেশনাথ বললে,—কেন, আমাদের রাজকুমারী। ছক কেটে দেখেছি রাজাবাহাদুর।

কালীশঙ্করের মুখে যেন খুশীর আভাস ফুটলো কথা শুনে। বললেন,—কি কি দেখলে মহেশনাথ ?

—দেখলাম ভালই। বললে মহেশনাথ,—কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। তিনি সুখেই আছেন।

আরও আনন্দিত হয়ে ওঠেন রাজাবাহাদুর। স্বস্তির শ্বাস ফেললেন তিনি। বক্ষমথিত দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন,—আহারের অন্ন আর পরিধেয় বস্ত্র পেয়েছে সে ?

—হাঁ রাজাবাহাদুর আমি দেখেছি ছক কেটে, সুখে-শান্তিতে সুস্থ শরীরেই আছেন। মহেশনাথের কথার সুরে যেন প্রগাঢ় বিশ্বাস। বললে,—রাহুর দশা কেটে গেছে। আমার দক্ষিণা ?

কালীশঙ্কর আবার স্বস্তির শ্বাস ফেললেন। বললেন,—মহেশনাথ, তুমি তোমার ঘরে যাও। তুমি পাবে তোমার প্রাপ্য। আমিই পাঠিয়ে দেবো তোমার সহোদরা শিবানীর মারফৎ।

—পেন্নাম।

মহেশনাথের বাম হাতের বংশদণ্ড শব্দ ঠুকলো দালানে।

দালানের দেওয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে এঁকে-বেঁকে চললো মহেশনাথ। খুশীর হাসি হাসতে হাসতে এগিয়ে চললো।

মহেশনাথ কুশ্রী-কুরূপ, কিন্তু গুণী। কি এক গোপন আত্মীয়তার সম্পর্ক রাজগৃহের সঙ্গে—যা অনেকেই জানে না। মহেশনাথের সহোদরা রূপলাবণ্যময়ী শিবানী—কেউ যেন বিশ্বাসই করতে চায় না। তথাপি এ কথা না কি সত্য ! আকাশের চন্দ্র আর সূর্য্যের মতই সত্য।

আর দাঁড়াতে পারেন না রাজাবাহাদুর। এই টলো-টলো শরীরে।

ধীর পদচালনায় আপন কক্ষে ফিরলেন। চোখে আর মুখে যেন খুশী হওয়ার তৃপ্তি মাখানো। ওষ্ঠপ্রান্তে ক্ষীণ হাসি।

দু' জন ইরাণী নর্ত্তকী আজ আসবে। নাচঘরে নাচের আসর জমবে।

রাজাবাহাদুরের ওষ্ঠের ক্ষীণ হাসি স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। বললেন,—বড়রাণী, তুমি অযথা ভয় পাও। মহেশনাথ আর নাই, বিদায় লয়েছে।

শিউরে শিউরে উঠলেন রাজমহিষী। মাথায় গুণ্ঠন টানলেন। বুকের কাঁচুলী ওঠা-নামা করে ঘন ঘন। আরও কিছুক্ষণ এক ভাবে দাঁড়িয়ে রাজকক্ষ ত্যাগ করলেন রাজমহিষী। ভয়ে ভয়ে চললেন—খাসমহলে। শ্বাসগতি এখনও দ্রুত। মিনমিনিয়ে ঘামছে রাণীর সর্ব্বদেহ। হস্তপদ হিম হয়ে আছে যেন।

মহেশনাথের গণনায় অগাধ বিশ্বাস রাজাবাহাদুরের! মহেশনাথ যেন ত্রিকালদর্শী, ভবিষ্যদ্বক্তা। কালীশঙ্কর জানেন, মহেশনাথের কাছে গণনাকার্য্য অবিদ্যা নয়। মহেশনাথ দস্তুরমত শিক্ষা করেছে নিজ চেষ্টায়। আয়ত্ত করেছে গণনার রীতিনীতি, মন্ত্রতন্ত্র, ছকাছকি। জন্মলগ্ন সঠিক যদি হয়, যদি হয় নির্ভুল—মহেশনাথও নির্ভুল গণনা করতে পারেন!

ভৃত্য-খানসামা হাসাহাসি করে। ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপ করে মহেশনাথকে। রাজগৃহের কেউ কেউ নতুন নামকরণ করেছে মহেশনাথের, মহিষনাথ। তার কুশ্রী রূপের জন্য এই নাম দিয়েছে। আড়ালে-আবডালে এ নামেই তার পরিচয় রাজবাড়ীতে।

আহারের অন্ন আর পরিধানের বস্ত্র জুটেছে রাজকুমারী বিন্ধ্যবাসিনীর। সুস্থ শরীরে আছে। কত যেন নিশ্চিন্ত হলেন রাজাবাহাদুর, মহেশনাথের গণনাফল শুনে। ক্রোধ আর উত্তেজনায় কালীশঙ্করও ঘর্ম্মাক্ত হয়েছিলেন। টানাপাখার ঠিক নিচে দাঁড়িয়ে রাজাবাহাদুর হাঁকলেন,—খানসামা!

—জনাব!

অপেক্ষমান খানসামাও হাঁকলো ডাক শোনার সঙ্গে সঙ্গে। প্রবেশ করলো রাজকক্ষে। সেলাম ঠুকলো তকমাধারী। মাথা নত করলো সন্ত্রস্তের মত।

—স্নানঘরে যাবো। পোষাক বদল করবো। সাজসরঞ্জাম ঠিক রাখো।

—বিলকুল ঠিক আছে জনাব! সেলাম ঠুকে বললে খাসসামা। বললে, —আস্নানের পানি, বৈঠকের পোষাক, সব কুছ ঠিকঠাক হুজুর!

হঠাৎ যেন মনে পড়লো, সন্ধ্যা যে উৎরে যায়! শঙ্খধ্বনি কানে আসে যেন। রজতদীপের উজ্জ্বল শিখায় কক্ষ আলোকময়, তাই হয়তো কালো আঁধার চোখে পড়েনি। মনে মনে সন্ধ্যাদেবীকে স্মরণ করলেন রাজাবাহাদুর। প্রণাম করলেন। গায়ত্রী মন্ত্র নীরব-উচ্চারণের সঙ্গে চললেন হামামঘরে। আহারের অন্ন আর পরিধানের বস্ত্র যখন পেয়েছে রাজকুমারী, তখন আর চিন্তার কি কারণ আছে! বন্দিনী, নির্ব্বাসিতা! তা হোক, তবুও যখন অন্নবস্ত্র—

আমোদরের বুক থেকে, না আমোদরের অপর তীরের বনজঙ্গল থেকে, বোঝা যায় না, থেকে থেকে দম্‌কা হাওয়া সোঁ-সোঁ উড়ে আসছে। বিস্তীর্ণ তীরভূমি জনশূন্য। হাওয়ার তীব্র বেগে গাছপালা লতা-পাতা হেলে দোলে। শাখায়-পাতায় জড়াজড়ির শব্দ আসে বাতাসে ভেসে। আমোদরের অপর তীর থেকে যেন ঘন অন্ধকার আসে, জটলা পাকিয়ে। আর আসে মশককুল ঝাঁকে ঝাঁকে।

গড়-মান্দারণ কি এমন মন্দ স্থান! শালগ্রামশিলাকে প্রণাম সেরে নিজ কক্ষের এক ভগ্ন পালঙ্কের উপর বসেছিলেন রাজকুমারী। তাঁর মুখ যেন হর্ষ-উৎফুল্ল! কক্ষমধ্যে জ্বলছে মাটির প্রদীপ। বিন্ধ্যবাসিনীর সম্মুখে মুকুর, যদিও বেশভূষার কোন বালাই নেই। রাজকুমারী দর্পণাভ্যন্তরে মুহূর্ত্ত জন্য নিজ প্রতিমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করলেন। রেশমের মত ঘন-কালো কোঁকড়া কেশরাশিতে কোন বিন্যাস নেই, বিশাল চোখে নেই কজ্জলপ্রভা, অধর তাম্বুলহীন, নিরাভরণ দেহ। রাজকুমারী মুকুরে নিজ লাবণ্য দেখে ঈষৎ হাসলেন। ভাবছিলেন, গড়-মান্দারণ কি এমন মন্দ জায়গা! গড়-মান্দারণের আলো-বাতাস-জলে কত মধু। দর্পণে দেখেন রাজকুমারী, আবার দেখেন মুহূর্ত্ত জন্য। দেখেন নিজের কোমল-চঞ্চল দুই আঁখি, মেঘের মত চোখের

পল্লব, নিবিড় ভ্রূযুগল,—দেখেন প্রস্তরশ্বেত গ্রীবা, কোমল বাহু, পদ্মারক্ত করপল্লব,—মুক্তাহার-প্রভানিন্দী পীবরোন্নত বক্ষ।

পালঙ্ক থেকে গাত্রোত্থান করলেন সুন্দরী। কক্ষলগ্ন এক অলিন্দে পৌঁছে অনিমেষ দৃষ্টিতে তাকালেন অন্ধকারে। দিনমানে অলিন্দের চাতালে দাঁড়ালে দেখা যায় আসমানদীঘির পরপার।

কাক-চক্ষু দীঘির জল, আঁধারের সঙ্গে যেন এক হয়ে গেছে আসমান। কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, শুধুই নিরবচ্ছিন্ন কালো অন্ধকার। আলোর চিহ্ন মাত্র নেই। বিন্ধ্যবাসিনী ব্যাকুল দৃষ্টিতে দেখেন। কেমন এক উগ্র মানস-চাঞ্চল্যে মুখ যেন উৎফুল্ল। রাজকুমারী দেখেন আর ভাবেন—দীঘির অন্য তীরের চতুষ্পাঠীতে কি রাত্রে আলো জ্বলে না ছাই!

ইষ্টি-কুটুম কারও আর জানতে বাকী থাকলো না।

আপ্ত-পর জানাজানি হয়ে গেছে। পাড়া-পড়শীর মধ্যে কানাকানি হয়েছে, স্বর্ণ-পিঁড়ে থেকে আঁস্তাকুড়ে ঠাঁই হয়েছে অপ্সরা রাজকুমারীর। অতি-সুন্দরীর বর মেলে না, অতি-ঘরন্তীর ঘর মেলে না—অধিক বাতীর আলোয় শুধুই চোখ ঝলসায়। রাজমাতার বুকে যেন তুষের আগুন জ্বলে। দিনের আলো স্তিমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজবাড়ীতে আসে পড়শী-রমণী, বিলাসবাসিনীর দোসর যত। পাড়াবেড়ানীর দল জড় হয় রাজমাতার মহলের উঠোনে। ভাল-মন্দ শুধোয়, কুশল জিজ্ঞেস করে। থেকে থেকে উসকে দেয় তুষের আগুন। প্রবোধ বাক্যি শুনিয়ে কোথায় সান্ত্বনা দেবে বিলাসবাসিনীকে, নিবিয়ে দেবে তাঁর বুকের আগুন, ভুলিয়ে রাখবে গালগল্প শুনিয়ে—তা নয়। ছাই-চাপা আগুনে ফুঁ দেয় আরসি না বঁড়শীর মত ঐ খল পড়শীরা। রাজমাতার যতেক সই—সাগর, মকর, গঙ্গাজল, বেলফুল, আমসত্ব। কেউ কেবল পাতানো সই।

ঘাটে গিয়েছিলেন রাজমাতা। ক'টা ডুব দিতে গিয়েছিলেন।

উঠে দাঁড়ালে পায়ে ভর সয় না। কোমরে-কাঁকালে বাতের ব্যথা। বেতো

পা টনটনিয়ে ওঠে। রক্তের উর্দ্ধ-চাপে কপাল টিপ-টিপ করছে, দুই চোখ রক্তবর্ণ। মাথায় জল না পড়লে, অবগাহন স্নান বিনা এ কষ্টের লাঘব হবে না। দাসীদের কাঁধ ধ'রে ধ'রে, ধীরে ধীরে ঘাটে গিয়েছিলেন বিলাসবাসিনী। কোন রকমে ক'টা ডুব সেরে ফিরে এসেছেন ভিজে-কাপড়ে।

খাসমহলের উঠোনে পাড়াবেড়ানীদের দেখতে পেয়ে প্রথমে বিরক্ত হয়েছিলেন মনে মনে। পোড়ামুখ দেখাতে বুঝি বা লজ্জা পেয়েছিলেন! অন্তঃকরণটা জলে গিয়েছিল আরেক বার। বিলাসবাসিনী মরছেন নিজের জ্বালায়, শরীরও বইছে না আর। সইদের দেখে তবু মুখে হাসি ফোটালেন অতি অল্প। বললেন,—পান-তামাক খাও ভাই! আমি আসি ভিজে কাপড় ছেড়ে।

দরদ যেন উথলে ওঠে আয়নার মত ঐ খল-পড়শীদের।

কাজ এগিয়ে দিতে বসে কেউ কেউ। হাতের কাজ সেরে দিয়ে যাবে উপ্‌রিপড়া হয়ে। কেউ জাঁতা ঘুরিয়ে চলে ঘ্যানর ঘ্যানর। ডাল-কড়াই ভেঙে গম পিষে দিয়ে যাবে। কেউ চাল বাছতে বসেছে। ধান আর চাল আলাদা করছে। কারও হাতে বা কুলো, নাচিয়ে নাচিয়ে ধুলো ফেলছে মশলাপাতির।

কে ঢুকেছে ঢেঁকিশালে। ঢেঁকির মুখে বসেছে। ধান ভাঙছে।

কে মকর আর কে বেলফুল! ফুলের মতই পবিত্র কে, আর কে বা মকরের মত ডুবে ডুবে জল খায়!

রাজমায়ের দুঃখের ভাগীদার আছে কেউ কেউ। আবার এমন আছে, যারা, কাজের ফাঁকে ফাঁকে আপন আপন কোঁচড় ভরছে। কোল-আঁচলে ফেলছে চাল-ডাল-মশলা।

উঠোনে পানের ডাবর বসিয়ে দিয়ে গেল এক দাসী। রূপোয়-বাঁধানো খেলো হুঁকো ধরিয়ে দিয়ে গেল আরেকজন। জলের ঘটি আর পিকদানি বসিয়ে দিয়ে গেল।

উঠোনের তিন দিকে উচ্চ প্রাচীর। এক দিকে রাজমায়ের মহল।

পাঁচিলের বাধা মানেনি ফুল ফলের গাছ। অনধিকার প্রবেশের [illegible]

শাখা মেলেছে পাঁচিলের বাইরে থেকে। আমের শাখায় কচি কচি আম। কলার গাছে কলার ঝাড়। পেঁপের গাছে পাকা পেঁপে।

ডুবু ডুবু সূর্য্যের আঙরা-লাল রঙ। গাছে গাছে পাখীর কিচির মিচির। যেন থেমেও থামে না। রাজমায়ের উঠোন জাঁতা-ঘোরানো কুলো-নাচানোর শব্দে যেন মুখর।

আমের শাখায় হনুমানের ছা। কাঁচা আম দাঁতে কাটছে আর ফেলছে উঠোনে। রাজমায়ের মহলে।

—চলতে-ফিরতে জোর পাই না পায়ে। নড়তে-চড়তেই বেলা পুইয়ে যায়।

সত্যস্নাতা বিলাসবাসিনী কথা বললেন। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন দালানের চাতাল থেকে। অদৃশ্য হয়েছিলেন, দেখা দিলেন আবার। মেঘ-ওড়ানো বাতাস এসে রাজমাতার তসরবস্ত্রের লুটানো আঁচল উড়িয়ে দেয়। পিছু পিছু আসে পরিচারিকা ব্রজবালা। ব্রজর হাতে পশমের আসন।

হাতের কাজ ছেড়ে ফিরে তাকালো পড়শী-মেয়েরা। জাঁতা থেমে গেল কুলোর নাচন থামলো।

থেলো হুঁকোয় টান দিয়ে যায় সাগর। এক হাতে নাকের নৎ ধরে তুলে তামাক খেতে থাকেন। সাগর এয়োস্ত্রী। তাঁর টাক-পড়া মাথায় সিঁদুরের রেখা। বিলাসবাসিনীর কণ্ঠ কানে যেতেই তিনিও হুঁকো নামালেন মুখ থেকে মুখ ফেরালেন। বললেন,—আমার সাগরের মুখ বিষন্ন কেন?

ব্রজবালা উঠোনের মধ্যিখানে আসন পেতে দিয়ে গেছে।

রাজমাতা আসনে বসলেন না। উঠোনের দালানে বসলেন, পা ঝুলিয়ে পুকুর-ঘাটে যেতে আসতে হাঁফ ধরে ঘাম ঝরে গেছে। ঘামে-ভেজা মুখ আঁচলে মুছলেন রাজমাতা। টেনে টেনে শ্বাস নিলেন কয়েকটি। হাঁফের কষ্ট একটু কম হওয়ার পর বললেন,—মন ভাল নাই। সাগর কি আর সেই সাগর আছে? কত জ্বালা সাগরের!

—রাজকুমারী সোয়ামীর ঘর খোয়ালে শেষে ?

কথা বলতে বলতে মুখে আবার হুঁকো তুললো সাগর। নাকের নৎ তুলে ।'রে হুঁকোয় মুখ ঠেকালো।

আবার যেন ঘামতে থাকেন বিলাসবাসিনী। কালবোশেখী হাওয়া চলে, তবু তাঁর কপাল ঘেমে ওঠে। মুখে যেন কথা আসে না। খানিক গম্ভীর াকতে থাকতে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বুক-ভাঙা।

পড়শী হ'লেও পাতানো সই। তাঁরা কোথায় সান্ত্বনা দেবে, গালগল্প শুনিয়ে কাথায় ভুলিয়ে রাখবে রাজমাতাকে। তুষের আগুন উসকে দিতে আসে— হাই-চাপা আগুনে ফুঁ দিতে আসে।

বিলাসবাসিনী বললেন,—ধর্ম্ম রেখে কর্ম্ম করে মানুষ। অধর্ম্মের রেহাই নাই।

সাগর বললে হুঁকো সরিয়ে,—লাখো কথার এক কথা কইলে রাজমাতা। র্ম্মের জয়, অধর্ম্মের ক্ষয়। রাজকুমারীর অপরাধ কি ?

—অপরাধ! বললেন রাজমাতা,—বিন্দুর কোন দোষে নয়। কেষ্টরাম নদৌলত দাবী করেছে। কথা বলতে বলতে একটি দীর্ঘশ্বাস পড়লো, বললেন,—যাদের সম্পত্তি তারা ছাড়বে কেন ? ছোটকুমার তো কিছুতেই াজী হয় না। ছাড়তে চায় না এক কড়াক্রান্তি।

সইয়ের দল হাতের কাজ বন্ধ করে। ফ্যালফেলিয়ে তাকিয়ে থাকে। জাঁতা ঘারানো আর কুলো নাচানোর শব্দ কখন থেমে গেছে। একে একে উঠে এসে ঘিরে বসলো বিলাসবাসিনীকে।

ডাবর থেকে ক' খিলি পান মুখে পুরলো মকর। পান চিবোতে চিবোতে বললে,—কুলীন যেথা হয় জ্ঞাতি, কোঁদল সেথা দিবারাতি।

ব্যথাহত হাসি হাসলেন রাজমাতা। আকাশ পানে চোখ তুলে বললেন,— সই রোগেই ঘোড়া মরেছে। কুলীনকন্তের কপাল যে আটে-পিঠে বাঁধা, কি করি তাই বল' ?

সাগর বলে,—কানে আসে কত কথা। জামাই কেষ্টরাম শুনি নাকি চার াঁচ গণ্ডা বে করেছে ?

বিদ্রূপের কটুহাসি ফুটলো মকরের পান-রাঙা মুখে। হেসে হেসে বললে,—কুলীন-সমাজের আচার্য্যি হয়েছেন জামাই ?

বাতাসে ঝড়ের পূর্ব্বরাগ। সোঁ সোঁ হাওয়া চলেছে। গাছের মাথা দুলছে। শুকনো পাতা খড়মড় করছে। উড়ো পাখীর পালক উড়ছে। তবু মিন-মিন ঘামছেন বিলাসবাসিনী। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটেছে।

সইদের এক এক কথায় তাঁর সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠছে যেন। আকাশে চোখ তুলে ব'সে থাকেন রাজমাতা। জপের ঝুলি হাতে ধরিয়ে দিয়ে গেল ব্রজবালা। জপের মালা। ১০৮ রুদ্রাক্ষর মালা।

সাগর বললে,—তবে তো বেশ হয়েছে। ঘুঁটেকুড়ুনীর বেটা ভাঙা গাঁয়ের মোড়ল!

ফিক ফিক হাসি হাসলো মকর। তাচ্ছিল্যের হাসি। বললে,—ধনদৌলত আর দাবী করবে না কেন? ঘুঁটেকুড়ুনীর বেটা আবার মোড়ল হয়েছে হাঁটতে না পেরে পালকি চেয়েছে।

কাণে যেন বিষ ছড়ালো বিলাসবাসিনীর।

কারও কোন কথার জবাব দেন না তিনি। কৃষ্ণ-নীল আকাশে চোখ মেলে বসে থাকেন পাষাণমূর্ত্তির মত। বুকের আগুন, তুষের আগুন ধিকি-ধিকি জ্বলতে থাকে। ইচ্ছা হয় লোকজন ডাকিয়ে খেদিয়ে দেওয়াতে এই পড়শীদের

—সাঁঝ ফুরুলে জপ হবে না আর। যাই, পুজোর ঘরে যাই।

কথা বলতে বলতে এধার-সেধার দেখলেন বিলাসবাসিনী। বিশাল দু' চোখের দৃষ্টিতে কা'কে যেন খুঁজলেন।

—ব্রজ! ব্রজবালা!

দম ফেলবার ফুসরৎ পায় না ব্রজ। উদয়াস্ত লেগে থাকতে হয় তাকে কাজ আর কাজ। হুকুমের উপর হুকুম। ফাইফরমাসের যেন শেষ নাই রাজ মায়ের। ব্রজবালাকে একদণ্ড স্থির থাকতে দেন না। চোখের অন্তরালে গেলেই যেন চোখে আঁধার দেখেন।

ব্রজ ছিল আড়ালেই। দালানের কোন্ এক কুঠরীতে সিঁদিয়েছিল

জল-কুঠরীতে গিয়ে ঢকঢকিয়ে এক ঘটি জল খায় ব্রজবালা। কতক্ষণ মুখে জল পড়েনি কে জানে!

জল-কুঠরীতে জলের জালা, সারি সারি।

জলায় যখন জল থাকে না, ইঁদারা যখন শুষ্ক হয়ে যায়, মাঠে যখন ফাট ধরে,—তখন খাল-বিল মরুর আকৃতি ধরে, পুকুরের পৈঠা সার হয়, কূয়োর শুধু ক্যাদরানি—জল তখন মায়া-মরীচিকা। আকাশে চাতকপাখী ডেকে ডেকে ফেরে। কাক-কোকিল টা-টা করে। বনের পশু আর বসতি মানে না। এক আঁজলা জলের অভাবে কত কার শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়!

তবুও এক ফোঁটা জল বর্ষায় না! অনাবৃষ্টির আকাশ আর অজন্মার আকাল আসে। আসে দুঃখের রাত! জলাভাবে মানুষ মরতে থাকে কুকুর বেড়ালের মত। সেই প্রচণ্ড উষ্ণদিনের আশঙ্কায় পানীয় জলের সঞ্চয় থাকে জল-কুঠরীতে।

কুঠরী থেকে বেরিয়ে সাড়া দেয় ব্রজ। বলে,—আসি গো আসি হুজরণী!

—আমাকে ধরাধরি না করলে কেম্‌নে উঠি!

রাজমাতা বিরক্ত স্বরে কথা বললেন।

—যাই গো যাই। বললে ব্রজবালা,—তুমি যেন উঠতে যেও নি হুজরণী!

বিলাসবাসিনী ভারী গলায় বললেন,—ভাঁড়ারের সামগ্রী ভাঁড়ারে তোলা হোক। ব্রজ, দাসীদের তোলাতুলি করতে বল্‌।

সইয়ের দল প্রমাদ গণে। রাজমাতার কথা শুনে ভয় পায় যেন। সঙ্কোচের সলজ্জ চাউনি ওদের চোখে।

ছোট মুখে বড় কথা সহ্য করতে পারেন না বিলাসবাসিনী। মন ব্যাজার হয়। মেজাজ খিঁচড়ে যায়। সইরা বিদায় হ'লে তবুও হয়তো জ্বালা জুড়োয় খানিক। রাজমাতা যা নয় তাই বলতে পারেন তাঁর নিজের জামাইকে। তাঁর সমুখে ব'সে, তাঁর ভিটেয় ব'সে তাঁরই আপন-জনকে অকথা-কুকথা বলবে কি না পাড়া-পড়শী!

কৃষ্ণরামকে যা বলবার বলতে পারেন স্বয়ং তিনি। তারা বলবার কে— যাদের চালচুলোর বালাই নেই, মরণের ঠাঁই নেই ?

ব্রজর কাঁধে হাত রেখে দালান থেকে উঠলেন বিলাসবাসিনী। কারও প্রতি দৃক্‌পাত না ক'রে পা চালালেন ধীরে ধীরে।

তসরের কাপড়ে রাজমাতাকে দেখায় অতি পবিত্র। বিরল-কেশ এখন, তবুও পিঠে ছড়ানো ভিজে-চুলের রাশি থেকে টুপ টুপ জল পড়ছে।

সইয়ের দল একে একে স'রে পড়ে মানে মানে। রাজমাতার যা মুখের আকৃতি হয়েছে, তাঁর সমুখে এখন দাঁড়ায় কার সাধ্য !

কপালজোড়া সিন্দুর-ফোঁটা যেন আকাশের। ডুবু-ডুবু সূর্য্যের আঙরা-লাল রঙ! তা হোক, তাল তেঁতুল বাবলা মাদার এখনই যেন কত আঁধার সৃষ্টি করেছে। সপ্তগ্রামের কালো মাটি আর স্পর্শ পায় না সূর্য্যালোকের। বটের ঝুরি নেমেছে। দেবদারু শাখা ছড়িয়েছে কত দূর! কোথায় মাথা তুলেছে আম জাম লিচু! বেলা দ্বিপ্রহরেও আলো হয় কি না হয়।

বড়গাছের ফল কম, অধিক ছায়া। বড়গাছের তলায় বাস, ডাল ভাঙলেই সর্ব্বনাশ! বড়গাছে ঝড়। তাই বসতি আছে কি না আছে মানুষের পদচিহ্ন নেই সাতগাঁয়ের এই ছায়াকালো বনাঞ্চলে। আছে যত বন্যপশু, সরীসৃপ, কীট-পতঙ্গ।

পথের রেখা আছে। পথে মানুষ নেই।

কত কালের পায়ে-চলা পথ কে জানে! এখন যাওয়া-আসা নেই মানুষের শুকনো মেঠো-পথে বাঘের থাবার দাগ। ঘোড়ার খুরের রেখা ধূলিমলিন পথে

ঢাকের বাদ্যি হঠাৎ বাজলো বনপথে। কাড়া-নাকাড়ার সঙ্গে টেমটেমির উঁচু-নীচু আওয়াজে গাছের পাখী যেন ভয়ার্ত্ত হয়ে উঠলো। বনের পশু ব্যগ্র দৃষ্টি হানে চতুর্দ্দিকে।

ঝড় আসছে যেন। বাঁধ-ভাঙ্গা বান আসছে।

আকাশ-বাতাস-বন কাঁপিয়ে, এমন বাজনা বাজিয়ে, কে আসছে কে! জোরালো এক শব্দের তরঙ্গ আসছে।

সর্ব্বাগ্রে দুই অশ্বারোহী। সশস্ত্র ও নিশানাধারী। মধ্যাহ্ন-সূর্য্য অঙ্কিত রেশমের গৈরিক পতাকা তাদের হাতে। কৃষ্ণরামের কীর্ত্তিপতাকা। সপ্তগ্রামের দুর্গম পথে চলেছেন কুলাচার্য্য কৃষ্ণরাম। হস্তিপৃষ্ঠে চলেছেন। সারি সারি অস্ত্রধারী অশ্বারোহী পিছু পিছু চলে। তাদের কারও কারও হাতে পান-পত্রাকৃতি বিচিত্র অভয়। সকলেরই বাম কটি থেকে সকোষ তীক্ষ্ণ তরবারি ঝুলছে।

অশ্বসারির পেছনে খাসবরদার, আসাবরদার, চোপদার, জমাদার, পদাতিক সিপাহী। মশাল হাতে মশালচি।

সপ্তগ্রামের চার ক্রোশ উত্তরে পরমানন্দ রায়ের বসবাস। পরমানন্দ নৈকষ্য কুলীন, প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী। রায়ের দুই কন্যা বর্ত্তমান। দু'টি অনূঢ়া।

কনে দেখতে চলেছেন জমিদার কৃষ্ণরাম।

সুরূপা না কুরূপা দেখতে চলেছেন। সুলক্ষণা না কুলক্ষণা। কৃষ্ণরাম বধূ-রূপে ঘরে আনবেন দু'জনাকে—যদি না মনে ধরে। আর যদি চোখে লাগে, হয় যদি ঠিক মনের মত।

মনুষ্যকণ্ঠের চিৎকার ও যুগপৎ বাদ্যধ্বনি।

—জমিদার কৃষ্ণরামের জয়!

সম্মিলিত জয়ধ্বনির সঙ্গে জগঝম্প আর তাসাকড়কা বেজে উঠলো। গাছের শাখে ভীরু-পাখী পাখা ঝাপটালো। অন্ধকার বনের গহ্বরে ছুটলো বরাহ, শৃগাল, নেকড়ে। আত্মগোপন করলো বনের গহনে।

সসাজ হাওদার পরে কৃষ্ণরাম। কনে দেখতে চলেছেন বন-বাদাড় কাঁপিয়ে।

তাল তেঁতুল বাবলা মাদারের কালোছায়া আঁধার ভেদ করে চলেছে জমিদারের সাঙ্গোপাঙ্গ। শুষ্ক মেঠো-পথে অশ্বের পদধ্বনি উঠছে।

কৃষ্ণরাম ইতি-উতি দেখেন চোখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে। মুখে হাসি ফুটিয়ে। মনের আনন্দে চলেছেন যেন। কনে দেখার আনন্দে। নিকষ কুলীন পরমানন্দ রায়ের দুই কন্যা, কেমন কে জানে? সুশ্রী না বিশ্রী, গৌর না কৃষ্ণ; পূর্ণিমার ভরাজোয়ার না মরাগাঙ!

ঠোঁটের কোণের চাপা হাসি হঠাৎ অদৃশ্য হয়। কি যেন দেখলেন আর থ হয়ে গেলেন। কৃষ্ণরামের চোখে স্থির দৃষ্টি। এত আগ্রহে কি দেখছেন!

শুকনো পাতার খড়খড়ানি কানে আসে। একটি খেঁকশিয়ালি, বন থেকে বেরুলো আর দৌড় মারলো লেজ উঁচিয়ে। ভয়ে পালিয়ে গেল। খেঁকশিয়ালির মুখে ঝুলছে কি এক শিকার। হয়তো সগ্য মারা।

জমিদার কৃষ্ণরামের স্থির চোখের বিস্ময় কাটে না যেন। মুখের আনন্দ-হাসি মিলিয়ে গেছে। দৃষ্টি প্রসারিত করলেন কৃষ্ণরাম, ঐ তীরগামী অরণ্য-চারীর পিছনে। খেঁকশিয়ালির মুখে কি দেখলেন কৃষ্ণরাম!

বললেন,—মাহুত, হাতী থামাও!

হঠাৎ কথা বললেন কুলাচার্য্য। কেমন যেন কড়া হুকুমের সুরে বললেন।

রঙ্গলালের অশ্ব পাশে এসে দাঁড়ালো। রঙ্গলাল বললে,—এই শ্বাপদসঙ্কুল জঙ্গলে কি প্রয়োজন ?

—তিষ্ঠ তিষ্ঠ! বললেন কৃষ্ণরাম। আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। হাতী আর হাওদা ন'ড়ে উঠলো বারেক। বললেন,—কাছাকাছি কি মনুষ্যালয় আছে?

রঙ্গলাল বলে,—আপাতদর্শনে মনে হয় না তেমন। তবে—

—সিপাহীদের তল্লাসী করতে হুকুম দাও।

কেমন যেন গম্ভীর কণ্ঠে কৃষ্ণরাম বললেন। খেঁকশিয়ালী তখন কোথায় গা ঢেকেছে, আর দেখা যায় না।

জগঝম্প আর কাড়ার বাদ্যি থেমে যায়। টেমটেমি আর বাজে না। থেকে থেকে শিহরণ আসে। খেঁকশিয়ালির মুখের শিকার দেখে কৃষ্ণরামের মত জনও শিহরিত হন। চোখের পলক পড়ে না। অঙ্গ যেন অবশ হয়ে আসে। অশ্বারোহী সিপাহী আর পদাতিক, মুক্ত তরবারি উঁচিয়ে গভীর জঙ্গলের অভ্যন্তরে সন্ধান করতে যায়। জমিদার কৃষ্ণরাম অঙ্গুলি সঙ্কেতে দিক-নির্দ্দেশ ক'রে মাত্র।

রঙ্গলাল ও অন্যান্য সহযাত্রী বিস্ময়ে হতবাকের মত ব'সে থাকে। লক্ষ্য করে জমিদারের হাব-ভাব। কৃষ্ণরাম যেন রুদ্ধশ্বাস হয়ে আছেন।

খেঁকশিয়ালির মুখের শিকার কি মনুষ্যের দেহাংশ! কি দেখতে কি খেলেন কে জানে!

নিমেষের মধ্যে টগবগিয়ে ফিরলো এক অশ্বারোহী! উঁচানো তরবারি কোষে পুরতে পুরতে বললে,—জনাব আছে ক' ঘর ছাউনি! হুকুম না মিললে ছাউনির ধারে যেতে ভরসা হয় না।

হাতী ততক্ষণে চার পা মুড়ে বনের পথে ব'সে পড়েছে।

হাওদা থেকে নামতে উদ্যোগী হ'লেন কৃষ্ণরাম। হাওদার হাতল ধ'রে এক লম্ফে নামলেন মাটিতে। বলেন,—চল যাই, দেখি গিয়ে, কে কোথায় মরে!

গাছের পাখীর কিচির-মিচির আর যেন কানে আসে না। তাল তেঁতুল বাবলা মাদারের কালো আঁধারে থেকে ভয় হয় যেন ডাকাডাকি করতে! দিনের পাখী অন্ধকারে ডরায়, আলো না ফুটলে আর ডাকবে না। দূরে দূরে কোথায় কোন্ আড়ালে লুকিয়ে ডাকে রাতের পাখী। বাবলার বনে প্যাঁচা ডাকছে থেকে থেকে। বিশ্রী কর্কশ ডাকের প্রতিধ্বনি ওঠে দিকে দিকে।

মশালের আলোয় বনাঞ্চলে যেন আগুন ধরলো। দাবানল জ্বললো যেন! গাছে আগুন ধরলো যেন। শুকনো পাতার স্তূপে মশাল ধরিয়েছে মশালচি। আগুন ধরিয়েছে উড়োপাতার জঞ্জালে। আঁধারে আলো জ্বালিয়েছে।

গোলপাতার ছাউনি ক' ঘর। যেন পড়ো পড়ো। ক' ঘর ছাউনি গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে আছে কোন ক্রমে। বাঁশ-বাখারির কপাট-দুয়োর যেন জরাজীর্ণ, ঘুণ-ধরা। উইয়ের ঢিপি ছাউনি ক'টার আশ-পাশে।

মনুষ্যের পদশব্দ হয়তো কানে পৌঁছয়। মশালের কাঁপা-কাঁপা আলোয় দেখা যায়, আরও ক'টা শৃগাল—ছাউনির মুক্ত দুয়োর ভেদ করে, চম্পট দেয় যে যেদিকে পারে। বাবলা বনে আলো কেন আবার! বেণার বনে মুক্তো! খড়োচালায় ঝাড়লণ্ঠন!

কৃষ্ণরামের যেন ভয়-ডর নেই। বেপরোয়ার মত সর্ব্বাগ্রে এগিয়েছেন। পায়ের তলে শুকনো পাতা খড়খড় করে। গোলপাতার ছাউনিতে আছে যেন

যখের গুপ্তধন। শ্বাপদসঙ্কুল জঙ্গল, খেয়াল নেই—কি এক আবিষ্কারের নেশা যেন পেয়ে তাঁকে!

সিপাহী রাহী কারও মুখে কথা নেই। যেন প্রতিবাদের ভাষা নেই, বাধা দেওয়ার শক্তি নেই। শুধু তাদের শ্বাসত্যাগের শব্দ পাওয়া যায়। কৃষ্ণরামকে অনুসরণ করে তারা।

কোন্ এক সিপাহীর তরবারির ঝনৎকার শুনে ফিরে দাঁড়ালেন কৃষ্ণরাম। দেখলেন এক বৃক্ষশাখা থেকে এক ঝুলন্ত অজগর! মশালের তীব্র আলোয় দেখা যায়, সরীসৃপের তৈলচিক্কণ আকৃতি—সাপের ভয়াল মুখ-ব্যাদান।

সিপাহী তরবারির আঘাত হানে অজগরের দেহে। খানিক দূরে দাঁড়িয়ে ক্ষুরধার তলোয়ার চালায়।

আরেকবার শিউরে উঠলেন কৃষ্ণরাম। সাপের ফোঁসফোঁসানিতে বনজঙ্গল অস্থির হয়ে ওঠে। বাসার পাখী পাখা ঝাপটায়। একজোড়া বুনো রামপাখী ঝোপের ঝাড় থেকে বেরিয়ে আরেক ঝোপে লুকিয়ে পড়লো। দেবদারু আর বাবলা গাছের শাখায় শাখায় ঝুলন্ত বাদুড়ের ঝাঁক, উড়ে পালালো দলে দলে। ক্ষণেক থেমেছিল দূরের ক্ষুধার্ত্ত প্যাঁচা। আবার ডাক ধরলো একে একে। যত আঁধার নামে তত যেন সুখ। অন্ধকার যত ঘন হয় তত দৃষ্টি খুলবে চোখের। একদৃষ্টিতে শিকার ধরা পড়বে; ছুঁচো-ইঁদুর চোখে পড়বে।

তলোয়ারের ঘায়ে ময়াল মরে না। এক অশ্বারোহীর বর্শা বিঁধলো অজগরের বুকে। দেহে যত শক্তি আছে সবটুকু দিয়ে বর্শা চালালো তীরের বেগে।

হাতের বর্শা হাতে ফিরে আসবে। অস্ত্রের মায়া ত্যাগ করলো অশ্বারোহী। যেমনকার তেমনি রইলো অজগরের বুক-ফোঁড়া বর্শা! শূন্যে ঝুলে-পড়া ময়াল, যন্ত্রণায় অধীর হয়ে শূন্যে ছোবল চালাতে থাকে। অসহ্য অস্ত্রাঘাত থেকে যদি মুক্তি পাওয়া যায়।

ধারালো ফলা বর্শার তীরমুখের। সূচ্যগ্র। ঐ ভয়ঙ্কর অজগর অস্ত্রবিদ্ধ

হওয়ায় শ্বাস ফেললেন যেন কৃষ্ণরাম। বললেন,—আইস, যাই দেখি কিমাশ্চর্য্যম্ অতঃপরম্!

উইয়ের ঢিপি। ওকড়া, দুব্বোঘাস আর বিছুটি এখানে সেখানে। ধুতরোর ঝোপ। ফণী-মনসার ঝাড়। শুকনো পাতার স্তূপে বনভূমির মাটি আর নজরে পড়ে না।

আদাড়ে-কচুর মিশ্‌কালো জঙ্গলের ওপার থেকে সাঁই-সাঁই দমকা হাওয়া আসছে। এক করালকালো অদৃশ্য ছায়ামূর্ত্তি যেন, এলোকেশ ছড়িয়ে গিলতে আসছে। আদাড়ে-কচুর জঙ্গলের ওদিকে আছে সাতগেঁয়ে ভূতের বাসা। ভূতকে ভূতে ভয় পায় না, তাই আছে অনেকগুলো। ভূত আর পেত্নী। প্রেত আর প্রেতিনী। আর ঝাঁক-ঝাঁক জোনাকি।

ভূতুড়ে কাণ্ড বোঝা দায়! রঙ্গলাল নড়েও না চড়েও না। রাম-নাম আওড়ায়। জমিদার কখন ফেরেন, সেই আশায় পথ চেয়ে থাকে। নেশা কেটে যায় মদিরার।

গোলপাতার ছাউনিগুলো গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঘর, মাটি আঁকড়ে আছে। ঘরের দাওয়ায় ভাঙ্গাফাটা মাটির হাঁড়ি-কুঁড়ি, পোড়া মাটির। কোদাল, ঝাঁটা আর লাঙলের ফলা।

দমকা বাতাসে হাঁড়িতে হাঁড়িতে ঠোকাঠুকি হয়। গাছপালা দুলতে থাকে! পাতার মর্মরাণি অস্পষ্ট গুঞ্জনের মত শোনায়!

আশ্চর্য্যই বটে!

দাওয়া পেরিয়ে ঘরের দুয়োরে পৌঁছে আর এগোতে পারলেন না কৃষ্ণরাম। অনুচর সিপাহী বললে,—জনাব ফিরে আসেন। দুর্ভিক্ষের আসামী ওরা। ওলাউঠো রুগী।

ক্ষুধা আর তৃষ্ণার অনলে-পোড়া শীর্ণকায়দের মুখে কথা নেই। মশালের উজ্জ্বল আলোয় ওদের কুঠুরে-চোখে আলোর বিন্দু ফুটলো। কত কালের পরে যেন আলো দেখেছে চোখে।

মৃত শিশু মৃত জননীর বুকে আঁকড়ে আছে! অন্ন কাঙালের মরণ হয়েছে। মরতে বসেছে তাই চেয়ে আছে যেন ঘরপানে। ঘরের পুরুষের মরণকাল উপস্থিত। চিৎ হয়ে পড়ে আছে নির্জীবের মত। মরণকালে হরিনামের কেউ নেই আর! মরামানুষ কথা কয় না! স্ত্রী-পুত্র শব মাত্র।

খেঁকশিয়ালির দল এসেছিল, মরা টেনে নিয়ে যেতে। শেষকৃত্য করতে।

পুরুষ যতক্ষণ পেরেছে বাধা দিয়েছে, শিয়ালের পালকে রুখেছে। হাতের কাছে যা পেয়েছে তাই ছুঁড়ে ছুড়ে প্রতিরোধ করেছে। শেষকালে অনাহারে ক্লিষ্ট দেহে নড়নচড়নের শক্তি নেই আর। কোদাল, লাঙলের ফলা, হাঁড়িকুঁড়ি, ডেয়ো-ঢাকনা যা পেয়েছে ছুঁড়েছে! দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, কেটে গেছে নির্জলা উপোসে। আজ রাতে আর বোধ হয় রেহাই নেই, যমের হাত থেকে। খেঁকশিয়ালি পুরুষের একটি পা কেটে নিয়ে গেছে।

মরণ নিকটে যার কি করে ঔষধ তার।

কৃষ্ণরাম আরেক বার শিউরে উঠলেন মুমূর্ষুকে দেখে। অস্থিসার মৃতা জননীর বুকে মৃত শিশুকে দেখে। মরণের নেই যেন ধরণ।

—জল।

কৃষ্ণরামের একটি মাত্র কথা। উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনি ভাসলো।

সিপাহী বললে,—এই বনে-বাদাড়ে জল! কোথায় মিলবে হুজুর? জলার জলে বিষের পোকা।

হতাশার শ্বাস ফেললেন কৃষ্ণরাম! কপালের রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠলো। এই প্রথম দুর্ভিক্ষ দেখেছেন, আকালের মরণের পথের যাত্রীদের দেখেছেন।

ক্ষেতে ধান হয় না। জলে বাড়ে ধান, কিন্তু আকাশ জল দেয় না। ধানের তুল্য ধন নেই। ধান না হলে মান থাকে না, জান থাকে না। অকাল অজন্মায় মৃত্যু বৈ পথ নেই।

কৌতূহল, উত্তেজনা, রোমাঞ্চ—উবে যায় যেন কর্পূরের মত। গাছের পাতার খড়খড়ানি যেন আর ভাল লাগে না। কোথায় কারা মিহি সুরে

কাঁদে। নাকের সুরে। গোঙানি-কান্না কানে আসে কৃষ্ণরামের। আরও ক'টা পাতার ছাউনি আছে আশ-পাশে। দেখতে আর মন চায় না যেন। বিকার আসে মনে। কে হয়তো কোন ঘরে মরতে বসেছে। ক্ষুধার জ্বালায় কাতরে কাতরে মরছে। মৃত্যুযন্ত্রণার কষ্টে কাঁদছে করুণ-করুণ। কৃষ্ণরাম ফিরলেন। মশালের আলো আগে আগে চললো। যে-পথে এসেছিলেন সেই সঙ্কীর্ণ পথে এগোলেন। কৃষ্ণরাম কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে আছেন ভরা-গাম্ভীর্য্যে। যেন তিনি মূক!

অপূর্ব্ব পরিচিত, পথহীন ও নিবিড় বনমধ্যে ক্ষণে ক্ষণে পথভ্রান্তি জন্মে। দীর্ঘ বৃক্ষাবলীশোভিত প্রদোষ-তিমিরাচ্ছন্ন বনপথ এতই সঙ্কীর্ণ যে, সহজে লক্ষ্যে পড়ে না। মশালের তীব্র আলোয় পথের সন্ধান মেলে! বনভূমির বহুদূর দৃষ্টিপথে দেখা যায়। যতদূর চোখে পড়ে দেখা যায় শুধু দীর্ঘ বৃক্ষরাজি ও উদ্ভিদ-গুল্মের ঝোপ। কোথাও গ্রাম নেই, আশ্রয় নেই, মানুষ নেই, আহার্য্য নেই, জল নেই। বাতাসের গতি যেন তিলেক মন্দ হয়। গাছপাতার গুঞ্জন মৃদুতর হয়। ঝিল্লীর ডাক শোনা যায়। রাতের আঁধার ঘন হয়। রজনী গভীরা হয়।

ঐ তো নভোমণ্ডল। রাতের কালো আকাশ। নীরব নক্ষত্রমালা, দপ-দপ জ্বলছে। নিরাশ চোখে।

কৃষ্ণরাম নির্ব্বাক, বিষণ্ণ, বিস্ময়াবিষ্ট। তাঁর চলার গতি অতি দ্রুত। পদক্ষেপের ভারে মাটি কেঁপে কেঁপে ওঠে।

স্বস্তির শ্বাস ফেললো রঙ্গলাল। চোখের অন্ধকার ঘুচলো এতক্ষণে। কুলাচার্য্যকে কাছাকাছি আসতে দেখে বললে,—মহাশয়, এ বড় ভয়ঙ্কর স্থান! ঐ দেখেন আলেয়ার নাচন।

যেদিকে আদাড়ে-কচুর বন, সেদিকে যেন কয়েকটি অগ্নিস্তম্ভ জ্বলছে। নিবছে আর জ্বলছে থেকে থেকে।

হাতীর পিঠে আমাড়ী-হাওদায় উঠলেন জমিদার কৃষ্ণরাম। ঘন ঘন শ্বাস

পড়ছে তাঁর। হাঁফ ধরছে যেন। বললেন শুষ্ককণ্ঠে,—চল, গৃহে ফিরি। অদ্য আর নয়।

জগঝম্প বাজলো আবার। ঢাকে কাটি পড়লো। টেমটেমী বাজলো। হাতী উঠে দাঁড়ালো।

রঙ্গলাল বললে,—পরমানন্দ রায়ের কি দুর্ভাগ্য! কুলাচার্য্যের পদধূলি পড়ে না তাঁর গৃহে। পথে বাধা পড়ে। সেজে-গুজে বসে থাকে হয়তো পরমানন্দের দুই কন্যা।

হাতী উঠলো। ঘোড়া চললো। সিপাহী আর পদাতিকরা অনুসরণ করলো। কৃষ্ণরাম বাক্যহীন বিস্ময়ের ঘোরে। সপ্তগ্রামের মেঠো পথ গমগম করতে থাকে যেন। পথ বন্ধুর। শুধু চড়াই আর উৎরাই। আঁকাবাঁকা, এবড়ো-খেবড়ো। ঢাকের বাজনা, হাতীর গলঘণ্টা ও অশ্বের পদশব্দের প্রতিধ্বনি ওঠে। রঙ্গলালের অশ্ব চলে হাতীর পাশাপাশি। রঙ্গলালের ভয় যেন দূর হয় না। ভয়ার্ত্ত দৃষ্টি তার চোখে। সে ভয়ে ভয়ে বলে—কুলাচার্য্যের সাহস তো কম নয়! এই দুর্গম অরণ্যে মানুষে প্রবেশ করে না।

দুর্ভিক্ষের আসামী দেখেছেন কৃষ্ণরাম। আকালের ওলাউঠো রুগী। মৃতা জননীর বক্ষে মৃত শিশু। মরণকান্না শুনেছেন স্বকর্ণে। মৃত্যুযন্ত্রণার করুণ-কাতর গোঁঙানি। কৃষ্ণরামের চক্ষু স্থির হয়ে আছে। অসীম গাম্ভীর্য্যে স্তব্ধ হয়ে আছেন তিনি।

রঙ্গলাল বলে,—মহাশয়, গড়-মান্দারণের কথা একটি বার স্মরণ করেন। সেস্থানেও এরূপ ভয়াবহ বনজঙ্গল। অকাল আর অজন্মা। ভূত-প্রেতের বাস।

কাতরকান্নার গোঙানি, ভৌতিক আলাপচারী না বাঁশবনের ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ,—ঠিক ধরা যায় না। কৃষ্ণরাম কেমন যেন উৎকর্ণ হয়ে শোনেন। রঙ্গলালের কথা কানে যাওয়ায় আরও যেন স্তব্ধ হয়ে পড়লেন তিনি। সসাজ হাওদার আসনে হেলে পড়লেন ধীরে ধীরে।

গড়-মান্দারণ ভাসলো কৃষ্ণরামের দৃষ্টিপথে। স্মৃতির পটে।

কত কাল গমনাগমন নেই মান্দারণে। আসমান বিবির মৃত্যুর পর থেকে অদ্যাবধি আর যাওয়া-আসা নেই।

গড়-মান্দারণের দুর্গোপম প্রাসাদপুরী বর্ত্তমানে ভগ্নপ্রায়। আসমান-দীঘির কাকচক্ষু জল পানায় পরিপূর্ণ।

সহসা মনে পড়লো আর ছাঁৎ করলো বুক। কে যেন আছে মান্দারণের সেই ভগ্ন-আলয়ে। আছে নির্জ্জনবাসে, নজরবন্দী কে এক অবলা নারী—যার রূপজ্যোতিতে চোখ যেন ঝলসে যায়। মনের চাঞ্চল্যে উঠে বসলেন কৃষ্ণরাম। সেই অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তিকে যেন চোখের সমুখে দেখতে পেয়েছেন। বিপুল কেশভার বিন্যাসহীন, বেণীর বন্ধন নেই; অনিন্দ্য মুখমণ্ডলে অলকাবলীর প্রাচুর্য্য; আকর্ণবিস্তৃত আঁখিযুগলে সাগরবক্ষে কম্পমান চন্দ্রকিরণলেখার মত স্নিগ্ধ-উজ্জ্বল দীপ্তি। শুভ্র দেহরত্নে বিমলশ্রী।

সেই অবলা নারীর দোষ কি! ক্ষণেকের জন্য কৃষ্ণরামের মন কোমল হয়। অর্থ আর ভূ-সম্পত্তির লোভ যেন মুছে যায় মন থেকে। বিন্ধ্যবাসিনীকে মনে পড়ে।

জোর-কদমে হাতী চালিয়েছে মাহুত। সপ্তগ্রামের মেঠো-পথের শুষ্কমাটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় হাতীর পদাঘাতে। ধূলি উড়তে থাকে তেজী অশ্বের পদচালনায়।

রাজকুমারী কেমন আছে কে জানে! জমিদার-নন্দিনী সুখে আছে না দুখে আছে কে বলতে পারে! অধৈর্য্যে চঞ্চল হয়ে ওঠেন কৃষ্ণরাম। এক ভাবে যেন বসতে পারেন না অধিকক্ষণ। পাশ থেকে রঙ্গলাল আবার কথা বলে। বললে,—রাজকুমারীর পিত্রালয় থেকে কোন সমাচার কি মিলে নাই?

ডাইনে-বাঁয়ে মাথা দোলালেন কৃষ্ণরাম। মুখে কোন কথা বললেন না।

রঙ্গলাল বললে,—নাপতিনী ভালয় ভালয় ফিরলে হয় সুতানুটী থেকে! কুলাচার্য্যের প্রতি যদি কৃপা করেন শ্বশুরকুল! যদি বেহাত করেন কিছু ধনসম্পত্তি!

—কৃপাভিক্ষা আমি করি না। এ আমার দাবী। অধিকার। সহসা

বললেন জমিদার, ভাবগম্ভীর কণ্ঠে। বলেন,—রাজকুমারীর দুই সহোদর সহজে রাজী হওয়ার পাত্রই নয়।

—সোজা আঙ্গুলে ঘি ওটে না কুলজ্ঞ? রঙ্গলাল অশ্বপৃষ্ঠ থেকে কথা বললে। জগঝম্প আর তাসাকড়কার উচ্চ-নিনাদে তার কথা বুঝি চাপা পড়লো! সপ্তগ্রামের উচু-নীচু পথ ধ'রে এগিয়ে চললো হাতী, ঘোড়া আর পতদাতিক। মশালচি আগে আগে চললো আলো দেখিয়ে।

রাতের আঁধার যেন থরো থরো কাঁপতে থাকে বাদ্যধ্বনিতে। গাছের শাখায় পাখীরা পাখা ঝাপটায় ভয়ে ভয়ে! বনের পশু থমকে থাকে। আদাড়ে-কচুর জঙ্গলের পরপার থেকে সাঁই-সাঁই বাতাস উড়ে আসে।

সুতানুটির রাজগৃহের নাচঘরে ঝাড়বাতি জ্বলছে আজ! নানা রঙের বেলোয়ারী ঝাড়লণ্ঠনে নানা রঙের আলো জ্বলছে মোমবাতির। কিংখাবের পর্দা ঝুলছে বন্ধদ্বার নাচঘরের সদ্য উন্মুক্ত দ্বারে-বাতায়নে। কালো ভেলভেটের গালিচা বিছানো হয়েছে ফরাসে। জঙলা-জরির তাকিয়া পড়েছে কতগুলো। নাচঘরের চার দেওয়ালের বৃহৎ আকার আয়নায় ঝাড় আলোর প্রতিবিম্ব পড়েছে। ফুলদানিতে সাজানো ফুল—গোলাপের তোড়া রকম-রকমের। লাল, সাদা, গোলাপী, হলুদ রঙের গোলাপের স্তবক। গালিচার মধ্যিখানে সোনার তারের আতর দান। খস্ আতরের খুশবু বইছে নাচঘরে। আসর জাঁকিয়ে বসেছেন রাজাবাহাদুর কালীশঙ্কর, আশ-পাশে বসেছে ইয়ার-মোসায়েব। সুরার পাত্র আর পেয়ালা কয়েক জোড়া, বসিয়ে দিয়ে গেছে খাস্ খানসামা। সহাস্যে কালীশঙ্কর বললেন,—নর্ত্তকী, পেয়ালা ধরো সরাপ ঢালি।

দু'জন ইরাণের রাণী—ফরাসের এক প্রান্তে তাকিয়ায় এলিয়ে পড়েছে। ঝাড়লণ্ঠনের আলোয় ওদের ফিকে-বেগুনী রঙের ঘাঘরা চেকনাই তুলছে। জরি-জড়ানো লম্বা বিনুণি সোনার চিকণ তুলছে। সুর্মাঘষা চোখে চটুল হাসির ঝিলিক খেলছে। নিরেট আঁটসাঁট বুক যেন রূপের গর্ব্বে স্ফীত হয়ে আছে। সূক্ষ্ম গোলাপী অধরে টেপাটেপা হাসি।

রূপোর বালা-পরা হাত তুললো একে একে। নাচঘরে দুধে-আলতা রঙ খেললো ওদের দেহবরণের। হাসির আভা ঠিকরালো। গোলাপী গালে টোল ফুটলো। সুর্মাঘষা চোখে এখনই জাগলো যেন মদির চাউনি।

ডুগি-তবলায় চাঁটি হাতুড়ীর পড়লো ঘা পড়লো। সুর বাঁধাবাঁধি চললো সারেঙ্গীর সুরে সুর মিলিয়ে। তবলচি আর সারঙ্গীর মুখে তবক-দেওয়া পান উঠলো আপাতত।

দূরে দাঁড়িয়ে খাস্ খানসামা গোলাপ জল ছিটোয় পিচকিরী থেকে। দুই ইরাণীর রুখু রুখু কোঁকড়া চুলে যেন শিশিরের বিন্দু পড়লো। না কি হীরার কুচি বর্ষণ করলো খানসামা!

রাজা স্বহস্তে সরাব ঢেলে দেন পেয়ালায়। অল্প ঢালতে কত বেশী ঢেলে দেন চুয়ানো মদিরা। আগে পানাহার, তার পর নাচানাচি। নেশা না জমলে কে নাচ দেখবে? মরে-যাওয়া নেশা চাগিয়ে নিতে হয়।

রাজাবাহাদুর নিজেও পেয়ালা তুললেন মুখে। এক এক চুমুক খান আর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন ঐ তাব্রিজ-কন্যাদের। দেখেন, কি অপরূপ সুঠাম দেহ! কেমন অটুট যৌবন! কত রূপ!

মোসায়েবের দল রাজাবাহাদুরের আশ-পাশে। ফিসফাস কথা কয় পরস্পরে। যেন এ ওর গা শোঁকাশুকি করে। পৃথিবীর এক আশ্চর্য্য যেন চোখের সম্মুখে। তাই কারও কারও চোখে যেন ব্যগ্রবিহ্বল দৃষ্টি। আদেখলার মত তাকিয়ে আছে ফ্যাল-ফ্যাল।

বাতাসের সঙ্গে যেন লড়াই করে কিংখাবের ঝুলানো পর্দ্দা। বৈশাখের এলোমেলো টাটকা হাওয়া দুয়োরে দুয়োরে হানা দেয়। যুঁই, বেল আর চামেলীর গন্ধ বহন করে আনে। তবুও বাধা দেয় পর্দ্দা, পথ ছাড়ে না।

পৃথিবী যেন ভুলে যান রাজাবাহাদুর। ফিকে বেগুনী-রঙ ঘাগ্রার আবরণে সুস্পষ্ট দেহরেখা দেখে দেখে মোহে যেন আচ্ছন্ন হতে থাকেন। বেদুইনের রূপ কমনীয় কত! ওদের আদুড় পা ফর্সা যেন ডিমের মত।

ঘন নীল [illegible] পাথরের অলঙ্কার ইরাণীদের। বালা, তাবিজ আর কানফুল।

গলায় কালো অনিক্সের মালা। সোনালী কেশে কাঠের পাশ্ চিরুণী। হাতে রূপোর আঙটি। পেতলের ঘুমুর পায়ে।

রাজাবাহাদুর পান-পেয়ালা নামিয়ে রাখলেন। লাল ভেলভেটের একটি থলি ছিল হাতের কাছেই। মুখের ফাঁস আলগা করে থলিতে হাত ভরলেন কালীশঙ্কর। হাতে যা উঠলো তুললেন। ঝাড়ের আলোয় ঝলমলিয়ে উঠলো রাজার হাতের আঁজলা। জৌলুস ঠিকরালো ঠিক সূর্য্যের মত।

দু'জনের তরে দু'ভাগ। একেক জনের হাতে দিলেন একেক ভাগ। বললেন,—এই লও উপহার, আসল পাবে পরে।

হাত পাতলো ইরাণীরা। পরম লোভে হাত পাতলো। ভিক্ষা চাইলো যেন মুখে হাসি ফুটিয়ে। ওদের শুভ্র হাত যেন ভরে দিলেন কালীশঙ্কর। দিলেন একেক ছড়া কণ্ঠহার হাঁকা হীরার। রত্নাগার থেকে বের করিয়ে রেখেছিলেন আগে থেকে।

মেওয়ার রেকাব থেকে একটা আখরোট তুলে মুখে দিলেন রাজাবাহাদুর। কয়েকটা পেস্তা মুখে ফেললেন। চর্ব্বণের সঙ্গে সঙ্গে বললেন,—কত দাম, যদি কিনে লই দু'জনাকে !

দলের ছিল এক দলপতি। দুই ইরাণীর এক মাতব্বর। জাতে আরবী। চিবুকে হাত বুলিয়ে সে বললে,—দো দো হাজার শিক্কা রূপেয়া।

রাজা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন মৃদু মৃদু। পেয়ালা তুললেন মুখে ! জল চলকে চলকে উঠলো পেয়ালায়।

এক মোসায়েব রাজার কানে কানে বললে,—হুজুর, দুটো কেন? একটাকে নেন।

—উঁহু !

অসম্মতি প্রকাশ করলেন রাজাবাহাদুর।

মোসায়েব বললে,—তবে কি একটাকে দান করবেন ?

রাজা বললেন,—দান গ্রহণের পাত্রটা কে ?

আমতা আমতা করতে থাকে মোসায়েব। হাতে হাত কচলায়, বলে—কেন হুজুর, ছোটকুমার বাহাদুর আছেন। তেনাকেই দেন [illegible]টা।

কটাক্ষপাত করেন কালীশঙ্কর। ক্রুদ্ধ চোখে দেখেন বারেক। ভর্ৎসনার ভঙ্গিমা দেখা দেয় রাজার মুখে। রাজা বললেন,—অন্যায় কও কেন! কাশীশঙ্কর তেমন মানুষই নয়। যাও গিয়ে ব'সগে।

ভয়-পাওয়া নির্লজ্জ লোকটি নকল হাসি হাসতে হাসতে ফিরে গিয়ে বসে পড়লো।

অনেকক্ষণ রাজার মুখে হাসি ফুটলো না। খুশী-খুশী ভাব রইলো না মুখে-চোখে। নাচঘরে আর কোন সাড়া শব্দ নেই।

রাজাই যে কথা থামিয়েছেন! হাসি থামিয়েছেন।

ছোটকুমার তেমন মানুষই নয়। তিনি তখন কাছারীতে বসেছেন। সেজ জ্বালিয়ে, কানে কলম দিয়ে, কাশীশঙ্কর লেখা না পড়া করছেন এক মনে। তুলট কাগজের পাতা খোলা রয়েছে সামনের ডেকসোয়। ভূষোর কালিতে কি যেন লেখালেখি করছেন। সেজের প্রদীপে রেড়ীর তেল, আলো তাই স্বচ্ছশুভ্র, চোখে লাগে না, ক্ষতি করে না চোখের। খানসামার হাতে বৃহৎ হাতপাখা। প্রদীপ-শিখা লকলকিয়ে ওঠে পাখার হাওয়ায়। কাশীশঙ্করের লাল চেলীর উত্তরীয় খ'সে পড়ে। উপবীত আর রুদ্রাক্ষের মালা দেখা যায় লোমশ বক্ষে। দেখা যায়, কুমার ঘামছেন অতি গরমে।

প্রায়-রুদ্ধ কাছারী-ঘর। একটি মাত্র দুয়োর—উইয়ের ভয়ে আলকাতরা মাখানো। কাগজ-পত্র আছে, যদি উই আর ইঁদুরে কাটে! তক্তাপোষে বসেছিলেন কাশীশঙ্কর। ডেসকো টেনে কি যেন লিখছিলেন। ভূষোর কালির পোড়ামাটির দোয়াত ডেসকোয়। তুলট কাগজের খোলা পাতা।

চালের কারবারী এসেছে। পাইকের এসেছে।

চালের আড়ত করবেন কুমারবাহাদুর তাই শলা-পরামর্শ করছেন। কোন চাল কত মণ মজুত করবেন তারই মণ আর দর-কষাকষি করছেন। কখনও নামছেন, কখনও উঠছেন দরাদরিতে।

খড়ের চালা উঠছে কাশীশঙ্করের ভূমিতে। আড়তের চালা তুলছেন। কাঁড়া আর আকাঁড়া দুই রাখবেন কুমার। ঘরামি চালা বাঁধছে। রাতেও কাজ চলেছে লণ্ঠন জ্বালিয়ে।

পাইকার বললে,—ফর্দ্দটা মিলিয়ে নেন কুমারবাহাদুর, যদি ভুলচুক থাকে।

কাশীশঙ্কর খাগের কলম টানলেন কান থেকে। মৃদু হাসির সঙ্গে বললেন,—বেশ, ভাল কথা সাহার পো। তুমি বল, আমি মিলায়ে লই। খানসামা কাছারীর বাহিরে যাও। ডাকলে ফের আইস।

পাইকার ব'লে যায় নিজের ফর্দ্দে চোখ রেখে। বলে,—ভাদুই হাজার মণ। বাদসাভোগ সাতশো মণ। বালাম হাজার। বাঁকচুর পাঁচশো মণ। চাঁপা পাঁচশো মণ। দুর্গাভোগ হাজার। হাতিশাল, দুধকলমা কালামাণিক পাঁচ পাঁচশো মণ।

—কোন ভুল নাই।

ফর্দ্দে ফর্দ্দে মিলে যাওয়ার আনন্দে মৃদু হেসে বললেন কুমারবাহাদুর। বললেন,—এই লও আগাম। আমার নামে জমা করাও সাহার পো।

দেড় হাজার মোহর-টাকা। মুর্শিদাবাদের ছাপ মারা টাকার থলী একজোড়া, সমান ওজনের।

পাইকার এত টাকা দেখেও এতটুকু হাসলো না। গুণলো না বাজিয়ে বাজিয়ে। ঝুটা না আসল দেখলো না। দু'হাতে থলী তুলে বিদায় গ্রহণ করলো।

হাতের কাজ মিটিয়ে বদ্ধ কাছারী থেকে বেরিয়ে পড়লেন কাশীশঙ্কর। রাতের মুক্ত অন্ধকারে এলেন। কি দুঃসহ উত্তাপ কাছারীতে! বাইরে আকাশ আর বাতাস। তারা ফুটেছে ঘনকালো আকাশে। ঝড়ের মত উড়ো হাওয়া চলেছে। এক ঝলক হাওয়া। ঘর্ম্মাক্ত দেহ যেন শীতল ক'রে দেয়। কাশীশঙ্কর বলেন,—আঃ।

হাওয়ায় যেন নাচের ছন্দ। ঘুমুরের কিঙ্কিণী। কাশীশঙ্কর কান পাতলেন শূন্যে। মায়া না মরীচিকা!

রাজপুরীর বাতাসে ট্যাম্বুরিণের ঝমাঝম সুর। নাচের তালে তালে যেন বেজে চললো। সারেঙ্গী যেন কান্না ধরেছে। ট্যাম্বুরিণের খঞ্জনী ঝমঝমিয়ে বাজতে থাকে থেকে থেকে। ডুগী-তবলার আওয়াজ আসে ভেসে। ছোটকুমার অনুমান করলেন, রাজা হয়তো নাচঘরে আছেন। থাকবেন হয়তো আজ রাতের মত। অন্দরে আর ফিরবেন না। হয়তো কোন নর্ত্তকী এসেছে।

ট্যাম্বুরিণের ঝমাঝম সুর অন্দরে পৌঁছায় না। সারেঙ্গীর কান্না শোনা যায় না অন্দরে।

তবুও কেন যে পাটরাণী উমারাণীর চোখে জল ঝরে কে জানে! অন্দরের খাসকামরায় রাজমহিষী। সমুখে দর্পণ রেখে অলঙ্কার খুলে ফেলছেন দেহের। কেন কে জানে, অঝোর ঝোরে অশ্রুপাত করছেন।

সর্ব্বমঙ্গলা ও সর্ব্বজায়া নাটমন্দিরে। ভাগবতপাঠ শুনছেন নিবিষ্ট চিত্তে। বাদ্যযন্ত্রের ঝঙ্কার হয় কোথায়, কান নেই তাতে।

রাজপুরীর হাওয়ায় ট্যাম্বুরিণের ঝনন ঝনন। সারেঙ্গীর কান্না। মদালসা ইরাণী নৃত্যের ছন্দ। ঘুমুরের রুণুঝুনু।

কোদাল-কাটা মেঘ যেন ভোরের আকাশে।

সদ্যফোটা ফুলের সুধাগন্ধ। শিরশিরে ঠাণ্ডা বাতাস। বনে বনে ফুল ফুটছে, প্রথম পবিত্র পবনস্পর্শে পাপড়ী খুলছে অস্ফুট কুঁড়ি। গন্ধের তরঙ্গ আসছে চাঁপা আর বনমল্লিকার বন থেকে। আসমান-দীঘির দুই তীরে যুঁই আর গন্ধরাজের গাছ, দীঘির জলে ছায়া তুলেছে। ঐ চাঁপার বনে থাকে কাঠুরিয়া। গাছের আড়ালে বাসা বেঁধেছে। চালা তুলেছে, ঘর-সংসার পেতেছে দীন-দুঃখীর মত। কাঠুরিয়া কাঠ কাটতে বেরোয় রাত থাকতে থাকতে। কাঁধে কুড়ুল চাপিয়ে বন কাটতে যায়। বন কেটে কেটে যেন পরখ করে কুড়ুলের। পুবাকাশে দিনের আলো ফুটতে না ফুটতে গাছে গাছে কুঠারাঘাত পড়তে থাকে। ভোরের শিরশিরে ঠাণ্ডা হাওয়া শিউরে

শিউরে ওঠে তখন গাছের আর্ত্তনাদে। ক্ষুরধার কুঠারের ঘায়ে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়ে শাখা-প্রশাখা। তখনও আকাশ থাকে কালো-সাদা—আঁধারের রেশ আর আলোর আভাস।

কাঠুরিয়া কাঠ কাটে না কেন! আকাশে নতুন দিনের আলো, তবুও যেন স্থির হয়ে আছে বনাঞ্চল। শান্ত আর মৌন দিগ্বিদিক্। একটি পাখীও এখনও ডাকলো না। আঘাতে জর্জ্জরিত গাছের আর্ত্ত চিৎকার শোনা যায় না।

আধো-ঘুম আধো-জাগা চোখে দীঘির পৈঠায় বসেছিলেন রাজকুমারী। আলস্যে না দুশ্চিন্তায় গালে হাত। শিরশিরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় বিন্ধ্যবাসিনীর রুক্ষ-মুক্ত কোঁকড়া চুলের রাশি থরথরিয়ে ওঠে। ঘুম-জাগা চোখে রাজকুমারী তাকিয়ে থাকেন চাঁপাবনের শীর্ণ আঁকা-বাঁকা পথে। ঐ পথে দেখা যায় কাঁধে কুড়ুল কাঠুরিয়াকে। তখনও থাকে পাৎলা অন্ধকারে! আকাশের পুর্ব্বপ্রান্তে শুকতারা দপ্ দপ্ করে।

তবে কি চাঁদের আলো! দ্বাদশীর চাঁদ ডুবলো না এখনও! দিনের আলো ফুটলো না। মাঝ ঘুমে হঠাৎ জেগে উঠেছেন রাজকন্যা। বাসক-শয়ন বৃথা হয়ে গেছে, ঘরকরণের সাধ মিটলো না, মনে শুধু দুঃখদিনের ঝড় বইছে অষ্টপ্রহর। নিদ্রা নেই চোখে, জেগে ব'সে রাত কেটে গেল! চোখে জ্বালা ধরেছে।

আসমান-দীঘির পৈঠায় একা-একা বসে থাকেন গালেহাত বিন্ধ্যবাসিনী। বাতাসে বস্ত্রাঞ্চল কাঁপছে। থরথরিয়ে উঠছে আলুথালু রুখু চুলের বোঝা। চোখে যেন ঘুমের ঘোর এখনও। মুখে জাগরণের কালিমা!

—তুমি কোন্ দিন চোর-ডাকাতের হাতে পড়বে। এমন রাত থাকতে ওঠ?

চোখ ফেরালেন রাজকুমারী। ঠোঁটের হাসির রেখা মুখে ফুটিয়ে বলেন, —কাকপক্ষীর সাড়া মেলে না, চোর-ডাকাত কোথায়?

আকাশের কেদাল-কাটা মেঘ পানে চোখ তুললো পরিচারিকা। বললে,— অভাবের দেশ, দিনে ডাকাতি হয় হেথায়! খুনোখুনি লেগেই আছে কাল রাতেও গয়লাদের আটচালায় ডাকাত পড়েছে।

চোখ বড় করলেন বিন্ধ্যবাসিনী। ঘুম-জাগা চোখ। বললেন,—তুমি কেম্‌নে জানলে ?

—প্রহরীর কাছে। কথা বলতে বলতে ঘাটের পৈঠায় বসলো যশোদা। বললে,—গয়নাগাটি টাকাকড়ি কিছু বাদ দেয়নি। দুটো গাই-বাছুর। গয়লাদের পুরুষকে পৈতেকাটা করে কেটে গেছে।

চোখ বড় করলেন রাজকুমারী। সজোর হাওয়ায় বুকে আঁচল রাখতে দেয় না যেন। বিন্ধ্যবাসিনী বলেন,—গয়লাবাড়ী কত দূরে যশো ?

—চার পোয়া পথ। দূরে নয় কাছেই।

যশোদা কথার শেষে হাই তুলতে থাকে হাঁ ক'রে।

ভোরের মিষ্টি ঘুমটুকু থেকে বঞ্চিত হওয়ার ক্ষোভ যেন তার, মুখে বিরক্তি।

চোখ মেলতে শয্যায় দেখতে পাওয়া যায়নি রাজকুমারীকে। শূণ্য পালঙ্কে শুধু এলোমেলো শয্যা! কাঁথা-মাদুর। দেখলে ঠাওরানো যায়, কে যেন বিনিদ্র রজনী যাপন করেছে। ঘুম-ভাঙা চোখে যশোদা বিশ্বাস করতে পারেনি। ভেবেছিল সত্যি নয়, স্বপ্ন! দেখার ভুল, চোখ কচলে কচলে দেখে যশোদা। শূণ্য শয্যা দেখে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে। ভাবে, গেল কোথায় রাজকুমারী! চোখে ধূলো দিয়ে স'রে পড়লো নাকি রাতারাতি!

ভগ্ন প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে খোঁজাখুঁজি করতে করতে দীঘির ঘাটের দিকে যায় যশোদা। ঘাটের পৈঠায় জমিদার-নন্দিনীকে দেখতে পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

—আমার ভয় কি চোর-ডাকাতকে ?

কেমন যেন হেসে হেসে কথা বলেন বিন্ধ্যবাসিনী। কথার সুরে নির্ভয়। বলেন,—আমার কাছে সোনাও নেই, দানাও নেই!

—তুমিই যে সোনাদানার চেয়ে অনেক বেশী দামী।

যশোদার কথায় গাম্ভীর্য্য। বলে,—তোমার মত একটিকে পেলে চোর-ডাকাতের বহুৎ লাভ!

বিন্ধ্যবাসিনী কপালের 'পরে নেমে আসা চুর্ণ কুন্তল সরিয়ে বললেন,—মিথ্যে মিথ্যে ভয় পাও কেন যশো ? শ্যাল-কুকুরেও টানবে না। সাপেও দংশাবে না।

—কালকের মেয়ে, তুমি জানবে কি ! যশোদা ধমকানির স্বরে বলে,—তোমার মত রূপসী একটিকে পেলে—

শিরশিরে ঠাণ্ডা হাওয়া চলেছে। দীঘির তীরে ঘাসফুল নেচে নেচে উঠছে। যুঁই আর গন্ধরাজের শাখা প্রণাম করছে যেন মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে। ভোরের বাতাস ভারী হয়ে আছে সদ্যফোটা ফুলের সুগন্ধে। বাঁশবনে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ। আঁধার দিগন্তে !

—কাঠ-কাটুনেকে দেখা যায় না কেন ?

যশোদা বলে,—আকাশে কোদাল-কাটা মেঘ, হয়তো বর্ষা ঝরবে, তাই ঘরের বার হয়নি।

বৃষ্টি ! কথা শুনে অখুশীর ভাব ফুটলো যেন বিন্ধ্যবাসিনীর মুখে। আকাশে চোখ তুললেন। ঈশানের হাওয়া বইছে।

—শিলাবৃষ্টি না হয় !

যশোদা কথা বলে আর আড়মোড়া ভাঙ্গে ! আসমানের জলে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে আলস্যে।

শিলাবৃষ্টি ! প্রকৃতির এ কি উৎপাৎ সাতসকালে ! কি এক আশায় যেন ভাঙন ধরে রাজকুমারীর !

কখন সকাল হয়েছে, খেয়াল নেই বিন্ধ্যবাসিনীর। গঙ্গা-জলের মত রঙ হয়েছে যেন নীলাকাশের। কোদাল-কাটা মেঘ। হলকর্ষণ করেছে কে যেন আকাশ-ক্ষেত্রে। লাঙল চালিয়েছে।

ঐ আকাশে মন চলে গেছে যেন রাজকুমারীর। প্রথম কাক ডাকলো বনমল্লিকার বনে। ঈশানের হাওয়ায় ভাঙ্গা-বাসা দেখে ভয় পেয়ে ডাকলো যেন কাক।

পাখীর প্রথম কাতর কাকলী কানে যায় না রাজকন্যার। প্রথমে কাক ডাকলো। বিশ্ব যেন লুপ্ত হয়ে গেছে বিন্ধ্যবাসিনীর চোখে। আমোদরের

পর তীরে শ্যামল তালবন, স্পষ্ট হয়ে ওঠে ধীরে ধীরে। রাত্রির কালো মেঘে রুণ-আলোর স্পর্শ লাগে। শিরশিরে বাতাসে বিবশ ফুল খসে খসে পড়ছে দীঘির তীরে। চাষারা আল বাঁধতে বেরিয়ে পড়েছে মাঠে মাঠে। কোদাল-কাটা মেঘের ছায়া কাঁপছে আমোদরের জলে! আকাশে উড়ছে চাতক আর চাতকী।

—যশো, যদি বর্ষা নামে!

কেমন যেন বিমর্ষ স্বর বিন্ধ্যবাসিনীর! মুখপদ্ম যেন হতাশায় পূর্ণ।

—তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক বৌ! দীঘির জল থেকে চোখ সরায় না যশোদা। বলে,—বর্ষা না নামলে মাঠ-ঘাট জ্বলে যাবে যে! ফসল যদি না হয় কি খেয়ে বাঁচবে মানুষ?

রাজকুমারী কেমন যেন অবশ হয়ে পড়েন। বিনিদ্রায় নিশীথ-পারাবার শেষ হয়েছে। দিনের আকাশে সূর্য্যের স্বচ্ছ আলো নেই, মন থেকে যেন ভাল লাগে না প্রকৃতির এই পরিহাস।

লাজ-আবরণের বালাই নেই দীঘির ঘাটে। যেন বিবসনা বিন্ধ্যবাসিনী,—বাতাসে আঁচল উড়িয়ে দিয়েছে। প্রভাতের ফুলের মত কোথায় জেগে উঠবে, রাজকুমারী যেন ঘুমিয়ে পড়লেন দু'হাতে মুখ আর বুক ঢেকে।

দীঘির নিকষ-কালো জল থেকে চোখ ফেরালো পরিচারিকা। দেখলো জমিদার-নন্দিনীর ঊর্দ্ধদেহ—হলুদ রঙে যেন লালের আভা। স্বর্ণপিঁড়ি থেকে আঁস্তাকুড়ে স্থান হয়েছে—কঠিন শয্যার চিহ্ন পড়েছে মোমের মত নরম দেহে। যশোদা যেন রূপ আর রঙ দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। কুমোরপাড়ার মাটির প্রতিমা যেন, বাহন ছেড়ে এসে বসেছে! প্রতি অঙ্গে যৌবন-লাবণ্যের নিটোল কোমলতা শুধু!

—নারায়ণের কি ব্যবস্থা হবে বৌ?

হঠাৎ কথা [illegible]লে যশোদা। আলস্যভরা ঘুম-জড়ানো কথা।

দীঘির দুই তীরে কাল বিহানের বিবশ ফুল খসে খসে পড়ছে। যুঁই

ফুলের আস্তরণ ঘাসে আর শৈবালে। দীঘির জলে গন্ধরাজ আর করবী ফুলের সাদা লাল ছায়া। গাঁয়ের কচি কিশোরী কজন, ফুলের মত ছড়িয়ে পড়লো করবীগাছের তলায় তলায়। কোথা থেকে ডানা মেলে উড়ে এলো আকাশ-পরীর মত—আঁচল উড়িয়ে ছড়িয়ে পড়লো আসমানের সবুজ তীরে।

ভোরের আলো ফুটতে, ফুল-তোলার গান শুনাতে বেরিয়েছে ফুলের মত কুমারী-কিশোরীর দল। বাগানে বাগানে গান গাইবে দলে দলে, গান গাইবে আর ফুল তুলবে। গাছ-কোমর বেঁধে গাছে উঠবে।

রাজকন্যা উদাস-আঁখি তুললেন। অলকচূর্ণ সরিয়ে দিলেন কপাল থেকে। যশোদার কথার কোন জবাব নেই। ঘুম-জাগা চোখে তাকিয়ে থাকলেন বিন্ধ্যবাসিনী। যেন কি এক গোপন-স্বপন ভেঙ্গে জেগে উঠেছেন। কাজল পড়েনি কত কাল, তবুও যেন কাজল-কালো চোখ। রাজকুমারীর চোখে যেন চোখ রাখা যায় না, এমনই স্তব্ধ-উদাস দৃষ্টি।

যশোদা বললে,—নারায়ণের সেবা হবে না? তিন সন্ধ্যে পুজো!

লাজ-আবরণের বালাই নেই। তবুও আঁচল টানলেন বিন্ধ্যবাসিনী। কেন কে জানে, মনে মনে যেন শপথ করলেন, চোখে যেন কোন মতে প্রকাশ না পায়। তাঁর চোখ দেখে কেউ যেন না বোঝে তাঁর মন। দুয়োর বন্ধ থাক মনের—অন্ধকারে লুকিয়ে থাক মনের কথা। আঁধার হৃদয়ে থাকুক জ্বলজ্বলে মাণিকের মত। আলোয় যে শুধু কালো-কলঙ্ক!

এক-সন্ধ্যা পুজা হয় না, তিন-সন্ধ্যা। নারায়ণ যদি থাকেন অস্নাত-উপোসী! পায়ে যদি তাঁর তুলসী না পড়ে! অঙ্গন্যাস নাই যদি হয়! দশোপচারের পুজা!

আসমানের তীরে ফুল-তোলার প্রভাত-সঙ্গীত। কচি কচি কণ্ঠ, পাখীর কলকাকলীর মত। কুমারীকন্যারা দলে দলে ছড়িয়ে পড়েছে আসমানের ঘাস-বিছানো সবুজ তীরে, অশোক, করবী আর গন্ধরাজ-গাছের ছায়াতলে।

—কারা আসে যশোদা? রাজকন্যা কথা বললেন ক্ষুণ্ণ করুণ সুরে। নিস্পৃহ চাউনি ফুটেছে চোখে। দীঘির তীরে চোখ।

পরিচারিকা বলে,—ওরা গাঁয়ের মেয়ে। আসছে দূর দূর থেকে। ফুল তুলছে ব্রতের। পেত্‌ত্যহ আসে।

স্বপ্ন দেখছিলেন হয়তো বিন্ধ্যবাসিনী। দেখছিলেন, কারা বুঝি আসছে তাঁকে উদ্ধার করতে। স্বর্ণপিঁড়ির রাজকন্যার ঠাঁই হয়েছে আস্তাকুড়ে! তাই কঠিন শয্যা থেকে হয়তো তারা নিয়ে যাবে ফুলের বিছানায়—পরিয়ে দেবে ফুলের অলঙ্কার—খেতে দেবে মধু।

ব্রতের লগন এসে গেছে। বৈশাখের নতুন হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এসেছে গ্রামের ঘর-আঙিনায়!

যশোদা বলে,—পুণ্যিপুকুর আর অশথপাতা করবে মেয়েরা। করবে দশ পুতুল, গোকল, হরির চরণ। পুরো বোশেখ মাস চলবে এই ব্রতের পালা। শিবপুজো করবে। তাই ফুল আর বিল্বিপত্তর তুলছে। তুলসী-দুব্বো তুলছে। দেবো কোন্ দিন প্রহরীকে বলে!

বিন্ধ্যবাসিনী বলেন,—গাছে গাছে কত ফুল! কেবা তোলে! প্রহরীকে যেন জানিও না দাসী!

মেঘ ডাকলো গুরু-গুরু। থমথমে দিনের আলো, চমকালো যেন সেই শব্দে। ভোরের কালো আকাশে হলকর্ষণের কাটা-কাটা মেঘ। ঈশানের হাওয়া চলেছে বনমল্লিকার বনে।

—শিলাবিষ্টি আসে তো বেশ হয়! ফুল চুরি করার যথাত্ত শাস্তি হয়!

—না না। এমন কথা ব'ল না! কেমন যেন কাতর কথা বলেন রাজকন্যা।

শিলাবৃষ্টি! টুকরো টুকরো বরফ পড়বে আকাশ থেকে। ঝমঝম বর্ষণ। আকাশ থেকে পড়বে আর টুকরো টুকরো হয়ে ছড়াবে। গাছের ফলে দাগ পড়বে। শূন্য প্রান্তরে যে থাকবে অনাবৃত, তীরের মত বিঁধবে তার মাথায়। বৃষ্টির জলে রক্তের ধারা মিশবে তখন।

—কি নিষ্ঠুর তুমি! অলক্ষ্মী কোথাকার! কালভূজঙ্গিনী।

বিন্ধ্যবাসিনীর কথায় গঞ্জনার রেশ। চোখে উগ্র দৃষ্টি। বুকভরা শ্বাস টানলেন রাজকুমারী। পরিচারিকার কথা শুনে রুদ্ধশ্বাস ছিলেন যেন

এতক্ষণ। শিলাবর্ষণের ভয়ে! বলেন,—আহা, কচি কচি বাছা সব।

দীঘির তীরে চোখ রেখে বললেন বিন্ধ্যবাসিনী। তাঁর উগ্র চাউনি যেন থমকে আছে ফুল-তোলার গান শুনে। পাখীর কলকাকলীর। মত গান গাইছে না মন্ত্র বলছে, কে জানে। হয়তো তুলসী আর বিল্বপত্র আহরণের মন্ত্র বলছে গুনগুনিয়ে।

কাক ডাকলো কোথায়। আর্ত্ত আর্ত্তনাদ। ঈশানের হাওয়া চলেছে। ভাঙাবাসার ভয়ে কাক ডাকছে কর্কশ।

আকাশ-পরী আকাশে উড়লো। কার যেন্ রোষদৃষ্টি দেখে উড়ে পালালো ভয়ে। পুণ্যলোভী কিশোরীর দল এই ছিল এই নেই। গাছ-গাছড়ার আবডালে লুকিয়ে পড়লো না কি! ভয়-পাওয়া হরিণীর মত চকিতে অদৃশ্য হয় কোথায়।

খিল-খিল হাসি হাসলো যশোদা। তার চোখের শাসানি তবে ওদের চোখে পড়েছে। শ্যেনদৃষ্টি দেখে আর আকাশ-গর্জ্জন শুনে তারা পালিয়েছে আঁচল উড়িয়ে। দেখে তাই আনন্দের হাসি হাসছে যশোদা।

ভোরের আকাশে বিদ্যুতের কাঁপন দেখা যায়, আমোদরের অপর তীরে, আল-ভাঙা মাঠের ওপরে, ঘোলাটে আকাশে। বাতাস কখন থেমে গেছে!

—চল' ঘরে যাই দাসী।

বিন্ধ্যবাসিনী বললেন ভয়ে ভয়ে। বিদ্যুতের ঝিলিক যেন চোখে দেখতে মন চায় না। রূপালী দিনের আলো, ভাগ্যে নেই যেন রাজকুমারীর। ভাগ্যে শুধু কালো আঁধার। কি এক গোপন-স্বপন যেন মিথ্যা হয়ে গেল অকাল-বর্ষণে।

—নারায়ণের সেবার কি হবে! আবার বললে যশোদা।

উসকো- খুসকো চুল কপাল থেকে সরিয়ে দিলেন বিন্ধ্যবাসিনী। ক্লান্ত দেহ তুললেন ধীরে ধীরে।

আগে-হাঁটুনী যশোদা চললো আগে আগে। আড় দৃষ্টি তার চোখে।

—কি করি যশো?

পিছু পিছু যেতে যেতে বলেন বিন্ধ্যবাসিনী। অসহায়ের মত বলেন,—ফুল বিল্বপত্র দিলে পুজো হয় না? ফল দান করলে? স্নান হয় না আমোদরের জলে?

—হয় না কেন, সবই হয়। তোমাদের হিঁদুদের শাস্ত্রে কিছুই হয় না, আবার সবই হয়।

গুরু-গুরু মেঘ ডাকলো ঈশানে। আসমানের জলে সোনালী-বিদ্যুৎ খেলছে ঘন ঘন। আকাশের ছায়া দীঘির জলে।

—তাই হোক দাসী। ভাঁড়ারে আতপ চাল আছে, ফল আছে, বিন্ধ্যবাসিনী বলেন। বলেন,—নৈবিদ্যি হবে'খন। গাছে আছে ফুল। মালা গেঁথে দেবো।

—যা মন চায় কর'। যশোদা বলে। বলে,—আমি দীঘিতে ক'টা ডুব দিয়ে দু'টি মুড়ি-ছোলা খাই! দিন-রাত্তির পারি না আর তেপান্তরের মধ্যিখানে ভাঙাঘরে বন্দী হয়ে থাকতে! তোমার তরে আমার দুর্ভোগ।

নীরব বিন্ধ্যবাসিনী চুপিসাড়ে চলেছেন পিছনে। চোখের দৃষ্টি যেন লজ্জানত হয়েছে। বুকের স্পন্দন পড়ছে কি পড়ছে না।

দাসী বললে,—শুনতে পাই, বাপের বাড়ী রাজার বাড়ী। তা দিয়ে দিক না আমাদের জমিদার যা চাইছে। দাবী চুকিয়ে দিক না এখুনি! মিটে যায় তোমার কষ্টের ভোগ!

রাজকুমারীর কানে জ্বালা ধরে কথা শুনে! পরিচারিকার কথায় যেন শ্লেষ আর বিদ্রূপ। বিন্ধ্যবাসিনী যেন জ্বলছেন মনে মনে! মুখে কত তিরস্কারের কথা আসছে, তবুও নিশ্চুপ! ঘন ঘন শ্বাস পড়ে তাঁর। ছিন্নমূল স্বর্ণলতার মত ভূমিতে যদি পড়ে যান। চরণ যেন অবশ হয়ে আসে। কারাগারের সুবাধ্য বন্দিনীর মত বিন্ধ্যবাসিনী দালান পেরিয়ে চলেন ধীরে ধীরে।

—দাবী যে বড় বেশী। পাহাড়-প্রমাণ!

অনিচ্ছায় কথা বললেন রাজকুমারী! ক্ষীণকণ্ঠে বললেন,—ভাগে যারা পেয়েছে তারা কেন ভাগ ছাড়বে?

—তবে কি মরতে হবে এই বন-জঙ্গলের দেশে? যশোদা মুখ খিঁচিয়ে খিঁচিয়ে কথা কয়। মিশি-মাখানো দাঁত দেখা যায় তার। মুখে শুধু নির্মম বিরক্তি ফুটে আছে।

বিন্ধ্যবাসিনী এক প্রস্তরময় সোপানে বসলেন। কোমল দুই হাত কপোলে রাখলেন। বললেন,—আমি আর চলতে পারি না। দাসী, তুমি থামো। আমার হাত কোথায়? আমি তো নিরুপায়!

ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে। নিটোল বুক কাঁপছে থর-থর।

বৌ, তুমি হেথায় থাকো। আমি আনিগে তোমার শুকনো বস্তর। স্নান সেরে নাও।

যশোদাও সুর বদলায় কথার! বৌকে সোপানে বসতে দেখে ঈষৎ ভীত হয় যেন। চোখে যেন দেখতে পায় রাজকন্যার অসহায় অবস্থা। কষ্ট-কাতর মুখ। করুণ চাউনি কাজল-কালো চোখে।

অপরিচ্ছন্ন, ধূলি-মলিন প্রস্তরময় সোপান। বৌকে একা ফেলে এগোয় যশোদা। সাপের মত এঁকে-বেঁকে চলে দাসীর চলন্ত দেহ।

ফিরে ফিরে দেখেন রাজকন্যা। যে-পথে এসেছেন দেখেন সেই দীঘির ঘাটের পথ। সোপান থেকে সোজা দেখা যায় আসমানের বুক। পানায় পরিপূর্ণ। জল না জমি ধরা যায় না আপাতঃ চোখে। মনের বীণার তার ছিঁড়েছে যেন বিন্ধবাসিনীর। এক গোপন স্বপন যেন ভেঙ্গে গেল বর্ষার ঘনঘটায়। দিনের রূপালী আলো ফুটতে না ফুটতে কালো মেঘ জমলো আকাশে। হাওয়া থামলো। গুমোট আকাশ। থেকে থেকে মেঘ ডাকছে।

বিন্ধবাসিনীর বুকের শিরায় শিরায় যেন আকুল আগ্রহের ব্যগ্র ব্যাকুলতা নাচানাচি করে। তবুও কত সাবধানতা, আঁখিতে যেন প্রকাশ না পায়। মনের দুয়োর বন্ধ থাকে যেন!

রাজকুমারী আপন মনে স্বগতোক্তি করেন। বলেন,—বেশ আছি আমি। মান্দারণই আমার ভাল।

কথা ব'লে যেন তৃপ্তি পান বিন্ধ্যবাসিনী। তৃপ্তির শ্বাস ফেললেন। মুখে

যেন ফুটলো সুখের আকুলতা। চোর-ডাকাত-বাঘ-শিয়ালের সঙ্গে একত্রে বাস, কিন্তু শত-লক্ষ চোখ নেই এখানে। শাসনের ঝড় নেই কথায় কথায়। ব্যথার ব্যথী না থাক, আছে সরমহীন আরামসুখ। দুধের মত ফর্সা শয্যা নাই বা থাকলো।

—চল' বৌ, ঘাটে চল।

পাশে এসে দাঁড়িয়েছে যশোদা। কথা বলছে সহজ সুরে। বনবাসের দুঃখ যেন ভুলে গেছে ইতিমধ্যে। বললে,—আমাকে আবার জোগাড় করতে হবে নারায়ণের সেবার উপকরণ। ফুল তুলতে হবে। নৈবিদ্যি সাজাতে হবে।

আনন্দের হাসি চাপলেন রাজকুমারী।

কেমন যেন ঠোঁট টিপে টিপে হাসলেন, গোপন হাসি। বললেন,—তোমাকে কিছু করতে হবে না যশো। আমি সব ক'রে দেব। তুমি শুধু ফুল-তুলসী তুলে দাও দীঘির তীর থেকে।

ঘাটের পথে পা চালায় পরিচারিকা। যশোদার হাতে ধৌতবস্ত্র, গুলের চূর্ণ, ফুলেল তেলের পাত্র। ক্ষণেকের মধ্যে যেন অন্য আকৃতি হয় তার। মুখে আর নেই সেই বিশ্রী বিরক্তি।

ভাঙাঘাটে আবার আলো জ্বলে। শেষ পৈঠায় পা রাখতেই জলে ছায়া ভাসলো রাজকন্যার। কাঁপা-কাঁপা ছায়া!

বিন্ধ্যবাসিনী গুলের চূর্ণ ঘষেন মিছরী-দানার মত দাঁতের সারিতে।

চাঁপাবনের শাখায় শাখায় সোনা-ফুল ফুটেছে। হাওয়া চলে না, কিন্তু সুগন্ধ ভেসে আসে যেন ফুলের! ঘাটের এক পাশে বুড়ী মাধবীলতা। মাধবীর গন্ধ যেন থমকে আছে দীঘির ঘাটে। প্রজাপতি আর মৌমাছি উড়ে আসছে। মাধবীর বুকে হুল ফুটিয়ে মধু পান করছে।

হাওয়া থেমেছে। গাছের পাতাটি আর নড়ে না। বন-মল্লিকার বন আর দুলে দুলে ওঠে না বাতাসের বেগে। গুমোট হয়ে আছে ভোরের আকাশ।

আমোদরের অপর তীরে শ্যামল তালবনের পেছনে বিদ্যুতের ঝিলিক চিকচিকিয়ে ওঠে সাপের মত আঁকাবাঁকা। গুমোট আকাশে মেঘের গুরু-গুরু ডাক। ঈশান কোণে কালো মেঘের জটলা। গাছের পাতাটি পর্য্যন্ত যেন অনড় হয়ে আছে। বিবশ ফুল খ'সে পড়ছে চাঁপাগাছের শাখা থেকে। অলস পাপড়ি ঝরছে! বিদ্যুতের ঝিকিমিকি আকাশের বুকে। হাওয়া চলছে না হঠাৎ। গুমোট গরম।

যা চাওয়া যায় তা পাওয়া যায় না। বার বার এই একটি কথা কাঁটার মত যেন বিঁধছে বুকের কোথায়। বিন্ধ্যবাসিনীর বুকের কাছে দীঘির জল, কানাকানি করে নেচে নেচে। জলের 'পরে কাঁপা কাঁপা ছায়া। দীঘির জলে যেন যৌবন টলমল করছে।

—আমার তরে তোমারও কত কষ্ট!

রাজকুমারী জলের ঢেউ তোলেন আর বলেন। আঁজলা ভর্ত্তি জল দেন চোখে-মুখে। দীঘির জল যেন রাতের আকাশ! সোনার চাঁদের মত দেখায় যেন রাজকন্যাকে। বিন্ধ্যবাসিনী আবার বলেন,—দাসী তোমাকে আমার সাতনরী দেবো। হীরামাণিকের আঙটি দেবো। তুমি যা চাও তাই দেবো। তোমাকে ছাড়া আমার গতি কোথায়?

ডুব দিতে গিয়ে দেওয়া হয় না। পরিচারিকার মুখে যেন অফুরন্ত হাসি ফুটলো। কৃতার্থ হয়ে পড়েছে যেন যশোদা। তার চোখে যেন উগ্র লোভ। দাসী বললে,—বৌ, তোমার পায়ের বাঁদী হয়ে থাকবো আমি। ভাবনা কেন এত?

—জরির জঙ্‌লা দেবো, পাঠিও তোমার মেয়েকে।

বিন্ধ্যবাসিনী কথা বলেন মিষ্টি মিষ্টি। হেসে হেসে বলেন,—সাতগাঁ থেকে আমার একটা প্যাটরা এনেছি। তাতে আছে ক'খানা গয়না, জঙ্‌লা শাড়ী, অভ্‌রের কৌট। কৌটয় আছে বাদশাহী মোহর।

—ভাগ্যি এনেছিলে বৌ! তুমি কি যে-সে ঘরের মেয়ে! তোমার নজর কত উঁচু! যশোদার কথায় যেন মন জোগানো সুর। দাসী বলে,—নিছক কষ্ট তোমার! বিনি অপরাধে দণ্ডভোগ! রাজার মেয়ে তুমি—

—বর্ষা নামবে কি না বল' না দাসী ?

রাজকুমারীর মিনতিপূর্ণ প্রশ্ন। ধৈর্য্য হারিয়ে পরিচারিকার কথার মধ্যপথে কথা কইলেন। বুকের কাছে দীঘির জল কানাকানি করছে নেচে নেচে। রাজকন্যার মনেও যেন এক কৌতূহল নাচানাচি করছে!

—বলা কি যায় বৌ! হাওয়া বইলে আর জল হবে না। যশোদা কথা বলে আকাশ-শেষে দু' চোখ ফিরিয়ে! আমোদরের অপর তীরে শ্যামল তাল-বনের পেছনের আকাশে তাকিয়ে বললে,—বৃষ্টি হয় তো হরির লুট দিই আমি! এ্যাকটা বছর আকাল গেছে। দু' মুঠো খেতে পায় দেশের মানুষ।

ভাল লাগে না দাসীর কথা। বিন্ধ্যবাসিনী আর শুনলেন না। জলের তলে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। অবগাহনের ডুব দিলেন।

যশোদার দৃষ্টি স্থির হয়ে গেছে। এক দৃষ্টে দেখছে তো দেখছেই। কি যেন লক্ষ্য করছে সাগ্রহে। ঘুম-ভাঙ্গা চোখ, আবার ভুল দেখছে না কি! চোখে জলের ছিটে দিয়ে দিয়ে দেখে যশোদা।

আকাশ জুড়ে মেঘ জমেছে। কোদাল-কাটা মেঘ। আঁধার নেমেছে যেন দিকে দিকে। কি দেখতে কি দেখলো যশোদা! কাকে দেখতে কাকে!

রাজকন্যাকে মাথা তুলতে দেখে দাসী যেন ব্যস্ত হয়ে বলে, —বৌ, ঘাট হ'তে উঠে যাও এক্ষুণি। ডুব সেরেছো, আবার কি!

যশোদার চোখ অন্য দিকে! অনিমেষ দেখছে তো দেখছেই। দাসী বলে,—বৌ, সেই ব্রাহ্মণ আসছেন। খানিক থেমে বলে,—দেখে যদি তোমার আদুড় গা। তুমি উঠে পড় তার চেয়ে! আমি দুটো ডুব দিয়ে নিই ততক্ষণে।

বুকের শিরায় শিরায় শিহরণ শুরু হয়। বুক দুর-দুর করতে থাকে! তবুও দীঘির শীতল জলের পরশ লাগছে বুকের কাছে। বিন্ধ্যবাসিনীর সজল নয়নতারা অচুল হয় যেন। মন যেন উচাটন। সঘন শ্বাস ফেলেন। আলু-লায়িত সিক্ত কেশে দেখায় যেন যোগিনীর মত।

বসন-অঞ্চল পদতলে লুটিয়ে, দু' হাতে মুখ ঢেকে, জল ছড়িয়ে দ্রুত চললেন রাজকন্যা। অরুণ অধরে যেন মৃদু-মন্দ হাসি খেলে ওঠে অলক্ষ্যে।

আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে। আকাশ ডাকছে থেকে থেকে। অস্ফুট গর্জ্জন! আমোদরের তীরে শ্যামল তালবনের পেছনে আঁকাবাঁকা বিজলী-রেখা।

—ওঁ নমো নারায়ণায়।

দীঘির ঘাটে জলদগম্ভীর কথা শোনা যায়! পথশ্রমে ক্লান্ত, তাই যেন কণ্ঠ-স্বর ঈষৎ পরিশ্রান্ত। ক্ষণেক ব্যবধানের পর আবার শোনা যায় সেই কণ্ঠ। —গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিততনুং গোগোপসংঘাবৃতং গোবিন্দং কলবেণু-বাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে।

ব্রাহ্মণ পদচারণা করেন দীঘির ফাট-ধরা ঘাটে। এক প্রান্ত থেকে ঘাটের অন্য প্রান্ত চলাফেরা করেন আর মন্ত্র উচ্চারণ করেন গানের সুরে। ব্রাহ্মণের কপালে, কণ্ঠে ও দুই বাহুতে শ্বেতচন্দনের শুষ্ক প্রলেপ। গ্রন্থিবদ্ধ কেশের গুচ্ছে একটি লাল কলকে-জবা। ব্রাহ্মণ নধরকান্তি, শুভ্রবর্ণ, সুদর্শন যুবা। পায়ে-হাঁটা ধূলি-কাঁকরের পথ অতিক্রম করতে হয়েছে, গরদের ধুতি তাই এঁটেগেঁটে পরা। মুগাপাড় সুতির উড়ুনী ঘামে ভিজে গেছে। লোমশ বুকে শ্বেত উপবীত, রুদ্রাক্ষের মালা। ব্রাহ্মণ কখনও অস্ফুটে কখনও সশব্দে গুঞ্জন তোলেন ঘাটের চাতালে। মাধবীর গন্ধ থমকে আছে দীঘির ঘাটে। মাধবীর স্তবকে নাচতে নাচতে ডাকছে কালো-ভ্রমর।

—নারায়ণ যে উপোসী রয়েছেন। বিহিত হবে না?

কার কথায় লুপ্তজ্ঞান ফিরে আসে যেন। ব্রাহ্মণ ঘাটের দুয়োরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। কি এক ধ্যানের মন্ত্রে যেন আচ্ছন্ন ছিলেন। বলেন,—সেবার ব্যবস্থা আছে শাস্ত্রমত! আমিও নিয়োগ দিতে পারি এক পূজারী ব্রহ্মচারীকে। কিন্তু—

—কিন্তু? বললে যশোদা কৌতূহলের সুরে। বললে,—থামলে কেন বামুন ঠাকুর?

স্মিতহাসি ফুটলো ব্রাহ্মণের সুক্ষ্ম ওষ্ঠে। যেন খানিক চিন্তা করেন, বক্তব্য ব্যক্ত করবেন কি না তাই যেন ভাবতে থাকেন। বলেন,—দৈনিক একটি সিধার বন্দোবস্ত যদি পাকা হয় তবেই। তৎসহ ত্রিসন্ধ্যা পুজার নৈবেদ্যাদিও যদি প্রাপ্য হয়, নচেৎ নয়।

বিরক্তির কুঞ্চনরেখা যশোদার মুখে। চোখে কুটিল কটাক্ষ। যশোদা বলে,—এত কথা কৈ কাল বল নাই তো! তোমার শালগ্রামশিলে তুমি ফিইরে নাও।

প্রথমে চোখের ঈশারা, তার পর হাতছানি—কিছুই চোখে দেখতে পায় না যেন পরিচারিকা। কে যে কোথায় অন্তরালে থেকে ব্যাকুল হয়ে ডাকে, নজরে পড়ে না।

—দৈনিক একটি সিধা দেওয়া হবে যশো!

কে যেন কোথায় দৈববাণী করে অদৃশ্যে থেকে। কোমল কণ্ঠে কথা বলে।

—তিনি-সন্ধ্যার ফল-নৈবিদ্যি দেওয়া হবে।

এত ডাকাডাকি, ইশারা, হাতছানি যখন দৃষ্টিতে এলো না পরিচারিকার, তখন বাধ্য হয়ে কথা বলেছেন রাজকুমারী। ঘাটের দুয়োরের পাশে নিজেকে লুকিয়ে।

অদেখা নারীকণ্ঠের কোমলমিষ্ট কথায় ব্রাহ্মণের দুই ভ্রূ বক্র হয়ে ওঠে।

—যশো, তুমি বৃথা দাড়িয়ে থাকো কেন? আবার সেই সুধাকণ্ঠের কথা। রাজকুমারী বলেন,—যাও গন্ধফুল তুলে আনো। দুব্বো-তুলসী আনো। আমি দেবো চন্দন ঘষে। নৈবিদ্যি র'চে দেবো।

অগত্যা চললো যশোদা। ভাঙাঘাটের পাশ দিয়ে কুটোকাঁটা মাড়িয়ে চললো ফুল তুলতে! গজরাতে গজরাতে চললো পরিচারিকা।

ব্রাহ্মণ তখন চিত্রার্পিতের মত। নিষ্পলক দৃষ্টি তাঁর বিশাল চোখে। ঘাটের দুয়োরে কাকে যেন দেখেছেন। চোখের সমুখে।

সদ্যস্নাতার সিক্ত কেশ কোমর ছাপিয়ে নেমেছে। লালপাড় ধৌতবস্ত্র পরনে। শুভ্র নিটোল মুখে প্রসন্ন হাসি। লাজে ভয়ে থরো থরো তবুও,

বারেক দেখা দিলেন বিন্ধ্যবাসিনী। শরমের বাধা না মেনে বললেন,—নারায়ণের পুজা যদি স্বয়ং আপনি করেন তবেই এই ব্যবস্থা হবে, নয়তো নয়!

ব্রাহ্মণ স্তব্ধ হয়ে থাকেন। দেখতে দেখতে হতভম্ব। বাহন-ছাড়া প্রতিমা দেখেন চোখের সমুখে।

মুহূর্ত্তমধ্যে সেই সহাস মূর্ত্তি আর দেখা যায় না। কথার শেষে অদৃশ্য হন বিন্ধ্যবাসিনী।

আকাশের চাঁদ দেখা যায়। মেঘের আবরণে কখনও ঢাকা থাকে, দেখা যায় না। ব্রাহ্মণের চোখে তাই যেন ব্যর্থ দৃষ্টি। বাহন-ছাড়া প্রতিমা আর দেখা যায় না।

মাধবীর গন্ধ থমকে থাকে ঘাটের চাতালে। মাধবীর স্তবকে স্তবকে কালো-ভ্রমরের গুঞ্জন।

বীণানিন্দিত মধুর স্বরে মৃদু-মৃদু সঙ্গীত, না শুধুই কথা! দৈববাণী না সত্যিই কোন পুরনারীর সুমিষ্ট কণ্ঠ! আকাশের বিদ্যুতের মত ক্ষণেক দেখা দিয়ে যিনি অন্তর্হিতা হ'লেন তিনি কে? চাঁপাফুলের মত গাত্রবর্ণ, অথচ সে-অঙ্গ নিরাভরণ। ঘন-কালো কুঞ্চিত অলক-কেশ বন্ধনহীন। সুদীর্ঘ, চঞ্চল, আবেশময় চোখে কজ্জলপ্রভার কোন চিহ্ন নেই। প্রগলভ-যৌবনা স্বভাবতই অহঙ্কারী হয়, কিন্তু দর্শনদানের সঙ্গে সঙ্গে যে-সুন্দরী অদৃশ্যা হ'লেন, তিনি যেন কোমলা, স্নেহময়ী, বর্ষার আকাশের মত যেন সিক্তশীতলা। ঐ রূপবতীর দেহায়তন এখনও যেন সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত নয়। মুখাবয়বে বালিকাভাব প্রচ্ছন্ন। প্রশান্ত মাধুর্য্য যেন সেই অতুলনীয় রূপে। ললাটতলের ভ্রূ-যুগ অতি সূক্ষ্ম ও নিবিড় কালো; যেন চিত্রাঙ্কিত। চোখের দৃষ্টি যেন শান্তজ্যোতিঃ। এ সৌন্দর্য্যপ্রভায় কারও মন প্রদীপ্ত হয় না। আগুনের মত দগ্ধ করে না; অর্দ্ধস্ফুট পদ্মের মত শুধু আকৃষ্ট করে। দাহিকা নেই, আছে শুধু মধুগন্ধ। হর্ষবিকসিত রক্তিম অধরে অস্ফুট মিষ্টি হাসি যেন।

মিষ্টি হাসিতে দৃষ্টি খায়। কথা বলতে বলতে মুখ টিপে টিপে যেন অসংবৃত হাসি হেসেছিলেন রাজকুমারী। ব্রাহ্মণের দৃষ্টি বিভ্রান্ত হওয়ার উপক্রম হয়। অন্য আর কিছু চোখে পড়ে না, ব্রাহ্মণের দৃষ্টিপথে কেবল সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপমাধুরী। কর্ণকুহরে যেন সঙ্গীত-সুধা! চঞ্চল মন।

তুর্কীনাচন নাচতে নাচতে কোথা থেকে ফিরে আসে পরিচারিকা। তুরঙ্গের ঘোড়ার মত তার চালচলন। জমিদার-নন্দিনীর কথা আর দেখা দেওয়ায় অখুশী হয়েছে যশোদা। অজ্ঞাতকুলশীল একজনের সমুখে ঘরের বৌ দেখা দিয়েছে, মন থেকে পছন্দ করতে পারেনি সে আদপেই।

—কি গো ঠাকুর, দেখে যে চোখ দু'টো ঠিকরে বেইরে আসছে!

পরিচারিকার কথায় তাচ্ছিল্যভরা বিদ্রূপ। চোখে কটাক্ষ। তুর্কীনাচন নাচতে নাচতে আসে আর বলে। হাতে তার কচুপাতায় ফুল-তুলসী।

আসমানের ঘাটের এক পৈঠায় স্তব্ধ হয়ে ব'সেছিলেন ব্রাহ্মণ। কোদাল-কাটা আকাশে চোখ তুলে নিবিষ্টচিত্তে কি যেন চিন্তা করেন। ব্রাহ্মণকে নিরুত্তর থাকতে দেখে পরিচারিকা আবার বললে,—আগে জানলে কে রাখতো তোমার শালগ্রামের নুড়ি! এখন হাত-পা ধুয়ে এসো আমার সনে, ভাবনা পরে ভেবো 'খন।

—কুত্র? কোথায়?

ব্রাহ্মণ প্রশ্ন করেন গম্ভীর স্বরে। দুই ভুরু বক্র হয়ে ওঠে। চোখের দৃষ্টিতে যেন কোন কৌতূহল নেই, আছে শুধু বিস্ময়।

কৃত্রিম ও শ্লেষপূর্ণ হাসি হাসলো যশোদা। বললে,—ভয় নেই, যমের দক্ষিণ-দুয়োরে নয়। তোমার নারায়ণ যে পুজো পায়নি এখনও।

ঈষৎ বিচলিত হয়ে ওঠেন ব্রাহ্মণ। তবুও ঘাটের পৈঠা ত্যাগ ক'রে গাত্রোত্থান করলেন। আসমানের সবুজ-কালো জলে নেমে পা ধৌত করলেন। বললেন,—তোমাকে দাসী মনে হয়, তুমি কে, তাই শুনি?

—আমি? আমি আর কে! পরিচারিকার কথা যেন হতাশ-করুণ।

বলে,—তোমার অনুমানই ঠিক। আমি দাসী-বাঁদী ছাড়া আর কি! তবে অশূদ্দুর, বামুনের মেয়ে।

ভিজে পায়ের ছাপ পড়ছে ঘাটের শুষ্ক-মলিন ধাপে। ঘাটের চাতালে উঠে ব্রাহ্মণ বললেন,—আর একজন, তিনি কে? মনে তো হয় কোন সম্ভ্রান্তবংশীয়া! এই ভগ্নপ্রাসাদেই বা কেন?

যশোদার চোখে ফুটলো রোষদৃষ্টি। মুখভঙ্গী যেন বিকৃত হয়। বলে,—গপ্পগাছার ফুরসৎ নেই অত! জমিদার কেষ্টরামের ইস্ত্রী উনি, আর কিছু জানি না। জেনেও বলবো নি।

—জমিদার কৃষ্ণরাম!

কথা ক'টি স্বগত করলেন ব্রাহ্মণ। তাঁর মনে যেন কিছু পুরানো স্মৃতি জাগরূক হয়। প্রশস্ত ললাটে স্মরণরেখা দেখা দেয়।

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিচারিকা অগ্রসর হয় গৃহাভ্যন্তরের পথে। তার সশব্দ পদক্ষেপ বিলীয়মান।

কয়েক পল অতীত হয়ে যায়, খেয়াল থাকে না ব্রাহ্মণের। অতীতের চিত্র তাঁর চোখে। ভুলে-যাওয়া দিনের ছবি। পরিচারিকাকে আগুয়ান দেখে অগত্যা ব্রাহ্মণও সেই পথে চললেন। অস্ফুট উচ্চারণে কি এক মন্ত্র আওড়াতে থাকেন আর দ্রুত পদে এগিয়ে চলেন। বলেন,—ওঁ প্রসুপ্ত-ভুজগাকারাং……বিদ্যুৎকোটিপ্রভাং…শৃঙ্গারাদিরসোল্লাসাং, ইত্যাদি।

ব্রাহ্মণ কুলকুণ্ডলিনী-ধ্যানের মন্ত্র বলেন। প্রথম সন্ধ্যায় কুলকুণ্ডলিনী চিন্তা ও উত্থাপন করতে সচেষ্ট হন। দীঘির জলে নেমে পঞ্চশুদ্ধির মন্ত্র বলা আগেই শেষ হয়েছে—আত্মস্থান-মন্ত্র-দ্রব্য-দেহশুদ্ধির মন্ত্র। মাধবীলতার শাখা থেকে ছিন্ন করেছেন সগন্ধ মাধবীর একটি গুচ্ছ। হাতের ফুল হাতে থাকে না। ঘাটের দ্বারপ্রান্তে অর্ঘ্যদান করেন কা'কে যেন। দ্বারশুদ্ধির মন্ত্র বলেন আর দ্বারদেবতাকে পুষ্পার্ঘ্য দেন। দ্বারপূজার পর গৃহপ্রবেশ করবেন, এই বাসনায়।

পথ রোধ হয়ে যায় সহসা। কোষমুক্ত বাঁকা তলোয়ার সমুখে উদ্যত।

মেঘলা-দিনের অল্প-আলো, তবুও তরবারির চাকচিক্য মিলায় না। ব্রাহ্মণ দেখলেন এক বর্মধারী প্রহরী। অস্ত্রাঘাত নিবারণের জন্য সাঁজোয়ার অঙ্গাবরণ। প্রহরীর মুখ দেখা যায় না, লৌহশিরস্ত্রাণে আচ্ছাদিত। হাতের অস্ত্র স্থির, অকম্প।

প্রহরী কথা বলে খাঁটি উর্দ্দু। যা বলে, তার অর্থ বোধগম্য হয় ব্রাহ্মণের। কিঞ্চিৎ দক্ষতা আছে তাঁর নবাবী ভাষায়। এখন মহম্মদীয় জয়ধ্বজা উড়ছে বঙ্গদেশে, একটু-আধটু ফার্সী না জানলে চলে না।

প্রহরী বলে,—পরিচয় ব্যক্ত কর অচিরাৎ, নতুবা সমুচিত শাস্তি আছে বরাতে। এখানে আগমনের হেতুই বা কি ?

ব্রাহ্মণও নিষ্কম্প। তাঁর বক্ষ উদ্ধত। উঁচানো তরোয়াল বুকের কাছে, তবুও সহাস মুখ। ভয়লেশহীন চক্ষু। কিন্তু বাক্য নেই মুখে।

প্রহরীর ধৈর্য্যচ্যুতি হয়। আবার বলে,—নীরব কেন, তুমি কি বধির না মূক ? উত্তর দানে অধিক বিলম্ব হয়তো তরোয়াল আর স্থির থাকবে না।

প্রশ্ন শুনে ঈষৎ হেসে ব্রাহ্মণ বললেন,—সেখজী, পাগলের গো-বধে আনন্দ হয়, তুমি যদি ব্রাহ্মণ-বধে খুশী হও তো নিশ্চিন্তায় অস্ত্রচালনা করতে পারো, আমি বাধা দিব না। তবে আমি তস্কর নই। আমি দোষমুক্ত।

অনেক দূরের কোন এক গবাক্ষ থেকে কে যেন এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে শিউরে শিউরে ওঠে!

প্রহরী আবার রুষ্ট কণ্ঠে বলে,—এখানে কেন তাই বল, কথার বেয়াদপি শিকেয় তুলে রাখো।

ব্রাহ্মণ ইদিক-সিদিক দেখেন ব্যগ্র চোখে। কোথায় গেল পরিচারিকা! কা কস্য পরিবেদনা, কেউ কোথাও নেই।

আকাশে মেঘ ডাকছে। গুমোট আবহাওয়া কেঁপে কেঁপে ওঠে অস্ফুট মেঘগর্জ্জনে। বাতাস থমকে আছে। গাছের পাতাটি পর্য্যন্ত অনড়, অটল।

পরিচারিকার কথা ভেসে আসে কোথা থেকে! কোন দ্বারপ্রান্ত থেকে। ব্রাহ্মণের মৃত্যু আসন্ন দেখে ভয়ে জড়সড় হয়ে কোথায় আত্ম-

গোপন করেছে যশোদা। কথা বলছে ভয়ে ভয়ে! বলে,—প্রহরী, অস্ত্র নামাও! বৌঠাকরুণ হুকুম করেছেন, নারায়ণের পুজো করবেন ঐ ঠাকুর-মশাই।

তবুও অস্ত্র নামে না। কোষমুক্ত তরবারি যেমনকার তেমনি উঁচিয়ে থাকে প্রহরী। জলদগম্ভীর কণ্ঠ প্রহরীর, —হুজুরের হুকুম নেই। জমিদারের জমাদার আমি, শেষে কি খামকা আমার গর্দ্দানটা যাবে!

—সেখজী! যে নিরস্ত্র ও নিরপরাধী তাকে আক্রমণ করা বীরোচিত কাজ নয়। কার আকুল আহ্বান শুনে প্রহরী ফিরে দেখলো। তার দুই চোখ থেকে যেন অগ্নি স্ফুরিত হয়! বিনা ব্যবহারে একেই তরবারিতে মরিচা পড়েছে। হাতের নাগালে শিকার পেয়ে প্রহরী যেন তাই হিংস্র ও রক্তলোলুপ হয়ে উঠেছে। মুষ্টিবদ্ধ অস্ত্র যে নামে না!

দুই বিশাল চক্ষুর কটাক্ষ-সন্ধান, এই প্রথম দেখেছে পাঠান প্রহরী। অন্দরের গভীর ছায়ান্ধকারে যে তন্বী দণ্ডায়মানা, তার অপরূপ রূপরাশি এই প্রথমে দেখলো প্রহরী। সৌন্দর্য্য-প্রভাপ্রাচুর্য্যে মন প্রদীপ্ত হয়। সুন্দরীর স্থির ধীর শুভ্র-কোমল মুর্ত্তি কেন কে জানে, প্রহরীর হৃদয়মাঝে যেন বিষধর দন্তের দংশন-জ্বালা জাগিয়ে তোলে। প্রহরীর ভঙ্গী-ভাবে ঔৎসুক্য প্রকাশ পায়। প্রবল পাঠান ওষধির গুণে যেন ক্রমে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। হাতের অস্ত্র নামতে থাকে ধীরে ধীরে।

—পাঠান জাতির মুখে কলঙ্ক দিতে চাও? জাত-পাঠান সম্মুখ-সংগ্রাম ছাড়া অস্ত্র ধরে না।

অন্দরের ছায়ান্ধকার কাঁপিয়ে দীপ্তকণ্ঠে কথা বলে সেই নারীমূর্ত্তি। প্রহরী চিত্রাপিত পুতুলের মত নিস্পন্দ। বিহ্বল ও হতবুদ্ধি। বাক্যহীন জড় যেন। তার স্থিরদৃষ্টি আর ফিরে না। ঐ চাঁদমুখে কত শোভা! জ্যোৎস্নাঝলিক প্রতি অঙ্গে।

—একজন পুজারীর প্রয়োজন আছে। নারায়ণকে বিনি পুজায় রাখা হিন্দুর চরম পাপ। তাই ঐ ব্রাহ্মণকে ডাকিয়েছি আর কেউ নয়, আমি।

সুন্দরীকে দেখে কার না চিত্তচাঞ্চল্য আসে? সুন্দরীর কথায় কে না মুগ্ধ হয়? যে না হয় সে বনচারী পশু, কিংবা হিমালয়-গুহাবাসী সন্ন্যাসী। পাঠান তো ছার!

তলোয়ার কোষে রেখে প্রহরী পর পর এক শত সেলাম ঠুকলো আনত-ভঙ্গীতে। যুক্তকরে বললে,—মাফ করুন বেগমসাহেবা! আমি আন্দাজ করেছি এক বদজাত, খিড়কি পেরিয়ে এমারতের অন্দরে ঢুকছে বদ মতলবে। দৌলত লুঠতে এসেছে!

জমিদারনন্দিনীকে এই প্রথম দেখলো প্রহরী, চোখের সমুখে। দেখে আর চোখ ফেরে না।

—চিন্তার কোন কারণ নেই। বললেন বিন্ধ্যবাসিনী, আকপাল গুণ্ঠন টেনে। বললেন,—তুমি তোমার ডেরায় যাও। অন্দরে আর আসিও না।

ব্রাহ্মণ নিশ্চুপ, স্মিত হাস্যরেখা তাঁর ভয়হীন মুখে। নীরব দর্শক যেন। পাঠান কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হয় জমিদারণীর আদেশ-বাক্যে। অপমান বোধ করে। ব্যঙ্গের স্বরে বলে,—বেগমসাহেবা, কাজী হয় পাজী, পাজী হয় কাজী! আর বামুন গণক কাউয়া, তিন পরের খাউয়া।

ব্রাহ্মণ যেন বিচলিত হন এ কথায়। তবুও হাসির রেখা মিলায় না মুখ থেকে।

বিন্ধ্যবাসিনীর মুখ যেন কালিমা-প্রাপ্ত হয় প্রহরীর উদ্ধত কথায়। হাতের মুঠি দৃঢ়। লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে কর্ণমূল। বললেন,—আর কথায় কাজ নাই, তুমি বিদায় লও এখন।

সেলাম ঠুকে, আগন্তুকের প্রতি একবার রোষদৃষ্টি হেনে প্রহরী স্থান ত্যাগ করলো। বর্মধারীর সাঁজোয়া পোষাকের সঙ্গে তরবারি-কোষের ঘর্ষণে শব্দ ওঠে ঘন [illegible]।

ব্রাহ্মণ দৃষ্টি [illegible]য়ে দেখলেন, আবার অদৃশ্য হয়েছে সেই নারীমূর্ত্তি। আছে

শুধু পরিচারিকা। ভয়ে ভয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক পাশে। মুক্ত তরবারি দেখে ভয় পেয়ে হয়তো কাঁপছে ঠক-ঠক।

—চল' ঠাকুর চল'। প্রহরী ফের যদি এসে হাজির হয়! যশোদা কথা বলে ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে। বিস্ফারিত চোখ তার। কথা বলতে বলতে এগিয়ে চলে ভয়ে ভয়ে। আবার যদি হঠাৎ কোথাও থেকে নাকের ডগায় এগিয়ে আসে ধারালো তলোয়ার!

বাইরে মেঘের গর্জ্জন না গাছ কাটছে কাঠুরিয়া? ভোরের থমকানো ঠাণ্ডা হাওয়া শিউরে শিউরে ওঠে বিকট শব্দে। কাঁধে কুড়ুল চাপিয়ে বন কাটতে বেরিয়েছিল কাঠুরিয়া। বন কেটে কেটে যেন পরখ করবে কুড়ুলের কত ধার! তীক্ষ্ণধার কুঠারের আঘাতে আঘাতে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়ছে গাছের শাখা-প্রশাখা। গাছের আর্ত্তনাদ না মেঘের ডাক, অনুমানে বোঝা যায় না অন্দরের পথ থেকে।

ভগ্নপ্রাসাদে আছে অসংখ্য প্রকোষ্ঠ। পরিত্যক্ত, অপরিচ্ছন্ন। কত দিন ঝাঁট পড়েনি কে বলবে? কোন কক্ষ অন্ধকারময়, কোন কক্ষের বাতায়ন অর্গলহীন, তাই আলোকপূর্ণ। কাঠের কবাটে ঘুণ ধরেছে। ঘরে ঘরে আরশুলা আর চামচিকার বাসা। কোন কক্ষে শূন্য কলসী, ভগ্নপাত্র, ছিন্নবস্ত্র! কোথাও বা মরা বিড়ালের দাঁত-খিঁচানো খুলি। পায়রার পাখনা! ছেঁড়া চাটাই! বঁটি, ঝাঁটা। কয়লা ময়লা। সাপের খোলস।

একদা বসতি ছিল, আজই না হয় শূন্য। কেউ সিঁদোয় না। ঘরের দেওয়ালের চুণ-বালি খ'সে পড়েছে। কাঠের কড়ি-বরগায় উই। ফুঠো ছাদ, আকাশ দেখা যায়।

আসমানের সংসার ছিল এই আলয়ে। জমিদার কৃষ্ণরামের মুসলমানী পত্নী না উপপত্নী, আসমানীর সাজানো ঘর-দোর আজ ভগ্নপ্রায়। রূপসী আসমানীর কাণে হরিনাম শুনিয়ে তাকে জাতে তুলেছিলেন কৃষ্ণরাম। আমোদরের তীরে এই বিশাল গৃহে আসমানীকে রেখেছিলেন ধনসম্পদের মাঝে।

কে যেন হত্যা করেছিল আসমানীকে! কোন্ এক গভীর রজনীতে পাওয়া আর না পাওয়ার খেলায় জান হারিয়েছে সে।

—বৌ!

শঙ্কিত কথার স্বর যশোদার। এখনও যেন বুক ধুকপুক করছে। ড্যাবা ড্যাবা চোখ, পলক পড়ছে না। বললে,— বৌ! খুন-জখম করবে না তো প্রহরী?

সলজ্জায় গুণ্ঠন টানলেন রাজকুমারী। নৈবেদ্য রচনার কাজে হাত দিয়েছিলেন এক কক্ষমধ্যে। চাল ধৌত করছিলেন। ফিসফিসিয়ে বললেন,—না, ভয় নাই।

কক্ষ প্রায় অন্ধকার। তবু অন্যান্যের তুলনায় তত ধূলিধূসর নয়, হয়তো সদ্য-পরিষ্কৃত। পিতলের পিলসুজে দীপ জ্বলছে। দীপালোকে কক্ষাভ্যন্তর অস্পষ্ট লক্ষ্য করা যায় বাহির থেকে।

পরিচারিকা বললে,—পুজোর জোগাড় কত দূর? আমি তো ভয়েই মরি। কাজের জোগান দেব কোথায়, হাত পা পেটের মধ্যে সিঁদিয়েছে যেন!

—জোগাড় প্রায় শেষ। ফিস-ফিস বললেন রাজকন্যা। নৈবেদ্যর পাত্রে চালের চূড়ো গড়তে গড়তে বললেন।

—ব্রাহ্মণ অপেক্ষা করছে যে!

কথা বলতে বলতে দ্বারপ্রান্তে ব'সে পড়লো যশোদা।

আরও কিঞ্চিৎ গুণ্ঠন টানলেন বিন্ধ্যবাসিনী। চোখ ফিরিয়ে দেখতে মন চাইলেও ফিরে যেন তাকানো যায় না।

একটি বার দৃষ্টিপথে আসায় কক্ষমধ্যে চোখ পড়েছিল। তৎক্ষণাৎ চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আকাশে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন ব্রাহ্মণ। পরনারী, পুরবাসিনী, অসূর্য্যম্পশ্যা, দর্শনেও পাপের সঞ্চয়। তদুপরি এক দৈবকার্য্যে রত। দীপের আলোয় দেখা যায় কক্ষের দেওয়াল-গাত্রে বসুধারার ফোঁটা। শুষ্ক সিঁদূর আর ঘৃতের ধারা। বসুধারার সারি। কে কবে হয়তো শুভ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছে, তারই চিহ্ন আঁকা রয়েছে। কোন আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে গৃহভিত্তিতে কে এঁকেছে বসুধারা?

লজ্জায় লাল হয়ে উঠতে হয়। গুণ্ঠন টানতে হয় ঘন ঘন। প্রহরী তলোয়ার দেখিয়ে বাধা দিয়েছে, অকথা-কুকথা শুনিয়েছে,—এ লজ্জা যেন আর গোপন থাকে না। বিন্ধ্যবাসিনীর নারী-মন সঙ্কোচে জর্জর।

ব্রাহ্মণ অকস্মাৎ লক্ষ্য করেছেন, এক শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত বেদীমূলে নৈবেদ্য রচনায় রত সেই অনিন্দ্যসুন্দর রূপের অধিকারিণী। দীপের আলোয় চোখে পড়ে সাবগুণ্ঠনা রমণীর শুভ্র বাহু আর চিবুক মাত্র। মূর্ত্তির পিছনে রুক্ষ কেশের রাশি, ভূমি স্পর্শ করেছে।

কেন কে জানে, মনে হয়, আর কখনও এমন অলৌকিক রূপরাশি হয়তো দেখা যাবে না! আকাশ থেকে চোখ ফিরিয়ে প্রকোষ্ঠমধ্যে আরেকবার দৃক্-পাত করতেই দেখা যায়, কক্ষ শূন্য। দীপের উজ্জ্বল শিখা নিথর হয়ে আছে। প্রস্তরবেদীতে এক খণ্ড লাল চেলী। চেলীতে ফুলের স্তূপমধ্যে কৃষ্ণমূর্ত্তি শিলা। বেদীমূলে পূজার উপকরণ শাঁখ-ঘণ্টা, ফুল-নৈবেদ্য, সধূম-ধূনুচি।

কক্ষস্থ অন্য এক দ্বার খুলে কোন্ পথে কখন নীরবে বেরিয়ে গেছেন রাজকুমারী। অবগুণ্ঠনের কিয়দংশ সরিয়ে অনিমেষ চক্ষুতে দ্বারপ্রান্তে দেখেছেন একবার।

ব্রাহ্মণ হতাশ-শ্বাস ফেললেন।—দেখলেন পূজার সকল ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ। শুধু সেই অলৌকিক রূপরাশি আর দেখা যায় না।

নিবু-নিবু দীপ বিন্দু বিন্দু তৈলে আবার ধীরে ধীরে জ্বলে। তাপদগ্ধ শুষ্ক-শাখা বর্ষাধারায় আবার পল্লবিত হয়। এই পাণ্ডববর্জ্জিত দেশে, ব্রাহ্মণকে দেখতে-পেয়ে বিন্ধ্যবাসিনীও যেন পুনর্জ্জীবন পেয়েছেন।

কেবল ঐ দুর্মুখ প্রহরী যদি না তলোয়ার উঁচিয়ে কটু-কাটব্য ক'রতো! কি লজ্জা, কি লজ্জা!

দ্বারে ছিল পরিচারিকা। নীরবতা ভঙ্গ করলো হঠাৎ কথায়। বললে,—যাও গো ঠাকুর, পুজোটা চুকিয়ে দাও।

কেমন যেন ইতস্ততঃ ভাব ব্রাহ্মণের। অপরিচয়ের সঙ্কোচ। কি যেন চিন্তা করেন মনে মনে, মুখভাবে অসম্মতি যেন।

মৃত্যুকে ভয় নেই। তবুও মরণে আপত্তি আছে। অপঘাতে মৃত্যু বরণ করতে প্রস্তুত নয়। ঘোর দুশ্চিন্তার ছায়া ব্রাহ্মণের চোখে-মুখে। কক্ষে প্রবেশ করতে যেন পা চলে না, মনের দ্বিধায়। আকাশে চোখ তুললেন ব্রাহ্মণ। কালো মেঘ আকাশে। আগ্নেয়গিরির কালো ধোঁয়ার মত বিস্তীর্ণ ও বৃহৎ একখানি মেঘ। আকাশের দক্ষিণ-পশ্চিম দিক জুড়ে উড়ে আসছে মন্থরগতিতে। কালো মেঘ দেখে ব্রাহ্মণ যেন আরও বেশী ভাবিত হন। আজ না হয় পূজাটা সেরে দেওয়া যাবে, কিন্তু প্রতিদিন কে আসে পূজা করতে! ব্রাহ্মণ মৃত্যুভয়হীন, কিন্তু গুপ্তশত্রুর হাতে মরণ বরণ করতে পরাঙ্মুখ। প্রতিদিন গমনাগমনে একদিন না একদিন দৃষ্টি পড়বে ঐ সঙ্ঘারামের বৌদ্ধ-তান্ত্রিকদের।

আমোদরের তীরে আছে এক বৌদ্ধ-মঠ। বিশাল অশ্বত্থের ছায়ায় লুকানো। মঠের চূড়া নজরে পড়ে না ঐ মহীরুহের অন্তরাল থেকে। অন্ধকার রাত্রে, শুধু দেখা যায় মঠের আলো। কষ্টির মূর্ত্তি আছে মঠে। তপস্যা-ক্লিষ্ট, শীর্ণ বুদ্ধমূর্ত্তি। বৌদ্ধতন্ত্রমতে পূজা হয় মঠে। নির্ব্বাণ-দীপ জ্বলে, রাত্রির আঁধারে সেই আলোক-পরিধি ক্রমে বর্দ্ধিতায়তন ও উজ্জ্বলতর হয়। বৌদ্ধ-তান্ত্রিকগণ গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত পূজা ও ধ্যান করেন! মঠের চতুর্দ্দিকে নর-কপালের ছড়াছড়ি। মঠাভ্যন্তরের দেওয়ালগাত্রে আছে নানা ধরণের শাণিত অস্ত্র। খড়্গ, কৃপাণ, তরবারি, তীর, ধনুক। সম্রাট বুদ্ধের অহিংস বাণী বিস্মৃত হয়েছে তান্ত্রিক-সন্ন্যাসীর দল। বিধর্ম্মী, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগের নিস্তার নেই সঙ্ঘারামের সন্ন্যাসীদের হাতে। উচ্চনীচ জাতিধর্ম্মের ভিন্নতা রক্ষা করে ব্রহ্মধর্ম্মাবলম্বীরা। বুদ্ধ অবতারকে হয়তো অমান্য করে। তাই কোন ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ পাওয়া মাত্র ক্রোধান্ধ হয়ে ওঠে এই অহিংস পথের যাত্রীরা। শাণিত অস্ত্র সাহায্যে তার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করে। মৃতের দেহ বন্য শৃগাল কুকুরের মুখে নিক্ষেপ করে।

শঙ্কায় নির[illegible]কা পুরুষোচিত নয়। এই ভেবে ব্রাহ্মণ সেই কক্ষে

প্রবেশ করলেন এবং বেদীমূলের কুশাসনে আসীন হ'লেন। মৃদু-মন্দ কণ্ঠে বলেন,—ওঁ তৎসৎ। আরও কি যেন বলেন, অন্যান্য মন্ত্র অশ্রুত থাকে।

মন্ত্র বলার সঙ্গে সঙ্গে আচমনের রীতিতে ব্রাহ্মণ দক্ষিণ হস্ত গোকর্ণাকৃতি করেন। অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠা মুক্ত রেখে তর্জ্জনী, মধ্যমা, ও অনামা সংহত ও উর্দ্ধমুখ করলেন। করতল সঙ্কুচিত হয়, হাতে ব্রাহ্মতীর্থ রচিত হয়। অঙ্গুষ্ঠ-মূলের নিকটে যাতে একটিমাত্র মাষকলাই নিমগ্ন হয়, সেই পরিমিত জল ধারণ করেন।

—মহাশয়ের নাম?

বামাকণ্ঠের বাণী। এক দ্বারের কাষ্ঠের কবাট ঈষৎ মুক্ত করে কথা বললেন কে যেন। কণ্ঠস্বর অতি সুমিষ্ট।

ইতি-উতি দেখলেন ব্রাহ্মণ। কক্ষের চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করলেন। কিন্তু প্রশ্নকারিণীকে দেখা গেল না। ব্রাহ্মণের চক্ষু ফিরতেই ঈষৎ মুক্ত কবাট বন্ধ হয়ে গেছে। কে-ই বা প্রশ্ন করে, কা'কেই বা উত্তর দেওয়া যায়? ব্রাহ্মণ আচমনের জল মুখে তুলবেন, আবার সেই বামাকণ্ঠ। কথার সুরে যেন কৌতূহলী হাসি।

—পরিচয় দানে বাধা আছে কি? আমা দ্বারা কোন ক্ষতির আশঙ্কা নেই।

কক্ষমধ্যে চন্দনধূনার গন্ধ। টাটকা ফুলের সুবাস। অতি উজ্জ্বল প্রদীপালোক। ঘৃতের প্রদীপ জ্বলছে। নিথর শিখা।

দ্বিতীয় প্রশ্ন শুনে ব্রাহ্মণ ভাবেন, আর নীরব থাকা উচিত নয়। এক হিন্দু কুলনারী, অন্তঃপুরবাসিনী, সম্ভ্রান্ত-বংশীয়া, তদুপরি কুলীনশ্রেষ্ঠ কুলীনকুলচূড়ামণি জমিদার কৃষ্ণরামের না কি সহধর্ম্মিণী—তাঁর দ্বারা কোন্ অপকারই বা সম্ভব! ব্রাহ্মণ বিনম্র স্বরে বললেন,—নাম শ্রীচন্দ্রকান্ত দেবশর্মা! জাতিতে গৌণকুলীন। যাজনিক ও শিক্ষাদানের ক্রিয়া-কর্মে অনধিকারী নই।

—মহাশয়ের নিবাস কোথায়? যদি বাধা না থাকে তো জেনে রাখি।

ক্ষণেক নীরবে থাকেন ব্রাহ্মণ। ঠিকানা ব্যক্ত করবেন কি না চিন্তা

করেন। ইতস্ততঃ কণ্ঠে বললেন,—নাম ধাম এ সকল কিছু জানাতে বিপত্তি নাই, যদি গোপন থাকে।

—গোপন কেন? আত্মগোপনের রহস্য কি?

—আছে। রহস্য আর কিছুই নয়, বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের ভয়! গুপ্ত আক্রমণের ভয়। অপঘাতে নিপাত যাওয়ার ভয়। ব্রাহ্মণ দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে বৌদ্ধ তান্ত্রিকের দল। অতর্কিতে আক্রমণ করে, হত্যা না করা পর্যান্ত ক্ষান্ত হয় না। তাই আত্মপরিচয় গোপন রাখাই শ্রেয়ঃ। আমার আসা-যাওয়ার সংবাদ সঙ্ঘারামে পৌঁছলে আর নিস্তার নাই।

প্রশ্নকারিণীর কণ্ঠস্বর যেন শান্ত, বেদনাহত! মুক্ত কবাটের ফাঁক থেকে মিহি সুরের কথা ভেসে আসে,—আমার দ্বারা কোন ক্ষতির ভয় নাই। আমি কা'কেই বা চিনি! সঙ্ঘারাম কোথায় তা-ও জানি না।

চন্দ্রকান্ত বললেন,—নিবাস আসমান-দীঘির অপর তীরে। এই গ্রামের নাম মান্দারণ, মধ্যে আসমান-দীঘির ব্যবধান, দীঘির শেষে মধুবাটী গ্রাম। বসতি সেখানেই।

—মহাশয়ের টোল না চৌবাড়ী? শিষ্যসংখ্যাই বা কত?

—সামান্য এক ক্ষুদ্র টোল, শিষ্যের সংখ্যা কতই বা হবে, পঞ্চবিংশতিও নয়। জনা কুড়ি।

ঈষন্মুক্ত কপাট ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়। আরও কোন প্রশ্ন যদি আসে তাই পূজায় মন বসে না। ব্রাহ্মণ প্রশ্নের অপেক্ষায় প্রস্তরমূর্ত্তির মত ব'সে থাকেন। দক্ষিণ হস্ত গোকর্ণাকৃতি হয়ে আছে কতক্ষণ। আচমনের জল হাতে। আর কোন শব্দ নেই। নারীকণ্ঠ আর কথা বলে না। ব্রাহ্মণ পূজায় মনোনিবেশ করেন। আচমনের শেষে নারায়ণের স্নানমন্ত্র শুরু করলেন,—ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ…ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য…

এক তাম্রপাত্রে সচন্দন তুলসীর 'পরে শালগ্রাম স্থাপন করলেন পূজারী। শিলার মস্তকে দিলেন তুলসীপত্র।

ধুনুচির ধোঁয়া এঁকে-বেঁকে ওঠে। ধূম্রজাল রচনা হয় চন্দ্রকান্তর আশ-পাশে। অতি ভক্তিভরে তিনি নারায়ণের স্নানকার্য্য সমাধা করেন। অর্ঘ্যাদি ন্যাস করবেন এখনই।

কাঠুরিয়া গাছ কাটছে না মেঘ ডাকছে? কড়-কড় শব্দ আসে যেন আমোদরের অন্য তীর থেকে, যেখানে ঘন জঙ্গল। ঘোরতর অন্ধকার দিগন্তে। গন্ধের তরঙ্গ আসছে বনমল্লিকার বন থেকে। ঝড়-বৃষ্টি হয়তো আসন্ন, ভয়ার্ত্ত কাক ডাকাডাকি করছে তারস্বরে। বিদ্যুৎ চমকে চমকে উঠছে থেকে থেকে।

বিন্ধ্যবাসিনী চুপি চুপি ডাকলেন,—যশো, যশোদা, বলি ও যশোদা! মরলে না কি, সাড়া নেই কেন?

পূজার ঘরের দ্বারপ্রান্তে ছিল পরিচারিকা। উবু হয়ে ব'সে দেখছি হয়তো ব্রাহ্মণের পূজাপদ্ধতি। উঠে দাঁড়ালো সে। বললে,—বৌ, বিধবার কি মরণ আছে কপালে! একশো বচ্ছর পেরমায়ু নিয়ে যে জন্মেছি! কি হুকুম তাই বল'।

হাস্যময়ী রাজকুমারী। হাসি-হাসি মুখ। আধো-ঘুম আধো-জাগা চোখে যেন উৎফুল্ল চাউনি। সহাস্যে বললেন,—তুই মরতে যাবি কেন? মরবো আমি। আগে আমি যাই, তার পর তুই যাবি। নয়তো কে আমাকে সাজিয়ে দেবে ফুলের সাজে? পায়ে আলতা দেবে কে?

বিরক্ত হয়ে ওঠে যশোদা। বলে,—রসিকতা রাখো, কি হুকুম তাই বল। মন মেজাজ ভাল নয় আমার। ভয়ে এখনও আমি কাঁপছি।

রাজকন্যা পরিচারিকার হাত ধরে টানতে টানতে এগোলেন। এক বৃহৎ তরুণী যেন রজ্জু-বন্ধনে টেনে নিয়ে যায় অন্য এক তরী। পরিচারিকা যেন শক্তিহীনা, পা চলে না তার। বললে,—কোথায় চললে এমন হনহনিয়ে?

খিল-খিল শব্দে হেসে উঠলেন বিন্ধ্যবাসিনী, লুটানো আঁচল বুকে তুলতে তুলতে। পূজার ঘর থেকে বেশ কিছু দূর অগ্রসর হয়ে যেন সশব্দে হাসতে সাহসী হলেন। কত দিন যে মুখে হাসি ফোটেনি, কে বলবে!

এত হাসির কি যে অর্থ বোঝে না পরিচারিকা। বিরক্তির সুরে বলে,—পাগল হ'লে না কি বৌ?

রাজকন্যা আরও জোরে হেসে উঠলেন। তাঁর উচ্ছ্বসিত হাসিতে যেন ভরাযৌবন টলমলিয়ে ওঠে। কপালের 'পরে নেমে-আসা রুক্ষ কুন্তল সরিয়ে দিতে দিতে বললেন,—সত্যি কথা বল্ তো যশো, পাগলে কি এত মিষ্টি হাসি হাসতে জানে?

বিকৃত মুখাকৃতি পরিচারিকার। ভয়ে আর আশঙ্কায় পরিপূর্ণ। ড্যাবা-ড্যাবা চোখ। কোন এক দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন যেন। যশোদা বলে,—আমাদের জমিদারের কানে গেলে কি যে পরিণাম হবে, ভাবতেও কণ্ঠরোধ হয়ে আসে আমার।

ক্ষণমধ্যে বিন্ধ্যবাসিনীর মুখে নামে কালো ছায়া। হাসি মিলিয়ে যায় রক্তিম অধরের। নিমেষের মধ্যে যেন তাঁর ভাবপরিবর্ত্তন হয়। রাজকন্যা বলেন,—তোমাদের জমিদারই বা জানবে কোথা থেকে? অন্যায় কি হল?

যশোদা বললে,—মানুষটাকে সরাসরি অন্দরে ডেকে আনলে, আগু-পাছু ভাবলে না একবার? প্রহরী যদি সাতগাঁয়ে খবর পাঠিয়ে দেয়?

শ্রাবণের মেঘ নামলো যেন বিন্ধ্যবাসিনীর মুখে। নীরব গম্ভীর হ'লেন। অপলক চোখে তাকিয়ে পাষাণের মত নিস্পন্দ হলেন। রাজকুমারীকে বাক্য-হীন দেখে পরিচারিকা আবার বলে,—কি ব'লবে তাই বল।

বিন্ধ্যবাসিনী পরিচারিকার শেষের কথায় খুশী হন, কিন্তু প্রকাশ করেন না। কম্পিতকণ্ঠে বললেন,—সিধেটা সাজিয়ে দেবে না যশো?

যশোদা বললে,—পারবোনি আমি। সিধে সাজাতে যে জানিনে। তুমিই দাও না কেন। তোমার রাঙা হাতের সাজানো সিধে দেখলে না জানি কত খুশীই হবে ঐ পূজারী ঠাকুর।

পরিচারিকার মুখ চেপে ধরলেন বিন্ধ্যবাসিনী। তার আরও যেন কিছু বক্তব্য ছিল, বলা হয় না আর। রাজকন্যার মিনতিপূর্ণ সুর। বললেন,—তোর পায়ে ধরি [illegible]।

আরও কি যেন বলতে চায় পরিচারিকা, থাকে অব্যক্ত। তার
রাজকুমারীর নখর নরম হাত। বিন্ধ্যবাসিনী আবার বললেন,—ভাঁড়ারে গি
সিধেটা সাজিয়ে দে ভাই। চাল, ডাল, ঘি, তেল আর কাঁচা শব্জী দি
সাজিয়ে দে।

কথার শেষে যশোদার হাত রাজকুমারী নিজের হাতে ধরলেন। যশো
আর কোন দ্বিরুক্তি করলো না। সেই স্থান ত্যাগ করলো তৎক্ষণাৎ।

পরিচারিকাও চলে গেল, বিন্ধ্যবাসিনীও ছুটলেন অন্য এক পথে। বুবে
আঁচল সামলে ছুট দিলেন ঊর্দ্ধশ্বাসে। প্রথমে একতলার লম্বমান দাল
অতিক্রম করলেন। উঠান, চাতাল পেরিয়ে ছাদের সোপান ধরলে
বিদ্যুৎগতিতে গৃহের ছাদে আরোহণ ক'রে ক্ষণেক দাঁড়িয়ে একটি দীর্ঘশ
ফেললেন। অনেকটা পথ পেরিয়েছেন, হাঁফ ধ'রে যায় যেন! কিন্তু কা
ক্ষেপ নয়, বিন্ধ্যবাসিনী আবার দৌড়লেন। বিস্তীর্ণ ছাদ পেরিয়ে চলে
খাস কামরায়। সেখানে আছে তার কাঁথা-মাদুর, পুঁটলী-প্যাটরা, কাপ
চোপড়।

আকাশ-দিগন্ত কেঁপে উঠছে থরথরো। বিদ্যুৎ চমকায় ঘন ঘন, সা
মত আঁকাবাঁকা। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মেঘ জমেছে দক্ষিণ-পশ্চিম আকাশে। বা
নেই বললেই হয়। গাছের পাতা স্থির হয়ে আছে। গুমোট গরম।

বিদ্যুৎশিখার মতই ছুটেছেন যেন সোনার বরণ রাজকন্যা। রুক্ষ এ
কেশরাশি উড়ছে পেছনে। ছুটতে ছুটতে ছাদ থেকে বারেক দেখলে
ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশের প্রতিবিম্ব নদীর জলে। আকাশের মত যেন থমা
আছে নদীর জল, প্রবাহ নেই। নদীর ওপারে বৃক্ষরাজি। চাষের জ
বর্ষণের লোভে লোভে চাষারা হাসি মুখে আল বাঁধতে বেরিয়েছে ক্ষে
খামারে। যে যার জমিতে আল বাঁধবে, বর্ষাজলের আগে।

বিন্ধ্যবাসিনী কামরায় পৌঁছে পালঙ্কে ব'সে পড়লেন। অনাহারে দুর্ব

'র আর বুঝি বয় না! সজোর শ্বাস পড়ছে রাজকন্যার। বক্ষ স্ফীত হয়ে
ছে ঘন ঘন। কপালে ফুটেছে স্বেদবিন্দু'

কালক্ষেপ নয়, এখনই যে কাজ সারতে হবে! পালঙ্ক ত্যাগ করলেন
জকন্যা। কলের চাবি ঘুরিয়ে প্যাঁটরা খুলে কি যেন তুলে নিয়ে লুকোলেন
ঞ্চলে। তারপর চাবি ঘুরিয়ে প্যাঁটরা বন্ধ করলেন। চাবি রাখলেন
মরার এক গোপন কুলঙ্গীতে।

ছাদ থেকে গৃহের ফটক লক্ষ্যে আসে। ছাদের হেথায়-সেথায় ধূলিজঞ্জাল
হয়ে আছে। কাণা কড়ি, সুড়ি-ঢেলা, মাটির ঘড়া-কলসীর ভাঙা-টুকরো
থাও স্তূপীকৃত। ছাদের নালা-নর্দ্দমার মুখে পাতখোলার রাশ।

বিন্ধ্যবাসিনী এক খণ্ড ঢেলা তুলে ফটক লক্ষ্য ক'রে সজোরে নিক্ষেপ
লেন। কোন সাড়া নেই দেখে আরেকটি তুললেন। একটি প্রস্তরখণ্ড।

প্রহরী ইতি-উতি তাকিয়ে দেখে সক্রোধে। কার এমন সাহস যে ঢ্যালা
ড় তার উদ্দেশে! বর্ম্মধারী পাঠানের দৃষ্টি এড়ায় না। দেখে হাতের
বন্দুকটা নামিয়ে নেয়।

বিন্ধ্যবাসিনী হাতছানি দিলেন। ডাকলেন। বস্ত্রাঞ্চল আন্দোলিত
লেন আহ্বানের ইশারায়।

বর্ম্মধারী প্রহরী দ্রুত এগিয়ে আসে গৃহের প্রান্তর পেরিয়ে। ছাদের নীচে
স দাঁড়ায় উর্দ্ধমুখে। লৌহশিরস্ত্রাণে আচ্ছাদিত পাঠানের মুখ দেখা যায় না।

একখানি রেশমী রুমাল কুণ্ডলীকৃত প্রায়, ছাদ থেকে নীচে ফেলতেই পাঠান
 নেয় অচিরাৎ। খুলে দেখে, এক বহুমূল্য রত্নহার। শিরস্ত্রাণে ঢাকা
প্রহরীর, নয়তো লক্ষ্যে পড়তো, ঐ নির্দ্দয়ের শ্রীমুখেও হাসি ফুটেছে।
রী গোটা কয়েক সেলাম ঠুকে আবার তাকালো ওপর দিকে।

রাজকন্যা সহাস্যে ও মৃদুস্বরে বললেন,—বকশিশ! তুমি লও।

আবার সেলাম ঠুকতে থাকে প্রহরী। দেশী বন্দুকটা নামিয়ে পর পর
ও শত খানেক সেলাম দেয়।

বিন্ধ্যবাসিনী আর এক পল দাঁড়ালেন না। ছাদ ত্যাগ ক'রে পূর্ব্ববৎ দৌড়

দিলেন। সিঁড়িতে নামলেন। তড়িৎগতিতে সোপানশ্রেণী ভেঙ্গে চললে ভাণ্ডারে। পরিচারিকা যশোদা নিশ্চিত এখনও সেখানেই আছে। ঝড়ের মত গিয়ে হাজির হ'লেন বিন্ধ্যবাসিনী। ঘন ঘন শ্বাস ফেলেন, কথা যেন আর বলা হয় না। হাঁফ ধরে বুকের মধ্যে।

যশোদা সিধা সাজানোর কাজ করছে তখনও। ধামায় চাল তুলেছে, ডাল তুলেছে। মৃন্ময়পাত্রে ঘি আর তেল ঢেলেছে। কাঁচা শাকশব্জী চাপিয়েছে চালের ধামায়।

কেমন যেন শ্রান্তকণ্ঠে রাজকুমারী বলেন,—দাসী, এই নাও দক্ষিণা। পুরোহিতকে দাও। আর বল একই সময়ে যেন তিন সন্ধ্যের পূজো চুকিয়ে যান। বার বার আসা-যাওয়ায় তাঁর যদি কোন বিপদের আশঙ্কা থাকে প্রত্যহ প্রাতঃকালেই পূজার স্থবিধা, তাও জানিও।

—একটি পৈতে যে দিতে হয় বৌ! কথা বললো আর হাত পাতলো পরিচারিকা। বিন্ধ্যবাসিনী তার হাতে দিলেন একটি আসরফি। বললেন, —এই দক্ষিণার সাথে মূল্য ধ'রে দিও। হাতে-কাটা পৈতা এখন কোথায় মেলে!

কথার শেষে কেমন যেন ক্লান্ত চরণে চললেন রাজবালা। এই ভাণ্ডার থেকে দোতলার উপরে খাস-কামরা, অনেকটা পথ। পা যেন চলতে চায় না, অবশ অঙ্গ যেন। ঘন-ঘটাচ্ছন্ন, তমসাবৃত আকাশের মত বিন্ধ্যবাসিনীর মুখ। খিল-খিল হাসি হাসতে হাসতে হঠাৎ কি কথা শুনে, কেমন যেন নিস্তব্ধ হয়ে গেছেন।

কম্পমান পদক্ষেপ, অঙ্গ যেন বইতে চায় না আর। বিন্ধ্যবাসিনী সিঁড়ির মুখে গিয়ে ক্ষণেক দাঁড়িয়ে পড়লেন। ফিরে দেখলেন, কালো আকাশ কাজল-কালো। সত্যিই আকাশ গুমরে ওঠে তখনই। বজ্রপাত, কানে হাত তুললেন বিন্ধ্যবাসিনী। অজগরের মত ঘনান্ধকার সোপান-শ্রেণীতে রাজকুমারীর চরণধ্বনি বেজে উঠলো।

আমোদরের তীরে কোন এক মাথা-উঁচু তালগাছের শিখরে আগুন ধরলো

নিদাঘ-শুষ্ক গাছের পাতা জ্বলছে দাউদাউ। শূন্য থেকে ছিটকে বাজ পড়েছে বৃক্ষশিরে। কাজল-কালো আকাশের ঠিক বুকে যেন আগুন ধ'রেছে!

বহুমূল্য রত্নহার হাতে-হাতে লাভ! প্রহরী চরিতার্থ হয়ে হাসিমুখে ফিরে গেছে আপন কাজে। ফটকের ধারে গিয়ে বসেছে এক প্রস্তরখণ্ডে, কোন এক পশু-মূর্তির ভগ্নাংশে। জমিদার কৃষ্ণরামের বহু সখের দুই মৌনরক্ষী ছিল ফটকের দু'পাশে। বারেন্দ্র-ভাস্করের নিখুঁত শিল্পসৃষ্টি, প্রচুর অর্থব্যয়ে সংগ্রহ করেছিলেন কৃষ্ণরাম। সযত্নে রেখেছিলেন প্রধান তোরণদ্বারে। পশুরাজ সিংহের প্রস্তরমূর্ত্তি। একটি কে বা কারা অপহরণ করেছে। অন্যটি ভগ্নপ্রায়। নখদন্তের চিহ্ন নেই, কেশর বিলুপ্ত। অবহেলায় অনাদরে হতশ্রী এখন। পাঠান প্রহরী বড়ই খুশী। পাহারা আর পায়চারীর বাঁধাধরা কাজে ইতি দিয়ে আনন্দাতিশয্যে ব'সে পড়েছে পাথরের ঢিপিতে। রেশমী রুমালে জড়ানো রত্নহার নাড়াচাড়া করছে, দেখছে বার বার চোখের কাছে তুলে। হাতে যেন এক রাজ্য পেয়েছে, দেখতে দেখতে হাসছে লোভাতুর হাসি। শিরস্ত্রাণ আর গাদা-বন্দুকটা পায়ের কাছে প'ড়ে আছে। আকাশে বিজলী ঝলকায়, বজ্রপাত হয় আমোদরের তীরে, শোঁ-শোঁ বাতাস চলছে তীরের বেগে—পাঠানের খেয়াল হয় না। মন আর মেজাজ তার নেই আর আগের মত। চোখে নেই সেই কুটিল কটাক্ষ। মুখের হিংস্র রেখা ক'টা কোথায় অদৃশ্য হয়েছে?

এক সঙ্গে অনেক মনুষ্যকণ্ঠের অস্পষ্ট গুঞ্জন আসে। মেঘ ডাকার ঘন ঘন শব্দে প্রহরীর কানে যায় না কিছু। ক্রমে শব্দ নিকট থেকে নিকটতর হয়। অত্যন্ত দ্রুত এগিয়ে আসে ঐ ঐকতান। রত্নহার দেখতে দেখতে যেন মুগ্ধ হয়ে গেছে। আদেখলার ঘটি হয়েছে আর কি!

একখানি সুসজ্জিত পাল্কী, ঝড়-বৃষ্টির আশঙ্কায় বনপথ ধরে চলেছে ভীষণ গতিতে। বৃক্ষতল ছাড়া এমন কোন আশ্রয় নেই কাছাকাছি, যেখানে বৃষ্টির ধারা থেকে রেহাই পাওয়া যায়। পাল্কীখানি সুসজ্জিত। নীল রেশমের আস্তরণে ঢাকা, জরির ঝালর ঝুলছে চতুর্দ্দিকে। পাল্কীর সম্মুখে ও পিছনে

বাহক প্রায় বিশ জন। কড়-কড় শব্দে মেঘ ডাকলো আবার। বিদ্যুতের হলুদ-আঁচল দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল কালো-মেঘের আড়ালে।

বন্দুক-হাতে উঠে দাঁড়ালো প্রহরী। রত্নহার লুকিয়ে ফেলেছে বুকে, লৌহবর্ম্মের অন্দরে। সজাগ দৃষ্টি হেনে দেখছে ইদিক-সিদিক। শিরস্ত্রাণ চাপিয়ে নিয়েছে মাথায়। হাওয়া চলেছে ঝড়ের বেগে। বহুদূরে কোথায় বর্ষণ শুরু হয়েছে, বাতাস তাই জল-শীতল। শুষ্কশাখা ভেঙ্গে পড়ে মড়মড়িয়ে। মাটির বুক থেকে ধূলির সর্পিল রেখা চক্রাকারে পাক খেতে খেতে আকাশপথে ছোটে। পাখীর পালক উড়ছে বাতাসের মুখে। ঝরাপাতা উড়ছে চৈত্রদিনের।

পাল্কী-বেয়ারাদের দেহ রক্তাক্ত। বনপথ ধ'রে চলতে হয় উর্দ্ধশ্বাসে, বন্য-গাছের কাঁটায় দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়। লতাগুল্মের কণ্টক পায়ে বিঁধেছে। দিনের আলো, দস্যু ডাকাতের ভয় তত নয়, ভয় বন্য পশুর। ঝড়ের আভাস পেয়ে ইতস্তত: ছড়িয়ে পড়েছে। শূয়োর, নেকড়ে আর বনবিড়াল ভয় পেয়ে ছোটাছুটি করছে অন্ধকার বন-জঙ্গলে।

হাওয়ার দাপটে যেন সোজা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না পাঠান, পদস্খলন হয়। পাল্কীখানি বনের পথ ত্যাগ করে মেঠো পথ ধ'রেছে। শিরস্ত্রাণের আড়ালে প্রহরীর চক্ষু পলকহীন হয়। পাল্কী যে এদিকেই আসে। তোরণ-ফটক লক্ষ্যে রেখে উজানের তরীর মত দ্রুত এগোয়।

হাতের গাদা-বন্দুক সাবধানে ধরে প্রহরী, ঠিক প্রয়োজনের সময়টিতে যাতে ঘোড়া দাগা যায়! ক্ষণেক আরও দেখে প্রহরী যেন চিনতে পারে, এ কাদের পাল্কী। বন্দুক সংযত করতে হয় তৎক্ষণাৎ।

পাইক-পেয়াদা পাল্কীর সহযাত্রী। ধূলি-ঝটিকায় বনের পথ হারিয়ে পিছিয়েছিল। পতাকাবাহী এক পাইক তোরণ-ফটকের কাছে পৌঁছে প্রহরীকে সেলাম দেয়। বাহকেরা ঘাসের প'রে নামিয়ে রাখে পাল্কীখানি। ঝড়ের বেগে ঝালর ঝুলানো রেশমী আচ্ছাদনের আঁচল উড়তে থাকে। দেখা যায়, পাল্কীর দ্বার রুদ্ধ। পাল্কীর গায়ে আলিম্পন। পদ্ম, স্বস্তিকা আর চক্র আঁকা। পাল্কীর হাতলে রূপার পাত জড়ান।

সেলাম ফিরিয়ে দেয় প্রহরী। পাইক-পেয়াদা সাহস ভরে আরও খানিক এগোয়। বলে,—সেখজী, এ পাল্কী গোপীমোহন চৌধুরীর। এই ঝড়টুকু না সামলালে আর তো আগানো যায় না। পাল্কীতে চৌধুরীর বেটি আছে। সেখজী, তুমি যদি এখন তার মাথা বাঁচিয়ে রক্ষে কর।

ওপরে নীচে মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানালো প্রহরী। মান্দারণে গোপী-মোহন চৌধুরীর নামের বড় কদর। চৌধুরী এ তল্লাটের সকলের চেয়ে বড় বেণে। ছত্তিক, দেশ, সজ্ঘ আর রাউত এই চার আশ্রমের বেণেরাই গোপী-মোহনকে প্রধান মানে। মান্দারণের বেণে ও ব্যবসাদারেরা চৌধুরীকে খুব শ্রদ্ধা-ভক্তি করে।

প্রহরীর সম্মতি পেয়েছে, পাইক-পেয়াদা আহ্লাদে আটখানা হয়ে পাল্কীর বেয়ারাদের বলে,—ভাই সব, সেখজী মুখে পরোয়ানা দিয়ে দিয়েছে। পাল্কী বাঁচাও এখন।

একটা অস্পষ্ট কলরোল, চলন্ত গুঞ্জন। কৃষ্ণরামের ভাঙা দেউলের দুয়োরে এসে থেমে যায়। গলদ্‌ঘর্ম্ম বেয়ারার দল হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। বন্য লতাগুল্মের কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত দেহে জ্বালা ধরেছে। তাজা রক্তের সঙ্গে মিশেছে ঘর্ম্মধারা। তাই জ্বলছে।

রুদ্ধদ্বার পাল্কী। ভিতরে গালিচা বিছানো। হাতের কাছে ময়ূরপক্ষের হাতপাখা, তবুও যেন শ্বাস রোধ হয়ে আসে। পাল্কীর এক পাল্লা ধীরে ধীরে সরিয়ে দেখলো চৌধুরীর মেয়ে। সম্মুখে এক মুক্ত দ্বার দেখে পাল্কী ত্যাগ ক'রে নামলো আর চকিতের মধ্যে মিলিয়ে গেল ভাঙা দেউলের মধ্যে।

গোপীমোহনের মেয়ের নাম আনন্দকুমারী। শান্ত, গম্ভীর, মধুর অথচ আনন্দময়ী। জ্যোৎস্নাময়ী নদীর মত আনন্দকুমারীও সুসজ্জিতা। এক লহমায় দেখা গেল, আনন্দময়ীর পরিধানে একখানি পরিষ্কার মিহি ঢাকাই, তাতে জরির তারা-ফুল। হীরামুক্তা খচিত কাঁচুলী, ঢাকাই শাড়ীর আড়াল থেকে ঝকমক করলো। জ্যোৎস্না-রাতের নদীতে খেলে চাকচিক্য, আনন্দ-কুমারীর শরীরেও তাই। জল-রঙ ঢাকাই শাড়ীর মাঝে মাঝে মোতির

চিকিমিকি, এক ছড়া যুঁই ফুলের গড়ে তার চালচিত্তির খোঁপায় জড়িয়ে আছে।

ফোঁটা-ফোঁটা বৃষ্টি ঝরলো। টুপ-টাপ শব্দে। ঠাণ্ডা হাওয়া চলেছে। ধূলার ধূসর আস্তরণে দিগন্ত যেন নিশ্চিহ্ন হয়েছে। আমোদরের অপর তীরে বেগুনী-কালো রেখা। মেঘ নেমেছে।

জমিদার কৃষ্ণরামের ভাঙা-দেউলে না আছে দেউটি, না আছে দেবতা। জীর্ণ এক প্রস্তরবেদী ছাড়া অন্য কিছুই নেই। দেউলের সংলগ্ন দেউড়ি, অন্দরের প্রবেশ দ্বার। দেউলে কত কাল মানুষের পদার্পণ নেই আনন্দ-কুমারীর অবস্থা হয় যেন ন যযৌ, ন তস্থৌ। ঝড়ের হাওয়ায় আঁচল উড়ে যায়।

এই দেউলে কৃষ্ণরাম রাম-খোদার আরাধনা করতেন। কৃষ্ণরাম নিজে হিন্দু, কিন্তু আসমানী ছিল মুসলমানী। রূপসী আসমানীর মন রাখতে যুগপৎ রাম এবং খোদাকে ভজনা করতেন কৃষ্ণরাম। দেউলের গায়ে পোড়ামাটির অলঙ্করণ, ইদের চাঁদ আর পদ্ম, পাশাপাশি। ত্রিশূল আর তরোয়াল।

শুধু ঝড় নয়। প্রবল বেগে বৃষ্টি নেমেছে! পিপাসার্ত্ত পৃথিবী ধারাস্নানে সিক্ত হয়। দিনারম্ভেই ঘোরতর অন্ধকার ছেয়ে ফেলেছে যেন দিগবিদিক্।

ভাঙা-দেউলের ভেতরে নিশ্চিদ্র তমসা! অশ্বত্থের চারা শিকড় ছড়িয়েছে। দুর্য্যোগে আশ্রয় যদি বা মিললো, আনন্দকুমারী কি এক ভয়ে যেন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে থাকেন এই ঘন আঁধারে।

—কে ভাই তুমি?

মিহি-মিষ্টি নারীকণ্ঠ শুনেও প্রথমে চমকে ওঠে আনন্দকুমারী। বিশ্বাস হয় না যেন নিজের কানকে। অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে যত দূর দৃষ্টি যায় দেখে।

—এসো, কোন ভয় নাই।

আনন্দকুমারী শব্দ অনুসরণ করে। সভয় পদক্ষেপে এগিয়ে চলে। কয়েক পা যেতে না যেতে কার কোমল করপল্লবের শীতল স্পর্শ লাগে আনন্দ-কুমারীর নিটোল বাহুতে। সর্ব্বাঙ্গ শিউরে ওঠে যেন।

—কে?

আনন্দকুমারী ভীতিকাতর কণ্ঠে শুধোলেন। ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে তার। বাষ্পরুদ্ধ স্বর।

মৃদু মৃদু হাসির তরঙ্গ ছড়ালো ঘন আঁধারে। হাসি চাপলো কোন্ হাস্য-ময়ী! বললো,—তুমি কে, তাই ব'ল ?

হাতের পরশে আনন্দকুমারী বোঝে এ-ও এক পুরনারী। স্বস্তির শ্বাস ফেলে, কিন্তু ভয়ে ভয়ে। আনন্দকুমারী বললে,—আমি ? আমি বাদলা-দিনের অতিথি। আমার নাম আনন্দকুমারী। আর তুমি ?

ঝড় উঠতে, বৃষ্টি ঝরতে বিন্ধ্যবাসিনী তাঁর কক্ষের বাতায়নে মুখ রেখে উদাসী চোখে চেয়ে ছিলেন। আকাশের ডাকাডাকি আর ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বাতাস চলতে ফেলে-আসা-দিনের সঙ্গে ছেড়ে-আসা আপন জনদের মুখও যেন ভেসে উঠেছিল মনের চোখে। বিন্ধ্যবাসিনীর সহসা চোখে পড়েছিল তোরণ-ফটক পেরিয়ে আসছে একখানি সুসজ্জিত পাল্কী। কার পাল্কী কে জানে, দেখে না কত খুশী হন রাজকন্যা। ভাবেন, আসছে হয়তো কোন কাছের মানুষ। আসছে হয়তো খোঁজ-খবর করতে।

—আমি ? আত্ম-পরিচয় দিতে যেন সঙ্কোচ হয় বিন্ধ্যবাসিনীর।

কি যেন বলতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু ব্যক্ত করতে পারেন না। স্ত্রীলোকের পরিচয় স্বামী। সমাজ প্রতিবন্ধক, পতির নাম মুখে আনা না কি অশাস্ত্রীয়। বিন্ধ্যবাসিনী বলেন,—বাহিরে দারুণ বর্ষা, এ দেউলে অধিকক্ষণ থাকাও নিরাপদ নয়। আমার অনুগামী হও, অন্দরে চল। তারপর যা হয় একটা পরিচয় দেওয়া যাবে। কথার শেষে একটি দীর্ঘশ্বাস পড়লো। রাজকুমারী অন্দর অভিমুখে চললেন। ছায়ার মত অনুসরণ করে আনন্দকুমারী। ভয়ে ভয়ে চলে।

কড়কড়িয়ে গর্জ্জে উঠছে জলভরা মেঘ। যত বা বর্ষায়, তত বা গর্জ্জায়। প্রবল বৃষ্টিধারার শব্দে যেন প্রলয়-ছন্দ।

আনন্দকুমারী দেখলেন, এই বিশাল গৃহ কালগ্রাসে বিধ্বস্ত। মানুষের বাসের অযোগ্য জীর্ণ দেওয়াল-প্রাচীর। ভগ্ন সোপানাবলী। দালানে-

উঠানে আগাছা জন্মেছে। শুধু কোথা থেকে ভেসে আসছে কে জানে, ধূপ-ধুনার পবিত্র সুগন্ধে!

অন্দরের এক দালানে এসে একে অন্যকে দেখলেন। পরস্পরের চোখে নেমেছে বিস্ময়ের ঘোর। বিন্ধ্যবাসিনী বলেন,—এই আমার বাসস্থান। সাত-গাঁয়ের জমিদার, কুলীন-কুলতিলক আমার স্বামী।

আর কোন কথা মুখে আসে না। রাজকুমারীর রাত-জাগা চোখের চাউনি আনত হয়। মুখ যেন হয় লজ্জা-লাল।

গোপীমোহনের কন্যা আনন্দকুমারীও সুন্দরী। শান্ত, গম্ভীর, মধুর অথচ আনন্দময়ী। কিন্তু কষ্টক্লিষ্টা বিন্ধ্যবাসিনীর মুখখানি যেন আরও বেশী ঢলো-ঢলো। তাঁর চক্ষু দু'টি কেমন যেন আবেগময়। কাজলের চিহ্ন নেই, তবুও যেন কাজল-কালো। আকাশের কালো মেঘের মত রুক্ষ কেশরাশি কোমর ছাপিয়ে নেমেছে।

—স্বামী মৃত না জীবিত? আনন্দকুমারী প্রশ্ন করলে ব্যগ্র কৌতুকে।

ঈষৎ বিচলিত হয়ে ওঠেন বিন্ধ্যবাসিনী। বলেন,—জীবিত। তিনি সাতগাঁয়েই থাকেন।

আনন্দকুমারী বলে,—তবে সিঁথিতে সিঁদুর নাই কেন? গায়ে একখানা গয়নাও তো দেখি না।

কড়কড়িয়ে মেঘ ডাকছে। গুমরে গুমরে উঠছে আকাশ! কত দূরের বিদ্যুতের আলো, চোখ ধাঁধিয়ে দেয়।

একটা জোরালো বজ্রপাতের শব্দে কানে হাত তুললেন বিন্ধ্যবাসিনী। শব্দের আধিক্যে চমকে উঠলেন। প্রবল বৃষ্টিধারা, মুঠো-মুঠো বৃষ্টি রেণু ছড়ালো রাজকুমারীর চোখে মুখে। ধূপ-ধূনার সুগন্ধ ভাসছে ভিজে বাতাসে।

কপালের পরে নেমে-আসা রুক্ষ চুলের গুবক। বড় বেশী কোঁকড়ানো কুন্তলগুলি গোলাকার। এক গুচ্ছ চুল সরিয়ে দিয়ে রাজকুমারী নকল হেসে বলেন—তুমি এই দুর্যোগে কোথায় চললে? অভিসারে?

ঢাকাই শাড়ীর আঁচল চেপে আনন্দকুমারী মুখের হাসি গোপন করলে।

বললে,—তোমাদের মান্দারণে একটা মানুষের মত মানুষ আছে নাকি যে অভিসারে বেরিয়ে কুল নষ্ট করি! কথায় শেষে ক্ষণেক থেমে আবার বলে,—শৈলেশ্বরের মন্দিরে গেছিলাম। ফিরতে ফিরতে ভীষণ ঝড় উঠলো। এই নাও শৈলেশ্বরের পূজার বিল্বপাতা। কপালে ঠেকাও, অদৃষ্ট ফিরে যাবে। কথা বলতে বলতে বস্ত্রাঞ্চল খুলতে থাকে আনন্দকুমারী। সচন্দন বিল্বপত্র আছে আঁচলে বাঁধা।

বিন্ধ্যবাসিনী হাসলেন দুঃখের ক্ষীণ হাসি। অদৃষ্ট ফিরে যাওয়ার কথা শুনে হয়তো হাসলেন। বললেন,—শৈলেশ্বরেব নাম আমি জানি, কখনও দেখি নাই। আমাকে একদিন দেখাও তো পূজা দিয়ে আসি। বৃষ্টির রেণু উড়ে আসে রাশি রাশি। বাতাসে এখনও ঝড়ের বেগ। শোঁ-শো শব্দে হাওয়া চলেছে।

—একা যাওয়া-আসা কর, ভয় হয় না? বিন্ধ্যবাসিনী সহাস্যে বললেন। আনন্দকুমারীর বক্ষবাস সরিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন হীরামুক্তা খচিত কাঁচুলীর রত্নশোভা। নবপরিচিতার একখানি হাত নিজ হস্তে ধারণ করলেন সস্নেহে।

আনন্দকুমারী বলে,—ভয়? হাঁ, তা ভয় হয় বৈ কি! আমাকে তুমি নিরস্ত্র মনে ক'র? এই দেখো!

কথার শেষে আনন্দকুমারী কাঁচুলীর মধ্য থেকে বের করলে মণিময় কোষ-পূর্ণ একটি কুকরি। আবার যথাস্থানে রাখলো সন্তর্পণে।

প্রলয় ছন্দে বৃষ্টিপাত চলেছে। দূরের বনভূমি আর দৃষ্টিগোচর হয় না। নিদাঘ-তপ্ত মাটির তৃষা যেন মিটে না। মুষলধারার শব্দে কান পাতা দায়।

—শৈলেশ্বর কি জাগ্রত? রাজকুমারীর কণ্ঠে যেন অদম্য কৌতূহল। বললেন,—শৈলেশ্বরকে দেখবার ইচ্ছা খুব, কে-ই বা দেখায়? হাঁ ভাই, সে মন্দির কত দূরে?

এক ঝলক শীতল-সিক্ত বাতাস উড়ে আসে। আনন্দকুমারীর পরিচ্ছন্ন মিহি ঢাকাই শাড়ীর আঁচল উড়িয়ে দেয়। মুখে-চোখে জলরেণুর স্পর্শ লাগে। চৌধুরীর কন্যার উদ্ধত ভাবভঙ্গী এত বর্ষণেও কেন কে জানে শান্ত হয় না।

আনন্দকুমারী বলে,—শৈলেশ্বর জাগ্রত, তবে হয়তো ধুতুরার গুণে সদাই

আচ্ছন্ন থাকেন। শিবঠাকুরের আর এক নাম আশুতোষ, তাই অল্প আরাধনাতেই শৈলেশ্বর মুখ তুলে চান। কৃপা করেন।

কপালে যুক্ত দুই কর ঠেকালেন বিন্ধ্যবাসিনী। অদেখা দেবতার উদ্দেশে প্রণাম জানালেন। বললেন,—আমার তো শিবদর্শনে যাওয়ার কোন উপায় নেই। ফটকে পাঠান প্রহরী, সেই বাধা দেবে।

—তুমি আমার সহযাত্রী হও। গোপীমোহন চৌধুরীর মেয়েকে বাধা দেয় এমন পাঠান এখনও মাতৃগর্ভে। আমি ফের আগামী কাল প্রাতে শৈলশ্বরের মন্দিরে যাবো, তোমাকেও সঙ্গে নেবো। আপত্তি যদি না কর,—

হাসি ফোটে রাজকুমারীর রক্তিম অধরে। খুশীর অস্ফুট হাসি। বিন্ধ্যবাসিনীর বললেন,—চল ঘরে যাই। এখানে বড় বেশী বর্ষার দাপাদাপি। তোমার এমন সাজসজ্জা, বৃষ্টির জলে বুঝি বা নষ্ট হয়! প্রহরী যদি বাধা না দেয় আমার যেতে আপত্তি কি? কথা বলতে বলতে এগিয়ে চলেন রাজকন্যা। আনন্দকুমারীও সঙ্গে চলে। ঝড়ের বেগ চলার গতি রোধ করতে চায় যেন।

আনন্দকুমারী বলে,—শৈলেশ্বরও আছেন, গোপেশ্বরও আছেন। যদি যাও তো দুই শিবেরই দর্শন পাবে। গোপেশ্বরও কম জাগ্রত নন।

গোঘাট থেকে কামারপুকুরের পথের বাম দিকে কাঁটালি গ্রাম। কাঁটালিতে শৈলেশ্বরের মন্দির। গড় মান্দারণের কয়েক পোয়া উত্তরে কামারপুকুর। কাঁটালিতে যেমন শৈলেশ্বর আছেন, কামরপুকুরে তেমন কর্ম্মকারদের পুষ্করিণীর পূর্ব্বতীরে গোপেশ্বর শিব সংস্থাপিত। এই পুণ্যক্ষেত্রে অসংখ্য অরণ্যাবৃত মৃৎস্তূপ ও বহু বিলুপ্তপ্রায় দুর্গপ্রাকার সুদূর অতীত গৌরবের স্মৃতি রক্ষা করে।

—বৌ!

কে ডাকলো পিছন থেকে? পরিচারিকার কণ্ঠস্বর শুনে বিন্ধ্যবাসিনী দৃষ্টি ফিরালেন।

যশোদা বললে,—বৌ, ইনি কে গা? কোথা থেকে এলেন এই ঘনঘটা বর্ষায়?

বিন্ধ্যবাসিনী সহাস্যে বললেন,—বাদলা-দিনের অতিথি। আমার সই। ছাখ যশো, দেখে দেখে চোখের জ্বালা জুড়িয়ে নে। কত রূপ দেখেছিস্!

—তোমার নাম কি মা? বিমুগ্ধ সুরে বললে পরিচারিকা। সম্ভ্রমের সঙ্গে কথা বললে।

আমার নাম আনন্দকুমারী। আনমনে কথা বলে চৌধুরীর মেয়ে। কথায় তার মন নেই। ভগ্ন গৃহের ইদিক-সিদিক দেখছে চোখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে। চোখে উদ্ধত দৃষ্টি। স্ফীত বক্ষ। সগর্ব্ব প্রতিটি পদক্ষেপ।

—নামটি যেমন রূপও কি তেমনি! দেখলে সত্যিই চক্ষু জুড়িয়ে যায়।

যশোদার কথা কারও কানে পৌছয় না। রাজকুমারী গৃহের দ্বিতলে ওঠার অন্ধকার সোপানে উঠেছেন। আনন্দকুমারীও তাঁর পশ্চাতে। পরিচারিকার দৃষ্টিপথ থেকে দু'জনেই অদৃশ্য। যশোদা ভাবে, এই ঘনঘটার দিনে আকাশ থেকে নেমে এলো কি মেঘকন্যা?

কোথায় বজ্রপাত হয়। মেঘের গভীর নিনাদে চমকে চমকে ওঠে যশোদা। উঠানে চোখ রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে দালানে। বিদ্যুৎ ঝলসানোর ভয়ে দেওয়ালের আড়ালে থাকে।

ঝম-ঝম বর্ষার নৃত্য চলেছে উঠানে। মুষলধারা নামছে আকাশ থেকে! মাটির সংঘর্ষণে ছড়িয়ে ছিটকে পড়ছে বৃষ্টির জল; রাশি রাশি হীরার কুচি যেন, উঠানের চত্বরে ছড়িয়ে পড়ছে। উঠানের ধারে ধূলিম্লান আগাছার বন রঙ হারিয়েছিল। জলের ধারায় লুকানো-সবুজ আবার দেখা দিয়েছে।

—তালপাতার ছাতা আছে দাসী?

কথা শুনে মুখে আবার বিরক্তির রেখা ফুটলো যশোদার কপালে। ফিরেও দেখলো না। বললে,—ছাতা নাই, উঠানে তালপাতা জড় করা আছে।

—ত্রিসন্ধ্যার পূজা শেষ হয়েছে?

পূজারী চন্দ্রকান্ত, কথা বললেন মেঘের মত গম্ভীর কণ্ঠে। আবার বললেন,—আমার কর্ত্তব্য শেষ হ'ল, এখনই আমাকে যাত্রা করতে হয়। বাহিরে অতি বর্ষণ, তা হোক।

প্রথমে অবাক মানে যশোদা। বৃষ্টির গতি দেখে ব্রাহ্মণের কথা যেন তার বিশ্বাস হয় না। যশোদা বলে,—মাথায় যে বাজ পড়বে ঠাকুর! গাছ-গাছড়া ঝড়ে ভেঙে পড়বে!

—তেমন কোন পাপ কার্য্য কদাপি করি নাই। চন্দ্রকান্ত সামান্য হাসলেন কথার শেষে। বললে,—কার অভিশাপে?

এতক্ষণে ফিরে তাকালো যশোদা। উঠানের হীরার খেলা দেখতে দেখতে কেমন যেন আনমনে ছিল সে। অবিরাম ধারাপাত দেখে। ফিরে তাকিয়ে বললে,—অত-শত জানি না ঠাকুর! যেতে হয় যাও না কেনে! বলতে হয় আমি বলেছি। এ দুঃসময়ে কেউ ঘরের বার হয় না, তাই তো জানি!

—সিধা-নৈবেদ্য আমার প্রাপ্য। আমি তবে ল'য়ে যাই? চন্দ্রকান্ত কথা বলেন নম্র ধীর সুরে। ব্যগ্র চোখে কাকে যেন খুঁজতে থাকেন! কাকে যেন দেখতে চান। দালানের সংলগ্ন কক্ষসমূহ লক্ষ্য করেন। অন্ধকার সোপান, শূন্য কক্ষ—যাকে দেখতে অভিলাষী হন কোথাও তার সন্ধান মেলে না। ব্রাহ্মণের ক্ষুণ্ণদৃষ্টি বৃথাই চঞ্চল হয়।

তাচ্ছিল্যপূর্ণ মুখভঙ্গী পরিচারিকার। কথার সুরে ব্যঙ্গ মাখিয়ে বলে,—বামুন বাদল বান, দক্ষিণে পেলেই যান। সিদে-নৈবিদ্যি, দক্ষিণা, সবই যখন মিলেছে তখন তুমিও ঠাকুর আজকের মত মানে মানে বিদেয় হও।

উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতায় চন্দ্রকান্ত ঈষৎ অধীর হয়ে আছেন। নিষ্কলুষ ও পবিত্র মন তাঁর। শিক্ষাদান ও যাজনিক কাজেই কালাতিপাত করেন। সমাজ ও সংসারের প্রতি চন্দ্রকান্ত নিস্পৃত। তবুও যেন আজ মনের একাগ্রতা ক্ষণে ক্ষণে ভঙ্গ হয়। মানস চক্ষে বার বার সেই শুভ্রবসনা রূপবতীর দেহলাবণ্য সুখস্বপ্নের মত জেগে ওঠে।

ব্রাহ্মণ বললেন ধীরে ধীরে।—বিনা আচ্ছাদনে এই বিপর্যয়ে পথ চলা কি সম্ভব, তুমিই বল?

কোন উত্তর নেই যশোদার মুখে। বিস্ফারিত চোখ ফিরিয়ে ব্রাহ্মণকে একবার দেখলো মাত্র। ক্ষণেক দাঁড়িয়ে তরতরিয়ে উঠানে নেমে চললো।

মুসলধারায় বর্ষণ পরিচারিকার মাথায়। যে দিকে স্তূপীকৃত তাল আর নারিকেলের পাতা সেদিকে চলে। দু'-এক খণ্ড তালপত্র তুলে আনে, প্রবল বৃষ্টিপাতে যেন স্নান সেরে ফিরলো। বললে,—ঠাকুর, আমাকে এই জলে ভেজালে তুমি! নাও, তোমার আচ্ছাদন নাও।

কেন কে জানে, চন্দ্রকান্ত বললেন,—তোমাদের জমিদার কৃষ্ণরামের নাম এ দেশে কেহ উচ্চারণ করে না। শুনা যায়, তিনি নাকি কুলীনের কুলীন, ব্রাহ্মণ-সমাজের কুলতিলক আচার্য্য, হা হতোঽস্মি!

থান কাপড়ের আঁচলে বৃষ্টির জল মুছতে মুছতে হঠাৎ ব্রাহ্মণের অতি নিকটে এগিয়ে আসে যশোদা। বলে,—আমাদের জমিদারের তিরিশটা বে, কাকেও নেয়, কাকেও নেয় না।

বিবাহের সংখ্যা শুনে বিস্ময়ে ক্ষীণ হেসে চন্দ্রকান্ত বললেন,—বল্লাল সেনের মত ক'জন রাজা-বাদশার খেয়ালে সমগ্র ব্রাহ্মণ-সমাজটাই উচ্ছন্নে গেল আর কি! হায়, রাঢ় ও বারেন্দ্রর কি মন্দ ভাগ্য!

যশোদা চোখের জল মোছে। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বলে,—এয়োস্ত্রী, মাছ-ভাত মুখে দেয় না। চুলে তেল-সিঁদুর ছোঁয়ায় না, গায়ে একটা গয়না তোলে না। মুখে হাসি নেই, থাকে যেন বিবাগীর মত। তবু যা হোক কে এক চৌধুরীদের মেয়ে আসতে মুখে আজ একটু হাসি ফুটলো।

চৌধুরীদের মেয়ে! বললেন চন্দ্রকান্ত। পদতলের ভূমিতে চক্ষু নত করলেন। ঈষৎ চিন্তাকুল হয়ে পড়লেন যেন। অস্ফুটকণ্ঠে বললেন,—চৌধুরীর মেয়ে! কে? আনন্দকুমারী নয় তো?

—মরি মরি, তার রূপের কি বাহার! যশোদা কথা বলে প্রসন্ন কণ্ঠে। বলে,—যেমন রূপ, তেমন রঙ। যেন রণরঙ্গিনী। দেখলেও চক্ষু জুড়ায়।

বজ্রাহত হ'লেও হয়তো কেউ এত বেশী স্তব্ধ হয় না। চন্দ্রকান্তের যেন অন্য এক মূর্ত্তি হয়। ঘোর দুশ্চিন্তায় যেন তিনি নীরব, নিস্পন্দ। শ্বাস পড়ে কি না পড়ে।

—রাম-খোদার দেউলে চৌধুরীদের পাল্কী লেগেছে। পাল্কী বয়ে এনেছে গণ্ডায় গণ্ডায় লোক। সঙ্গে আছে পাইক-সেপাই।

—আমি তবে বিদায় লই—বলতে বলতে চন্দ্রকান্ত দ্রুত দালান ত্যাগ করলেন। তাঁর মনের সকল সুখ যেন বিনষ্ট হয়েছে। কি এক দুশ্চিন্তার ঘূর্ণীতে মস্তিষ্ক যেন ঘূর্ণায়মান! ব্রাহ্মণের গম্ভীর কণ্ঠ ভেসে আসে দূর থেকে। চন্দ্রকান্ত যেতে যেতে স্বগতোক্তি করলেন,—আনন্দকুমারী, তোমার নারী-জন্ম শোভা পায় না। পুরুষের কাজ এই গুপ্তচরবৃত্তি।

জমিদার কৃষ্ণরামের জীর্ণ, বিধ্বস্ত, ভগ্ন-আলয় যেন হেসে উঠলো আজ। রূপের আলোয় হেসে উঠলো। অপ্সরী কিন্নরীর রূপ-জৌলুসে। গৃহের দ্বিতলের একটি কক্ষ তখন দুই পূর্ণলাবণ্য-ললনার রূপসৌন্দর্য্যে শুধু আলোক-ময়, দুই সদ্যপরিচিতার কথোপকথন ও পরিহাস-প্রগল্ভতায় হাস্যময়। আনন্দ-কুমারীর কাঁচুলীর হীরা-মুক্তার দীপ্তি, পরিচ্ছন্ন মিহি ঢাকাইয়ের রাশি রাশি রূপালী জরির তারা-ফুল, কক্ষমধ্যে যেন এক অপূর্ব্ব মোহ বিস্তার করে।

কথায় কথায় যে যার আত্মকথা ব্যক্ত করে। একে অন্যকে প্রশ্ন করে। যে উত্তর দেয় সেই আবার প্রশ্ন করে। হাসি, কৌতুক আর পরিহাসের বিনিময় চলতে থাকে।

এটি বিন্ধ্যবাসিনীর শয়নকক্ষ। পালঙ্কের দুই প্রান্তে দু'জন। এক দিকে নিরাভরণা, সদ্যস্নাতা, মুক্তকেশা রাজকন্যা বিন্ধ্যবাসিনী। আরেক প্রান্তে সুবেশা, নানালঙ্কারভূষিতা চৌধুরীকন্যা আনন্দকুমারী।

কক্ষের দ্বার বাতায়নমুক্ত। জলকণাবাহী বাতাস তরঙ্গহিল্লোল তোলে কক্ষমধ্যে। ঝড়ের বেগে উড়ে যায় বুকের আঁচল।

—সই, এমন একা-একা আছো, ভয় পাও না? সহাস্যে, কিছু বা কৌতুকমিশ্রিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন আনন্দকুমারী।

রাজকন্যার দৃষ্টি মুক্ত বাতায়নের বাহিরে। কক্ষ থেকে দেখা যায়, বর্ষাপ্লুত আমোদরের উদ্দাম রূপ। নদীর স্বচ্ছ জল এখন ঘোলাটে লাল। দুরন্ত গতিবেগ আমোদরের। কোথাও উচ্ছ্বাস, কোথাও প্রবাহ, কোথাও চক্রাকার ঘূর্ণী।

প্রশ্নের উত্তর নেই। বিন্ধ্যবাসিনীর দৃষ্টি ফিরে না। পলকহীন চোখে দেখছেন কি যেন! দেখতে দেখতে বাক্যরহিত, নিস্তব্ধ, গম্ভীর। চক্ষুও যেন পলকহীন। কেন কে জানে, হতাশার শ্বাস ফেললেন রাজকন্যা।

চৌধুরীর মেয়ে বললেন,—কথা নাই কেন? অত আগ্রহে দেখ কি?

আরেকটি হতাশ-শ্বাস ফেললেন বিন্ধ্যবাসিনী। আমোদরের তীর থেকে চোখ ফিরলো না। দেখতে দেখতে আপন মনে বললেন—তবে কি পূজা শেষ হয়েছে! ব্রাহ্মণ কি চলে গেলেন! এই ঝড় জলে।

—কে?

সূক্ষ্ম দুই ভ্রূ বাঁকিয়ে প্রশ্ন করলেন আনন্দকুমারী। কি এক গুপ্তরহস্যের সন্ধান মিলেছে যেন। বললেন,—কে তাই দেখি। কথা বলতে বলতে পালঙ্ক ছেড়ে খোলা জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন।

বিন্ধ্যবাসিনী নিরুৎসাহের সঙ্গে বললেন,—নারায়ণের পূজারী। হয়তো তিন সন্ধ্যের পূজা শেষ হ'তে চতুষ্পাঠীতে ফিরছেন।

আনন্দকুমারীও দেখলেন। নদীতীরের আঁকাবাঁকা পথ, সারি সারি গাছের ছায়াঢাকা পথ ধ'রে অত্যন্ত দ্রুত এগিয়ে চলেছে এক সবল-সুঠাম পুরুষ। তালপাতার আচ্ছাদন মাথায়। কাঁধে সিধার আধার!

—চন্দ্রকান্ত!

—চন্দ্রকান্ত!

দু'জনে প্রায় সমস্বরে নামোচ্চারণ করে। নিরাশার আক্ষেপ ফুটলো যেন দুই নারীকণ্ঠে। আনন্দকুমারী বললেন,—চন্দ্রকান্ত তবে এই গৃহেই ছিলেন! আমার অনুমান মিথ্যা হয় না।

বিন্ধ্যবাসিনী সহজ-সরল কণ্ঠে বললেন,—ঐ ব্রাহ্মণ কি সই তোমার পরিচিত?

হাঁ, না কিছুই বললেন না আনন্দকুমারী। তার স্ফীত-বক্ষ আরও' যেন স্ফীত হয়। চৌধুরীর মেয়ে ফিস-ফিস কথা বলে,—আমার আসা বৃথা হয়নি তবে। অনুমানও ভুল নয়।

চন্দ্রকান্তর নাম আর আকৃতি রাজকন্যার মনে যেন আবার আলোড়ন তুললো। কথা আর আলাপে মগ্ন থেকে মনে ছিল না কিছু। বিন্ধ্যবাসিনী ভুলেছিলেন যেন। রাজকন্যা বললেন,—কিসের আশা সই?

—আশা! বললো আর হটাৎ খিল-খিল হাসতে থাকলো আনন্দকুমারী। সর্ব্ব দেহে হাসির ফোয়ারা তুলে হাসতে হাসতে বিন্ধ্যবাসিনীর কানের কাছে মুখ এনে বললে,—আশা! ভালবাসার আশা! দেখো সই, নিন্দুকদের কানে যেন কথাটা ফাঁস ক'র না।

কেমন যেন অসহ্য জ্বালা ধরলো বিন্ধ্যবাসিনীর বুকের মাঝে। ঈর্ষা না মাৎসর্য্যের জ্বালা বোঝা যায় না, রাজকন্যার কানে যেন বিষ ঢাললো কে! বিন্ধ্যবাসিনীর ঢলো-ঢলো মুখখানি যেন আরক্তিম হয়। আনন্দকুমারীর নিলাজ হাসি শুনতে ভাল লাগে না যেন। রাজকন্যা কেমন যেন বিমনার মত তাকিয়ে থাকেন। নিতাশ চাউনী চোখে।

—বৃষ্টি ধ'রেছে সই, ঝড়ও থেমেছে।

হাসি থামিয়ে হঠাৎ সহজ কণ্ঠে কথা বলে আনন্দকুমারী। বলে,—এখন তবে আমি যাই?

বিন্ধ্যবাসিনীর মুখে কথা নেই। নীরব নিস্পন্দ যেন। ঘুম ভেঙে গেছে, স্বপ্ন যেন মধ্য পথে খেই হারালো। কেমন এক অসহ জ্বালায় বুক যেন জ্বলছে।

—যাবে সই? কোথায় যাবে? কত কষ্টে যেন কথা বললেন রাজকন্যা। কেমন যেন জড়তাপূর্ণ কণ্ঠস্বর!

কে সাড়া দেয়! কেউ কোথাও নেই। আনন্দকুমারী শব্দহীন পদে চুপিসাড়ে কখন কক্ষ ত্যাগ ক'রে গেছে। আমোদরের ঘোলাটে লাল জলের আবর্ত্ত দেখছিলেন বিন্ধ্যবাসিনী। চৌধুরীর মেয়েকে দেখতে না পেয়ে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে অন্ধকার সোপানের কাছে অগ্রসর হন। কোথায় কে, বর্ষা দিনের চঞ্চলা ঝরণার মত ছুটতে ছুটতে নেমে গেছে আনন্দকুমারী। দ্বিতলের দালান থেকে রাজকন্যা দেখলেন, একখানি সুদৃশ্য সুসজ্জিত পাল্কি

নীল-রেশমের আবরণে আচ্ছাদিত—তোরণ-ফটক পেরিয়ে বড় দ্রুতবেগে বেরিয়ে যায়। পাল্কী-বেয়ারাদের কলগুঞ্জনের প্রতিধ্বনি সিক্ত হাওয়ায়।

বিন্ধ্যবাসিনী হতাশ দৃষ্টি তোলেন মেঘযুক্ত আকাশে।

আপন কক্ষে ফিরে রাজকুমারী পালঙ্কে লুটিয়ে পড়লেন অবশ ক্লান্ত দেহে। এক-রাশ স্নিগ্ধ বাতাস এসে এলোমেলো ক'রে দিয়ে যায় বিন্ধ্যবাসিনীর রুক্ষমুক্ত কেশরাশি।

পাল্কীবাহকদের ছড়ার প্রতিধ্বনি।

আনন্দকুমারীর অলঙ্কার-ঝঙ্কার যেন কানে বাজতে থাকে রাজকন্যার!

সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গের মত, এক ঝলক তপ্ত আগুনের মত চৌধুরীকন্যা মাত্র কিছুক্ষণের জন্য এসে যেন তোলপাড় ক'রে দিয়ে যায়। আনন্দকুমারীর অপূর্ব্ব রূপরাশি, প্রস্ফুটিত যৌবনের ঐশ্বর্য্য; রত্নাভরণের পারিপাট্য; পরিধানের পরিচ্ছন্ন মিহি ঢাকাই শাড়ী আর জরির কাঁচুলীর উজ্জ্বল শোভায় বিন্দ্যবাসিনীর যেন দৃষ্টি-বিভ্রম হয়। চোখ দুটি জ্বলতে থাকে। সূক্ষ্ম ও লালাভ ওষ্ঠাধর দংশন করেন কখনও। এক ঝলক আগুনের কাছে নিজেকে মনে হয় যেন নিস্প্রভ প্রদীপশিখা। বর্ষাশেষের শিরশিরে ঠাণ্ডা বাতাসে যেন শীত-শীত করে। রাজকন্যার আলুলায়িত রুক্ষ চুলের বোঝা বাতাসে চঞ্চল হয়। কেমন যেন বিরক্তির সঙ্গে এলো চুলের এলো খোঁপা বাঁধলেন ধীরে ধীরে। কেশের বোঝা যেন অসহনীয় মনে হয়। কক্ষের দেওয়াল-গাত্রে ছোট ছোট খোপ। একটি কুলঙ্গী থেকে দর্পণ তুলে ধরলেন সম্মুখে। দেখলেন, মুখের সেই শ্রী যেন ঘুচে গেছে। চোখের কোলে কালিমা। শুভ্র-লাল দেহবর্ণ দেখায় যেন পাংশু ও রক্তহীন। দৌর্ব্বল্যে শিথিল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। কেন কে জানে, একটি হতাশ-শ্বাস ফেললেন বিন্ধ্যবাসিনী। দর্পণ রেখে দিলেন যথাস্থানে। মুক্ত বাতায়নের ধারে আত্মগোপন ক'রে স্থির দাঁড়িয়ে থাকলেন অবশ পায়ে। সম্মুখে সুবিশাল বালিয়াড়ি বৃষ্টির জলে জমাট বেঁধে দেখায় যেন প্রস্তরবৎ। জল-ছলছল আমোদর আপন বেগে ব'হে চলেছে। বর্ষাজলে নদীর জল যেন গেরুয়া রঙ ধরেছে। কূল ছাপিয়ে তরঙ্গহিল্লোলে যেন মুখর হয়ে আছে।

মুছে-আসা ঝাপসা বনপথ আবার নয়নগোচর হয়। আকাশের নীল, শ্যামল-বনাঞ্চল, আমোদরের খরবেগ ঘন-ঘটায় কোথায় যেন অদৃশ্য হয়েছিল। নদীর সিক্ত বালিয়াড়িতে কাঁচা রৌদ্ররেখা পড়েছে। নিস্তেজ সূর্য্যের ইশারা নীল মেঘমালার আড়ালে।

আর এখন বৃষ্টি ঝরবে না আকাশ থেকে। দিগদিগন্ত কাঁপিয়ে মেঘ ডাকবে না আর। দুয়োর কপাট বন্ধ রাখতে হবে না। কাকের ডাক শুনে যাই হোক খুশীর হাসি হাসলেন বিন্ধ্যবাসিনী। বুকে ঈর্ষা আর বিদ্বেষের দাহ, তবুও অল্প একটু হাসি ফুটলো মুখে। কেমন যেন এক রহস্য আর কৌতূহল-মিশ্রিত অব্যক্ত হাসি! শাড়ীর আঁচল পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কোমরে জড়িয়ে ফেললেন। নধর-নিটোল কটি ও নিতম্ব স্পষ্টতর হয় যেন।

—অ বৌ! কক্ষের বাহির থেকে ডাক দেয় পরিচারিকা নাতিউচ্চ কণ্ঠে!

সাড়াশব্দ মেলে না। ডাকের সাড়া মেলে না। আবার তাই ডাক পড়লো,—বৌ, ঘরে আছো না কি?

তবুও সাড়া নেই। অগত্যা পরিচারিকা দুয়োর পেরিয়ে দেখলো, কক্ষের এক কোণে জমিদারনন্দিনী। মৃদু মৃদু হাসছেন তিনি।

স্বস্তির শ্বাস ফেললো যশোদা। বললে,—ভাখো বাছা, দিন-রাত্তির ন্যাকরা আর ভাল লাগে না আমার! আমাদের জমিদারটি তেমন মানুষই নয় যে এই বনবাদাড়ের দেশে এসে মানভঞ্জন করবে তোমার! সোয়াগ দেখিয়ে তোমাকে খাওয়াতে আসবে!

বিন্ধ্যবাসিনী অতৃপ্ত হাসির সঙ্গে বললেন,—ঝাঁটা মারো সোয়াগের মুখে! সোয়াগ কে চায়? তুমি তো আছো, আমার আবার ভাবনা কি।

পরিচারিকার হাতে জলের ঘটি, থালিকা—পাত্রে আহার্য্য সামগ্রী, নারায়ণের প্রসাদী ফলমূল, নারকেলের নাড়ু, ক্ষীরের ছাঁচ। যশোদা বললে,—সদাক্ষণ তোমার এই গোমড়া মুখ আর আমার মোটেই ভাল লাগে না!

ক্ষীণ হাসি হাসলেন বিন্ধ্যবাসিনী। আঁচল চেপে মুখ মুছতে মুছতে

বললেন,—আমার মুখখানাই যে অমনি ধারার। পোড়া মুখে কি হাসি মানায়? হাসি কা'কে বলে তা কি জানি ছাই?

যশোদা যেন আর রাগ চাপতে পারে না। চাপা হাসি তার মুখে, অথচ যেন ক্রোধের মুখভঙ্গী। হাসি আর রাগ সংযত ক'রে বললে,—এগুলো এখন খেয়ে নাও দেখি! রান্না-বান্না হতে এখন অনেক দেরী।

—আমি রাক্ষসীর মত গোগ্রাসে গিলবো, আর তুমি? রাজকন্যা কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে কথা বললেন। বললেন,—তুমি কি অনাহারে থাকবে না কি? আয়, ভাগাভাগি করে দু'জনায় খাই।

—আমার তরে তোমাকে ভাবতে হবে না বৌ!

—আমার তরেও তবে ভাবতে হবে না কা'কেও।

খেঁকিয়ে উঠলো যেন পরিচারিকা। বললে—খাবো গো খাবো। না খেয়ে কি বেঁচে থাকা যায়?

দুই বাহুর সবল বন্ধনে বাঁধা পড়লো দাসী। বিন্ধ্যবাসিনী তাকে সাদরে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন,—খেতে আমি পারি, যদি একটা কথা রাখিস।

ড্যাবা-ড্যাবা চোখ ক'রলো দাসী। বললে,—কথাটা কি তাই শুনি আগে।

বিন্ধ্যবাসিনী বললেন,—রাখবি তো যশো? বল্ আগে অমত করবি না?

—আগে-ভাগে কথা দিতে পারবোনি ভাই! বিষ-টিষ এনে দিতে হবে না কি?

হাসি আর খুশীর ঝিলিক খেলে যায় রাজকুমারীর চোখে-মুখে। সহাস্যে বলেন,—চল, পাড়া ঘুরে আসি। কাছাকাছি যাবো, ভয় নেই তোর।

খানিক ভাবলো যশোদা। কক্ষের উপরিস্থিত কড়ি-বরগায় চোখ তুললো। ভেবে ভেবে বললে,—প্রহরী যে বাধ সাধবে! বাধা দেবে?

আর যদি বাধা না দেয়?

—তাতে আর আপত্য কি আমার। এটা তো তোমাদের সাতগাঁ নয় যে পাড়া-প্রতিবেশীর চোখকে ডরাবো? লাজ-লজ্জাকে ভয় ক'রবো?

—তবে দে খাই। সত্যিই আর থাকতে পারছি না যেন! ক্ষুধার জ্বালায় জ্বলছে বুক-পেট। কথা বলতে বলতে খাবারের পাত্র স্বহস্তে গ্রহণ করলেন বিন্ধ্যবাসিনী। নিজে কিছু মুখে দেওয়ার আগে সহসা একটি ক্ষীরের ছাঁচ দাসীর মুখে পুরে দিলেন সজোরে।

হেই হেই করলো পরিচারিকা। কিন্তু সে নিরুপায়। মুখের মধ্যে ছাঁচ পুরে দেওয়া হয়েছে তার।

দাসীর হাতে আরও কিছু ফল-মিষ্টান্ন তুলে দিলেন রাজকন্যা। নিজেও গলাধঃকরণ করলেন কিছু কিছু। জলপান করলেন প্রায় এক-ঘটি। ক্ষুধা-তৃষ্ণার জ্বালা নিবারণ ক'রে পরিতৃপ্তির শ্বাস ফেললেন।

—পাড়া ঘুরতে বেরুবে, আমাকে রান্না-বান্না করতে হবে নি?

যশোদা ঈষৎ ভাবালু কণ্ঠে কথা বললে,—ফিরতে যদি বেলা গড়িয়ে যায়, তখন?

—তা যায় যাক। রাজকুমারী কথার সঙ্গে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গী প্রকাশ করলেন। বললেন,—এক-হাঁড়ি ভাত ফোটাতে কতক্ষণ? সেই সঙ্গে ক'ট শব্জীও সেদ্ধ হয়ে যাবে। খাবো তো ভাতে-ভাত, তার তরে এত ভাবনার কি আছে!

—খাবি তো বৌ? স্নেহভরা কথার সুর পরিচারিকার। বলে,—এই তো কেমন লক্ষ্মীমন্ত মেয়ের মত কথা! তা নয়, না নাওয়া না-দাওয়া, চুলে তেল নেই—চোখে যে আর দেখা যায় না।

মৃদু মৃদু হাসলেন রাজকুমারী। টোল প'ড়লো দুই গোলাপী কপোলে। বললেন,—আর বিলম্ব নয় দাসী, চল যাই।

—প্রহরীকে বলতে হবে না? যাই বললেই কি যাওয়া যায়?

—তুই তবে বলে আয়। আমি গিয়ে দাঁড়াই পুকুর-ঘাটে।

—যাবে কোন্ দিকে তাই শুনি?

নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকেন বিন্ধ্যবাসিনী। ভাবতে ভাবতে বলেন,

দীঘির ধার দিয়ে দিয়ে যাবো খানিক। এই চার দেওয়ালের মধ্যে থেকে থেকে যেন হাঁফ ধরেছে আমার।

—পাড়া-প্রতিবেশী যে দেখতে পাবে? দুর্নাম ছড়াবে। বলবে, জমিদার কেষ্টরামের স্ত্রী পাড়া-বেড়ানী।

—সে ভয় নাই—বললেন রাজকন্যা। কোমরের কাপড় এঁটে বাঁধতে বাঁধতে বললেন,—একখান তসরের চাদরে ঢেকে নেবো মুখ। মাথায় ঘোমটা থাকবে। দেখেও কেউ ঠাওরাতে পারবে না। ভাববে, কে না কে!

—আবার যদি ঝড়-জল আসে? দুর্যোগ হয়? সম্ভাব্য ভীতির ছায়া ঘনায় পরিচারিকার মুখে!

রাজকুমারী বললেন,—শোন্ না কেন, কাক ডাকছে। আর জল হবে না এখন।

—তবে তাই চল। তুমি পুকুর-ঘাটে যাও, আমি প্রহরীকে জানিয়ে আসি ততক্ষণে। কথা বলতে বলতে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয় যশোদা। দালানে পা দিয়ে বললে,—প্রহরী সায় দেয় তো বাঁচি।

অলক্ষ্যে থেকে মিটি-মিটি হাসলেন রাজকুমারী। কেমন যেন দুষ্টামির হাসি। নিজের মনেই বললেন,—তোমাদের পাঠান প্রহরীকে ওষুধ খাইয়েছি। তাতেই কাজ হবে।

ছাই পায় না, মুড়কি জলপান। পাঠান প্রহরী তখন আনন্দে অধীর হয়ে আছে। অভাবী জন, ভাত-কাপড়ের রেস্ত নেই। চালচুলোর বালাই নেই। ছেঁড়া-চাটাই তার শয্যা! অন্ন-কাঙালী বললেই হয়। সে পেয়েছে হাজার টাকার মোতির হার!

যশোদা প্রহরীর কাছে গিয়ে বলে,—জমিদারনীকে নিয়ে যাচ্ছি কাছেই এক দেব-দেউলে। যাবো আর আসবো। অমত করবে না কি?

আকাশে চোখ তুললো পাঠান। বড় জটিল প্রস্তাব করেছে যে দাসী।

খাঁচার পাখীর পায়ের শিকল কেটে দিতে বলছে। বন্দুকের কুঁদোয় দু'হাতে ভর রেখে দাঁড়িয়ে থাকলো চুপচাপ।

—প্রহরী, তুমি জবাব দাও না কেন? কি এত ভাবছো আকাশ পাতাল? অধৈর্য্যের সুরে বললে যশোদা। কাতরকণ্ঠে বললে,—আমাকে তোমার প্রত্যয় হয় না? আমি কি জমিদারের মাইনে খাই না? ইষ্টানিষ্ট জ্ঞান নেই আমার?

—বেইমানী করবি না তো তুই? আকাশ থেকে চোখ ফিরিয়ে বলতে বলতে হঠাৎ পাঠানের দৃষ্টিপথে আসে, ভগ্নগৃহের ছাদে এক আকাশ-পরী। জমিদারের বেগম, প্রহরীর মনিবনী। সাঁজোয়া পোষাকের ভেতরে, ঠিক বুকের কাছে খচখচ বিঁধছে বহুমূল্য রত্নহার! পাঠানের দৃষ্টি নত হয়ে যায় ঐ গুণ্ঠনবতীকে দেখে। পাঠান বললে,—ঠিক হ্যায়! বেইমানী করবি তো দেখছিস এই বন্দুক।

থরথরিয়ে কেঁপে উঠলো পরিচারিকা। বুক দুরদুরিয়ে উঠলো। শ্বাস প'ড়লো না কতক্ষণ। বললে,—জান্ থাকতে নয়। যদি না মরি তো তোমার কোন ভয় নেই। কথার শেষে ফিরলো দাসী। চললো কাঁপা-কাঁপা পায়ে।

রূপালী রৌদ্রের পরশ লেগেছে গাছের শিখরে। ঘনঘোর বর্ষণের পর ছিটে-ফোঁটা আলো! সূর্য্যের রশ্মি যেন স্যাঁতস্যাঁতে। গৃহের ছাদেও রৌদ্ররেখা পড়েছে। জমিদারের বেগমও বাদ যায়নি। কাঁচা রোদে বিন্ধ্যবাসিনীর তসরের গাত্রাবরণ ঝলমল করে।

দেখা দিয়েছেন রাজকন্যা। সশরীরে। তাঁকে চোখে দেখে যদি মনে পড়ে পাঠানের, রত্নহার লাভের কৃতজ্ঞতায় যদি আর অসম্মত না হয়, সেই আশায় বিন্ধ্যবাসিনী ছাদে দাঁড়িয়ে দেখা দিলেন।

পাঠান কুর্নিশ শুরু করলো, একের পর এক। নতুন সূর্য্যালোকে তার সাঁজোয়া পোষাক ঝিকমিকিয়ে ওঠে।

দীঘির তীর ধ'রে, পায়ে চলা সঙ্কীর্ণ ও আঁকাবাঁকা পথ ধ'রে বিন্ধ্যবাসিনী সভয় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেন। সহগামিনী পরিচারিকা যশোদা যেন পদে

পদে ভীতা হয়। পাঠান প্রহরীর ভীতি প্রদর্শনের কথাগুলি বার বার মনে পড়ে। বন্দুকের ভয়ে গায়ে যেন তার কাঁটা দেয়।

পথের এক দিকে বিস্তীর্ণ আসমানদীঘি, অন্য দিকে বালুকাবেলার শেষে জল ছলছল আমোদর—কুলু কুলু রবে প্রবহমান। যতদূর দৃষ্টি চলে তত দূর মধ্যে কোথ্যও বসতির লক্ষণ কিছুই নেই। কিন্তু সে বন শুধু দীর্ঘ বৃক্ষাবলী-শোভিত বা নিবীড় বন নয়—কেবল স্থানে স্থানে উদ্ভিদ মণ্ডলাকারে কোন কোন ভূমিখণ্ড জুড়ে আছে। কোথাও কোথাও মানুষ প্রমাণ কাশ মাথা তুলেছে!

রাজকুমারী এদিক সেদিক দেখতে দেখতে দ্রুত পায়ে অগ্রসর হন। নদীর জল স্থির গম্ভীর, কোথাও ঘূর্ণাবর্ত্ত, কোথাও জলরাশির মধ্যে ভৈরব কল্লোল।

যতদূর দৃষ্টি যায় রাজকুমারী দেখেন, কোথাও গ্রাম নেই, মনুষ্য নেই, আহার্য্য নেই। আসমান আর আমোদরের থৈ থৈ জল।

—কোথায় চললে বৌ? আমার যে ভয় ভয় করে।

পরিচারিকার ভীতিবিহ্বল কণ্ঠস্বরে পিছন ফিরে দেখলেন বিন্ধ্যবাসিনী। চলার গতি সংযত করলেন। হাঁফ ছেড়ে বললেন,—দীঘির শেষ বরাবর চল না। দেখা যাক্ সেথায় কি আছে।

—বাঘের মুখে পড়বে না কি বৌ? তোমার সাহস তো দেখি কম নয়? যশোদা ভয়ে ভয়ে কথা বলে। নিজের শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দে পর্য্যন্ত ভয় পায় সে। সাপের ফোঁসফোঁসানি শোনে যেন কানে। দুর্য্যোগ-শেষের বাতাসে শোঁ-শোঁ শব্দ!

রাজকন্যা বললেন,—ভাগ্যে যদি থাকে বাঘের সাক্ষাৎ, কে খণ্ডাবে?

অলকাবলীর প্রাচুর্য্যে আর অবগুণ্ঠনের আবরণে বিন্ধ্যবাসিনীর অপূর্ব্ব মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ প্রকাশ হয় না। কাজল-কালো চোখে অতি স্থির, অতি স্নিগ্ধ, অতি গম্ভীর অথচ জ্যোতির্ম্ময় কটাক্ষ। কেশরাশিতে পৃষ্ঠদেশ ও বাহু-যুগল যেন আচ্ছন্ন হয়ে আছে। চাঞ্চল্যে মুক্ত হয়ে গেছে এলোচুলের এলো-খোঁপা। মুক্তকেশ আর তসরের উত্তরীয়ে স্কন্ধদেশ প্রায় অদৃশ্য, শুধু শুভ্র বাহুযুগলের নিটোল গঠন কিছু কিছু দেখা যায়।

—সাপে যদি দংশায় ?

—তা-ও ভাগ্যের লেখন বলতে হবে।

কথা বলতে বলতে দু'জনে দ্রুত এগিয়ে চলেছেন। যেন কি এক আবিষ্কারের নেশায় মেতে উঠেছে রাজকন্যার দেহ-মন। ভয় আর আশঙ্কাকে যেন জয় করেছেন!

—নদীর তীরে অত ভীড় কেন? দেখো দেখো, কত মানুষ, কত খোল আর কত শিঙা!

কথার শেষে দাঁড়িয়ে পড়লো যশোদা। পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকলো। দেখলো, নদী-সৈকতে একটি ক্ষুদ্র জনতা। কোন এক আনন্দে আত্মহারা হয়ে তারা নাচানাচি করছে অবিরাম। 'হরি হরি বল' ধ্বনিতে মাতিয়ে তুলেছে যেন নদী-তীর।

—ওরা কা'রা? অত্যন্ত ধীরকণ্ঠে বললেন বিন্ধ্যবাসিনী, নদীতীরে দৃষ্টি রেখে।

পরিচারিকা বললে,—কেউ হয়তো মরেছে! তবে এত মেইয়াদের ভীড় কেন?

রাজকন্যা পথক্লান্তিতে শ্রান্ত। ক্লান্ত চোখে দেখেন তিনি। দেখা যায়, কীর্ত্তনীয়াদের কাছাকাছি নারীদের এক জটলা। সধবা এয়োস্ত্রীদের সমাগম সলজ্জায় তারা দাঁড়িয়ে আছে এক পাশে। রাজকুমারী বলেন,—দাসী, য দেখে আয়। আমি আছি এই গাছের ছায়ায়।

—একা-একা যেতে আমি ডরাই, তুমিও কেন চল না? দাসীর কথা যেন ভয়ার্ত্ত স্বর। বললে,—কেউ চিনবে না তোমাকে। মুখ-চোখ ঢেকে চল না কেন?

—তবে তাই চল।

কেমন যেন অনিচ্ছায় পা চালালেন বিন্ধ্যবাসিনী। কণ্টকাকীর্ণ ভূমিখণ্ড যখন-তখন কাঁটা বিঁধছে, পায়ে। নীরবে কাঁটা তুলে ফেলে আবার চলতে থাকেন তিনি। বালির স্তূপে ঢাকা প'ড়েছে ফণী-মনসার শাখা। অজ্ঞাতে কাঁটা বিঁধে যায় পায়ে। মনসার কাঁটা। পদতল ক্ষত-বিক্ষত হয়, তবু

মুখে কিছু প্রকাশ করেন না রাজকন্যা। কি এক আবিষ্কারের নেশায় যেন অধীর হয়ে আছেন।

জনতার কাছে এগিয়ে যেন শিউরে উঠলেন বিন্ধ্যবাসিনী। দুই চক্ষু মুদিত ক'রে ফিসফিয়ে বললেন,—চল্ দাসী, এখান থেকে পালাই। চোখে আমি দেখতে পারি না যেন।

জনতার মধ্যস্থলে এক মুমূর্ষু। লোল চর্ম্ম, অশীতিপর বৃদ্ধ, শেষ শয্যায় শায়িত। মৃত্যুপথযাত্রীর দৃষ্টি মহাশূন্যে নিবদ্ধ। চক্ষুতারকা স্থির ও অচঞ্চল। অন্তর্জলী হবে বৃদ্ধের, মুমূর্ষুর নিম্নাঙ্গ নদীতে নিমজ্জিত করা হবে পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য। বৃদ্ধের অন্তিমকাল যে সমুপস্থিত!

মান্দারণের কোন এক গৃহে পাঁচটি কন্যা বর্ত্তমান। দেবীবরের নিয়মে মেলী-কুলীন-কন্যা অবশ্যই করণীয় কুলীন পাত্রে অর্পিত হবে, যদি তার আজীবন বিবাহ না হয় তবুও শ্রোত্রিয় অথবা বংশজের ঘরে তার বিবাহ হ'তে পারবে না। অথচ কুলরক্ষা করতে হবে যেন-তেন। সেই হেতু এক মহাপ্রস্থানের পথিক, অশীতিপর বৃদ্ধের করে সময় সময় বহুসংখ্যক কন্যা সম্প্রদান করতে হয়। মেলী কুলীন শ্রীনাথাচার্য্য এ নিয়মের প্রচলন করেছেন! পাত্রাভাবে যে কুলবালাদের আর ইহজন্মে পাত্র জুটবে না। তদুপরি বঙ্গদেশে পাত্র-সংখ্যা নিতান্তই অল্প আর কন্যা-সংখ্যার আধিক্য। অথচ ষোড়শোপচারে পূজা না পেলে কোন কুলীন-সন্তান তাঁর করণীয় ঘরে বিবাহ করতে সম্মত হন না।

লোলচর্ম্ম বৃদ্ধকে দেখে দেখে শিউরে শিউরে ওঠেন রাজকন্যা। লক্ষ্য করেন, এয়োস্ত্রীদের মধ্যে পাঁচ জন অনূঢ়া। তাদের মধ্যে কারও বয়স ত্রিশ, কারও বিশ, কেউ সপ্তদশী, কেউ বা মাত্র দশমবর্ষীয়া।

পরিচারিকা বললে,—ঐ বুড়ার সঙ্গে ঐ কুমারীদের বিয়া হবে। দেখবে না বৌ?

—না এখনই চল, এই স্থান ত্যাগ করি।

রাজকুমারী ফিরতে চাইলেন। চোখে যেন দেখা যায় না এই অপকর্ম্ম।

বৃদ্ধের আশ-পাশে কন্যাকর্ত্তার দেয় দ্রব্যাদি সজ্জিত। মুমূর্ষুকে ঘিরে উদ্দাম নৃত্য করছে কীর্ত্তনীয়ার দল। মধ্যে মধ্যে চীৎকার করছে, 'হরি হরি বল'।

দ্রব্যসমূহের মধ্যে আছে, বস্ত্রজোড়; লগ্নপত্র, কন্যার বস্ত্র, নরসুন্দরের বস্ত্র, কোটালের বস্ত্র। টাকার তোড়ায় আছে পাত্র-দক্ষিণা; পুরোহিতের প্রাপ্য; কুলপালকের পুরস্কার; পাত্র আশীর্ব্বাদী; কুলদায়িনীর প্রণামী; গুরুপ্রণামী, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঘোর পাত্রাভাব। কুলবালাদের দুর্দ্দশার অন্ত নেই। শুভ-পরিণয় ব্যতীত জীবনরক্ষা করা যায় না। তাই এক ঘরের পঞ্চকন্যার বিবাহ হবে একটি প্রবৃদ্ধের সঙ্গে। কপালে সুখভোগ না থাকে, সীমন্ত সিন্দুর বিহীন থাকবে না আর।

পরিচারিকা যশোদার দু'চোখে দরদর অশ্রু। ঐ পঞ্চকন্যার ভবিষ্যৎ কি, ভাগ্যে কি আছে কে জানে! বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে বৈধব্য সমুপস্থিত হবে। দাসী না কেঁদে যেন পারে না। বার বার দেখে ঐ পঞ্চকন্যাকে, দেখে তাদের অসাধারণ রূপ-যৌবন। দেখে তাদের ভাগ্যের পরিহাস। আঁচলে চোখ মুছে ফিরে তাকিয়ে দাসী দেখলো, জমিদারপত্নী অনেক দূরে এগিয়েছে। একটি তপ্তশ্বাস ফেলে সেও চললো!

নদীর তীরের পায়ে-চলা আঁকা-বাঁকা ও সঙ্কীর্ণ পথ ধ'রে অতি দ্রুত এগিয়ে চললেন রাজকন্যা বিন্ধ্যবাসিনী। আর ফিরেও তাকালেন না। পঞ্চকন্যার ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে মন যেন তাঁর ক্ষুণ্ণ হয়ে গেছে।

—অ বৌ! অ জমিদার-গিন্নী! যশোদা ডাক দেয় পেছন থেকে।

রাজকন্যার কান নেই কারও কথায়। লজ্জা-নম্র পদক্ষেপে তিনি আগেই অগ্রসর হয়েছেন! তসরের উত্তরীয়ে তাঁর উর্দ্ধাঙ্গ আচ্ছাদিত।

—অ বৌ, আর কত দূরে নিয়ে যাবে গো?

যশোদা শুধায় সহজ সরল সুরে। বলে,—ওদিকে যে বৌদ্ধদের সঙ্ঘারাম। বৌদ্ধরা যদি কোন রকমে জানতে পায় তুমি ব্রাহ্মণের মেইয়া, রক্ষা থাকবে না আর। নয় তাদের সঙ্গে যেতে হবে, বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহন করতে হবে, আর তা নয়তো জানে মারা পড়তে হবে। কিম্বা থাকতে হবে বন্দিনী হয়ে।

—কোথায় সঙ্ঘারাম? উগ্র কৌতূহলের সঙ্গে কথা বলেন রাজকন্যা।

—পথে যেতে যেতে দেখতে পাবে! ভয় করবে না তোমার?

ড্যাবা-ড্যাবা চোখে বললে যশোদা।

—যার কপাল পুড়েছে তার আবার ভয় কিসে?

চলতে চলতে বললেন বিন্ধ্যবাসিনী। বললেন,—শুনেছি বৌদ্ধরা মেয়ে-জাতকে বড় শ্রদ্ধাভক্তি করে। তবে আর ভয় কিসের?

পায়ে-চলা আঁকাবাঁকা সঙ্কীর্ণ পথ। পথের হু'পাশে বৃক্ষশ্রেণী। তাল, নারিকেল আর খেজুর গাছের সারি। মেহেদীর ঝোপ। বনঝাউয়ের জটিল যেন সবুজ পর্দ্দা ঝুলছে একটানা। কাসফুল ফুটেছে এখানে ওখানে। ফড়িং উড়ছে ফুলে ফুলে।

পরিচারিকা বললে দুঃখভারাক্রান্ত সুরে,—কুলীন মেইয়দের কি দুর্দ্দশা দেখলে বৌ? দেখে চোখ ফেটে জল আসে যেন!

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন রাজককন্যা। পায়ে কাঁটা আর কাঁকর বিঁধছে, খেয়াল হয় না। জীবন পণ ক'রে চলেছেন যেন। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলে ফেলছেন এক একবার। বললেন,—কুলীন-ঘরের মেয়ের বৃথা জন্ম! বরাতে শুধুই দুঃখুকষ্ট, স্বোয়ামীর সোয়াগ আদর কা'কে বলে জানতে পায় না! স্বোয়ামীর মুখ দেখতে পায় না বছরান্তে। ঘর করতে পায় না। বলতে বলতে ক্ষণেক থেমে আবার বললেন,—আমার বরাতই বা কি? পোড়াকপাল বৈ তো কিছুই নয়।

—কোথায় চললে বৌ? এ পথের কি শেষ আছে? চল, ফেরা যাক এখন। যশোদা চলতে চলতে যেন হাঁপিয়ে উঠছে। দাঁড়িয়ে পড়ছে। শ্রান্তির ছায়া নেমেছে তার মুখে।

রাজকুমারীর মিনতিপূর্ণ কণ্ঠস্বর। বললেন,—দীঘির শেষাশেষি গিয়ে ফেরা যাবে দাসী। আর কতটুকুই বা।

কি এক আবিষ্কারের নেশা যেন পেয়ে ব'সেছে রাজকন্যাকে। অদম্য কৌতূহল আর উৎসাহ তাঁর।

আসমানদীঘি আকাশের মতই যেন বহুবিস্তৃত। আকাশের হয়তো শেষ আছে, কিন্তু দীঘির যেন শেষ নেই! যতদূর দৃষ্টি চলে, শুধু জল আর জল। শেওলা-সবুজ সুগভীর জল। যেন সুষুপ্তি-সুস্থির। কচিৎ দু'একটা বৃহৎ মৎস্য লাফিয়ে উঠছে কোথাও কোথাও সশব্দে।

আশা! ভালবাসার আশা!

আনন্দকুমারীর এই কথা ক'টি বারে বারে কানে বাজে যেন বিন্ধ্যবাসিনীর। চৌধুরীকন্যার কথা তো নয়, যেন দম্ভোক্তি। শুধু কথা নয়, আনন্দকুমারীর অলঙ্কারের ঝনৎকারও কানে লেগে আছে। চোখে ভেসে উঠছে তার রূপ-যৌবনের লাবণ্য, তার পোষাক-পরিচ্ছদ। ঈর্ষা আর বিদ্বেষের জ্বালায় রাজকন্যা থেকে থেকে বড় অস্বস্তি বোধ করছেন। চন্দ্রকান্ত কি সত্যই ঐ মূর্তিমতী আগুনের প্রেমাস্পদ! কে জানে! পায়ের কাঁটা তুলে ফেলা যায়, কিন্তু বুকের কাঁটা কে তুলবে? ক্ষণে ক্ষণে খচখচ করে যেন রাজকন্যার বুকে।

—দাসী কার আটচালা বল্ তো?

বিন্ধ্যবাসিনী কথা বলতে বলতে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করলেন। ব্যগ্রচোখে তাকিয়ে।

—কে জানে কার!

—বসতি নেই না কি? যা না, দেখে আয় না। আমি আছি এখানে।

কথার শেষে এক অতি বৃহৎ মহীরুহের ছায়াতলে একটি মাটির ঢিপিতে ব'সে পড়লেন বিন্ধ্যবাসিনী।

কিছু দূরে বাঁশঝাড়। ঘন বাঁশবন। তেঁতুল আর সজিনার শাখা মাথা তুলেছে আকাশে। থেকে থেকে ঝড়ের হাওয়া বইছে। রাজকন্যার তসরের গাত্রাবরণের আঁচল উড়ে যায়। মহীরুহের শাখায় শাখায় পাখীর কলকাকলী। কাঠবিড়ালীর লম্ফ-ঝম্ফ। এখানে-সেখানে বন্য লতাগুল্ম। বনঝাউয়ের ঝোপ।

শুদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণের মধুর ধ্বনি ভেসে আসে কোথা থেকে? দেবভাষায় কারা যেন গান ধরেছে সামস্বরে? কাছাকাছি কোথাও কোন দেবালয় আছে না কি! উড়ু-উড়ু বাতাসে পবিত্র সুগন্ধ। হোমাগ্নিতে কেউ হয়তো

গব্যঘৃত আহুতি দেয়। দূরস্থিত আটচালার প্রতি অনিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন বিন্ধ্যবাসিনী। আটচালার চতুর্দ্দিকে সুউচ্চ প্রাচীর—মাটির দেওয়াল। প্রাচীরগাত্রে আলপনা আঁকা। যেন রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষায় থাকেন রাজকন্যা। মাঝে মাঝে গা ছম-ছম করে তাঁর নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দে। সাপখোপ থাকে যদি কোথাও! অতর্কিতে যদি দংশন করে?

সুস্বাগতম!

কার গম্ভীর কণ্ঠে যেন চেতনা লাভ করলেন আপনাতে আপনি আত্মহারা বিন্ধ্যবাসিনী। লুপ্তজ্ঞান ফিরে পেলেন। ফিরে তাকিয়ে দেখলেন, সেই অভাবনীয়কে। যুক্ত দুই কর, বিনম্র মুখাকৃতি, ভাবগম্ভীর চোখে যেন আকুল আহ্বানের ঈশারা। রাজকন্যা সলজ্জায় দেখলেন, চন্দ্রকান্ত কখন এসে দাঁড়িয়েছেন পিছনে। চন্দ্রকান্ত মৃদু হাসির সঙ্গে পুনরায় বললেন,—সুস্বাগতম।

মাটির ঢিপিতে ব'সেছিলেন রাজকন্যা। শ্রান্তদেহে। মনুষ্যকণ্ঠ শোনামাত্র উঠে দাঁড়িয়েছেন তৎক্ষণাৎ। বুক আর পিঠের বসন সামলে নেন। মুখে যেন কোন কথা আসে না। অভিভূত দৃষ্টি যেন চোখে। বিন্ধ্যবাসিনী চক্ষু নামিয়ে ভূমির প্রতি দৃষ্টি-নিবদ্ধ করেন ক্ষণেকের মধ্যে। কত উৎসাহ, কত প্রতীক্ষা, কত আগ্রহ, কত কৌতুহল—সব যেন উবে গেল কর্পূরের মত। দৃষ্টি-বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গে লজ্জা আর ভয় যেন গ্রাস করলো। আনত মুখ আর তুলতে পারলেন না। মাথার গুণ্ঠন ঈষৎ টেনে দিলেন ভ্রূযুগলের পরে। প্রথম দৃষ্টিতে বিন্ধ্যবাসিনী দেখে নিয়েছেন—চন্দ্রকান্তর সৌম্যকান্তি। প্রশস্ত ললাটে চন্দনরেখা; বিশাল বক্ষে শুভ্র উপবীত; করাঙ্গুলিতে কুশাঙ্গুরীয়; পরিধানে পটবস্ত্র; পদদ্বয়ে কাষ্ঠপাদুকা।

চন্দ্রকান্ত স্মিতহাসি হাসলেন। বললেন,—মহাশয়ার দুঃসাহস প্রশংসার্হ। কিন্তু এ স্থান অত্যন্ত ভয়াবহ। শ্বাপদের ভয় শুধু নাই, বৌদ্ধতান্ত্রিকগণের অনাচারের যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। মদীয় কুঠীরে চলুন, এই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ যতক্ষণ জীবিত আছে আপনার পদে কুশাঙ্কুরও বিঁধবে না। ঐ আমার বাসস্থল।

ব্রাহ্মণ কথার মাঝে নিজের প্রতি নির্দ্দেশ করলেন। বক্ষে হাত ছোঁয়ালেন।

—দাসীকে দেখি না কেন? সে কোথায়?

মিহিমিষ্টি কথার সুর রাজকন্যার। লজ্জানম্র ভঙ্গিমা। আনতদৃষ্টি।

চন্দ্রকান্ত রমণীর দুই পায়ে চোখ রেখে বললেন,—দাসী সেখানে আছে। তার মুখে শুনে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছি আমি। আপনি আমাকে অনুসরণ করুন নির্ভয়ে নিশ্চিন্তায়।

মহীরুহের সিক্ত শাখা-পল্লব থেকে টুপটুপ জল পড়ছে এখনও, শুষ্কপত্রের স্তূপে। বনভূমির নৈঃশব্দ ভঙ্গ হয় থেকে থেকে।

চন্দ্রকান্ত আগে, বিন্ধ্যবাসিনী তাঁর পশ্চাতে। ধীরে ধীরে, জল-কাদা মাড়িয়ে, দু'জনে এগিয়ে চললেন সাবধানে। মাটির পিচ্ছিলতা বড় বেশী যেন।

চন্দ্রকান্ত প্রশ্ন করলেন,—কোন্ কার্য্য কারণে এই দিকে আগমন? জানতে ইচ্ছা হয়।

ক্ষণেক নিরুত্তর থাকেন বিন্ধ্যবাসিনী। কি অভিমত ব্যক্ত করবেন, চিন্তা করলেন হয়তো। কণ্ঠ-তালু বিশুষ্ক, বাক্যের যেন স্ফুরণ হয় না। তদুপরি অপরিসীম লজ্জা-সঙ্কোচে যেন বুক দুরুদুরু করে।

চন্দ্রকান্ত আবার বললেন,—বাধা থাকে তো না বলেন।

সঙ্কোচ বোধ করলেন রাজকন্যা। ভাবলেন, বলবেন কি বলবেন না। ইতস্ততের মধ্যে ব'লে ফেললেন,—মহাশয়ের দর্শন অভিপ্রায়ে।

কপালে রেখা ফুটলো ব্রাহ্মণের। চোখের পলক পড়লো না। কেমন বিস্ময়ে নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। আর দ্বিতীয় কোন প্রশ্ন করলেন না। নীরবে চললেন আগে আগে।

পিছন থেকে লক্ষ্য করেন বিন্ধ্যবাসিনী। ব্রাহ্মণকে দেখেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। ব্রাহ্মণের সৌম্যকান্তি, বলিষ্ঠ বাহু, বৃষ-স্কন্ধ, ক্ষীণ কটি। মাথার শিখায় নীল অপরাজিতা।

রাজকন্যার কথায় ব্রাহ্মণ খুশী হন না অখুশী হন, অনুমানে বোঝা গেল না।

আটচালার দুয়োরের কাছাকাছি পৌঁছে চন্দ্রকান্ত বলেন,—এই আমার টোল চতুষ্পাঠী—যাই বলেন।

কোথায় কা'রা মন্ত্রপাঠ করছে যেন বৈদিক ভাষায়। মন্ত্রের উচ্চারণে, সুরে ও বিরতিতে অসম সমতা। একসঙ্গে বহু জনের কণ্ঠ, কিন্তু সুর অত্যন্ত কোমল। যেন শিশুকণ্ঠ।

ফিস-ফিস করে কথা বললেন রাজকন্যা। সাগ্রহে বললেন,—এ সময়ে পূজার মন্ত্র কেন? কি তিথি আজ? কার পূজা?

অস্ফুট হাসলেন চন্দ্রকান্ত। আটচালার দাওয়ায় পদার্পন ক'রে সহাস্যে বললেন,—অন্য কোন দেবদেবীর পূজা নয়, বাগ্‌দেবীর অর্চ্চনা। ছাত্রশিষ্যদের দৈনন্দিন পাঠের সময় এখন। তারাই পাঠ করছে তাদের অধ্যেয়।

—আমাদের আসায় পাঠে বিঘ্ন হবে হয়তো? বিন্ধ্যবাসিনী চুপি চুপি কথা বললেন অবগুণ্ঠনের মধ্যে থেকে। গুণ্ঠন আরও কিঞ্চিৎ টানলেন, প্রায় নাসিকাগ্রে।

আটচালার একটি শূন্য কক্ষে পূর্ব্বেই এসে বসেছিল পরিচারিকা। সেই কক্ষে প্রবেশ করলেন চন্দ্রকান্ত। বললেন,—এই স্থানে কোন কলরব নাই, আপনারা অধিষ্ঠান করুন। পথ-ক্লান্তি লাঘব করুন।

কক্ষের মধ্যস্থলে ছিল একটি তক্তাপোষ। ব্যাঘ্রচর্ম্মের আসনে আবৃত। দেওয়ালে কয়েকখানি চিত্রপট, মানচিত্র। দশ অবতারের হস্তাঙ্কিত পট আর বঙ্গভূমির মানচিত্র। বাঙলার একেক স্থানের নাম মানচিত্রের বুকে। নগর-নগরী নদ-নদীর নাম। কক্ষের এক প্রান্তে একটি জলচৌকীতে স্তূপীকৃত পুঁথি। লাল শালু জড়ানো। সদ্য কার করস্পর্শ পড়েছে, তাই যেন কিছু অগোছালো। কয়েকটি পুঁথির শালুর আবরণ উন্মোচিত দেখা যায়। কক্ষের এক দেওয়ালে সারি সারি খড়্গ প্রলম্বিত। কোনটি পশুচ্ছেদক, কোনটি মনুষ্যচ্ছেদক। বঙ্গদেশজাত অসি, তীক্ষ্ণচ্ছেদভেদে পটু। যেমন তীক্ষ্ণ, তেমন দৃঢ়, লঘুভাব ও সুলক্ষণযুক্ত। প্রতিটি খড়্গের অঙ্গে অঙ্গচিহ্ন। কোনটিতে স্বর্ণরেখা, কোনটিতে রৌপ্যরেখা। সর্পফণা, লাঙ্গলাগ্র, অশ্বখুর ও চক্ষুচিহ্নযুক্ত যুদ্ধাস্ত্রগুলিতে দিবালোকের চাকচিক্য।

—এটি কি অস্ত্রাগার? অত অস্ত্র কেন? অস্ত্রশিক্ষা দেন না কি রাজকুমারী যেন ভয়ার্ত্তকণ্ঠে বললেন।

এদিক সেদিক দেখলেন চন্দ্রকান্ত। সশঙ্কচিত্তে বললেন,—বিধর্ম্মীদের অত্যাচার আর অনাচারে সমগ্র ব্রাহ্মণ-সমাজ বর্ত্তমানে অতিষ্ঠ হয়ে আছে! বিশেষতঃ বৌদ্ধতান্ত্রিকদের হিংস্রতা আর সহ্য করা যায় না! তরবারির পরিবর্ত্তে তরবারি চালনায় বঙ্গদেশবাসী যে অপারগ নয়, এ তারই প্রমাণ। বৌদ্ধগণ জানে না আমাদের আদর্শ, 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'।

—অস্ত্রগুলিতে রক্তের ছাপ কেন?

রাজকন্যার যেন অদম্য কৌতূহল! কণ্ঠ আবেগময়।

ব্রাহ্মণ ক্ষীণহাস্য সহকারে বলেন,—শত্রুর রুধিররেখা।

শিউরে শিউরে উঠলেন রাজকুমারী। পরিচারিকা যশোদাও যেন চমকে উঠলো। দু'জন মুণ্ডিত-মস্তক কিশোর ব্রহ্মচারী কক্ষে প্রবেশ করলো সসম্ভ্রমে। তাদের একজনের দুই হাতে কদলীপত্র। পাতায় ফল আর মিষ্টান্ন। আম, জাম, জামরুল আর চিনি-সন্দেশ। অন্য জনের হাতে জলপাত্র!

চন্দ্রকান্ত বললেন মিনতির সুরে,—আপনারা ভক্ষণ করেন তো বাধিত হই। এ দরিদ্রের আবাসে আর অধিক কিছুই নাই।

লজ্জানুভব করলেন বিন্ধ্যবাসিনী। অপ্রস্তুত হ'লেন। ব্রাহ্মণের কথার প্রতিবাদ জানাতে পারলেন না যেন। পাত্রগুলি আর আহার্য্যপূর্ণ কদলীপত্র তক্তাপোষে রেখে নির্ব্বাক্ ব্রহ্মচারীদ্বয় কক্ষ ত্যাগ ক'রলো।

ব্রাহ্মণ আবার বলেন,—আমি আছি অন্যত্র। আমার সম্মুখে হয়তো আহারে অসুবিধা হবে। কথা বলতে বলতে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন চন্দ্রকান্ত। কক্ষের দ্বার দীর্ঘ নয়, তাই কথঞ্চিৎ অবনত হয়ে নিষ্ক্রান্ত হন।

—একটি নিবেদন ছিল। লজ্জা ঘুচিয়ে বললেন বিন্ধ্যবাসিনী। অবগুণ্ঠন আবার নাসিকাগ্রে টানলেন কথার শেষে।

—ব্যক্ত করুন নির্ভয়ে। দ্বিধার কিছুই নাই।

কথা বলতে বলতে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন চন্দ্রকান্ত। নির্ব্বিকার মুখাকৃতি তাঁর! সামান্ত আগ্রহ বা উৎসাহ প্রকাশ পায় না যেন।

বিন্ধ্যবাসিনী অত্যন্ত ধীরে ধীরে বলেন,—মহাশয় কি চৌধুরীকন্তাকে জানেন? পরিচয় আছে গোপীমোহন চৌধুরীর মেয়ে আনন্দকুমারীর সঙ্গে?

প্রশ্ন শুনে ক্ষণেক নীরব হন চন্দ্রকান্ত। উপবীত করাঙ্গুলিতে বেষ্টন করতে করতে বলেন,—হাঁ, পরিচয় আছে বটে, তবে কোন ঘনিষ্ঠতা নাই। ঐ আনন্দকুমারী কিছুকাল পূর্ব্বে—কথা থামালেন ব্রাহ্মণ, কেন কে জানে। লজ্জার অরুণ-আভা খেললো তাঁর মুখাবয়বে।

অধৈর্য্যে অস্থির হন রাজকুমারী। শ্বাস রুদ্ধ হয় যেন তাঁর, বিন্ধ্যবাসিনী বলেন,—বক্তব্য শেষ করলেন না কেন?

লজ্জানম্র, স্মিতহাসি হাসলেন চন্দ্রকান্ত। বললেন,—বাধা কিছুই নাই। তবে কথাটি যেন পাঁচ কানে না যায়!

—অঙ্গীকার, কেউ জানবে না। নিশ্চিন্ত হোন আপনি।

আবার এদিক-সেদিক দেখলেন চন্দ্রকান্ত। সলজ্জায় বললেন,—গোপী-মোহনের অদৃষ্ট মন্দ, তাই আনন্দকুমারীর মত কন্যা লাভ করেছেন! এমনই নির্লজ্জ যে, আমার সমীপে সে স্পষ্ট বিবাহের প্রস্তাব করে।

—আপনি অসম্মত কেন?

—জাতিভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কায়। তদ্ব্যতীত আমি বিবাহের পক্ষপাতীও নহি। ঘোর অভাব, সংসার প্রতিপালনের ক্ষমতা আমার নাই। তদুপরি আনন্দকুমারী বড়ই প্রগলভা!

প্রসন্ন হাসি গোপন করলেন রাজকুমারী। স্বস্তির শ্বাস ফেললেন যেন এতক্ষণে।

—চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত, আছো না কি?

আটচালার বাহির থেকে কে ডাক দেয় জলদ-গম্ভীর কণ্ঠে। কোন এক পরিচিত কণ্ঠ শুনে তৎক্ষণাৎ কক্ষ ত্যাগ করলেন ব্রাহ্মণ। ব্যস্ততার লক্ষণ দেখা

যায় তার মুখভাবে। প্রশস্ত কপালে চিন্তারেখা। যাত্রাকালে বললেন,—কা'কে আবার হত্যা করলো কে জানে! গোকুলানন্দ যেন দিন দিন অসুরে পরিণত হ'তে চলেছে!

ব্রাহ্মণের স্বগতোক্তিতে বক্ষ দুরু-দুরু করে জমিদার-নন্দিনীর। কে আবার কাকে হত্যা করলো! খুনোখুনি, হাতাহাতি, রক্তারক্তি যেন সহ্য করতে পারেন না বিন্ধ্যবাসিনী। চোখে দেখা দূরের কথা, কানে শুনতেও ভীতা হন যৎপরোনাস্তি।

ক্ষুধার তাড়নায় কি না কি জানি পরিচারিকা একে একে সকল আহার্য্যই শেষ করলে। কারও অনুরোধের অপেক্ষা করে না সে। রাজকন্যা যৎকিঞ্চিৎ মুখে তোলেন। অবশিষ্টাংশ যেমনকার তেমনি থাকে।

চন্দ্রকান্ত আটচালার প্রাঙ্গণে গিয়ে দেখলেন রুধিরসিক্ত গোকুলানন্দ। তার বস্ত্রে ও উপবীতে রক্তচিহ্ন। দুই হাতও রক্তাক্ত। শরীরের স্থানে স্থানে রক্তলাল রেখা। গোকুলানন্দের এক হাতে একটি ছিন্নমুণ্ড! রক্তাপ্লুত! তাঁর ঘর্ম্মাক্ত মুখে খুনীর উল্লাস, শত্রু-জয়ের হাসি।

—পাঁচ জন ব্রাহ্মণের পরিবর্ত্তে এক জন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যের মুণ্ডচ্ছেদ করেছি। দেখে পরিতৃপ্ত হও চন্দ্রকান্ত! তোমার টোলে উৎসবের ব্যবস্থা কর। গোকুলানন্দ কথা বললেন সহাস্যে, সহজ কণ্ঠে।

চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে যায় চন্দ্রকান্তর। নির্ব্বাক্, নিস্পন্দের মত তিনি দেখেন, গোকুলানন্দের হস্তধৃত কাটামুণ্ড। এখনও রক্তপাত বন্ধ হয়নি।

গোকুলানন্দ বললেন,—যাতে বিশ্বাস হয় তোমার, তাই এই বস্তুটি আনয়ন করেছি। নতুবা ছেদের সঙ্গে সঙ্গেই আমোদরের গর্ভে নিপাতিত করতাম। তুমি উৎসবের ব্যবস্থা কর, আমি যাই, এর একটা সদ্গতি করি গে! আমোদ-রের জলেই নিক্ষেপ করি, কি বল?

চন্দ্রকান্ত কোন কথা বললেন না, কেবল সম্মতিসূচক মুখভঙ্গী করলেন। ওপরে নীচে মাথা দোলালেন।

গোকুলানন্দ অট্টহাসি হাসতে হাসতে বিদায় নিলেন। হাসির প্রতিধ্বনি ভাসলো বাতাসে।

—আর কালক্ষেপ নয়, আপনারা এ স্থান অবিলম্বে ত্যাগ করুন। একজন সিদ্ধাচার্য্যের জীবন নাশ হয়েছে!

চন্দ্রকান্তর কথায় শিউরে শিউরে উঠলেন রাজকন্যা। তক্তাপোষ ত্যাগ ক'রে উঠে দাঁড়ালেন। ভয়ে আর আশঙ্কায় বিন্ধ্যবাসিনীর মুখ যেন বিবর্ণ হয়ে যায়। বক্ষে যেন কাঁপন লাগে তাঁর। বাক্য সরে না মুখে।

চন্দ্রকান্ত বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখেন যেন। তাঁর চোখে কিসের ঘোর কে জানে! বিন্ধ্যবাসিনীর মুখ-সৌন্দর্য্য দেখেন কি?

—পথে কোন ভয় আছে কি? পরিচারিকা উদ্বেগপূর্ণ স্বরে প্রশ্ন করলে।

চন্দ্রকান্ত বললেন,—দুই জন ব্রহ্মচারী যাক্ আপনাদের সঙ্গে। আপনারা বিপদের সীমানা অতিক্রম করলে ব্রহ্মচারীরা ফিরে আসবে। ভীতচকিতা রাজকুমারী শেষ বারের মত দেখে নেন যেন। দেখেন ও সবল সুঠাম চন্দ্রকান্তকে হতজ্ঞানের মত বলেন,—প্রণাম! তবে যাই এখন?

—হাঁ। আর অপেক্ষা নয়। আগামী কল্য প্রাতে সাক্ষাৎ মিলবে পুনরায়। নারায়ণের পূজার ব্যবস্থা যেন সম্পূর্ণ থাকে।

আর কোন কথা বললেন না বিন্ধ্যবাসিনী। অনিমেষ দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে আটচালার বাহির-পথ ধরলেন।

চন্দ্রকান্তর ছাত্রশিষ্যগণ বিরত হয় না কোন মতেই। বারদুয়ারীর দাওয়ায় ব'সে পাঠ গ্রহণ করে তারা। পুরানো ছাত্ররা পাঠ দেয় তাদের। ছাত্র-শিষ্যদের কেউ কেউ চারি বেদ ও বেদান্ত কণ্ঠস্থ করে। কেউ মীমাংসা, কেউ সাংখ্য, কেউ ন্যায় মুখস্থ করে। কেউ স্মৃতি আর কেউ কাব্যালঙ্কার রপ্ত করে। দ্বাদশবর্ষীয় কয়েক জন বালক বর্ণজ্ঞান ও লিখন শিক্ষা অভ্যাস করে।

চন্দ্রকান্ত একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন আটচালার বাহির-পথ পানে। জমিদার-নন্দিনীকে আর দেখা যায় না। ধীর মন্থরগতিতে বিন্ধ্যবাসিনী তখন

বেশ কিছু দূরে এগিয়েছেন। তাঁর পশ্চাতে পরিচারিকা। সর্ব্বশেষে চলেছে দু'জন মুণ্ডিত মস্তক ব্রহ্মচারী। সূর্য্যের প্রখর আলোয় তাদের হস্তস্থিত ক্ষুরধার মুক্ত-অস্ত্র চিকচিকিয়ে ওঠে। মুক্ত কৃপাণ।

গা ছম্-ছম্ করছে বিন্ধ্যবাসিনীর!

আলগা-চুলের খোঁপা জড়িয়ে নিলেন চুপিসাড়ে। চোখে যেন আলো-আঁধারি লাগছে থেকে থেকে। আহ্লাদি-পুতুল রাজকুমারী, সামান্য পথের কষ্টে যেন হিমসিম খেয়ে ওঠেন। ইচ্ছার বোঝার না কি ভার লাগে না, তবুও যেন তাঁর ক্লান্ত মুখশ্রী। পায়ে চলা পথ, আঁকা-বাঁকা। দীঘির ধার বরাবর সাপের মত এঁকেবেঁকে চলে গেছে দীঘির শেষ সীমানায়। রক্ত দেখেছেন রাজকুমারী। মনুষ্যরক্ত! পথে আসতে আসতে দেখেছেন বৃষ্টিভেজা পথের ধূলোর তাজা রক্তের রেখা। কোন্ সিদ্ধাচার্য্যের শোণিতধারা কে জানে! রক্তজবার ছিন্ন পাপড়ি ছড়িয়ে গেছে কে যেন।

—পা চালাও বৌ!

পথ চলতে চলতে কথা বললে পরিচারিকা। ভয়-ভাবনায় ফিসফিস বললে,—খুন-জখম কি চোখে দেখা যায়? জোর-কদমে চল। ভালয় ভালয় ঘরে ফেরা যায় তবেই রক্ষে!

আলুলায়িত কেশের বোঝা আর বইতে পারেন না রাজকুমারী। আলগা-চুলের খোঁপা জড়িয়ে নিলেন। চলার গতি কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত করলেন যেন। বিন্ধ্যবাসিনী ভয়ে সিঁটিয়ে আছেন। গা ছম-ছম করছে। হাত-পা যেন হিম হয়ে গেছে। চোখের পলক পড়ছে না কি এক আশঙ্কায়। দেখলেন রাজকুমারী, দীর্ঘ দুই চোখের আড়দৃষ্টিতে দেখলেন, পায়ে চলা পথের এক কিনারায় ভিজে ঘাস সবুজ নয়, ঘাসের রঙ ঘোর লাল। ঘন আলতা ছড়িয়েছে কে!

ঐ বধ্যভূমি চোখ পড়তেই চোখ ফিরিয়ে নিলেন বিন্ধ্যবাসিনী। চক্ষু মুদিত রাখলেন খানিক।

আবার বললে পরিচারিকা,—পা চালাও বৌ! জোরে-কদমে চল।

প্রেতাত্মার দীর্ঘশ্বাস না কি! অস্ফুট সোঁ-সোঁ শব্দ কেন তবে? নিহতের আত্মা কাঁদছে হয়তো। কথা ফুরিয়ে গেছে চিরকালের মত, তাই হয়তো দুঃখবেদনায় ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে! পথিকজনের কানে কানে কান্নার সুরে জানিয়ে দিয়ে যায় খড়্গাঘাতের অসহ্য ব্যথা।

সোঁ-সোঁ বাতাস বইছে থেকে থেকে। বর্ষণসিক্ত ঠাণ্ডা হাওয়া চলছে যে!

জমিদার কৃষ্ণরামের ভগ্নালয়ের কাছাকাছি পৌঁছে বিন্ধ্যবাসিনী সলজ্জায় পিছন ফিরে দেখলেন গুণ্ঠনের অন্তরাল থেকে। কোথায় গেল দুই ব্রহ্মচারী! বিষাক্ত তীরের অতর্কিত আঘাতে ধরাশায়ী হয়ে নেই তো কোথাও! রাজকুমারী দৃষ্টি চালিয়ে দেখলেন, ব্রহ্মচারী দু'জন ফিরে চলেছে তড়িৎ গতিতে। সহযাত্রিণীরা তাদের আবাসের কাছাকাছি পৌঁছতেই নিশ্চিন্তায় ফিরে চলেছে তারা।

পরিচারিকা বললে,—সামনে বুদ্ধপূর্ণিমা! সেদিন যে কি হয়·কে জানে! খণ্ড যুদ্ধ হবে হয়তো! নবাবের রাজত্বে শাসন ঘুচে গেছে! শান্তির বালাই নেই। যার যা খুশী তাই করছে!

বিন্ধ্যবাসিনী কাহিল সুরে বললেন,—যশো, আমার একখান হাত তুই ধর্। ভয়ে যেন কেমন হয়ে গেছি আমি!

চন্দ্রকান্তর চতুষ্পাঠী দেখে মনে মনে অপরিসীম আনন্দের উন্মেষ হয় রাজকুমারীর। ছাত্রশিষ্য-পরিপূর্ণ চতুষ্পাঠী; পড়ুয়াদের পঠনধ্বনিতে মুখরিত হয়ে আছে। চন্দ্রকান্তকে মনে হয় যেন এক বিদ্যাকল্পবৃক্ষ। অজ্ঞান-অন্ধকার দূরীকরণের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন ব্রাহ্মণ। বেদান্ত-অন্ত, শব্দশাস্ত্র, অগণিত ধর্ম্মশাস্ত্র, মীমাংসার মীমাংসা, অসংখ্য সাংখ্য, তন্ত্রমন্ত্র আর কর্কশ ব্যাকরণের জটিলতা যেন সহজ সরল হয়ে গেছে তাঁর শিক্ষা-পদ্ধতিতে। কিন্তু চতুষ্পাঠীর কক্ষাভ্যন্তরের দেয়াল-গাত্রে অসংখ্য খড়্গ আর কৃপাণ প্রলম্বিত কেন? তীক্ষ্ণধার অস্ত্র-দেহে রুধিররেখাই বা কেন?

রাজকুমারীর মনে হয়, পৃথিবীর কোথাও বুঝি শান্তি নেই। কোথাও যে মেলে না সুখশান্তি! সপ্তগ্রামে ঘরোয়া অশান্তি; কৃষ্ণরামের পর্ব্বতপ্রমাণ

দাবী আদায়ের নির্লজ্জ প্রতিজ্ঞায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন বিন্ধ্যবাসিনী। স্বামীর বাক্যবাণ, বিরূপ মন্তব্য আর দুর্ব্যবহারে অধীর হয়ে পড়েছিলেন যেন। গড়-মান্দারণে নির্ব্বাসন তদনুপাতে শ্রেয়ঃ বলতে হয়। এখানে আর যাই থাক, কটুক্তি আর মন্দ ব্যবহারের অন্তর্জ্বলা নেই। কিন্তু খুন-জখম আছে মান্দারণে, ধর্ম্মের দ্বন্দ্বযুদ্ধ আছে, আছে পরধর্ম্ম বিদ্বেষের নগ্ন আত্মপ্রকাশ!

বিন্ধ্যবাসিনীর একখানি হাত ধরলো পরিচারিকা। অনুভব করলো সে-হাত যেন হিমশীতল। যশোদা বললে—বসলে কেন আবার? বললে—চল ঘরে চল, জিরেন নেবে চল।

—আর পা চলছে না ভাই। এখানেই জিরিয়ে নিই খানিক। রাজকুমারী কথা বলেন যেন শুষ্ককণ্ঠে। হয়তো তৃষ্ণার্ত্ত হয়েছেন, তাই বুঝি অস্পষ্ট কথা। হাঁফিয়ে হাঁফিয়ে একেকটি কথা উচ্চারণ করেন যেন অতি কষ্টে। বললেন, —পা ধুয়ে ঘরে যাবো'খন!

—কেমন ঘরের মেইয়া তুমি! কেমন ঘরের বৌ!

পরিচারিকার কথা যেন কাণে লাগে বিন্ধ্যবাসিনীর। নিমেষের মধ্যে স্মরণে আসে, ফেলে-আসা পিত্রালয়। মনে পড়ে, স্নেহময়ী রাজমাতা বিলাস-বাসিনীর সৌম্য-শান্ত মুখখানি। মনে পড়ে দুই সহোদরকে। চোখে ভাসে সুতানুটির মাটি আকাশ। ছেড়ে-আসা পিত্রালয়ের কক্ষে কক্ষে যেন ছুটে বেড়ায় রাজকুমারীর বিরহ-তপ্ত মন। রাজপ্রাসাদের বৃহৎ ও প্রশস্ত খোলা ছাদে যেন যেতে ইচ্ছা করে। ছাদে উঠে দেখতে ইচ্ছা হয়, সুতা আর নটীর বাজার সদাই জম-জমাট। লোকারণ্যে যেন গম-গম করছে বাজারের অলি-গলি পথ। আনন্দ-কোলাহলে মুখর হয়ে আছে পণ্যের বাজার।

সুতানুটীর বাজার থেকে কত কে আসে রাজ-গৃহের অন্দরে। ঝাঁপি-মাথায় চুড়িওয়ালী। আসতো তসবিরওয়ালী। কাপড় বোঝা নিয়ে আসতো তাঁতিনী।

বেলোয়ারী রঙীন চুড়ি কিনতেন রাজকুমারী। হরেক রকমের কাচের চুড়ি, বালা আর কণ্ঠহার। পুঁতির মালা। অভ্রের পরে আঁকা বাদশা-বেগমদের তসবির, দেব-দেবীর চিত্র, শাস্ত্র আর উপাখ্যানের রঙদার ছবি। কাচের

আয়না। তাঁতের শাড়ী রকম রকম। সুতা, জরি আর মুগাপাড়ের শাড়ী। বেনারসী আর কিংখাব। রূপার খেলনা। হাতীর দাঁতের পুতুল আর মূর্ত্তি। বুড়ীর মাথার পাকা চুল। গোলাপ গাণ্ডারী, কদমা।

অভ্রের পরে আঁকা তাজমহল, কুতুব মিনার আর কাশীর মন্দিরধ্বজার চিত্র কিনেছিলেন বিন্ধ্যবাসিনী। রাশি রাশি পোড়ামাটির পুতুল আর খেলনা কিনেছিলেন কড়ি জমিয়ে! কোথায় যে তাদের হারিয়ে এসেছেন, কে জানে। কোথায় গেল সেই পুতুল-খেলার দিনগুলি?

সপ্তগ্রাম আর গড়মন্দারণে শুধুই বন-জঙ্গল। অরণ্যের পশু আর সরীসৃপের বসতি। খেনো-জমি আর খাল-বিল। ক্ষেত-খামার, গড়খাই আর পানাপুকুর। আর সুতানুটী যেন গুলজার হয়ে আছে সর্ব্বক্ষণ। বন-জঙ্গল কেটে ফেলছে দিনকে দিন। চাষের জমিতে আর চাষ হয় না, ধানচালের বদলে বেণে আর তাঁতিদের কোঠা উঠছে ফসলী জমিতে। সেখানে কেবল খোস্‌মেজাজীদের বসবাস—রাজা-উজীর ধনিক-বণিক আর সায়েবসুবোদের আস্তানা। দাঙ্গা আর কাটাকাটির বদলে গান-তান, গাল-গল্প আর কোলাকুলি।

—চোরকাঁটার উৎপাতে আমি তো ম'লাম!

দীঘির ঘাটের পৈঠায় রাজকুমারী। কাঁটায় ক্ষত-বিক্ষত দুই পা আসমানের জলে ডুবিয়ে রেখেছেন। সুতানুটীতে হারিয়ে-যাওয়া দিনগুলি মনে পড়লে চোখ ফেটে জল আসে তাঁর। মনে হয় যেন এক সুখের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে অকস্মাৎ।

—চল বৌ, ঘরে যাই। এই কাঠ-ফাটা রোদে আর কত পুড়বে! যশোদা ডাঙ্গায়-তোলা মাছের মত যেন খাবি খেতে খেতে কথা বলছে হাঁফিয়ে হাঁফিয়ে। তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়েছে সে যেন। ব্যাজার মুখ।

প্রেতাত্মার দীর্ঘশ্বাসের মত সোঁ-সোঁ শব্দে হাওয়া বইছে থেকে থেকে।

—ভাতে-ভাত চাপিয়ে দে যশো। বেলা আর নেই।

কথা বলতে গিয়ে রাজকুমারী ফিরে দেখলেন কথা যে শুনবে সে সেখানে

নেই। আরও যেন ভীতা হয়ে পড়লেন। এক-আঁচলা জল তুলে চোখে-মুখে ছুঁইয়ে, উঠে পড়লেন পৈঠা থেকে। এখনও যেতে হবে অন্দরে, খাড়া-গাঁথনির সিঁড়ি ভাঙতে হবে। কেন কে জানে, কেমন যেন ভেঙে পড়েছেন বিন্ধ্যবাসিনী। সাবগুণ্ঠনে নম্রমুখী হয়ে অন্দরে চললেন রাজকুমারী।

—বেগম সাহেবা।

কে যেন ডাকলো পিছন থেকে। পুরুষালি কণ্ঠ।

চিত্রার্পিতের মত সহসা স্থির হয়ে গেলেন রাজকন্যা। আড়-নয়নে তাকালেন পিছু পানে।

—বেগম সাহেবা, এক আদমী আপকো ভেট মাঙতা।

ফিরে দেখলেন না রাজকুমারী। অস্ফুট কণ্ঠে বললেন,—কে? বল এখন আমার ফুরসৎ নেই। কে তার কে, তাই জানি না। যার-তার সমুখে আমি বেরোই না। যাকে-তাকে দেখা দিই না। নাম কি?

—জগমোহন।

প্রহরী কথা বলছে ধীরে ধীরে। সসম্ভ্রমে। নম্র স্বরে।

—জগমোহন?

—হাঁ বেগম সাহেবা।

—জগমোহন লেঠেল?

স্বগত করলেন বিন্ধ্যবাসিনী, নিজেকেই যেন প্রশ্ন করলেন। জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ফুটলো আঁখিযুগলে। ভ্রূ দু'টি কেঁপে উঠলো থর-থর।

—হাঁ লেঠেল আছে। বহুৎ আচ্ছা তাকত আছে। প্রহরী কথায় কথায় কুর্নিশ করে আর কথা বলে।

খানিক চুপচাপ থাকলেন রাজকুমারী। অনড় অটল থাকলেন।

—সুতানুটী থেকে আসছে কি? আমার বাপের বাড়ী থেকে আসছে কি?

—হাঁ বেগম সাহেবা।

—জগমোহন লেঠেল কোথা থেকে এলো? স্বগতোক্তি করলেন রাজকন্যা। বললেন,—ডেকে দাও তাকে।

কুর্নিশ ঠুকতে ঠুকতে স্থানত্যাগ ক'রলো পাঠান প্রহরী। কেমন যেন অভিমানে ভিজে গেল বিন্ধ্যবাসিনীর চোখ দু'টি। আনন্দিত হবেন কোথায়, তা নয়, অভিমানের আধিক্যে ক্ষুব্ধ হ'লেন যেন। চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু টলমলিয়ে উঠলো। যেমনকার তেমনি দাঁড়িয়ে থাকলেন অচলার মত।

—রাজকুমারী! জগমোহন লেঠেলের কথার সুরে ব্যথার আবেগ।

—কি ব'লতে চাও বল। বিন্ধ্যবাসিনী অবিচলিতের মত সাড়া দিলেন।

—রাজমাতা পাঠালেন আমাকে। তোমাকে দেখতে পাঠালেন।

জগমোহন কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসে। জগমোহন লেঠেল হলে কি হবে, তার কথাও কেমন যেন মিহি সুরের। যেন বাষ্পরুদ্ধ! কথা বলতে গিয়ে গলায় কথা আটকে যায়।

আর যেন পিছু ফিরে থাকতে পারলেন না রাজকন্যা। অভিমানী দৃষ্টিতে ফিরে তাকালেন। ফিরে দাঁড়ালেন। কাঁপা-কাঁপা-সুরে বললেন,—এখনও বেঁচে আছি জগমোহন। অলক্ষ্মীর কি মরণ হয়? আমি যে মাদারণে আছি কেমন করে জানলে?

পরিধানের কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছলো জগমোহন। তপ্ত অশ্রুবিন্দু মুছলো। বললে,—আমি যে সাতগাঁয়ে গেছিলাম রাজকুমারী। সাতগাঁ থেকে খোঁজ-খবর নিয়ে রাতারাতি চলে আসছি হুড়তে পুড়তে। কোথায় কেমন আছো, তাই দেখতে আসছি।

বিন্ধ্যবাসিনীর চোখের জল চিবুকে গড়িয়েছে। বললেন,—বাঘের বাচ্ছা শ্যাল হয়ে আছি জগমোহন। তোমাদের রাজমাতা ভাল আছেন তো? রাজাবাহাদুর? কুমারবাহাদুর? রাণীমায়েরা?

—বিলকুল বহাল তবিয়তেই আছে। জগমোহন কেঁদে-কেঁদে বলছে না কি! বললে,—তুমিই শুধু কত কষ্টে দিন গুজরাণ করছো!

—কষ্ট আর কি?

বিন্ধ্যবাসিনী বললেন কত যেন দুঃখে। বললেন,—বেশ আছি মাদারণে। স্বোয়ামী যেমন রেখেছেন তেমনি আছি।

পিত্রালয়ের দূতকে দেখে, জগমোহন লেঠেলকে দেখে, যত বা আনন্দ হয়, তত বা দুঃখ হয়। অদ্ভুত এক আবেগে চোখ দু'টি জ্বলতে থাকে যেন। ছলছলিয়ে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে। বস্ত্রাঞ্চল চোখে তুলতে হয়।

জগমোহন বললে,—রাজমাতা তো মুখে অন্ন তোলেন না! দিন নেই, রাত্তির নেই, কাঁদাকাটা করেন।

—কেন?

—তোমার তরে রাজকুমারী। তেনার যত দুঃখু তা তো তোমার জন্যে।

দুঃখের ক্ষীণ হাসি হাসলেন বিন্ধ্যবাসিনী। শব্দহীন স্মিত হাসি। বললেন,—আমার কথা মনে পড়ে কারও? তাই যদি হয়, তবে আমার কপালে এ দুঃখু কেন?

—তোমার কথা ভাববেনি রাজকুমারী? জগমোহনও কথা বললে মৃদু হেসে। দুঃখের হাসি মুখে ফুটিয়ে। বললে,—তোমার তরে রাজমাতা কত আজ্জি করছে তার ঠিক আছে? রাজাবাহাদুর আর কুমারবাহাদুরকে যখন তখনই বলছে।

—কি বলছেন রাজমাতা?

জগমোহন ভেবে ভেবে বললে,—সাতগাঁয়ের জমিদার কেষ্টরামের দাবী যাতে মিটিয়ে দেওয়া হয় সেই কথাই বলছে। বলবার আছে কিছু আর?

—রাজাবাহাদুর কি বলেন?

—রাজাবাহাদুর শান্তিপ্রিয় লোক, তিনি তো মেটামিটি করতেই চান।

—কুমারবাহাদুরের কি ইচ্ছা?

জগমোহন শিউরে উঠলো যেন। বললে,—তেনার কথা আর ব'ল না রাজকুমারী! ছোটকুমার তো অন্য প্রকৃতির মানুষ। হয়তো ব'লে বসবে, সাফ জবাব দিয়ে দেবে যে, এ সব বুজরুকী চলবে না। তাঁর কথা বাদ দাও।

কেমন যেন চিন্তাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন বিন্ধ্যবাসিনী। চোখের চাউনি স্থির

হয়ে গেল। এক-দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন ভূমিতে। খানিকক্ষণ পরে বললেন,—জগমোহন, তুমি সদরে যাও, বিশ্রাম কর'গে। কিছু খানাদানা পাঠিয়ে দিই তোমাকে। আসতে তোমার কত কষ্ট হয়েছে!

—না রাজকুমারী, একটুকুও কষ্ট হয়নি। আমার তো কাজই এই। কোঁচার খুঁটে চোখ মুছতে মুছতে কথা বললে জগমোহন। এমন পেশীবহুল বলিষ্ঠ আকৃতি যার তার চোখে অশ্রুবন্যা; পাষাণের শরীরের আছে নাকি কোন দুঃখানুভূতি? জগমোহন বললে,—আমার তো কাজই এই রাজকুমারী, আমার আবার কষ্ট কি! তোমাদের হুকুমে দাস আমি, তোমাদের জন্মি জানটাও দিতে পারি।

—জগমোহন! বিন্ধ্যবাসিনী ভাঙা-ভাঙা কণ্ঠে ডাকলেন। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে।

—বল রাজকুমারী। কি হুকুম তাই বল'।

রাজকন্যা প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন,—জগমোহন তুমি সাতগাঁয়ে গিয়েছিলে?

—রাজকুমারী। সোৎসাহে বললে জগমোহন।—সাতগাঁ হ'তেই তো সটান এখানে আসছি।

—দেখা হয়েছিল তোমার সঙ্গে? দেখা দিয়েছিলেন? কোন কথা হয়েছিল?

বিন্ধ্যবাসিনী কম্পিত কণ্ঠে থেমে থেমে পর পর অনেগুলি প্রশ্ন করলেন। কথায় যেন তাঁর অব্যক্ত কৌতূহল। কেমন যেন দ্বিধাজড়িত ভাবভঙ্গী।

জগমোহন বললে,—কার কথা কও কি জানি! জমিদার কৃষ্ণরামের সঙ্গে দেখা হয়নি, কথা তো দূরের কথা। আমি রাজকুমারী, শুনেছি পাড়া-প্রতিবেশীর মুখে।

—জানাজানি হয়ে গেছে, নয় জগমোহন?

—রাজকুমারী, জানতে আর বাকি নেই কারও। তোমাদের সাতগাঁয়ের সবাই জেনেছে।

নিরুত্তর থাকলেন বিন্ধ্যবাসিনী। খানিক নীরব থেকে বললেন,—তুমি

সদরে যাও। মুখ-হাত ধুয়ে কিছু মুখে দাও আগে। জিরেন নাও, ঠাণ্ডা হও।

—বেশ কথা, আমি আছি সদরে। সহজ সুরে কথা বলতে সচেষ্ট হয় জগমোহন। বলে,—তোমার সঙ্গে দেখা না ক'রে আমি ফিরবো না কিন্তু।

হঠাৎ হাসলেন রাজকন্যা। কৌতূহলী হাসি হাসতে হাসতে বললেন,—তোমাদের রাজমাতা কি ভেবেছেন আমি ম'রেছি? বাঘে খেয়েছে আমাকে?

হা-হুতাশ করলো জগমোহন। চোখ বড় ক'রে বললে,—বালাই ষাট্! কি যে বল তুমি! ক্ষণেক থেমে আবার বললে,—রাজকুমারী, তুমি যদি জানতে, যদি দেখতে পেতে রাজমাতার কি হাল হয়েছে! আমি না ফিরলে, গিয়ে তোমার হাল-হকিয়ৎ না শোনালে, তিনি হয়তো উপোস ক'রেই থাকবেন।

বুকের মধ্যে কে যেন আঘাত করলো বিন্ধ্যবাসিনীর! উত্তেজনায় কতক্ষণ নিশ্চুপ থাকলেন। দীর্ঘ এক শ্বাস টেনে বললেন,—মা ঠাকরুণকে জানিও, আমি বেশ ভাল আছি এখানে। আমার তরে ভাবতে মানা ক'রে দিও। বিয়া দিয়ে পরের ঘরে যখন পাঠিয়েছ তখন—

কাতর হাসি হাসলে জগমোহন। রৌদ্রদগ্ধ কপালে হাত বুলোয় আর হাসে। হাসি থামিয়ে বললে,—তেনা যে তোমার মা রাজকুমারী! মায়ের মন তাঁর, তিনি যা ভাল বুঝবে, করবে। কারও কথা কানে তুলবে না।

বিন্ধ্যবাসিনী মনে হয়তো সান্ত্বনা পান। খুশী হন মনে মনে,অথচ প্রকাশ করেন না। বলেন,—রাজমাতা কোত্থেকে জানলেন? আমি যে মাদারণে, কে বললে তাঁকে?

ভূমির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রলো জগমোহন। নিম্ন দৃষ্টিতে বললে,—তুমি যে মাদারণে আছো রাজমাতা জানে না। তেনার কানে ওঠেনি। রাজমাতা জানে, তুমি বুঝি বা সাতগাঁয়েই আছো, বন্দী ক'রে রেখেছে তোমাকে।

আবার নির্ব্বাক হয়ে পড়লেন রাজকন্যা। ধীর পদে ফিরলেন। দুর্ব্বল রোগিণীর মত চললেন অতি ধীরে। বললেন,—হাত-পা ধুয়ে জিরেন নাও জগমোহন! কিছু মুখে দাও আপাতত। জল খাও।

রাজকন্যা .পিছন ফিরতে, সোজা চোখ চালিয়ে এতক্ষণে নিশ্চিন্তায় দেখে নেঠেন জগমোহন ; বিন্ধ্যবাসিনীকে দেখে। তাঁর আপাদমস্তক দেখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। সোনার বরণ ছিল রাজকুমারীর, পুড়ে যেন আঙার হয়ে গেছে। মোমের মত নধর গড়ন যেন শীর্ণ হয়ে গেছে! সেই অপূর্ব্ব রূপ যেন নেই আর! থাকলেও, সেই চিকণচাকন নেই। ভৈরবীর জটার মত মুক্তকেশী রাজকুমারীর চুলে জট পাকিয়েছে। কালো চুল, তৈল বিনা সোণার রঙ ধরেছে। এলো-মেলো ঠাণ্ডা বাতাসে বিন্ধ্যবাসিনীর আলুলায়িত রুক্ষ চুলে তরঙ্গ লেগেছে।

রাজকন্যা দৃষ্টিপথ থেকে মুছে যেতে জগমোহনও পা চালালো। কাপড়ের খুঁটে চোখের প্রান্ত মুছে সদরের দিকে চললো।

সুতানুটীর রাজগৃহে ট্যাম্বুরিণের ঝমাঝম ঝঙ্কারে বিরতি পড়েছে।

রাত্রি গভীরতর হওয়ার সঙ্গে রাজাবাহাদুর কালীশঙ্করের অঙ্গুলি-সঙ্কেতে তাব্রিজকন্যাদের নৃত্যলীলা থেমে যায়। সারেঙ্গী বাজিয়েরা রাজার আদেশে ত্যাগ করে নাচঘর। অন্যান্য বাদ্যকার আর সঙ্গতকাররাও বিদায় লয়। সুদৃশ্য ও সুসজ্জিত নাচঘরের ফরাসে তাকিয়া ঠেস দিয়ে এলিয়ে ব'সে থাকে দুই নর্ত্তকী। গীত, বাদ্য আর নৃত্য চ'লেছিল মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত। রাজনির্দ্দেশে ছুটি পেয়ে কাহিল ও অবসন্ন নর্ত্তকীরা খুশীর প্রাবল্যে সুধামাখা হাসি হেসেছিল। চুণী-লাল রাঙা অধরের মিষ্ট হাসি দেখতে দেখতে কালীশঙ্কর যেন আত্মজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন! সুসজ্জিত ও সুরম্য নাচঘরে তখন গহন রাতের স্নিগ্ধ বাতাস খেলা করছে। কিংখাবের পর্দ্দাগুলি নেচে নেচে উঠছে মৃদুমন্দ সমীরণে। তাব্রিজ-মেয়েদের কুঞ্চিত ঘনকুন্তল কপালের 'পরে নাচানাচি করছে! জেড আর অনিক্স পাথরের অলঙ্কারসমূহ নর্ত্তকীদের বেশে চাকচিক্য তুলেছে দেওয়ালগিরির উজ্জ্বল আলোয়। নর্ত্তকীদের কৃষ্ণশোভা ভ্রূযুগল আর মুদিত নয়নপদ্মে যেন ইশারার ইঙ্গিত দেখছিলেন রাজাবাহাদুর! ঐ লজ্জাভয়হীনাদের মদালস চাউনিতে ছিল যেন আকুল আহ্বানের ব্যাকুলতা।

চুয়ানো মণ্ড পান ক'রেছিলেন কালীশঙ্কর। আখরোট আর কাজু দাঁতে কাটতে কাটতে নিজের অজ্ঞাতে পান করেছিলেন অতি অধিক মাত্রায়। খেয়াল ছিল না। আসবের প্রক্রিয়ায় চোখে যেন ঝাপসা দেখছিলেন রাজা। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল ও গতিহীন হয়েছিল। রক্তবর্ণ চক্ষু অর্দ্ধ নিমীলিত হয়ে থাকে। তাত্রিজকন্যাদের এক জনের একখানি হাত নিজ হাতে ধারণ ক'রে ব'সেছিলেন কালীশঙ্কর। একেকটি হাত যেন একেকটি শ্বেতপদ্ম, এমনই সুললিত, এমনই সুকোমল! রাজাবাহাদুর মদির দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেন নর্ত্তকীদের দেহগঠন। লক্ষ্য করেন ওদের ক্ষীণকটিতে জরির কোমরবন্ধ। রেশমী ঘাঘরা বুকের কাছে স্ফীত হয়ে আছে। বুকের খাঁজে ঝুলে প'ড়েছে রাজাবাহাদুরের প্রদত্ত হীরার কণ্ঠহার। ফিরোজা পাথরের দুল দুলছে কাণে। সাপের মত আঁকা-বাঁকা বিনুণীতে জরির বেষ্টন। বিনুণীর শেষ প্রান্তে জরির ট্যাসেল ঝুলছে।

বাদ্যকার, সঙ্গতকার প্রভৃতি অবাঞ্ছিতরা নাচঘর ত্যাগ করতে নর্ত্তকীদের কাছাকাছি এগিয়ে বসেছিলেন রাজাবাহাদুর। নরম নধর দেহের উষ্ণ উত্তাপ অনুভব করা যায় যেন।

—রাজাবাহাদুর! অস্ফুটে ডাকলো যেন কে। ভয়ে অসাড় হয়ে সে ডাকলো। কিন্তু কোন সাড়া মিললো না।

—রাজাবাহাদুর! আবার ডাক পড়লো সভয়ে। সম্ভ্রম ও সঙ্কোচের সুরে। নাচঘরের দুয়োর থেকে ডাক পড়ছে।

ফিরেও দেখলেন না কালীশঙ্কর। তাচ্ছিল্যভরা কণ্ঠে বললেন,—কোন্ শালা হে তুমি? বেকুব, বদমায়েস।

—আমি হুজুর আপনার অধীনের দেওয়ান।

—দেওয়ানজী! আপনি?

—হাঁ রাজাবাহাদুর।

—মাপ করবেন। আমি কিছু অপ্রকৃতিস্থ আছি। এত রাতে আপনি এখানে কি কারণে?

দেওয়ানজীর নিদ্রাজড়িত কণ্ঠ। বললেন,—রাজাবাহাদুর, অন্দরে কি আজ আর ফেরা হবে না ?

আদপেই নয়—মৃদু হাস্য সহকারে বললেন কালীশঙ্কর। বললেন,—আপনি নিশ্চিন্ত হোন, আজ রাতের মত আমি নাচঘরেই থাকতে চাই। নাচঘরের প্রধান দ্বারে যেন পাহারার বন্দোবস্ত থাকে। খাস-খানসামারাও যেন থাকে।

—যথাজ্ঞা। দেওয়ানজী বিনম্র স্বরে বললেন,—অন্দরের দরজায় তবে কুলুপ এঁটে দিই ? বড়রাণী খোঁজ নিতে পাঠিয়েছেন অন্দর থেকে। আপনার এখনও আহার হয়নি যে !

—বড়রাণী ? উমারাণী ?

—হাঁ রাজাবাহাদুর।

হঠাৎ অট্টহাসি শুরু করলেন কালীশঙ্কর। নাচঘর কাঁপিয়ে হাসতে থাকেন। নেশার ঝোঁকে কি না কে জানে, অসংযত হাসির শব্দে ফেটে পড়লেন যেন নিজে। হাসতে হাসতে বললেন,—আজ আমি দিল্লীর বাদশা বনেছি, হারেমে আজ আর ফিরছি না। এখানে ভাল-মন্দ আহারের কিছু অভাব নেই, জানিয়ে দিন আপনাদের বড়রাণীকে।

কথার শেষে রাজা কটাক্ষপাত করলেন, নর্ত্তকীদের চুণী-লাল অধর পানে চোখ বুলালেন।

দেওয়ানজী নাচঘরের দ্বারপ্রান্ত থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন চকিতের মধ্যে। আর কোন কথা বললেন না। বুঝলেন, রাজা এখন সত্যিই প্রকৃতিস্থ নেই। অসংযত কথা বলতে শুরু করেছেন। হাসছেন উচ্ছৃঙ্খল হাসি।

রাতের কুহেলী। ঘন-কালো আঁধার ছড়িয়েছিল দিকে দিকে। কৃষ্ণ-যবনিকা নেমেছিল যেন আকাশ থেকে। ঝিঁ ঝিঁ ডাকছিল অবিরাম। আকাশে তারা ; গাছে গাছে জোনাকি জ্বলছিল দপ-দপ।

চমকে চমকে ওঠে ঘুমন্ত রাজকুমার শিবশঙ্কর। শিয়রের কাছে বিনিদ্র রাজরাণী ছেলের মাথায় হাত রেখে ঘুমে ঢুলতে থাকেন। রাজাবাহাদুরের

আগমন-প্রতীক্ষায় বসে থাকেন। রাজা অন্দরে ফিরলে তবেই তিনি আহার সারবেন। স্বামীকে খাইয়ে নিজের মুখে তুলবেন। রাতের খাওয়া আর মুখে ওঠে না উমারাণীর! কালীশঙ্করের দেখা মিলে না যে! উগ্র আসবের নেশায় মনে পড়ে না রাজার, কে বা রইলো অনাহারে! তাম্রিজকন্যাদের রূপের যাদুতে ভুলে গেছেন হয়তো স্বদার-সংসার!

কৃষ্ণ যবনিকা কখন মুছে যায়। রাতের কালো পর্দা স'রে যায় কখন।

ভোরের শুভ্র-লাল আলোর স্পর্শ লাগে রাজগৃহের শীর্ষে। চিড়িয়াখানার হরেক রকম পাখী ডাকাডাকি শুরু করে নতুন আলো দেখে। ক্ষুধার্ত্ত পশুদের চিৎকারে পাইক, পেয়াদা, প্রহরী আর খানসামাদের নিদ্রা টুটে যায়। দুয়োরে দুয়োরে গঙ্গাজলের ছিটে পড়লো। কিন্তু নাচঘরের দ্বার এখনও খুললো না!

নাটমন্দিরে পুরোহিত আবাহন-মন্ত্র পাঠ করেন। আবাহনী স্তুতি। প্রথম সন্ধ্যার পূজাপাঠ চলতে থাকে। তন্ত্রধারক পুঁথি খুলে বসেন। তৈজসপত্র তোলাপাড়া করেন ব্রাহ্মণেরা। ধূনুচিতে হাতপাখার বাতাস দেন কেউ। কেউ চন্দন ঘষতে বসেন। ফুল-বিল্বপত্র বাছতে বসেন কেউ।

সগুস্নাতা লালপাড় পট্টবস্ত্রপরিহিতা রাণীরা সহচারিণী দাসীদের সঙ্গে আসেন একে একে। উমারাণী, সর্ব্বমঙ্গলা, সর্ব্বজয়া। নৈবেদ্যের কুঠরীতে নৈবেদ্য রচনা করতে বসেন তাঁরা। আতপ তণ্ডুল, ফল আর মিষ্টান্নের নৈবেদ্য রচেন একেক জন। তিন জনেই যেন মূক, বাকশক্তিহীনা,—এমনই গম্ভীর!

উমারাণীর ঘুম-ঘুম চোখ। রাতে সুনিদ্রা ছিল না। আহারও ছিল না—তাই যেন কিঞ্চিৎ শ্রান্ত-ক্লান্ত। তদুপরি রাজাবাহাদুরের দেখা মেলেনি রাতভোর। রাজার সোহাগ-সম্ভাষন মেলেনি।

নীরবতা ভঙ্গ করলেন সর্ব্বমঙ্গলা। চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন,—আমরা দু'বোন না হয় হাঘরের মেয়ে, তুমি তো তা নয় পাটরাণী! আমাদের না হয় রূপ-যৌবনের কদর নেই রাজার কাছে, তুমি তো আদরবিবি! তবুও কেন রাজার এমন মতি-গতি? দু'দু'টো মুসলমানীকে কি না ঘরে তুললে!

বেদনার হাসি হাসলেন বড়রাণী। হতাশার হাসি। কি বলতে গিয়ে যেন বলতে পারলেন না। আত্মসংযত হ'লেন। আরও যেন গম্ভীর হয়ে পড়লেন।

সর্ব্বমঙ্গলা বললেন,—শুনছি, মুসলমানী দু'টোকে দাম দিয়ে কিনে ফেলেছেন না কি! দামী দামী রত্নহার ওদের পায়ে ঢেলেছেন!

কলা-বউ যেন উমারাণী। সাবগুণ্ঠনা, লজ্জায় নম্রমুখী। ধীর কণ্ঠে বললেন, —পিরিত যখন জোটে, ফুটকড়াই ফোটে, আর পিরিত যখন ছোটে, ঢেঁকিতে ফেলে কোটে!

খিল-খিল করে হাসলেন সর্ব্বমঙ্গলা। যৌবন টলমলিয়ে উঠলো যেন!

—আমার কাশী যদি রাজা হ'তো, তা হ'লে কি এমন দুরাচার চ'লতো!

রাজমাতা কথা বলছেন। গঙ্গাস্নান সেরে ফিরে আসেন বিলাসবাসিনী। ফেরার পথে নাটমন্দিরে প্রণাম সারতে আসেন। সঙ্গে দাসী ব্রজবালা।

রাজমাতার কণ্ঠ শুনে রাণীরা যেন ন'ড়ে-চ'ড়ে বসলেন। ভয়ে ভয়ে যে যার কাজে মন দিলেন।

বিলাসবাসিনীর চলাফেরায় হাঁফ ধরছে যেন। অবগাহন স্নান করেছেন, মাথায় জল প'ড়েছে, চোখ দু'টি তাই রক্তবর্ণ ধারণ ক'রেছে। হাতে জপের ঝুলি। আবার কথা বললেন রাজমাতা। জপের ঝুলি ব্রজবালার হাতে দিয়ে বললেন,—ঘরে এমন সব রূপুসী বৌ থাকতে কি না মুসলমানীর রূপে ম'জে গেল?

রাণীরা বুঝলেন, কার প্রসঙ্গে এ সকল উক্তি। কেউ কোন কথা বললেন না। মুখ তুললেন না। যে যার হাতের কাজ করছেন।

বিলাসবাসিনী আবার বললেন,—নারায়ণ! আমার কপাল কেন পুড়লো ব'লতে পারো? জন্ম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ম'রলো না কেন? এমন জানলে নুণ খাইয়ে মেরে ফেলতুম অমন ছেলেকে!

রাণীরা চমকালেন রাজমাতার কথায়। প্রতিবাদ জানাবেন, তেমন দুঃসাহস আছে না কি কারও?

—মদ আর মেয়ে মানুষ বৈ আর কিছু সে চিনলো না? বিলাসবাসিনীর গম্ভীর কণ্ঠে নাটমন্দির যেন গম-গম করতে থাকে। তিনি বললেন,—মরেও না তো এমন নষ্ট ছেলে! কি পাপ ক'রেছি, নারায়ণ?

নারায়ণ নিরুত্তর। মূর্ত্তির চোখ অচঞ্চল। ত্রিলোকের পূজ্য, তবুও যেন দর্পহীন। করুণ চোখে তাকিয়ে আছেন অপলক।

—আমার কাশী, তার হাঁকডাক, রাগারাগি যতই থাক, সে যদি দরবারের গদীতে ব'সতো! বিলাসবাসিনী আক্ষেপ জানান নির্ব্বাক দেবতাকে।

হাতের কাজ সেরে উঠে পড়েন উমারাণী। ভাল লাগছে না যেন কানে শুনতে! রাজমাতার অভিযোগ তাঁর বক্ষ-মাঝে আলোড়ন তুলেছে; মাথার মধ্যে দুশ্চিন্তা!

কুমার কাশীশঙ্কর তখন গৃহের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে কাজের তদারক করছেন সেই সকাল থেকে। আঙিনায় ঘর বাঁধছে ঘরামির দল। খড়ের চালা বাঁধছে। আড়তদার হয়েছেন ছোটকুমার, তাই আড়তের ঘর বানিয়ে ফেলছেন রাতারাতি!

বৈশাখের সূর্য্যালোক মাথার 'পরে। খেয়াল নেই কাশীশঙ্করের।

—কুমার বাহাদুর!

কার ডাক শুনে কান ফেরালেন কুমার।

—ইংরেজের কুঠি থেকে কে যেন আইছেন। সাক্ষেৎ করতে চান হুজুরের সঙ্গে।

সেরেস্তার এক জন গোমস্তা। কুমারের পিছনে থেকে কথা বলে সভয়ে।

—রামনারায়ণ না কি?

সোল্লাসে স্বগত করলেন কুমার। নিজেকেই যেন প্রশ্ন করলেন! ইংরেজ কুঠীর দেশী দালাল রামনারায়ণের অপেক্ষাতেই ছিলেন যেন তিনি। তার আগমন প্রত্যাশায়। আজ আসবে, কথা দিয়েছিল যে রামনারায়ণ, ভাগীরথীর তীরে দাঁড়িয়ে। কথা পেয়ে, সম্মতি পেয়ে কুমার নিজ কণ্ঠের মুক্তাহার পরিয়ে দিয়েছিলেন রামনারায়ণকে!

দিবা-রাত্রি কাজ চলেছে ঘর-বাঁধার। নিশ্বাস ফেলার অবকাশ নেই ঘরামিদের। বাঁশ বাঁধছে, মাটি লেপছে, খড়ের আঁটি চালায় তুলছে। একটা অস্পষ্ট কলগুঞ্জন চ'লেছে কর্ম্মরত ঘরামিদের মধ্যে। কুমারবাহাদুর স্বয়ং কাজের তদারক করছেন, তাই যেন তারা অতি ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

—রামনারায়ণ সুস্বাগতম্! সদরের এক কক্ষে প্রবেশ ক'রেই সানন্দে বললেন কাশীশঙ্কর।

তক্তাপোষের ফরাসে ব'সেছিল রামনারায়ণ। উঠে দাঁড়ালো। আনত হয়ে দুই হাত কপালে তুলে প্রণাম জানালো। বললে,—পেরণাম কুমার-বাহাদুর!

—নমস্তে রামনারায়ণ!

কুমার দুই বাহু মেলে বুকে জড়িয়ে ধরলেন আগন্তুককে।

—কি হুকুম তাই বলেন। রামনারায়ণ কথা বললে সাগ্রহে।

—হুকুম নয় রামনারায়ণ! বললেন কাশীশঙ্কর। ফরাসে আসন গ্রহণ ক'রে বললেন,—তোমার সাহায্য প্রার্থনা করি আমি। তুমি আমার পাশে দাঁড়াও। পথ বাৎলাও।

—আমি কি করতে পারি, কুমারবাহাদুর?

—বলছি রামনারায়ণ, তুমি আগে পান তামাক খাও। কাশীশঙ্কর হেসে হেসে কথা বলেন। হঠাৎ কণ্ঠ সপ্তমে তুলে বললেন,—খানসামারা গেল কোথা সব?

—হুজুর এখানেই আছি। বলেন কি বলবেন।

এক জন ভৃত্য কোথা থেকে এসে দেখা দেয়। তার এক হাতে আলবোলা আর আরেক হাতে রূপোর পানদান। তক্তাপোষের ফরাসের 'পরে নামিয়ে রেখে ভৃত্য বলে,—হুজুরণী শুধোচ্ছিলেন কিছু খাবার-দাবার পাঠাবেন কি?

কাশীশঙ্কর বললেন,—পাঠাবেন বৈ কি! নিশ্চয়ই পাঠাবেন। রাম-নারাণকে না খাইয়ে ছাড়ছি না আমি।

কেমন যেন কৃতজ্ঞতার হাসি হাসলো রামনারায়ণ। বললে,—কুমার-

বাহাদুর, খাওয়া-দাওয়া কেন আবার? গেরস্থকে অনর্থক ব্যস্ত করতে চাই না।

—সে কি কথা রামনারাণ? সবিস্ময়ে বললেন কাশীশঙ্কর। বললেন,-মিষ্টমুখ করবে না, তা কখনও হয়?

—কাজের কথা বলুন কুমার বাহাদুর! দেখি আমি যদি কিছু করতে পারি। আলবোলার সর্পিল শটকা মুখে তুললো রামনারায়ণ। কথা থামিয়ে আমীরী টান দিতে থাকলো ঘন ঘন।

—ইংরেজের কুঠীতে আমি যোগানদার হতে চাই রামনারাণ!

অকৃত্রিম বিনয়ের সুরে বললেন কাশীশঙ্কর। তাঁর আসল বক্তব্যটি পেশ ক'রে ফেললেন। বললেন,—শুনি নাকি কুঠীয়ালরা প্রচুর মাল-মশলা কেনা-কাটা করছে কোম্পানীর তরফ থেকে?

—হাঁ কুমার বাহাদুর! তা যা বলেছেন। ধোঁয়া উদ্গীরন করতে করতে বলে রামনারায়ণ। বলে,—তবে কথা কি জানেন, যোগানদার হওয়া আপনার চাট্টিখানি কথা নয়। ঐ শালা কুঠীয়ালদের হাত করতে হবে সর্ব্বাগ্রে। ওদের মধ্যে যারা সওদার কাজ করে, সেই এজেণ্ট শালারাই হচ্ছে কি না সর্ব্বেসর্ব্বা!

—তাই নাকি রামনারায়ণ? তার উপায় বাৎলাও তুমি।

রামনারায়ণ আলবোলার গর্ভে মেঘগর্জ্জন তোলে। ঘন ঘন ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে টান দিয়ে যায় একের পর এক। বেশ কিছুক্ষণ এক নাগাড়ে টানতে টানতে হঠাৎ বললে,—এজেণ্ট শালারা হুজুর ঘুষ ছাড়া এক পা এগোয় না। কথায় কথায় টাকা গুঁজতে হয় হাতে হাতে। আগাম দাদন দিতে হয়। মাইনে যা পায় তা নামমাত্র। ঘুষ নইলে কথাই কয় না।

—রাজী আছি রামনারাণ।

—তবে হুজুর কথার আর কি আছে? ঘুষ দিতে পারলে কত যোগান দিতে পারেন দিন না কেন।

কথার শেষে আবার মুখানল মুখে তোলে রামনারায়ণ।

কাশীশঙ্কর কেমন যেন প্রফুল্ল হয়ে উঠলেন। স্বপ্ন সার্থক হওয়ার আভাস

পেয়ে তৃপ্তির শ্বাস ফেললেন। মুখের প্রসন্ন হাসি লুকিয়ে বললেন,—ইংরেজের কুঠীতে কোন্ কোন্ মালের চাহিদা আছে রামনারাণ?

ভেবে ভেবে রামনারায়ণ বলে,—শোরা আর লবণের চাঁই—এই দু'য়ের চাহিদাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হুজুর। যেখানে যে দরে পাচ্ছে কিনে ফেলছে।

—তারপর?

—তারপর হুজুর ভাল কাপড়, বেনারসী, ঢাকাই মসলিন, পাট, থলে, রেশম, তসর, গরদ, এণ্ডী, ক্ষীরোদ।

—তারপর?

—তার পর হুজুর চাল, ডাল, আটা, লবণ, নারকেল, চিঁড়া, ছাতু, তেল, ঘি, চিনি। রামনারায়ণ থেমে থেমে ব'লে যায়। বলে,—ইংরেজদের ম্লেচ্ছ-দেশে কুমারবাহাদুর ধর্ম্মের লড়াই চলছে বর্ত্তমানে। গোলা-বারুদ তৈরীর কাজের জন্যে কাঁড়ি কাঁড়ি শোরা আর লবনের চাঁই চালান দিচ্ছে জাহাজে। হপ্তায় হপ্তায় মালবোঝাই জাহাজ ছাড়ছে জাহাজঘাটা থেকে।

গ্রেট ব্রিটেনে ধর্ম্মযুদ্ধ চ'লেছে সত্যিই। ক্যাথলিক আর প্রোটেষ্টাণ্টদের লড়াই উগ্র আকার ধারণ করেছে। পথে পথে যুদ্ধ চলেছে হাতাহাতি। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধেছে দুই দলের মধ্যে। তীরন্দাজদের হাতে উঠেছে টোটাভরা বন্দুক। আগ্নেয়াস্ত্র।

—আমাকে এখন কি করতে হবে রামনারাণ? ঘুষ আমি দিতে রাজী আছি। যত টাকা লাগে।

—ঘুষ দিলেই কুমারবাহাদুর পাট্টায় চুক্তি হয়ে যাবে। আপনিও হুজুর বাঁধা যোগানদার হয়ে যাবেন কোম্পানীর। খাতায় নাম লিখে নেবে তারা তখন। তারপর আমি তো আছিই।

—ঘুষের টাকা কত লাগবে রামনারাণ!

লজ্জার বাধা ঘুচিয়ে ব'লে ফেললেন কালীশঙ্কর। মাথা চুলকে ব'লে ফেললেন।

ভেবে ভেবে কোনো একটি অঙ্ক স্থির করতে পারে না যেন রামনারায়ণ—

কোম্পানীর বাঙালী দালাল। কুঠীয়ালদের বকলম, নিয়োজিত প্রতিনিধি। ক্রেতা আর বিক্রেতার মধ্যগ।

অনেক চিন্তার পর কথা বললে,—তা হুজুর, আপনার হাজার পাঁচেক টাকা তো বটেই। ক'জন এজেণ্ট আছে।

—তাতেও রাজী রামনারাণ। বলতে যেন এতটুকু দ্বিধা করলেন না কাশীশঙ্কর। অত্যন্ত সহজ কণ্ঠে বললেন। খানিক থেমে বললেন,—টাকা আমি দিতে পারবো না কিন্তুক। ঐ টাকার মোহর দেবো। আকবরী মোহর!

চোখের লোলুপতা লুকাতে দুই চোখ বন্ধ ক'রলো রামনারায়ণ। লোভের দৃষ্টি লুকালো। বললে,—তাই দেবেন কুমার বাহাদুর! কিন্তু ফ্যাক্টররা যেন জানতে না পারে ঘুণাক্ষরেও। কেউ যেন না জানতে পারে। জানতে পারলে হুজুর আমার এ্যাদ্দিনের চাকরীটা যাবে, হাতে হাত-কড়া পড়বে।

—এক ঈশ্বর ব্যতীত অপর কেউ জানবে না, তুমি নিশ্চিন্ত হও। কাশী-শঙ্কর চাপা স্বরে কথা বলেন ইদিক-সিদিক তাকিয়ে। বলেন,—পাঁচশো মোহর এখনই দিয়ে দিই তোমার হাতে।

—না কুমার বাহাদুর, এমন কাজ করবেন না। চোর-ডাকাতের হাতে শেষে তুলে দেবেন না কি? কেড়েকুড়ে নেবে যে পথে বেরোলেই। অপঘাতে ম'রবো কি আমি?

—তবে উপায়?

ভেবে ভেবে বললে রামনারায়ণ,—ঘোড়সওয়ার পাঠাবেন কুমার বাহাদুর। আমার ঘরে তুলে দিয়ে আসবে।

কাশীশঙ্কর যেন চিন্তামুক্ত হন। কপালের কুঞ্চিত রেখাগুলি যেন অদৃশ্য হয়ে যায়। সুস্থির হয়ে বসেন। লক্ষ্মীর কবচ পাঠ করেন মনে মনে। লক্ষ্মী যদি সুপ্রসন্না হন। সদাগরীর বৃত্তি নেবেন রাজকুলোদ্ভব কুমার কাশীশঙ্কর, লক্ষ্মী যদি কৃপা করেন।

—বাবামশাই।

কোমল কিশোরীকণ্ঠের ডাক। আধো-আধো কথা। বনলতা শাড়ীর
াচল লুটোতে লুটোতে কাশীশঙ্করের কাছে এসে দাঁড়ায়। কি যেন বলতে
ায় সে। কানে কানে বলে কাশীশঙ্করের। কি বলে কে জানে।

-গৃহিণীর আহ্বান এসেছে, রামনারাণ। কন্যাদূতীকে পাঠানো হয়েছে।
গ্যস্তে বলতে বলতে তক্তাপোষ থেকে নীচে নামলেন। বললেন,—তুমি
না রামনারাণ। আমি অচিরাৎ আসবো। বনলতা, তুমি কথা কও
ামনারাণের সনে। এখানে থাকো আমি যতক্ষণ না আসি।

—রাতরাণী!

অন্দরের মুখে দাঁড়িয়ে ডাক দিলেন কুমার বাহাদুর।

মহাশ্বেতা অদূরে দাঁড়িয়ে। কেমন যেন স্তব্ধ শান্ত! মুখে যেন তাঁর
ুশ্চিন্তার ছায়া।

—রাতরাণী!

—কুমার বাহাদুর। কাছে এসো আমার। কথা আছে একটা।

কাশীশঙ্কর স্বপ্ন সার্থক হওয়ার আভাস পেয়ে খুশীতে আত্মহারা হয়ে
াছেন। পরিহাসের সুরে বললেন,—ঠিক এই ক্ষণে কি কাছে যাওয়ার
ময়? সময়-অসময়ের বাছবিচার নাই?

মহাশ্বেতার মুখাকৃতির কোন পরিবর্ত্তন হয় না। সূক্ষ্ম ওষ্ঠাধরে হাসি ফোটে
া। কেমন যেন ভীতিবিহ্বলতা। কুমার নিকটে যেতে মহাশ্বেতা বললেন,
—রাজমাতা মূর্চ্ছা গেছেন নাটমন্দিরে। তুমি এখনই যাও।

—আঃ!

বিরক্তির সুর কাশীশঙ্করের। বললেন,—রাজমাতাকে নিয়ে আর পারি না।

মহাশ্বেতা কুমারের হাত ধরলেন নিজ হাতে। সুমিষ্ট কণ্ঠে বললেন,—ছিঃ
ুমারবাহাদুর, তিনি তোমার গর্ভধারিণী মা। অমন কথা বলতে আছে কি?

—নাটমন্দিরে যাওয়াই বা কেন অথর্ব্ব শরীরে? মেয়ের দুঃখে মূর্চ্ছা না
কে?

—তা জানি না। তুমি এখনি যাও। দুঃখভরা সুরে বললেন মহাশ্বেতা।
বললেন,—তুমি যে কেন গররাজী হও বুঝি না! কৃষ্ণরামের দাবী তো মিটিয়ে
দিলেই হয়। বিন্ধ্যবাসিনীও সুখী হয়!

—আমি জীবিত থাকতে নয়।

কাশীশঙ্কর দৃপ্তকণ্ঠে কথা বলে অন্দর থেকে বেরিয়ে গেলেন দ্রুতগতিতে
মহাশ্বেতা শ্বেতপ্রস্তরের মূর্ত্তি মত স্থির হয়ে থাকলেন। স্মরণ করলে
বিপত্তারিণীকে। ইষ্টদেবীকে।

বিন্ধ্যবাসিনী কিছুই জানতে পায় না। পিত্রালয়ের লোক, রাজগৃহে
লেঠেল জগমোহনের হঠাৎ দেখা পেয়ে সকল দুঃখই যেন ভুলে যায়। মনের ক
মনে থাকে না। ভাঙা-ভিটায় বন্দিনী রাজকন্যা। পিত্রালয়ের লোকে
কাছে পেয়েছেন। আনন্দাতিশয্যে জল ঝরছে রাজকুমারীর চোখ থেকে।

বাপের বাড়ীর লোককে খাওয়াতে বসেছেন বিন্ধ্যবাসিনী। ক'দিন অ
জোটেনি জগমোহনের। গোগ্রাসে গিলছে সে হাপুশ হুপুশ শব্দে
ভাতের পাহাড় জগমোহনের পাতে।

চোখের জল আঁচলে মুছে বিন্ধ্যবাসিনী বলেন,—কত দিন যে দেখি
রাজমাকে! বুকের ভেতরটা যেন আই-ঢাই করে।

রাজকুমারী জানতে পায় না, তার ভাবনা ভেবে ভেবেই মূর্চ্ছা গেছলে
রাজমাতা আজ সকালে।

নাটমন্দিরের পূজায় বিঘ্ন হয়। পতিত হয়ে যায় প্রাতঃসন্ধ্যা।

পুরোহিত হয়তো মন্ত্র বিস্মৃত হন। বৈদিক সন্ধ্যার পর তান্ত্রিক সন্ধ্যা
করতে না করতে অঘটনের কথা কানে যায় পুরোহিতের। শুনলেন, নাট
মন্দিরের দালানে রাজমাতা মূর্চ্ছা গেছেন। ক্রোধের আতিশয্যে কেমন যে
অপ্রকৃতিস্থা হওয়ায় চেতনা লোপ পেয়েছে বিলাসবাসিনীর। জ্যেষ্ঠপুত্রে
প্রতি কোপ প্রকাশ করতে করতে সহসা পতন এবং সঙ্গে সঙ্গে মূর্চ্ছাপ্রা
হয়েছেন। আত্মজ্ঞান হারিয়ে মূলচ্যুত বৃক্ষের মত দালানের মেঝেয় প'

গেছেন। আঘাত পেয়েছেন, রক্তাভ চিহ্ন ফুটেছে কপালে। চক্ষু অর্দ্ধ-নিমিলিত হয়ে আছে। হাতের মুঠি কঠোর। নাটমন্দিরের যাজক, ব্রাহ্মণ পূজারী ও ব্রহ্মচারীদের ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা। কেউ যেন এগোতে সাহসী হন না। সকলে দূরে দাঁড়িয়ে থাকেন নীরবে। রাণী সর্ব্বমঙ্গলা নিজ ক্রোড়ে তুলে নিয়েছেন বিলাসবাসিনীর মাথা। ঘন ঘন জলসিঞ্চন করছেন রাজমাতার মুখে-চোখে। ছোঠ রাণী সর্ব্বজয়া হাতপাখা চালনা ক'রে চলেছেন অবিরাম।

—চিন্তাজ্বরো মনুষ্যাণাং! কার কণ্ঠের প্রতিধ্বনি ভাসলো নাটমন্দিরের দালালে! কোন এক জোরালো কণ্ঠের।

দুই রাণী, কেন, কে জানে, সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন যেন। সলজ্জায় গুণ্ঠনের মাত্রা বাড়িয়ে দেন। ভয়ের দৃষ্টি ফোটে চোখে।

ফুল, চন্দন আর আতরের সুগন্ধময় বাতাস থমকে থাকে যেন। নাট-মন্দিরে কেমন এক স্তব্ধতা। পূজাবেদীর আশেপাশে ধুনুচি জ্বলছে কতগুলো। ধূমায়িত, তাই ধূসর ধূম্রাবরণে অদৃশ্য হয়েছে মূর্ত্তি। শুধু দেখা যায়, মূর্ত্তির দেহের সোনার অলঙ্কার, হলুদ-রঙ চেলী আর লাল পদ্মর মালা। ধুনুচির ধূসর-ধোঁয়া সর্পাকারে উর্দ্ধে উঠছে। রাশি রাশি গুল্‌গুল পুড়ছে ধুনুচিতে।

কোমর বাঁধতে বাঁধতে এসে উপস্থিত হয়েছেন কুমার কাশীশঙ্কর। দালানে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে বললেন,—চিন্তাজ্বরো মনুষ্যাণাং! চিন্তা-ভাবনাতেই রাজমাতা সারা হ'লেন! অকারণ অনাহার-উপবাসের এই কুফল!

কুমারের সজোর কথায় চমকে চমকে ওঠেন দুই রাণী। নাটমন্দিরে প্রতিধ্বনি ভাসতে থাকে ঘন ঘন। কোথায় কোন্ অদৃশ্য থেকে কে যেন কুমারের কথা অনুকৃতি করতে থাকে। বধূরাণীদের পরিচর্য্যাই যথেষ্ট, এই ভেবে কাশীশঙ্কর আর অধিক অগ্রসর হন না। ব্যস্ততায় পায়চারী করেন দালানে।

—কুমার বাহাদুর! পুরোহিত ধীরে এসে সসম্ভ্রমে ডাকলেন। পুরোহিত ঈষৎ যেন শ্রদ্ধাবনত [illegible] যুক্তকর।

—আজ্ঞা করেন।

পায়চারী থামিয়ে বললেন কাশীশঙ্কর!

—রাজমাতাকে যদি সামান্য চরণামৃত দেওয়া হয়?

ভয়ে ভয়ে শুধোলেন পুরোহিত। উত্তরের প্রতীক্ষায় তাকিয়ে থাকেন ব্যাকুল চোখে।

—ক্ষতি কি তায়? বরং

রাজমাতার স্থির ঊর্দ্ধ-দৃষ্টি হঠাৎ চাঞ্চল্যে কেঁপে উঠলো। নিমীলিত আঁখি মেললেন বিলাসবাসিনী। দীর্ঘ দুই চোখের তারা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলেন। চক্ষু এখনও ঘোর রক্তবর্ণ।

কাশীশঙ্কর উদাত্ত কণ্ঠে ডাকলেন,—জননি!

রক্তাভ চোখের তারা স্থির হয়ে যায়। বিলাসবাসিনী এক দৃষ্টে চেয়ে আছেন। তাঁর কনিষ্ঠ সন্তানের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি।

—চরণামৃত পান কর রাজমাতা! বলতে বলতে পুরোহিতের হাত থেকে তাম্রপাত্র নিজেই ধারণ করেন কাশীশঙ্কর। চরণামৃতের পাত্র।

রাজমাতা অতি ধীরে মাথা দোলালেন। অসম্মতি প্রকাশ করলেন। প্রাতে পূজাপাঠ শেষ হ'লো না এখনও, তৎপূর্ব্বে জল গ্রহণ করবেন না। চরণধোয়া জল, তবুও নয়।

—বৌরাণী, মাতৃদেবীর জপ-আহ্নিক এখনও কি সমাধা হয় নাই? কাশীশঙ্কর কথা বলছেন বধূরাণীর প্রতি। দুই রাণী যেন কিঞ্চিৎ লজ্জিতা হয়ে ওঠেন।

সর্ব্বমঙ্গলা মিহি কণ্ঠে বললেন,—নাটমন্দিরে পৌঁছেই এমন হয়েছে। পূজা-আহ্নিক শেষ হ'ল কৈ?

মৃদু হাসির সঙ্গে কাশীশঙ্কর বলেন,—চরণামৃত পানেও দোষ? লুপ্তজ্ঞান, তবুও বাছবিচার ঠিক আছে! সিংহরাশিতে জন্ম যে রাজমাতার, তাই এত তেজ!

চোখ মেলেছেন রাজমাতা,—সব চেয়ে বেশী যেন খুশী আর নিশ্চিন্ত হয়েছেন পুরোহিত। সহাস্যে তিনিও বললেন,—জ্যোতিষশাস্ত্র মতে,

'সিংহস্থিতে চন্দ্রমসি প্রধানা নারী ভবেৎ শৌর্য্যসমন্বিতা চ।' অর্থাৎ সিংহ-রাশিতে জন্ম হ'লে সে রমণী প্রধানা ও তেজস্বিনী হয়েই থাকে।

—যথার্থই বলেছেন আপনি। বললেন কুমার বাহাদুর। কথার শেষে চরণামৃতের পাত্রটি হস্তান্তরিত করলেন পুরোহিতকে।

ইশারায় ডাকলেন বিলাসবাসিনী। ভ্রূভঙ্গিমায়! কনিষ্ঠ সন্তানকে ডাকলেন নিকটে।

কাশীশঙ্কর কাছে এসে বসতে বিড়বিড়িয়ে কি যেন বললেন বিলাসবাসিনী, অস্ফুট কথা কইলেন, বোঝা গেল না। কেবলমাত্র একটি শব্দ শোনা যায়; সেই শব্দটি 'মুসলমানী'।

অনুমানে বুঝলেন কাশীশঙ্কর। বোঝেন, এ অভিযোগ রাজার বিরুদ্ধে। অগ্রজ রাজা কালীশঙ্করের বিপক্ষে। কিন্তু রাজমাতার আসল বক্তব্য অবোধ্য থেকে যায়। কুমার বললেন,—কি যে বল কিছুই সমঝাই না। মুসলমানী কোথা হ'তে এলো?

কুমার বাহাদুর জানেন না কিছুই। শুধু জানেন, রাজার নাচঘরে গত রাতে আলোর রোশনাই হয়েছিল। নর্ত্তকী এসেছিল। জানেন না যে, দুটি বশরাই গোলাপ এসে উঠেছে রাজগৃহে। অনিন্দ্য রূপের দুই তাত্রিজকন্যা এসেছে সুদূর তুর্কী আর পারস্যের মিলনভূমি থেকে। দাম দিয়ে কিনে ফেলেছেন রাজাবাহাদুর। নগদ মূল্য দানে।

মৃদুস্বরে বিলাসবাসিনী বললেন,—জাত-জন্ম সব যে গেল। কি আর বলবো?

কাশীশঙ্কর বলেন,—বিনা পাপে জাত-জন্ম যেতে যায় কেন?

রাজমাতা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,—রাজা যে ওদিকে মুসলমানী দু'টোকে ঘরে তুলেছে!

চিন্তার রেখা ফুটলো যেন কুমার বাহাদুরের প্রশান্ত ললাটে। ইতি-উতি দেখলেন চোখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে। কি যে বলবেন ভেবে পান না যেন। নাট-মন্দিরের দালানে বসে সারি সারি স্তম্ভের ফাঁক থেকে আকাশ দেখলেন কাশীশঙ্কর। নিরাশ চাহনি যেন চোখে। মুখে যেন হতাশা।

—কথা নাই কেন? হঠাৎ আবার ক্ষীণ সুরে কথা বললেন রাজমাতা।

চমকে চমকে উঠলেন দুই রাণী। মাতা-পুত্রের কথায় যেন বিচলিতা হন তাঁরা থেকে থেকে। জল-সিঞ্চনে বিরতি পড়েছে, কিন্তু হাতপাখা চালনা অবিরত চলছে।

কুমার বাহাদুর বললেন,—রক্ষা করেছেন শাস্ত্রকারেরা! কথার শেষে স্বল্প হেসে আবার বললেন,—ব্রাহ্মণের শূদ্রাণী অগম্যা নয়। তাতে কোন দোষ হয় না। রক্ত দূষিত হয় না। পুরুষের দেহে তো রক্ত প্রবেশ করে না, যে জন্ম ব্রাহ্মণীর শূদ্র অগম্য।

পরাজয়ের মুখভাব ফুটলো রাজমাতার। তাঁর অভিযোগ টিকলো না যে! শাস্ত্রের দোহাই পেড়ে মায়ের অভিযোগ খণ্ডন করে দিলেন ছেলে।

ধীরে ধীরে উঠে বসলেন বিলাসবাসিনী। অনেক কষ্টে যেন দেহ তুললেন।

দুই রাণী এক অন্যের প্রতি আড় নয়নে দেখলেন গুণ্ঠনের আড়াল থেকে থেকে যতটুকু দেখা যায়।

—তুমি বাধা দেবে না কুমার বাহাদুর? রাজমাতা কেমন যেন কাতরে কাতরে এই কথা বলেন। কত যেন কষ্ট হয় কথা বলতে। শ্বাসের কষ্ট হয়।

—রাজমাতা, বাধা দিয়া কি ফল হয়? ভেবে ভেবে বললেন কাশীশঙ্কর কথাগুলি বললেন যেন ঈষৎ নতকণ্ঠে। বললেন,—

বৌরাণীরা আছেন, রাজরাণী একেকজনা, তেনাদের বাধা মানবে কি? আমি তো দূরের মানুষ।

কাঠফাটা গরম বোশেখের। তপ্ত হাওয়া বইছে থেকে থেকে। প্রহর না উৎরোতেই মাটি উষ্ণ হয়েছে। নাট মন্দিরের সারি সারি স্তম্ভের ফাঁক থেকে রৌদ্রের ফালি ছড়িয়েছে কুমারের প্রশস্ত বক্ষে। কাশীশঙ্কর ঘর্মাক্ত হয়ে উঠেছেন।

অগ্নিতে যেন ঘৃতাহুতি প'ড়লো। সেবায় রতা রাণীদের দিকে রুষ্টদৃষ্টিতে দেখলেন রাজমাতা। অব্যক্ত আক্রোশ ফুটেছে যেন তাঁর রক্তলাল চোখে। শ্বাস রুদ্ধ ক'রে বিলাসবাসিনী বললেন,—তোমরা, রূপের ধুচুনীরা, আছো কি করতে? তোমাদের গলায় দড়ী পড়ে না?

—রাজমাতা! ধমকানির স্বরে ডাকলেন কাশীশঙ্কর। বললেন,—বৌ-রাণীদের কি দোষ?

গঞ্জনার কথা শুনে দুই রাণী দৃষ্টি নত ক'রেছেন। রাজমাতা আবার বললেন,—রূপের বলাই নিয়া মর' এখন। আমার সমুখ থেকে বিদেয় হও।

সর্ব্বমঙ্গলা উঠে পড়লেন বাক্যবাণে জর্জ্জরিত হয়ে। সূক্ষ্ম দুই ভ্রূ আকুঞ্চিত হয় সর্ব্বজয়ার। হাতপাখা এক পাশে রেখে তিনিও উঠলেন। দালান ত্যাগ করলেন শব্দহীন পদক্ষেপে। সর্ব্বজয়াও চললেন সহোদরার পেছন পেছন।

—খাসমহলে যাও রাজমাতা। কাশীশঙ্কর গম্ভীর স্বরে কথা বলেন। মাতৃ-পদে হাত রেখে বলেন,—বৃথা উত্তেজিতা হও কেন? বৌরাণীদের সেবা-যত্নেও কোন' মূল্য নাই?

—চাই না আমি সেবা-যতন। প্রত্যাশা করি না।

বিরক্তির মুখাকৃতি হয় কুমারবাহাদুরের। আর কোন কথা যেন বলতে ইচ্ছা হয় না আর। তবুও বলেন,—যাই হোক, তুমি এখন খাসমহলে ফিরে যাও। নাটমন্দির পুজার স্থান, সেটা ভুলে যাও কেন?

—ব্রজ কোথায় গেল? আমার ব্রজবালা?

ইদিক-সিদিক তাকিয়ে কাকে যেন খুঁজতে থাকেন বিলাসবাসিনী। কথা বলেন দুঃখকাতর স্বরে।

ব্রজবালা ছিল অদূরেই। কুমার দালানে আসতেই সভয়, সলজ্জায় লুকিয়েছিল এক থামের আড়ালে।

কাশীশঙ্কর উঠে পড়লেন! সহসা তাঁর মনে পড়েছে, কা'কে যেন বসিয়ে এসেছেন বৈঠকখানায়। ফেলে-ছড়িয়ে এসেছেন কত কাজকর্ম্ম। ব্যস্ততার লক্ষণ প্রকাশ পায় কুমারের মুখে যেন। আকাশে চোখ তুলে দেখলেন যেন, সূর্য্যের ঠিকানা। দেখতে দেখতে বেশ বেলা হয়েছে! তপ্ত হাওয়া চলেছে বোশেখের।

—মুখে জল দাও গিয়ে। কি নিদারুণ প্রখর রৌদ্র!

কুমার কথা বলতে বলতে ধীরে ধীরে এগোলেন। কিছু দূরে এগিয়ে

আবার ফিরলেন। বললেন,—রাজমাতা, পদধূলি দাও। কোম্পানীর পাট্টায় সহি করতে চলেছি যে! পাকা কথা পেয়েছি রামনারাণের মুখের। কথা বলতে বলতে বিলাসবাসিনীর দুই পা স্পর্শ করলেন কুমারবাহাদুর।

—আমাকে ধর' ব্রজবালা। খাসমহলে নিয়ে চল্‌। প্রায় কম্পিতকণ্ঠে বললেন রাজমাতা। কেমন যেন কাঁদো-কাঁদো সুরে বললেন,—অশান্তির কারণ হ'তে চাই না আমি।

—আশীর্ব্বাদ কৈ রাজমাতা? কাশীশঙ্কর প্রণামের শেষে বললেন ভক্তি-মাখা সুরে?

কোন কথা উচ্চারণ করলেন না বিন্ধ্যবাসিনী। কুমারের মাথায় হাত ছোঁয়ালেন বারেক। তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে হাসি মুখে চললেন কুমার।

বিলাসবাসিনী ক্ষীণকণ্ঠে বললেন,—কুমার, যেও না, কথা আছে। আমার শেষ কথা জানিয়ে দিই তোমাকে।

কাশীশঙ্কর মাতৃআহ্বান শুনে ফিরে দাঁড়ালেন। বললেন,—শেষ-কথা কি আবার?

ক্ষণেক নীরব থেকে রাজমাতা বললেন—আমার চাঁপাডাঙ্গার তালুক আমি সনদ দিতে ইচ্ছা করি। দানপত্র লিখে দেবো আমি। চাঁপাডাঙ্গা তালুকের বার্ষিক লভ্য কয়েক লক্ষ টাকা।

কাশীশঙ্কর কেমন যেন স্তম্ভিত হয়ে পড়লেন শেষ-কথা শুনে। বললেন—কা'কে দেবে তাই শুনি?

—বিন্ধ্যবাসিনীর স্বামীকে। কৃষ্ণরামকে।

রাজমাতার তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠ কুমারবাহাদুরের কানে যেন বজ্রপাতের মত শোনায়।

চাঁপাডাঙ্গা তালুক রাজমাতার নামে। এই তালুক থেকে যা আয় হয় তা রাজমাতার প্রাপ্য। ভবিষ্যতে পুত্ররা যদি মাতার প্রতি বিমুখ হয় সেই আশঙ্কায় স্বর্গত রাজা চাঁপাডাঙ্গা তালুক আপন ধর্ম্মপত্নীর নামে দান করে ছিলেন। চাঁপাডাঙ্গা আরামবাগের অন্তর্গত। কয়েক হাজার ধর্ম্মপ্রজার বসতি সেখানে।

-যা ইচ্ছা হয় কর'।

কাশীশঙ্কর কথা বললেন ভগ্ন-উৎসাহে। বললেন,—অতঃপর তোমার কোথা দিয়া দিন গুজরাণ হবে ? রাজগৃহে যদি শেষে ঠাঁই নাই মিলে।

রাজমাতা ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলেন—গাছতলায় থাকবো। ভিক্ষে মেগে খাবো। হাত পাতবো।

হেসে ফেললেন কুমারবাহাদুর। অসম্ভব এক কথা শুনে মানুষ যেমন হাসে। হাসতে হাসতেই বললেন,—বেশ কথা। যা মন চায় কর। তোমার তালুক তুমি যদি দান কর কে কি করতে পারে ?

বিলাসবাসিনী তপ্ত শ্বাস ফেললেন। বললেন,—চাঁপাডাঙ্গা তালুকের দলিলখানা দিয়ে দাও কুমারবাহাদুর !

হাসি মিলিয়ে যায় মুখের। কাশীশঙ্কর বলেন—এখনই চাই না কি রাজমাতা ?

—হাঁ, এখনই পাই তো ভাল হয়। কথা বলতে বলতে অতি কষ্টে উঠে দাঁড়ালেন বিলাসবাসিনী। শরীর যেন টলছে এখনও। পা দু'টো কাঁপছে ঠকঠকিয়ে।

কুমার বললেন,—রাজার সঙ্গে পরামর্শ করবে না একবার ? দলিল তো আছে রাজকাছারীতে।

ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন যেন রাজমাতা। সক্রোধে বললেন—রাজা বাদশাহের পায়ে তেল দিতে বাঁচবো না আমি। পরামর্শের ধার আমি ধারি না। আমার কথাই শেষ কথা।

—তথাস্তু ! রাজাকে আমি জানাবো।

ব্যস্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চললেন কাশীশঙ্কর। আর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করলেন না।

বিলাসবাসিনী আবার ডাকলেন,—ছোটকুমার, দাঁড়াও কথা আছে।

কে কার কথা শোনে ! কুমারবাহাদুর দ্রুত বেগে ফিরে চলেছেন যে-পথে এসেছিলেন। কত জরুরী কাজকর্ম্ম ফেলে-ছড়িয়ে এসেছেন তিনি। বৈঠক-

খানায় বসিয়ে রেখে এসেছেন রামনারায়ণকে। কথার মধ্যপথে উঠে চলে এসেছেন তিনি।

কত দূর থেকে দেখা যায়, ছোটকুমারের গৃহের আঙিনায় শালকাঠের গুঁড়ি খাড়া হয়েছে সারি সারি। বাঁশের চালা বাঁধার কাজ চলেছে। ঘরামিরা কাজ করছে তড়িৎ গতিতে। বাঁশ বাঁধছে। চালায় খড়ের আঁটি উঠছে রাশি রাশি। মাটি লেপছে কেউ কেউ। আড়তের ঘর উঠছে। দিবারাত্র কাজ চলেছে। মশাল জ্বালিয়ে কাজ হয়েছে রাতভোর। কুমার স্বয়ং কাজের তদারক করছেন। চাল ডাল আর কাঁচা মশলার আড়তদার হবেন কাশীশঙ্কর।

ঘরামিদের কলকোলাহলে মুখর হয়ে আছে রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণ-প্রান্ত। ধারালো কাস্তে পড়ছে বাঁশের কঠিন অঙ্গে। কাঠ কাটছে তারা।

কাশীশঙ্করের কথাগুলি কানে বাজতে থাকে রাজমাতার। কথা তো নয়, যেন কামানের গর্জ্জন ধ্বনি!

বিলাসবাসিনী বললেন,—ব্রজবালা কৈ গো? আমাকে ধরে নিয়ে চল' ব্রজ। পা যে কাঁপে!

কুমার দৃষ্টির বাইরে গেলে দাসী ব্রজবালা আসে। সযতনে ধরাধরি করে রাজমাতাকে। তার পিঠে হাত রেখে বিলাসবাসিনী অবশ পায়ে নাটমন্দির ত্যাগ করলেন। অন্ধের মত চললেন যেন!

নাচঘরের দেওয়ালগিরি নিবু-নিবু হয়।

সারা রাত ধ'রে আলো যুগিয়ে আলোকশিখা যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এতক্ষণ। বাতিদানের বাতি পুড়ে পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। রাতে যেন ঝড় হয়েছে নাচঘরে, তাই হেলাগোছা হয়ে আছে ফরাস আর তাকিয়া। ফুল, আতর আর গোলাপ জলের বাসি সুবাসের ঘর যেন টইটম্বুর।

রাজার সঙ্গে সঙ্গে তাব্রিজকন্যারাও পান করেছিল অতি মাত্রায়। চুয়ানো মদ খেয়েছিল ভরা-পেয়ালায়। রাজাবাহাদুরের প্রেমলাভের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেধেছিল দু'জনের মধ্যে। এক পক্ষ অন্য পক্ষকে গালি দিয়েছিল। বাকযুদ্ধ থেকে চুলোচুলি মারামারি হওয়ার উপক্রম হতে দেখে সহাস্যে মধ্যস্থতা

করেছিলেন রাজা কালীশঙ্কর। বিবাদ ক্ষান্ত করার জন্য দু'জনকে নিজের দুই পাশে রেখেছিলেন।

রঙমহলের কপাটে কড়া পাহারার বন্দোবস্ত ছিল। পাছে কেউ অনধিকার প্রবেশ করে তজ্জন্য দু'জন অস্ত্রধারী পাইক বদ্ধ দ্বারের মুখে পাহারায় নিযুক্ত ছিল। বিনিদ্রায় রাত্রি যাপন করেছিলেন রাজাবাহাদুর। কালো আকাশের পূব-প্রান্তে আলোর আভাস ফুটতে ধীরে ধীরে কখন নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়েছিলেন।

বেলা দ্বিতীয় উত্তীর্ণ হওয়ার পর নিদ্রাভঙ্গ হয় কালীশঙ্করের। রাতে জাগা, দিনে ঘুম। ঘুম ভাঙ্গলো, কিন্তু নেশা যেন কাটলো না। চোখে লেগে আছে নিদ্রার জড়িমা, শরীরও যেন কি কারণে জড়তাপূর্ণ হয়ে আছে। রাজা চোখ মেলতে দেখলেন, নর্ত্তকীরা তখনও ঘোর নিদ্রায় অচেতন। এত রূপের ঐশ্বর্য্য, দিনের আলো ফুটতে কোথায় যেন হারালো। নর্ত্তকীরা কেমন যেন বিকারগ্রস্ত রোগীর মত অসাড় হয়ে প'ড়ে আছে। নধর নিটোল দেহ, ভরা যৌবন, দুধের মত দেহবরণ,—তবুও গভীর ঘুমের মাঝে সকল কিছুই যেন লুপ্তশ্রী হয়। কি বিশ্রী দেহভঙ্গিমা ঐ বিনিদ্রিতা রূপবতীদের! এক জন হাঁ করে আছে ঘুমন্ত অবস্থায়। অন্য জনের পা অস্বাভাবিক প্রলম্বিত হয়ে আছে।

হাতের কাছেই ছিল পেটাঘড়ি। রাজাবাহাদুর ঘড়ি পিটলেন বার কয়েক। কম্পমান ও অবসন্ন হাতে থেমে থেমে পিটলেন। নর্ত্তকীদের এক জনের একখানি হাত নিজের পা দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিলেন কালীশঙ্কর। ঘন ঘন ঘড়ি পিটছেন, অথচ সাড়া মিলছে না। কারও দেখা পাওয়া যাচ্ছে না।

নাচঘরের দ্বার রুদ্ধ মাত্র ছিল, বদ্ধ ছিল না।

কে এক জন দুয়োরের কপাট সরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলো প্রায় চুপি-সাড়ে। ভয়ে ভয়ে।

—শুয়ারের বাচ্ছারা গেল কোথায়?

ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললেন রাজাবাহাদুর। ঘুমভাঙ্গা চোখে রোষদৃষ্টি যেন।

বললেন—জরিমানা একেক মাসের বেতন। কথার শেষে আবার ঘড়ি পিটতে থাকেন ঘন-ঘন।

ঘুমন্ত নর্তকীরা ঘোর নিদ্রার মাঝে অস্থির হয় সেই বিকট শব্দে, কিন্তু নিদ্রা যেন ভঙ্গ হয় না। চুয়ানো মদের নেশায় এখনও যে তারা জ্ঞানহারা।

—সেলামালেকম্!

খাস খানসামা সেলাম জানায় নাতিউচ্চ কণ্ঠে। কুর্নিশ করে সামনে ঝুঁকে। বাম হাত বুকে রেখে ডান হাত কপালে ঠেকায়।

কালীশঙ্কর বললেন,—অন্দরমহলে যেতে চাই এখনই।

—পালকি তৈয়ার আছ হুজুর! জরিমানা খারিজের হুকুম হয় হুজুর!

পালকি নয়, মনুষ্যবাহী সুখাসন। বহন ক'রে নিয়ে যাবে দু'দল মিশকালো কাফ্রী। এডেন বন্দর থেকে চালানে আসা কেনা-গোলাম। দাস!

—দেওয়ানজী কাঁহা? বিরক্তস্বরে কথা বললেন রাজাবাহাদুর। একটা ভেলভেটের তাকিয়ার পরে দু'হাতে দেহের ভর রেখে সত্বর উঠলেন রাজা।

—দেওয়ানজী কাছারীর অন্দরে।

—লে আও শালোকো। পাক্‌ড়ে লে আও। কথা বলতে বলতে ক্ষণেক থেমে হেথা-সেথা তাকিয়ে আবার বললেন,—নেহি নেহি। ছোড় দেও।

রাজাবাহাদুরের হাতে ছিল মুঠোয়-ধরা রেশমী রুমাল। রামধনু রঙের পাতলা, হালকা রুমালে মুখের কালিমা মুছতে মুছতে নাচঘর থেকে বেরুলেন রাজা। রাত্রির কালিমা মুছলেন হয়তো। কি যেন, কাকে যেন হঠাৎ মনে পড়েছে কালীশঙ্করের। স্মৃতিপটে ভেসে উঠেছে কে যেন। টলতে টলতে চলেছেন রাজা। অসংযত পদক্ষেপে চলতে চলতে সুখাসনে উঠে ধপাস ক'রে বসে পড়লেন।

দেওয়ানজী প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে উপস্থিত হন। প্রাতঃপ্রণাম জানান যুক্তকর কপালে ছুঁইয়ে। যাতে রাজার চোখে পড়ে তাই সুখাসনের সমুখে দাঁড়ালেন। বললেন,—রাজা কালীশঙ্করের জয়!

—দরবার খোলা হোক দেওয়ানজী। হুকুমের সুরে বললেন রাজা-

বাহাদুর। বললেন,—আমার ফিরতে বড় দেরী হবে না। এখনই ফিরবো। দরবার করবো এসে।

—যথাজ্ঞা, রাজাবাহাদুর। আপনি জয়যুক্ত হোন—দেওয়ানজী বিনয়নম্র ভঙ্গীতে বললেন,—মহাশয়ের কি অপরিসীম কর্ম্মক্ষমতা!

সুখাসন এগিয়ে চললো হনহনিয়ে। হেলতে দুলতে।

একেই গুরুভার সুখাসন, তদুপরি স্থূলকায় রাজাবাহাদুর। কাফ্রীর দলকে তবুও বহন করতে হয়। এই কাজের জন্যই তারা গ্রাসাচ্ছাদন পায়। দাম দিয়ে কেনা হয়েছে কাফ্রীদের।

কার তরে হঠাৎ মন কেঁদেছে কালীশঙ্করের। স্মৃতির পটে হঠাৎ ভেসে উঠতে আর এক পলের জন্য ভাল লাগলো না নাচঘরের বিলাসসুখ। মন চাইলো না নর্ত্তকীদের কাছে থাকতে। একমাত্র পুত্রকে কেন কে জানে মনে পড়েছে রাজার। রাজপুত্র শিবশঙ্করকে দেখতে সাধ হয়েছে। অথচ রাজপুত্রকে নাচঘরে আসতে আজ্ঞা করা যায় না। দেখানো যায় না নাচঘরের বেআবরুতা।

রাজপুত্র তখন লিখন-পঠনের অভ্যাস করছে গুরুর কাছে।

কাষ্ঠফলকে খড়ির আঁচড়া কাটতে শিখছে। স্বরবর্ণের প্রথম অক্ষরগুলি লিখতে চেষ্টা করছে। লেখাপড়ায় অমনোযোগী হয়ে ওঠে থেকে থেকে। কাষ্ঠফলক রেখে দিয়ে শিবশঙ্কর বলে,—গুরুমশাই, গুরুমশাই, ছড়া শুনান একটা। ছড়া না শুনালে লেখালেখি বন্ধ থাক।

নস্যির টিপ নাকে পুরলেন গুরু। প্রায় পোয়াটাক নস্যি পুরলেন দুই নাসারন্ধ্রে। তারপর বললেন,—ছড়া শুনালে অক্ষর লিখবা তো?

—হাঁ।

অগত্যা গুরু বললেন,—তবে বলি ছড়া। শুন মন দিয়া। কথা বলতে বলতে খানিক ভেবে ছড়া ধরলেন সুরেল কণ্ঠে। বললেন:

আয় রে আয় ছেলের পাল মাছ ধরতে যাব।
মাছের কাঁটা পায়ে ফুটলে দোলায় চড়ে যাব॥

দোলায় আছে ছ পণ কড়ি গুন্তে গুন্তে যাব।
ছোট শাঁখা বড় শাঁখা রুনুঝুনু বাজে॥
দুর্গা হেন জল টুকু ঝিকিমিকি করে।
তাতে বসে বাবা খুড়ো কন্যা দান করে॥

ছড়া বলতে বলতে খানিক থামলেন গুরু। রাজপুত্র আবদারের সুরে বললে,—তার পর, তার পর গুরুমশাই? গুরু আবার ছড়ার জের ধরলেন। বললেন:

কন্যা দান করতে করতে চোখ পড়লো লো।
হাত পেতে নাও গামছা চোখের পুছলো॥
আজ থাক রে বরকনেরা যষ্টি মধু খেয়ে।
কাল যাবে রে কনেরা সংসার কাঁদিয়ে॥
বাপে কাঁদে মাসী পিসী তার পর কাঁদে পর॥
কানতে কানতে গেল খুড়ো ঘর।
খুড়ো দিলে বুড়ো বর।
ও খুড়ো তুই পুড়ে মর।
আপনি বুঝিয়ে দেখ কার ঘর কর॥
এইখানটি খেলেছিলাম ভাঁড় টাঠি নিয়ে।
এইখানটি রুঁদে দাও ময়না কাঁটা দিয়ে॥
চাঁদ উঠল ফুল ফুটল ঝলক মলক দিয়ে।
ওর বেটা পান খেয়েছে শাশুড়ী বাঁধা দিয়ে॥

শিশুসুলভ হাসি হাসতে থাকে রাজপুত্র। ছড়া শুনে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে যেন মাদুরে। কচি কচি দাঁতগুলি ঝিকমিকিয়ে ওঠে শিবশঙ্করের উল্লসিত হাসিতে।

—শিবশঙ্কর!

পিতৃকণ্ঠ হঠাৎ শুনে চমকে ওঠে যেন রাজপুত্র। হাসি উবে যায় মুখ থেকে, মুহূর্ত মধ্যে। উঠে বসতে হয় তাকে ঠিকঠাক।

—কাছে এসো রাজকুমার।

রাজা কালীশঙ্কর স্বয়ং এসে দাঁড়িয়েছেন পাঠ কক্ষের দ্বারে। দুই বাহু বাড়িয়ে সাদরে ডাকছেন। বললেন,—গুরুমহাশয়, আজকে উহাকে অব্যাহিত দেন, এই অনুরোধ। আমার মন বড় কাঁদে পুত্রের অদর্শনে।

—আপনি যেমত আদেশ করেন রাজাবাহাদুর! আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সম্ভ্রমের সঙ্গে বললেন গুরু। রাজার আকস্মিক আবির্ভাবে তিনিও যেন বিস্ময়াবিষ্ট।

শিবশঙ্কর এক পা এক পা অগ্রসর হয়। রাজাকে দেখে ভয়ে যেন আড়ষ্ট হয়ে থাকতে হয় রাজপুত্রকে। ছেলে কাছে আসতেই দু'হাতে তাকে বক্ষে তুললেন রাজাবাহাদুর। বুকে তুলে নিয়ে চললেন অন্দরাভিমুখে। রাজপুত্র কোমল দুই হাতের বেষ্টনে পিতাকে জড়িয়ে থাকলো।

কালীশঙ্কর বললেন,—আমার চোখের মণি, আমার আদরের দুলাল!

শিবশঙ্কর এক ঝলক হাসলো স্নেহের কথা শুনে। কচি কচি দাঁত দেখিয়ে হাসলো মৃদু মৃদু।

—বড়রাণী কোথায়? তোমার জননী?

ছেলেকে একটি চুমা খেয়ে প্রশ্ন করলেন রাজাবাহাদুর। অন্দরে এগিয়েছেন তিনি। কাষ্ঠপাদুকার শব্দ উঠেছে অন্দরে।

শিবশঙ্কর বলে,—মাইয়া আছে রশুইয়ে।

পাটরাণী উমারাণী জলন্ত উনানের কাছে। গনগনে আগুনের মুখে বসেছেন! কাঁচা কাঠ পুড়ছে দাউ-দাউ। অগ্নিতাপে চোখ ঝলসে যায় যেন। লালপাড় পট্টবস্ত্র পেঁচিয়ে পরে উমারাণী রাঁধতে ব'সেছেন। স্বামি-পুত্রের অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করছেন। পবিত্র গঙ্গাজলে রাঁধছেন যত কিছু।

ঘামতেল মেখেছেন যেন প্রতিমা। সদ্যস্নাতা উমারাণীর মুখ তৈলচিক্বণ। উনানের আঁচে দরদরিয়ে ঘামছেন উমারাণী। কেমন যেন বিষণ্ণ মুখ তাঁর। উনানের আগুনের উপর স্থির দৃষ্টি। গত রাতে রাজাবাহাদুর অন্দরমুখো হননি। সারারাত দেখা মিললো না তাঁর। অথচ জেগে ব'সে রইলেন উমারাণী। রাত

কেটে গেল চোখের সম্মুখে। প্রহরের পর প্রহর গড়িয়ে আকাশ ফর্সা হয়ে গেল কখন! ঘর্ম্মরেখা না অশ্রুরেখা চোখে! কে জানে কি! অশ্রুর বন্যা না কাঁচা কাঠের ধোঁয়ায় চোখ জ্বলছে!

রাণীর মুখ যেন বিমর্ষ, দুঃখে-ভরা। ক্লান্ত চাউনি চোখে। উমারাণীর রাঙা অধরও কেমন যেন বিবর্ণ। চোখে জলের ধারা। কিন্তু রসুই ঘরে মসলা-ফোড়নের খোসবয় বইছে। পাকা রাঁধুনি নাকি রাজরাণী। ভারি মিষ্টি রান্নার হাত।

নিরামিষ রান্নার পর আমিষ রান্নায় হাত দিয়েছেন তিনি। মাছের ঘণ্ট তৈরী করছেন। আর কাঁদছেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। মুসলমানীদের ঘরে তুলেছেন রাজাবাহাদুর। সেই দুঃখে অশ্রুপাত করছেন আপন মনে, সকলের অলক্ষ্যে।

খাস-মহলে চলেছিলেন রাজাবাহাদুর, গদাই-লস্করী চলনে। ঘুম-ভাঙা চোখ দু'টি এখনও যেন রক্তবর্ণ হয়ে আছে। মদিরাচ্ছন্ন দৃষ্টি দুই চোখে। কাষ্ঠ-পাদুকার শব্দতরঙ্গ শোনা যায় অন্দরে। যে যেখানে থাকে, পথ ছেড়ে স'রে দাঁড়ায় সসম্ভ্রমে। খাস-মহলে ফিরে রাজা ক্ষৌরকর্ম সারবেন, স্নান করবেন, প্রাতরাশে বসবেন। তারপর আবার সদরে আসবেন, দরবারে বসবেন। রাজাবাহাদুরের চোখে-মুখে ব্যস্তভাব, কিন্তু চালচলনে কোন তৎপরতা নেই। কপালে ফুটে আছে চিন্তারেখা, কিন্তু শরীর যেন আর বইছে না। গুরুভার দেহ, বহন করতে পারেন না যেন আর। কোঁচা-কাছা বেসামাল হয়ে পড়ে। রাজকুমারকে বক্ষে ধারণ করে চলেছিলেন। রসুই-শালার কাছাকাছি গিয়ে গগন-ফাটা চিৎকার করলেন। ডাকলেন,—উমারাণী কৈ গো? দেখতে পাই না কেন?

সাড়া মেলে না কারও। রন্ধনকার্য্য করছেন বড়রাণী। এখন তিনি নির্ব্বাক। আহার্য্য উচ্ছিষ্ট হওয়ার ভয়ে মুখে যেন কুলুপ এঁটেছেন। কারও কায়া-ছায়া নজরে পড়ে না, আহ্বানের উত্তরও পাওয়া যায় না। কালীশঙ্কর আবার ডাকলেন চড়া সুরে। ডাকলেন,—উমারাণী। উমারাণী কৈ?

সাড়া পাওয়া যায় না, কিন্তু রসুই থেকে রন্ধনের মশলার সুগন্ধ ভেসে আসছে। কিমা-পোলাও না কিমা-সুরবা রান্না হচ্ছে হয়তো। ঘ্রাণেন অর্দ্ধভোজনম্। খাসনাসায় গন্ধ পেয়েছেন রাজা। বুঝেছেন কোন পাকা হাতের রান্নার সুগন্ধ ভেসে আসছে। সুখদোষ চালের ভাত চেপেছে চুল্লীতে।

বড়রাণীর নাসিকা ও মুখ লাল রেশমের রুমালে বাঁধা। সাড়া দেবেন তিনি কোন্ উপায়ে! উনানে কড়াই আর হাঁড়ি, উঠে আসবেন কোন্ ভরসায়? ভাত যদি ধ'রে যায়, পোলাও আর সুরুবা যদি যদি পুড়ে যায়!

উমারাণীর পরিবর্ত্তে তাঁর প্রতিনিধির মত দেখা দেয় শিবানী। উসকো-খুসকো চুল তার, উড়ো-পাখীর মত আকৃতি। কাঁকালে ঘড়া। চোখে উজ্জ্বল কাজলের রেখা। তাম্বুলে অধর রাঙানো।

—বড়রাণীকে দেখি না কেন বিন্দে দূতী শিবানী?

কেমন যেন ভগ্নকণ্ঠে কথা বললেন রাজাবাহাদুর। কাঁসর-ভাঙা কথার সুর যেন। কথা বলতে বলতে বক্ষ থেকে নামিয়ে দিলেন রাজপুত্র শিবশঙ্করকে। আর যেন পারেন না ভার বইতে! কটমটিয়ে তাকিয়ে রইলেন তিনি।

মৃদু মৃদু হাসতে থাকলো শিবানী। এ কাঁকাল থেকে ও কাঁকালে ঘড়া বদলাতে বদলাতে বললে,—আপনার আহ্লাদের বিবি এখন পাকশালে আছে! নাকে-মুখে কাপড় বেঁধে ভাতের হাঁড়ি ঠেলছে!

রাজাবাহাদুর পলকহীন চোখে একবার দেখলেন শিবানীকে! তার মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত দেখলেন। পায়ে গাঢ় আলতার চিহ্ন। লালপাড় শাড়ীর আঁচল কোমরে জড়ানো! হাতে জল-রঙ কাচের চুড়ী গোছা-গোছা। কপালে কাচপোকার টিপ, সবুজ আভা ছড়ায়। রুক্ষ কেশরাশি, কোমর ছাপিয়ে নেমেছে নিতম্বে।

—তোর বিয়া আর না দিলেই নয়। রাজাবাহাদুর বললেন ঈষৎ ধীর-কণ্ঠে। বললেন,—বিয়া না দিলে দেখছি কুল মজাবি তুই।

লাজুক হাসি ফুটলো শিবানীর মুখে। বললে,—শুধু কথার কথা না কি? বিয়া যদি না হয় আপনাদেরই গালে চুন-কালি পড়বে!

কেমন যেন ত্রস্ত কণ্ঠে কালীশঙ্কর বললেন,—ঈশ্বরের দোহাই, এমন কোন গর্হিত কাজ যেন না করিস্। আমি ভেবে ভেবে স্থির করেছি, শ্রীমন্ত পুরোহিতের ব্যাটার সঙ্গেই তোর বিয়া দেবো। ভাবিস না তুই। এ মাসেই দু'টো একটা শুভদিন আছে বিয়ার। তুই তো জানিস, বিয়া কাঁদতে লাগে কড়ি, ঘর বাঁধতে লাগে দড়ি। কথার শেষে একটু থেমে আবার বলেন,—তা হোক, তা হোক, খরচাপত্র যা লাগে আমিই দেবো।

মুখের হাসি মিলিয়ে যায় শিবানীর। মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন অন্যমনা হয়ে পড়ে কেমন! শিবানী জানে, রাজাবাহাদুর আজেবাজে কথার মানুষ নন—যা বলেন তাই করেন। মন আর মুখ তাঁর দুই-দুই নয়।

শ্রীমন্ত পুরোহিতের ছেলে! ভাবতে থাকে শিবানী এক অব্যক্ত আনন্দে। এমনই বা মন্দ কি! শিবানী বহু বার দেখেছে ঐ শ্রীমন্ত পুরোহিতের ছেলেকে। নাম তার শশীনাথ। বেশ ডাগর-ডোগর। এমন কিছু কন্দর্প না হ'লেও দেখতে সুশ্রী। যখন একজন সৎবংশের কুলীন পাত্র একান্তই দুর্লভ, তখন শশীনাথ কি-ই বা এমন অযোগ্য!

রাজগৃহেই থাকে শশীনাথ। নাটমন্দিরে প্রধান পুরোহিতের সহকারীর কাজ করে। তন্ত্রধারকের কাজ সে করে। নেহাৎ অকালকুষ্মাণ্ড নয়, পূজার মন্ত্র-তন্ত্র জানে।

—মনে ধরলো না তোর? মৃদু হেসে শুধোলেন রাজাবাহাদুর।

আবার হাসলো শিবানী। হেসে হেসে বললে,—আমি কিছু জানি না রাজা, আপনি যা বলবেন, যা করবেন তাই হবে।

আনন্দাতিশয্যে প্রসন্ন হাসি হাসলেন কালীশঙ্কর। হাসিমুখে চললেন খাসমহলের দিকে। বললেন,—বড়রাণীকে বল্‌তো, হাতের কাজ মিটিয়ে যেন আমার মহলে আসে।

সকল কথাই কানে যায় উমারাণীর। লাল রেশমের রুমাল নাকে-মুখে বেঁধে রান্না করছেন তিনি। মধ্যে মধ্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন। গত রাতে

নিজের মহলে ছিলেন না রাজা, ছিলেন রঙমহলে, ইরাণী নর্ত্তকীদের নাচ দেখছিলেন। তারপর—

আর যেন ভাবতে পারেন না উমারাণী। তাঁর কর্ণমূল উষ্ণ হয়ে ওঠে। মাথা ঝিমঝিমিয়ে ওঠে। বক্ষ-স্পন্দন দ্রুততর হয়। রাজা আহ্বান জানিয়েছেন শুনেও মন থেকে যেন খুশী হ'তে পারেন না আদপেই। মুসলমানী কুলটাদের সঙ্গে রাজা রাত কাটিয়েছেন, গা ঘিন-ঘিন করতে থাকে বড়রাণীর।

—রাজামশাই!

আবার ডাকলো শিবানী। মিহি-মিষ্ট সুরে। পিছু ডাকলো রাজার।

ফিরে দাঁড়ালেন কালীশঙ্কর। বললেন,—কি বক্তব্য শিবানী?

কালীশঙ্করের কাছাকাছি এগিয়ে যায় শিবানী। ফিসফিসিয়ে বলে,—শুনেছেন, রাজমাতা জ্ঞান হারিয়েছিলেন?

মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো যেন রাজাবাহাদুরের! খাসমহলে চলেছিলেন তিনি গদাই-লস্করী চলনে। ঘুম-ভাঙা চোখ দু'টি এখনও যেন রক্তবর্ণ হয়ে আছে। মদিরাচ্ছন্ন দৃষ্টি দুই চোখে। কোঁচা আর কাছা বেসামাল হয়ে আছে। বললেন,—কেন রে শিবানী? মা জননী কোথায়?

ইনিয়ে-বিনিয়ে শিবানী বললে,—কেন তা জানি না রাজামশাই! তেনার মহলেই আছেন রাজমাতা। মেজরাণী বললেন যে, চাঁপাডাঙা তালুক না কি জামাইয়ের নামে দানপত্তর লিখে দেবে রাজমাতা। চাঁপাডাঙা তালুক দিয়ে বিন্ধ্যবাসিনীকে রাজমাতা ফিরিয়ে আনবে।

কোন কথা বললেন না কালীশঙ্কর। যে-পথে চলেছিলেন সেই পথ ধ'রে পুনরায় এগিয়ে চললেন। রাজকুমার শিবশঙ্করও চললো পা টিপে-টিপে। ভয়ে-ভয়ে।

খানিক স্থির দাঁড়িয়ে থাকে শিবানী। আকাশ-পাতাল কত কি চিন্তা সে করে যেন! মুখের হাসি মিলিয়ে যায় কেন কে জানে? আনন্দে যেন স্তব্ধ হয়ে যায়। রাজাবাহাদুরের কথা, মিথ্যা হওয়ার নয়। রাজার যে কথা, সেই কাজ

কাঁকালে জলের ঘড়া। কেমন যেন ত্রিভঙ্গ হয়ে আছে দাঁড়িয়ে শিবানী, জলপাত্রের ভারে। কাঁকাল নাচিয়ে নিতম্ব দুলিয়ে শিবানীও চললো পুকুর-ঘাটের দিকে। কার উদ্দেশে চেঁচিয়ে বললে,—রাজার ডাক পড়েছে, হাতের কাজ সেরে যাও আগেভাগে।

রাণীর নাক-মুখ লাল রেশমের কাপড়ে বাঁধা, রান্না উচ্ছিষ্ট হওয়ার আশঙ্কায়। একেই বৈশাখের দাবদাহ বাতাস, দু'টো উনুন জলছে পাক-শালায়। ঘামে ভিজে গেছে উমারাণীর পরনের শাড়ী। মধ্যে মধ্যে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন।

খাসমহলের কোলে দরদালান। মহলে ফিরে রাজাবাহাদুর নিজ হাতে কি যন্ত্র ধ'রে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছেন সাগ্রহে। এক ফরাসী বণিকের কাছ থেকে রাজা কিনেছেন এই যন্ত্র। দূরবীক্ষণ যন্ত্র, দূরের বস্তু বৃহদাকার হয়ে নিকটে চলে আসে এই যন্ত্রে চোখ রাখলে। লম্বা এক টেলিসকোপে চোখ রেখে কালীশঙ্কর দেখছেন তাঁর খাসমহলের দালান থেকে। দেখছেন রাজ-গৃহের শেষ-সীমানা। টেলিসকোপে রাজা দেখলেন, দূরে বহুদূরে, উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে কুস্তিগীররা তস্‌লিম্ ঠুকছে। একেকজন পালোয়ান তিন তিনটে তসলিম ঠুকছে পর পর। গায়ে মাটি মেখেছে তারা। কেউ শুধু লাঠি, কেউ ঢাল আর লাঠি হাতে লড়াই করছে পরস্পরে। কেউ কেউ শুধু হাতে কুস্তির প্যাঁচ কষছে। কারও কারও হাতে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বাঁকা তরোয়াল, অসিযুদ্ধ শিক্ষা করছে।

টেলিসকোপ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছেন তো দেখছেনই। অশ্বশালা ধরা পড়েছে যন্ত্রমুখে। রাজাবাহাদুর বড়ই অশ্বপ্রিয়। ইরাক, রুম, তুর্কিস্থান, বদক্সান, সিরবান আর তিব্বত থেকে ভাল ভাল ঘোড়া আমদানী করিয়েছেন ভারতের কচ্ছ আর সিন্ধু থেকে অশ্ব আনিয়েছেন। বাঙলার উত্তর ভাগ কোচের অশ্ব আর পাহাড়ী ভুটিয়া অশ্বিনীর গর্ভজাত টাঙ্গন অশ্ব সংগ্রহ করেছেন। পালক সহিসদল অশ্বসমূহের সেবা-পরিচর্য্যায় রত।

—আমাকে দেখাও বাবামশাই! রাজকুমার শিবশঙ্কর আবদারের সুরে কথা বলে।

খুশীর হাসি হাসলেন রাজাবাহাদুর। একজন খানসামাকে হুকুম করলেন। বললেন,—কুমারকে দেখাও, আমি গোসলে যাই। আর শ্রীমন্ত পুরোহিতের ব্যাটা শশীনাথকে এত্তেলা দাও, সে দরবারে হাজির হোক।

খানসামা সেলাম জানায়। রাজার হাত থেকে যন্ত্র নিয়ে শিবশঙ্করের চোখের সমুখে ধরে।

শিবশঙ্কর বললে,—আমার শিবানীপিসী পুকুরঘাটে জল তুলতে গেছে, আমি দেখবো। দেখাও আমাকে।

পুকুর-ঘাট ইদিকে নয়। রাজার খাস-মহলের পিছন দিকে। খানসামার সঙ্গে শিবশঙ্কর সেদিকে চললো।

পুকুর-ঘাটের চতুর্দ্দিকের তীরে আছে ফুলের বাগিচা। গ্রাম্ম ঋতুর ফুল ফুটেছে যত। বেল, যুঁই আর গন্ধরাজের মেলা বসেছে যেন। গাছে গাছে পাখীর সভা বসেছে। একটি আকাশছোঁয়া কনকচাঁপার গাছে লুকিয়ে পড়েছে পুকুরের বাঁধানো ঘাট, দেখতে পায় না রাজকুমার। দূরবীক্ষণে ধরা পড়ে না আর। শুধু দেখা যায়, সাজি হাতে কে যেন ফুল তুলছে পুকুরতীরে।

লালপাড় শাড়ীর আঁচল কোমরে জড়ানো। কপালে কাচপোকার টিপ। চোখে উজ্জ্বল কাজলের রেখা। আলতারাঙা পা। রুক্ষ কেশরাশি কোমর ছাপিয়ে নিতম্বে নেমেছে। বোশেখী সূর্য্যের আলোয় হাতের জলরঙ কাচের চুড়ি ঝিকমিক করছে। ঘাটের এক পৈঠায় ব'সে পড়লো শিবানী। ঘড়া নামিয়ে রাখলো পাশে।

ঘাটে চোখ পড়তেই চোখ ফিরিয়ে নিতে হয়। পুষ্প আহরণকারী অন্য দিকে চলে পুকুরতীর থেকে।

শিবানী ইতি-উতি দেখে চাপা কণ্ঠে ডাকলো,—ও শশীঠাকুর!

নিভৃতনিকুঞ্জে যেন পরমপ্রিয়ের দেখা পেয়েছে শিবানী। চাঁদের কলার মতই না কি কলঙ্কলা, দিনে দিনে বর্দ্ধিত হয়, হ্রাস পায় না। তবুও খর-নয়নের শরাঘাত হানলো শিবানী। ডাকলো ইসারায়!

শশীনাথ ফুল তুলছিল সাজিতে। সাঁঝের পূজার ফুল। ঘৃণা

নয়, লজ্জা আর ভয়ে শঙ্কিতকণ্ঠে সে বললে,—আমাকে ডাকছো কি ঠাকরুণ?

—হাঁ গো হাঁ! নয়তো এখানে আর কে আছে!

কেমন যেন মিষ্টি-মিষ্টি কথার সুর শিবানীর মুখে! দেখলে মনে হয় যেন বিরহ-ব্যাধিতে ভুগছে শিবানী। সদাই জ্বলছে বিরহানলে।

শিবানীর কালোকুটিল কেশ দেখতে দেখতে যেন বিমুগ্ধ হয়ে যায় শশীনাথ। নিঃশব্দ পদক্ষেপে এগিয়ে আসে ধীরে ধীরে।

ভঙ্গুর ভ্রূপল্লব বাঁকিয়ে, ঠোঁটের কোণে অল্প হাসির রেখা ফুটিয়ে শিবানী বলে,—শুনেছো ঠাকুর, তোমার বিয়ার লগন ঘনিয়ে আসছে।

পুরুষ, তবুও লজ্জা নামে। শশীনাথ চোখ নামালো মাটীতে। কেমন যেন অপ্রস্তুততার ছায়া তার চোখে-মুখে। রাজগৃহের আশ্রিত শশীনাথ, মুখে তার কথা ফোটে না। পুরুষানুক্রমে যাজনিক কর্ম্ম করছে। কুলীন ব্রাহ্মণ, গ্রাসাচ্ছাদনের আশায় যেন ক্রীতদাস পরিণত হয়ে আছে। সত্তা হারিয়ে মুখের কথা পর্য্যন্ত যেন থেমে গেছে চিরদিনের মত।

মুখ টিপে-টিপে হাসছিল শিবানী। পানলাল ঠোঁট টিপে-টিপে। তার হৃদয়দেশে যেন হঠাৎ প্রলয় শুরু হয়েছে, রাজার কথা শুনে।

শশীনাথ নতদৃষ্টিতে থাকে। বলে,—আমি এখন যাই ঠাকরুণ?

সুধা-মধুর ধ্বনিতে বললে শিবানী, ইদিক-সিদিক দেখতে দেখতে বললে, —বিশ্বাস করলে না আমার কথা?

চোখ তুললো শশীনাথ। লজ্জানম্র দৃষ্টি তুললো। গন্ধরাজ গাছের এক রসাল শাখা সমুখ থেকে সরিয়ে দিয়ে বললে,—আমি তো কিছুই জানি না ঠাকরুণ!

আঁখি তারকা হেসে উঠলো যেন শিবানীর। বিরহপাণ্ডুর আকৃতি মুখের, কিন্তু বসন্তের বনবেতসলতার মত পল্লবিত দেহলতা। ক্ষণেকের জন্য যেন শিবানী ভুলে যায় কলিকলুষ ভয়। তার হৃদয়-কবাটের অর্গল খুলে যায় হয়তো। কটাক্ষশর সে হানে। ইদিক-সিদিক দেখে বিমুক্তবাধা হয় যেন!

পৈঠা থেকে উঠে আসে ঘাটের চাতালে। মুখের হাসি লুকিয়ে বলে,—তুমি জানবে কোত্থেকে! রাজামশাই জানেন, আর আমি জানি।

শশীনাথ আবার নতদৃষ্টি হয়। লজ্জায় কেমন যেন অধীর হয়ে ওঠে। চোখ তুলে তাকাতে পারে না ঐ দিক—সুন্দরীর প্রতি। অস্ফুট তার কথার সুর। শশীনাথ বললে,—আমি তবে যাই ঠাকরুণ?

একেই তনুদাহে জ্বলছে শিবানী। মিলন-বঞ্চনায় কাতর হয়ে আছে কত কাল! শশীনাথের কথা শুনে বিরক্ত হয় সে। বিলাস লালসায় শিবানীর ভয়ভঞ্জন হয়ে গেছে আজ। কথায় কথায় কৃত্রিম রাগ ফুটিয়ে বললে,—কার সঙ্গে বিয়া হবে শুনবে না?

চোখ তুললো শশীনাথ। কেমন যেন এক শঙ্কামিশ্রিত কৌতূহল ফুটলো চোখের দৃষ্টিতে।

লোকলজ্জা, পরিজন-পরিহাস, কিছুই যেন মনে থাকে না। মুগ্ধবধূ শিবানী, ঘাটের চাতাল থেকে পুকুর-তীরের মাটিতে গিয়ে দাঁড়ায়। শশীনাথের সামনাসামনি চোখের চাউনিতে এক অসহ্ মর্ম্মব্যথা ফুটিয়ে বললে,—তোমার বিয়া হবে এই চলতি মাসেই। আমার সঙ্গে বিয়া হবে, রাজামশাই বলেছেন।

শশীনাথ অবিচলিত। মুখে তার কথা নেই। দেহে যেন স্পন্দন নেই। শিবানীর মুখপদ্মে দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে। শশীনাথের হাতের সাজি থেকে না; বাগিচা থেকে পুষ্পসৌরভ ভেসে আসছে। বৈশাখের তপ্ত হাওয়ায় বেলফুলের মিষ্ট সুগন্ধ ভাসছে।

শিবানী যেন আজ বিগলিতলজ্জা! সরমের বালাই ঘুচে গেছে। বাসনা-বন্ধে বাঁধা পড়েছে যেন। শিবানী বললে,—অমত করবে তুমি শশীঠাকুর?

শশীনাথ নিরুত্তর। চাঁপা গাছের শাখা থেকে কনকচাঁপার একটি কি দু'টি কলি খসে পড়লো শশীনাথের দেহে। গাছের শাখায় পাখীর চাঞ্চল্যে ফোটাফুলের পাপড়ি ঝ'রে পড়লো।

—কথা কও না কেন?

—আমি তো কিছুই শুনি নাই ঠাকরুণ!

—আমি তো তোমাকে শুনিয়েছি। বিশ্বাস হয় না?

—দেশে মা আছেন আমার, তিনি যা বলবেন তাই হবে।

—দেশ কোথায়?

—ত্রিবেণীতে। গঙ্গার অপর পারে।

—রাজার আদেশ, তোমার মা কি অমান্যি করবে?

—জানি না ঠাকরুণ! আমি এখন যাই।

—ভয় পাও কেন? কে আছে হেথায়? গাছপালা কি কথা কয় কলঙ্ক ছড়াবে?

—কেউ যদি দেখে তো আমার তিন পুরুষের কর্ম্মটা ছাড়তে হবে যে! কথা বলতে বলতে শশীনাথের লজ্জা আর ভয় কিঞ্চিৎ অপসৃত হয়। পূর্ব্বাপেক্ষা সহজ স্বরে কথা বলে যেন। পলকহীন চোখে দেখে শিবানীকে। রত্নাভরণ-পারিপাট্য নেই শিবানীর দেহে, নেই পোষাকের বাহার, তবুও কত রূপ শিবানীর! আঁটসাঁট গড়ন, দুধের মত দেহবর্ণ, কালোকুটিল কেশ। চোখে কাজলের উজ্জ্বল রেখা। পায়ে আলতা।

শিবানীও তাকিয়ে থাকে অনিমেষ চোখে। উচানো মুখে যেন আবেদনের কি এক আকুলতা! চোখের কোণে যেন সহসা জলদাভা ফুটলো; ক্ষণেক স্থির দৃষ্টিতে থাকতে থাকতে মাটির 'পরে নতজানু হয়ে বসে পড়ল শিবানী। কোমরে জড়ানো অঞ্চল খুলে গলবস্ত্র হয়ে যুক্ত করে বললে,—তোমার পায়ে আমাকে স্থান দাও।

দ্বিধাজড়িত কণ্ঠ শশীনাথের। ভয়ার্ত্ত চাউনি যেন চোখে। চতুর্দ্দিকে সন্ধানী দৃষ্টি ফিরিয়ে বললে, অমত নাই আমার, তবুও মাতৃবাক্য শিরোধার্য্য যে!

হর্ষাশ্রু ঝরলো যেন শিবানীর চোখের প্রান্ত থেকে। শশীনাথ দেখলো, আবার দেখলো, আবার দেখলো বিলুলিতকেশা ঐ কুমারী-যুবতীকে। দেখলো তার তনুলতা, পুষ্প আর পত্রভারে যেন ঈষৎ আনত। শিবানী মাটিতে মাথা রেখে প্রণাম করলো ভক্তিভরে।

বাগিচার শুষ্কপত্র মর্ম্মরিত হয়। তপ্ত বাতাসে হয়তো শুকনো পাতা খড়মড় করে। শিবানী মাথা তুলে দেখলো কেউ নেই সমুখে। শশীনাথ নেই। খানিক স্তব্ধ থেকে শিবানীও উঠে দাঁড়ালো। গাছে গাছে শুধু পাখীদের সভা বসেছে।

হঠাৎ চোখ পড়লো শিবানীর। পাকশালার গবাক্ষ থেকে কে যেন দেখছিলেন সহাস্তে, এই মধুমিলন লীলা। চোখাচোখি হ'তেই গবাক্ষ থেকে সরে গেলেন সলাজে।

জিব কাটলো শিবানী। পাটরাণী উমারাণী হয়তো লুকিয়ে থেকে দেখেছেন যত কিছু। কাঁকালে ঘড়া তুলে তরতরিয়ে জলে নামলো শিবানী। ঘাটের জল তরঙ্গ তুললো।

—বড়রাণী!

লজ্জা জয় ক'রে পাকশালের দুয়ার থেকে ডাক দেয় শিবানী। প্রায় শুষ্ক কণ্ঠে।

উমারাণীর মুখ লাল রেশমের বস্ত্রখণ্ডে ঢাকা। তবুও দেখলে বেশ বোঝা যায় যে, সেই মুখে পরিহাসের মিষ্ট হাসি। কথা নেই মুখে, নীরব ইশারায় সাড়া দিলেন বড়রাণী।

—রাজামশাই যে ডেকে গেল, কানে তুললে না?

শিবানী কথা বলে অভিযোগের সুরে। কাঁকালের ঘড়া নামিয়ে রাখে। পাকশালের বাইরের দালানে। রান্নার শেষে বড়রাণী হাত-পা ধৌত করবেন ঐ জলে।

হাতের কাজ হয়তো শেষ হয়েছিল! রেশমের বস্ত্রাবরণ খুলে ফেললেন উমারাণী। হাসতে থাকলেন খিল-খিল। হাসতে হাসতে বললেন,—ভাগ্যিস যাইনি আমি। গেলে কি আর দেখতে পেতুম এই রাসলীলা?

লজ্জায় ম'রে যায় যেন শিবানী। ক্রোধের ভাব ফোটে তার আরক্ত মুখে।

হাসবে না রাগবে, ভেবে পায় না যেন। এক দৌড়ে পালায় দালান থেকে। বড়রাণীর খিল-খিল হাসি যেন থামতে চায় না।

মুখে হাসি, কিন্তু বুকে যেন খড়ের আগুন জ্বলছে। রাজার নাচঘরে মুসলমানী নর্তকীরা আশ্রয় পেয়েছে, ভাবতে ভাবতে কেমন যেন দিশাহারা হয়ে পড়েন বড়রাণী। হাতের কাজ কোন রকমে শেষ ক'রে পাকশালের দুয়োরে শিকলি তুলে দিয়ে রাজার মহলে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। রাজা ডেকে গেছেন, নিজে এসে, তবুও খুশী হ'তে পারেন না উমারাণী। রাজমহলে যাওয়ার আগে নিজের খাসমহলে যেতে হয়। তসরবস্ত্র প'রে-ছিলেন। পাকশালের কাজকর্ম্মে তসরের শাড়ী হলুদ আর মশলায় অপরিচ্ছন্ন হয়েছে। বস্ত্র পরিবর্ত্তন করতে হবে।

পাটরাণীর খাসমহল আগলে বসেছিল ক'জন দাসী। খাসমহলের দ্বার-রক্ষার কাজ করে। কত মূল্যবান দ্রব্যসম্ভার আছে রাণীর মহলে। কত মহার্ঘ অলঙ্কার। পোষাক-পরিচ্ছদ। পাটরাণীর অনুচর দাসী, প্রত্যেকে সুসজ্জিতা। রূপের জৌলুশ না থাক, রৌপ্যালঙ্কারের চাকচিক্যে ঝলমল করে দাসীদের কালো রূপ। দাসীদের হাতে রূপার বলয়, কঙ্কণ, চৌদানী; কোমরে কোমরপেটী; পায়ে আরবেঁকি; বাহুতে কাটাবাজু; গলায় গুঞ্জাফলের মোহনমালা। গাত্রচর্ম্মে অঙ্কিত উল্কি আর গোধানি।

পাটরাণীকে আসতে দেখে দাসীরা উঠে দাঁড়ায়। সেলাম জানায় পুরুষালি ঢঙে। রাণীর গম্ভীর মুখ দেখে কেউ আর কোন কথা কয় না। পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ায়। মধ্যাহ্নের সূর্য্যালোকে রূপার অলঙ্কার রূপালী চেকনাই ছড়ায়।

কটি ও কোমরে ব্যথা ধ'রে গেছে বড়রাণীর। রন্ধনকার্য্য করতে করতে কোমর কনকনিয়ে উঠেছে। একটি রূপার কেদারায় শ্রান্ত দেহে ব'সে পড়লেন উমারাণী। আঁচলে চেপে মুখের আর বুকের ঘাম মুছলেন।

কোথা থেকে মৃদুমন্দ বীণার ঝঙ্কার ভেসে আসছে। কাছাকাছি কে কোথায় বীণা বাজিয়ে চলেছে মধুর সুরে। বৈশাখের খররৌদ্র দিকে দিকে।

বাতাসে যেন আগুনের প্রবাহ বইছে। বীণার একেক ঝঙ্কারে যেন কেঁপে উঠছে রৌদ্ররশ্মি।

পাটরাণীর মহলের পাশে মেজরাণী আর ছোটরাণীর মহল। সর্ব্বমঙ্গলা আর সর্ব্বজয়ার মহল। বেশ আছে ওরা, ভাবছিলেন উমারাণী। সুখ আর দুঃখের বালাই নেই, আছে যেন নিস্পৃহ সন্ন্যাসিনীর মত। ভাবনা-চিন্তা নেই, চোখ-কানও নেই কোন কিছুতে। মেজ আর ছোটরাণীও শুনেছেন, নাচ-ঘরে ইরাণী নর্ত্তকীরা এসেছে। শুনে কেউ বিচলিত বা মর্ম্মাহত হননি, যেমনটি হয়েছেন বড়রাণী। বেশ আছে ওরা, পূজাপাঠ, গালগল্প, আর গান-বাজনা নিয়েই মেতে আছে, ভাবছিলেন উমারাণী। ক্লান্ত চোখে তাকিয়ে ছিলেন রূপালী আকাশের দিকে। ছোটরাণীর মহল থেকে বীণার ঝঙ্কার ভেসে আসছে। আপন চেষ্টায় সর্ব্বজয়া বীণা বাজানো শিখছেন। সময় নেই, অসময় নেই, বীণা বাজাতে বসেন তাই। কে শোনে তার ঠিক নেই, ঘুম-পাড়ানো সুর বাজিয়ে চলেন প্রহরের পর প্রহর। সর্ব্বজয়া নিজেই সুর বাঁধেন, নিজেই সুর সাধেন।

বেশ সুখে আছে ওরা দুইটি বোনে। সংসারের প্রতি দৃষ্টি নেই, রাজার প্রতি ওদের অনুরাগ আছে কি না তাও বুঝা যায় না, ধনরত্নের লোভ নেই বললেই হয়—কত কথা ভাবতে থাকেন বড়রাণী। অলস মধ্যাহ্নে বীণার মিষ্টি সুর শুনতে শুনতে কেমন যেন উদাস হয়ে থাকেন। কত কথা মনে পড়ে তাঁর, ভবিষ্যতের কথা। তাঁর একমাত্র সন্তান রাজপুত্র শিবশঙ্করও যদি ভবিষ্যতে রাজার গুণাবলী অধিকার করে! ভাবতে যেন শিউরে ওঠেন পাটরাণী!

সর্ব্বজয়া এখন টোড়ীতে বীণা বাজিয়ে চলেছেন। এই মধ্যাহ্ন-বেলায়, এখনই নাকি টোড়ী বাজানোর যথাসময়। সূর্য্যোদয়ের পর গান্ধার, খট্ট কিংবা কালাংড়া সুর ধরেন ছোটরাণী। দিবাভাগে মূলতানী বাহার কিংবা রামকেলী ললিত। সন্ধ্যার পরে ইমন কল্যাণ, শ্যাম পূরবী, গৌরী, খাম্বাজ কিংবা গান্ধার। রাতে ধরেন হিন্দোল। মধ্যরাতে পরজ, সিন্ধু কিংবা মালকোশ।

রাগ-রাগিণীতে সর্ব্বজয়ার অসাধারণ দক্ষতা। তাই যেন তিনি সদাস্থির, সুর-গম্ভীর।

রাজার কক্ষে মন্ত্রের গুঞ্জন চলেছে। পবিত্র গায়ত্রীমন্ত্র আওড়াচ্ছেন রাজাবাহাদুর। দীক্ষার বীজমন্ত্র উচ্চারণ করছেন। মেঘ ডাকছে যেন গুরু-গুরু। কালীশঙ্করের কণ্ঠে যেন মেঘনাদ করছে। উপবীত জড়ানো করাঙ্গুলিতে মন্ত্র গুণছেন। স্নানের শেষে প্রথম সন্ধ্যা করছেন এতক্ষণে।

উমারাণী কক্ষের বাইরে অপেক্ষা করেন, পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে। মন্ত্র-পাঠ শেষ হোক, সন্ধ্যা-বন্দনা চুকে যাক, তারপর দেখা দেবেন। পরিধানের বস্ত্র পরিবর্ত্তন করেছেন তিনি। তসর ছেড়ে পরেছেন পাছাপাড়ের শান্তিপুরী রাজার প্রাতরাশ সাজিয়ে রেখে এসে দাঁড়িয়েছেন রাজদ্বারে। আশপাশে চাপরাশী আর খানসামারা ঘোরাফেরা করছে, বড়রাণী তাই গুণ্ঠন টেনেছেন চিবুক পর্য্যন্ত।

সহসা ঘড়িতে ঘণ্টা বাজলো ঘন ঘন। রাজাবাহাদুর ঘড়ি পিটলেন চাপরাশি আর খানসামাদের পরিবর্ত্তে পাটরাণী প্রবেশ করলেন।

রাজার কক্ষ প্রায়-অন্ধকার। বাতায়নে খসখস ঝুলছে। কালীশঙ্কর মহলে ফিরতেই খসখস ভিজিয়ে দেওয়া হয়েছে পিচকারীর জলে। বাতি জ্বলছে সোনার ক্যাণ্ডেলেব্রায়। রাজাবাহাদুরের রক্তলাল দীর্ঘ চোখে বাতির আলোর ছায়া পড়েছে।

—রাজাবাহাদুর!

কাঁপা-কাঁপা স্বরে ডাকলেন বড়রাণী। ব্যথিত-চিত্ত রাণীর, তাই কণ্ঠ যেন কাঁপছে।

ফিরে তাকালেন কালীশঙ্কর। চক্ষু বিস্ফারিত করলেন। কি ভয়ঙ্কর চাউনি রাজার রক্তিম চোখে! চোখের মণি দু'টি কত বেশী উজ্জ্বল! যেন দু'টি অগ্নিগোলক!

—প্রাতরাশে বসবেন চলুন—আবার কথা বললেন বড়রাণী, ঈষৎ স্পষ্টস্বরে

—চল যাই। বড়ই ক্ষুধার্ত্ত আমি।

রাজাবাহাদুর দুলিচা থেকে উঠে দাঁড়ালেন অতি কষ্টে। একেই গুরুভার শরীর, ওঠা-বসায় বড়ই ব্যাঘাত হয়। গতরাতের নেশাও যেন অবশ ক'রেছে দেহ। রাজা বললেন,—রাজমাতা কি অসুস্থা উমারাণী ?

—হাঁ রাজাবাহাদুর! বড়রাণী চাপাকণ্ঠে বললেন। জ্ঞান হারিয়েছিলেন নাটমন্দিরে যেতে যেতে। এখন সুস্থ হয়েছেন।

—আমার কি কর্ত্তব্য বড়রাণী ?

নেহাৎ শিশুর মতই যেন প্রশ্ন করলেন রাজাবাহাদুর। গায়ে আংরাখা চাপাতে চাপাতে বললেন।

—কি আর কর্ত্তব্য রাজাবাহাদুর! স্নেহভরা কথার সুর উমারাণীর। বললেন,—একবার দেখা দেওয়া ছাড়া আর কি কর্ত্তব্য ? আপনি তো প্রতি সকালে রাজমাতাকে প্রণাম করতে গিয়েই থাকেন।

—ঠিক কথা, ঠিক কথা। বললেন কালীশঙ্কর। মনে ছিল না তাঁর। বড়রাণী বলতেই মনে পড়লো যেন। বললেন,—রাজমাতা কি এখন তাঁর মহলেই আছেন ?

—হাঁ রাজাবাহাদুর! অন্য দিন তিনি স্বয়ং এসে দর্শন দেন, আজ বোধ হয় তা আর পারবেন না, শরীর বইবে না।

—আমিই যাই তবে। কবরেজ মশাইকে ডাকবো না কি বড়রাণী ?

—আপনার যা ইচ্ছা রাজাবাহাদুর, আমি কি বলি ?

রাজা কক্ষ থেকে বেরুলেন। জরিদার নাগরা জুতোর শব্দ মচমচিয়ে উঠলো দালানে। বড়রাণীও চললেন পেছনে। চাপরাশি আর খানসামারা আশ-পাশে রয়েছে, তাই আবার গুণ্ঠন টানলেন।

কুঠরীতে খিল দিয়েছেন রাজমাতা বিলাসবাসিনী। সেই যে নাটমন্দির থেকে ফিরে ঢুকেছেন, আর একটি বারও বাইরে দেখা দেননি তারপর থেকে।

কেমন যেন স্তম্ভিতমিত হয়ে আছেন। ডাকলে সাড়া মিলছে না। ডাকলে বিরক্ত হয়ে উঠছেন।

—মা জননী কৈ ?

কুঠরীর বাইরে থেকে জলদগম্ভীর স্বরে ডাকলেন রাজাবাহাদুর। বললেন, —পায়ের ধূলা দেও। মুখে দিয়ে জীবন সার্থক করি।

যতই হোক গর্ভজাত সন্তানের ডাক। আচ্ছন্ন হয়ে থাকলেও রাজমাতার কানে পৌছায়। মাথা তুললেন বিলাসবাসিনী। ধীরে ধীর উঠে বসলেন। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন,—আমাকে তুমি ছুঁয়ো না রাজাবাহাদুর। ঐ দূর থেকেই হোক। আমিও আশীর্ব্বাদ করি, দীর্ঘজীবী হও।

—কিং মে অপরাধম্ ? কি দোষ করেছি জননি ?

মায়ের কথায় কালীশঙ্কর কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। এমন কথা শুনবেন, আশা করতে পারেন নি যেন। তবুও মাতৃআদেশ অমান্য করলেন না। দূরে থেকেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানালেন। এইটুকু পথ হেঁটে আসতেই ঘেমে উঠেছেন রাজা। কর্ণমূল তাঁর লাল হয়ে উঠেছে।

বিলাসবাসিনী বললেন,—হিঁদুর ঘরে বুঝি আর মেয়ে পেলে না তুমি ? মুসলমানী দু'টোকে ভিটেয় এনে তুললে ? বাস্তু অপবিত্র করলে ?

রাজবাহাদুর, যাঁর এত দাপট আর হাঁক-ডাক, তিনিও কি না লজ্জায় মাথা নত করলেন ! ভূমিতে চোখ নামালেন। বড়রাণী উমারাণীর মনের কোণেও যেন ঠিক এই প্রশ্নই উঁকিঝুঁকি দেয়, কিন্তু তিনি তো আর সাহসভরে বলতে পারেন না কোন কথা। উমারাণী সাগ্রহে লক্ষ্য করেন রাজার মুখাকৃতি। গুণ্ঠনের আড়াল থেকে দেখেন।

—জননি, তুমি কি চাও না আমি কিছু আমোদ-আহ্লাদ করি ? নীরব থাকতে থাকতে, অস্ফুটকণ্ঠে বললেন রাজাবাহাদুর।

বিলাসবাসিনী এতক্ষণে দৃষ্টি ফিরালেন। চাপা কথার সুর তাঁর। বললেন, —তা আমি বলতে চাই না রাজা ! যাতে খুশী থাকো তাই কর' তুমি। তবে, রূপ কি শুধু মুসলমানীদেরই থাকে ? দেশে আর মেয়ে জুটলো না ?

কালীশঙ্কর দেখলেন এপাশ-ওপাশ। চাপা কণ্ঠে বললেন,—তুমি যদি অপছন্দ করো, ওগুলানকে বিদায় ক'রে দিই!

—যা মন চায় করো, আমি কিছুই বলতে চাই না।

কথা বলতে বলতে আবার মুখ ফিরিয়ে নিলেন বিলাসবাসিনী। অন্য দিকে তাকিয়ে থাকলেন রুষ্টমুখে।

—তাই হবে, তাই হবে। তুমি নিশ্চিন্ত হও জননি! আমার প্রতি আর অপ্রসন্ন থাকো না যেন!

—শুধু বিদেয় করলেই তুমি পার পাবে না রাজা। বিলাসবাসিনীও যেন কিঞ্চিৎ সহজসুরে কথা বললেন।

—আর কি করণীয় আছে জননি?

ফিরে চলেছিলেন রাজাবাহাদুর। পার না পাওয়ার কথাটি শুনে ফিরে দাঁড়ালেন। বুকে যেন আঘাত পেলেন কি এক। বুকে না মস্তিষ্কে কে জানে!

রাজমাতা ক্ষীণ হেসে বললে,—প্রায়শ্চিত্ত করাতে হবে যে! নয়তো এ ভিটে আর পবিত্র হবে না তোমার।

—তথাস্তু, তথাস্তু!

আর এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে ফিরে চললেন রাজাবাহাদুর। নাগরা জুতোর মচমচ শব্দ তুলে চললেন গদাই-লস্করী চলনে। ঘামে ভিজে গেছে কালীশঙ্করের প্রশস্ত কপাল। মধ্যাহ্নের বাতাস চলেছে এলোমেলো! আগুনের স্পর্শ দিয়ে যায় যেন খর হাওয়া।

সবচেয়ে বেশী চিন্তামুক্ত হন পাটরাণী। সর্ব্বাধিক খুশী হন তিনিই। বুক থেকে যেন তাঁর কিসের ভার নেমে যায়।

—রাজাবাহাদুর, আবার যে রাজমাতা আপনাকে ডাকেন! পেছন থেকে অনুগামিনী উমারাণী কথা বললেন মিহিকণ্ঠে!

—আবার কি বলেন কে জানে! কথা বলতে বলতে আবার ফিরলেন কালীশঙ্কর। কুঠরীর দুয়োরে ফিরে এলেন। বললেন,—কি আদেশ জননি?

আসনপিঁড়ি হয়ে গুছিয়ে বসলেন রাজমাতা। কেমন যেন অস্বাভাবিক

দৃঢ়কণ্ঠে বললেন,—তোমরা তো আমার বিন্ধ্যবাসিনীর সোয়ামীকে কিছুই দিলে না। আমি আমার চাঁপাডাঙ্গা তালুক তার নামে সনদ ক'রবো। দানপত্র লিখিয়ে দেবো।

—অতঃপর তোমার দিন চলবে কোথাকার আয়ে?

—না খেয়ে মরতে হয়, তবুও। এ-কথা আমি তোমার সহোদর কুমার বাহাদুরকেও জানিয়ে দিয়েছি। তোমাকেও ব'লে রাখছি।

—কাশীশঙ্কর কি বলেন।

—সে কি বলবে? আমার নামে তালুক। আমাকে দিয়ে গেছে আমার রাজা। আমি যদি দান করি তো কার কি বলার থাকে?

—চাঁপাডাঙ্গা তালুকের বৎসরান্তে আয় যে অনেক টাকা!

কালীশঙ্কর যেন আপন মনেই বললেন কথাগুলি। কা'কেও শুনিয়ে ন নিজেকে শোনাতেই বলেন যেন।

—আর যাই হোক না কেন। আমার তো আর দশটা পাঁচটা নেই, মো ঐ একটা। সে যদি সুখী না হয়, কেঁদে-ককিয়ে দিন কাটায়, তার চো আমার যে মরণ ভাল!

—যদিচ্ছা তোমার। ক্ষণেক থেমে আবার রাজাবাহাদুর বললেন,— অ কিছু বলবে তুমি? আমি এখনও অভুক্ত আছি জননি, আজ দেখি পিতৃর আর হয় না।

—আর কি বলার আছে! কিছুই নেই! কাশীশঙ্কর! তার বলার ধ ধারে কে! বিলাসবাসিনী বলতে বলতে আবার শয়নে উদ্যোগী হ'লেন।

ঈষৎ বিরক্ত হয়ে প'ড়েছেন রাজাবাহাদুর। হন্তদন্ত হয়ে আবার ফি চললেন তিনি। মনের ভাব ফুটলো যেন রাজার পদক্ষেপে। নাগরা জুতোর মচমচানি আওয়াজে। চলতে চলতে বললেন,—বড়রাণী, ছোটকুমারকে এত্তেলা দিতে বলতো। কালীশঙ্করকে ডাকাও।

—আপনি আগে মুখে জল দিন রাজাবাহাদুর! বেলা অনেক হয়েছে। উমারাণীর কথা যেন মিনতিপূর্ণ। আবেগময়। চোখে যেন ভয়ভীরু চাউনি।

রাজা বললেন,—তা মুখে আমি জল দেবো, তুমি কারেও হুকুম কর এখনই। আসুন ছোটকুমার। কথা আছে জরুরী।

বড়রাণী বললেন,—আগে চলুন, আপনাকে প্রাতরাশে বসিয়ে আসি। তারপর হুকুম পাঠাবো'খন।

কুমার কাশীশঙ্কর তখন মুক্ত প্রাঙ্গণে। গৃহলগ্ন বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের শেষসীমায় মাটির বাঁধ বাঁধিয়েছেন কুমারবাহাদুর। মাটির পর্ব্বত বানিয়েছেন যেন। বন্দুক ছোঁড়া অভ্যাস করছেন কাশীশঙ্কর।

একটি গাছের গুঁড়িতে বেঁধেছেন বন্দুক—কারুকার্য্যখচিত। দড়ি দিয়ে বেঁধেছেন আষ্টেপৃষ্ঠে। অভ্যাস আয়ত্ত হ'লে বুকে তুলে দাগতে শিখবেন। এখন শুধু টিপ-দাগা অভ্যাস করছেন। তাই স্যুটিং টারগেটের বাঁধ বাঁধিয়েছেন। মাটির পাহাড়ের বুকে ঝুলছে ডিস্ক, রঙ-দাগানো গোল চাকতি। 'বুলস্ আই' তাক ক'রে বন্দুক দাগছেন কুমার। আকাশে গর্জ্জন ভাসছে বন্দুকের। বারুদের ধোঁয়ার গন্ধ বইছে হাওয়ায়। ওয়াস্‌আউট হয়ে যাচ্ছে। কখনও ইনার আর কখনও আউটার চিহ্ন বিঁধছে, কিন্তু 'বুলস আই' বিঁধছে না একবারও। কোথায় দাগলো গুলী। কোথায় লাগলো! ইনার, ম্যাগপাই না আউটার চিহ্ন বিঁধলো! না কি ওয়াসআউট হয়ে বেরিয়ে গেল বারুদের স্তূপ!

একেক গর্জ্জনে ভীরুপাখীর ঝাঁক উড়ে যায় আকাশে।

কাশীশঙ্করের চোখ নেই কোন দিকে। তাঁর চোখ শুধু ঐ দূরের ঝুলন্ত চাকতির 'বুলস্ আই' দেখছে। থেকে থেকে গুম্-গুম্ ধ্বনির প্রতিধ্বনি ভাসছে দূর-আকাশে।

—মাঠাকুরাণী আদেশ করেছেন, প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে! কথা বলতে বলতে রাজাবাহাদুর সহসা হো হো শব্দে হাসতে থাকলেন। খানাঘর যেন ফেটে পড়তে চায় রাজার জোরালো অট্টহাসে। হাসির তোড়ে কালীশঙ্করের আঁখিপ্রান্ত সজল হ'য়ে উঠলো। অধিক হাসিতে কারও কারও চোখ থেকে এমন জল পড়তে দেখা যায়। প্রাতরাশের আসনে ব'সে কি যেন মনে পড়ে

যায় কালীশঙ্করের! বেলা শেষ হ'তে চললো, এখনও এক বিন্দু জল পর্য্যন্ত পান করেন নি রাজা। তবুও যে কোন বলে এই হাসি হাসছেন কে জানে? অনাহারে ক্ষুধার তাড়না নেই, রাজাবাহাদুর যেন নির্ব্বিকার। ক্ষুধা আর তৃষ্ণাকে যেন জয় করেছেন। পাটরাণী উমারাণী হাতপাখার হাওয়া দেন রাজাকে। হাসি শুনতে শুনতে তিনিও কিঞ্চিৎ বিচলিত হয়ে ওঠেন, কিন্তু মুখে কিছুই প্রকাশ করেন না। বড় মানুষের উপপত্নী রাখা আর সময়ে সময়ে বাঈ আর নটীদের নাচিয়ে-গাইয়ে রঙ্গলীলা করা অত্যন্ত সাধারণ ব্যবহারের মতই গণ্য করা হয়। তাতে কেউ দোষ জ্ঞান করে না। জলপাত্র আর সেবাদাসী না থাকলে বা না রাখলে ধনীদের সম্মানের হানি হয়, সমাজে ঠাঁই হয় না। রাজাবাহাদুর কালীশঙ্কর এত থাকতে দু'জন মুসলমানীকে কেন যে নাচঘরে তুললেন, কেউ ভাবতে পারে না। উমারাণী যেন দুশ্চিন্তায় স্তব্ধ হয়ে আছেন। মুসলমানী দু'টি রাজগৃহের তল্লাট থেকে বিদায় না হওয়া পর্যন্ত বড়রাণী যেন স্থির হ'তে পারছেন না। রাজকুমার শিবশঙ্কর তার সমুখে দেখে যদি এই আদর্শ, তবে তো তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার বলতে হবে। উমারাণী তাই এ হাসি শুনে হাসতে পারেন না, আরও গম্ভীর হয়ে ওঠেন।

খানাঘরে আরও যেন কারা এসে দাঁড়িয়েছেন। মেজরাণী আর ছোটরাণী ছুটে এসেছেন, রাজাবাহাদুর প্রাতরাশে বসেছেন শুনে। চোখের ইশারায় কি যেন বললেন পাটরাণী। অন্য দুই রাণীকে কি যেন ইঙ্গিত করলেন। কত যেন ভয়ে ভয়ে একপাশে চুপচাপ ছিলেন দু'জনে। সাহসে ভর দিয়ে মেজরাণী সর্ব্বমঙ্গলা মৃদুকণ্ঠে বললেন,—রাজাবাহাদুর, খাওয়া স্থগিত রাখলে কেন? কিছু মুখে দিন।

—অ্যাঁ! বললেন কালীশঙ্কর। চোখ ফিরিয়ে দেখে বললেন,—কে মেজরাণী!

—হাঁ রাজাবাহাদুর। সর্ব্বমঙ্গলা বলেন,—আপনার তরে আমরাও যে এখনও অনাহারে আছি।

—আর ছোটরাণীও যে দেখি এসে হাজির হয়েছো!

কথা বলতে বলতে কালীশঙ্কর আহারপাত্রে হাত ছোঁয়ালেন। মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে বললেন,—আমি এক মহাপাতক! তাই যদি না হই তোমাদের কি উপোষী রাখতে পারি কখনও!

রাণীরা পরস্পর মুখ-চাওয়াচাওয়ি করলেন। ছোটরাণী সর্ব্বজয়া রাজার কথায় ক্ষীণ হাসলেন। বললেন,—আপনি মুখে জল না দিলে আমরা কোন উপায়ে খেতে পারি?

—এ আমার সৌভাগ্য ছোটরাণী।

কথার শেষে কি যেন মুখে তুললেন কালীশঙ্কর। কি এক মিষ্টান্ন! মুখে পুরে দিলেন গোটা একটি মালপুয়া। খেতে খেতে বললেন,—তোমরা কি দু'জনা কাঠের পুতুল যে ঠায় দাঁড়িয়ে আছো?

সলাজ হাসি হাসলেন দুই রাণী। ধীরে ধীরে বসলেন খানাঘরের এক পাশে। মেঝেয় বসে পড়লেন। মধ্যাহ্নের খরবাতাস চলেছে এলোমেলো। তপ্ত শ্বাস ফেলছে যেন প্রকৃতি। রাজার প্রশস্ত কপালে ঘামের রেখা ফুটেছে কুচানো হীরার মত। তবুও ক্ষুধাধিক্যে এটা সেটা মুখে তোলেন কালীশঙ্কর।

উমারাণী কথায় মিনতি ফুটিয়ে বললেন,—আর একখান মালপুয়া মুখে দেন রাজাবাহাদুর। ভাল লাগে না কি?

—চর্ব্বচোষ্য খাওয়ার সময় এখন নয় পাটরাণী। দরবারে যেতে হবে আমাকে। খেতে খেতে কথা বলেন রাজা। বলেন,—অনেক কাজকর্ম্ম আছে দরবারে।

—তবে ঐ মুগের বর্ফী ক'খান খেয়ে নেন। উমারাণী আবার অনুরোধ জানালেন। বললেন,—কত কষ্টে আমি তৈয়ার করেছি, আপনি যদি মুখে না তোলেন কেন মরতে দিলাম আমি পাতে!

—তবে এক আধখান খাই।

কথায় কথায় কেমন যেন অন্যমনা হয়ে পড়েন উমারাণী; প্রায়শ্চিত্তের কথায় রাজার অট্টহাসি শুনে মনে যেন তাঁর আবার বিষিয়ে উঠেছে।

রাজমাতার কাছে রাজাবাহাদুর নিজেই এই খানিক আগে বলেছেন,—'তুমি যদি অপছন্দ করো, ওগুলোকে বিদায় করে দিই।' এ কথার পর আবার কেন তবে প্রায়শ্চিত্তের কথায় হাসাহাসি করলেন রাজাবাহাদুর! মনের ভাব কি বদলে গেল ক্ষণেকে মধ্যে!

—শ্রীমন্ত পুরোহিতের ব্যাটার সঙ্গে শিবানীর বিয়া দেবো, তোমাদের মত কি তা জানাও আমাকে—কালীশঙ্কর বললেন রাণীদের মুখে চোখ বুলিয়ে। মুগের বর্ফী মুখে তুলতে তুলতে।—বেশ মানাবে ওদের দুটিকে।

উমারাণী বললেন তৎক্ষণাৎ! বললেন,—শিবানীর বিয়া আর না দিলেই নয়। মেজ আর ছোট, তোমরা কি বল?

ছোটরাণী সর্ব্বজয়া কোন বাক্যব্যয় করলেন না। চুপচাপ থাকলেন। সর্ব্বমঙ্গলা বললেন, —শিবানীর মনে ধরবে তো শশিনাথকে?

—মনে যদি না ধরে তো যা খুশী করুক। মরুক।

কথার শেষে রাজাবাহাদুর পানীয়ের পাত্র মুখে তোলেন। বললেন,—আচ্ছা এক পাপের বোঝা আমাদের স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়ে গেছেন আমাদের পিতৃদেব। ঘাড় থেকে না নামলে আমিও যে শান্তি পাই না।

রাণীরা আবার পরস্পর মুখ-চাওয়াচাওয়ি করলেন রাজার কথা শুনে। শুধু উমারাণী বললেন,—শিবানীর যে মনে ধরেছে তা আমি জানি। শিবানী রাজাবাহাদুরের কথা কখনও ঠেলতে পারবে না।

পাপের বোঝা ঐ শিবানী। রাজার কথায় যেন কি এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যের সন্ধান পাওয়া যায়। মেজ আর ছোটরাণী ভাবতে থাকেন, শিবানী কি কারণে পাপের বোঝার সামিল হয়ে আছে।

মেজরাণী সর্ব্বমঙ্গলা বলেন,—শিবানী যে ঐ শশিনাথের চেয়ে বয়সে বড়ই হবে হয়তো।

রাজাবাহাদুর বললেন,—তা হোক, তা হোক। কুলীনের ঘরে কনে যদি বয়সে বড় হয় তায় কোন ক্ষতি নাই। শিবানী তো ঠেকা-মেয়ে হয়ে আছে।

খানাঘরের দুয়োরের বাইরে, আড়ালে দাঁড়িয়েছিল শিবানী। ঘর থেকে ভেসে আসা টুকরো টুকরো কথা তারও কানে পৌঁছয়। কেমন যেন নীরব নিস্পন্দের মত দাঁড়িয়ে আছে শিবানী। পাষানের মত স্থির হয়ে আছে। অন্য দিন আহারে বসলে রাজার তরফ থেকে ডাক পড়ে শিবানীর। আজ আর ডাক পড়ছে না তার, অথচ তাকে নিয়ে আলাপ চলেছে খানাঘরে।

—এ বিয়া আমি দেবোই মেজরাণী। হোক বয়েসে বড়। তোমার আর বাধার সৃষ্টি কোরোনা। সামনের লগনেই বিয়া হবে। খরচাপত্র যা লাগে আমিই দেবো।

কথা বলতে বলতে আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন কালীশঙ্কর। খানাঘরের বাইরে বেরিয়ে দেখলেন প্রতীক্ষারতা শিবানীকে। দেখে প্রথমে ঈষৎ বিস্মিত হন। তারপর সহাস্তে বললেন,—এই তো পোড়ামুখী এখানে দাঁড়িয়ে আছে। কি রে শিবানী, ডাক না পড়লে বুঝি আসতে নাই?

কোথায় গেল শিবানীর সেই হাসি-হাসি মুখভাব। কোথায় গেল তার সেই হরিণীর মত চপলতা। অভিমানে যেন সে মুখের কথাও হারিয়েছে।

—বোবা হয়ে গেলি নাকি তুই? মুখে কথা নাই কেন? হেসে হেসে শুধোলেন রাজাবাহাদুর।

—আমি যে পাপের বোঝা রাজামশাই! প্রায় কান্নার সুরে কথা বললে শিবানী। ব্যথাহত কণ্ঠে বললে,—আমি ঘরে গেল যদি আপনার খাওয়ায় ব্যাঘাত হয়, তাই এখানেই আছি আমি।

—তোর কি দোষ শিবানী! হঠাৎ গম্ভীর সুরে বললেন কালীশঙ্কর। বললেন,—দোষ তাঁদের, যাঁরা তোকে পৃথিবীর আলো দেখিয়েছে। তোকে এনেছে এই পৃথিবীতে।

—কেন রাজামশাই? কে কি দোষ করলে তা'তো জানি না আমি!

শিবানীর সরল কথায় যেন দারুণ মনোব্যথা ফুটলো। তার চোখে অশ্রু চিকচিক করলো। ঠোঁট দু'টি থরথরিয়ে কেঁপে উঠলো। কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেলেন রাজাবাহাদুর। কোন কথাই আর বললেন না। সদরের

পথে এগিয়ে চললেন জরিদার নাগরা পায়ে গলিয়ে। চর্ম্মপাদুকার মশ-মশ শব্দ ভাসলো দালানে। দালানের শেষাশেষি পৌছে বললেন,—বড়রাণী, ছোটকুমার আসে তো দরবারে আসতে ব'ল। আমি দরবারেই আছি।

কান পেতে রাজার ঐ উচ্চরবের কথাগুলি শুনলেন উমারাণী। বললেন,—শিবানী, আয় ঘরে আয়।

চপলমতি শিবানীর চোখ বেয়ে দর দর বেগে অশ্রুপাত শুরু হয়েছে তখন। চোখে আঁচল চেপে নিঃশব্দ পদক্ষেপে দালান ত্যাগ করলো সে। কোথায় চললো কে জানে।

আবার উমারাণী ডাকলেন,—শিবানী! অ শিবানী। এত ডাকাডাকি করছি, কানে তুলবি না?

বৈশাখের মধ্যাহ্নের খর-হাওয়ার মতই এক নিমেষে কোথায় যেন উধাও হয় শিবানী। সাড়া মেলে না তার।

—ভাই!

কার কোষ্ঠীর ছক খুলে গণনায় বসেছিল মহেশনাথ। নিবিষ্টচিত্তে সাল আর তারিখের অঙ্ক কষছিল। বৃহৎ পারাশরী জ্যোতিঃ গ্রন্থের নকল পুঁথি খুলে শুভাশুভ ফলের বিচার করছে। মহেশনাথ এমনই নিবিষ্ট যে, বজ্রপাতেও হয়তো তার একাগ্রতা ভঙ্গ হবে না। নাম মহেশনাথ, কিন্তু রাজগৃহের অনেকের কাছে সে মহিষনাথ নামেই পরিচিত। কালো কষ্টিপাথরের মত শরীরের অর্দ্ধাংশ পক্ষাঘাতে বিকল। অন্ধকার কুঠরীতে তৈলপ্রদীপ পাশে রেখে আত্মমগ্ন হয়ে আছে যেন।

অনেকটা পথ ছুটে এসেছে শিবানী। মনের কষ্ট, বুকের ব্যথা জানাতে ছুটে এসেছে। হাঁপিয়ে উঠেছে তাই। ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে। সজলচোখে আবার ডাকলো শিবানী,—ভাই! ও ভাই, শুনছো।

সহোদরাকে দেখতে পেয়ে বিচার রেখে মহেশনাথ অনুনাসিক কণ্ঠে বললে,—শিবানী, বল্ দেখি তোর কোন্ রাশি?

আঁচলে চোখ মুছলো শিবানী। বললে,—আমি জানি না। জানতে
াই না। কথা বলতে বলতে ফুঁপিয়ে ওঠে শিবানী। বললে,—ভাই, চল'
ামরা এখান থেকে চলে যাই অন্য কোথাও। পাপের বোঝা হয়ে আর
াকতে চাই না।

কে কার কথা শোনে! মহেশনাথ পরাশরীয় নকল পুঁথিতে চোখ রেখে
লে,—শিবানী, তোর মিথুন রাশি। এই রাশির ফলাফল কি তা জানিস?

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে শিবানী। আঁচলে মুখ ঢেকে বললে,— পোড়া-
পাল আমার, কি বলছি আর কি শুনছো তুমি! জানতে চাই না ফলাফল।
ামার কথা কি শুনতে পাও না তুমি?

—মিথুন রাশির স্বরূপ জেনে রাখবি না? বললে মহেশনাথ। পুঁথিতে
ব গিয়ে বললে,—

প্রত্যক সমীবঃ শুকভা দ্বিপান্না।
দ্বন্দ দ্বিমূর্ত্তি বিষমোদয়োঞ্চাঃ।
মধ্যপ্রজাসঙ্গ বনস্থ শূদ্রো
দীর্ঘশ্বিনঃ স্নিগ্ধ দিনেট তথোগ্রঃ॥

শিবানী শোনে কি শোনে না। চোখে আর মুখে আঁচল চেপে দাঁড়িয়ে
ক। নিজেকে শোনাতেই বলে যেন,—দূর ছাই, আমার কি মরণও
না!

—শ্লোকের অর্থ কি তা তো জানো না? মহেশনাথ প্রশ্ন করলো আপন
চোখ ফিরিয়ে একবার দেখলো না তার একমাত্র সহোদরার চোখে
শ্রুপ্লাবন নেমেছে। কথা বলতে বলতে মৃদু মৃদু হাসে মহেশনাথ। মুখখানি
িকৃত হয়ে ওঠে সেই হাসিতে। বড় বিশ্রী দেখায় যেন। মহেশনাথ বলে,—
্লোকের অর্থ এই: মিথুন রাশি, পশ্চিম দিকস্বামী, বায়ুরাশি হরিৎবর্ণ দ্বিচরণ,
রাশি স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতি ব্যাতকস্বভাব, বিষমরাশি, মধ্যসহবাসে পরিতুষ্ট,
নধিক সন্তান, অরণ্যচারী শূদ্রবর্ণ, অতুচ্ছরবকারী, স্নিগ্ধ, দিবাবলী, ক্রুর
ভাব।

—কবে আমার মরণ হবে ব'লতে পারো ?

শিবানী কাঁপা কাঁপা সুরে কথা বললে। তার প্রতি মহেশনাথের অমনো-যোগে হতাশায় যেন ম্রিয়মান হয়ে পড়লো। ভাইয়ের কাছে নালিশ জানাতে এসে আশার আলো দেখতে না পেয়ে নিরাশায় কুঠরী থেকে ফিরে চললো।

মহেশনাথ বললে—শিবানী, তোর আয়ুগণনা করতে সাহস হয় না। তোর মধ্যমায়ুঃ! মানুষের আয়ুর্যোগ তিনটি। যথা অল্পায়ুঃ, মধ্যমায়ুঃ ও দীর্ঘায়ুঃ। এই আয়ুষ্কালের জীবনসংখ্যা যথাক্রমে বত্রিশ, চৌষট্টি এবং একশত বর্ষ।

অরণ্যে রোদন করে যেন মহেশনাথ। কত কষ্টের সঞ্চয় শাস্ত্রজ্ঞান বৃথা আওড়ায়। পক্ষাঘাতে দেহ বিকল হওয়ায়, কর্ম্মশক্তি লুপ্ত হওয়ার দুঃখে ব'সে ব'সে শাস্ত্র পড়ছে, কত কাল ধ'রে। প্রথমে দেবভাষা আয়ত্ত ক'রেছে ব্যাকরণের জটিল কুটিল বন্ধন মোচনে। কত দিবারাত প্রহরের পর প্রহর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে একলব্যীয় পাঠক্রমে। ভাষাশিক্ষার পর একে একে প'ড়ে শেষ করেছে রাশি রাশি পুঁথি। গৌড়বঙ্গে যে তত্ত্বে হদিস মেলেনি তার নথিপত্র আনিয়েছে ত্রিবেণী, নবদ্বীপ আর মিথিলা থেকে। কত স্মার্ত্ত আর পণ্ডিতের সঙ্গে পত্রালাপ ক'রেছে দিনের পর দিন! মহেশনাথের কুঠরীতে তাই আছে রাশি রাশি পুঁথি। সর্ব্ববিদ্যায় কোন নরদেহী বিশারদ হ'তে পারে না কোন কালে, যে-জন্য মহেশনাথ এখন কেবল মাত্র জ্যোতিষ দর্পণ খুলে বসেছে। আকাশের নবগ্রহের স্থিতিকালের সঙ্গে মিলিয়ে ফলিত জ্যোতিষ চর্চ্চা করছে।

কথার সাড়া মেলে না, ফিরে তাকালো মহেশনাথ। দেখলো কুঠরী শিবানী নেই। তবুও দেখলো এপাশে, ওপাশে, পেছনে। শিবানীকে দে না পেয়ে কেমন যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো মহেশনাথ। গম্ভীর অনুনাসিক কণ্ঠে আর্ত্তনাদ করলো ক্রোধের আধিক্যে! হাতের কাছে ছিল একটি কাংস জলপাত্র। রাগের বশে পাত্রটি তুলে কুঠরীর দুয়ার পানে নিক্ষেপ করলো সজোরে। জলপূর্ণ পাত্র দুয়ারে ঘা খেয়ে আছড়ে পড়লো ভূমিতে, সশব্দে।

মহেশনাথের দেহ শুধু বিকল নয়, মনটাও যেন কেমন বিকারগ্রস্ত হয়ে

ওঠে। অত্যধিক ক্রোধে বিস্ফারিত হয়ে পড়ে যেন। মহেশনাথের মনের দাড়ি-পাল্লা বে-সমাল হয়ে যায় যখন তখন।

কিছুই যেন ভাল লাগে না শিবানীর। রাজগৃহের বিপুল বৈভব, ঐশ্বর্য্যের ছড়াছড়ি, রাজকীয় কায়দা-কানুন কিছুই তার মনে ধরে না। এই বিশাল রাজপুরীকে মনে হয় যেন পাখীর খাঁচা, শাস্তিভোগের কারাগার—যেখানে থেকে থেকে কত সময়ে শিবানীর শ্বাসরোধ হ'তে থাকে। হাত পাতলেই মুখের গ্রাস মিলে যায়, বসন আর ভূষণের অভাব নেই বললেই হয়—তবুও যেন শিবানী অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। দন্ত দংশনে অধর চেপে ধ'রে, চোখের জল ফেলতে ফেলতে শিবানী যে কোথায় চ'লেছিল তা হয়তো সে নিজেই জানে না। যে দিকে চোখ পড়ে সেদিকেই ঘর, দুয়ার, দালান আর দেওয়াল। অন্দরমহল, তাই বহির্জগতের সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই। মাথার পরে দেখা যায় শুধু সাদা-নীল আকাশ, উড়ন্ত কাক-চিল, প্রখর সূর্য্য। অন্দরের যেদিকে ভাণ্ডার আর পাকশালা, সেদিকের মহলে যেতে যেতে একটি ফাঁকা দালানে কেমন শ্রান্তক্লান্তের মত ব'সে পড়লো শিবানী। আকাশে চোখ মেলে রইলো।

ধান-ভানানীরা ধান ভানছিল উঠানে। কাটুনীরা চরকার সুতো কাটছে। তিলক-কাটা ক'জন নারী ঢেঁকিশালে ধান কুটার কাজ করছিল। রাঁধুনীরা কুটনো কাটা আর বাটনা বাটার তদারক করছে। হাট-বাজার বসেছে যেন এ মহলে। দালান ক'টা যা হোক তবু ফাঁকা।

আকাশে চোখ তুলে বসে থাকে শিবানী। ব্যথিত-চিত্তের মর্ম্মব্যথা জানায় যেন আকাশকে। দুই চোখে জল টলমল করে।

একজন তিলক-কাটা বোষ্টমী হাতের কাজ ফেলে এগিয়ে আসে। শিবানীর চিবুক ধ'রে বলে,—রাধিকাসখা, তুমি হেথায় এমন একা রয়েছো যে! শরীরগতিক মন্দ নাকি?

পা ছড়িয়ে বসে আছে শিবানী। অহল্যার মত যেন পাষাণ হয়ে গেছে কি এক দুঃখে। শিবানী ভাবছে,পাপের বোঝা হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরণ বরণ ভাল। রাজপুরীর স্বর্ণথালে পোলাও কালিয়ার চেয়ে অনেক সুখের ছেঁড়া কচুর পাতে পান্তাআমানি খাওয়া। দয়াদাক্ষিণ্যের আশ্রয়ের চেয়ে গাছতলা ভাল! শিবানীর আপনজন বলতে আপন ভাই আছে। কিন্তু পূর্ণাবয়বের মানুষ বলতে পারা যায় না মহেশনাথকে। লোকসমাজে বের করা যায় না যেন ঐ বিভীষিকাকে। তাইতো শিবানীকে থাকতে হয় এই হেলা-ফেলায়।

বোষ্টমী আবার বললে,—দেখো বাছা, কথায় বলে, 'নাও, ঘোড়া, নারী, যে চড়ে তারি'। তা তোমার এত দুঃখু কেন?

এত দুঃখেও হেসে ফেললো শিবানী। কান্নার মাঝে হাসিতে বড় সুন্দর দেখায় শিবানীকে। জ্যোৎস্নার ঝিলিক খেলে যেন মেঘঢাকা চাঁদে।

বোষ্টমী বললে,—আমরা মেয়ে চিনি হাসে, পুরুষ চিনি কাশে।

ঠোঁটের কোণে হাসির জের টানলো শিবানী। চোখ মুছে বললে,—কাজে যাও গো, কাজে যাও। কে ডেকেছে তোমাকে আমার দুঃখের ভাগীদার হ'তে!

—আমাদের আখড়ায় যাবে রাধিকাসখী? কের্ত্তন শুনবে, নাচ দেখবে?

ফিসফিস কথা বললে বোষ্টমী। শিবানীর কানের কাছে মুখ এগিয়ে বললে।

—কোথায় তোমাদের আখড়া? কোন চুলোয়? রাগের সুরে কথা বলে শিবানী। অনিচ্ছায় শুধোয় যেন।

বোষ্টমী বললে,—গঙ্গার তীরে আখড়া। চিত্তেশ্বরীর মন্দিরের কাছে। নাম ভিখ্‌দাসের আখড়া। দেড়শো হ্যাড়া নেড়ী আছে ভিখ্‌দাস বাবার সেবায়।

এত কথা শুনে এত রাগেও হেসে ফেললো শিবানী। বললে,— বেশ আছি আমি। তুমি তোমার কাজে যাও। রাজমাতাকে ডাকতে হবে কি?

শিউরে উঠলো যেন বোষ্টমী। ভয়ে যেন আঁতকে উঠলো। বললে,—না না রাধিকাসখী, আমিই বরং যাই।

যেমন কার তেমনি ব'সে থাকে শিবানী। নড়নচড়ন নেই যেন তার। এত কথা শুনিয়ে গেল বোষ্টমী, তবুও এক রত্তি খুশী হ'ল না। আকাশে চোখ তুলে ব'সে থাকে সর্বহারার মত। কেমন যেন বিরহম্লান চাউনি তার দুই চোখে। এখন ঠিক এই মুহূর্ত্তে যদি একবার শশিনাথের দেখা মিলতো, ভাবছিল শিবানী। তাকে কাছে পেয়ে মনের কষ্ট জানিয়ে মন হালকা করতো। বিয়ের প্রস্তাবে শশিনাথ মানুষটার কিছু বদল হয়েছে কি না কে জানে! তার দেখা মিললে দেখে দেখে বুঝতে পারতো শিবানী, নিজের কানে শুনতো তার মুখের কথা। দেখতো শশিনাথের কিশোর-কোমল-ভয়ভীরু মুখখানি। সেই পুকুরঘাটে দু'জনের দেখা হওয়ার পর থেকে শুধু কি শিবানীর মন-যমুনায় তুফান উঠছে? না কি, শশিনাথও চিত্তচাঞ্চল্যে অস্থির হয়েছে। একটি বার যদি দেখা মিলতো শশিনাথের কোন এক নিভৃত নিকুঞ্জে। দিনের খটখটে আকাশে চোখ, কিন্তু শিবানীর চোখে ভাসছে যেন শশী—চাঁদ—শশিনাথ!

ঢেঁটড়া পিটিয়ে জানান দেওয়া হয় সদরে। জানিয়ে দেওয়া হয় রাজা-বাহাদুর দরবারে এসেছেন। দরবারের বাইরে লেগেছে রাজার সুখাসন। কালো রঙ কাহারীর দল সুখাসন ঘিরে ব'সে দাঁড়িয়ে আছে। দরবারের দুয়ারে বন্দুকধারী পাহারা পায়চারী করছে। সেরেস্তার নায়েব গোমস্তারা যাওয়া আসা করছে। দরবার-গৃহের কাছেই রাজকাছারী। সারি সারি ঘর। কাছারীর এক লৌহদ্বারযুক্ত ঘরে রাজার খাজনাখানা। এক নাগাড়ে টাকা বাজানোর ঝন ঝন শব্দ আসে খাজনাখানা থেকে। রাজার খাসমহল আর জায়গীর-জমির রাজস্ব আদায় হয় সেখানে। ক'জন খাজাঞ্চী আর তহশীলদার হিমসিম খেয়ে যায় কড়াক্রান্তি হিসাব রাখতে রাখতে। দরবারে পৌঁছে রাজা-বাহাদুর ধূপদান আর ধূনাচির সর্পগতি ধূম্ররেখা ভেদ ক'রে দেখলেন, দরবারে আজ বড় বেশী জনাগম যেন। রাজাকে আসতে দেখে যে যেখানে ছিল

আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। কেউ বললে নমস্তে, কেউ নীরবে সেলাম জানালে। কেউ যুক্ত করে থাকলো।

দরবারের প্রায় মধ্যস্থলে, পেছনে দেউলে-লাগা এক তক্তপোষে জরি আর ভেলভেটের আসন পাতা গদীতে রাজা বসতেই যে যার আসনে ব'সে পড়লো। রাজার পেছনে লাল ভেলভেটের তাকিয়া। দু'পাশে পাশ-বালিস। গদীর সুমুখে একটি হাত-বাক্স, কলমদান, মসীপত্র, সহি-মোহর আর কোষবন্দী-তরবারী।

ইদিক-সিদিক তাকিয়ে অতি নিকটেই রাজা দেখলেন, দেওয়ানজীকে। বললেন,—দেওয়ানজী, ইংরেজ কুঠি থেকে কি ঐ লাল বানর দুটো এসেছে?

—হাঁ রাজাবাহাদুর। আপনি ঠিক চিনেছেন।

দেওয়ানজী বিনম্র কণ্ঠে বললেন।

খানিক একদৃষ্টে ঐ দু'জন ইংরাজকে দেখতে দেখতে রাজাবাহাদুর সহসা গর্জন করে উঠলেন যেন উচ্চরবে। দরবার-কক্ষ গমগমিয়ে উঠলো যেন। রাজাবাহাদুর সরবে বললেন,—বেল্লিক বদখত দুটোকে হাটাও!

ছুঁচ পড়লে শব্দ হবে, এমনই স্তব্ধতা দরবারে। রাজার কণ্ঠস্বর যেন দরবারে ভেসে ভেসে বেড়ায়। যে যেমন সে তেমন থাকে নির্ব্বাকের মত।

দু'জন ইংরাজ এক সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো। বুক চিতিয়ে এক সঙ্গে স্যালুট ক'রলো; আবার বসে পড়লো বেতের মোড়াতে। কি বুঝলো কে জানে, মিটি মিটি হাসলো বোকা-হাসি!

রাজাবাহাদুর আবার যেন গর্জ্জে উঠলেন। বললেন,—দেওয়ানজী, টাকা মিটিয়েছে বানরের বাচ্চারা? আমার লোকসানের ক্ষতিপূরণ?

দেওয়ানজীর মাথা যেন কাটা যায় অপরিসীম লজ্জায়। ঐ দু'জন ইংরাজের কাছে। লজ্জা পাওয়ার অবশ্য কারণ আছে যথেষ্ট। রাজাবাহাদুরের কাছে সহজে কার্য্য হাসিল ক'রে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেওয়ানজী কিছু নগদ টাকা হস্তগত করেছিলেন ইংরেজের সুতানুটির কুঠি থেকে।

দেওয়ানজী বললেন,—ওরা সেই কথাই পেশ করতে এসেছে রাজা-বাহাদুর।

কোথা থেকে এসে রাজার হাতে পৌঁছেছে করসি-নল। দেওয়ালগিরির আলোয় রাজার হাতের মাণিক্যখচা সোনার মুখনল চক চক করছে। কালী-শঙ্কর মুখে মুখনল তুলতে উদ্যত হয়ে নামিয়ে নেন। ভৎ´সনার দৃষ্টিতে দেওয়ানজীর দিকে তাকিয়ে বললেন,—আমি কথা চাহি না দেওয়ানজী, টাকা চাহি। আমার জমি আর পুষ্করিণী বেহাত হওয়ার ক্ষতিপূরণ।

ইংরাজের সুতানুটির কুঠী উত্তরাংশে সম্প্রসারণের জন্য ইংরাজ ফ্যাক্টর একটি পুকুর বুঁজিয়ে দিয়েছে আর কুঠী-সংলগ্ন কয়েক বিঘা জমিও অধিকার করেছে। পুকুর আর জমির মালিকের বিনা অনুমতিতেই এই কাজ করা হয়েছে। এই পুকুর আর জমি রাজা বাহাদুর কালীশঙ্করের জায়গীর সম্পত্তি।

দেওয়ানজী ভয়ে ভয়ে বললেন,—ওরা বলছে হুজুর, লণ্ডনের কোর্টে লিখে পাঠিয়েছে, কোর্ট থেকে অর্ডার এলেই কড়ায়-গণ্ডায় হুজুরের পাওনা মিটিয়ে দেবে।

—জাহান্নামে যাক কোর্টে! বললেন রাজাবাহাদুর। কণ্ঠ সপ্তমে তুলে বললেন, —সঠিক কত দিন অপেক্ষা করতে পারি জানিয়ে দিক আমাকে।

রাজার একেক কথায় যেন চমকে চমকে ওঠেন দেওয়ানজী। কানে যেন তাঁর কামানের গোলা দাগছে কে! লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছেন যেন। প্রায় কেঁপে কেঁপে বললেন,—সামনের মাসেই জাহাজ এসে পৌঁছবে রাজা বাহাদুর। সেই জাহাজেই কোর্টের পক্ষ থেকে সম্মতিপত্র আসবে, আপনার টাকা মিটিয়ে দেওয়ার।

সহসা অত্যন্ত ধীরকণ্ঠে কথা বললেন রাজাবাহাদুর। বললেন,—দেওয়ানজী, আমি ওদের মুখের কথা চাই, আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই না। ঐ বানরের বাচ্চারা বলুক!

ব্যস্ত হয়ে কি যেন ইঙ্গিতে বললেন দেওয়ানজী। দু'জন ইংরাজ একসঙ্গে

উঠে দাঁড়ালো। একজন বললে,—ইয়েস্ ইওর অনার, উই প্রমিজ, ইউ উইল গেট্ দি ফরফিচার! দি সিপ 'গোডল্‌ফিন্' কামিং ইন্ দি নেক্সট্ মান্থ!

সুতানুটির ফ্যাক্টরীতে রোজকার রোজনামচা লিখে রাখে ফ্যাক্টরীর কর্তা-কর্তারা। ইংরাজের এক মহৎ গুণ, এই লেখার অভ্যাস। কথা টেঁকে না, কথা থাকে না। কথা রাখে না অনেকে! তাই লেখালিখি। আয়-ব্যয়ের হিসাব লেখাতে ইংরাজ যেমন পাকাপোক্ত, কাজ দিয়ে কাজ করিয়ে নিতেও তেমনই দক্ষ। গ্রেট বৃটেন থেকে যে সব ফ্যাক্টর আর রাইটারের দল এসেছে, তারা কি করছে, না করছে তার বিবরণ লিখতে হয় ফ্যাক্টরীর ডায়রীতে। কাজ করছে, না শুধু মদ আর মেয়েদের সঙ্গে হৈ-হুল্লোড় করছে! ঠিক ঠিক কাজ হচ্ছে, না কাজ পণ্ড হচ্ছে ঘুষ নেওয়ার বহরে!

ফ্যাক্টরীর রোজনামচায় লিখতে হয় পুকুরচুরি আর অবৈধ জমি অধিকারের কথা। লেখা হয়:

"The compound enlarged to the northward, March 18—There being a tank of water near the Factory-gate which is very offensive to the place and there being occasion for more ground to enlarge the compound to the northward where the chambers for the Factors and Writers to be built.

'Tis order'd that the charges general keeper fills up the same speedily,"

অন্য দিকে মুখ ফেরালেন রাজাবাহাদুর। সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্যে কাকে কাকে যেন খুঁজতে থাকলেন ব্যগ্রচোখে। মুখ থেকে মুখনল নামিয়ে বললেন,—জনার্দন সাহাকে দেখি না কেন?

ইংরাজ দু'জনের তখন বিদায় নেওয়ার পালা। সামরিক কায়দায় উঠে দাঁড়িয়েছে তারা। একসঙ্গে দু'জনে বলছে,—"The grace of our Lord

Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Ghost, be with us all evermore. Amen."

—জনার্দ্দন সাহা! আবার ডাকলেন কালীশঙ্কর! চোখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে খুঁজতে থাকলেন।

—রাজাবাহাদুর, হাজির আছি। প্রণাম।

জনার্দ্দন ছিল কিছু দূরে। তার কণ্ঠ শুনে নিশ্চিন্ত হলেন যেন রাজা। বললেন,—কাছে এসো জনার্দ্দন। একটা গুহ্যকথা কই।

জনার্দ্দন বহু অর্থের মালিক। তাম্বুলজাতির মধ্যে একজন নামজাদা ধনী। দোষের মধ্যে এই, জনার্দ্দন সুরা আর নারীতে অর্থব্যয় করে। রাজার সঙ্গে দোস্তি আছে অনেক দিনের, তাই দরবারে আসে প্রত্যহ। শলা-পরামর্শে যোগ দেয়। ভালমন্দের মতামত জানায়। রাজার সঙ্গে পানাহার করে।

—কি হুকুম রাজাবাহাদুর?

জনার্দ্দন রাজার কাছে গিয়ে বসলো। পানদান থেকে কয়েকটা তবক দেওয়া পানের খিলি তুলে মুখে পুরলো।

কালীশঙ্কর মৃদু মৃদু হাসির সঙ্গে মিহি সুরে বললেন,—ভাই জনার্দ্দন, ইরাণী দু'টাকে তুমিই লও।

—সে কি কথা রাজাবাহাদুর! সাগ্রহে বললে জনার্দ্দন। মাথার পাগড়ী খুলে ফেলতে ফেলতে বললে,—একটা রাতেই সাধ মিটে গেল রাজাবাহাদুর?

হাঁ জনার্দ্দন। তুমিই লও। অগুই লয়ে যাও। কেমন যেন দুঃখের সুরে বললেন কালীশঙ্কর।

—যথাজ্ঞা রাজাবাহাদুর, আপনি যেমত হুকুম করেন।

কথা বলতে বলতে জনার্দ্দন যেন আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে ওঠে। হাতে স্বর্গ পাওয়ার আনন্দেও কেউ বোধ করি এত প্রফুল্ল হয় না। বললে,—দু'চার দিন আরও আপনি ভোগসুখ করতে চান তো করুন রাজবাহাদুর! এত শীঘ্র এই বিতৃষ্ণা কেন?

—না জনার্দ্দন। তা আর হয় না। দরবারের চাঁদোয়ায় চোখ রেখে কথা বলছেন কালীশঙ্কর। বললেন,—যা বলি তুমি তাই কর। দেওয়ানজী!

দেওয়ান হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে আসেন গদীর কাছে। ডাক দেওয়ার পরেই রাজাকে গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করতে দেখে বললেন,—রাজাবাহাদুর, ডাকলেন আমাকে?

একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন কালীশঙ্কর। তারপর বললেন নাতিউচ্চ কণ্ঠে,—দেওয়ানজী, আমাদের জনার্দ্দন নাচঘর থেকে যা চায় তা যেন পায়। জনার্দ্দনকে নাচঘরে পাঠান। সঙ্গে লোক দেন। যাও হে জনার্দ্দন।

আনন্দের আধিক্যে এলোপাতারি কয়েকটা সেলাম ঠুকলো জনার্দ্দন। বললে,—রাজাবাহাদুর আপনি মানুষ নন, সাক্ষাৎ দেবতা।

রাজমাতার কথাগুলি মনে পড়ে কালীশঙ্করের। সেই শিশুকাল থেকে যিনি লালনপালন করলেন সস্নেহে, তিনি যদি কোন কিছুতে আপত্তি জানান তা মানতে যেন বাধ্য রাজাবাহাদুর। মুসলমানী দু'জন যতক্ষণ না রাজগৃহ ত্যাগ করে ততক্ষণ যেন চিন্তামুক্ত হ'তে পারেন না। রাজা ভাবছিলেন, সত্যিই হিন্দুর ঘরে মেয়ের তো কোন অভাব নেই! রাজমাতা এমন কিছু অন্যায় বলেননি।

কাকে যেন জনার্দ্দনের সঙ্গে দিলেন দেওয়ানজী। জনার্দ্দন দরবার ত্যাগ করতে রাজা বললেন,—জহুরীলোগ কৈ?

কে আগে রত্নসম্ভার রাজসমীপে হাজির করতে পারে, তার জন্য রেষারেষি লেগে যায়, প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাধে ক'জন জহুরীর মধ্যে। রাজার গদীর সামনে যে যার মালের ঝাঁপি খুলে সাজিয়ে রাখলো।

রাজাবাহাদুর বললেন,—টেপকচি হাজির হোক।

রাজার রত্নভাণ্ডারের কোষাধ্যক্ষের নাম টেপকচী। রাজার পাশেই ছিল সে। সেলাম জানালে টেপকচী।

এক ছড়া মুক্তামালা তুললেন রাজবাহাদুর। মালার মুখে শীল আঁটা। মুক্তার রঙ যেন ঈষৎ লালাভ বা গোলাপী। বললেন,—মূল্য কত?

জহুরীদের একজন বললে,—এক এক মুক্তার দাম ত্রিশ আসরফি। মালাতে হুজুর তিন কুড়ি মুক্তা আছে।

—ঠিক দাম বাত্লাও। জোচ্চুরি ক'র না। কথার শেষে মুখে মুখনল চুসলেন রাজাবাহাদুর।

জহুরী বললে,—এক ছিদাম বেশী নেবো না হুজুর।

রাজা বললেন,—আমার এক কুড়ি চাই। দাম দেবো পঁচিশ আসরফি হিসাবে।

আটাশ দিন রাজাবাহাদুর।

—উঁহু, তা হয় না। আমার কথা বদল হয় না।

অগত্যা রাজী হয় জহুরী। বহুদিনের খরিদ্দার রাজা কালীশঙ্কর। তাঁর কাছে দর কষাকষি করতে আর ইচ্ছা হয় না জহুরীর। জহুরী বললে,—আপনার কথাই থাক রাজাবাহাদুর। আপনি যা দেবেন মাথা পেতে নেবো।

কালীশঙ্কর তখন অন্য এক জহুরীর মণিমাণিক্যের স্তূপ থেকে একখণ্ড সবজা তুললেন। ঐ বৃহৎ রত্নটি নাড়াচাড়া করতে করতে রাজা বললেন,—দেওয়ানজী মুক্তার মূল্য চুকায়ে দিতে ক'ন কাছারীতে। ক্ষণেক থেমে আবার বললেন—এ সব্জার ওজন কত?

জহুরী বললে,—সাড়ে সাত রতি রাজাবাহাদুর।

রাজা বললেন,—টেপকচী তুমি কি বল?

টেপকচী বললে,—হাঁ হুজুর, তাই হবে।

রাজা বললেন,—মূল্য কত?

জহুরী বললে,—পঞ্চাশ হাজার টাকা।

রাজা বললেন,—চল্লিশে দাও তো দাও, নয়তো পাততাড়ি গুটাও।

জহুরী বললে,—তা হয় না রাজাবাহাদুর। সবজা বড় একটা মেলে না।

রাজা বললেন,—চল্লিশের বেশী দেওয়া যায় না।

জহুরী বলে,—তবে রাজাবাহাদুর ফেরৎ দিন। আমি পঁয়তাল্লিশ হাজার দাম পেয়েছি বাজারে।

রাজা বললেন,—তবে ঐ বাজারেই বিকাও। যাও।

জহরীর দল যার যার ঝাঁপি তুলে নেয়। দরবার থেকে বেরিয়ে একে একে। লালাভ মুক্তার মালাটি ধ'রে যেন খেলা করতে থাকেন রাজা বাহাদুর। মালায় চল্লিশটি মুক্তা আছে। খেলা করতে করতে হঠাৎ টেপকচীকে হস্তান্তরিত করেন ঐ মালা। টেপকচী মালাটি লুকে তৎক্ষণাৎ। রত্নভাণ্ডারে রাখতে যায়।

দেওয়ানজী বললেন,—ছোট বাহাদুরকে ডেকেছিলেন রাজাবাহাদুর?

হঠাৎ যেন মনে পড়লো কালীশঙ্করের। ব্যস্ত হয়ে বললেন,—কোথ ছোটকুমার? কৈ?

দেওয়ান বললেন,—আহারে বসেছেন কুমারবাহাদুর। তাঁর আস কিঞ্চিৎ বিলম্ব হবে।

খানিক স্থির থাকতে রাজা বললেন,—তা হোক, বিলম্ব হোক। কালীশং আসবে তো দেওয়ানজী?

—হাঁ হুজুর, তিনি নিশ্চিত আসবেন। খবর পাঠিয়েছেন ছোটকুমার।

রাজাবাহাদুর বললেন,—শ্রীমন্ত পুরোহিতের ব্যাটাকে এত্তেলা দি এখনই। কথা আছে তার সহ।

লোক ছুটলো। একজন সিপাহি ছুটলো রাজার এত্তেলা নিয়ে নিমেষের মধ্যে যেন এনে হাজির ক'রলো শশিনাথকে।

রাজা বললেন,—তোমার নাম কি বলহ।

—আজ্ঞে শশিনাথ ভট্ট।

—আমি তোমার বিয়া দেবো। সামনের লগ্নেই দেবো। তুমি প্রস্তু হও। একটি সৎপাত্রী আছে আমার হাতে। আপত্তির কিছু আছে?

লজ্জায় মাথা নত ক'রলো শশিনাথ। আমত আমতা স্বরে বললে,—দে আছেন আমার মা। তাঁকে পত্র দিতে হবে। তিনি অনুমতি দান করলে হবে। আমার কোন মতামত নাই এ ক্ষেত্রে।

ক্ষীণ হেসে রাজা বললেন,—আমার নাম উল্লেখে তোমার মা

অনুমতি দিবেন। সত্বর আমাকে জানাবে, ভুল না হয়!

—যথাজ্ঞা রাজাবাহাদুর। শশিনাথ সলজ্জায় বলে। কথার শেষে কপালে করকর ঠেকিয়ে দরবার থেকে বেরিয়ে যায় ধীরে ধীরে।

রাজা গাত্রোত্থান করলেন। বললেন,—দেওয়ানজী, দরবার আজ এখানেই শেষ হোক। কুমারকে জানায়ে দিন, আমি অন্দরেই আছি। সে যেন সেখানেই যায়।

দেওয়ানজী যেন নিশ্চিন্তার শ্বাস ফেললেন এতক্ষণে। খুশীর হাসি হাসতে হাসতে বললেন,—তথাস্তু রাজাবাহাদুর!

কাফ্রীবাহী রাজার সুখাসন দরবার থেকে অন্দরের পথে এগোয়। কাছারীর দালানে ভিড় জমিয়ে ব'সেছিল একপাল প্রজা। খাসমহল থেকে এসেছে খাজনা মিটাতে। সেই প্রজার দল রাজার জয়ধ্বনিতে বৈকালিক আকাশকে মুখর ক'রে তোলে যেন।

অপরাহ্নের সূর্য্যালোক পড়েছে রাজার সুখাসনে! সোনারূপার কারুকাজ বিকালের সোনালী আলোয় ঝলমলিয়ে ওঠে। কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রীদের দেহের ঘর্ম্মরেখাও চিকচিকিয়ে ওঠে অস্তগামী সূর্য্যের শেষ রশ্মিজালে! রাজার জয়ধ্বনি ভাসতে থাকে যেন আকাশে বাতাসে।

—সূর্য্য কি ডুবে গেল ব্রজবালা!

রাজমাতা কুঠরীর মুক্ত দুয়ার থেকে আকাশ দেখতে দেখতে বললেন ক্ষীণ কণ্ঠে। দিনের আলোকে যেন যত লজ্জা রাজমাতার। রাতের অন্ধকার নেমে যতক্ষণে না দশ দিক অদৃশ্য হয়ে যায়, ততক্ষণ কুঠরী ত্যাগ করবেন না তিনি। দিবালোকে লোকচক্ষুর সমুখে দেখা দিতে হয়, দেখাতে হয় নিজের পোড়ামুখ, আবার দেখতেও হয় অন্যের মুখ। অনিচ্ছায় শুনতে হয় আপনজন আর অনাত্মীয়দের কপট সহানুভূতি আর নকল সমবেদনার স্তোক-বাক্য। রাজমাতার দুর্দ্দিন পড়েছে যখন, তখন সব আসবে একে একে। আসবে যত চেনা জানা, যত পাড়াবেড়ানীর দল। নিজেদের হাসিমুখ দেখিয়ে

যাবে তারা। আর দেখে যাবে বিলাসবাসিনীর মত তেজস্বিনী ও পুণ্যব্রতার কি হাল হয়েছে! কেউ জব্দ করতে পারেনি তাঁকে কখনও; পেটেধরা মেয়ে স্বামী এতদিনে জব্দ ক'রেছে। বুকের মণি কেড়ে নিয়েছে। তাও যদি সমাদরে রাখতো সেই অমূল্য রত্নকে! আদর-কদর নয়, স্নেহ-সোহাগ নয়,-বিলাসবাসিনীর বক্ষমণি আছে কোথায় অনাদরে অবহেলায়! হয়তো চোখের জলে ভাসছে রাত্রি দিন। সেই দুঃখে কত কাল হাসতে ভুলে গেছেন রাজমাতা। একটা মিষ্টকথাও বলেন না কা'কেও। সামাজিকতার ধার ধারেন না আর। বিলাসবাসিনীর মনের মত দেহটাও যেন ভেঙ্গে পড়েছে! আগের সেই সৌম্যসুন্দর মুখশ্রী ঘুচে গেছে মনের দুঃখে। দেহলাবণ্য হারিয়ে কেমন যেন রুক্ষ আকৃতি হয়েছে। রাজমাতার বিশাল আঁখিযুগলে সর্ব্বক্ষণ ফুটে আছে ক্রোধের চাউনি।

—সূয্যি ডুবু-ডুবু—বললে ব্রজবালা। রাজমাতার পায়ে হাত বুলাতে বুলাতে আকাশে চোখ ফিরিয়ে বললে, ঐ তো সন্ধ্যাতারা ফুটেছে আকাশে! দপদপিয়ে জলছে!

বেলাশেষের ম্লান আকাশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সত্যিই জল্-জল্ করছে একটি মাত্র তারা। কে বলবে ঐ আকাশে আবার কোটি কোটি তারার দেখা মিলবে! তখন হয়তো আর খুঁজে মিলবে না ঐ ধ্রুবতারাকে। হারিয়ে যাবে, লুকিয়ে থাকবে তারার দলে মিশে। মহাশূন্যের বুকে যেন সোনার ধুকধুকি জলছে!

ব্রজবালা শুধু দেখতে পায়। রাজমাতার ক্ষীণদৃষ্টি চোখের নজরে পড়ে না। বিলাসবাসিনী বৃথাই দেখেন আকাশে চোখ তুলে। খুঁজে মেলে না সন্ধ্যাতারা। দৃষ্টিপথে দেখা যায় না।

ব্রজবালা বললে,—এই ঘুপসি কুঠরীতে ভাল না লাগে তো চল' না ফাঁকায় গিয়ে খানিক থাকবে।

—কোথায় আবার যেতে যাবো! বিলাসবাসিনী কথা বলতে বলতে চোখ ফেরালেন আকাশ থেকে। বললেন,—আমার এই কুঠরীই ভাল।

কোন মুখে আর বেরুবো লোকচক্ষে ? কার কাছে গিয়েই বা দাঁড়াবো ! কে আছে আমার ?

—সে কি কথা গো রাজমাতা !

অবাক স্বরে বললে ব্রজবালা। তার দু'টি হাত বিলাসবাসিনীর পায়ে থেমে থাকলো ক্ষণেক, বললে,—তোমার অমন দুই ছেলে থাকতে আবার ভাবনা কি ? এমন সাজানো রাজপুরী, ঐশ্বয্যি রাখবার ঠাঁই নেই, তুমি ভাবতে যাবে কেন ?

কেমন যেন কথায় গাম্ভীর্য্য ফুটিয়ে বললেন রাজমাতা। প্রবল প্রতিবাদের স্বর তুললেন কথায়। অসহায়ের মত মৃদুতম কণ্ঠে বললেন,—নাঃ, কেউ নেই আমার ! ওরা আমার কেউ নয়।

কথা বলতে বলতে সহসা কি যেন মনে পড়লো রাজমাতার। মুখের নকল হাসি মিলিয়ে গেল। মিনতির স্বরে বললেন,—ব্রজ, একটিবার সদরে যাবি মা ? দোহাই তোর !

—কেন তাই বল'। একবার কেন, হাজার বার যাবো। তুমি যখন হুকুম করবে তখনই যাবো।

দাসী ব্রজবালা বললে যেন স্বর উঁচিয়ে। কেমন যেন গর্ব্বভরা স্বরে।

রাজমাতা বিলাসবাসিনীর খাসচাকরাণী সে, সকলের চেয়ে মান্যে গণ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ তাঁরই অধীনের পরিচারিকা,—ব্রজবালা কারেও ডরায় না।

চুপ চুপ !

হাতের তর্জ্জনী নিজের মুখে তুললেন রাজমাতা। বললেন,—কেউ যেন না জানতে পায় ব্রজ ! যাবি আর আসবি, দাঁড়াবি না কোথাও।

—কেন যে যাবো তাই তো এখনও বললে না রাজমা ?

ব্রজবালা কেমন যেন নির্ব্বোধের মত বললে মুখে অজ্ঞতা ফুটিয়ে।

আবার হাসলেন বিলাসবাসিনী, সেই কৃত্রিম হাসি। বললেন,—কেন যাবি তা-ও ব'লে দিতে হবে ব্রজ ? এখনও বুঝলি না তুই, আমার বুকের দাগা কোথায় ? হায়, হায় !

ব্রজবালা তাকিয়ে থাকে অবোধ চোখে। রাজমাতার বক্তব্য যেন ঠাওর করতে পারে না ঠিক। সোজা কথার মানুষ ব্রজবালা, বোঝে না আঁকাবাঁকা কথা। সোজা কথা বোঝে।

রাজমাতা ফিসফিসিয়ে বললেন,—জগমোহন সাতগাঁ থেকে ফিরলো কি না জেনে আসবি না?

—হ্যাঁ।

নিজের মাথা প্রায় নিজের কোমরে ঠেকিয়ে সম্মতি জানায় ব্রজবালা। বলে,—হ্যাঁ। যাবো বৈ কি। এখুনি যাবো। যাবো আর আসবো।

—আমার তরে তোর কত কষ্ট ব্রজবালা! একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে বললেন বিলাসবাসিনী।

—কষ্ট! হেসে হেসে কথা বলে ব্রজ। বিলাসবাসিনীর পায়ে হাত রেখে আনন্দের হাসি হেসে-হেসে বলে,—কষ্ট! সে কি কথা রাজমাতা! কষ্ট কা'কে বলে আমি জানি না। তোমার এই চরণে আমি আশ্রয় পেয়েছি, আর আমি কি চাই!

—তবুও কতটা পথ যাবি-আসবি তুই! আমার হুকুম শুনতে শুনতেই হাড় কালি হয়ে গেল তোর!

রাজমাতা কুঠরীর মধ্যে এত নিরালাতে থেকেও, পাছে কেউ যেন শুনতে না পায় এই ভয়ে ফিস-ফিস কথা বললেন।

কাতর কণ্ঠে বললে ব্রজবালা। রাজমাতার পা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। বললে,—আমি যাবো আর আসবো।

প্রায় অন্ধকার কুঠরীতে একা থাকেন বিলাসবাসিনী। সূর্য্য ডুবলো কি না কে জানে! কুঠরী যেন এখনই কালো আকার ধারণ ক'রেছে। আঁধার নেমেছে কুঠরীতে। অন্ধকার মন্দিরে যেন কোন এক দেবীমূর্ত্তি! মূর্ত্তির দুই চোখ বিস্ফারিত হয়ে আছে। জ্বল্‌-জ্বল্‌ জ্বলছে সেই চোখ। দেবীর মুখ প্রসন্ন নয়, যেন রুষ্ট!

লেঠেল জগমোহনের দেখা নেই এখনও, সেই ভাবনাতেই অস্থির হয়ে

আছেন বিলাসবাসিনী। মুখে কোন' প্রকাশ নেই, বুকের মাঝে তুফান বইছে যেন।

—রাজমাতা!

কে ডাকলো? বেলাশেষের আলো-আঁধারিতে চোখে যেন স্পষ্ট কিছু দেখা যায় না। রাজমাতা নিরুত্তর! যেন ধ্যানে বসেছেন নিবিড়চিত্তে।

—রাজমাতা!

আবার ডাক প'ড়লো। নারীকণ্ঠের মৃদু-মন্দ ডাক।

—কে তুমি?

বিলাসবাসিনী বললেন আর মুদিত চক্ষু উন্মুক্ত ক'রে দেখলেন কুঠরীর বাইরে। বললেন;—শিবানী না কি?

—হাঁ গো রাজমাতা!

—ডাকিস কেন? কিছু বলবি তুই?

ভাবতে পারেনি শিবানী, কল্পনা করতে পারেনি স্বপ্নেও যে, রাজমাতা তার সঙ্গে মিষ্টিমুখে কথা বলবেন। তার ডাকে সাড়া দেবেন।

বলবে কি বলবে না, ভেবে ঠিক করতে পারে না শিবানী। কি বলতে এসে যেন আর মুখ খুলতে পারে না। অন্ধকার কুঠরীর মধ্যে বিলাসবাসিনীর জল-জল চোখ দেখে আর মুখে কথা জোগায় না।

—মুখে কথা নেই কেন? আবার কথা বললেন,—বেঁচে আছি না ম'রে আছি তাই দেখতে এলি না কি?

—না গো রাজমাতা, না। মরতে যাবে কেন তুমি?

কথা বলতে বলতে শিবানী কুঠরীর দুয়োরের কাছে ব'সে পড়লো। হাসি হাসি মুখ তার। সন্ত-বাঁধা কবরীতে টাটকা গন্ধরাজ। লাল পাড় শাড়ী এঁটে-সেঁটে প'রেছে। কপালে অভ্র-সিঁদুরের টিপ চিকচিক করছে। কথার সুরে হাসি মিশিয়ে শিবানী বললে, আমার গয়না ক'খানা আমাকে তুমি দেবে না রাজমাতা?

—তোর গয়নাগাটি কি আর চিবিয়ে খাবো আমি, ভেবেছিস তুই?

বিলাসবাসিনী ধীরে ধীরে বললেন সহজ স্বরে। বললেন,—বে-থা হোক না, দেখিস'খন তোর গয়না তোকে দিই না, না দিই!

মুখে হাসি ফুটলো শিবানীর। শব্দহীন মৃদু-মৃদু হাসি। বললে,—বে-থা না হ'লে আর গয়না পরবো না আমি?

—তাই বা কেন? রাজমাতা বললেন। বললেন,—তুই যা অলবড্ডো মেয়ে, কোথায় রাখতে কোথায় ফেলবি, তাই তো দিই না! মহেশনাথও যদি মানুষের মত মানুষ থাকতো!

—আর বে-থা যদি হয় তখন?

নকল গাম্ভীর্য্যের স্বরে বললে শিবানী। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো।

বিলাসবাসিনী হেলে-দুলে বসলেন। বললেন,—ফুলচন্দন পড়ুক তোর মুখে। বে-থা হ'লে তখন তোর গয়না ছাড়া আরও অনেক কিছু দেবো তোকে। আমার নিজের দু'-চারখানাও উপরি দেবো।

এক ঝলক হাসলো শিবানী। খুশীর হাসি মুখে। বললে,—গয়না ছাড়া আর কিছু দেবে না রাজমাতা?

বিলাসবাসিনী অল্প হাসলেন। বললেন,—তোকে দেখলে আমার বুকের মধ্যে যেন কেমন করতে থাকে! ঠেকা-মেয়ে হয়ে আসিছ, বে-থা এখনও দিতে পারিনি। আমার বুকের জ্বালা তুই কি বুঝবি শিবানী। শুধু গয়না নয়, ভাল ভাল বেনারসী দেবো তোকে, দেখিস। নগদ কড়িও দেবো কিছু। তা এখনই যেন ফাঁস ক'রে দিস না কথাগুলো।

চোখে যেন স্বপ্ন দেখে শিবানী। রাজমাতার কথা শুনে আনন্দে কেমন যেন গুম হয়ে থাকে। স্বপ্ন দেখে শিবানী, জেগে জেগে। দেখে, কারা যেন সাজিয়ে দিয়েছে শিবানীকে। কনে-চন্দন পরিয়ে দিয়েছে। গায়ে এক-গা গয়না। চালচিত্র খোঁপায় বিঁধেছে রূপোর কাজললতা। লাল বেনারসীতে শিবানীকে মানিয়েছে কত! হাতে আর পায়ে ঘন লাল আলতা! বুকে মাখিয়েছে অগুরু চন্দনের নির্য্যাস। মুখে পান চাপা দিয়ে আলপনা দেওয়া পিঁড়িতে বসে আছে। সাত পাক ঘুরতে হবে। বুক যেন দুরু-দুরু করতে

থাকে খুশীর উচ্ছ্বাসে। মুখের পান সরিয়ে শিবানী দেখছে শুভদৃষ্টির মধুমুহূর্তে। পলকহীন চোখে দেখছে, সামনে দাঁড়িয়ে আছে বরবেশে শশিনাথ।

আর ভাবতে পারে না শিবানী। কেমন যেন নিথর হয়ে যায়। যদি স্বপ্ন সত্যি না হয়ে মিথ্যা হয়ে যায়, তখন? শশিনাথ যদি বেঁকে দাঁড়ায়! রাজা বাহাদুরের আদেশ যদি অমান্য করে! আর যেন ভাবতে পারে না শিবানী। কাঠ হয়ে যায় যেন তার কোমল দেহ। শ্বাস পড়ে কি না পড়ে।

—পায়ে হাত বুলিয়ে দেবো রাজমাতা? শিবানী কথা বললে আড়ষ্ট কণ্ঠে, সসঙ্কোচে।

বিলাসবাসিনী বললেন,—না, না, তুই আমার পায়ে হাত দিতে যাবি কেন? তুই আর আমার বিন্দুতে কি কিছু তফাৎ আছে? তোদের দু'জনের তরেই তো আমি জ্বলে-পুড়ে খাক হচ্ছি!

বলবে কি বলবে না, তাই যেন ভাবতে থাকে শিবানী। মুখে আসে কথা, তবুও যেন লজ্জায় বলতে পারে না। বিয়ের কথা উঠেছে শুধু, তুলেছেন স্বয়ং রাজা। কথা যতক্ষণ কাজে না পরিণত হয় ততক্ষণ শুধু কথায় বিশ্বাস কি! তবুও শিবনী বলে ফেললে যেন মুখ ফসকে। বললে,—রাজাবাহাদুর পাত্র ঠিক করেছেন রাজমাতা। সামনের লগনেই বে দিতে চান।

—তাই নাকি রে শিবানী! বিলাসবাসিনী বললেন সবিস্ময়ে।—পাত্রটি কে তাই বল্‌?

শাড়ীর আঁচল পাকায় শিবানী। নতমুখে থাকে। বলে,—তোমাদের শ্রীমন্ত পুরোহিতের ছেলে।

—কে? শশিনাথ? সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন বিলাসবাসিনী।

ওপরে-নীচে মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানায় শিবানী। চোখ তুলে দেখে রাজমাতার মুখভাব। লক্ষ্য করে, পাত্রের নাম শুনে কি করেন, কি বলেন তিনি।

রাজমাতা বলেন,—বেশ ত, খুব ভাল কথা। শশিনাথ ছেলেটি ভালই।

সৎ বংশের ছেলে। তোদের দু'টিতে বেশ মানাবে। আমি তো কোন দিন ভাবি নি, যে, তোর বিয়ে হবে আমাদের ঐ শশিনাথের সঙ্গে? শুনে বড় আনন্দ পেয়েছি।

—তোমার কোন অমত নেই ত রাজমাতা?

ভয়ে ভয়ে শুধোয় শিবানী। কথা বলতে যেন তার মুখ আরক্তিম হয়ে ওঠে!

—কোন অমত নেই আমার। আমি সায় দিচ্ছি এ বিয়েতে! বলিস্ তো আমিই ব'লবো তোদের ঐ রাজাবাহাদুরকে;

একগাল হাসলো শিবানী। যেন রুদ্ধশ্বাস ফেললো এতক্ষণে। কুঠরীর দুয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। আর এক পল দাঁড়ালো না, চললো কোথায় কে জানে!

—সাতগাঁ থেকে জগমোহন লেঠেল এখনও এসে পৌছয়নি রাজমাতা! সদরে গিয়ে দেখে এসেছি আমি। জেনে এসেছি।

ব্রজবালা আসে হাঁপাতে হাঁপাতে। থেমে থেমে কথা বলে যেন।

—ঠিক জেনেছিস তো ব্রজ? ভুল শোনায়নি তো কেউ?

রাজমাতা যেন ব্রজবালার কথা বিশ্বাস না ক'রেই বললেন। বললেন,—কাছারীতে একবার খোঁজ করেছিস?

—হাঁ গো হাঁ।

—কাশীশঙ্কর যে ধরণের মানুষ, হয়তো জগমোহনকে শূলে চাপিয়ে দিতে হুকুম ক'রেছেন!

—না গো না। জগমোহনেরই পাত্তা নেই। গোমস্তারা বললে যে, হয়তো আসছে কাল ফিরতে পারে।

মুখে বিরক্তি ফুটলো বিলাসবাসিনীর। এত কথা বললেন এতক্ষণ! হাসি মুখে কথা কইলেন। নিমেষের মধ্যে আবার যেন গাম্ভীর্য্যে ডুবে গেলেন। নিরাশায় যেন ভেঙে পড়লেন।

ছোটকুমার কাশীশঙ্কর তখন রাজবাহাদুরের খাস-কামরায়। রাজমহলে।

রাজা বড়ই সুগন্ধিপ্রিয়। তাঁর কক্ষে তাজা ফুলের সৌরভ। স্বর্ণময় ফুলদানীতে স্তূপীকৃত পুষ্পশোভা। হরেক রকম গোলাপ ফুলের তোড়া। লাল, সাদা আর হলুদ রঙের বাহার। ধূপদানিতে ধূপ, ধুনা, গুল্গুল, আম্বর ও চন্দনকাষ্ঠ জলছে। রাজার নিজের দেহ খসখস-গন্ধে অনুলিপ্ত। জরীর কাজ করা মখমলের পাশোয়াজ রাজার পরিধানে। অত্যধিক গরমে মখমলের পোষাক পরেছেন। টানা পাখার হাওয়া খেলছে রাজকক্ষে, তবুও কালীশঙ্কর বিন্দু বিন্দু ঘামছেন। কে কোথায় অদৃশ্য থেকে সুশীতল গোলাপজল বর্ষণ করলো রাজার মাথায়! তৃপ্তি না আরামের মুখভঙ্গী করলেন তিনি।

সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে এক দণ্ড থাকতে দিবানিদ্রা থেকে উঠেছেন রাজা-বাহাদুর। মশালচি কখন এসে দেওয়ালগিরি জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে, জানা যায় না। নিদ্রাভঙ্গের পর চোখ মেলতেই রাজা দেখেন কক্ষ আলোয় আলোকময়। আর দেখলেন, একটি রৌপ্য কেদারায় ছোটকুমার কাশীশঙ্কর, ব'সে আছেন তাঁর প্রতীক্ষায়।

চার চোখ এক হ'তেই রাজাবাহাদুর বললেন,—কুমারবাহাদুর, তুমি এত দূরে কেন, নিকটে আসো। তোমার জন্য অপেক্ষায় থেকে থেকে নিদ্রায় ডুবেছি, আমাকে মার্জ্জনা করো।

কথা বলতে বলতে এক পুষ্পাধারে রক্ষিত বেলকুঁড়ির একটি গোছে স্বহস্তে তুলে নিলেন রাজা।

কাশীশঙ্কর কেদারা ছেড়ে রাজার কাছে এগোলেন। রাজার সুদৃশ্য শয্যার এক পাশে আসন করলেন। বললেন,—কি আদেশ তাই কও। এত ঘন ঘন ডাক পাঠালে আমাকে সকল কিছু ত্যাগ ক'রে তোমার সমীপেই থাকতে হয়।

—মার্জ্জনা করো কুমারবাহাদুর! কেমন যেন সলজ্জায় বললেন কালী-শঙ্কর। বেলকুঁড়ির গোছে নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন,—মধ্যে মধ্যে মনে হয় আমি নেহাতই অসহায়। তখন তোমাকে মনে পড়ে।

—আমার কাজকর্ম্ম নাই? সহাস্যে বললেন,—তা হোক, তোমার হুকুম

আমার শিরোধার্য্য। সব ত্যাগ ক'রে আমি আসছি। এখন কি আদেশ তাই ব্যক্ত করো।

ইদিক-সিদিক চোখ ফেরালেন রাজাবাহাদুর। দেখলেন যেন সাগ্রহে কাছাকাছি আরও কেউ যদি থাকে। গোপন কথা বলার মত চুপি চুপি বললেন,—পাপের বোঝা কে আর ধরে রাখতে চায়! আমিও চাই না। আশা করি তুমিও চাও না।

কি বলতে চান রাজা, অনুমানে কিছুই বুঝতে পারেন না কালীশঙ্কর। নীরবে থাকেন তিনি।

রাজাবাহাদুর আবার বললেন নত কণ্ঠে,—পিতৃপুরুষের কৃত পাপ থেকে মুক্ত হ'তে চাও না তুমি? আমি চাই, যেজন্য তোমাকে এই আহ্বান জানিয়েছি।

—কে আবার কি পাপ করলে?

অব্যক্ত কৌতূহলের সঙ্গে ছোটকুমার বললেন। বললেন,—কি পাপ আর কি পাপ নয়, আমি তো বুঝি না!

মৃদু হাসির উদ্রেক হয় রাজবাহাদুরের ওষ্ঠপ্রান্তে। সহজ সরল হাসি বললেন,—তুমি কনিষ্ঠ, তোমার জানার কথাও নয়। যাই হোক—

কথা থামলো। আবার ইদিক-সিদিক দেখলেন কালীশঙ্কর। বেলকুঁড়ির গোড়ে নাচাতে থাকলেন। কি এক গোপন রহস্য প্রকাশ করতে চান, কিন্তু যেন বলতে পারেন না।

ছোটকুমার বললেন, একটি কিংখাপের তাকিয়া টেনে নিয়ে বললেন,—বিরত কেন? বক্তব্য শেষ কর।

সহোদরের আকুল অনুরোধ শুনলেন কি শুনলেন না। সহসা কণ্ঠ সপ্তমে তুলে রাজা ডাকলেন,—খানসামা! হুঁকাবরদার কৈ? আলবোলা!

রাজার উচ্চ কণ্ঠ শুনেই যেন টানাপাখার গতি বর্দ্ধিত হয়ে উঠলো। নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে হুজুরের, বুঝলো যেন কক্ষের বাইরের জনমানুষ।

অল্প ঘুম থেকে উঠেছেন কালীশঙ্কর, কিছুতেই ঝিমুনি কাটছে না বুঝি।

খানসামা আলবোলার শট্‌কা রাজার হাতে ধরিয়ে দিয়ে গেল। ফুলের গন্ধের সঙ্গে একত্র হয় অম্বুরী তামাকের সুবাস। কালীশঙ্কর ঘন ঘন টান দিতে শুরু করলেন মুখনলে। ধূম্রজাল বিস্তার করলেন যেন নিজের সম্মুখে।

ছোটকুমার বললেন—হাতের কাজকর্ম ফেলে ছুটে আসছি। বক্তব্য শেষ কর।

রাজাবাহাদুর মুখনল নামিয়ে আবার দেখলেন ইতিউতি। নিম্ন কণ্ঠে বললেন,—কালীশঙ্কর, আমাদের শিবানী আর মহেশনাথের পরিচয় তোমার অজানা নয়। তুমি সকল বৃত্তান্তই অবগত আছো, আশা করি।

ছোটকুমারের মত বলদীপ্ত মানুষও লজ্জায় অধোবদন হন। বলেন,—হাঁ, আমি জানি। ওরা দুই ভ্রাতা-ভগিনী, ধরতে গেলে আমাদের নিকট-আত্মীয়। ওদের পরিচয় জানি বৈ কি। কিন্তু এতকাল পরে সেই পরিচয় ঘাঁটাঘাঁটির প্রয়োজন কি?

মৃদু হাসি ফুটলো রাজার মুখে। বললেন,—প্রয়োজন আছে ভাই। নিকট-আত্মীয় বটে, তবে অত্যন্ত লজ্জাকর সেই পরিচয়। লোকের কাছে বলা যায় না, এমনই লজ্জার!

—হাঁ, তা বটে।

—তবে? রাজাবাহাদুর ধীর কণ্ঠে কথা বলেন। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে বললেন,—তুমি সেই লজ্জার গ্লানি মোচন ক'রতে চাও, কি না চাও?

—চাই তো বটে। কিন্তু কোন্ উপায়ে করি, তা তো ভেবে পাই না।

আবার হাসলেন কালীশঙ্কর। শিশুসুলভ সরল হাসি। হাসতে হাসতেই বললেন,—তুমি ভেবে পাও না, আমিও ভেবে পাই না। তবে আমি এক উপায় স্থির ক'রেছি। এখন তুমি যেমন মত দেবে তেমনই হবে।

—যথা?

—ব্যস্ত না হও। ব্যস্তকর্মের বিষয় এটা নয়। কথা বলতে বলতে আবার মুখে মুখনল ছোঁয়ালেন রাজাবাহাদুর। টান দিলেন না, আবার নামিয়ে নিলেন রত্নখচিত মুখনল। বললেন,—ঐ মহেশনাথ আর শিবানী যে

আমাদের স্বর্গগত পিতৃদেবের রক্ষিতার ঔরসজাত, তা অনেকেই জানে, এ কথা কি তুমি অস্বীকার ক'রতে পারো ?

যেন ভেবে ভেবে বললেন কালীশঙ্কর। বললেন,—না, তা পারি না।

রাজাবাহাদুর বললেন,—আমার এবং তোমার ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীরা যদি কোন দিন এ ব্যাপার জ্ঞাত হয়, তারাও কি তোমার আমার মত সমচক্ষে দেখবে ঐ মহেশনাথ আর শিবানীকে ? তুমি কি মনে কর ?

অনেক ভাবলেন যেন ছোটকুমার। চিবুক ধ'রে চিন্তিত হয়ে থাকলেন বেশ কিছুক্ষণ। তার পর চিবুক থেকে হাত নামিয়ে বললেন,—ভবিষ্যতের কথা কোন্ জানে বলি! আমাদের মত সমচক্ষে না-ও দেখতে পারে হয়তো।

—হয়তো কেন বল, বল নিশ্চিত।

দেওয়াল-গিরির উজ্জ্বল আলোয় রাজাবাহাদুরের ঘুম-রাঙা-চোখ দেখায় যেন ভয়ঙ্কর। বললেন,—দিনকাল আর আগের মত নাই। মানুষ স্বাধীন হওয়ার পক্ষপাতী। কলঙ্ককালিমা ধুয়ে-মুছে সাফ ক'রে দেবে আমাদের উত্তরপুরুষ। ভয় আর লজ্জা কি বস্তু, তা জানবে না। ঐ লজ্জার বস্তুদের সদরে ঠাঁই দেবে ভাবো তুমি ?

—এ বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাই নাই আমি। কোন দিন এত ভাবি নাই।

রাজকক্ষ ধূম্রময়। ধূপদানির লতানে ধোঁয়া কক্ষের চাঁদোয়া স্পর্শ ক'রেছে। দেওয়ালগিরির আলোগুলি পর্য্যন্ত ধূম্রাচ্ছন্ন হয়ে গেছে। রাজ-কক্ষে এত সোনারূপোর সরঞ্জাম, ধূসরতায় ঢাকা পড়েছে যেন। আরও কিঞ্চিৎ ধোঁয়া ছাড়লেন রাজাবাহাদুর। তাঁর নাক-মুখ থেকে নির্গত হয়ে মিশলো যেন ঐ ধূম্রচির কপিশ ধোঁয়াজালে।

কোথা থেকে ভেসে আসে সুরের ইন্দ্রজাল!

দুই সহোদরের বাক্য বিনিময়ের বিরতি-ব্যবধানে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে বীণা না সেতারের সুরঝঙ্কার।

রাণীদের মহল থেকে যেন বাতাসের সঙ্গে উড়ে আসছে সেই মধুর ধ্বনি।

সন্ধ্যা সমাগমে ইমন কল্যাণ ধরেছেন হয়তো ছোটরাণী। বীণা বাজিয়ে চলেছেন সর্ব্বজয়া।

কে শুনছে কে জানে! ছোটরাণীর ঘরে এখন তিনি একা। কেউই শুনছে না। নিজে শুনছেন না আকাশ-বাতাশকে শোনাতে বাজাতে ব'সেছেন, একমাত্র সর্ব্বজয়াই জানেন।

—মাথাটা একটু ঘামাও। রাজাবাহাদুর অনুরোধের সুরে বললেন। বললেন,—ভবিষ্যৎ বংশধর আমারও আছে, তোমারও আছে। তবে আমি একাই এ সকল ঝঞ্ঝাট পোয়াবো কেন?

—কি কর্ত্তব্য বল তুমি? মহেশনাথ আর শিবানীকে হত্যা করাতে চাও না কি? তা কি সম্ভব?

আগুনের ভাঁটার মত কালীশঙ্করের আরক্তচোখ চক্ চক্ করতে থাকে। লকলকে জিব কাটলেন তিনি। বললেন,—হা হতোঽস্মি! আমি কি তাই কইলাম এতক্ষণে! না, না, না, উহাদের পৃথিবী হ'তে সরিয়ে দিতে আমি চাহি না। তবে তো কোন্ কালে ঝামেলা মিটায়ে ফ্যালাতাম। আমি সৎপথের পক্ষপাতী, দ্বন্দ্ব-কলহ অপছন্দ করি, অশান্তির সৃষ্টি হোক, তাও চাহি না। কথার শেষে ক্ষণেক থেমে বললেন,—মহেশনাথ আর শিবানী যতই হোক মানুষ তো! তা ছাড়া, ওরা দু'জনা আমাদের শত্রু নয়, দাবীদাওয়া অনায়াসে জানাতে পারে।

—দাবীদাওয়া কেন?

—কেন ভরণপোষণের দাবী! বললেন রাজাবাহাদুর, নিম্নতর সুরে। বললেন,—আমাদের স্বর্গগত রাজা, মহেশনাথের মাতাকে না কি শাস্ত্রমতে বিবাহ-বন্ধনে বেঁধেছিলেন। তাই যদি হয় তবে তো সে-দাবী আমি তুমি উপেক্ষা করতে পারি না?

চিন্তাকুল ছোটকুমারের চোখ স্থির হয়ে থাকলো। পানদান থেকে একটি কি দু'টি খিলি তুলে মুখে দিলেন। পানেও খসের সুগন্ধি!

কালীশঙ্কর আবার বললেন,—একবার যদি দাবী করে তো তখন আমি আর তুমি সমাজে মুখ দেখাই কোন্ লজ্জায়! কথার শেষে মুখনল তুললেন মুখে। আলবোলায় ক'বার গুরু-গুরু ধ্বনি তুলে থামা দিয়ে বললেন,—সুতরাং ও দু'টিকে যদি মানে মানে বিদায় করতে পারা যায় সেই চেষ্টাই কর।

—বিদায় করবে তুমি কোন্ উপায়ে? বিতাড়িত হবার পর প্রতিহিংসা লয় যদি, তখন?

—তবে আর মানে মানে কথাটা বলা কেন? শিবানীর বিবাহের স্থির করেছি আমি। বিয়া দিয়া বিদায় কর শিবানীকে। পরের ঘরে পাঠাও।

—মহেশনাথ যায় কোথায়? শিবানীর না হয় বিবাহ হ'তে পারে যে কোন উপায়ে। মহেশনাথ! মহেশনাথ যে প্রকৃতির পরিহাস!

দুঃখ ফুটলো যেন রাজাবাহাদুরের চোখে-মুখে। মহেশনাথের প্রতি সমবেদনায় কাতর হয়ে উঠলেন যেন। বললেন,—কেন? আমি যদি ঐ মূর্তিমান বীভৎসকে কাশীধামে পাঠাই?

—কাশীধামে! কেন? সেথায় পাঠানোর কি কারণ?

—মহেশনাথ কাশীধামেই থাকবে। থাকবে আমাদের ছত্র দেবোত্তরে। আমাদের ছত্রে তো থাকা-খাওয়ার ভাবনা নাই। কাশীধামে থেকে মহেশনাথ শাস্ত্রচর্চ্চা করবে, টোল পত্তন করতে চায় তো তাই-ই করবে। মহেশনাথ বিকলাঙ্গ হ'তে পারে, তবে শাস্ত্রজ্ঞ। সাংখ্য, দর্শন আর জ্যোতিষশাস্ত্রে মহেশনাথের যে অগাধ ব্যুৎপত্তি।

—এ তোমার মন্দ যুক্তি নয়।

ছোটকুমারের কথা শুনে যেন কত খুশী হন রাজাবাহাদুর! তাঁর তন্দ্রালস্য কেটে যায় তৎক্ষণাৎ। এলিয়ে ব'সেছিলেন, আসনপিঁড়ি হয়ে ব'সলেন। আলবোলায় শব্দ তুলে ঘন ঘন ধোঁয়া ছেড়ে বললেন,—শিবানীর পাত্র কে, তাই শুনতে চাও?

—কে?

—শ্রীমন্ত পুরোহিতের পুত্তুর ঐ শশিনাথ।

কাশীশঙ্করের দুই ভুরু আকুঞ্চিত হয়। বললেন,—শশিনাথ সম্মত হয়েছে?

—সে ভার আমার প্রতি অর্পণ করো। রাজাবাহাদুর প্রসন্ন কণ্ঠে কথা বলেন। বললেন,—শশিনাথ অসম্মত নয়। শশিনাথ তার মাতার অনুমতি পেলেই এ বিবাহ করবে, কথা দিয়েছে।

—শশিনাথের মা কি বলে?

—ত্রিবেণীতে থাকেন শশিনাথের মা। তাঁর মতামত এখনও জানতে পাই নাই। আমি কল্যই ত্রিবেণীতে ঘোড়সওয়ার পাঠাবো, স্থির করেছি। শশিনাথের মাতাকে পত্র লিখাবো। মনে করি, আমার অনুরোধ তিনি কোন মতেই এড়াতে পারবেন না।

—না, তা বোধ হয় পারবে না। কথার শেষে কি যেন ভাবলেন কাশী-শঙ্কর। বললেন,—উত্তম প্রস্তাব! যথা ব্যবস্থা করো।

ধূপদানি আর ধুনুচির গুগগুলের সর্পিল ধূম্রজালে বোধ করি ভাই ভাইয়ের মুখ দেখতে পান না। নয়তো কাশীশঙ্কর দেখতেন, রাজার খুশী-খুশী মুখ। সেই মুখে প্রচ্ছন্ন হাসি। আরও এক খিলি পান মুখে পুরলেন ছোটকুমার। পানদান থেকে এক টুকরো জৈত্রী তুলে দাঁতে কাটলেন।

—শিবানীর বিবাহের যা খরচাপত্র আমিই দিতে চাই। বিয়ে হবে সামনের লগনেই।

—বেশ কথা। তুমি যদি আদেশ করো, আমিও যৎকিঞ্চিৎ যা পারি দেবো।

এপাশে ওপাশে মাথা দুলিয়ে রাজাবাহাদুর বললেন,—না, তার কোন প্রয়োজন দেখি না। তোমাকে খরচান্ত করতেও চাহি না।

উঠে পড়েছিলেন কাশীশঙ্কর। হাতের কাজকর্ম্ম ফেলে ছড়িয়ে এসেছেন তিনি। ছোটকুমারের হাত ধ'রে আবার তাঁকে বসালেন রাজাবাহাদুর। মুখনল পাশে নামিয়ে রেখে বললেন,—আর একটি কথা আছে তোমার সহ।

আমি আর পারি না অনর্থক ঝঞ্ঝাট পোয়াতে! তুমি তো জানো, আমি শান্তিকামী। কলহ বিবাদ, বাকবিতণ্ডা কেন কি জানি আমার ধাতে সহ্য হয় না।

—কে আবার কলহ-বিবাদ ক'রলো?

সহসা গাম্ভীর্য্য ফুটলো রাজবাহাদুরের হাসিমুখে। বললেন,—কেন? আমাদের ঐ কেষ্টরাম! কি করা যায় তুমি তার একটা বিহিত করো।

—আমি কি করতে পারি?

—আমাদের মাতাঠাকুরাণী এমন কেঁদে-কেঁদে দিন কাটাবেন আমরা জীবিত থাকতে? বিন্ধ্যবাসিনীকে আমরা কেষ্টরামের অনাচার থেকে রক্ষা করতে পারবো না?

চিন্তার রেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, কাশীশঙ্করের প্রশস্ত ললাটে। চোখে ভাবালু দৃষ্টি। বললেন,—জগমোহন লেঠেলটাকে আগে ফিরতে দাও। তার মুখে বিস্তারিত শুনে যা হয় একটা করা যাবে।

—বিন্ধ্যবাসিনীকে সপ্তগ্রাম থেকে অন্যত্র প্রেরণ ক'রেছে কেষ্টরাম। শুনেছি গড়-মান্দারণে আছে বিন্ধ্যবাসিনী। নাপিতানী এসেছিল সাতগাঁ থেকে। এ খবরটা শুনায়ে গেছে সেই নাপিতানী।

চিবুক ধ'রে খানিক নতমস্তকে থেকে কাশীশঙ্কর বললেন,—তুমি যদি হুকুম করো আমি বিন্ধ্যবাসিনীকে উদ্ধার করতে পারি।

—কোন্ উপায়ে করতে চাও?

রাজার কথার সুরে ব্যগ্র কৌতূহলের আবেগ। ধীর কণ্ঠ।

—জগমোহন লেঠেল আসুক আগে। তার কাছে জেনে-শুনে যা করতে হয় আমিই করবো। ভেবে-চিন্তে যা হয় একটা স্থির করবো। কথা বলতে বলতে বারেক থেমে আবার বললেন,—গড়মান্দারণে যদি বিন্ধ্যবাসিনীকে রেখে থাকে তো তাকে উদ্ধার করা সহজ হবে। আমরা মেয়েকে এনে আর পাঠাবো না। অমন পাষণ্ড স্বামীর ঘর নাই বা করলো বিন্ধ্যবাসিনী!

—যথার্থই বলেছো তুমি। বিন্ধ্যবাসিনীকে ফিরে পাওয়া গেলে রাজ-

মাতাও আরও ক'টা দিন বাঁচতে পারেন। কথার শেষে আবার মুখনল তুললেন রাজাবাহাদুর। ঘন ঘন টানতে শুরু করলেন।

—জগমোহন লেঠেলকে আসতে দাও আগে, ততঃপর কর্ত্তব্য স্থির করা যাবে। তুমি এত ব্যস্ত হও কেন?

কেমন যেন কাতর হাসি হাসলেন রাজাবাহাদুর। বললেন,—দেখো কুমারবাহাদুর, আমার দিন হয়তো খুব বেশী আর নাই। আমি ব্যস্ত হই, তোমার আমার ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীদের কথা যখন চিন্তা করি। এই সকল আপদ তাদের পরেও বর্ত্তাবে না তুমি মনে করো, ?

কনিষ্ঠের কথার জন্য অপেক্ষা করলেন না রাজা। হঠাৎ চড়া সুরে ডাকলেন,—খানসামা!

একজন কেতাদুরস্ত খানসামা কক্ষে প্রবেশ ক'রে তসলিম ঠুকলো। রাজা সেই চড়া সুরেই বললেন,—পেয়ালা লে আও। সরাব লে আও!

মুখে বিরক্তি ফুটলো কাশীশঙ্করের। বললেন,—সরাব পান ক'রে ক'রেই শেষ করলে শরীরটা। আমি তবে বিদায় লই?

সহোদরের চিবুক স্পর্শ করলেন রাজাবাহাদুর। বললেন সস্নেহে,—ভাই, আর কিছুতে যে আমি শান্তি পাই না। দু'-চার পাত্র সরাবেই আমার সকল জ্বালার লাঘব হয়। বিন্ধ্যবাসিনীর তরে ভেবে ভেবেই আমি ম'লাম যেন।

—বিন্ধ্যবাসিনীকে উদ্ধারের ভার আমার প্রতি অর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হও। এজন্য আমাকে যদি মৃত্যু বরণ করতে হয় তাতেও রাজী আছি।

শিশুর মত হাসলেন রাজাবাহাদুর। হাসতে হাসতেই বললেন,—তা কেন হবে? আগে আমি যাবো, তারপর তুমি। মৃত্যুবরণের অগ্রাধিকার আমারই যে!

বিন্ধ্যবাসিনী! কনিষ্ঠা সহোদরার মুখখানি মনের আকাশে ভেসে ওঠে কাশীশঙ্করের। বিন্দুর অনিন্দ্য মুখশ্রী। অশ্রুর বন্যা যেন সেই ঢলো-ঢলো মুখে! মনে মনে যেন কি এক পণ করতে করতে ফিরে চললেন ছোটকুমার

রাজমহল ত্যাগ ক'রে চললেন হনহনিয়ে।

দরদালান থেকে দেখা যায় রাত্রির মৌননীল আকাশ। শুক্লা ত্রয়োদশীর কানাভাঙা চাঁদ উঠেছে আকাশের বুকে। চন্দ্রভস্ম না স্বর্ণভস্ম ঝিরঝিরিয়ে পড়ছে চন্দ্রমণ্ডল থেকে।

সূর্য্য ডুবে গেল। ঝিঁঝির ডাকের সঙ্গে সঙ্গে যেন কাজল-কালো তমসা ছুটে এলো কোন অজানা গহ্বর থেকে। আকাশের কোল অস্পষ্ট হ'তে না হ'তে পৃথিবী যেন কালো ওড়না টানলো। একটি কি দু'টি সোনালী চুমকি যেন চিকণ তুললো। দপদপে শুকতারা হঠাৎ কোথায় নিরুদ্দেশ হয়! উড়ু-উড়ু মেঘমালার আড়ালে মিশিয়ে যায় দেখতে না দেখতে। জোড়া-জোড়া তুলো-সাদা লক্ষ্মীপেঁচা উড়ে গেল রাজগৃহের বিশাল ছাদ পেরিয়ে। নাটমন্দিরে কাঁসর-ঘণ্টা বাজতে শুরু করেছে।

সন্ধ্যা সমাগমে বীণার তারে ইমন কল্যাণ ধরেছিলেন ছোটরাণী। হঠাৎ যেন বীণার তার ছিন্ন হয়। সন্ধ্যা উৎরে যায়, খেয়াল হয় শাঁখের আওয়াজ শুনে। থেকে থেকে বড় বেশী একা মনে হয় নিজেকে। মনে হয় ছোটরাণী সর্ব্বজয়ার কেউ নেই যেন এ জগতে। মেজরাণী সর্ব্বমঙ্গলা আছেন তাঁর আপন সহোদরা, শিবের মত আত্মভোলা স্বামী আছেন—তবুও যেন কেমন একা-একা ঠেকে। রাজগৃহের আরাম-সুখে ডুবে আছেন, তবুও সর্ব্বজয়ার সদাই যেন ম্লান মুখ। হাসতে ভুলে গেছেন যেন। বীণাবাদিনী তিনি, সুরলোকে যতক্ষণ থাকেন, ততক্ষণই যেন নিশ্চিন্তায় থাকেন। গৃহদেবতার উদ্দেশে অন্তরাঞ্জলি দিয়ে সর্ব্বজয়া চললেন রাজমহলের দিকে। যাওয়ার আগে শুধু একবার দেখলেন নিজ মুখ। দর্পণ তুলে ধ'রে দেখলেন মুখের চিন্তা-কালিমা মুছে গেছে না আছে।

এক হাতে বেলকুঁড়ির গোড়ে, অন্য হাতে আলবোলার মুখনল। রাজা-বাহাদুর কালীশঙ্কর কি এক গভীর ভাবনায় আচ্ছন্ন যেন। দেওয়ালগিরির উজল আলোয় রাজার ঘুম-লাল চোখ দু'টি দেখায় যেন আগুনের ভাঁটার মত। ধূপ আর ধুনোর আঁকাবাঁকা ধোঁয়ার রাজকক্ষ পরিপূর্ণ। আসবাবপত্র অদৃশ্য

যেন। কিন্তু কালীশঙ্করের লাল চোখ স্পষ্ট হয়ে আছে। আরক্ত আঁখি চকচক করছে।

রাজার মন নেই রাণীদের প্রতি। যত স্নেহ-প্রেম-সোহাগ যেন ফুরিয়ে গেছে তাঁর। আসবের নেশায় আর বারনারীর রূপেই আত্মহারা যেন সর্ব্বক্ষণ। অথচ রূপের ডালি একেক রাণী ঘরে বন্দিণী প্রায়।

—রাজাবাহাদুর!

কেমন যেন ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে ডাকলেন সর্ব্বজয়া।

—কে? পাটরাণী না কি?

আসবের পাত্র রেখে কথা বললেন কালীশঙ্কর। দুয়োর পানে চোখ ফেরালেন। নেশায় ঢুলু-ঢুলু চোখে শূন্যদৃষ্টি ফুটে আছে যেন।

—পাটরাণী আর পাটরাণী! স্বগত করলেন ছোটরাণী, ক্ষুব্ধ-কণ্ঠে বললেন,—আমরা বুঝি ভেসে আসছি গাঙের জলে?

হেসে ফেললেন রাজা। শিশুর মত সহজ-সরল হাসি। ঊর্দ্ধাঙ্গ নেচে উঠলো তাঁর, হাসির বেগে। হেসে হেসেই বললেন,—জয়ারাণী, এসো, কাছে এসো।

—রাণী নয়, বাঁদী বলুন।

দুঃখকাতর কথা বললেন সর্ব্বজয়া। তাঁর ওষ্ঠাধর যেন কাঁপছে থরথরিয়ে। মুখে হাসি মিলিয়ে যায় মুহূর্ত্ত মধ্যে। রাজার ললাটরেখা ধনুকের মত বাঁকা হয়ে উঠে। বললেন,—এমন কথা কেন কও রাজরাণী? তোমার কি কোন, কষ্ট আছে! মুখে হাসি দেখি না কেন?

অপলক চোখে তাকিয়ে থাকলেন সর্ব্বজয়া। ব্যথাতুর চাউনি যেন চোখে। নীরব থাকতে থাকতে বললেন,—আপনাকে যে পাই না রাজা-বাহাদুর! আপনিও কখনও আমল দেন না। আমি তবে যাই কোথা সাধ-আহ্লাদ নেই আমার?

পালঙ্কে ব'সেছিলেন রাজা। সুসজ্জিত শয্যা তাঁর। পালঙ্কের চতুর্দ্দিকে জরির ঝালর ঝুলছে। ভেলভেটিনের উপাধানে দেহ এলিয়ে দিয়েছেন নেশার

আসেছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন তাঁর অবশ হয়েছিল, দু-'এক পাত্র পান করতে না করতে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছেন। ধীরে-সুস্থে উঠে বসলেন তিনি। রাজমহিষীর কমলকোমল হাত ধ'রে কাছে বসিয়ে বললেন,—আমার নিকট তোমরা সকলেই সমান। কেউ বেশী, কেউ কম নয়। তুমি তো লজ্জাতেই মগ্ন হয়ে থাকো, তোমার সাক্ষাৎ পাই কখন ?

অভিমানের দৃষ্টি ফুটলো রাণীর আঁখি-তারকায়। কেঁপে উঠলো আলতা-রাঙা অধর। সুর্মা দেওয়া চোখের প্রান্তে পোখরাজের মত দু'ফোঁটা জল টলমলিয়ে উঠলো। কেমন যেন ডুকরে ডুকরে উঠলেন রাণী। আড়ষ্ট জিহ্বা।

কালীশঙ্কর আবার বললেন,—কথা নেই কেন মুখে ? শরীরের ভাব-গতিক কি ভাল নাই ? কোন অসুখ-বিসুখ নয় তো ?

ইদিক-সিদিক মাথা দুলিয়ে রাণী বললেন,—আপনাকে পাই কৈ ? ভাবলে জ্ঞান থাকে না ! আমার এই রূপযৌবন কা'কে দিতে যাবো আমি ? কে নেবে ?

সাড় ফিরলো রাজাবাহাদুরের। রাণীর ব্যথা শুনে সব নেশা কেটে গেল যেন ক্ষণমধ্যে। কাছেই ছিলেন সর্ব্বজয়া, হাতের নাগালেই ছিলেন। রাণীর কোমর জড়িয়ে আরও কাছে টেনে নিলেন। পশমের স্তূপে যেন হাত লাগলো রাজার। বললেন, ইতি-উতি তাকিয়ে বললেন,—আমাকে দেবে। তুমি তো আমারই। শুধু এ জন্মে নয়, গতজন্মেও ছিলে, পরজন্মেও থাকবে।

কথা বলতে বলতে ভরাযৌবনা রাণীর বুকে মুখ রাখলেন কতক্ষণ।

—এ তো শুধু কথার কথা রাজা ! প্রমাণ পাই না তো। ফিরেও দেখেন না একবার।

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন ছোটরাণী। আবার যেন ডুকরে ডুকরে উঠলেন।

—কথার কথা নয় রাণী। এ আমার মনের কথা। কথা বলতে বলতে কালীশঙ্করের বাহুবেষ্টন যেন নিবিড়তর হয়। বলেন,—এই লও মালা। কথার শেষে বেলকুঁড়ির মালা পরিয়ে দিলেন সর্ব্বজয়ার কণ্ঠে।

ফুলের ছোঁয়ায় বুকে যেন সুখের ছোঁয়া লাগে। এত দুঃখের মাঝেও খুশীর হাসি হাসলেন ছোটরাণী। গললগ্ন মালাটি খুলে রাজার কণ্ঠে পরিয়ে দিতে দিতে বললেন,—আমার রাজা আমার সর্ব্বস্ব, আমার চোখের মণি! আজ রাতে আমার মহলে আপনি থাকবেন। রাত কাটাবেন। আপত্তি করবেন না যেন।

—তথাস্তু, তথাস্তু। তাই হবে ছোটরাণী! হেসে হেসে বললেন রাজা কালীশঙ্কর। তৃপ্তির হাসি হাসলেন যেন। বললেন,—ফুলের বিছানা মিলবে তো? আমি চাই কি, শুধু গোলাপ থাকবে শয্যায়। চৈত্রী গোলাপ।

—তাই হবে রাজা। আমার রাজা আমার কাছে থাকবেন, এ তো আমার পরম সৌভাগ্যি!

বৃষ্টির সময়ে সূর্য্যালোকের মত এত কষ্টেও মৃদু মৃদু হাসতে থাকেন ছোট-রাণী। আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার লোভে ভুলে গেছেন যেন সোহাগ-বঞ্চিত পূর্ব্বাবস্থা।

—এক্ষণে হাসি দেখাও তবে! তোমার শ্রীমুখের মুক্তাঝরা হাসি দেখি আমি। তুমি খুশী হও।

মুখে হাসি ফোটে না ছোটরাণীর। আদর-কদরের কোন মূল্য নেই যেন তাঁর কাছে। সুরলোকে থাকেন সর্ব্বজয়া, তাই যেন মরলোকের প্রতি তাঁর যত বিতৃষ্ণা। কাঁপা-কাঁপা কণ্ঠে বললেন,—আপনি তো দরবারে আর রঙমহলেই থাকেন। রাজমাতা আর ছোটকুমার ছাড়া কাকেও আমল দেন না। আমরা তবে যাই কোথা?

রাজাবাহাদুর মৃদু হেসে বললেন,—অকারণে রোষ প্রকাশ কর কেন? তোমরা ক'জনেই আমার সুখ-দুঃখের ভাগীদার। আর কে আছে আমার?

কথা বলতে বলতে রাণীর কণ্ঠে রাজাবাহাদুর বেলকুঁড়ির গোড়ে পরিয়ে দিয়েছেন। এক প্রতিমা যেন মাল্যভূষিতা হয়ে দেখা দিয়েছেন রাজার সমুখে। মনের আনন্দ চেপে সর্ব্বজয়া বলেন,—সময় নেই অসময় নেই, দিন-রাত্তির এই বিষ আপনি পান করছেন! অজাত-কুজাত মানেন না, রঙমহলে মুসলমানীদের

এনে তুলেছেন! তিন রাণীতেও মন ভরে না?

হো-হো শব্দে হেসে ফেললেন কালীশঙ্কর। দিলখোলা হাসি হাসলেন। হাসতে হাসতেই বললেন,—সেগুলোকে তো বিদায় দিয়েছি আজ। তবে আর আক্ষেপ কেন? কথা বলতে বলতে আসবপূর্ণ পাত্র তুলে ধ'রে বললেন,—এ বিষ নয় ছোটরাণী, এ যে অমৃত! এই অমৃতপানে যত ব্যথা আর কষ্টের লাঘব হয়, উপশম হয়। কথার শেষে মুখে তুললেন রাজা। এক নিমেষে পান করলেন প্রায় অর্দ্ধপাত্র। মুখ বিকৃত করলেন।

সর্ব্বজয়া জানেন, অনুরোধ, উপরোধ আর নিষেধে কোন ফল হবে না। বারণ মানবেন না রাজাবাহাদুর। কারও কথায় কর্ণপাত করবেন না। মিহিসুরে রাণী বললেন,—স্মরণ আছে তো, আমার মহলে আজ রাত্রিবাসের কথা?

ঘুমরাঙা চোখ দু'টি আরও যেন লালাভ হয়ে উঠেছে। সদ্য আসবপানের প্রতিক্রিয়ায় রাজকণ্ঠ যেন জড়িত, অস্পষ্ট। রাজা বললেন,—ছোটরাণী, পৃথিবী রসাতলে গেলেও আমার কথা নড়বে না, নিশ্চিত জেনো।

হঠাৎ হাসির আভাস দেখা যায়, সর্ব্বজয়ার লাল অধর কোণে। হাতে যেন স্বর্গ পেয়েছেন তিনি, এমনই মুখভঙ্গী। রাজার বাহুবেষ্টন থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে রাজাবাহাদুরের পদযুগলে মাথা রাখলেন। প্রণাম করলেন বহুক্ষণ। উঠে বললেন,—যাই, গিয়ে আপনার জন্য গোলাপের শয্যা রচনা করিগে। ইতিউতি দেখে বললেন,—কত কাল পরে আপনাকে যে কাছে পাবো আমি! আজ আমার বড় সুদিন।

এ কথার কোন জবাব দিলেন না কালীশঙ্কর। মৃদু মৃদু হাসতে থাকলেন। আবার এলিয়ে পড়লেন ভেলভেটিনের তাকিয়ায়। সর্ব্বজয়া দ্রুতপায়ে রাজকক্ষ ত্যাগ করলেন। তাঁর পায়ের তোড়া ঝমাঝম শব্দ তুলে মিলিয়ে গেল রাতের আঁধারে।

—খানসামা! আলবোলায় কল্কে বদল করো।

কালীশঙ্করের উচ্চস্বরে রাজকক্ষ গমগমিয়ে ওঠে। অন্দরের কত দূর

থেকে শোনা যায় রাজার কথা। যেন বজ্রপাতের মত শোনায়।

খানসামা কক্ষে বদলে দিয়ে যেতেই কার কথা ভেসে আসে কালীশঙ্করের কানে।

—রাজামশাই, কক্ষে প্রবেশের অনুমতি দিন।

—কে? বললেন রাজাবাহাদুর। সাগ্রহে চোখ ফেরালেন দুয়ারে। বললেন,—মহেশনাথ না কি? এসো ভাই, এসো। অনুমতির অপেক্ষা কেন আর?

বিকলাঙ্গ মহেশনাথের আবির্ভাবে রাজকক্ষের সকল সাজসজ্জা যেন লুপ্ত হয়ে যায় কোথায়। কৃষ্ণবর্ণ মহেশনাথের অর্দ্ধাঙ্গ পক্ষাঘাতে পঙ্গু। দেওয়াল-গিরির কম্পমান আলোয় আরও যেন ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে মহেশনাথের কদাকার আকৃতি। বহুকষ্টে অন্দরের এতটা পথ অতিক্রম করে এসেছেন মহেশনাথ। হাঁপ ধরেছে যেন।

—কি বক্তব্য মহেশনাথ? কালীশঙ্কর জড়িত স্বরে প্রশ্ন করলেন। লাল চোখে যেন জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ফুটলো। বললেন,—কোন' দুঃসংবাদ আছে নাকি?

মহেশনাথ হাঁপিয়ে বলেন,—আগে দম নিতে দিন রাজবাহাদুর, তত্তঃপর বক্তব্য পেশ ক'রবো। দুঃসংবাদ নয়, কতকগুলো বিষয় জানতে চাই আমি।

রাজাবাহাদুর কেমন যেন চকিতের মধ্যে ভীত হয়ে পড়েন। মুঘল বাদ-শাহের দেওয়া পুরুষানুক্রমিক খেতাব—সম্মানসূচক উপাধি রাজাবাহাদুর—সে তো শুধু এ বংশের বীরত্বের পুরস্কার। শুধু রাজা নয়, বাহাদুরও বটে,—অর্থাৎ রাজাবাহাদুর। স্বর্গত রাজার মতই কালীশঙ্করও বীরত্বে বিখ্যাত। ছেলে-বেলায় তাঁর খেলার সাথী ছিল ব্যাঘ্রশাবক। যৌবনের প্রারম্ভে বিনা অস্ত্রে লড়াই করেছিলেন কালীশঙ্কর—এক হৃষ্টপুষ্ট বাঘের বক্ষ বিদীর্ণ ক'রেছিলেন। বাঘও যুঝেছিল যতক্ষণ জীবিত ছিল। একটি থাবার আঘাতে রাজার উরু থেকে কিঞ্চিৎ মাংস ছিঁড়ে উপড়ে নিয়েছিল।

সেই বিপুল বলশালী রাজাও যেন মহেশনাথকে দেখে ভয় পেয়েছেন। মহেশনাথের কুশ্রী রূপ দেখে ভয় নয় তাঁর, কিন্তু মহেশনাথ যদি কথায় কথায়

কোন দাবীদাওয়া জানায়! রাজত্ব আর রাজত্ব দাবী করে যদি পৈত্রিক অধিকারে!

মহেশনাথ ভূমিতে আসন গ্রহণ করলেন। ধীরে ধীরে বললেন,—রাজা-বাহাদুর, লোকপরম্পরায় শুনছি, আপনি নাকি শিবানীর বিবাহের ব্যবস্থা করছেন? পাত্র পর্য্যন্ত ঠিক হয়ে গেছে শুনেছি? ইহা কি সত্য?

খানিক নিশ্চিন্ত হন রাজা। স্বস্তির শ্বাস ফেলে বলেন,—তুমি মিথ্যা শুন নাই মহেশনাথ। শিবানীর বিবাহে কি আপত্তি আছে তোমার? পাত্র শ্রীমন্ত পুরোহিতের পুত্তুর ঐ শশিনাথ।

—উত্তম প্রস্তাব রাজাবাহাদুর! বললেন মহেশনাথ। এক বুক শ্বাস টেনে বললেন,—পাত্রটিও অপছন্দের নয়। ঐ শশিনাথের সহ বিবাহ হ'লে শিবানীর জীবন ধন্য হয়ে যাবে। শশিনাথ সুপুরুষ, কুলীন ব্রাহ্মণ, তদুপরি ন্যায়-নিষ্ঠ ও শাস্ত্রজ্ঞ। শিবানীর বিবাহ যত শীঘ্র হয় ততই মঙ্গল। আমিও ভারমুক্ত হই। ক্ষণেক থেমে আবার বললেন,—কিন্তু রাজা, আমার জন্য কি করলেন? আমি যাই কোথায়?

পাত্র শেষ করলেন কালীশঙ্কর। এক চুমুকে অবশিষ্ট পানীয় শেষ করলেন। একটি আখরোট চিবোতে চিবোতে বললেন,—স্থির করেছি, মহেশনাথ, তুমি যাবে বারাণসীতে।

—বারাণসীতে থেকে কি ভিক্ষা ক'রে খাবো। মহেশনাথ বললেন আতঙ্কিত স্বরে।

—ছি, ছি! কি যে বল মহেশনাথ! রাজাবাহাদুর তাকিয়া ছেড়ে উঠে বসলেন। বললেন,—ভিক্ষা মাগতে যাবে কোন্ দুঃখে? আমি থাকতে তুমি ভিক্ষা মেগে খাবে?

মহেশনাথের চোখে যেন দুঃখের ছায়া ফুটলো! বললেন—ভিক্ষা ছাড়া আমার ন্যায় প্রকৃতির পরিহাস কোথায় অন্ন পাবে রাজাবাহাদুর?

—কি যে তুমি বল' মহেশনাথ! পাত্র পুনরায় পূর্ণ করতে করতে কথা বললেন কালীকিঙ্কর। বললেন,—তুমি তো জ্ঞাত আছো, পঞ্চকোশী কাশীতে

আমাদের একটি দেবালয় আছে। বিগ্রহ আছে সেই দেবালয়ে। ছত্র আছে। প্রত্যহ পঞ্চাশ জন অনাথ আতুরের পাত পড়ে সেখানে। দেবোত্তর সম্পত্তি, সেথায় তোমার আহার ও বাসস্থানের পাকা ব্যবস্থা করবো, মনস্থ করেছি। তুমি কি বল ?

হাসির চাকচিক্য খেললো মহেশনাথের চোখে। ক্ষণেক স্তব্ধ থেকে বললেন,—আপনার ইচ্ছাই ফলপ্রসূ হোক রাজাবাহাদুর! বারাণসীতে বসবাসের ব্যবস্থা হ'লে আমি রক্ষা পাবো। শিবস্থান বারাণসী, মা অন্নপূর্ণার এলাকা। বারাণসীতে মৃত্যুও শ্রেয়ঃ। গতজন্মে কি মহাপাপ করেছি জানি না, তজ্জন্যই আমার এই দুরবস্থা। কাশীতে মরণ বরণ করলে তো অক্ষয় স্বর্গবাস, শিবত্বপ্রাপ্তি! তাই হোক রাজাবাহাদুর, আমিও লোকচক্ষুর অন্তরালে গিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। এই বিকৃত আকৃতি আর সমাজে দেখাতে হয় না।

মহেশনাথ কথা বলতে বলতে কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছলেন। তপ্ত অশ্রু মুছলেন। নিজের প্রতি যেন তাঁর ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয় থেকে থেকে। নিজের রূপের প্রতিবিম্ব কোথাও দেখলে মহেশনাথ নিজেই শিউরে ওঠেন। কত মানুষ আছে, যাদের রূপ থাকে না! কত মানুষ আছে, যারা কুৎসিত ও কদাকার! কিন্তু এমন মানুষ ক'জন আছে, যাদের রূপ বিকৃত, অস্বাভাবিক, দোষগ্রস্ত ? মহেশনাথ তাদেরই একজন। সেই দুঃখে হয়তো চোখের জল ফেলছেন!

—আর কিছু বক্তব্য আছে মহেশনাথ ? কিছু বলবে কি ?

রাজাবাহাদুর মুখনল তুললেন মুখে। ঘন ঘন টান দিতে থাকলেন। দেওয়ালগিরির আলো-অন্ধকার আরও যেন বীভৎস দেখায় মহেশনাথকে। চোখে যেন দেখতে পারেন না কালীশঙ্কর। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে কথা বলছেন তাই।

—রাজাবাহাদুর! কথা বলতে গিয়ে যেন আর বলতে পারেন না মহেশনাথ। জলভরা চোখ মুছলেন আবার। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন,—রাজাবাহাদুর, শিবানীর বিবাহের পূর্ব্বেই আমার কাশীবাসের ব্যবস্থা করুন, এই মাত্র অনুরোধ আমার।

মেশাচ্ছন্ন সুর রাজার। জড়ানো জড়ানো। বললেন,—সে কি মহেশনাথ, তোমারই সহোদরার বে, তুমি থাকবে না, সে কেমন কথা!

হতাশ হাসি হাসলেন মহেশনাথ। বললেন,—এই আনন্দোৎসবে আমাকে কিবা প্রয়োজন? আমি আশীর্ব্বাদ করছি শিবানীকে। সে সাবিত্রীসমান হোক, আয়ুষ্মতী হোক। তার সীঁথির সিন্দুর অক্ষয় হোক। সুখী হোক। কথার শেষে কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার বললেন,—আর কিছু বলবার নাই আমার। এখন আমি বিদায় লই।

উঠে পড়লেন মহেশনাথ, অতি কষ্টে। রাজাকে একা রেখে কক্ষ ত্যাগ করলেন, অতি সন্তর্পণে।

শিবানী এখন প্রেমান্ধ। এত কাল ছিল মুকুলতার মত, এবার পাবে স্পর্শ-সুখ, পাবে আশ্রয় আর অবলম্বন। একাকিনী পাবে প্রিয়সঙ্গ। থাকতো ভয়ে ভয়ে, এবার হবে তার ভয়-ভঞ্জন। যোগিনী হবে প্রেয়সী। ছিল নিরাসক্ত, হঠাৎ যেন হয়েছে কেমন ভাবনশীলা!

অভ্র-আয়নায় নিজেকে দেখতে দেখতে মুগ্ধ হয়ে পড়ে যেন। কেশবিন্যাসে বিরত হয়ে দেখে তার মুখপদ্ম। মদালস চাউনি যেন চোখে। কোথায় গেল মুখের সেই বিরহপাণ্ডুরতা! কবরী রচতে ব'সে কত কি মনে পড়ে শিবানীর! অনাগত সুখের দিনের ছবি, ছায়া ছায়া দেখতে পায় যেন। রাত্রির আকাশে চাঁদের মত, শিবানীর ব্যথিত চিত্তে ভেসে ওঠে এক চাঁদমুখ। শশিনাথের মুখ!

লজ্জা নামে যেন দেহ-মনে। নিজের রূপ আর যৌবন দেখতে দেখতে যেন লজ্জা পায়। এত রূপ আর এত যৌবন তার, এতদিনে যেন এই প্রথম চোখে পড়েছে। শিবানী ভাবছিল, শশিনাথ কোথায় এখন? আর একটিবার যদি দেখা পাওয়া যায় তার, শিবানীর বুকের তুফান যেন থামবে। শশিনাথকে দেখতে দেখতে জুড়িয়ে যাবে চোখের জ্বালা। অদর্শনের ব্যথা ঘুচবে।

—আয় লো, তোকে সাজিয়ে দি।

কার কথায় যেন সাড় ফিরলো শিবানীর। চমকে চমকে উঠলো মনের

পাশে। কি ভাব জেগেছিল মনে কে জানে, কেমন যেন থ মেরে গেল। অনড়-অচল হয়ে থাকলো কতক্ষণ। হাতের তালু ঘামতে শুরু করলো। চোখের পলক পড়ে না যেন আর।

—কি লো, ভাব লাগলো নাকি! এত চুপচাপ কেন?

কথা শুনে চমকে চমকে উঠলো শিবানী। আড়ষ্ট হাসি হাসলো। নকল হাসি। বললে,—বড়রাণী, তুমি এমন অসময়ে যে আমার ঘরে?

উমারাণীও হাসলেন মিষ্টি মিষ্টি। শিবানীর পাশে বসলেন। বললেন,—কেন লো শিবানী, আসতে নেই বুঝি। তুই তো একলা আছিস, তবে আর ভাবনা কেন?

হাসির আভাস দেখা যায় শিবানীর মুখে। চাপা-আনন্দের সলাজ হাসি। বললে,—ভূঁয়ে বসলে কেন বড়রাণী? মাতুরখানা বিছিয়ে দিতে তর সইলো না আর?

—থাক থাক, ঢের হয়েছে। উমারাণী কথা বলতে বলতে চিরুণী তুলে নিলেন। কাঠের চিরুণী। বললেন,—আয়, আজ তোকে সাজিয়ে দিই!

—তা দাও। কিন্তু এমন অসময়ে যে?

—হাতে কোন কাজ ছিল না। রাজপুত্তুরকে ঘুম পাড়িয়ে ভাবনু কোথায় যাই, কি করি! ভাবতে ভাবতে তোর কথা মনে পড়লো, তাই এসেছি।

—রাজামশাইয়ের কাছে গেলেই পারতে। তিনি বুঝি অন্দরে নেই?

—হ্যাঁ অন্দরেই আছেন। নেশায় টইটুম্বুর হয়ে আছেন। তাঁর কাছে এখন ছোটরাণী, সোয়াগ খাচ্ছেন! দূর থেকে দেখেই স'রে প'ড়েছি। পেছন ফিরে ব'স, চুল বেঁধে দেবো।

অনিচ্ছার ভাব ফুটলো শিবানীর মুখে। বললে,—আমার যা চুল, জট ছাড়াতেই তোমার হাত টনটনিয়ে উঠবে! এই চুলের রাশি আমিই যে সামলাতে পারি না।

—দেখাই যাক না, পারি কি না পারি। পেছন ফের না তুই।

শিবানী দেহ ঘুরিয়ে বসে। সাজিয়ে দেওয়ার কথা শুনে আনন্দে সে যেন

উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। কিন্তু দুঃখে কিছু ব্যক্ত করে না।

শিবানীর চুলের গোছা মুঠোয় ধ'রে চিরুণী চালাতে চালাতে বড়রাণী বললেন,—ঘাড়ে যে ময়লা লো! যে ক'দিন বে না হয় সে ক'দিন একটু-আধটু শরীরের তোয়াজ কর্। সর-ময়দা মাখ্, হলুদ-বেসম মাখ্, তবে তো রূপ খুলবে।

রাণীর কথাগুলি মনে লাগে শিবানীর। মনে মনে স্থির করে, বড়রাণীর কথা রেখে এ ক'দিন শরীরের তোয়াজ করবে যথাসাধ্য। সর-ময়দা মাখবে, হলুদ-বেসম ঘষবে! পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হবে। মাথায় তেল দিয়ে দিয়ে কেশের যত্ন করবে! কিন্তু রাণীর কথার কোন জবাব দেয় না। নীরব থাকে।

—যত্ন-আত্তি করলে দেখবি তোর কত রূপ! আসল চেহারাটা যে তোর চাপা প'ড়ে আছে অযত্নে আর অবহেলায়। চুলের গোছায় চিরুণী চালাতে চালাতে উপদেশের সুরে ব'লে চলেন উমারাণী।

ঘরের এক কোণে প্রদীপ জ্বলছে। লকলকে শিখা কাঁপছে থরথরিয়ে, দেওয়ালে দু'জনের ছায়া প'ড়েছে। মশার ঝাঁক উড়ছে শিয়রের কাছে। আঁধার নামতে না নামতে মশার দল ছুটে আসছে, বন-বাদাড় থেকে। ইদিক সিদিক চোখ ফিরিয়ে বড়রাণী বললেন,—এই ফাঁকা তল্লাটে একা-একা থাকতে তোর ভয় করে না শিবানী? ডাকলে তো কারও সাড়া মেলে না এখানে!

স্বল্প হাসলো শিবানী। পেছন থেকে চুলের গোছা টেনে ধ'রে আছেন উমারাণী। চিরুণী চালিয়ে চ'লেছেন, জট ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে। শিবানীর মুখখানি তাই উঁচিয়ে আছে। শিবানী বললে,—উপায় কি বল। ভয় করলে তো চলবে না আমাদের! এই আশ্রয়ই বা পায় কে?

—আমার তো ভয় ভয় করছে। বড়রাণী সভয়ে বললেন। খানিক থেমে আবার বললেন,—তুই শ্বশুরঘরে চ'লে গেলে আমি যে কেমন ক'রে থাকবো তাই ভাবছি। এখন থেকেই বুক যেন আমার খাঁ-খাঁ করছে। শশিনাথ তোকে এখানে রাখবে না?

লজ্জাভরা সুর শিবানীর। বললে,—কিছু তো জানি না বড়রাণী!

—সেই ত্রিবেণীতে গিয়ে থাকতে হবে তোকে। পারবি তো থাকতে? উমারাণী যেন মন জানতে চান শিবানীর। মনের আসল ভাবটি জেনে নিতে চান।

আমতা আমতা করে শিবানী। কি বলবে যেন ভেবে পায় না। অনেক ভেবে ভেবে বললে,—তোমরা সকলে মিলে যদি তাঁদের বল, থাকতে যদি তাঁরা দেন, আমার আর আপত্তির কি আছে?

—আচ্ছা। রাজাকে আমি ব'লবো খন। দেখি কি হয়। তবে আমার তো মনে হয় না তাঁরা রাখবে। ঘরের বৌ ঘরে নিয়ে যাবে না?

চুপ হয়ে যায় শিবানী। আনন্দে আর নিরানন্দে মুখ দিয়ে কথা সরে না যেন। ঘরের মুক্ত গবাক্ষ থেকে সোজা চোখ চালিয়ে রাতের কালো আকাশ দেখতে থাকে। শুক্লাকাশে রাশি রাশি তারা জ্বলছে মিটমিটিয়ে। চাঁদ কৈ? নভোশশী কৈ? বিন্দু বিন্দু আলোর ফুটকি দেখা যায় শুধু। এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে। চন্দ্রমণ্ডল দেখা যায়, কিন্তু চাঁদ দেখা যায় না। ঐ চন্দ্রবলয়ের রেখা দেখেই খুশী হয় শিবানী। মনের চোখ দিয়ে দেখে যেন নির্নিমেষ দৃষ্টিতে। ভাবে, বলয় যখন আছে, তখন শশীও আছেন। চোখে ধরা প'ড়ছে না শুধু!

হঠাৎ কথা ধরলে শিবানী। বললে,—থাকতে আমি পারি। তবে শুধু ভয় হয় এক জনকে। তিনি যদি অমত করেন বড়রাণী?

—কে লো, কার কথা ক'চ্ছিস বলতো? কা'কে আবার ভয়? আমাদের রাজাকে?

কৌতূহলী কথার সুর উমারাণীর। চিরুণী থামিয়ে ব'সে থাকেন উত্তরের আশে।

বলবে কি বলবে না, ভাবতে থাকে শিবানী। দোনামনা করে যেন। কণ্ঠরোধ হয় যেন তার।

—কি লো, চুপ করলি কেন? অধৈর্য্য প্রকাশ পায় বড়রাণীর কথায়।

রাগের সুর যেন।

শিবানী বললে,—রাজাকে ভয় নয়, ভয় আমার ছোটকুমারকে। তাঁকে দেখলে যেন ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যাই। তিনি যদি বলেন, বে-থা হ'ল যখন তবে আবার আমাদের স্কন্ধে কেন? তাই বলি, মানে মানে স'রে পড়াই ভাল।

উমারাণীও নিরুত্তর হন। ছোটকুমার কাশীশঙ্কর যেন এক ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। যেমন গম্ভীর, তেমনি একরোখা। দুই ভাইয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ মাটির মানুষ, আর কনিষ্ঠ যেন লৌহমানব। তবে বড়রাণীকে কাশীশঙ্কর সত্যিই শ্রদ্ধা-ভক্তি করেন। ঠিক লক্ষ্মণ যেমন ভাতৃজায়া সীতাকে মান্য করতেন। সেই আশাতে যেন বুক বেঁধেই বড়রাণী বললেন,—ছোটকুমার আমার কথা ঠেলতে পারবে না। আমি যদি তাঁকে বলি, নিশ্চয়ই শুনবে। ক্ষণেক থেমে বললেন সুর নামিয়ে,—তা ছাড়া, তোকে তিনি খুব স্নেহের চোখেই দেখেন। আমি বেশ জানি, তোর প্রতি তাঁর—

কথা আর শেষ করলেন না রাণী। চিরুণী চালাতে শুরু করলেন ঘন ঘন।

বুক যেন হু হু ক'রে ওঠে শিবানীর। দুঃখের ব্যথা বাজতে থাকে যেন বক্ষ-মাঝে। কিন্তু বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। শিবানী নির্ব্বাক; তাকিয়ে থাকে শূন্য দৃষ্টিতে, ঐ শূন্য পানে! কথা বলে না, যদি ধরা প'ড়ে যায় তাই। যদি জানাজানি হয়ে যায় তার মনের ভাব! কাশীশঙ্করের প্রতি তার লোভের অন্ত ছিল না একদিন। কিন্তু সে আশা যে বৃথা এখন। মিথ্যা বৈ তো নয়।

·

দিন ফুরিয়ে কখন রাতের কালোয় দিগ্বিদিক অদৃশ্য হয়ে গেছে, জানতে পারেননি কাশীশঙ্কর। ঘরে সাঁঝের বাতি নজরে পড়েনি। সেঁজুতির আলোয় ঘর উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। খেয়াল নেই, দিনের প্রাকৃতিক আলো, না তেলের আলো জ্বলছে! তুলট কাগজের লম্বা খাতায় জমা-খরচ লিখছেন ছোটকুমার। পাশে টাকা আর মোহরের আণ্ডিল। এক গোপন সেরেস্তা ঘরে ব'সে কাজ করছেন নিবিষ্ট মনে। ঘরের দ্বার রুদ্ধ। বাতাসের লেশ মাত্র নেই ঘরে, তাই দরদরিয়ে ঘামছেন কুমারবাহাদুর।

দুয়ারে টোকা প'ড়লো। এক দুই তিন। তবুও সাড়া নেই ঘরের মানুষের। আবার করাঘাত পড়লো! বাইরে থেকে কে যেন ধৈর্য্য হারিয়ে দুয়ার ঠেলছে। সন্দিহান হয়ে উঠলেন কাশীশঙ্কর। ভ্রূ দুটি তাঁর নেচে উঠলো বারেক। এত নগদ টাকা আর মোহর ছড়িয়ে আছে ঘরে। কোন তস্কর নয়তো! ফটকের পাহারাদারের চোখ ফাঁকিয়ে হয়তো অনুপ্রবেশ ক'রেছে অন্দরে। ভয় নয়, আশঙ্কায় আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন কুমারবাহাদুর। সেরেস্তা ঘরে তেমন কোন একটি ধারালো অস্ত্র পর্য্যন্ত নেই, যার সাহায্যে চোর তাড়ানো যায়! কিংকর্ত্তব্য ঠাওরাতে পারেন না যেন তিনি। বললেন,—কে ডাকে?

—আমি গো আমি। খুলে দাও না বন্ধ দুয়ার।

—তুমি কে তাই শুনি আগে। অতঃপর অর্গল মুক্ত ক'রবো।

—আমাকে চিনতে পারো না? আমার পোড়াকপাল।

—দুনিয়ায় কত মানুষ আছে, সকলকেই কি আমি চিনি না কি?

—আমার মত আর একজনও নাই। আমি তোমার অচেনা নয়। দুয়ারটা খুলে দেখো না কেন?

বাহির থেকে যিনি এত কাতর হয়ে ডাকাডাকি করছেন তিনি পুরুষ নয়, স্ত্রী। বামাকণ্ঠ। তস্কর সব করতে পারে। কণ্ঠস্বর নকল নয়তো!

—নামটা কহ না শুনি?

—আমি মহাশ্বেতা, তোমার সহধর্ম্মিণী, তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনী।

আবার কুঞ্চিত হয়ে উঠলো ভ্রূযুগল। দ্বিধাচিত্তে কাশীশঙ্কর খানিক নীরব থাকলেন। বললেন,—আমি তোমারে কি নামে ডাকি?

বাহিরের সুধাকণ্ঠী হয়তো বিব্রত হয়ে ওঠেন। মনে মনে বিরক্ত হন অবিশ্বাসের জ্বালায়। আর ডাকাডাকি করতে যেন মন চায় না। তার চেয়ে ফিরে যাওয়াই ভাল। কণ্ঠ শুনেও যদি প্রত্যয় না হয় তখন আর অধিক বাক্যব্যয়ে কি লাভ আছে? আমি তোমার রাতরাণী। নারীকণ্ঠ যেন ঈষৎ রুষ্ট হয়ে ওঠে।

মধ্যে দ্বার মুক্ত হয়ে যায়। কাশীশঙ্কর দেখা দেন। সলজ্জায় বললেন,—মার্জ্জনা কর, রাতরাণী। টাকা মোহর ছড়িয়ে ব'সেছি, তাই ভেবেছি হয়তো কোন চোর-ডাকাত এসেছে!

মহাশ্বেতা গম্ভীর। অভিমান হয়েছে তাঁর। নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন নতমুখে। যেন তিনি মূক, বধির, স্পন্দনহীনা। কুমারবাহাদুর আবার বললেন,—অকারণে রুষ্টা হও কেন?

কথা বলতে বলতে মহাশ্বেতার দুই হাত ধ'রে কাছে টানলেন তাঁকে। বলেন,—ডাকাডাকির কি কারণ তাই বল?

—কাজকর্ম্মে দিন-রাত ডুবে থাকতে হয়? মহাশ্বেতার কথায় যেন অভিযোগের সুর। বললেন,—রাত হয়েছে, আর কাজ নয়। এখন চলুন, বিশ্রাম করবেন চলুন।

—বেশ কথা। তাই চল। হাতের কাজ থাক, কিন্তু টাকা-মোহরগুলো যে যথাস্থানে রেখে যেতে হয়। তুমি আর কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা কর। আমি তোলাপাড়া সেরে লই তবে।

মহাশ্বেতা বললেন,—রাজাবাহাদুর ডেকে কি বললেন তা কি শুনতে পাই?

টাকা-মোহর থলিয়ায় ভর্ত্তি করতে করতে কাশীশঙ্কর বললেন,—রাজা বলছেন, সহোদরা বিন্ধ্যবাসিনীকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করতে।

—তুমি কি স্থির করলে?

মহাশ্বেতা জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকেন। উত্তরের প্রত্যাশায় বুঝি বা শ্বাসরুদ্ধ হয় তাঁর।

কুমারবাহাদুর হাতের কাজ সারতে সারতে বললেন,—হয়তো আমাকেই যেতে হবে সেই গড় মান্দারণে। দেখি কি করা যায়।

—আমি তোমাকে ছাড়বো না। মান্দারণে তোমাকে আমি যেতে দেবো না। ঘোর আপত্তির সুরে মহাশ্বেতা বললেন। বললেন,—তোমার তো ভাই-ভগিনী আর মা আছেন। আমার কে আছে শুনি?

—অধীর হও কেন রাতরাণী? যমুনার তুফান দেখে ডরাও কেন? কাশীশঙ্কর থলিয়ার মুখ বাঁধতে বাঁধতে কথা বলেন। বলেন,—বিন্ধ্যবাসিনী আমারও যে সহোদরা। রাজাবাহাদুর তো নিষ্কর্ম্মা, ব'সে ব'সে পিয়ালা পান করছেন সদাক্ষণ। নেশার ঘোরে সদাই আচ্ছন্ন থাকেন। আহা, বিন্ধ্যবাসিনী কত কষ্ট ভোগ করছে সেই নির্ব্বাসনে।

কথা বলতে বলতে সেঁজুতিতে ফুঁ দিয়ে শিখা নিশ্চিহ্ন করলেন। ভারী ওজনের এক কুলুপ এঁটে দিলেন সেরেস্তার দ্বারে। চাবিকাটি মহাশ্বেতার হাতে দিয়ে বললেন,—আমার লক্ষ্মী, আমার নারায়ণী, এই লও চাবি। রেখে দিও কোন গোপন স্থানে।

মহাশ্বেতা আগে আগে চললেন, ভগ্নমনে। তাঁর পদালঙ্কার ঝমাঝম শব্দ তুললো। তাঁকে অনুসরণ করলেন কাশীশঙ্কর। কাষ্ঠপাদুকার শব্দ তুললেন তিনি। সীমাহীন আঁধারে মিলিয়ে গেলেন দু'জনায়।

•

গড় মান্দারণে তখন পৌর্ণমাসী চাঁদের সোনা-আভা প'ড়েছে দিকে দিকে। আসমানের কাকচক্ষু জলে যেন কে রাশি রাশি সোনা ছড়িয়েছে। দূরের গাছ-গাছালি স্পষ্ট দেখা যায় চোখে। আর দেখা যায় গাছে গাছে বৈশাখী শুভ্র ফুল। ওদিকে মন্থর গতি আমোদর বয়ে চলেছে কুলু-কুলু শব্দে। বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ি, চন্দ্রকিরণে চিকচিকিয়ে উঠছে।

ইদিক-সিদিক চোখ ফিরিয়ে দেখছেন রাজকুমারী বিন্ধ্যবাসিনী।

প্রহরী শেখজী বন্দুক উঁচিয়ে পায়চারী করছে মুক্ত প্রান্তরে, ফটকের কাছাকাছি। যেন এক দৈত্য-দানব শিকারের সন্ধানে ঘোরাফেরা করছে। শেখজীর লৌহশিরস্ত্রাণ চাঁদের আলোয় জৌলুষ তুলছে ক্ষণে ক্ষণে। ব্রাহ্মণ চন্দ্রকান্তর চতুষ্পাঠী দেখে এসে বেশ খুশী হয়েছিলেন রাজকুমারী। কিন্তু খুনোখুনি আর রক্তারক্তি দেখে এখনও থেকে থেকে শিউরে উঠছেন। তাজা রক্তের প্রবাহ আর ছিন্নমুণ্ড বৌদ্ধ ভিক্ষুক দেখেছেন বিন্ধ্যবাসিনী। আগামী-কাল প্রত্যূষে চৌধুরীকন্যা আনন্দকুমারী আসবে, এসে মন্দিরে নিয়ে যাবে—

মন থেকে যেন সায় দেয় না তার এই প্রস্তাবে। আনন্দকুমারী এসেছিল যেন কি এক গোপন উদ্দেশ্যে। চন্দ্রকান্তর আসা-যাওয়ায় কি ভেবেছে কে জানে? চন্দ্রকান্তর প্রতি আনন্দকুমারীর লোলুপ চাউনি—লক্ষ্য করেছেন বিন্ধ্যবাসিনী। তখন থেকে কাঁটার মত বিঁধছে তাঁর বুকে। হিংসার কাঁটা খচখচ করছে।

—অ বৌ, আর কতক্ষণ ছাদে থাকবে? পরিচারিকা যশোদা কোথা থেকে এসে কথা বললে।

—যতক্ষণ না ঘুম আসে—বললেন রাজকুমারী। দীঘির তীরে তাঁর চোখ। সুদূরপ্রসারিত দৃষ্টি তাঁর চোখে। চতুষ্পাঠীর আলো যদি বারেক দেখা যায়! আসমানদীঘির তীর দিগ্বলয়ে মিশে গেছে। আমোদরের অপর তীরে শুধু আলোক-বিন্দু দপদপ জ্বলছে আকাশতারার মত। বৌদ্ধদের সঙ্ঘারামে আলো জ্বলছে।

সামনে বৌদ্ধ-পূর্ণিমা। সাজো সাজো রব প'ড়েছে বুদ্ধ-উপাসকদের মধ্যে। বুদ্ধের জন্মোৎসব আসন্ন। সেদিন, সেই রাতে কি হয় কে জানে! হয়তো খণ্ডযুদ্ধ বাধবে বৌদ্ধে আর ব্রাহ্মণে। হানাহানি, মারামারি, কাটাকাটি চলবে দুই সম্প্রদায়ে।

চন্দ্রকান্ত যেন রক্ষা পায়। মনে মনে প্রার্থনা জানাতে থাকেন রাজকুমারী বিন্ধ্যবাসিনী। হঠাৎ চোখ পড়লো আসমানের বুকে। শুক্লপক্ষের নিটোল চাঁদ আকাশ থেকে নেমেছে নাকি পৃথিবীর বুকে। আসমানের জলে চাঁদের প্রতিচ্ছায়া। রাজকুমারীর চোখে তন্দ্রা আর নামে না। দুশ্চিন্তায় কেমন যেন তিনি স্থিরা, গম্ভীরা। শিয়াল ডাকতে শুরু করলো জঙ্গলে। আকাশে প্রতিধ্বনি ভাসলো। ঝিল্লীর রবে মুখর হয়ে আছে গড় মান্দারণ।

জমিদার কৃষ্ণরামের নাম সার্থক বটে।

শৈশবে কোন্ কুলজ্ঞ নামকরণ ক'রেছিলেন কে জানে, তিনি যেন ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছিলেন। কৃষ্ণ আর রামের এমন অপূর্ব্ব সমন্বয়, সত্যিই বিরল।

সচরাচর দেখা যায় না। আপন সমাজে তিনি কুলীন-কৃষ্ণ, প্রজাদের চোখে যেন প্রজানুরঞ্জন রামচন্দ্র। কুলশাস্ত্র মতে 'কুলীনো দেবতা স্বয়ং'; রায়ত বলে, 'রাজা বিনা রাজ্যনাশ।' সমাজের প্রণাম আর প্রজাদের সেলাম—এই দুই একত্রে ভোগ করছেন কৃষ্ণরাম। কৃষ্ণরাম বলেন,—'জমিদারী বাপের নয়, দাপের।' অর্থাৎ দাপটের। গুপ্তচর না থাকলে রাজ্য শাসন চলে না, সংসার চলে না। ঘরে-বাহিরে তাই গুপ্তচর পোষণ করেন কৃষ্ণরাম। চর আর চরী, ছড়ানো আছে তাঁর। চুপি চুপি কখন এসে কথা কানে তুলে দিয়ে যায়। গোপন তথ্য ফাঁস করে দিয়ে যায়। শুনিয়ে যায় না-শোনা কথা, জানিয়ে যায় অজানা যা কিছু। কথায় আছে, 'বড়মানুষের কান আছে, চোখ নেই।'

খেলতে বসেছিলেন কৃষ্ণরাম। অন্দরের এক প্রকোষ্ঠে সহধর্ম্মিণীদের ক'জনকে সঙ্গে নিয়ে ছক খেলতে বসেছিলেন। সুদৃশ্য গালিচায় ভূমি দেখা যায় না প্রমোদকক্ষের। টিয়াপাখী-সবুজ রঙ গালিচা জুড়ে বসেছেন জমিদার-নন্দিনীরা। এ ওর গায়ে যেন ঢ'লে পড়ছেন এঁরা থেকে থেকে, পরস্পর হাস্য-কৌতুকে। কৃষ্ণরাম মধ্যে মধ্যে কি যেন পান করছেন এক স্বর্ণপাত্রে। কক্ষের একেক দেওয়ালে একেক রঙের দেওয়াল-গিরি জ্বলছে। লাল, হলুদ, নীল, বেগুনী কত রঙের জোলুশ খেলছে। ক্ষণেক ব্যবধানে স্বর্ণপাত্র মুখে তুলছেন কৃষ্ণরাম, কারণ পান করছেন। জমিদারণীর দল খিল-খিল শব্দে হেসে উঠছেন কখনও কখনও। তাঁরা আজ বদ্ধপরিকর,—কোমরে আঁচল বেঁধে খেলায় যোগ দিয়েছেন। তাঁরা সকলে এক দলে, আর কৃষ্ণরাম একা এক দলে। পুরুষের জয় হয়, না প্রকৃতির পরাজয় হয়, দেখা যাক্।

পরিহাসপ্রিয়া একজন কৃষ্ণরামের কর্ণকুহরে মুখ রেখে বললেন,—মহাশয়, অধিক কারণ পান করলে খেলায় যে হারাবেন! কে রক্ষা করবে তখন? স্মিতহাসির রেখা উঁকি দেয় কৃষ্ণরামের ধারালো অধরে। আরও সামান্য পান ক'রে বললেন সহাস্যে,—রসিকা, কারণ নারী নয়, বিশ্বাসঘাতিনী নয়।

কারণ হেতু, নিমিত্ত, উদ্দেশ্য।

ঐক্যহাস্তে ছেদ পড়লো বারেক। জমিদার কি যেন বলছেন, তাই শুনতে হাসি থামালেন সকলে।

—পূজাপাঠের সঙ্গে কারণ পানই শ্রেয়ঃ। পরিহাসের সুরে বললেন কৃষ্ণরামের স্কন্ধলগ্না। বললেন,—অহেতুক পান করলে চালে ভুল হবে। তখন বলবেন, কারণের ঘোরে হয়তো ভুল করেছি। আমরা সে কথা শুনবো না তখন।

একা একদলে থাকলে কি হয়, কৃষ্ণরাম যেন একাই একশো। দু' দু'বার বিরুদ্ধ-পক্ষকে হারিয়েছেন খেলতে বসে। দু' দফায় কিস্তী মাৎ ক'রেছেন।

কৃষ্ণরাম মৃদু মৃদু হাসেন আর বলেন,—দর্শনে আছে দুই কারণ। সমবায়ী ও অসমবায়ী। শাস্ত্রোক্ত কারণবারি থেকেই জীবের উৎপত্তি। বেদান্তে সূক্ষ্মদেহের অন্য নাম কারণশরীর। আর তান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত প্রসাদী কারণ অমৃত, গরল নয়।

খাস-মহলের দাসী দুয়ারে উঁকি মারলো। ঘরের বাইরে অন্ধকারে রূপার অলঙ্কার ঝিলিক তুললো। দাসীর বুকে হাঁসুলী জ্বল-জ্বল করলো।

গালিচা থেকে উঠলেন এক জমিদারণী। কোমর বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে এগোলেন দুয়োর পানে। সাপের মত ঝুলন্ত বিনুণী থেকে খ'সে পড়লো যুঁইয়ের পাপড়ি, তুষারকণার মত।

—কি লো দাসী? কা'কে চাস? আমাদের?

দাসী অন্য দিকে চোখ ফেরায়। মনিবনীর দিকে চোখ তুলে তাকাতে লজ্জা পায় যেন। জমিদারনন্দিনীর কোমরে অঞ্চল জড়ানো, তবুও ঊর্দ্ধ দেহবাস যেন শিথিল হয়ে আছে। লাল মতির মালা,—ফোঁটা ফোঁটা রক্ত-বিন্দু যেন ছড়িয়ে আছে শুভ্র বুকে।

—কারকুন হুজুরকে চিরকুট পাঠিয়েছে একখান।

কারকুন জমিদারের তত্ত্বাবধায়ক। সদর থেকে অন্দরে চিট পাঠিয়েছে কলাপাতে লিখে। দাসী বহন করে এনেছে সেই গোপনলিপি।

হাত পাতলেন স্খলিতবেণী কুলীনবধূ। বললেন,—আমার হাতে দাও, দিই জমিদারমশাইকে।

কৃষ্ণরাম বললেন,—দাসী হেথায় কেন? কি বলে? বাঁশরী।

হঠাৎ চোখে প'ড়ে গেছে যেন। দুয়োরে কার সঙ্গে আলাপরতা বাঁশরী, ঐ অষ্টাদশী,—অন্যতমা অর্দ্ধাঙ্গিনী।

বাঁশরী দেবী ঘুরে দাঁড়ালেন। পাক খেয়ে ঘুরলো ঝুলানো বিনুনী। তুষারকণার মত যুঁই খ'সলো। বললেন,—দাসী চিরকুট এনেছে। কারকুন পাঠিয়েছে সদর থেকে।

ব্যস্ত হয়ে উঠলেন যেন কৃষ্ণরাম। হাসির ঢেউ থামলো। পাত্র নামিয়ে রেখে জমিদার বললেন,—বাঁশরী, চিরকুট কৈ দেখি?

এক খণ্ড কলাপাতা হাতে দেয় দাসী। পুরনারীর দল হাসি-পরিহাসে বিরতি দিয়ে নিস্পলক চোখে চেয়ে থাকেন।

কৃষ্ণরাম শাস্ত্রজ্ঞানী তান্ত্রিক কুলীন। লিখন-পঠন জানেন। চিরকুট পাঠ ক'রে বললেন,—তোমাদের সতীন, রাজকুমারী বিন্ধ্যবাসিনীর পিত্রালয় থেকে অন্য এক চর আসে। ফটকের প্রহরী আমাকে না জানিয়েই তাকে বিদায় ক'রে দিয়েছে। কি দুঃসাহস প্রহরীর!

কুলীনকন্যাগণ এ ওর মুখপানে দেখলেন শুষ্কচোখে। সহসা যেন কেউ কিছুই বলতে পারছেন না। মতামত ব্যক্ত করতে পারছেন না।

কৃষ্ণরাম আবার বললেন,—সুতানুটির রাজগৃহ থেকে চর এসে তাদের মেয়ের খোঁজ নিয়ে গেছে, অথচ আমি জানতে পাই না? জমিদার চিন্তাকুল হয়ে পড়লেন যেন কথা বলতে বলতে।

শুধু সতীন নয়, সতীন-কাঁটা। মনে মনে কারও সঙ্গে কারও মিল নেই। এ ওকে দেখতে পারে না, ঈর্ষা করে। আড়ালে আবডালে অমঙ্গল গায়। কেউ কা'কেও ডাকলে সাড়া পায় না। সতীনের ডাক নয়তো, যেন নিশির ডাক।

খেলা ফেলে উঠে পড়লেন কৃষ্ণরাম। দপ ক'রে যেন জ্বলে উঠেছেন।

কারণ পান করেছেন আকণ্ঠ, উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন হঠাৎ। ক্রোধে যেন ফুলতে লাগলেন। বললেন,—তোমরা সকলে থাকো, আমি সদর থেকে এখনই ফিরবো! পাহারাদারটাকে শাস্তি দিতে হয় যে!

কেউ কোন কথা বলেন না। কিছু বলতে যেন সাহস হয় না, শাস্তি-দানের কথা শুনে কারও চোখে বা ভয়ের দৃষ্টি ফুটেছে!

চাকরে কুকুরে সমান, হুকুম করলেই দৌড়তে হয়।

জমিদার সদরে পা দিতে না দিতে ডাক পড়লো প্রহরীর। যে যেখানে ছিল সজাগ হয়ে উঠলো। সদরের আঙিনায় রাম-মশালে আগুন ধরিয়ে দিলে মশালচি—হুজুর স্বয়ং সদরে পদার্পণ ক'রেছেন। রাম-মশালের আলোয় যেন জমিদারপুরীতে সূর্য্যের আলো ছড়ালো।

আমোদ ছেড়ে কৃষ্ণরামকে উঠতে হয়েছে। বাধা পড়েছে, ছেদ পড়েছে প্রমোদবিহারে। কারণ পানের রিমঝিম নেশা ছুটে গেছে হয়তো। কৃষ্ণরামের মুখাবয়ব যেন রক্তরাঙা হয়েছে উত্তেজনায়!

চাকরী মেঘের মায়া। চাকরী তালপাতার ছাউনি। চাকর কুকুরের সমতুল্য।

দু'জন পাইক সেই প্রহরীকে ধ'রে আনতে গেছে। ক্রোধের আতিশয্যে ঠকঠকিয়ে কাঁপছেন কৃষ্ণরাম। হুঙ্কারের সুরে ডাকলেন,—কারকুন!

কেঁপে উঠলো সদরকাছারী। রাতের অন্ধকার কেঁপে উঠলো যেন। যে যেখানে ছিল সে সেখানেই থাকলো।

সেই প্রহরীর তখন বিশ্রামের সময়। ফটকের পাহারা বদল হয় দিনে রাতে। দিনে একজন, রাতে অন্য জন। সারা দিন তপ্তরৌদ্রে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে থেকে মাথা ঝিমঝিম করে। পা দু'টো কনকন করে। কাঁধে ব্যথা ধরে ভারী ওজনের বন্দুক ব'য়ে ব'য়ে। চতুর্দ্দিকে লক্ষ্য রাখতে হয় সূক্ষ্মদৃষ্টিতে, তাই চোখে ঝাপসা ঠেকে যেন এখন।

গোসত আর রুটি বানাতে বসেছিল কর্ম্মক্লান্ত প্রহরী তার নিজের আস্তানায়।

দু'জন পাইক তার দু'টো হাত ধ'রে উঠিয়ে ফেললে পেছন থেকে। বললে,—মিঞা, রুটি-মাংস শিকেয় তুলে রেখে চল এখন, হুজুরের ডাক প'ড়েছে।

কথা বলার ফুরসৎ পায় না পাহারাদার। দু'জন পাইকের বাহুবন্ধনে আটকা প'ড়ে হনহনিয়ে চলতে হয়। ওদিকে ক'খানা রুটি পু'ড়ে আঙরা হ'তে থাকে চাটুর 'পরে।

জমিদারের ডাক শুনে কারকুনও ভয়ে কাঁপতে শুরু করে। কাছারী থেকে বেরিয়ে কৃষ্ণরামের সমুখে দেখা দিতেই তিনি বললেন,—সুতানুটি হ'তে কে আসছিল শুনি?

কারকুন ভয়ে কেঁপে কেঁপে বললে,—হুজুর, আসছিল একজন পেয়াদা। বোধ হয় পত্রবাহক সেই ব্যক্তি। প্রতিবেশীদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে আমাদের বধূমাতা, তাদের রাজকন্যার কথা। পাহারাদার জেনে শুনে তাকে রেহাই দিয়ে দেয়। আমি হুজুর আপনাকে না জানিয়ে পারি না।

বড়মানুষের কান আছে, চোখ নেই। কানে শুনে খড়গহস্ত হয়ে উঠলেন যেন কৃষ্ণরাম। পাখী ধরা দিয়েও হাতছাড়া হয়ে গেছে, সেই অপমানের জ্বালা যেন ভুলতে পারছেন না।

রাম-মশালের আলোয় কারকুনের চোখ যেন ধাঁধিয়ে যায়। জমিদারের দিকে চোখ রেখে তাকাতে পারে না। কৃষ্ণরামের চক্ষু ও মুখাবয়ব ক্রোধ-রক্তিম। তাঁর পরিধানে রক্তলাল চেলী। লোমশ বক্ষে রুদ্রাক্ষের মালা আর উপবীত ঝুলছে। কপালে রক্তচন্দনের প্রলেপ।

—হুজুর তোমাদেরও হুজুর। আমাকে ধরা-বাঁধায় কি ফায়দা হবে? পাহারাদারের টুকরো টুকরো কথা শোনা যায়। সে পাহারা দেওয়ার কাজ করে, ফটকের সর্ব্বময় কর্ত্তা সে, তাকে কি না এত চোখের সামনে ধ'রে বেঁধে নিয়ে চলেছে দু'জন পাইক।

—আমরা কিছুই জানি না মিঞা। পাইকদের একজন বললে, একটু

হেসে। বললে,—বেঁধে নিয়ে যেতে হুকুম করেছেন, আমরা তবু তো তোমাকে মান্য ক'রে শুধু ধরে নিয়ে যাচ্ছি।

পাহারাদার বললে,—কসুর কি তাই শুনি ?

কৃষ্ণরাম হঠাৎ বললেন,—আমার চাবুকটা কৈ ?

কা'কে বললেন কে জানে। আশপাশে পাইক পেয়াদার ভীড়। ভৃত্য খানসামারা যেন কষ্ঠিমূর্ত্তির মত অচঞ্চল হয়ে আছে।

শঙ্কর মাছের চাবুক। তাক বুঝে পিঠে-পেটে লাগাতে পারলে দাগও পড়বে, রক্তও ঝরবে। ছোরাছুরির চেয়ে কম ধারালো নয়, কাঁধে-পিঠে লাগলে চিরে যাবে দোফালা হয়ে।

কে যেন তুলে দেয় কৃষ্ণরামের হাতে শঙ্কর মাছের লেজ। যেমন লকলকে, তেমন তীক্ষ্ণধার। চর্ব্বি মাখানো। সুতানুটির রাজগৃহ থেকে গুপ্তচর এসে ধরা দিয়ে বেরিয়ে গেল হাতের নাগাল থেকে, সেই রাগে দাঁতে দাঁত ঘষলেন কৃষ্ণরাম। কোন অভিপ্রায়ে এসেছিল কে জানে, সেই ভাবনায় অস্থির হয়ে পড়েছেন যেন।

মাংসলোলুপ চাবুক যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে কৃষ্ণরামের হাতে। সাপের মত হিল-হিল করে। যেন সতেজ, জীবন্ত। কাছারীর দালানে কৃষ্ণরাম। নীচের আঙিনায় পাহারাদারকে এনে ছেড়ে দেওয়া হয়। এতটুকু ভয় নেই যেন, তাই উন্নতবক্ষ। চোখে শুধু বিস্ময়! উনুন্‌তাতে রুটি সেঁকতে ব'সে-ছিল, তাই ঘর্ম্মাক্ত কলেবর।

—বেকুফ, বেহুঁশ!

বলতে বলতে চাবুক চালালেন কৃষ্ণরাম! এপাশ থেকে ওপাশ থেকে চাবুক চলতে শুরু ক'রলো। মধ্যিখানে প্রহরী; চাবুকের এক এক ঘা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুধু একেক বার চমকে চমকে উঠছে। চাবুক যেন থামতে চায় না; অবিরাম চলছে তো চলছেই!

প্রহরীর চোখে ভয়শূন্য দৃষ্টি। আঘাতে আঘাতে জর্জ্জরিত, তবুও বিকার নেই যেন। রক্ত ঝরছে পিঠ ব'য়ে, তবুও নীরব, নির্ব্বাক।

চাবুক চালাতে চালাতে হয়তো হাত টনটনিয়ে ওঠে, তাই ক্ষান্ত হ'লেন কৃষ্ণরাম। চাবুক ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন,—ওকে ফটকে আটক কর।

শত্রুপক্ষের চর এসে চোখে ধুলো দিয়ে খোঁজখবর নিয়ে গেল—কৃষ্ণরাম জানতে পারলেন না! স্ত্রী বিন্ধ্যবাসিনী আছে মান্দারণে। পরিত্যক্ত নির্ব্বাসিতা হয়ে আছে। কড়া পাহারা আছে সেখানে, বন্দুকধারী পাঠান আছে একজন। গুপ্তচর যদি মান্দারণে গিয়ে হাজির হয়! রাজকুমারীর সঙ্গে যদি যোগাযোগ স্থাপন করে!

এত চাবুক মেরেও স্থির হ'তে পারলেন না কৃষ্ণরাম। মনে ঘোর দুশ্চিন্তা পুষে অন্দরে ফিরে চললেন। প্রহরীর আকুল ক্রন্দন কানে ভেসে যায় তাঁর। পাহারাদার কাঁদছে গলা ফাটিয়ে, আকাশ কাঁপিয়ে। চাবুকের ঘায়ে রক্তপাত হচ্ছে, সেদিকে তার খেয়াল নেই, সেজন্য দুঃখ নেই যেন। কান্নার কারণ, ফটকে আটক থাকতে হবে।

রাত্রির অন্ধকার কান্নার সুরে আরও যেন ভয়াল রূপ ধরে। জমিদার-গৃহের বাতায়নে অলিন্দে কুলনারীরা কানে আঙুল দেন। তাঁরাও দূরে থেকে দেখেছেন এই নির্ম্মম প্রহার।

কৃষ্ণরাম প্রমোদকক্ষে ফিরে দেখেন, কেউ নেই সেখানে। দাবার ছক যেমনকার তেমনি পড়ে রয়েছে। স্বর্ণপাত্রে কারণ টলমল করছে। গালিচা অবিন্যস্ত হয়ে আছে। হাঁফ ধ'রেছে কৃষ্ণরামের। গালিচায় ব'সে পড়লেন তিনি, হাতে তুলে নিলেন কারণপাত্র। তৃষ্ণার্ত্ত বোধ করছেন যেন!

কেউ যেন আর এগোতে সাহসী হয় না। জমিদারনন্দিনীরা যে যার মহলে ফিরে গেছেন।

রাত্রিও গভীর হয়েছে। কৃষ্ণরাম কারণ পান করতে করতে বাতায়নে চোখ মেললেন। ঘন কালো আকাশে জ্যোৎস্না থৈ-থৈ করছে।

কৃষ্ণরামের মনে আর সুখ নেই। বিন্ধ্যবাসিনীর ভাবনা! কোন দোষে দোষী নয় রাজকন্যা, সরল সাবলীল স্বভাব তার। সদাই হাসি হাসি মুখ।

দোষ বিন্ধ্যবাসিনীর নেই, জানেন কৃষ্ণরাম। তবুও কিছু দিনের জন্য

তাকে ভিন্ন স্থানে পাঠালে যদি হাজার হাজার টাকা আর কিছু সংখ্যক অশ্ব ও হস্তী পাওয়া যায়, ক্ষতি কি তায়! হাজতবাস তো নয়; কারাগারে বন্দিনী হয়েও থাকতে হচ্ছে না। মান্দারণে বিন্ধ্যবাসিনীর বসবাসের সকল বন্দোবস্তই ক'রে দিয়েছেন কৃষ্ণরাম। কেন কে জানে, বিন্ধ্যবাসিনীর হাসিমাখা মুখখানি যেন আজ বারে বারে মনে পড়ছে কৃষ্ণরামের।

দাবী জানালেন, রাখলো না সুতানটির রাজা কালীশঙ্কর। সর্ত্ত পাঠালেন, তাও রক্ষা করলেন না। সামর্থ্য যখন আছে সুপ্রচুর, তখন কেন যে কিছু উবুড়হস্ত করলেন না কে বলবে?

স্বর্ণপাত্র পূর্ণ করলেন তিনি আবার। শত্রুপক্ষের চর মান্দারণে গিয়ে যদি সাক্ষাৎ চায় তাদের রাজকন্যার!

জেগে ব'সে রাত কেটে যায়। যতবার তন্দ্রা আসে ততবার ফেউ আর বাঘের ডাক শুনে উঠে বসেন বিন্ধ্যবাসিনী। মান্দারণের গহন বনে বাঘ, নেকড়ের বাসা। গবাদি পশু না মিললে মানুষ ধ'রে খায়। বাঘের ভয়ে গ্রামের লোক ঢাক-ঢোল পিটতে থাকে; বনে-বাদাড়ে শুকনো পাতার স্তূপে তারা আগুন ধরিয়ে দেয়।

চোখ-ভরা ঘুম, কিন্তু চোখে পাতায় এক করতে পারেন না তিনি। ঘরের কোণে মিটমিটিয়ে প্রদীপ জ্বলেছে রাতভোর। পরিচারিকার ভয়-ডর নেই যেন, পড়ে পড়ে ঘুমিয়েছে নাক ডাকিয়ে। বাঘের আকাশফাটা ডাক শুনে ঘুমের ঘোরে থেকে থেকে শিউরে উঠেছে শুধু। জেগে বসে থেকে রাজকন্যার চোখেই জ্বালা ধরেছে শুধু। পূবাকাশে ভোরের কাঁচা আলো ফুটতে স্বস্তির শ্বাস ফেলে শয্যা ছেড়ে ছাদে গিয়ে বসেছেন। বিশাল ছাদের এক কিনারায় চুপচাপ বসে থাকেন। ঘুম নেই, তাই কেমন যেন উত্তপ্ত হয়ে আছে কপালের দুই পাশ। আসমান দীঘিতে ক'টা ডুব দিয়ে আসতে পারলে যেন শান্ত হয় দেহ।

স্বর্ণপিড়ি থেকে আঁস্তাকুড়ে স্থান হয়েছে রাজকুমারীর। সপ্তগ্রামের

জাঁকালো জমিদারগৃহ থেকে এসে উঠেছেন মান্দারণের এক ভগ্নপ্রাসাদে। সপ্তগ্রামে যেন প্রতিদিন মহোৎসবের ব্যবস্থা—রঙ্গ, নৃত্য, গান আহারবিহার। মান্দারণে শুধু বাঘের ডাক ; যেদিকে চোখ যায় কেবলই অরণ্য।

ছাদ থেকে নজরে পড়ে বিস্তীর্ণ দীঘি। আসমান যেন হাতছানি দিয়ে তাঁকে ডাক দেয়। আসমানের বুকে ডুব দিলে ধুয়ে যাবে যত বিষাদ আর ব্যথা।

বিন্ধ্যবাসিনীর নয়ন যুগলের কি বিস্তীর্ণ আয়তন! ভ্রমরকৃষ্ণ চক্ষুতারায় আসমানের ছায়া দেখা যায়। কোমল করপল্লবে কালো রেশমের মত আলুথালু কেশরাশির জট ছাড়াতে থাকেন রাজকন্যা। কতদিন সিঁদুর পড়েনি কে জানে, সিঁথীরেখায় ঈষৎ লালের আভা এখনও স্পষ্ট দেখা যায়।

—তোমার চোখে কি ঘুম নেই বৌ? পরিচারিকা যশোদার কথায় যেন অভিযোগের স্বর। ঘুম থেকে সদ্য উঠে এসেছে সে।

বিন্ধ্যবাসিনীর পীবরোন্নত বক্ষ ধীরে ধীরে যেন আরও স্ফীত হতে থাকে। দীর্ঘ এক শ্বাস টানলেন তিনি। মধুর কটাক্ষে দেখলেন একবার চারিধার। কোন কথা বললেন না।

—ঘর ছেড়ে কখন ছাদে এলে শুনতে পাই? যশোদা আবার কথা বলে রাগের সুরে।

—তখনও কাকপক্ষী ডাকেনি। রাত থাকতে উঠে এসেছি। মৃদু মৃদু হাসলেন রাজকন্যা। বললেন,—চল দীঘিতে ডুব দিয়ে স্নান সেরে আসি।

—শরীরগতিক যখন ভাল নয় তখন সাতসকালে মাথায় জল দেবে কি গো বৌ! কথার শেষে পরিচারিকা হাই তুললো একটা। বললে,—তার চেয়ে বরং চল না একটু ঘুমিয়ে নেবে এই ভোরের বেলায়।

—এ পোড়া চোখে ঘুম আর আসবে না। পূজার যোগাড় করতে হবে। ফুল-দুব্বো বাছতে হবে। নৈবিদ্যি সাজাতে হবে। তারপর—

—থামলে কেন, বল তারপর কি আবার করতে হবে?

শঙ্কাকুল হয়ে ওঠেন যেন বিন্ধ্যবাসিনী। কি মনে পড়ে কে জানে,

ভ্রূযুগ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে তার। বিরক্তি ফোটে মুখে। বললেন,—চৌধুরীদের সেই মেয়ে আসবে ব'লে গেছে।

—কেন? সেই দজ্জাল ছুঁড়ী আবার আসবে কেন?

—আমাকে নিয়ে যাবে যে।

চমক লাগে যেন যশোদার। চটকা ভেঙে যায়। বলে,—তোমাকে আবার কোথায় নিয়ে যাবে? বৌ, তুমি দেখছি, আমার চাকরীটা আর রাখতে দেবে না।

হেসে ফেললেন রাজকন্যা। ঘুম-ঘুম চোখে যেন হাসির ঝিলিক খেললো। বললেন,—ভয় নেই গো, ভয় নেই। আমি কোথাও পালিয়ে যাবো না। আনন্দকুমারী আমাকে মন্দিরে নিয়ে যাবে। পূজো দিয়ে আসবো।

—মন্দির কোথায় এই বনজঙ্গলের দেশে?

—আছে গো আছে। শৈলেশ্বর শিব আছেন, গোপেশ্বরও আছেন। কথা বলতে বলতে উঠে পড়লেন বিন্ধ্যবাসিনী।

—যাবে তো বলছো, প্রহরী ছাড়বে কেন? সে জাতিতে পাঠান, আমাদের জমিদারের বিশ্বাসঘাতক হবে না কখনও।

—জানি গো জানি। তুইও না হয় যাবি আমাদের সঙ্গে।

—নিয়ে যাবে তো বৌ? খুশীর হাসি হাসলো যশোদা। বললে,—আমার কপালে কি আর আর এত ভাগ্যি হবে! আমিও শুনেছি শৈলেশ্বরের নাম।

রাজকন্যা এগিয়ে চললেন। বক্রকটাক্ষে একবার দেখলেন ফটকের দিকে। প্রহরী কি করছে তাই দেখলেন হয়তো। লক্ষ্য করলেন তার চালচলন। পায়চারী করছে পাঠান; কাঁধে বন্দুক ধ'রে আছে। সদর্প পদক্ষেপ যেন তার। মহামূল্য কণ্ঠহার উপহার পেয়েছে সে। জমিদার-গৃহিণীর কথা নিশ্চয়ই ফেলতে পারবে না। রাজকন্যা মনে ভাবলেন, দেখা যাক কি হয়। পাঠানের কঠোর মন, গলে কি না গলে!

বিনিদ্রা, নির্ব্বাসন, একাকিনী রাত্রিবাস—সব দুঃখ ঘুচে যায় যেন কি এক

গোপন আনন্দে। বিন্ধ্যবাসিনী হঠাৎ যেন কেমন হাস্তময়ী হয়ে পড়েন। অবসন্ন মুখকান্তি প্রসন্ন হয়। মনের অতল গহ্বরে কি এক আশা জাগে তাঁর। কা'কে যেন দেখতে পাওয়ার এক লুকানো আশা।

কাকের ঝাঁক বাসা ছেড়ে আকাশে পাড়ি জমায়। কা-কা রবে মুখর হয়ে ওঠে আসমানের তীর। দীঘির দুই তীরের গাছ এলোমেলো বাতাসে হেলছে দুলছে।

আঁচল নাচিয়ে ইশারায় ডাকলেন বিন্ধ্যবাসিনী। প্রহরীকে ডাকলেন। পাঠান প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে নীচের আঙিনায় দাঁড়িয়ে সেলাম জানায়। ছাদের ওপরে রাজকুমারী, নীচে প্রহরী। মাথার 'পরে গুণ্ঠন টানলেন বিন্ধ্যবাসিনী। বললেন,—আমরা মন্দিরে যাবো পুজো দিতে। বাধ সাধবে না তো?

তৎক্ষণাৎ জবাব দিতে পারে না প্রহরী। ক্ষণকাল ভাবতে থাকে যেন ভালমন্দ। ভেবে ভেবে বললে,—আপনার মর্জ্জি হুজুরণী! কথা বলতে বলতে নিজের বুকে হাত রেখে বললে,—এ পাঠানের গর্দ্দানটা না যায়, খেয়াল রাখবেন শুধু!

—কোন ভয় নেই তোমার। আমরা যাবো আর আসবো।

বিন্ধ্যবাসিনী কথা বললেন গুণ্ঠনের মধ্যে থেকে।

আবার সেলাম ঠুকতে থাকলো প্রহরী। পর পর অনেকগুলি সেলাম জানালো। রাজকন্যা আর এক মুহূর্ত্ত ছাদে না দাঁড়িয়ে সিঁড়ি ধ'রে নীচে নেমে গেলেন তরতরিয়ে। দীঘিতে স্নান করতে চললেন। দেখতে দেখতে রৌদ্র ছড়িয়েছে গাছের শিখরে শিখরে। কাঁচা-মিঠে রোদ।

সকল মেয়েই মেয়ে, কেউ বা যায় পালকি চ'ড়ে, কেউ বা থাকে চেয়ে। চৌধুরীকন্যার পালকি তখন মান্দারণের পথে নেমেছে। পালকির রঙীন বস্ত্রাবরণে প্রথম সূর্য্যালোকের স্পর্শ লাগলো। পথের মানুষ পথ ছেড়ে স'রে দাঁড়ায়। শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম নয়, হতশ্রদ্ধায়। কেউ বলে,—মর্দ্দানী চললো!

কারও কথার তোয়াক্কা করে না আনন্দকুমারী। ধনী-বণিকের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী, ধরাকে সরা জ্ঞান করে। বেশবিন্যাস বিলাসিতায় থাকে সদাক্ষণ, কে কি বললে না বললে শুনবে কখন!

চৌধুরী সত্যিকার ধনীজন। বেনেগিরি থেকে বহু অর্থ সঞ্চয় করেছেন। সে যে কত টাকা কেউ জানে না, চৌধুরী নিজেও হয়তো জানেন না। চৌধুরী সঙ্ঘ-আশ্রমের বণিক। সঙ্ঘের কাছে গন্ধদ্রব্য ও পূজার উপকরণ বিক্রী করেন। ধুনা, ধুপ, গুগ্‌গুল, কর্পূর, মধু আর সাদা, রক্ত ও হরিচন্দনের কাঠ বিক্রী করেন। সুন্দরবন থেকে বাঘের ছাল, কুমীরের হাড়, বাঘের নখ, গোলপাতা, চামড়া, আর মাদুর আনিয়ে একচেটে করেছেন। মোমবাতিও তাই। সঙ্ঘের কাজে মোমবাতি বড় দরকার। মন্দিরে মন্দিরে বাতি না দিলে ধর্ম্মকর্ম্ম হয় না!

মেয়ে তো নয়, আহুরে দুলালী। চৌধুরী একদিন মেয়ের মুখে হাসি প্রচ্ছন্ন দেখে বিবাহের প্রস্তাব করেছিলেন।

আনন্দকুমারী ডাইনে-বামে মাথা দুলিয়ে বললে,—বিবাহ করবো আমি। তোমরা পাত্র পছন্দ করবে, কি কথা?

চৌধুরী ব'লেছিলেন,—আনন্দময়ী, তাই হবে। তোমার নির্দ্দিষ্ট পুরুষেই তুমি পাত্রস্থ হও। আমার এই বিলকুল বিত্ত, ভূসম্পত্তি সে তো তোমারই।

পালকি কখনও ধীরে চলে না। পালকি তখন শ্রীপুর বাজারের পথ ধরেছে। মান্দারণ পূর্ব্বে খুবই সমৃদ্ধি-সম্পন্ন নগর ছিল, শ্রীপুর বাজার তারই ভগ্নাবশেষ বলা যায়।

বাজারে পণ্যের অভাব নেই। অভাব শুধু ক্রেতার। বিশালবিস্তীর্ণ এক মহাবটের ছায়া-আঁধারে বাজার বসেছে। মহাজনদের গোলপাতার ছাউনি, সারি সারি। চাল ডাল মশলার আড়ত। ফল আর সবজীর স্তূপ ভূমিতে। কাপড়ের কারবারীরা তাঁত-বস্ত্রের পাহাড়ে ব'সে আছে। গুড় আর ঘিয়ের গন্ধ ভুর ভুর করছে।

পালকির বস্ত্রাবরণ ঈষৎ মুক্ত করে আনন্দকুমারী পালকি থামাতে আদেশ

করলে। বাজারের ঠিক মধ্যখানে তো আর পালকি থামবে না, তাই এক পাশে, শূন্য জমিতে, একটু নিরালায় পালকি থামলো।

—একখানা লালপাড় মিহি বস্ত্র নাও আনকোরা। পূজার জন্য ফল ফুল মিষ্টান্ন নাও বাজার থেকে।

পালকির অন্দর থেকে ফিসফিস কথা বললে আনন্দকুমারী। তার এক খানি ফর্সা হাত দ্বিখণ্ডিত আবরণ-বস্ত্র ভেদ ক'রে দেখা দিলো শুধু। একহাত সোনার চুড়ি, হাঙরমুখী কাঁকণ—ঝকঝকিয়ে উঠলো যেন দিনের আলোয়।

এক মুঠো টাকা দিয়ে দিলে পালকি-বাহকদের একজনের হাতে।

—আর কিছু খুচরো তামার চাকতি নিয়ে নাও। ভিক্ষে দিতে হবে ভিখারীদের।

আবার বললে চৌধুরীর মেয়ে। মন্দিরে যেতে হ'লে ভিক্ষা না দিলে ছেঁকে ধরে যত ভেকধারী আর ভিখারী।

পালকির অন্দরে অসম্ভব গরম। শ্বাস রোধ হয় যেন। ময়ূরশিখার হাতপাখা ঘন ঘন নাচিয়ে বাতাস খায় আনন্দকুমারী। চোখেমুখে গোলাপজল ছিটিয়ে নেয়। কাঁচুলী ঘামে ভিজে আরও যেন এঁটে গেছে বুকে পিঠে।

তিন দিকে তিন জন ছুটেছিল কেনাকাটা করতে! গেল আর নিমেষের মধ্যে ফিরে এলো যেন! ফল, ফুল আর বস্ত্র এলো। একধামা তামার চাকতি এলো।

আনন্দকুমারী বললে,—সাত গাঁয়ের জমিদারবাড়ীতে চল।

আবার পালকি চললো। বাহকদের সেই দ্রুত গতি আর সেই এক ছড়া—পালকি এগিয়ে চললো শ্রীপুর বাজার পেছনে ফেলে মুকুন্দপুরের দিকে।

আনন্দকুমারী কিন্তু যে খুশী মনে চলেছে, তা আদপেই নয়। ফল-ফুল দেবদেবীর জন্য কিনেছে, ভিখারীদের জন্য ভিক্ষা নিয়েছে, আর আনকোরা বস্ত্রখানি সে নিয়েছে জমিদারনন্দিনী রাজকুমারী বিন্ধ্যবাসিনীকে উপহার দেবে। আনন্দকুমারী নিজে পরেছে কাশীর কাতানের সাড়ী, তার সঙ্গে যাবে ঐ মলিনবেশ বৌ, মানাবে না যেন।

তাই কিনেছে, নয়তো মনে মনে যেন জ্বলছে চৌধুরীর মেয়ে। কেন কে জানে, ঐ পোড়াকপালী রাজকন্যা যেন জ্বালা হয়েছে তার ডাগর বুকের। হিংসা, দ্বেষ, মাৎসর্য্য নয়,—এ যেন কেমন এক অদ্ভুত জ্বালা।

তাকে একা দেখলে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু তাকে কেন দেখলো আনন্দ-কুমারী! সেই তাকে, যাকে সে অন্তরে অন্তরে—

কোথায় ছিল রাজকুমারী। উড়ে এসে জুড়ে বসলো কোথা থেকে!

জমিদারগৃহের গুপ্তপ্রাসাদের এক দালানে পালকি নামিয়ে রাখে ক্লান্ত বাহকরা। খানিক নীরবে অপেক্ষা করে আনন্দকুমারী আবরণ সরিয়ে গৃহের অভ্যন্তরে চলে যায় চরণচাঁদের ঝঙ্কার তুলে।

পাঠান প্রহরী আজ আর বাধা দিতে এগোয় না। ভগ্নগৃহের অন্দরে যেতে যেতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো আনন্দকুমারী। কাকে সম্মুখে দেখে গতি থামালো। মুখে হাসি মাখাতে হ'লো তাকে।

—এসো ভাই এসো।

কথা বলতে বলতে দেখা দেন বিন্ধ্যবাসিনী। পালকির বাহকদের ছড়া তিনিও গৃহের অন্দরে থেকে শুনেছেন। অভ্যর্থনা জানাতে এসেছেন পূজার ঘর থেকে। রাজকুমারীর সদ্যস্নাতা, কালো পশমের মত তৈলহীন রুক্ষ কেশের রাশি পিঠ ছাপিয়ে নেমেছে! পরিধানে সেই মলিন বস্ত্র। শুভ্র রঙ তৈলাভাবে আরও যেন শুভ্র হয়েছে।

—যাত্রা করি চল। বললে আনন্দকুমারী। নকল হেসে হেসে বললে।

—ঘরের পূজোর জোগাড় শেষ করে যাবো। চল তুমি খানিক বিশ্রাম করবে। কথা বলতে বলতে চৌধুরীর মেয়ের হাত ধরলেন বিন্ধ্যবাসিনী।

—ঘরে কার পূজা কর?

যেতে যেতে শুধোলে চৌধুরীর মেয়ে। মিহি-মিষ্টি সুরে।

—ঘরেও যার বাইরেও তারই পূজা করি।

—কে সেই দেবতা?

—তা তো ভাই জানি না। পূজাই করছি, দেখা পাইনি এখনও।

রহস্য যেন বুঝতে পারে না চৌধুরীর মেয়ে। বিন্ধ্যবাসিনী হেসে ফেললেন তার প্রশ্ন শুনে। বললেন হাসতে হাসতে,—সে আর ব'ল না ভাই! এই কুড়িয়ে-পাওয়া শালগ্রাম রেখে কি ঝকমারি!

—কে দিলে? কোথা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া গেল?

বিন্ধ্যবাসিনী একবার অলক্ষে লক্ষ্য করলেন আনন্দকুমারীর মুখভাব। তার মুখে যেন কত ব্যগ্র কৌতুহল! বললেন,—আর বল কেন? একজন ব্রাহ্মণ এসে দিয়ে গেলেন। আমোদরের তীরে কুড়িয়েছিলেন।

—ব্রাহ্মণ!

—হ্যাঁ।

—কে তিনি? কোথায় থাকেন?

আবার একবার লক্ষ্য করলেন রাজকুমারী। দেখলেন আরও যেন ব্যগ্র হয়েছে চৌধুরীর মেয়ে। মনে মনে হাসলেন। বললেন,—অতশত চিনি না ভাই। দেখবে, এখনই হয়তো আসবেন। তিন সন্ধ্যার পূজা সেরে দিয়ে যাবেন।

ঘামে-ভেজা কাঁচুলীর আঁটসাঁট বাঁধনে বাঁধা বক্ষমাঝে আবার যেন সেই জ্বালা ধরছে। আনন্দকুমারীর কণ্ঠ যেন কেঁপে কেঁপে উঠলো। তবুও মুখ থেকে হাসি মুছলো না। বললেন,—চন্দ্রকান্ত কি? ইনি কি সেই ব্রাহ্মণ?

—হ্যাঁ, তাই হবে। নামটি যেন ঐ। তাঁর চতুষ্পাঠী আছে আসমানের অপর তীরে।

এক নাম, কিন্তু দু'জনের বুক যেন বেজে উঠলো একই সঙ্গে। কৃষ্ণের কথা শুনে যেমন রাধার বুকে তুফান উঠতো!

দু'জনেই নীরব থেকে চললেন ধীরে ধীরে। আর যেন কোন প্রশ্ন নেই কারও। কোন কথা নেই।

পরিচারিকা এসে বললে,—বৌ, পুরোহিত এসেছেন। পূজায় বসেছেন। নৈবিদ্যির যা বাকী ছিল আমি শেষ করে দিয়েছি। যাবে তো চল' সকাল সকাল। বেলা হ'লে কড়া রোদে কষ্ট পাবে কেন?

দু'জনেই যেন গতিহীন। বিন্ধ্যবাসিনী চুপি চুপি বললেন,—চৌধুরীর মেয়ে, ব্রাহ্মণকে দেখতে চাও তুমি? রাজকুমারী আবার বললেন ফিসফিসিয়ে,—ঐ ব্রাহ্মণকে তুমি চেনো?

হ্যাঁ না কিছুই বলতে পারে না চৌধুরীর মেয়ে। সম্মুখগামিনী রাজকন্যাকে অনুসরণ করে মাত্র অন্তর্জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে।

বৈশাখের তপ্ত হাওয়ায় অগুরু ধূপের পবিত্র সুগন্ধ!

শুধু ধূপ নয়, নিদাঘ দিনের শুভ্রফুল বেল, যুঁই আর গন্ধরাজের গন্ধ ভাসছে বাতাসে। বাতাসের একেক প্রবাহে যেন একেক সুগন্ধ বইছে। কৃষ্ণরামের পরিত্যক্ত ভগ্ন-প্রাসাদ যেন এক দেবালয়ে পরিণত হয়েছে। পূজা-অর্চ্চনার আয়োজনে এই ভাঙা-দেউলেই হয়তো দেবতা জেগেছেন!

চন্দ্রকান্তর শুদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণে পূজার কক্ষ যেন গমগম করে। সকল উপচার নেই, তাই তিনি মানসোপচারে পূজা করছেন। বেদীতে শালগ্রামশিলা, সাদা ফুলের রাশিতে লুকিয়ে আছেন দেবতা যেন।

ষোড়শ উপাচার নেই, আছে শুধু ফুল দূর্ব্বা তুলসী আর নৈবেদ্য। নেই আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য মধুপর্ক, বসন, আভরণ। আচমনীয় আর পুনরাচমনীয় নেই। গন্ধ নেই, তাম্বুল নেই। চুয়াচন্দন নেই, আছে শুধু রাশি রাশি শ্বেতপুষ্প।

—আনন্দকুমারী, পূজার উপকরণ দেখে তুমি না হাসো আমার সেই ভয় হয়।

অস্ফুটে কথা বললেন বিন্ধ্যবাসিনী। ফিস ফিস কথা, ঈষৎ হাসির সঙ্গে। পূজার ঘরের এক মুক্ত জানালার ধারে গিয়ে বলেন।

চৌধুরীকন্যার চোখে তখন বিস্ময়ের ঘোর। কত ঐশ্বর্য্য আর বৈভব দেখা চোখ তার, তবুও অবাক হয়ে থাকে যেন দেখতে দেখতে।

রাজকুমারী বললেন, তেমনি ফিসফিসিয়ে,—তোমার কাছে আমার অনেক লজ্জা যে!

—কেন?

বাঁকা চোখে তাকিয়ে বললে আনন্দকুমারী। কাশীর কাতানের শাড়ী তার পরনে। পিঠের আঁচল টেনে টেনে দেহরেখা স্পষ্ট ক'রে তুললো।

—পাছে নিন্দা কর আড়ালে। জানো ভাই, আমার সব ছিল, এখন কিছুই নাই। এখন আমি শ্মশানবাসী।

—আমার অজানা নয় রাজকন্যে! আনন্দকুমারী চুপি চুপি কথা বললে। স্থিরচোখে এখন সে তাকিয়ে আছে।

মুখের ক্ষীণ হাসিটুকু কোথায় যেন মিলিয়ে যায়। রাজকুমারী বললেন,—তোমাকে এখানে বসাই কোথা? তুমি তো যে-সে নও, রাজার ছুলালী। চৌধুরী মশায়ের নামে সাধারণে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়!

—বাপের কাছেই শুনেছি আমি। তিনিই সব বৃত্তান্ত বলেছেন।

আনন্দকুমারী কথা বলে, কিন্তু কথায় যেন মন নেই। যাকে বলছে তার প্রতি চোখ নেই। নিষ্পলক তাকিয়ে আছে। দেখছে হয়তো নারায়ণের পূজা। তাঁর মন্ত্র শুনছে!

—চৌধুরীমশায় বিজ্ঞজন, সবই জানেন। শুনেছি যেমন তাঁর কর্ম্মশক্তি তেমনি দেবদ্বিজে ভক্তিও অপার।

বিন্ধ্যবাসিনীর কণ্ঠস্বর ধীর। কানে কানে কথা বলার সুর। কথা বলেন আর চৌধুরীর মেয়েকে দেখেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। আনন্দকুমারীর বসন-ভূষণ লক্ষ্য করেন।

আনন্দকুমারী বললে,—হাঁ তিনি নমস্য। ভাগ্যকে জয় করেছেন। ব্যবসাকর্ম্মে তা মন্দ কামান না। আমরা জাতিতে নীচু, শাস্ত্রে অধিকার নেই। তবে রূপচাঁদের জোর থাকলে দেব-দেবী আর বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণদের কেনা যায়, তা তো মানো?

কথা শেষ করতে করতে মৃদুমন্দ হাসলো আনন্দকুমারী। চোখে বাঁকা চাউনি, মুখে বাঁকা হাসি। অহঙ্কার উপচে পড়েছে যেন মুখে-চোখে।

পরিচারিকা প্রতীক্ষায় আকুল হয়ে উঠেছে। শৈলেশ্বরকে দর্শন করতে যাবে, সেই আনন্দে অপেক্ষা করছে। সেও যেন অধীর হয়ে এগিয়ে যায়। বলে,—চড়চড়ে কড়া রোদ উঠলো! যেতে-আসতে জিভ বেরিয়ে আসবে।

স্বর্গের সোপান থেকে ধীরে ধীরে নীচে নেমে আসে আনন্দকুমারী। সন্তফোটা হৃৎপদ্ম শুকিয়ে যেতে থাকে তার।

মিথ্যা নয় পরিচারিকার কথা। কাঠফাটা রৌদ্র যেন ছড়িয়ে আছে মাঠে-ঘাটে।

—চল যাই ভাই! এই দারুণ গ্রীষ্মের দিনে পথে বড় কষ্ট! বিন্ধ্যবাসিনী কথা বলতে বলতে আনন্দকুমারীর একখানি হাত ধরলেন নিজের হাতে। একরাশ সোনার চুড়ি সেই হাতে। দিনের উজ্জ্বল আলোয় ঝলমলিয়ে উঠলো চুড়ির রাশি আর হাঙরমুখী কাঁকণ।

—পথও অনেকটা, যেতে আসতে বেলা না পুইয়ে যায়!

কেমন যেন ক্ষুব্ধকণ্ঠে কথা বললে আনন্দকুমারী। তার মুখের সেই হাসি-হাসি ভাব যেন আর নেই। কা'কে যেন ফেলে যেতে হয়, তাই তার চলায় গতি যেন মন্থর।

চন্দ্রকান্ত একটি বারও ফিরে দেখলেন না কেন, ভাবছিল চৌধুরীকন্যা। চন্দ্রকান্ত দেখলেন না আনন্দকুমারীর সাজসজ্জা। তার দেহের থরে থরে কত রূপ আর যৌবন, দেখেও দেখলেন না!

ব্রাহ্মণ হয়তো ধ্যানগম্ভীর হয়ে আছেন! কখনও মন্ত্র উচ্চারণ করছেন সুরেল ছন্দে, কখনও নির্ব্বাক হয়ে পড়ছেন। দুই ভ্রূর মধ্যস্থলে না বক্ষমধ্যে হয়তো দেখতে পেয়েছেন আলোর ছটা। আলোর মণ্ডল মধ্যে দেখছেন ঘনশ্যাম কৃষ্ণমূরতি!

রাজকুমারী বিন্ধ্যবাসিনী ভেবে ভেবে বললেন,—যশোদা, তুমি চৌধুরীর মেয়ের সঙ্গে গিয়ে পালকীতে ওঠ। আমি ফুলের সাজি নিয়ে আসি তৎক্ষণে।

পরিচারিকার পিছু পিছু অগত্যা এগোতে হয় আনন্দকুমারীকে !

লেবুফুলের গন্ধতৈল মেখেছে চৌধুরীকন্যা। চিকন কেশের খোঁপা থেকে একেক ঝলক সুগন্ধ ভাসছে যেন। রাজকুমারী নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন। দেখেন মন্থরগামিনী ঐ আনন্দকুমারীকে। লক্ষ্য করেন তার বেশবিন্যাস, বস্ত্র আর অলঙ্কার। তার দেহলক্ষণ, তার পদক্ষেপ।

দালানের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যায় আনন্দকুমারী।

সহসা রাজকন্যা দ্রুত পায়ে পূজাকক্ষের দ্বার অভিমুখে ধাবিতা হন। যেদিকে দুয়োর সেদিকে ছোটেন। দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে কেন কে জানে গতিহীনার মত দাঁড়িয়ে পড়লেন।

সময় অবাধ্য। অযথা সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, সেই ভেবে বিন্ধ্যবাসিনী মৃদুমন্দ স্বরে কথা বললেন,—মহাশয় শুনছেন ?

চন্দ্রকান্ত নিবিষ্টচিত্তে পূজা করছেন। শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করছেন। বলছেন ...পীড়িতা কামবাণেন চিরমাশ্লেষনোৎসুকাঃ। মুক্তাহারলসৎপী-তুঙ্গস্তন-ভরানতাঃ...

রাজকুমারী অধীর হলেন। পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চস্বরে আবার বললেন, —একটি কথা বলার ছিল, কিন্তু কে-ই বা শোনে !

সম্বিৎ ফিরে আসে যেন। মুক্তচোখে ফিরে দেখলেন চন্দ্রকান্ত ! নারীকণ্ঠ কানে যাওয়ায় দ্বারপথে দৃষ্টি ফেরালেন।

জমিদার-নন্দিনীর মুখ গুণ্ঠনে ঢাকা। কেবল মাত্র নাসিকাগ্র চোখে পড়ে। লজ্জাবতীর মত জড়সড় যেন। মুখের কথা বলতে পারছেন না। জিহ্বা আড়ষ্ট হয় যেন। এক বুক শ্বাস টেনে বললেন,—বৈকালে একবার মহাশয়ের আগমন প্রার্থনা করি।

—অদ্যই কি ?

বেদীর দিকে চোখ ফিরিয়ে কথা বললেন চন্দ্রকান্ত। তাঁর চোখে যেন ধ্যানের আবেশ। মুখাকৃতিতে ভক্তির জড়তা।

—হাঁ আজই।

গুণ্ঠনের অন্তরাল থেকে কথা ভেসে আসে।

—কি প্রয়োজন? যদি অন্যথা হয়! ব্রাহ্মণ বলতে বলতে দু'এক মুহূর্ত থেমে আবার বলেন,—অন্ত এক ইঙ্গদেশীয় শিক্ষার্থীর আসার কথা আছে চতুষ্পাঠীতে। সে হয়তো দ্বিপ্রহরের সময় আসবে। কথায় কথায় যদি বিলম্ব হয়ে যায়।

—ইঙ্গদেশীয় শিক্ষার্থী! নিজের মনে বললেন বিন্ধ্যবাসিনী। স্বগতোক্তি করলেন। বললেন,—তিনি কি মহাশয়ের ছাত্রশিষ্য? আপনি কি ঐ দেশের ভাষা শিক্ষা করেছেন?

—ছাত্র কিংবা শিষ্য হওয়ার যোগ্য সে নয়। এ ইংরাজ একজন বয়স্ক ব্যক্তি, প্রতীচ্য শিক্ষায় দীক্ষিত। কর্ম্মসূত্রে ভারতবর্ষে আসে। বঙ্গভাষা আয়ত্ত করতে চায় কোন্ এক গবেষণার কাজে। আমিও ওদের ভাষা যৎকিঞ্চিৎ জানি। ইংরাজী বর্ণমালা অল্প-বিস্তর অবগত আছি।

—তাকে বিদায় দিয়ে, কাজ মিটায়ে আসতে অনুরোধ করি। রাজকুমারীর মিষ্টি কথায় মিনতির সুর যেন। বললেন,—প্রয়োজন আমার ব্যক্তিগত, তখনই জানাবো। জীবন ধারণের কিছু নির্দ্দেশ চাই। আপনি বিজ্ঞজন, শাস্ত্রসংহিতায় আপনার অগাধ দখল আছে, দিনযাপনের মত কিছু কর্ম্ম যদি আমাকে দেন।

—অপরাধ না নেন, মহাশয়ার অক্ষর পরিচয় আছে কি? পড়ালেখা জানেন?

—হাঁ, তবে কিছু কিছু। একেবারে দক্ষ নই। কৈশোরে এক বৈষ্ণবীর কাছে শিখেছি।

জমিদারনন্দিনীর কথা শুনে চিন্তিত হয়ে থাকলেন চন্দ্রকান্ত। বললেন,—আসা যাওয়ার একমাত্র বাধা, পথ বড়ই বিপদসঙ্কুল। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের গুপ্তদৃষ্টি এড়ায় সাধ্য কার! তথাপি অপরাহ্নে আসতে সচেষ্ট হবো।

কথার শেষে আরেক বার ফিরে দেখলেন ব্রাহ্মণ। দেখলেন জমিদারনন্দিনী দ্বারপ্রান্ত ত্যাগ করেছেন। মুক্তদ্বারের বাইরে বৈশাখের রূপালী

আকাশ। পুনরায় আচমন শুরু করলেন চন্দ্রকান্ত। পূজা-অর্চনায় বিঘ্ন হয়েছে, বাধা পড়েছে। চিত্ত চাঞ্চল্যে পূজার একাগ্রতা বিনষ্ট হয়েছে।

হাতে ফুলের সাজি। সুগন্ধের ডালি হাতে ধরে পালকির ভেতরে সিঁদোলেন রাজকন্যা বিন্ধ্যবাসিনী। ইতি-উতি দৃষ্টি চালিয়ে দেখলেন পালকির অভ্যন্তর। অভ্রের আয়না, গণেশ আর লক্ষ্মীর পট ঝুলছে পালকির দেওয়ালে। ছোট একটি বুদ্ধমূর্ত্তি একটি খুপরিতে। সোনার মূর্ত্তি, প্রায়-অন্ধকারে চিক-চিক করছে। পালকির চারদিকের দেওয়াল শীর্ষে চারটি বুদ্ধ-মন্ত্র লিখিত আছে। রক্তচন্দনে লেখা যেন।

ময়ূরশিখার হাত-পাখার বাতাস খায় চৌধুরীর মেয়ে। লাল শালুর তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসেছে। দাঁতে ঠোঁট কামড়ে আছে কি এক ভাবনায়। রাজকন্যা পালকিতে উঠতে আনন্দকুমারী বললে,—এই আনকোরা শাড়ীখানি তোমাকে আমি দিলাম। শৈলেশ্বরের মন্দিরে গিয়ে পরবে তুমি।

—আমি তো কিছুই দিতে পারি না। তুমি দেবে কেন?

সলজ্জায় বললেন বিন্ধ্যবাসিনী। প্রত্যাখ্যান করলেন না, গ্রহণ করলেন হাত পেতে। বস্ত্রখানি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। খোলে হাত দিয়ে থাপী অনুভব করলেন, বেশ ঠাস্‌-বোনা।

আনন্দকুমারী যেন হাঁসফাঁস করছে বোশেখী গরমে। ময়ূরশিখার হাতপাখা চালনায় রাশি রাশি সোনার চুড়ি রুনুঝুনু বাজতে থাকে ঘন ঘন।

মান্দারণ থেকে কাঁটালি গ্রামের পথ ধরে পালকি চলেছে। যা হোক পথের দু'ধারে আছে গাছের সারি। বাঁশের ঝাড়। শিমূল, মাদার, সজনে আর তেঁতুল গাছের ছায়া মেঠো সড়কে। ফালি ফালি রোদ ঠিকরেছে পথের এখানে সেখানে।

—কেমন করে তুমি দিন রাত কাটাও, একটু শুনাও। আলতা-লাল ঠোঁঠের কোণে হাসির ঝিলিক তুলে শুধোলে আনন্দকুমারী। হেসে হেসে বললে যেন।

—অনুমানে বোঝ না? বিন্ধ্যবাসিনীও বললেন অল্প হেসে। মাথার গুণ্ঠন খুলে বললেন,—তোমার দিন কাটে কিসে আগে শুনি?

হাতপাখা থামিয়ে তাকিয়ায় আরও হেলে পড়লো আনন্দকুমারী।

খস-আতর-মাখা রেশমী রুমাল ছিল কোমরে ঝুলানো। রুমাল টেনে নিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বললে,—আমার দিন কাটে দৌরাত্ম্যে। ঘরে থাকতে মন চায় না যেন। এই পালকিখান আছে, হেথায় সেথায় ঘোরাঘুরি করি। আজ এখানে কাল সেখানে যাই।

—আমার তো কোথাও যাওয়ায় হুকুম নেই, ঘরেই থাকি। খেয়ে ঘুমিয়ে দিন আমার কাটতে চায় না যেন। হেসে হেসে কথা বলেন রাজকুমারী তাঁর দীর্ঘ আঁখিযুগলও যেন হাসলো।

—মান্দারণে আছো কত কাল?

—প্রায় এক পক্ষ। এসেছি বেশী দিন নয়।

—জমিদার কৃষ্ণরামের বিয়া অনেকগুলি, তাই কি?

—হাঁ, তা অনেক। কুলীন বামুন মরণকালেও কনের গলার মালা দিয়ে যায়, জানো না?

—শুনেছি, এমনটা দেখি নাই কখনও।

—দেখতে যেন না হয়।

পালকিবাহকদের কলগুঞ্জনে কথা যেন চাপা পড়ে যায় একেকবার। যতই অগ্রসর হয় পালকি, ততই যেন বাহকদের গতিও বাড়তে থাকে।

পালকিতে উঠেই ব'লে দিয়েছে চৌধুরীর মেয়ে, যেতে হবে কোন্ পথে। কোথায় গন্তব্য।

মন ফেলে এসেছেন বিন্ধ্যবাসিনী। তাঁর সেই ভাঙা-দেউলে মন পড়ে আছে। বিন্ধ্যবাসিনীর মন নেই যেন কিছুতে। কেমন যেন বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে মনের অবস্থা। জমিদার কৃষ্ণরামের দেওয়া ভাত-কাপড়, ঘৃণায় যেন তাঁর অন্তরাত্মা অস্থির হয়ে ওঠে থেকে থেকে। ভগ্নগৃহ, তবুও যেন থাকতে ইচ্ছা করে না সেখানে।

গাছের তলা আছে। ভিক্ষা চাওয়া আছে। গাছের ছায়া আর গৃহস্থের ভিক্ষাদান সম্বল ক'রে পথে বেরিয়ে পড়তে পারলে যেন শান্ত হয় রাজকুমারীর মন। একটি বার পথে বেরুলে তখন কাশী নয়তো বৃন্দাবনের পথ খুঁজে মিলতে বেশী দেরী হবে না। কিন্তু পথে দুর্যোগ আসে যদি, ঝড় বৃষ্টিতে তখন কে দেবে আশ্রয়? বয়সের বাধা আছে যে সমর্থ যুবতী রাজকুমারীর।

তাই ঘরে ব'সে যদি কোন কর্ম্ম করে কিছু উপার্জ্জন করা যায় মন্দ কি। সাতগাঁ থেকে হপ্তায় হপ্তায় পাঠানো এটা সেটা, ফেরৎ দেওয়া যায়। সুতা কেটেও যদি দু'চার কড়ি মিলে। অপমানের জ্বালা ধরে যে বিন্ধ্যবাসিনীর বুকে! সাতগাঁয়ের ভাত-কাপড়ে বেঁচে থাকবেন, ভাবতেও ঘৃণা হয়।

—তোমার মত আমার কপাল হ'লে কি যে করতুম কে জানে! আনন্দকুমারী তাকিয়া ছেড়ে উঠে বসলো কথা বলতে বলতে। বললে,—যে আমাকে রাখে আমি তাকে রাখি।

দাসী যেন আর থাকতে পারলে না, বললে,—জমিদারনীর মন আর তুমি ভেঙো না বাছা!

খিল-খিল শব্দে হেসে ফেললো আনন্দকুমারী। নিজের দেহে যেন তরঙ্গ তুললো হাসতে হাসতে। রেশমী রুমালে অধর চেপে হাসছে তো হাসছেই, যেন থামবে না। হাসির সুরে যেন ব্যঙ্গ না তাচ্ছিল্য। হাসতে হাসতেই বললে,—জমিদারনীর কানে আমি মন্তর প'ড়ব, দেখিস্।

—ও মা, সে কি কথা গো! কোথায় যাবো গো! পরিচারিকা আপন মনে বলে যায়। মুখ-চোখে ভয় ফুটিয়ে বলে,—দোহাই তোমার, অমন কুকর্ম্ম ক'র না!

আরও হাসতে থাকে আনন্দকুমারী। হাসতে হাসতে চোখ বেয়ে যেন জল ঝরে তার। হাতপাখা থামিয়ে বলে,—তুই তখন কোথায় থাকিস্ দেখবো আমি!

—কান নষ্ট করবে বৌয়ের?

—হাঁ গো হাঁ। পথ ব'লে দেবো, ফন্দী-ফিকির বাৎলে দেবো।

পরিচারিকার চোখে ফুটেছে ভীষণ ভয়। মুখ যেন কাঁদোকাঁদো। কপালে দেখা দেয় কুঞ্চন-রেখা। খানিক নিস্তব্ধ থেকে সগর্বে বললে,—নিজের বুকে হাত রেখে,—এই আমি যতক্ষণ আছি ততক্ষণ কাকেও ঘেঁষতে দেবো না। আমি বেঁচে থাকতে নয়। একটা মজা মাছিকেও নয়।

আবার হাসতে শুরু করলো আনন্দকুমারী। আগের চেয়ে অনেক জোরালো হাসি ধরলো যেন।

—কোথাকার কাল-ভুজঙ্গিনী তুমি? কোথাকার ঘর-জ্বালানী? যশোদা যেন থামতে চায় না, বলে যায়।

—এই মান্দারণের! হাসির বেগ কমিয়ে বললে আনন্দকুমারী। বললে,—এই মান্দারণের অর্দ্ধেক আমার বাপের তা জানিস্? তুই তো আমার কাছে ছারপোকা, টিপে মারবো তোকে! হাতীর পায়ের তলে ফেলে দিয়ে পিষে মারবো।

এতক্ষণ মিটিমিটি হাসছিলেন বিন্ধ্যবাসিনী। ওদের পরস্পরের কথা শুনতে শুনতে। তিনিও যেন চঞ্চল হয়ে পড়লেন। দর্পভরা চাউনিতে কটাক্ষ হানলেন।

—ওরে কলঙ্কিনী! ধম্মে সহ্য হবে না। মাথায় যে তোমার বজ্রাঘাত হবে!

বিন্ধ্যবাসিনী ঈষৎ গম্ভীর সুরে বললেন,—যশোদা, এ সকল কথা যেতে দাও। তুমি থামো।

—কথা শুনলে মরা মানুষও যে বেঁচে ওঠে। এ কি ছিষ্টিছাড়া মেয়ে!

হাসতে হাসতে কাঁচুলীর ভেতর হাত ভ'রল আনন্দকুমারী। গোলাপী ছোপানো মখমলের কাঁচুলীর মধ্য থেকে বের করলো খাপে-ভরা দামাস্ক ছুরিকা। বেগুনী বনাতের খাপ, জরির নক্সাকাটা। বললে,—দেখছিস তো। মনে রাখিস্!

শিউরে উঠলো যশোদা। মরণকে যেন নিকটে দেখতে পেয়ে ভয়ে শিউরে উঠলো। প্রায় কান্নার সুরে বললে,—চল, বৌ ফিরে চল। পালকি ফেরাতে বল।

—পালকি আমার। আমি যেদিকে বলবো সেদিকে যাবে। হাসির জের টেনে কথা বলে আনন্দকুমারী। যেখানকার অস্ত্র সেখানে রাখতে রাখতে বলে।

বিন্ধ্যবাসিনী বললেন,—মস্করা বোঝ না কেন যশোদা? চৌধুরীর মেয়ে কি সত্যি সত্যি বলছে?

—সত্যি-মিথ্যে জানি না। বলে কেন অমন ধারার কথা?

আড়চোখে দেখে আনন্দকুমারী। টেরিয়ে টেরিয়ে দেখে। বলে,—আমাকে কিছু করতে হবে না। ঐ চন্দ্রকান্ত যখন সন্ধান পেয়েছে তখন—

কথা শেষ ক'রল না। হাতপাখা তুলে আবার হাওয়া খেতে থাকলো।

ধৈর্য্য আর স্থৈর্য্য হারিয়ে ফেলেন বিন্ধ্যবাসিনী। অধর কেঁপে ওঠে যেন। বুকে যেন হাতুড়ির ঘা পড়তে থাকে। কিংকর্ত্তব্য বুঝতে পারেন না যেন। প্রতিবাদ জানাতে চাইলেও নীরব হয়ে যান। ক্রোধে যেন সর্বাঙ্গ জ্বলতে থাকে। কেন কে জানে, মনে মনে ভাবেন, ধরণী দ্বিধা হও।

—শুনলে তো জমিদারনী? পরিচারিকা বললে ভয় আর রাগে কাঁপতে কাঁপতে!

বিন্ধ্যবাসিনীও যেন হতবাক হয়ে থাকেন। আনন্দকুমারীর কারচুপি বুঝতে পারেন যেন এতক্ষণে। যশোদার মন বিষিয়ে দিতে চায় সে, খেয়াল হয় তাঁর। সত্যিই আনন্দকুমারী যেন কালভুজঙ্গিনী। মনের গতি তার সহজ সরল নয়,—আঁকাবাঁকা, সর্পিল!

—ব্রাহ্মণ তেমন মানুষ নন, তা তুমি যাই বল বেনের মেয়ে!

বিন্ধ্যবাসিনী কথা বললেন রাগের সুরে। প্রতিবাদের ভঙ্গীতে, অনন্যোপায়ে।

ব্যঙ্গভরা হাসি হাসলো আনন্দকুমারী। বিদ্রূপের হাসি যেন। হেসে হেসে বললে,—তুমি তো জমিদানী, দু'দিন দেখছো, আর আমি আমার জন্ম থেকে দেখছি।

—কি দেখছো তাই শুনি?

—তা আর নাই শুনলে! শুনে যদি মূর্চ্ছা যাও?

—তবুও শুনি। জেনে রাখা ভাল! আগেভাগে সাবধান হ'তে পারি।

ভাবালু চোখে তাকিয়ে থাকে আনন্দকুমারী, হাত-পাখার হাওয়া খেতে খেতে। পাখার বাতাসে তার চূর্ণ কুন্তল থর থর কাঁপতে থাকে। বুকের কাপড় স'রে যায়।

—আজ থাক রাজকুমারী, পরে শুনাবো চন্দ্রকান্তর কীর্ত্তিকলাপ। আজ একটা শুভ কাজে যাচ্ছি, শৈলেশ্বরের পূজো দিতে যাচ্ছি, আজ আর নয়। ঠোঁট বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে কথা বলে চৌধুরীকন্যা। বাঁকা চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে।

কি আর বলবেন রাজকন্যা, তাই চুপ মেরে যান। মুখে যেন তার কালো-ছায়া নামে দুশ্চিন্তার। চোখে ফোটে হতাশ চাউনি। বুক দুরদুরিয়ে কেঁপে ওঠে যেন! হাত-পা যেন শিথিল হয়ে যায়।

কাঁটালীর পথ ধ'রে ছুটে চলেছে পালকি! পথের মাটি তেতে উঠেছে, তাই ছুটতে ছুটতে চলেছে বাহকরা।

—ব্রাহ্মণী, তুমি রুষ্ট হয়েছো? নকল স্নেহের সুরে বললে আনন্দকুমারী। বললে,—আমার কথা ধরো কেন? আমি এমনি ব'লেছি, বোঝ না তুমি? একটু থেমে আবার বললে,—আমি যে বড্ড মুখরা! মা আমার জন্মের পর মুখে নিমের আরক দিয়েছিল, তাই।

—তোমার খুরে খুরে দণ্ডবৎ! যশোদা যুক্তকর কপালে ঠেকায়। বলে,—অমন জানলে আমি কি সঙ্গে আসতে চাইতুম?

হেসে যেন লুটিয়ে পড়ে আনন্দকুমারী। মজা আর ভাঁড়ামি দেখলে যেমন হাসি পায় সেই ধরণের হাসি যেন।

·

—শৈলেশ্বরের মন্দির আর কতদূরে ভাই? হাঁফ ধরছে যেন আমার! বিন্ধ্যবাসিনী ভাঙা কাঁসরের সুরে কথা বললেন। আঁচলে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন।

পালকির আচ্ছাদন সরিয়ে ইতি-উতি দেখলো আনন্দকুমারী। বললে,

—আর পোয়াটাক পথ বাকী আছে। কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে দিদি? কেষ্টরামকে কি মেলে?

মুখ বিকৃত করলেন রাজকন্যা। বিরক্তির সঙ্গে বললেন,—ও নামটি আর আমার কানে শুনিও না, দোহাই তোমার!

—ছিঃ, অমন কথা বলতে নেই। তিনি না তোমার পরমগুরু!

—তা হোক, তবুও আমি শুনতে চাই না। প্রবল প্রতিবাদের সুরে বললেন রাজকুমারী। বললেন,—মিথ্যে আর জ্বালিও না আমাকে। বেশ আছি আমি। ভুলে আছি।

প্রখর তাপে হাঁসফাঁস করতে থাকে চৌধুরীর মেয়ে। কাঁহাতক আর হাত-পাখা চালায়। হাত টনটনিয়ে ওঠে যেন। লাজলজ্জা বিসর্জ্জন দিয়ে পালকির পাল্লা সরিয়ে দেয়, যদি বাতাস আসে, সেই আশায়।

গড়মান্দারণ থেকে কাঁটালীগ্রামে এগিয়ে চলেছে পালকি অপ্রতিহত গতিতে। শ্রীপুর গ্রাম ছেড়ে মুকুন্দপুর পেরিয়ে কাঁটালী গ্রামের পথ ধ'রে পালকি ছুটছে। তপ্ত বাতাস আসছে যেন। যতদূর চোখ যায় শুধু দেখা যায় অতীত গৌরবের স্মৃতি। এখানে-সেখানে অসংখ্য অরণ্যাবৃত মৃৎস্তূপ আর বহু বিলুপ্তপ্রায় দুর্গপ্রাকার। আপাতদৃষ্টিতে ভয় হয়।

—শৈলেশ্বরের মন্দির ঐ দেখা যায়। আনন্দকুমারী পথের বাঁক থেকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখায় আর বলে। বলে,—দিনের প্রথম ভাগে মন্দিরে বড় ভিড় হয়! দর্শন পাওয়া যেন অসাধ্য হয়। মন্দিরে ঢোকে কার সাধ্য?

শৈলেশ্বরের মন্দির যেন আকাশ স্পর্শ করেছে। মন্দিরের আশপাশের দীর্ঘকায় বৃক্ষসমূহ ভেদ করে, মন্দির শীর্ষ মাথা তুলেছে। পালকি এক বৃক্ষতলে নামিয়ে দেয় বাহকরা। মন্দির বিন্ধ্যবাসিনীর নয়নগোচর হওয়ায় তিনি মনে মনে প্রণাম জানালেন।

—রাজকুমারী, এখানে লোকে লোকারণ্য। তুমি পালকির ভেতরে থেকেই কাপড় বদলাও। আমরা অপেক্ষা করি।

ক্ষণেকের মধ্যে নববস্ত্র পরিহিতা বিন্ধ্যবাসিনী পালকির বাইরে বেরিয়ে

ইতিউতি দেখে শিউরে শিউরে উঠলেন। যত সব অঙ্গহীন আর বিকলাঙ্গর দল দাঁড়িয়ে আছে হা প্রত্যাশায়। মূক, বধির, আর অন্ধ জন যত। পুরুষ আর নারী ভিক্ষা চাইছে হাত পেতে। ইনিয়ে বিনিয়ে আর কেঁদে কেঁদে ভিক্ষা চাইছে। প্রায় নগ্নদেহ সকলের। অভাবের তাড়নায় হয়তো লজ্জা ঘুচে গেছে।

—চল রাজকুমারী, আমার সঙ্গে চল। নয়তো ঘিরে ধরবে ঐ যত রোগশোকের আসামীরা!

কথা বলতে বলতে মন্দিরের পথে এগিয়ে চললো আনন্দকুমারী। আকপাল গুণ্ঠন টেনে, যেন মুখ লুকিয়ে, বিন্ধ্যবাসিনীও চললেন ধীরে ধীরে। যশোদা চললো ভিখারীদের পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে। তার হাতে পূজার উপচার।

—শৈলেশ্বর বড় জাগ্রত শিব। কথার গুঞ্জন তুললো চৌধুরীকন্তা। বললে,—যা প্রার্থনা করা যায় তাই পাওয়া যায়। স্বপ্নে দেখা দেন, কথা বলেন।

—এ কথা আমিও শুনেছি।

অল্প একটু হাসলো আনন্দকুমারী। বললে,—তবে শৈলেশ্বরকে জানাও, যাতে কৃষ্ণরামের মতি ফিরিয়ে দেন শীঘ্রি। তোমাকে সাতগাঁয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যান।

—তা ব'লবো না। ম'রে গেলেও নয়। আমি কারও দয়া ভিক্ষা করি না।

—কেন? তিনি যে তোমার ইহকাল-পরকাল। তবে কি জানাবে?

—যা জানাবো তা কি ফাঁস করতে আছে কারও কাছে!

—আমি কি জানাবো বলতে পারো?

—হুঁ, বলতে পারি। একটি সৎপাত্র যেন ত্বরায় মিলে যায়। সামনের লগনেই—

কথা শেষ করতে পারলেন না বিন্ধ্যবাসিনী। তাঁর মুখে হাত চাপা দেয় চৌধুরীর মেয়ে। সলাজ হাসি ফোটে তার আলতা-লাল ঠোঁটে। বলে,—

কথা ফিরিয়ে নাও তোমার। আমি এখনই বিয়ার জন্য লালায়িত নই।

হাসলেন রাজকন্যা। বললেন,—সাঁজ গেলে দীয়া, আর বয়স গেলে বিয়া?

—পাত্র তো ঠিক আছে, তুমি তবে দাও না কথা এগিয়ে।

—আমার কথায় কে এগোবে? আছে না কি তেমন কেউ?

চৌধুরীর মেয়ে ইদিক-সিদিক দেখলো। চুপি চুপি বললে,—আছে। কাকেও যেন ব'ল না। মনে মনে আমি—

কৌতূহলী হাসি ফুটলো বিন্ধ্যবাসিনীর মুখে। কাকুতি-মিনতি ফুটলো। ব্যস্ত হয়ে বললেন,—কে সেই ভাগ্যবান শুনি?

মন্দিরের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে কথা আর চলে না। সেখানে অনেক দর্শনার্থীর জনতা! বৈশাখের দাবদাহ চলেছে, আগুনের তীর বিঁধেছে যেন দেহে। শীঘ্র পূজাপাঠ শেষ ক'রে ঘরে ফিরতে চায় পুণ্যপ্রার্থীরা। ক'জন পুরোহিত, তাঁরা যেন বেসামাল হয়ে পড়েছেন।

শ্বেতপ্রস্তরের মূর্তি শৈলেশ্বরের। প্রকৃতি আর পুরুষের প্রতিমূর্তি। মন্দিরের মধ্যে থেকে সুগন্ধের ঢেউ আসে বাইরে। মূর্তি ঢাকা পড়েছে ফুল আর বিল্বপত্রে।

চৌধুরীর মেয়েকে দেখে সকলেই পথ ছেড়ে দেয়। গায়ে যেন গা লাগে না তার। যতেক পুরুষ আর মহিলা সরে যায় আনন্দকুমারীকে দেখে। কিন্তু সে কাকেও দেখে না। ফিরেও তাকায় না। সকলের বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে থাকে শুধু তার প্রতি।

বাদশাহী মোহর ছুঁড়ে দেয় আনন্দকুমারী। এক মুঠো সোনা। ধাতব মুদ্রা ঝনঝনিয়ে ছড়িয়ে পড়লো শৈলেশ্বরের বেদীতে। রাশি রাশি ফুল ছুঁড়তে থাকে চৌধুরীকন্যা। মুঠো মুঠো ফুল। পুষ্পবৃষ্টি হয় যেন।

গলায় আঁচল। যুক্তকর। মুদিত আঁখি। মুখে যেন পথক্লান্তি। কিংবা হয়তো প্রার্থনা জ্ঞাপনের সরলতা। যেন ভিখারিণীর মত কি চাইছেন রাজকন্যা! স্বস্তি না শান্তি কে জানে!

স্থানীয় বাসিন্দারা যেন কিছু অধিক বিস্মিত হয়েছে। চৌধুরীর মেয়ের সঙ্গে ইনি আবার কিনি! কে এই রূপবতী, যাকে কোন দিন দেখেনি, শ্রীপুর, কাঁটালী, আর মুকুন্দপুরের বাসিন্দা? সকলের চোখেই যেন ব্যাকুল জিজ্ঞাসা ফুটে আছে।

—চরণামৃত দিন পুরোহিতমশাইরা। গোকর্ণ মুদ্রায় হাত পাতলো চরণ-জলপিয়াসিনী।

একজন পুরোহিত অতি সাবধানে, আলগোছে তাম্রকুণ্ড উলটে দিলেন তার হাতে।

বিন্ধ্যবাসিনী যেন পরকালের পথের পথিক। তাঁর মনের কামনা-বাসনা ফুরিয়ে গেছে, এমনই নিস্পৃহ মুখভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। রুদ্ধচোখ। প্রার্থনা নেই যেন কিছু। শুধু যেন চরণাশ্রয় ভিক্ষা করছেন নীরবে। ঠাঁই চাইছেন পায়ে।

শৈলেশ্বরের চোখ আছে কি না কে জানে। তিনি হয়তো দেখছেন অন্তরের চোখে। দেখছেন হয়তো রাজকুমারীর চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমেছে শ্রাবণ ধারার মত। বর্ষার আকাশের মতই মুখখানি যেন থমথম করছে।

—বৌ, ফিরবে না?

পরিচারিকার কথায় কতক্ষণ পরে সাড় ফিরলো যেন রাজকুমারীর। গম্ভীর তপস্যায় ছেদ পড়লো। চোখ মেলে তাকালেন, কিন্তু দৃষ্টি যেন আচ্ছন্ন হয়ে আছে তখনও। ইদিক-সিদিক চোখ ফিরিয়ে দেখলেন। খুঁজলেন যেন কাকে। বললেন,—কৈ, কোথায় গেল আনন্দকুমারী? আমাদের ফেলে চলে গেল না কি?

—না যায় নাই। মন্দিরের চত্বরে আছে। ভিক্ষা দিচ্ছে। দান-খয়রাত করছে।

মন্দির থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে পড়লেন বিন্ধ্যবাসিনী। অন্ধকার থেকে প্রখর আলোয় বেরিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে ওঠে যেন। স্পষ্ট কিছুই দেখতে পান

না। ঝাপসা দেখেন। দৃষ্টির জড়তা কাটিতে দেখতে পেলেন অদূরে আনন্দকুমারী। তাকে ছেঁকে ধরেছে যতেক নিরাশ্রয়ের দল। চীৎকার করছে। কাড়াকাড়ি মারামারি করছে যেন।

একজন পালকিবাহক হাতে ধামা ধ'রে আছে। আর আনন্দকুমারী তামার চাকতি মুঠো মুঠো ছুঁড়ছেন। যেন হরির লুঠ হচ্ছে!

পালকিতে উঠে বসলেন রাজকন্যা। তৃষ্ণায় যেন ছাতি ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয় তাঁর। এখন পর্য্যন্ত আজ এক বিন্দু জল খাওয়া হয়নি। রৌদ্রের তাপে যেন অগ্নিকণা।

—আজ আর গোপেশ্বর দর্শন থাক রাজকুমারী। আবার আসা যাবে একদিন—কথা বলতে বলতে পালকিতে উঠলো চৌধুরীর মেয়ে। বললে, —জল না খেয়ে যেন পারি না আর। এসো উপোস ভাঙি, জল খাই।

কোন কথা বললেন না বিন্ধ্যবাসিনী। সম্মতি বা অসম্মতি কিছুই না। চৌধুরীকন্যা তাঁর হাতে তুলে দিলো প্রসাদী ফল আর মিষ্টি। নিজেও মুখ তুলল কি কি যেন। বললে, দাও ব্রাহ্মণী দুই পাত্র জল গড়িয়ে দাও। খেয়ে তৃষ্ণা মিটাই।

পালকির অভ্যন্তরে আছে জলপাত্র। রূপার কলসী। যশোদা দু' পাত্র জল ভরলো। এগিয়ে দিলো দু'জনকে।

—কি ভাব ছাই? চৌধুরীকন্যা শুধায়। বলে,—মুখে তোল না।

হাতে আহার, তবুও চুপচাপ বসে থাকেন রাজকন্যা। কত যেন দুশ্চিন্তায় ডুবে আছেন এখনও। বাধ্য হয়ে হাতের বস্তু মুখে তুললেন।

বহুক্ষণ উপসী আর তৃষ্ণার্ত্ত থাকলে সহসা যেন বেশী কিছু খাওয়া যায় না। তাই অল্প কিছু মুখে দিয়ে ঢকঢকিয়ে জল পান করতে থাকে আনন্দকুমারী। আকণ্ঠ জল খেয়ে তৃপ্তির শ্বাস ফেলে যেন। বলে, পালকির বেহারাদের উদ্দেশে বলে,—পালকি উঠাও।

—আমার তরে তোমার কত কষ্টভোগ করতে হচ্ছে! বিন্ধ্যবাসিনী মিষ্টি-স্বরে কথা বললেন।

চৌধুরীর মেয়ে কথা বলতে বলতে মুখে মৌরী পুরলো। মুখশুদ্ধি মুখে দিলো। ক্লান্তমুখে যেন তার হাসি ফুটলো। বললে, কণ্ঠস্বর নামিয়ে রাজকন্যার কানের কাছে মুখ এগিয়ে বললে,—তোমার তরে তো যা হোক কষ্ট করলাম কিছু, এখন আমার একটা উপায় কর। কথার শেষে রহস্যের হাসি হাসলো আনন্দকুমারী। খস মাখানো রেসমী রুমালে মুখ মুছে হাত-পাখা তুলে নিলো হতে।

—আমি কি করতে পারি বল? আমাব হাতে কি আছে?

—আছে গো আছে। রাজকন্যা, তোমার হাতেই আছে।

ভেবে ভেবে কিছুই ঠাওরাতে পারেন না বিন্ধ্যবাসিনী। অবাক চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললেন,—তুমি যেমন বলবে তেমন করবো। কি করতে পারি বল। মনে মনে কাকে তুমি বর বরণ করেছো, আমি জানবো কোথা থেকে?

—যদি জানাই, পারবে না তুমি একটা পাকা ব্যবস্থা করতে?

—আমার হাতে যদি থাকে নিশ্চিত করবো।

—শৈলেশ্বরের দিব্যি তো?

—হাঁ শৈলেশ্বরের নামে শপথ করছি আমি।

হঠাৎ যেন উৎফুল্ল হয়ে উঠলো চৌধুরীর মেয়ে। খুশী উপচে উঠলো তার মুখে-চোখে। আনন্দকুমারী এমন প্রসন্ন হাসি হাসতে পারে, এই প্রথম দেখলেন যেন বিন্ধ্যবাসিনী। চৌধুরীকন্যা বললে,—তোমার মঙ্গল হোক রাজকন্তে। হাতের লোহা অক্ষয় হোক তোমার।

বিন্ধ্যবাসিনী হাসলেন কৃত্রিম। হাসতে হয় তাই যেন হাসলেন। বললেন,—তোমার মনোমত পাত্রটি কে তাই শুনি?

রাজকন্যার কানের কাছে মুখ এগিয়ে আনে আনন্দকুমারী। হেসে হেসে, ফিসফিসিয়ে বললে,—জাতিতে তিনি ব্রাহ্মণ, তাই তো যত ফ্যাসাদ!

চমক লাগে যেন বিন্ধ্যবাসিনীর। তাঁর অন্তঃকরণ শিউরে ওঠে যেন।

তবুও তিনি হাসলেন ঈষৎ। বললেন,—তোমার সাহস তো দেখি কম নয়! কে আছেন এমন জন, যিনি—

কথার মধ্যে আবার কথা ধরে আনন্দকুমারী। ফিসফিস বললে,—মধুবাটী চতুষ্পাঠীর ঐ চন্দ্রকান্ত তর্কভূষণ!

কানে যেন বজ্রাঘাত শুনছেন বিন্ধ্যবাসিনী! প্লাবনের ডাক শুনছেন যেন। তবুও তিনি হাসলেন। শুষ্কহাসি। কথা বললেন যেন বাষ্পরুদ্ধ স্বরে,—তাঁকে আজ বৈকালে আসতে অনুরোধ জানিয়েছি! সুযোগ পাইতো কথাটি পাড়বো আমি। তবে আগে জানাও নাই কেন? তাঁর নামে নিন্দা গাইলে খানিক আগে!

সোহাগের সুর ফুটলো আনন্দকুমারীর প্রফুল্ল মুখে। নাটুকে তামাসার ঢঙে বললে,—ক্ষমা কর মম অপরাধ। খানিক থেমে থেকে আবার বললে,—কেন, রাজকন্যে? তাঁকে কেন আসতে অনুরোধ জানিয়েছো?

বিন্ধ্যবাসিনী কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে থাকেন। সেই করুণ চাউনি ফোটে তাঁর বিশাল দুই চোখে! কি বলবেন যেন ভেবে ঠিক করতে পারেন না। যেন অনেক ভেবে ভেবে বললেন,—কিছু কর্ম্ম যদি আমাকে দেন। দিন গুজরাণের মত কোন কাজকর্ম্ম। দু'মুঠো মুখের গ্রাস যাতে জোগাড় হয়।

—তোমার অভাব কি? আনন্দকুমারীর কথায় বিস্ময় ফোটে। বলে,—সাতগাঁ থেকে কিছু পাও না ভরণপোষণ?

—পাই তো, তবে তাতে মন ওঠে না। চাই না আমি সাতগাঁয়ের ভিক্ষে। ঠাঁই হ'ল না যখন, তখন আর হাত পাতবো কেন?

আনন্দকুমারীর মত কঠোর-কঠিন মেয়ের চোখ দু'টিও যেন চিকচিকিয়ে ওঠে। তার কাজল-পরা চোখের কোণে যেন হীরার কুচি দেখা যায় সহসা।

পালকি ছুটেছে তীব্র গতিতে। মেঠো পথ তেতে উঠেছে শ্মশানভূমির মত। কাঁটালীগ্রাম পেছনে ফেলে পালকি এগিয়ে চলেছে হনহনিয়ে।

প্রাচীরের রাজগৃহের সঙ্গে বহির্বিশ্বের যেন কোন যোগ নেই। ফটকে পাহারা যারা দেয় তাদের চোখে ঘুম নেই। সদাজাগ্রত, দাঁড়িয়ে থাকে দিবারাত্র। বিনা পরোয়ানায় যে আসবে সেই বাধা পাবে। প্রহার খাবে, ফিরতে হবে হয়তো রক্তাক্ত দেহে। বর্শার একটি আঘাতে বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে যাবে। নবাব সরকারে নালিশ চলবে না রাজার নামে। স্বয়ং দিল্লীর বাদশাহ রাজাকে অধিকার দিয়েছেন অস্ত্র ব্যবহার আর সৈন্য প্রতিপালনের। বিপদে-আপদে নবাব যদি ডাক পাড়েন, তখন ধার দিতে হবে ঐ অস্ত্র আর সৈন্যবল। বাতাস শুধু বাধা মানে না, ভয় করে না অস্ত্রাঘাতকে ; বৈশাখের ক্ষেপা হাওয়া আসে ছুটতে ছুটতে, রাজগৃহের আঙিনায় দাপাদাপি নাচানাচি করতে থাকে। বাতাসে কথা ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

দ্বিতীয় প্রহরের থমকানো খররৌদ্র চমকে চমকে ওঠে যেন কি এক বিকট শব্দে। দরবার কক্ষের এক অলিন্দে দাঁড়িয়ে রাজাবাহাদুর কি যেন লক্ষ্য করছেন, আর মৃদু মৃদু হাসছেন। কালীশঙ্করের দু'পাশে দু'জন পাখাবরদার, হাওয়া খেলিয়ে খেলিয়ে নিদাঘতাপ দূর করছে। রাজাবাহাদুরের হাতে পানপাত্র, সোনার পেয়ালায় টলমল করছে উগ্র পানীয়। তাঁর আশেপাশে জড়পুতুলের মত নিশ্চুপ ইয়ার-মোসাহেবের দল।

রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি। বিশেষ ক্ষমতা লাভ করেছেন দৈববলে। পৃথিবীর যত অন্যায় আর অনিয়মের প্রতিকার রাজার হাতে। রাজা দীর্ঘজীবী হোন, রাজার জয় হোক! রাজপুরীর সদরের এখান সেখান থেকে জয়ধ্বনি উঠছে সমস্বরে। সিপাই আর পাইকরা দলে দলে মঙ্গল প্রার্থনা করছে। জয়ঢাকে ঘা পড়ছে ঘন ঘন। সিপাহী-সালার মিনারে থেকে ঘন ঘন ভেরী বাজিয়ে চলেছে। প্রহরী-সান্ত্রী দু'পাশে দু'জন পাখাবরদার, তবুও বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটছে রাজার কপালে। কালীকিঙ্করের দেহ-গঠন অতি সুন্দর। আজানুলম্বিত বাহু, বিশাল বক্ষ, বৃহৎ নেত্র। মুখের ডান ভাগে একটি অতি ক্ষুদ্র কৃষ্ণতিল। মুখশ্রী দেখে যাঁরা ভাগ্য অবধারণ করেন, তাঁরাই বলেন,

ঐরূপ চিহ্ন প্রচুর বিভবের আর বর্দ্ধিষ্ণু সৌভাগ্যের অগ্রবর্তী লক্ষণ। কালীশঙ্করের স্বর গম্ভীর, যদিচ বাকপটুতা অসাধারণ। কৌতুকী আমোদী তিনি, তাই যেন মৃদু-মৃদু হাসছেন পশু আর মানুষের লড়াই দেখতে দেখতে।

দরবার-গৃহের নীচের আঙিনায় আসল লড়াই চলছে!

একটা নেকড়ে ইদিক থেকে সিদিকে ছোটাছুটি করছে উর্দ্ধশ্বাসে।

রাজাবাহাদুর দূরে থেকেও দেখতে পেয়েছেন নেকড়ের চোখে পাশব দৃষ্টি ফুটেছে। রক্ত আর মাংসের লোভে মুখ থেকে ও. প্রচুর লালা যেন ঝরছে। হিংস্র বাঘ ঈষৎ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে শ্রমযন্ত্রণায়। এধারে সেধারে তাসা আর জয়ডাক বেজে চলেছে অবিরাম, তাই বুঝি কেমন বিব্রত হয়ে পড়েছে শব্দভয়ে। এক নাগাড়ে ছোটাছুটি করছে।

লড়াই চলেছে নেকড়ের সঙ্গে মানুষের। জগমোহন লেঠেলের সঙ্গে খাঁচার পশুর।

রাজা শাস্তি দান করেছেন জগমোহনকে। নেকড়ের সঙ্গে লড়াইয়ে যদি জয় হয়তো বাঁচোয়া, নয়তো রক্তদানের সঙ্গে সঙ্গে জীবন দান করতে হবে। জীবন আর মরণের যুদ্ধে জগমোহনও যেন বেপরোয়া হয়ে পড়েছে। হাতে আর পায়ে বর্ম্ম এঁটেছে। গায়ে তেল মেখেছে। ঘাম আর তেলে পিচ্ছিল হয়ে আছে তার সর্ব্বশরীর।

সপ্তগ্রাম থেকে গড় মান্দারণে গিয়েছিল রাজকুমারীর সন্ধানে। হদিশ মিলেছে নির্ব্বাসিতা রাজকন্যার। দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে। বিদায়ের ক্ষণে স্মরণচিহ্ন দিয়ে গিয়েছেন বিন্ধ্যাবাসিনী। একটি রত্নাঙ্গুরীয় জগমোহনের হাতে তুলে দিয়ে রাজকুমারী ব'লে দিয়েছিলেন,—রাজমাতাকে দিও, অন্য কারও হাতে না পড়ে।

গড় মান্দারণ থেকে আবার তাকে সুতানুটিতে ফিরতে হয়েছে। খানিক পথ গোযানে অতিক্রম করেছে জগমোহন। খানিক নৌকায়। বাকীটুকু পায়ে হেঁটে শেষ করেছে। দীর্ঘ এক লাঠিতে দেহের ভর রেখে লাফাতে লাফাতে এসেছে। এক এক লাফে দশ থেকে পনের হাত পেরিয়েছে।

রাজগৃহে পৌছাতে না পৌছাতেই গিরিফতার হয়েছে। লোহার কড়া প'ড়েছ তার হাতে আর পায়ে। রাজাবাহাদুর আদেশ দিয়েছিলেন, যেন এই ব্যবস্থাই পাকা করা হয়। তারপর তিনি যেমন বলবেন তেমনি হবে।

হস্তপদবদ্ধ অবস্থায় রাজসমীপে তাকে হাজির করলে। রাজা বললেন,—অপরাধ গুপ্তচরবৃত্তি। অপরাধ রাজ-অন্দরে রাজমাতার মহলে বিনা অনুমতিতে গমনাগমন। অপরাধ—

রাজার কথা শেষ হ'তে না হতে কথা ধরেছিল জগমোহন। দুই কর একত্র ক'রে বলেছিল, অপরাধ হুজুর বহুৎ। রাজমাতার হুকুম অমান্য করি কোন্ ভরসায় ? রাজমাতা যখন হুকুম করলেন ডেকে পাঠিয়ে তখন—

দরবারে ব'সেছিলেন তখন কালীশঙ্কর। ক্রোধে আর উত্তেজনায় থর-থর কাঁপছিলেন যেন। সম্মানের কিছু হানি হয়েছে তাঁর, জমিদার কৃষ্ণরামের কাছে। উপরিপড়া হয়ে জগমোহন গেছে রাজগৃহের পক্ষ থেকে। গালমন্দ মিলেছে হয়তো জগমোহনের কপালে। দেখা না দিয়ে কৃষ্ণরাম হয়তো দূর ক'রে দিয়েছে কুকুর বেড়ালের মত।

আবার কথা বললেন কালীশঙ্কর। দরবার কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে বললেন,—অপরাধ, আমার শত্রুর শিবিরে গিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা ?

—ভিক্ষা আমি চাই নাই রাজাবাহাদুর।

জগমোহনও বললে জোরালো কণ্ঠে। বললে,—সাতগাঁর জমিদার-বাড়ীর মাটিও হুজুর মাড়াইনি।

রাজাবাহাদুর যেন কর্ণপাত করতে চাইলেন না লেঠেলের আকুল আবেদনে। বাম হাতের তালুতে ডান হাতে ঘুঁসি মেরে বললেন,—শাস্তি লও জগমোহন! বৃথা বাক্য ব্যয় কর কেন ? কণ্ঠ সপ্তম থেকে মূহূর্তে নামলো যেন। গোঁফের এক প্রান্ত পাকাতে পাকাতে রাজা বললেন,—লড়াই হোক, তোমার জয় হয়তো আমার কি ! বেঁচে যদি যাও তো তোমার সৌভাগ্য !

—কার সাথে লড়বো হুজুর ? হুকুম করেন খুশী মনে।

—বাঘ-ভাল্লুকের সনে নয়, ভয় নাই তোমার। একটা নেকড়ের সঙ্গে লড় তবে!

—সে ও তো হুজুর ঐ বাঘই হ'ল! বাঘে-মানুষে লড়াই?

হেসে ফেললেন রাজাবাহাদুর! তাঁর হাসির সঙ্গে সঙ্গে বুকের এক খণ্ড হীরা জ্বলজ্বলিয়ে উঠলো। শ্বেত রেশমের উষ্ণীষ শিরে ধারণ করেছেন। উষ্ণীষের আঁচলার কিনারায় সোনালী জরি ঝলমল করছে। নবরত্নের একটি কলকা এঁটেছেন মুকুটের বদলে। কলকার শীর্ষে সাদা পালকগুচ্ছ। রাজা-বাহাদুর বললেন,—নেকড়ে আবার বাঘ হয়েছে কবে? নেকড়ে তো দো-আঁসলা! বাঘ আর কুকুরের ঔরসে—

—হাতে অস্তর দেবেন না হুজুর! জগমোহন চোখ ছোট ক'রে শুধোয়। বলে,—ছোরা-ছুরি শড়কি-বল্লম একটা কিছু যা হয়?

আবার হাসলেন রাজাবাহাদুর। তাঁর সর্ব্বাঙ্গ হেসে উঠলো যেন। রাজা বললেন,—শক্তির পরীক্ষা, অস্ত্রের পরীক্ষা নয় জগমোহন। তুমি প্রস্তুত হও। সিপাহীশালার!

শেষের কথাটি কালীশঙ্কর সজোরে বললেন। ডাকলেন উচ্চকণ্ঠে।

তারপর আর কোন কথায় কর্ণপাত করেননি রাজা। অন্য কাজে মন দিয়েছিলেন। দরবারের নানা কাজে।

দুই যোদ্ধাকে আঙিনায় ছেড়ে দিয়ে খবর দেওয়া হয় রাজাকে। পানপাত্র হাতে ধরেই রাজা দরবারের অলিন্দে এসে দাঁড়িয়েছেন। মৃদু-মৃদু হাসির সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করছেন নেকড়ে আর মানুষের মরণবাঁচনের যুদ্ধ।

হাতে আর পায়ে বর্ম্ম এঁটে নিয়েছে জগমোহন। নেকড়ে যখন লাফ দিয়ে আক্রমণ করছে, তখনি সে পা চালাচ্ছে। জানুতে এসে লাফিয়ে পড়ছে হিংস্র জানোয়ার, তখন প্রতিপক্ষকে রামঘুষি মারছে বুকের পাঁজরায়। তারপর পিছু হ'টে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে জগমোহন। নেকড়েটাকে ছোটাচ্ছে। ছুটিয়ে ছুটিয়ে যদি দম নষ্ট করা যায়!

চিৎকার করছে একেক বার। হুঙ্কার ছাড়ছে ঘুঁষি খাওয়া নেকড়ে।

বুকের পাঁজরাগুলো যেন গুঁড়িয়ে যাচ্ছে এক্কেক ঘায়ে! জগমোহনও চিৎকার করছে। গর্জ্জন করছে যেন থেকে থেকে।

সুতানটির সকল মানুষ জানতে পারে রাজপুরীতে অত্যাচারের তাণ্ডবলীলা চলেছে। কে যেন আর্ত্ত স্বরে চিৎকার করছে। রাজার আদালতে কোন আসামীকে শাসন করা হচ্ছে হয়তো!

ফটকের কাছে দর্শনার্থীর ভিড় জমেছে, কিন্তু কড়া পাহারার ফলে কেউ যেন এগোতে সাহস পায় না! শিউরে শিউরে ওঠে তারা পশু আর মানুষের আকুল কণ্ঠ শুনে।

রাজা কালীশঙ্কর শুধু হাসছেন থেকে থেকে। পানপাত্র মুখে তুলছেন কখনও। নেকড়েটা লড়াই করতে করতে কেমন যেন কাহিল হয়ে পড়েছে। একটা পা তার হয়তো ভেঙ্গে গেছে আছাড় খেয়ে, তাই চলাফেরা করছে খুঁড়িয়ে। জগমোহনের জানু থেকে তাজা লাল রক্ত ঝরছে। নেকড়ের থাবা না দাঁতের আঘাতে কেটে ছিঁড়ে গেছে। আর একটি বার বাগিয়ে ধরতে পারলেই জয় হয় জগমোহনের। পায়ের তলায় ফেলতে পারলে পিষে মারা যায়।

রাজমাতার গুপ্তচরী আছে। তারাই কানে তুলে দেয় বিলাসবাসিনীর, জগমোহন লেঠেল সপ্তগ্রামে ফিরতেই শাস্তি ভোগ করছে রাজার আদেশে। নেকড়ের মুখে তাকে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুনে কানে আঙুল দিলেন রাজমাতা। কুঠরী থেকে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। পরিচারিকাদের বললেন,—চল, আমি যাবো দরবারে! জগমোহনের প্রাণ ভিক্ষা করবো রাজার কাছে হাত পেতে।

—এতক্ষণ বোধ হয় শেষ হয়ে গেছে!

—লড়াই চলেছে বহুক্ষণ ধরে!

রাজমাতা কপালে করাঘাত করলেন। বললেন,—বাঘে মানুষে লড়াই? শাস্তি যদি দিতে হয় আমাকে দিক। কাপড়ে আগুন ধরিয়ে মরবো? মরতে ভয় করিনা আমি। তোমরা আমাকে সদরে নিয়ে চল!

—সে কি কথা রাজমাতা! ক্রোধে অন্ধ হয়েছো তুমি?

বিলাসবাসিনী যেন ঠিক শিশুর মত কেঁদে ফেললেন। মনের বাঁধ যেন তাঁর ভেঙ্গে গেছে। দরদর অশ্রু ঝরছে গণ্ড বেয়ে। কান্নার সুরে বললেন,—সদরে ব'লে পাঠাও আমি ভিক্ষা চাইছি রাজার কাছে। জগমোহনকে রেহাই দেওয়া হোক! আমার হুকুমে গিয়েছিল সে, শাস্তি যদি দিতে হয় আমাকে দিক। ছোটকুমার কাশীশঙ্কর কোথায়? তাকেই না হয় ডাকতে পাঠাও।

কথা বলতে বলতে বিলাসবাসিনী দ্রুত অগ্রসর হন। তাঁর পিছু নেয় ব্রজবালা। বলে,—রাজমাতা, অধীর হন কেন এত?

—জগমোহন যে আর বাঁচে না ব্রজবালা! কি করি আমি? কোথায় যাই?

—ধৈর্য্য ধারণ করুন, আপনি শান্ত হোন।

—কুমারবাহাদুরও কি মদ্য পানে জ্ঞান হারিয়েছেন! কাশীশঙ্কর কোথায়? এত্তেলা দাও না তার কাছে। সে এসে রক্ষে করুক ঐ গরীব-মানুষকে!

খাসমহলের দরদালানে রাজমাতার কাতর কণ্ঠ আছড়ে আছড়ে পড়ে। পরিচারিকা ব্রজবালা বিলাসবাসিনীর দুই পা আঁকড়ে ধ'রে আছে।

—ব্রজ, আমাকে ছাড়ো, মিথ্যে মিথ্যে ধ'রে রাখো কেন? আমি যাই কাশীশঙ্করের দুয়োরে। মা হয়ে ভিক্ষে চাইতে যাই!

কথার শেষে আবার কেঁদে ফেললেন রাজমাতা। রক্তচাপের রোগিণী, রাঙা চোখ থেকে যেন রক্ত ঝরছে জলের বদলে। শুধু চোখ নয়, সারা মুখখানি যেন তাঁর ভীষণ লাল হয়ে আছে। চোখ যেন কপালে উঠে গেছে।

কুমারবাহাদুরেরও জানতে আর বাকী নেই।

কাছারী ব'সে খাতার কাজ দেখছিলেন কাশীশঙ্কর। চালের আড়ত তুলতে কি কত খরচাপত্র হয়েছে সেই সব হিসাব-পরীক্ষার কাজ করছিলেন। ঘরামির রোজ করছিলেন কয় শত বাঁশ লাগলো! শালের গুঁড়ি কতগুলো। ক'গাড়ী খড় এসে পৌঁছেছে। নারকেল দড়ি এলো কত কত গাঁট।

ক'জন নায়েব সেরেস্তায় কাজে লেগেছে কুমারের সঙ্গে। খাতা লেখার কাজ করছে। কাছারীর খোলা জানলা থেকে কাশীশঙ্কর বারে বারে দেখছেন

কি যেন, আর হিসাব ঠিক করছেন নিজে কলম ধ'রে। জানালার বাইরে খটখটে সাদা আকাশের তলায় সবুজ খাসের আড়াল থেকে ঘর উঠছে অনেক উঁচুতে। খড়ের চালা উঠেছে। চালের আড়ৎ। দেখতে দেখতে প্রসন্ন হাসির অস্ফুট রেখা উঁকি মারে কুমারের অধরকোণে। স্বাধীন ব্যবসার সুখ-স্বপ্ন দেখেন হয়তো জেগে জেগে। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ।

এক জন পাইক গিয়ে টপ ক'রে একটা প্রণাম সেরে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, —ছোটরাজা, ওদিকে যে রক্তারক্তি হচ্ছে দরবারের সম্মুখে।

কানে কলম তুললেন কাশীশঙ্কর। কপালে রেখা ফুটলো। বললেন,—রক্তপাত কেন?

—নেকড়ের সঙ্গে ল'ড়ছে জগমোহন বাগদী। রাজাবাহাদুর শাস্তি দিয়েছেন।

কান থেকে কলম নামিয়ে নিয়ে স্বল্প হাসলেন কাশীশঙ্কর। তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন,—ছোঃ। নেকড়ের সঙ্গে আবার লড়াই কি। বাঘ-সিংহ হ'লেও না হয় কথা ছিল। একটা নেকড়ে তো একটা কুকুরের সামিল!

পশু আর মানুষের যুদ্ধে পশু পরাস্ত হয় ওদিকে। দরবারের ঘাসমাটিতে প'ড়ে আছে নেকড়ে। তার বুকের ক'খানা পাঁজরা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গেছে। পায়ের তলায় তাকে চেপে ধ'রে উঠে দাঁড়িয়েছিল রক্তাক্ত জগমোহন। নেকড়ের দাঁত আর নখরের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত সে। পায়ের তলায় পিষে ধরায় পশুর হৃৎপিণ্ড ফেটে গেছে চৌচির হয়ে! মুখের দু'পাশের কষ বেয়ে রক্তপাত হয়েছে।

ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে। হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে উঠছে যেন জগমোহন। হাঁ হয়ে আছে মুখ। টসটসিয়ে ঘাম পড়ছে চিবুক থেকে। তবুও হাসছে জগমোহন, হননের নেশায়।

—রাজাবাহাদুর! কথা বললে জগমোহন। হাঁপাতে-হাঁপাতে ডাকলো। বললে,—একটিবার রাজমাতার দর্শন চাই, আপনি অনুমতি দিন।

—কেন? কি কারণ? কপালে রেখা ফুটিয়ে বললেন কাশীশঙ্কর।

—রাজকুমারী একটি আঙটি দিয়েছেন। জগমোহন কথা বলে আর হাঁপায়। বলে,—ব'লে দিয়েছেন এই আঙটি যেন রাজমাতার ছিচরণে প্রণাম দিই।

—প্রণাম না প্রমাণ জগমোহন ?

সহাস্যে বললেন কুমার কাশীশঙ্কর। তিনি কখন এসে উপস্থিত হয়েছেন খেয়াল হয়নি রাজাবাহাদুরের।

—যাই বলুন ছোটকুমার। রাজকুমারী যেমন ব'লে দিয়েছেন, আমিও সেই কথাই কইছি।

কথা বলতে বলতে জগমোহন নিজের ট্যাঁকে হাত দেয়। কোমরের ইদিক-সিদিক হাতড়ে বের করলো সরু লম্বা থলিয়া একটি।

জগমোহন বললে,—কুমারবাহাদুর, নেকড়েটাকে ঘায়েল করেছি আমি। একবার দেখেন চোখ ফিরিয়ে।

কাশীশঙ্কর অগ্রজের পদদ্বয় স্পর্শ করলেন। প্রণাম করলেন। বললেন,—দেখেছি জগমোহন। এখন কও আমাদের অনুজা বিন্ধ্যবাসিনী কেমন আছে ?

—ভালই আছেন তিনি। বেশ হাসিমুখেই আছেন। গড় মান্দারণে বসবাস করছেন।

—আর কে কে আছে তার কাছে ?

—একজন দাসী আছে। আর আছে একজন বন্দুকধারী প্রহরী।

—ব্যস ! আর কেহ নাই ?

—না হুজুর, আর তো কাকেও দেখি নাই।

কথায় কথায় কুমার যেন কেমন চিন্তাকুল হয়ে পড়লেন। বললেন,—রাজাবাহাদুর, তবে তো খুবই ভাল। আমিই যাবো মান্দারণে, বিন্ধ্য-বাসিনীকে উদ্ধার ক'রে আনবো। ঐ জগমোহন আমার সঙ্গে থাকবে।

—তথাস্তু। তথাস্তু।

রাজাবাহাদুর কথার শেষে পানপাত্র নিঃশেষ ক'রে ফেললেন এক চুমুকে। বললেন,—সঙ্গে আরও দু'-চার জন লেঠেলকে যদি লও তো ক্ষতি কি? সাবধানের মার নাই।

কালীশঙ্কর অল্প হাসির সঙ্গে বললেন,—একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব দোসর। কি বল জগমোহন?

—হুজুর, আপনার যেমন ইচ্ছা তাই করেন। কেমন যেন মনমরার মত কথা বলে লেঠেল।

—রাজকুমারীর আঙটি কৈ দেখি? হাত পাতলেন কালীশঙ্কর। সাগ্রহে, অদম্য কৌতূহলের সঙ্গে।

কুমারের হাতে পড়লো একটি স্বর্ণাঙ্গুরীয়। হীরা আর পান্না বসানো। আঙটি হাতে নিয়ে কালীশঙ্কর বলেন,—এই আঙটি রাজমাতার হাতের। অত্যন্ত সুলক্ষণযুক্ত। বিন্ধ্যর বিবাহের পরে রাজমাতা উপহার দিয়েছিলেন রাজকুমারীকে।

—হাঁ ঠিক তাই। রাজাবাহাদুরও সায় দিলেন ভাইয়ের কথায়।

কালীশঙ্কর বললেন,—এটি আমার কাছেই থাক। আমি দেবো রাজমাতাকে।

জগমোহন কাতর সুরে বললে,—একবার রাজমাতার দর্শন মিলবে না রাজাবাহাদুর? কত ব্যস্ত হয়ে রয়েছেন তিনি।

রাজা বললেন,—আজ এখনই নয়, পরে অন্য সময়ে এসো জগমোহন। সর্ব্বাগ্রে তুমি তোমার ক্ষতে মলম লাগাও। নেকড়ের নখে আর দাঁতে যে বিষ আছে!

—তাই হবে রাজাবাহাদুর। আপনি যেমন হুকুম করবেন তেমন হবে। আমি কিছু পাবো না রাজাবাহাদুর? সাতগাঁ আর গড় মান্দারণে গেছি আর এসেছি। নেকড়ের সঙ্গে লড়াই করেছি। কত রক্তপাত হয়েছে।

—গুপ্তচরবৃত্তি পরিহার করো তো দিই দু'-চার মোহর, রাজাবাহাদুর কথা বললেন। দরবারে উদ্যোগী হলেন।

—মা কালীর দিব্যি বলছি রাজাবাহাদুর, আর কখনও এমন গর্হিত কাজ হবে না।

কালীশঙ্কর ইতি-উতি দেখলেন। ডাকলেন,—দেওয়ানজী। দেওয়ানকে দেখি না কেন?

কাছাকাছি কোথায় ছিলেন দেওয়ানজী। সাড়া দিলেন না, রাজার সমুখে এসে দাঁড়ালেন।

রাজা বললেন,—পাঁচখান মোহর দেওয়া হোক জগমোহনকে। এক জোড়া ধুতি আর একখান পেতলের তৈজস।

—জয়, রাজা কালীশঙ্করের জয়! জয়ধ্বনি দেয় একা জগমোহন। কণ্ঠ সপ্তমে তুলে কথাগুলি বলে।

রাজাবাহাদুর সহোদরের উদ্দেশ্যে বললেন,—কুমারবাহাদুর, তুমিই যাও রাজমাতার নিকট। সকল বৃত্তান্ত তাঁকে জানাও। আমি আর দাঁড়াতে পারি না। নেশা লাগছে। পায়ে বল পাই না যেন আর।

অন্দরমহল যেন থম-থম করছে। কেউ কোথাও নেই যেন। কারও দেখা মেলে না। তিন রাণী, একজনেরও দেখা নেই। দাস-দাসী খানসামা, তারাও যেন কোথায় আত্মগোপন করেছে। শুনেছে কুমারবাহাদুর এসেছেন অন্দরে, তাঁর হাতে আছে দোনলা বন্দুক, টোটা-ভরা।

পাটরাণী উমারাণী এক কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন লাল অধরে স্নিগ্ধ হাসি মাখিয়ে। বললেন,—কুমারবাহাদুর।

মৃদু হেসে বললেন কালীশঙ্কর,—রাজমাতার কাছে চলেছি।

কথা শেষ করতে দেন না বড়রাণী। বলেন,—জগমোহন লেঠেলের কি পরিণাম হয়েছে, কুমারবাহাদুর?

—নেকড়ের সঙ্গে লড়াইয়ে তার জয় হয়েছে। নেকড়ে পঞ্চত্ব পেয়েছে। কথায় যেন কাতরতা ফুটলো কুমারের। বললেন,—বড়ই তৃষ্ণার্ত হয়েছি বড়রাণী। এক পাত্র শীতল জল খাওয়াতে পারো?

—অপেক্ষা করুন কুমার, আমিই পানীয় জল দিই আপনাকে। কথার শেষে পুনরায় কক্ষে প্রবেশ করলেন উমারাণী। চকিতের মধ্যে ফিরে এলেন স্বর্ণপাত্র হাতে। জলের সুগন্ধ ছড়ালো যেন। কেয়া ফুলের গন্ধ।

আকণ্ঠ পান করলেন কাশীশঙ্কর। পাত্র নিঃশেষিত ক'রে বললেন —আমাদের মহামান্যা পাটরাণীও এয়ো থাকুন জন্মজন্মান্তরে।

—না কুমারবাহাদুর, প্রর্থনা করো যেন মরতে পারি শীঘ্রি শীঘ্রি।

—কেন গো বড়রাণী? মরণে স্পৃহা কেন এই অকালে?

—নারীর মৃত্যুই মঙ্গলের, বেঁচে থাকায় অনেক যন্ত্রণা।

কুমারবাহাদুর লক্ষ্য করলেন, কথা বলতে বলতে উমারাণীর মুখবিম্বে যেন দুঃখের ছায়া ফুটলো। হতাশ দৃষ্টি ফুটলো চোখে। লাল অধর যেন কেঁপে-কেঁপে উঠছে। এত সুখ আর এত ঐশ্বর্য্য, তবুও কেন যে কষ্টের সুর রাণীর কথায়, বুঝলেন না ছোটকুমার।

কাশীশঙ্কর বললেন,—যাবে কোথায় এখনই, কুমার শিবশঙ্করকে মানুষ করবে না? দেখো, তোমার রাজপুত্তর খুবই বুদ্ধিমান হবে, আমি তাকে দেখে দেখে বুঝেছি।

—আশীর্ব্বাদ করুন কুমারবাহাদুর। আমার একমাত্র সন্তান সে। যেন মানুষের মত মানুষ হয়। কথার শেষে খানিক থেমে আবার বললেন বড়রাণী —রাজমাতার কাছে কেন এমন অসময়ে? ডাক পড়েছে?

—না গো বড়রাণী। কাশীশঙ্কর বললেন। হাতের মুঠো খুলে ধরলেন। বললেন,—এই দেখ রাজকুমারীর হাতের অঙ্গুরীয়।

—কোথায় মিললো? কে দিলো? এ তো দেখি তার হাতের আঙটি।

উমারাণী কথায় কথায় বিস্ময় প্রকাশ করলেন। খুঁটিয়ে দেখলেন হারা পান্নার আঙটি। কুমারের শুভ্র লাল হাতের তালুতে জ্বল জ্বল করছে যেন।

—লেঠেল জগমোহন গিয়েছিল মান্দারণে। সেই এনেছে এই স্মারক-চিহ্ন। রাজমাতাকে দিতে হবে।

—আমাদের ননদিনীর শরীরগতিক ভালো? সুখে আছেন তো রাজ-

কন্যা? উমারাণীর কণ্ঠে যেন ব্যগ্র আগ্রহ ফুটলো। জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তাঁর চোখে।

—আছে, ভালই আছে বিন্ধ্যবাসিনী। তবে নির্ব্বাসনভোগে কে আর সুখ পায়। মান্দারণ দেশও তেমন সুখপ্রদ নয়, বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ।

—আর কতকাল থাকতে হবে মান্দারণে? কবে যে মুক্তি পাবেন রাজ-কুমারী? আহা তার নরম শরীর। দুঃখকষ্ট কাকে বলে কখনও জানতো না।

—আর বেশীদিন কষ্ট ভোগ করতে হবে না বড়রাণী।

—তবে কি জমিদার কৃষ্ণরাম মত বদল ক'রেছেন? বিন্ধ্যর প্রতি দয়া হয়েছে তাঁর? ভগবান তাঁকে সুমতি দিন।

ব্যঙ্গমিশ্রিত হাসি হাসলেন কাশীশঙ্কর। বললেন,—কৃষ্ণরাম মত পরিবর্ত্তন করবে, তেমন মানুষই সে নয়। বৃশ্চিকের কামড়, মেঘ না ডাকলে ছাড়ান-ছোড়ন নেই।

—তবে কে মুক্তি দেবে রাজকন্যাকে? কষ্টভোগ কে ঘুচাবে?

নিজের বক্ষে হাত রাখলেন কুমারবাহাদুর। সদম্ভে বললেন,—এমন ভাই থাকতে রাজকুমারীর ভাবনা কি? আমি যাবো মান্দারণে। চুপ চুপ, কেউ যেন না জানতে পারে। কাকে-বকেও নয়। আমি বিন্ধ্যকে উদ্ধার করবো। তাকে বাঁচাবো ঐ স্বেচ্ছাচারীর কবল থেকে।

আশার আলো দেখতে পেয়েছেন যেন উমারাণী। খুশীর মৃদু হাসি ফুটলো তাঁর রাঙা ঠোঁটের কোণে। টানা টানা চোখ দু'টিও যেন হেসে উঠলো বারেক। স্বস্তির শ্বাস ফেললেন।

—ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন কুমারবাহাদুর। কথা বলতে বলতে সভয়ে স'রে গেলেন। বড়রাণী কক্ষে প্রবেশ করলেন। বললেন—ছোটকুমার, ঐ দেখুন রাজমাতা, এই দিকেই হয়তো আসছেন।

লম্বা দালানের অপর প্রান্তে বিলাসবাসিনীর আবির্ভাব হয়। অসংলগ্ন পদক্ষেপে তিনি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছেন। তাঁর মুখাকৃতিতে যেন

শ্রাবণের মেঘ নেমেছে, এমনই গম্ভীর। দালান কাঁপিয়ে তিনি ডাকলেন উচ্চ কণ্ঠে,—কাশীশঙ্কর!

—কি আদেশ রাজমাতা?

—জগমোহনকে হত্যা করলে না কি?

হেসে ফেললেন কুমারবাহাদুর। জননীর পদধূলি মাথায় ছুঁইয়ে বললেন, —জগমোহনকে হত্যা করতে কি আমাকে প্রয়োজন হয় রাজমাতা?

বিলাসবাসিনী বললেন,—বাঘের মুখে লেলিয়ে দিতে হয়?

আবার হাসলেন কুমার। হো-হো শব্দে হাসলেন হেসে হেসে বললেন, —বাঘ তো নয় নেকড়ে, যা একটা কুকুরের সামিল। রাজাবাহাদুর তাকে এ শাস্তি দিয়েছেন গুপ্তচরবৃত্তির অপরাধে।

—এই শাস্তি তো আমারই পাওনা। গরীব বেচারী আর অহেতুক মরে কেন?

—জগমোহনের জয় হয়েছে রাজমাতা। নেকড়েটাকে পরাস্ত করেছে, পিষে মেরে ফেলেছে। জগমোহন আহত হয়েছে নামমাত্র, যৎসামান্য।

—তোমাদের রাজাবাহাদুর দিন-দিন যেন নৃশংস হয়ে উঠছেন! এমন শাস্তি কি মানুষে দেয়? আমার বিন্ধ্যবাসিনী কেমন আছে, জানো কি তুমি? লেঠেলের সঙ্গে রাজকুমরীর সাক্ষাৎ হয়েছে?

—এই লন রাজমাতা। দেখেন চিনতে পারেন কি না এ কার অঙ্গুরীয়।

—এ যে আমার বিন্ধ্যবাসিনীর।

—লেঠেল এনেছে সাতগাঁ থেকে। রাজকুমারী পাঠিয়েছেন আপনার তরে।

আঙটি হাতে নিয়ে মুঠোয় ধ'রে বুকে চাপলেন বিলাসবাসিনী। চু খেলেন ওষ্ঠে ছুঁইয়ে। বিশাল আঁখিদ্বয়ে অশ্রুর চিকণ খেললো যেন। বহুক্ষ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলেন, রাজকন্যার ব্যবহারের আঙটি। এখনও যে বিন্ধ্যবাসিনীর স্পর্শ মাখানো রয়েছে।

—আমাকে সাতগাঁয়ে পাঠিয়ে দাও কুমারবাহাদুর। মেয়েকে একবা

দেখে আসি আমি। কাঁপা-কাঁপা স্বরে কথা বললেন রাজমাতা। আকুল প্রার্থনার স্বরে যেন বললেন।

—আপনি কেন যাবেন কুটুমের দেশে? অপ্রত্যাশিত যাওয়ায় যদি সম্মানের হানি করে কেষ্টরাম, তখন?

—মেয়ে দিয়েচি যখন, তখন আর মান-অপমানের কথা ওঠে না। আমাকে তোমরা পাঠিয়ে দাও। সঙ্গে ঐ জগমোহন লেঠেল যাবে'খন।

—না না, তা হয় না। আমি তো যাবোই। আমি যদি যাই তো আপনার আর চিন্তার কি আছে!

হঠাৎ প্রসন্ন হাসি হাসলেন রাজমাতা। বললেন,—ছোটকুমার, তুমি যাবে? সত্য না মিথ্যা? না স্তোকবাক্য?

—আমি মিথ্যা বলি না রাজমাতা।

—তা আমি জানি, আমার অজানা নেই। কিন্তু, তুমি কেন যাবে?

—বিন্ধ্যকে সঙ্গে লয়ে আসবো। তোমার আদরের মেয়ে আসবে, তোমার কাছে থাকবে। জলাঞ্জলিতে যাক তার শ্বশুরালয় বাস!

—কোন উপায়ে কুমারবাহাদুর? রাজকন্যার সন্ধান পাবে কোথায়?

—আর কোন প্রশ্ন নয় রাজমাতা। আর যেন ব্যস্ত না হও। আমি যখন কথা দিয়েছি, তখন রক্ষা করবো আমার মুখের কথা।

—শতায়ু হও তুমি। এসো আশীর্ব্বাদ করি। তোমাদের রাজা তো গ্রাহ্য করলেন না, তুমি যদি এখন শান্তি দিতে পারো আমাকে।

—রাজাকে দুষবে না অযথা। তাঁর দোষ কি? রাজার মত মানুষ দেখা যায় না সচরাচর। তিনি শান্তিকামী, কারও সাতেও নেই পাঁচেও নেই।

—আমার পেটে-ধরা মেয়েকে তবে আমি ফিরে পাবো ছোটকুমার?

—হ্যাঁ নিশ্চয়ই পাবে। আকাশের ধ্রুবতারার মত এ কথা সত্য জানবে।

—তবে আমি নিশ্চিন্ত। আর আমার কিছু বলার নেই। কথার শেষে বিলাসবাসিনী পিছন ফিরলেন। যে পথে এসে ছিলেন সেই পথে চললেন।

মা আর ছেলে চললেন দুই বিপরীত পথে। কক্ষমধ্যে নীরবে থেকে উমারাণী শুনেছেন আদ্যোপান্ত।

কাশীশঙ্কর সটাঙ অন্দরমহলে চলে গেলেন। অন্দরের ঘরে ঘরে কাকে যেন ডেকে ডেকে খুঁজতে থাকেন ব্যস্ত হয়ে। এ-ঘরে সে-ঘরে কত খোঁজাখুঁজি করেন, কিন্তু কৈ দেখা মেলে না কেন! ভাঁড়ারের ঘর থেকে পাকশালার দিকে এগিয়ে চললেন। দেখলেন কয়েকটা আগুনের চুল্লী, জ্বলছে দাউ-দাউ। উনানের ধারে কেউ নেই। রন্ধনাগার থেকে শাকসব্জীর ঘরে উঁকি দিলেন একবার। আশাহত হয়ে ফিরে চললেন ভাঁড়ারের তল্লাটে। আঁশরান্নার ঘর দেখতে বাকী থাকে কেন! দেখলেন বঁটির সারি। মাছের চুবড়ী। মেছুনীরা আগেই ভয়ে স'রে গেছে আড়ালে, কুমারের পদশব্দ শুনে। ঘি আর তেলের কুঠরীর পাল্লা সরিয়ে দেখলেন। মিষ্টির ঘরের দুয়োরে ক্ষণেক দাঁড়ালেন। ক্ষীর আর ছোট এলাচের খোসবয় বইছে যেন ঘরে। ফলের ঘরেও দেখলেন, কিন্তু কোথাও কারও সাক্ষাৎ নেই। আম, আনারস, নারাঙ্গী আর কদলীর সুগন্ধ আসে যেন নাসিকায়।

—রাতরাণী, কোথায় গো? ব্যগ্র কণ্ঠে আবার ডাকলেন কাশীশঙ্কর। প্রশস্ত দরদালানে তাঁর কথার প্রতিধ্বনি ভাসলো। কাশীশঙ্করের নিজের কণ্ঠ যেন ব্যঙ্গ করলো তাঁকে। বিরক্তির রেখা ফুটলো কপালে।

—এই যে আমি, কোথায় আপনি খোঁজেন!

অন্দরের এক সিঁড়িতে সহসা দেখা পাওয়া যায়। স্বর্গ থেকে যেন নেমে আসে অপ্সরীকন্যা! কথা বলে মিষ্টি সুরে।

—রাতরাণী! এত ডাকাডাকিতেও সাড়া নাই কেন? শোন নাই?

—হুঁ।।

মাথা দোলাতেই বধূরাণীর কানের ঝুমকো আর নাকের নোলক দুলতে থাকলো। তাম্বুল-লাল ওষ্ঠের 'পরে নোলকের মুক্তা নেচে নেচে উঠছে যেন।

তসরের লাল পাড় শাড়ী প'রেছেন কি এক পবিত্র কাজে। বললেন,—পূজাঘরে ছিলাম। দিনের আহার মিটবে কখন? সূর্য্য যে মাথায় উঠেছে।

—এখনই মিটাবো। মাথায় দু'দশ কলসী জল ঢালি আগে।

রাতরাণী বললেন অস্ফুট কণ্ঠে,—জগমোহন লেঠেল ম'ল শেষে বাঘের কবলে?

মুখে যেন বিরক্তি ফুটলো। কাশীশঙ্কর বললেন,—না মরে নাই, জগমোহনের জিত হয়েছে। নেকড়েটা শেষ হয়েছে।

—ননদিনী কেমন আছে? বিন্ধ্যাবাসিনী? কিছু বা নিশ্চিন্ত হয়ে কথা বললেন বধূরাণী। প্রশ্ন করলেন ব্যাকুল কণ্ঠে।

কাশীশঙ্কর বললেন,—শারীরিক ভালই আছে বিন্ধ্য। রাজমাতাকে আঙটি পাঠিয়েছে হাতের। মান্দারণেই আছে। রাতরাণী. আমি শীঘ্র মান্দারণ যাত্রা করছি। বিন্ধ্যকে করতে চলেছি।

শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন বধূরাণী। ভয়ে যেন কাঠ হয়ে যান। ঢলো-ঢলো মুখে যেন অভিমান ফুটলো।

কাশীশঙ্কর আবার বললেন,—কারও কাছে বিষয়টা এখন ফাঁস ক'র না। মান্দারণে আমার সহযাত্রী হবে ঐ জগমোহন লেঠেল। আর দু'চার জন লেঠেলকে সঙ্গে লবো।

রাতরাণী নিরুত্তর। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন। অভিমানে যেন মূক তিনি। শেষ পর্য্যন্ত থাকতে পারলেন না যেন। কথা ফুটলো মুখে। বললেন, একটা বিপদ-আপদ যদি ঘটে, তখন আমার কি উপায় হবে?

—বনমালাকে কে দেখবে! সে কচি মেয়ে। আমি না হয় পরনের কাপড়ে আগুন ধরিয়ে—

কুমারবাহাদুর তাঁর সহধর্ম্মিণীর মুখে হাত চাপলেন। কথা শেষ করতে দিলেন না। বললেন,—বিপদ-আপদে জয়ের মন্ত্র জানি আমি। শত্রুকে পরাস্ত করবো ঠিক। আমাদের সোহাগী রাজকুমারীকে ফিরায়ে আনবো।

—অধীর হও কেন এত!

কাশীশঙ্কর অর্দ্ধাঙ্গিনীকে দুই বাহুতে জড়িয়ে ধরলেন। বুকের কাছে টেনে নিলেন। বললেন, রাতরাণী, তুমি তোমার নারায়ণের কাছে প্রার্থনা জানাবে। বিনা বাধায় কার্য্য উদ্ধার করবো আমি। সহোদরা বিন্ধ্যবাসিনী বনজঙ্গলের দেশে বাঘের পেটে যাবে, তুমি তাই চাও? সর্প দংশনেই যদি মারা যায়, কে বলতে পারে!

—ছেড়ে দিন, কারও যদি চোখে পড়ে!

নিজেকে মুক্ত করতে সচেষ্ট হন বধূরাণী, ছোটকুমারের কঠোর বাহুপাশ থেকে।

কুমার বললেন,—মুখে হাসি না ফুটালে ছাড়বো না। হাসি দেখাও আগে।

—হাসি আসে না কুমারাহাদুর! আপনি বৃথা সময় নষ্ট করেন কেন? যান স্নান সেরে আসেন। আহার প্রস্তুত।

—হাসি না দেখে ছাড়বো না জেনো। এত ভয় কেন তোমার?

কাশীশঙ্কর যেন কেমন দৃঢ়কণ্ঠে বললেন। বাহুবন্ধন আরও কঠোর করলেন।

কৃত্রিম হাসি হাসলেন বধূরাণী। হঠাৎ হাস্যরেখা, বিদ্যুতের মত দেখা দিয়ে তৎক্ষণাৎ মিলিয়ে গেল। বললেন,—হিন্দুর ঘরের কুলবধূর মুখে হাসি শোভা পায় না। ঐ দেখেন, বনমালা আসে। যেতে দিন আমাকে।

—কোথায় যাবে?

—আপনার আহার্য্য সাজাতে যাবো। বেলা আর নাই যে। আকাশের পরীর মত যেন উড়তে উড়তে আসে বনমালা। ডানার মত অগোছালো শাড়ীর আঁচলা উড়ছে পেছনে। মুখ তার পাংশু। কাজলপরা চোখে যেন ভয়ের আভাস। ছুটতে ছুটতে আসে।

—বাবামশাই, বাবামশাই।

কিশোরীকণ্ঠ সুর ছড়ায় দালানে। জলতরঙ্গের সুর তোলে যেন।

মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খানিক দূরে সরে গেলেন বধূরাণী। বক্ষবাস ঠিকঠাক করতে করতে দালানের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

কন্যাকে কাছে টানলেন কাশীশঙ্কর। তার ছোট্ট কপালে ওষ্ঠ ছুঁইয়ে চুমা খেলেন। বললেন,—বনবালা, তুমিও ভীতা না কি? কোথায় ছিলে শুনি?

পিতার কটিদেশ দুই হাতে জড়িয়ে ধরে মেয়ে। কুমারের লোমস বক্ষে মুখ লুকোয়।

—দাসীর কাছে। জল-কুঠরীতে লুকিয়ে রেখেছিল দাসী।

অট্টহাসি শুরু করলেন কুমারবাহাদুর। মেয়ের কথায় ভীতির আধিক্য শুনে হাসতে থাকলেন অন্দর কাঁপিয়ে।

—আমাদের রাজামশাই কেমন আছে? ভাই শিবশঙ্কর?

—বহাল তবিয়তেই আছে। তোমার চিন্তার কোন কারণ নাই।

হাসতে হাসতে কথা বলেন কাশীশঙ্কর। বনবালার হাত ধরে এগিয়ে চলেন। বলেন,—বন, তোমার মাজননীর কাছে থাকো। যাই স্নান সেরে আসি।

হাসতে হাসতে চললেন কুমারবাহাদুর। সদরের পথে চললেন। দালানের শেষ প্রান্তে গিয়ে বললেন,—রাতরাণী, ভাত বাড়ো তুমি। আমি শীঘ্র আসছি।

হাসির কথা নয়, রাজাবাহাদুর কালীশঙ্কর একদা সত্যিই যুদ্ধ করেছেন। জ্যান্ত বাঘের সঙ্গে লড়াই করেছেন। তরোয়াল চালিয়ে কত সিংহকে হত্যা করেছেন। তাই না নবাব সরকার খেতাব দিয়েছে তাঁকে। রাজা ছিলেন শুধু, বাহাদুর উপাধি দিয়েছেন দিল্লীর বাদশা। সুবে বাঙ্গালায় শ্রেষ্ঠ শিকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন কালীশঙ্কর! এখন আর হাত চলে না। তরোয়াল ধরতে পারেন, কিন্তু চালাতে পারেন না।

জগমোহনের জয় হয়েছে, সেজন্য রাজা অখুশ হননা একতিলও। বরং খুশী হয়েছেন জগমোহনের বীরত্বে! এতো ঐ লেঠেলের জয় নয়, তার দেহবলের জয়। সুতানুটির দুলে আর বাগদীদের পরাক্রম খুব। সম্মুখ যুদ্ধে তারা অদ্বিতীয়। অস্ত্র চালনাতেও সে অত্যন্ত দক্ষ—দরবারে অলিন্দ থেকে স্বচক্ষে দেখেছেন রাজাবাহাদুর। দেখে বিস্মিত হয়েছেন খুব।

নেকড়ে আর মানুষের লড়াই দেখতে দেখতে আজ কত পুরানো স্মৃতি জেগে উঠছে রাজার মনে, কৈশোর আর যৌবনের। দুই বাহুতে চিহ্ন আঁকা আছে। দুই জানুতেও দাগ আছে এখনও। বাহুতে প্রতিপক্ষের তরবারি আঘাতের চিহ্ন। জানুতে আছে সিংহের নখরের।

আজ দরবার ভেঙে দিয়েছেন রাজাবাহাদুর। মানুষের জয় হওয়ায় কেমন যেন উৎফুল্ল তিনি। জগমোহন বাগদীর জয় হয়েছে, তাই পানের মাত্রাও যেন বেড়েছে। দরবার থেকে মনুষ্যবাহী সুখাসনে ফিরতে ফিরতে পান থামলো না। জরির কামদার তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় ব'সে পানপাত্রে চুমুক দিতে দিতে ফিরলেন কালীশঙ্কর। রাজমহলের প্রধান দ্বারের সামনে সুখাসন নামাতে হুকুম দিলেন। দেহরক্ষীদের বললেন,—ডুলি অনায়ন করা হোক। পায়ে হেঁটে চলা সম্ভব নয়।

অন্দরমহলে সুখাসনের প্রবেশ নেই। তেমন প্রশস্ত নয় অন্দরের পথ। চেলা আর দাসেরা জরিজড়ানো ডুলি এনে হাজির ক'রলো। ডুলিতে মোটা গদী, লাল আবরণে ঢাকা। রাজাবাহাদুর সুখাসন থেকে ঐ ডুলিতে আশ্রয় নেন। দেহরক্ষীদের বললেন,—রাণীমহলে যাবে, বাহকদের বুঝায়ে বল।

মেজরাণীর মহলে ডুলি নামিয়ে রেখে বাহকরা ছুটি পায়। দেহরক্ষীরা ফিরেন পায়। অন্দর থেকে বেরিয়ে যায় তারা।

—সর্ব্বমঙ্গলা আছো না কি মহলে ?

রাজাবাহাদুরের কণ্ঠস্বর, আশাতীত আনন্দে সাড়া দিলেন মেজরাণী। মুখে পান আর তাম্বুল। স্মৃতি-জর্দ্দার সুগন্ধ ভাসিয়ে সর্ব্বমঙ্গলা আসেন। একটি হাত প্রসারিত করেন। কালীশঙ্করের হাত ধরেন। সহাস্যে বলেন,—রাজাবাহাদুর, চলুন পালঙে বসবেন।

—তাই চল, মেজরাণী। কালীশঙ্কর ধীরে ধীরে চলতে চলতে বললেন,—আসবের পাত্র আনতে কও। অন্ত এক সুখ-আনন্দের দিন। জগমোহন বাগদী একটা নেকড়েকে ঘায়েল করেছে। বিন্ধ্যবাসিনীর শুভসংবাদ এনেছে সে। আমার সহোদর কাশীশঙ্কর রাজকুমারীকে উদ্ধার করবে, সম্ভত

হয়েছে। তাই বড় আনন্দের দিন আমার। ঘরবার ছেড়ে চলে আসছি তোমার কাছে।

মেজরাণীর মেঘ-গম্ভীর মুখেও যেন হাসি ফুটলো। পান চিবাতে চিবাতে অল্প অল্প হাসলেন যেন। রাজাবাহাদুরকে রেশমের চাদর বিছানো পালঙে বসালেন। উপাধান এগিয়ে দিলেন।

কালীশঙ্কর বললেন,—সর্ব্বজয়া কোথায়? তারেও একবার ডাকাও, আসুক। তোমরা দুই বোনেই এসো আমার কাছে।

—ছোটরাণীকে ডাকি। পানপাত্র আনাই। আপনি শান্ত হোন।

কথা বলতে বলতে সর্ব্বমঙ্গলা উর্দ্ধে চোখ তুললেন। দেখলেন, টানা-পাখা, সচল হয়ে উঠেছে। দ্রুত গতিতে দুলছে। হাওয়া খেলছে রাণীর ঘরে। ফুলদানির ফুল হাওয়ার বেগে কেঁপে কেঁপে উঠছে। পালঙের রেশমী চাদরের মণিমুক্তার ঝালর দু'লে দু'লে ওঠে। ফুলদানে যুঁয়ের স্তবক আর মতিবেলের তোড়া—স্নিগ্ধ সুগন্ধ ভাসলো কক্ষময়।

সর্ব্বজয়া ছোটরাণীর হাতের চুড়ির রিনিঝিনি শোনা যায় যেন। ধীর স্থির ছোটরাণী, মন্থরগামিনী। নীরব চরণে আসেন তিনি। রাজাবাহাদুর তখন কক্ষের দেওয়াল-গাত্রে তাকিয়ে আছেন। দেওয়ালে তসবিরের ছড়াছড়ি যেন। হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত ফলকে অঙ্কিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপূর্ব্ব চিত্রগুলি। কোন মুসলমান শিল্পীর আঁকা, দিল্লীর বাদশা আর বেগমদের রঙদার ছবি। ছবিতে সোনার আখরে লেখা ফার্সী নাম। যার যার ছবি তার তার নাম।

সর্ব্বজয়া রাজাকে ভাবাবিষ্ট দেখে হাসি গোপন করলেন। কৌতুকের স্বরে বললেন,—বেগমদের কোনটিকে আপনার মনে ধরে রাজাবাহাদুর?

বাছা বাছা সুন্দরীদের আলেখ্য। ডানাকাটা পরী একেকজন।

হঠাৎ কথা শুনে যেন বারেক চমকে উঠলেন কালীশঙ্কর। অতর্কিতে যেন চুরি ধরা পড়েছে। অল্প হেসে রাজাবাহাদুর বললেন,—যেটি জীবন্ত সেটিকে, অন্ত কাকেও নয়। রাণীজাতির মধ্যে যিনি উত্তমা সেই তাকে।

—কে সে? কি নাম তার?

অদম্য কৌতূহলের সঙ্গে বললেন সর্ব্বজয়া। দাঁতে ঠোঁট কামড়ালেন কথার শেষে। রাজার অদূরে পালঙের পরে বসলেন ধীরে ধীরে।

—তার নাম সর্ব্বজয়া দেব্যা। রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী সে।

উপাধানে দেহের ভর রাখলেন রাজাবাহাদুর। মৃদু মৃদু হাসির সঙ্গে কথা বললেন। দেওয়াল গাত্র থেকে চোখ ফেরালেন।

—পরিহাস নয় তো ?

—আদপেই নয়। খাঁটি সত্য বচন। অন্তরের কথা।

সর্ব্বজয়া যেন গর্ব্ব বোধ করলেন ক্ষণেক। করাঙ্গুলিতে জলডুরে শাড়ীর আঁচল জড়াতে থাকলেন নত মুখে। মিহি কণ্ঠে বললেন,—তবে রাজাবাহাদুর, শুনেছি আপনি দু'টি ইরাণীকে ভালবেসে ফেলেছেন না কি খুব।

উপহাসের হাসি হাসলেন রাজা। নড়ে চড়ে বসলেন স্থির হয়ে। হেসে হেসে বললেন,—মোসায়েবদের বিলায়ে দিয়েছি দু'টাকেই। রাজমাতার আদেশে প্রায়শ্চিত্ত করায়েছি।

চেরা পটলের মত আঁখিযুগলে কটাক্ষ ফুটলো যেন। ছোটরাণী আবার চোখ নামিয়ে বললেন,—ভাল না মন্দ ?

—ভাল মন্দের বার। শরীর গঠনে তাকত আছে বেশ। মেদভারী আকৃতি। গোঁফের প্রান্তে পাক দিতে দিতে কথা বলেন রাজাবাহাদুর।

মোরাদাবাদের মীনার কাজ রূপার পানপাত্রে। মেজরাণীর হাতে ঝলমলিয়ে ওঠে। পানপাত্র আর পিয়ালা, এক থালিকায়। পালঙের তেপায়ায় বসিয়ে দিলেন সশব্দে।

—মেজরাণী, পেয়ালায় শরাব ঢালো। দারুণ গ্রীষ্মে কণ্ঠ যেন শুকায়ে যায়।

কথা বলতে বলতে রাজাবাহাদুর ছোটরাণীর হাত ধরলেন। সর্ব্বজয়ার একখানি হাত নিজের হাতে ধ'রে রাখলেন। ছোটরাণী তাঁর কোমল হাতে যেন ঈষৎ পীড়ন অনুভব করলেন।

স্বেচ্ছায় পেয়ালা পূর্ণ করলেন সর্ব্বমঙ্গলা। তুলে ধরে বললেন,—রাজাবাহাদুর, পাত্র ধারণ করুন।

—জয়া, তুমিও থাকো, যেও না কোথাও।

কথা বলতে বলতে কালীশঙ্কর পাত্র ধরলেন সাবধানে। চোখের তাকানিতে যেন মিনতি জানালেন মেজরাণীকে।

সর্ব্বজয়া পানের ডিবা থেকে কয়েকটি খিলি তুলে মুখে দিলেন। ছোট ছোট খিলি মিঠাপানের। সোনার তাম্বুলকরঙ্ক, বন্ধ ক'রে স্ফূর্তির কৌটা খুললেন। বললেন,—খাওয়া দাওয়া চুকবে কখন?

—আরও খানিক যাক।

কথার শেষে মীনা কাজের রঙীন পাত্র তুললেন মুখে। কণ্ঠ সিক্ত করলেন। পাত্র নামিয়ে রেখে সর্ব্বজয়ার একটি হাত আবার ধরলেন নিজের হাতে। খেলার সামগ্রী যেন, শিশুর খেলার মত হাতখানি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে থাকলেন।

সর্ব্বমঙ্গলা পান চিবাতে চিবাতে বললে,—মেওয়ার রেকাবী আনাই রাজাবাহাদুর? দু'চারটা মুখে দেবেন?

—কিছু চাই না, কিছু চাই না। ব্যস্ত হও কেন?

মেজরাণী কথার মাঝে পিকদানি তুললেন। নিজের পানলাল অধর বাঁকিয়ে দেখলেন লালিমার ঘোর।

—সর্ব্বমঙ্গলা, এসো। পাশে এসে আসন লও।

মুখ থেকে পাত্র নামিয়ে কথা বললেন কালীশঙ্কর। অর্দ্ধশায়িত তিনি, সর্ব্বজয়ার নধর নরম দেহে হেলান দিয়েছেন। ছোটরাণীর অনিন্দ্য মুখশ্রী, থেকে থেকে লজ্জায় রাঙা হতে থাকে।

হঠাৎ খেয়াল হয় কালীশঙ্করের তাঁর উষ্ণীষবিহীন মাথায় যেন শীতল জলের ধারা পড়ছে। সর্ব্বমঙ্গলা গোলাপপাশ থেকে গোলাপজল ঢালছেন। গোলাপের উগ্র সুগন্ধ মিশলো বেল আর যুঁইয়ের সুগন্ধে।

—বাঁচালে মেজরাণী। দুই চোখ নিমীলিত, কথা বললেন রাজাবাহাদুর। বললেন,—এই প্রখর গ্রীষ্মে মানুষ বুঝি আর বাঁচে না। কাল-বৈশাখীরও দেখা নাই।

—ঈশানে মেঘ জমেছে আজ। বললেন সর্ব্বমঙ্গলা, ঘরের ঝিলিমিলি থেকে আকাশ দেখতে দেখতে। বললেন,—কাকে কুটো তুলছে।

—তবে আজ ঝড়ের সম্ভাবনা আছে।

রাজাবাহাদুরের এক হাতে পানপাত্র। অন্য হাতে ছোটরাণীর সুন্দর চিবুক ছুঁয়ে আছেন।

রাজাবাহাদুরের দুই পাশে দুই রাণী। অপ্সরী আর কিন্নরী যেন। দু'জনের অধর তাম্বুল লাল। দুই বোনে মধ্যে মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করেন পরস্পরে। সর্ব্বমঙ্গলা ইশারায় কি যেন বলছেন রাজার অলক্ষ্যে। সর্ব্বজয়ার মুখে মিনতি যেন। কি যেন নিষেধ করছেন তিনি। মেজরাণীর কি এক প্রস্তাবে গররাজী যেন ছোটরাণী। কক্ষ ত্যাগ করে উঠে চলে যেতে চাইছেন সর্ব্বমঙ্গলা। ছোটরাণীর ইশারায় কাতর অনুনয়, তিনি যেতে দিতে চান না অগ্রজাকে। সর্ব্বমঙ্গলা কক্ষ ত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করছেন। সর্ব্বজয়া থাকেন আর তিনি যান, এই তাঁর ইচ্ছা। কিন্তু লজ্জাবতী ছোটরাণী, লজ্জার যেন রাঙা হয়ে উঠেছেন। দৃষ্টিবাণ হানছেন যেন থেকে থেকে। রাজাকে লুকিয়ে নীরব তিরস্কার করছেন।

কালীশঙ্কর বললেন,—মেজরাণী, তোমার কি অন্য কাজ আছে এ সময়ে? তুমি কি অন্যত্র যেতে চাও কোন জরুরী কর্ম্মে?

—না রাজাবাহাদুর। অফুরন্ত অবসর আমাদের। মৃদু মৃদু হাসির সঙ্গে কথা বলেন সর্ব্বমঙ্গলা। বললেন,—তবে বড়রাণী একা যদি সব রান্নার কাজ করেন, চোখে দেখতে পারা যায় না। বড়রাণী খাটাখাটি করবেন আর আমরা কিনা খাটে বসে থাকবো পায়ের ওপর পা তুলে। তাই ভাবছি আমিও যাই পাকশালে, ছোট থাকুক আপনার কাছে।

লজ্জারুণ মুখ তুললেন সর্ব্বজয়া। ঘোর আপত্তির সুরে বললেন,—না। আমিও থাকি, তুমিও থাকো। বড়রাণীর গতর আছে, তিনি ঠিক সামলে নেবেন।

এক চুমুকে পাত্র শেষ ক'রে বিকৃতমুখে কালীশঙ্কর বলেন,—মেজরাণী মন্দ

কথা বলে নাই। সেই বা একা সকল কর্ম্ম করবে কেন? সর্ব্বমঙ্গলা যদি যেতে চায় যাক না। উমারাণীও প্রসন্ন হবে। তার কাজেরও লাঘব হবে কিছু।

মেজরাণীর জয় হয়। হাসি গোপন করলেন তিনি। বললেন,—ঠিকই বলেছেন রাজাবাহাদুর। আমিও পাকশালে যাই।

কথা বলতে বলতে সর্ব্বমঙ্গলা পালঙ থেকে নামলেন ধীরে ধীরে। কনিষ্ঠাকে তর্জ্জনী দেখিয়ে ফিসফিসিয়ে বললেন,—ঠিক হয়েছে। কেমন জব্দ?

মুখে যেন কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য ফুটলো সর্ব্বজয়ার। লজ্জারক্ত মুখ নত করলেন। ক্রোধের বহ্নি যেন তাঁর চোখে। অপ্রস্তুততা ভাবে ভঙ্গীতে।

কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পূর্ব্ব মুহূর্তে মেজরাণী দ্বার আর বাতায়নের পর্দ্দাগুলি ঠিকঠাক করে দিয়ে গেলেন। চাপাহাসি হাসতে হাসতে চলে গেলেন তিনি ঘর ছেড়ে।

রাজাবাহাদুর কাছে টানলেন সর্ব্বজয়াকে। তাঁর সূক্ষ্ম চিবুক তুলে ধরলেন। রাণীর চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে থাকলেন অপলক। কম্পমান চাউনি ছোটরাণীর দীর্ঘ চোখে। লজ্জানম্র চোখ পুনরায় নত করলেন। রাজা বললেন,—ভয় কি!

মিষ্টকণ্ঠ ছোটরাণীর। বললেন,—ভয় নয় লজ্জা! দিনদুপুর এখন।

—তা হোক। কালীশঙ্কর বললেন,—তুমি থাকো আমার কাছে। তোমাকে দেখে দেখে আমার চক্ষু জুড়াক। তুমি যে চিত্রাণী।

সুন্দরী, দৃঢ়চিত্তা, সদাসত্যভাষিণী, গুরুজন ও দেবদ্বিজে ভক্তিমতী, সতত প্রিয়ভাষিণী, নিষ্পাপ, দয়া, ক্ষমা ও ধর্ম্মের আধার, স্বল্পে সন্তুষ্টা—এই সকল লক্ষণ দেখেছেন রাজাবাহাদুর, ছোটরাণী সর্ব্বজয়ায়।

—শূন্য পাত্র, পূর্ণ ক'রে দিই? প্রায় চুপি চুপি বললেন ছোটরাণী। ভাবলেন, এই প্রসঙ্গ তোলায় যদি রাজাবাহাদুর তাঁর প্রতি অমনোযোগী হন।

রাজা বললেন,—হাঁ, তাই দাও। কথার শেষে সর্ব্বজয়াকে নিবিড় বন্ধনে যেন বাঁধলেন। রাণীর মুক্ত দুই হাত। অগত্যা তিনি পিয়ালা পূর্ণ ক'রতে

থাকেন। তার মুখাকৃতিতে যেন কি এক অনিচ্ছা। বললেন,—আমাদের ননদিনী, রাজকুমারা বিন্ধ্যবাসিনী তা হ'লে এখন বনবাসিনী?

—হাঁ, এক রকম তাই বলা যায়। মান্দারণে নির্ব্বাসিতা সে। কৃষ্ণরাম যে কত বেশী নিষ্ঠুর আর হৃদয়হীন এ তারই একটা প্রমাণ। রাজাবাহাদুর কথা বললেন অন্য এক সুরে। প্রতিহিংসার জ্বালায় তিনি যেন জ্বলছেন। সহোদরার কষ্টে যেন কত কাতর!

—কি উপায় হবে এখন? কে তারে রক্ষা করবে? পাত্র এগিয়ে দিতে দিতে বললেন সর্ব্বজয়া। বক্রকটাক্ষে দেখলেন, রাজার মুখভাব।

—কাশীশঙ্কর রক্ষা করবে। সেই যাবে মান্দারণে, সম্মত হয়েছে। আমিও দুশ্চিন্তার কবল থেকে মুক্ত হয়েছি। রাজাবাহাদুর কথার শেষে স্বস্তির শ্বাস ফেললেন। বললেন,—তাইতো আজ এমন অসময়ে এসেছি তোমার পাশে। আমার চিত্রাণীকে কাছে পেয়েছি।

—রাজাবাহাদুর! প্রেমাপ্লুত কণ্ঠে কথা বলেন সর্ব্বজয়া। বলেন,—আপনি না কি শিবানীর বিবাহের ঠিকঠাক করেছেন?

ওপরে নীচে মাথা দুলিয়ে কালীশঙ্কর বললেন,—হ্যাঁ, প্রায় সবই স্থির হয়েছে। শ্রীমন্ত পুরোহিতের ব্যাটা শশিনাথের সঙ্গে বিবাহ হবে। পক্ষকালের মধ্যেই বিবাহ। এখন কেবল শশীর মা অনুমতি দিলেই কার্য্য সমাধা হয়। সেই বুড়ী ত্রিবেণীতে থাকেন। শশিনাথ লোক পাঠায়েছে তাঁর কাছে।

—বেশ হবে। ভাল হবে। শিবানীর জীবনটা রক্ষা পাবে।

ছোটরাণী কথার শেষে রক্তাধরে একটু মধুর হেসে আবার বলেন,—শশিনাথের সহ শিবানীকে বেশ ভালই মানাবে।

—ছোটরাণী! কক্ষের বাহির থেকে কে এক দাসী, ডাকলো ভয়ে ভয়ে।

—কে ডাকে? মন্দোদরী দাসী না?

সর্ব্বজয়া সাড়া দিলেন অভ্যন্তর থেকে, নাতি উচ্চ কণ্ঠে।

—হ্যাঁ গো ছোটরাণী। খানসামা আলবোলা এনেছে রাজার।

রাজাবাহাদুরের কানে যায় কথা। রাজা বললেন, সর্ব্বজয়াকে বাহুবন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে বললেন,—আলবোলা দিয়া যাক খানসামা।

রত্নখচিত নল, সুবর্ণের আলবোলা। তামাকুর সুরভিতে নেশা লাগে যেন। আলবোলার নল স্বহস্তে ধরলেন রাজা। আলবোলায় শব্দ তুলে তাম্রকূট সেবনে মন দিলেন। রত্নময় পালঙ, মুক্তাপ্রবালের ঝালরযুক্ত শয্যা। জরির কামদার বালিশে এলিয়ে পড়েছেন ছোটরাণী। উমারাণী আর সর্ব্বমঙ্গলা গেছেন পাকশালে, তাই যত লজ্জা ছোটরাণীর। অথচ রাজার সান্নিধ্য ত্যাগ করতেও ইচ্ছা হয় না যেন। রাজার প্রেম-সম্ভাষণ!

—আপনি বিশ্রাম করুন, এবার আমি যাই?

রাণীর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর একখানি হাত ধরে আবার টানলেন কালীশঙ্কর। বললেন,—যাবে কোথায়? আমি বাধা দিলে সাধ্য কি যে যাও! এসো, কাছে এসো।

দীর্ঘচোখের কটাক্ষ হানলেন সর্ব্বজয়া। মিষ্ট হাসি হাসলেন। দুই বাহু উর্দ্ধে তুলে আলস্য ত্যাগ করলেন যেন। রাজাবাহাদুর লক্ষ্য করলেন, রাণীর ক্ষীণ কটি, উন্নত বক্ষ, শুভ্র বাহুযুগল। রাজার সাদর আহ্বান শুনে চপল হেসে ছোটরাণী বললেন,—মুক্তি নাই তবে?

—না। মাথা দুলিয়ে বললেন কালীশঙ্কর। বললেন,—রাহু কখনও চন্দ্রকে মুক্তি দেয়?

রহস্যের হাসি হাসলেন সর্ব্বজয়া। রাজার একাগ্র মন যাতে বিক্ষিপ্ত হয় সেজন্য অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন থেকে থেকে। বললেন,—রাজকুমারী কি তবে ফিরে এসে সুতানুটিতেই বসবাস করবে? ফিরবে না আর সাতগাঁয়ে?

—কি জানি কি হয়। মুখ থেকে মুখনল নামিয়ে বললেন রাজাবাহাদুর। দুই ভুরু কুঞ্চিত করলেন। বললেন,—এতো ভবিষ্যতের কথা। কৃষ্ণরাম যদি কখনও সদ্ব্যবহার করে তো আবার ফিরে যাবে। শাসনে নয়, স্নেহপ্রেমে যদি কোন দিন বশ মানে বিন্ধ্যবাসিনী।

—লোকে যদি মন্দকথা বলে, তখন? সমাজে যদি নিন্দা ছড়ায়! সর্ব্বজয়া

থেমে থেমে বলতে থাকেন একেকটি কথা। সম্ভাব্য পরিণাম শোনাতে থাকেন।

কালীশঙ্কর বললেন,—তোমার এত চিন্তার কি কারণ? এ সকল প্রসঙ্গ আপাততঃ তোলা থাক না। তুমি কাছে এসো আরও।

খিল খিল শব্দে হেসে ফেললেন ছোটরাণী। তাঁর মনোগত ইচ্ছা রাজাবাহাদুর অনুমানে বুঝেছেন, তাই হেসে ফেললেন কৌতুকের হাসি।

মনের কোণেও ঠাঁই দেননি রাজকুমারী। স্বপ্নেও ভাবেননি কখনও।

নির্ব্বাসন, তা হোক। স্বামীর আশ্রয় ত্যাগ করে আবার পিত্রালয়ে ফিরে আসবেন, এমন কথা কখনও তাঁর মনে উদয় হয়নি। এমন অমঙ্গলের কথা!

গড়মান্দারণে বেশ আছেন বিন্ধ্যবাসিনী। সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল। কৃষ্ণরামের গঞ্জনা শুনতে হয় না দিবারাত্র, সতীনদের সমুখে অপমানিতা হ'তে হয় না সর্ব্বক্ষণ, চোখের জলে ভাসতে হয় না। মান্দারণে স্থলচর পশু আর সরীসৃপের বসতি। জঙ্গলে পরিপূর্ণ মান্দারণ। মনুষ্যের দেখা পাওয়া যায় কদাচ। কিছু না থাক, অবিচ্ছিন্ন শান্তি আছে।

রাজকুমারী ভগ্নগৃহের ছাদে বসেছিলেন এলোচুলে। অস্তগামী সূর্য্য পশ্চিম দিগন্তে। সূর্য্যকে পিছনে রেখে বসেছেন বিন্ধ্যবাসিনী। ভিজে চুল, শুকিয়ে যায় যদি শেষ রৌদ্রে। আমোদরের অপর তীর থেকে বাতাস আসছে সোঁ সোঁ। সহস্রফণা সাপের মত হাওয়া আসছে ছুটতে ছুটতে। জমিদারনন্দিনীর চোখে মুখে বুকে বাহুতে হাজার হাজার চুমুর পরশ দিয়ে পালিয়ে যায়। আলুলায়িত কেশ, ঠিক যেন কৃষ্ণপতাকার মত উড়তে থাকে। বুকের আঁচল উড়িয়ে দিয়ে যায়। গাছের পাতা মরমরিয়ে ওঠে।

বিন্ধ্যবাসিনীর গালে হাত। নির্নিমেষ দৃষ্টি যেন আমোদরের জলে নিবদ্ধ হয়ে আছে। দূরে, আমোদরের মাঝজলে একখানি পত্রপুটা নৌকা। লাল শালুর পাল তুলে এগিয়ে আসছে ধীর মন্থর গতিতে।

—বৌ! ছাদের অন্য প্রান্ত থেকে কথা বললে পরিচারিকা। হাতে

কিসের ভার, নামিয়ে রেখে বললে,—নদীর তীর থেকে দেখে দেখে এক ধামা এনেছি, দেখো দেখি কাজ হবে কি !

বর্ষার থমথমে আকাশের মত গম্ভীর মুখে সহসা হাসি ফুটলো। রাজকুমারী উঠে পড়লেন। চঞ্চল পায়ে এগিয়ে গেলেন যশোদার কাছে। দেখলেন কানায় কানায় ভরে গেছে ধামা। নদীতীরের বালু চিক চিক করছে।

—এবার তুমি বালির ঘর বাঁধবে না কি বৌ ?

পরিচারিকা যশোদা দম নিয়ে কথা বললে। আমোদরের তীর থেকে এক ধামা বালি বহন ক'রে আনতে আনতে কাহিল হ'য়ে পড়েছে যেন। মুখে যেন তার ক্লান্তি আর বিরক্তি ফুটেছে।

—বালির ঘর! সবিস্ময়ে বলেন রাজবালা। বলেন,—না, হাতের লেখা পাকাবো। বহুকাল অভ্যাস নেই। হয়তো ভুলে গেছি। অক্ষর লেখা মক্স করবো।

—তাই বল! বললে যশোদা। ব'সে পড়লো ছাদের আলসের ধারে। বললে,—আমিতো তা জানি না। আমি ঠাউরেছি, ঘর বাঁধবে বালির। কাজ নেই কর্ম্ম নেই, খেলা করবে তাই। লেখা শিখবে কেন গো? আমাদের জমিদারকে চিরকুট লিখবে না কি ?

—মরণ তোমার। মনে মনে বললেন রাজকুমারী। কি উত্তর দেবেন ভেবে ঠিক করতে পারেন না যেন। কপাল কুঁচকে বললেন,—একটা কিছু তো করতে হবে। নয়তো খাওয়াপরা চলবে কোথা থেকে! চরকা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সুতো কাটতে পারি না আমি! নকলনবীশের কাজ করবো। চন্দ্রকান্ত কাজ দেবেন, কথা দিয়েছেন। রামায়ণ মহাভারত নকল করেই চলে যাবে আমার।

গালে হাত দিলো যশোদা। অবাক মানলো। বললে,—জমিদারের দেওয়া ভাত-কাপড় ছেড়ে ভিক্ষে চাইতে বসবে? তুমি না রাজকন্তে! ভিক্ষের কড়ি হাতে উঠবে তো ?

বিন্ধ্যবাসিনী আর বাক্য ব্যয় করলেন না। আমোদরের দিকে চোখ

ফেললেন। দেখলেন দূরের পালবাহী পত্রপুটা ধীরে ধীরে অনেকটা অগ্রসর হয়েছে। নৌকার মুখে নাগমুখ। বিস্তারিত ফণা। নৌকার গাত্রে অপূর্ব্ব চিত্রকার্য্য। লাল শালুর পাল বুক ফুলিয়ে উড়ছে। নৌকা যতভাগ দীর্ঘ তার অর্দ্ধেক পরিমাণ বিস্তৃত।

রাজকুমারী ছাদ ত্যাগ করতে উদ্যোগী হলেন। নৌকা হয়তো কাছাকাছি কোথাও নোঙর করবে। একজন মাল্লা নৌকার নোঙর হাতে ধ'রে নদীর তীরে নেমেছে। সূর্য্যের শেষ-রশ্মি ছড়িয়েছে শালুর পালে।

আনন্দকুমারী! অস্ফুটে বলে ফেললেন বিন্ধ্যবাসিনী। নৌকায় কাকে যেন দেখতে পেয়ে বললেন।

নৌকার মধ্যস্থলে চৌধুরীকন্যা। সুসজ্জিতা, সালঙ্কারা আনন্দকুমারীকে দেখে মুখে হাসি ফুটলো বিন্ধ্যবাসিনীর। পাখীর কলরব আর অস্তরাগের আলো ফেলে ঘরে ছুটলেন। এলোচুল আর আঁচল উড়িয়ে ছুটলেন। প্রগলভার মত খিলখিলিয়ে হাসছেন যেন থেকে থেকে।

কূলপ্লাবী আমোদর হেসে হেসে ব'য়ে চলেছে উত্তাল তরঙ্গে। ছোট ছোট ঢেউ, সর্পফণার মত দলে দলে ছুটে চলেছে কোন এক মহানন্দের উৎসবে। উত্তরঙ্গ নদীর জলে লালের আভাস,—সিঁদুর না আলতার লালিমা ছড়িয়েছে আপরাহ্ণিক আকাশ। আমোদরের অন্য তীরে ঘন বনরেখার আড়ালে নেমেছে দিনশেষের লাল সূর্য্য। চৌধুরাণীর পালবাহী পত্রপুটার শব্দহীন গতিতে আরও যেন চঞ্চল হয় আমোদর। নদীর বালিয়াড়িতে তরঙ্গের আঘাত পড়ে ঘন ঘন। নৌকা তীরে লেগেছে, নোঙর পড়েছে। নাগমুখী পত্রপুটার লাল শালুর পাল ফুলে ফুলে উঠছে বিপরীত বাতাসে। নৌকাগাত্রের চিত্রবিচিত্র ছায়া খেলছে আলতারাঙা জলে। ক'জন মাল্লা নৌকা থেকে তীরে নেমে দেখছে ইদিক-সিদিক। জমিদার কৃষ্ণরামের ভগ্ন-প্রাসাদ লক্ষ্য করছে সাগ্রহে। নদীর তীর থেকে বিশাল বিস্তৃত জমিদার গৃহ দেখলে যেন কেমন ভয় হয় মনে। ভয় হয়, জোরালো এক হাওয়ার দোলায় যে-কোন মুহূর্ত্তে হয়তো ঐ জরাজীর্ণ অট্টালিকা ধরাশায়ী হয়ে পড়বে।

—জমিদারণী আছো না কি ?

আনন্দকুমারীর ভয়ার্ত কথায় অন্দর মহলে কাঁপা-কাঁপা প্রতিধ্বনি ভাসলো। টাটকা কাজলের রেখাটানা চোখে অনুসন্ধানা দৃষ্টি ফুটিয়ে অন্দরের সোপান-শ্রেণীর দিকে এগিয়ে চলে। চৌধুরাণীর চলার গতি কখনও অতি দ্রুত, কখনও অতি ধীর। অন্দরে সাঁঝবেলার অল্প অন্ধকারের ম্লান ছায়া ঘনিয়েছে, তাই এই ভয়চকিত পদপাত।

—ও পথে নয়, ও-পথে নয়, ইদিক দে যাও। ওদিকে ভীষণ ভয়!

সিঁটিয়ে সিঁটিয়ে ওঠে আনন্দকুমারী। কে যেন তার পিছু থেকে ডাক দেয় অতর্কিতে।

জমিদারনন্দিনীর পরিচারিকা আসমানের ঘাট থেকে ফিরতে ফিরতে কথা বললে। যশোদার কাঁকালে জলের কলসী।

—বৌ কোথায় গো দাসী ?

চৌধুরাণী ভয়ের সিঁড়ি থেকে দালানে নেমে বললে শুষ্ককণ্ঠে। ভয়ে ভয়ে বললে—ও পথে কিসের ভয় গো দাসী ?

কাঁকাল বদল করলো যশোদা। কলসী থেকে খানিক জল উপচে পড়লো দালানে। হাসির সুরে বললে,—স্বরগের সিঁড়ি ওটা নয়, ওটা পাতালের সিঁড়ি। অব্যর্থ মৃত্যু ওর শেষ পরিণাম!

—তবে যে উপর পানে উঠেছে এঁকে-বেঁকে ?

আনন্দকুমারীর কাজল-কালো চোখে বিস্ময়ের বিস্তার। ঠিক বুকের পরে একটি সুকোমল হাত। আঁট কাঁচুলীর মধ্যে আছে খাপেভরা গুপ্ত অস্ত্র —হাতের পরশে একবার অনুভব করলো, আছে না নেই।

ত্রিভঙ্গ যেন পরিচারিকা, জল ভরা কলসীর ভারে। হেসে হেসে যশোদা বললে,—হাঁ ঐ উঠতে উঠতে দেখবে শেষে শুধু মিশকালো আঁধার। সিঁড়ির শেষ ধাপে পা দিলেই একেবারে এমন এক পাতকুয়ায় পড়বে যার নাকি তল পাওয়া যায় না।

শুনে যেন শিউরে উঠলো ক্ষীণমধ্যা চৌধুরাণী। কোমর থেকে লাল রেশমী

রুমাল টেনে মুখের ঘাম মুছলো চেপে চেপে। অন্দরের বদ্ধ হাওয়া মৃগনাভি কস্তুরীর খোশবয় ভাসলো রুমাল থেকে।

রুমালে মুখ মোছে আনন্দকুমারী। আতঙ্কে যেন ঘেমে উঠছে বড় বেশী। শাঁখের গুঁড়ি মুছে গেছে মুখ থেকে। কাজল ভিজেছে চোখের। কত যতনের প্রসাধন ধুয়ে গেছে অবশ্য মৃত্যুর আশঙ্কায়।

—এসো, আমার সাথে এসো। সস্নেহে বললে পরিচারিকা। যেন স্বর্গের সিঁড়িতে উঠছে সে। ডাকলো হেসে হেসে, পিছু ফিরে। সিঁড়ির ক'টা ধাপ পেরিয়ে থামলে একবার। তারপর আবার উঠতে শুরু করলো বলতে বলতে,—আমাদের জমিদারের শখ-স্থবুৎ খুব। কাকেও শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছে হ'লে জমিদার তাকে কাঁচা মদ গিলিয়ে গিলিয়ে নেশায় চুরচুরে ক'রে ঐ সিঁড়ির মুখে এগিয়ে দিয়ে বলতেন, যাও বাছা, একবার সোজা স্বর্গে চলে যাও! যে যেতো সে আর ফিরতো না। শোনা যায়, ঐ পাতকুয়ায় এখনও না কি কারা কাঁদে রাত-বেরাতে। কত শয়ে শয়ে মানুষের ইহলীলা যে শেষ হয়েছে ওখানে, কেউ বলতে পারে না! আমরা ওর নাম দিয়েছি মরণ-সিঁড়ি।

চৌধুরাণীর দেহে অনেক স্বর্ণ-অলঙ্কার। চুড়ি, কাঁকণ, তাবিজ দুই হাতে; মুক্তা-চুণীর ঝালরের ঝুমকো ঝুলছে কানে। মুক্তোর একনরী হার কণ্ঠ থেকে বুকে নেমেছে। আসমানী-রঙ ঢাকাই শাড়ী পরেছে বস্ত্রগোপন ধাঁচে। শাড়ী পরার এমন রীতি যে, কোন রকমে যেন শ্লীলতার হানি না হয়। মেদ-ভারী নিতম্বে মেখলা। বণিককন্যার পায়ে নূপুর, সিঁড়ির ধাপে ধাপে অনেক ভ্রমরের শিঞ্জন তোলে যেন।

দ্বিতলে উঠেও কাকেও দেখা যায় না। যেন জনমানবহীন শূন্যপুরী। ফাঁকা দালান আর ছাদ খাঁ-খাঁ করছে। সন্ধ্যা উৎরাতে চললো, একটিও প্রদীপ জ্বললো না এখনও। ঘরে ঘরে আবছা অন্ধকার।

—বৌ কোথায় গো দাসী, দেখতে পাই না কেন?

—এই যে আমি।

চৌধুরাণী সন্ধানী কণ্ঠ হ'তে না হ'তে বিন্ধ্যবাসিনী কথা বললেন। দেখা দিলেন শুভ্রবেশে। কালো পাড় গরদের শাড়ী তাঁর পরনে। রুক্ষ এলো-কেশ, কালো হাওয়ায় উড়ছে কৃষ্ণপতাকার মত। কালিমালিপ্ত চোখের তল, তবুও মুখেও হাসি ফোটালেন রাজকুমারী। খুশী খুশী হাসলেন কথার শেষে।

চৌধুরীকন্যা আক্ষেপের সুরে কথা বললে। কেমন যেন অনুযোগের সুরে। বললে—পিদ্দিম জ্বালাও না কেন? আঁধারে কেমন আমি থাকতে পারি না, শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে আমার।

বিন্ধ্যবাসিনীর ম্লান মুখে হাসির ক্ষীণ রেখা। অনিচ্ছায় হেসে হেসে বললেন,—আমাকে যে আঁধারেই থাকতে হয়, ঘরের কোণে, ঐ আড়কাঠে চোখ তুলে।

কথা থামলেই নিশ্চুপ নীরবতা প্রকট হয়ে ওঠে। তখন শোনা যায়, কাছাকাছি কোথাও যেন কার ঘন ঘন শ্বাসপতনের শব্দ। দম-আটকানো বুক থেকে যেন অতি কষ্টে শ্বাস পড়ছে কার থেমে থেমে।

রাজকুমারীর একখানি হাত স্বহস্তে ধরলো চৌধুরাণী। তার বুকে স্পন্দন যেন থেমে গেছে। চোখ-দু'টিতে ভয়-ভীরু চাউনি।

পাৎলা কাজলের মত কালো ছায়া যেন হিমানী-আকাশে। শব্দহীন পদসঞ্চারে নিশার অন্ধকারে নামছে কোন্ অলক্ষ্যলোক থেকে। ঐ আকাশ থেকে যেন সোনা-আলোর এক ক্ষুদ্রতম গ্রহপিণ্ড নেমে এসেছে পৃথিবীর মলিন মাটিতে। সেই আলো এগিয়ে আসছে অত্যন্ত ধীরে ধীরে। দালনের অন্ত প্রান্ত থেকে এগিয়ে আসে অতি সন্তর্পণে। মাটির পৃথিবীর বিষাক্ত কালো হাওয়ার বেগে যেন নিবে যাবে এখনই।

হাতে তৈল-প্রদীপ, পরিচারিকা সাবধানে দালান অতিক্রম করে। যদি নিবে যায় দীপশিখা, দমকা বাতাসে? চকমকি ঠুকে ঠুকে অতি কষ্টে প্রদীপ জ্বালিয়েছে যশোদা।

বিন্ধ্যবাসিনী দেখলেন, দীপের আলোয় দেখলেন চৌধুরাণীকে। তার ভয়ার্ত মুখ দেখলেন সাগ্রহে। কুমোরপাড়া থেকে এসেছে যেন কোন্ এক

দেবীমূর্ত্তি। প্রতিমার মত ছাঁচে-ঢালা ঢল-ঢল মুখ। যেন ঘামতেল মাখানো শ্রীমুখে।

—রক্ষে করলে যশোদা, পিদ্দিম জ্বেলে এনোছো যা হোক। আমি তো ভয় কাঠ হয়ে আছি। এই ভুতুড়ে শূন্যপুরীতে কোন্ সাহসে তোমরা আছো, জানি না! আলো দেখে এতক্ষণে সহজ সুরে কথা বললে আনন্দকুমারী। স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

রাজকুমারী দেখলেন আবার। চৌধুরাণীর অলঙ্কারসমূহ দেখলেন খুঁটিয়ে। এমনটা যেখানে সেখানে যখন তখন দেখা যায় না। কি অপূর্ব্ব গঠন গয়নার। কি বিচিত্র কারুকাজ চুড়ির। কাঁকণ আর তাবিজে। চুণী আর পান্না আর মুক্তার কি অবিমৃষ্য ব্যবহার।

এক নির্জন কক্ষের এক কোণে দাসী প্রদীপ রেখে যায়। বিন্ধ্যবাসিনী সেই কক্ষে প্রবেশ করলেন। বললেন,—চৌধুরাণী, এসো এই ঘরে তোমাকে বসাই।

আনন্দকুমারী কক্ষের দ্বার অতিক্রম করে ভয়ে ভয়ে। দীপের উজ্জ্বল আলোয় লক্ষ্য করে ইতি-উতি। দেখে ঘরের মধ্যভূমিতে বালুকার আস্তরণ। হোমকুণ্ডের মত। অন্যান্য কক্ষ অপেক্ষা যেন এই ঘর অধিক পরিচ্ছন্ন। এক মৃৎপাত্রে স্তূপীকৃত যুঁইফুল। আসমানের তীর থেকে যশোদা সংগ্রহ করছে ফুলের রাশি। কক্ষের বদ্ধ বাতাস টাটকা যুঁইয়ের সুরভি। বালুকা-শয্যার দুই দিকে দু'টি তালপত্রের আসন। দু'টি লগুড়-লেখনী।

—ধূপ জ্বেলে দিই জমিদারণী?

দাসীর কথায় কক্ষের অবিচ্ছিন্ন নৈঃশব্দ ভঙ্গ হয়। যশোদার হাতে এক গুচ্ছ চন্দনধূপ।

আরেকটি আসন পাতলেন বিন্ধ্যবাসিনী। বললেন,—দাঁড়িয়ে থেকে পা দু'খানিকে আর কষ্ট দাও কেন? এই আসনে বসে বিশ্রাম কর খানিক। যশো, তুই ধূপ জ্বেলে দে।

দীপের অগ্নিশিখায় ধূপ জ্বালায় পরিচারিকা। যুঁইয়ের সৌরভে মিশে যায় ধূপের চন্দনগন্ধ।

—যাগযজ্ঞ হবে না কি কিছু? বালুর মধ্যে কিসের আখর? কার নাম লেখা? কোন মন্ত্র? আমি ত লিখন-পঠনে অক্ষম।

হঠাৎ যেন চোখে পড়েছে। দেখতে দেখতে কথা বললে চৌধুরাণী। প্রশ্ন করলে এক সঙ্গে একাধিক।

লজ্জায় কেন কে জানে আরক্তিম হয় রাজকুমারীর মলিন মুখকান্তি। তৎক্ষণাৎ হাত বুলিয়ে মুছে ফেললেন বালুর লেখা। লজ্জা সামলে বললেন,—এ আমার ইষ্টদেবের নাম, ভাগ্য ভাল যে তুমি পঠনে অপারগ।

কখন কোন্ খেয়ালে নিজের অজ্ঞাতে লিখে ফেলেছিলেন রাজকুমারী। চারটি মাত্র বাংলা অক্ষর লিখেছিলেন। ক্ষণেকের মধ্যে মুছে ফেললেন অক্ষর সমূহ। লেখনী-লগুড়ের সাহায্যে লিখেছিলেন চারটি অক্ষর। যথা,—'চ ন্দ্র কা ন্ত'।

—এক পাত্র জল পান করবো রাজকুমারী। তেষ্টায় বুক ফাটে যেন। সত্যিই যেন তৃষ্ণায় কাতর হয়ে কথা বললে চৌধুরাণী। কথা বললে শুষ্ক-কণ্ঠে। উৎকণ্ঠা আর উত্তেজনায় কণ্ঠ যেন শুকিয়ে আছে তার। মিন-মিন ঘামছে এখনও। ঘরেই ছিল জলপূর্ণ পাত্র। দাসী পাত্র এগিয়ে দেয়। ঢক ঢকিয়ে জল খায় আনন্দকুমারী। পাত্র বুঝি প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায়।

দাসীকে কক্ষ ত্যাগের নির্দেশ দিয়ে রাজকুমারী কথা বলেন আর থেকে থেকে ঘরের এক ক্ষুদ্রগবাক্ষ থেকে অপাঙ্গে দেখেন একেক বার। বিক্ষ্যর মনে গোপন প্রতীক্ষা। মধ্যে মধ্যে যেন ঈষৎ আকুল হয়ে ওঠেন। দাসী কক্ষ ত্যাগ করে।

—কৈ গো বৌ, তোমার চন্দ্রকান্তর দেখা নাই কেন?

চৌধুরাণী বললেন কিঞ্চিৎ কাঁপা স্বরে। একজনের বেশী অন্য জন যেন না শোনে।

মৃদু মৃদু হাসি ফুটলো জমিদারনন্দিনীর রাঙা অধরে। হেসে হেসে বললেন,—আমার না তোমার বেণের মেয়ে?

খানিক নীরব থেকে হতাশ স্বরে আনন্দকুমারী বললে, বুকের মুক্তমালা নাড়াচাড়া করতে করতে। বললে,—জানি না ঠিক, তোমার না আমার।

—হাঁ তোমারই।

—কি জানি কার।

আনন্দকুমারীর সহাস কথায় যেন হতাশা ফুটলো। তার কাজলপরা চোখে যেন শূন্য চাউনি দেখা যায়।

প্রদীপের দীপ্তিতে দেখা যায় চৌধুরীকন্যার মুখে যেন আষাঢ় মেঘের সিক্তছায়া। বর্ষার থমথমে আকাশের মত বিষণ্ণতা! কোথায় গেল কাজল-কালো চোখের সেই ঘন ঘন কটাক্ষ-বর্ষণ! সেই হরিণী-চঞ্চলতা! মৃদুরক্ত ওষ্ঠাধরের সেই মুক্তাঝরা হাসি! আনন্দকুমারীর বুকে মনসিজের দহন। মনের মাঝে সদাজাগ্রত সেই মনের মানুষ—কিন্তু মুখের কথায় কি কিছু প্রকাশ করা যায়? মন-মন্দিরে আসন বেদীতে যাকে স্থান দিয়েছে, তার নাম কি কেউ ফাঁস করে! পলে অনুপলে সময়ের তরী এগিয়ে চলে। দিন শেষ হয়ে সন্ধ্যা উৎরে রাত্রি নামলো ধীরে ধীরে, কিন্তু কৈ অভীষ্টের কেন দেখা নাই এখনও? চৌধুরাণী স্থির গম্ভীর, কিন্তু তার বেশভূষা জ্বল-জ্বল করছে সমুজ্জ্বলা দীপালোকে। আসমানী ঢাকাই শাড়ীর স্বর্ণ তারাবলী চাকচিক্য তুলছে।

এই ভগ্ন-আলয়ের অন্তঃপুরের অসংস্কৃত ও অপরিচ্ছন্ন একটি কক্ষ, রূপালী রূপ আর সোনালী বসনভূষণ হেসে হেসে ওঠে। দীপের কম্পমান শিখায় যত অচেতন জীবন্ত হয়ে ওঠে যেন!

—দাসী, ফুলের পাত্রটা এগিয়ে দে, এক ছড়া মালা গাঁথি! আর সুতুলি দে এক হালি। কেমন যেন আলস্যভরা কথা বললেন রাজকুমারী। ক্ষণেক থেমে বললেন,—শুধু যূঁই তুলেছিস যশো, আর ফুল নেই আসমানের ধারে?

—আছে, অনেক আছে। বেলা চাঁপা করবী গন্ধরাজ, কিছুর অভাব নেই। পরিচারিকা দেওয়াল-গাত্রে হাত পুরলো। কুলঙ্গী থেকে বার করলো সুতোর কাটিম। পুষ্পপাত্র এগিয়ে দিলো এক লহমায়। বললে,—মল্লিকা মালতী মাধবী সব আছে, গাছের মগ-ডালে যে হাত ওঠে না! আসমানে পদ্ম পলাস

আর শালুক থৈ-থৈ করছে, কে আর জলে নামে এই ভর সন্ধ্যেয়।

সহজ হয়ে বসলো চৌধুরাণী আসমানী ঢাকাইয়ের আড়ালে পা লুকিয়ে। এতক্ষণে যেন শ্বাসগতি স্তিমিত হয়েছে। দীপের আলো আর জমিদার-নন্দিনীকে কাছে পেয়ে ভয় ঘুচেছে খানিক। সহজ হওয়ার অঙ্গ-সঞ্চালনে আর আলোর ছটায় সীমন্তের পাশে হীরার তারায় কত রঙের বাহার ছুটেছে। শুভ্র কণ্ঠ কাঁপিয়ে ক'টা ঢোক গিললো আনন্দকুমারী। দাসী কক্ষ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর হাসতে চেষ্টা করলো যেন! পিঠে ফেলা-জড়ানো সাপের মত বেণী বুকের পরে টানলো। কাঁচা আলতায় লাল অধরে নকল হেসে বললে,—মালা গাঁথবে কেন বৌ? কাকে পরাবে?

ইদিক-সিদিক দেখলেন জমিদারণী; সভয়ে লক্ষ্য করলেন, দাসী ঘরে আছে না নেই। সুতায় ফুল গাঁথায় বিরত হয়ে মেঘনীল চোখ তুললেন। মলিন মুখে ম্লান হাসি ফুটলো। বললেন,—তোমাকে পরাবো। আর কে আছে আমার!

চৌধুরাণী যেন অপ্রস্তুত হয়! যেমনটি আশা ক'রেছিল তা যেন শুনলো না। হঠাৎ আনন্দে সত্যিকার হাসি হাসলো। কানের ঝুমকো দুলে উঠলো যেন হাসিখুসীতে। হাতের লাল রেশমী রুমাল কটিতে রাখতে রাখতে বললে,—বৌ, তোমার মুখখানি কি মিষ্টি, যেন আকাশের চাঁদ! কথা, তাও কি মিষ্টি।

কলের মত হাত চলেচে যেন বিন্ধ্যবাসিনীর। রাশি রাশি সদ্য তোলা শুভ্র যূঁই মুঠো মুঠো তুলছেন আর গেঁথে চলেছেন। আয়ত চোখে দৃষ্টির বদ্ধ হয়ে আছে হাতের সূতাগ্রে। কথা শুনেই কথা বললেন না রাজকুমারী। মুঠোর ফুল শেষ করে নতমুখেই বললেন,—তুমি আর হাসিও না চৌধুরীর মেয়ে! সুন্দরের নিন্দা করে, না অযথা। শুনেছি যে রূপ আমার ছিল এক কালে, জ্বলে-পুড়ে এখন ছাই হয়ে গেছে।

আনন্দকুমারীর মুখে হতাশা ফুটলো। নিরাশ চোখে তাকিয়ে থাকে। সমবেদনার দুঃখে যেন অভিভূত সে। অপলক দেখে রাজকুমারীর মালাগাঁথার সূক্ষ্ম শিল্পনিপুণতা।

কলের মত হাত চলেছে বিন্ধ্যবাসিনীর। মালার গ্রন্থিহীন ছড়া লুটিয়ে

আছে কোলে। নীরবতা ভেঙে বললেন,—চৌধুরী মশাই কেমন আছেন? মান্দারণেই আছেন তো?

সহজ সুরে কথা বলে চৌধুরাণী,—আজ বিকালে নৌকাযাত্রা করেছেন তিনি। সদাগর মানুষ, ঘরে থাকতে মন চায় না তাঁর। সুতানুটিতে সুতা কিনতে গেলেন। এই বুদ্ধ পূর্ণিমার আগেই ফিরবেন আবার।

সুতানুটি! চমকে উঠলেন যেন বিন্ধ্যবাসিনী, তাঁর পিত্রালয়ের বাস্তুগ্রামের নামটি শোনা মাত্র। মালা গাঁথা থামিয়ে ক্ষণেক স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। চোখ দেখে অনুমান হয়, তিনি যেন সহসা অন্যমনা হয়েছেন। রাজকুমারীর বস্ত্রাঞ্চল খসে পড়লো পিঠ থেকে। অস্ফুট স্বগত করলেন,—সুতানুটিতে গেছেন চৌধুরী মশাই!

এক সঙ্গে অনেক ভুলে-যাওয়া স্বপ্ন যেন স্মৃতির অতল থেকে ভেসে উঠলো। কত যেন হারানো সুর ভাসলো কানে। বিস্মরণের কুয়াশায় ঝাপসা অতীত কালের ছবি যেন স্পষ্ট দেখা দিলো। রুখু চুলের গুচ্ছ কপাল থেকে সরিয়ে আবার মালা গাঁথা শুরু করলেন বিন্ধ্যবাসিনী। বললেন,—সুতানুটি থেকে লোক এসে খোঁজ নিয়ে গেছে। রাজমাতা হয়তো আর থাকতে পারেননি! ভেবেছেন, তার এক মাত্তর মেয়েটা বেঁচে আছে না গেছে জন্মের মত যমের দুয়ারে!

কথার শেষে ক্ষীণ হাসলেন রাজকুমারী। ধারালো ওষ্ঠে বাঁকা হাসির রেখা। গবাক্ষের বাহিরে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। দেখলেন, খণ্ড-মেঘের ছবি-আঁকা আকাশ। দেখলেন, সে আকাশ সাদা না কালো। দেখলেন, রাত্রি জ্যোৎস্না। দেখলেন, নক্ষত্র-বিলাসী শুক্লাকাশ। মেঘমালার মেঘবরণ চূর্ণকুন্তল আঁধার-গুণ্ঠনে ঢাকা পড়েছে কখন! এই দুঃখ-জর্জর মর-দুনিয়ার স্বপ্নময় আবরণ, ঐ তারা-ভরা আকাশ থেকে চোখ ফিরিয়ে বললেন, —চৌধুরাণী, সামনে বড় ধুম, তাই নয়?

থেকে থেকে বুক ঢিপ-ঢিপ করে চৌধুরীর মেয়ের। হাত দু'খানি হিম হয়ে যায় তুষারের মত। ফিকে আলতা-লাল হাতের তালু ঘামতে থাকে।

মন যেন তার চঞ্চল হয়ে ওঠে। সামান্ত এক গবাক্ষ থেকে সারা আকাশ চোখে ধরা পড়ে। আনন্দকুমারীও আকাশ দেখে নেয় এক মুহূর্তের কটাক্ষ হেনে। দেখতে পায়, কালো রঙের বেনারসী পরেছে আকাশ। আঁচলায় সোনালী তারের কাজ, জমিতে তারাফুল।

আকাশ থেকে চোখ ফিরিয়ে চৌধুরীকন্তা বলে,—বৈশাখী পূর্ণিমায়, তথাগতের জন্ম-জয়ন্তীতে সঙ্ঘরামে মহা উৎসব হবে। অবতার গোতমের পূজা হবে আমাদের ঘরে ঘরে।

—মঠে মঠে অনেক বাতি জ্বলবে সে রাতে, নয়? অগুরু ধূপের গন্ধে ভরে যাবে আকাশ-বাতাস। গাছে ফুল আর থাকবে না।

মাল্য রচনার সঙ্গে সঙ্গে কথা বলেন বিন্ধ্যবাসিনী। আসন্ন মহালগনের কথা বলেন। হাতের মুঠা থেকে ফুল ঝরে পড়ে। মালা গাঁথা বুঝি শেষ হয়। বিন্দু বিন্দু জলে সিন্ধু যেমন, তেমনি একটি একটি ফুলে গাঁথা পূর্ণাকার এক মালা রচলেন রাজকুমারী। মালার দুই প্রান্ত একত্রে বাঁধতে বাঁধতে বললেন,—বেণের মেয়ে, দু'টা ক্ষীরের পুতুল খেয়ে মুখে হাসি ফোটাও, কেমন? দাসীকে বলি এনে দিক।

—মিষ্টি কখনও কেউ একা-একা খায় না। নকল হেসে হেসে বললে আনন্দকুমারী।

কক্ষের বাইরের দরদালানে পদাঘাতের শব্দ যেন। দাসী হনহনিয়ে আসছে, পায়ের তলার ভূমি কাঁপিয়ে। ভাঙন-ধরা, জরাজীর্ণ দলান আর দেওয়াল কেঁপে কেঁপে ওঠে। প্রাঙ্গণের কোথা থেকে অস্ফুট শব্দ আসে এক, যেমন ভয়াবহ তেমনি শ্রুতিকটু। কে যেন কার দেহ করাত চালিয়ে চালিয়ে খণ্ড-বিখণ্ড করছে। যার দেহ সে ককিয়ে ককিয়ে কাঁদছে রুদ্ধকণ্ঠে। একটানা কান্না নয়, থেমে থেমে কাঁদছে।

চৌধুরাণীর কর্ণকুহরে পদশব্দ আর কান্নার ধ্বনি। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকে আনন্দকুমারী। ভয়বিহ্বলতায় মুখাকৃতিতে সংকোচ নামে যেন। ভয়ে ভয়ে চৌধুরাণী হস্ত প্রসারিত করে। রাজকুমারীর একখানি হাত স্বহস্তে

ধারণ করে। তার নিষ্পলক চোখে ভয়ার্ত জিজ্ঞাসা ফুটেছে।

মৃদু-মন্দ হাসলেন বিন্ধ্যবাসিনী, এমনই নির্ভীক তিনি। চপল চটুল হাসি নয়, স্নেহের স্নিগ্ধহাস। বললেন,—ভয় পাও কেন? দাসী আসছে, তারই চলার শব্দ।

—ও কে কাঁদে কোথায়? চৌধুরীর মেয়ে প্রশ্ন করে কম্পিত স্বরে।

আরও হাসলেন জমিদারনন্দিনী। এবার একটু সজোরে হাসি যেন। কৌতুক-হাসি। বললেন,—তাল আর নারকেল গাছের পাতা দোলার শব্দ, বাতাসে দুলছে। কান্নাকাটি করবার মত কে আছে এখানে? আগে আগে আমি কত কেঁদেছি এখানে এসে, এখন আর কান্না আসে না।

—জমিদারণী, পূজারী এসে পৌঁছেছেন।

কক্ষের বাহির থেকে কথা বললে যশোদা। রাগো-রাগো সুর যেন তার কাটা কাটা কথায়। বললে,—পথের ক্লান্তিতে বসে পড়েছেন নীচের এক দালানে। হাত-পা ধোয়ার জল দিয়েছি আমি। পূজারী কি এখানে আসবেন? এই অন্তঃপুরে?

একজন স্থির আর অন্য জন চঞ্চল হয়ে উঠলেন। উজ্জ্বল কোমল বর্ণের দুই কমনীয় দেহরাজিতে সহসা ভাবান্তর চোখে পড়ে। এক উত্তাল নদী যেন চকিতের মধ্যে স্তিমিত হয়; চৌধুরাণী বিকলচিত্তের মত, ধবলপ্রস্তরের মূর্তির মত নীরবে বসে থাকেন। বর্ষণ-ক্ষান্ত হাসি দেখা যায়।

বিন্ধ্যবাসিনী যেন হাসি রাখতে পারেন না। খুশীর উৎস উছলে ওঠে যেন। চৌধুরাণীর কণ্ঠে মালা পরিয়ে দিলেন হঠাৎ। মুখে আঁচল তুলে হাসি গোপন করতে সচেষ্ট হলেন।

সেই প্রবল প্রগল্ভ হাসির উচ্ছাসে যেন হারিয়ে যায় চৌধুরীর মেয়ে। সলাজ আঁখিতে তার আনত দৃষ্টি।

রাজকুমারী আঁচল চেপে হাসি সম্বরণ করেন। রঙ্গিণীর মত চুপি চুপি বললেন,—চৌধুরীর মেয়ে, শুনলে তো সকলি? আর চিন্তার কি আছে।

এবার একটু হাসো।

আনন্দকুমারীর আলতালাল ওষ্ঠে ভাঙা-ভাঙা হাসি দেখা দেয়। বৃষ্টির পর মন্দ বিদ্যুতের মত মুচকি মুচকি হাসি। চৌধুরাণী বলে,—আমি তবে যাই এখন রাজকুমারি! ঘরে ফিরে যাই?

এ-পাশে ও-পাশে মাথা দোলালেন বিন্ধ্যবাসিনী। সহাস্যে বললেন,—কে তোমাকে যেতে দেয় দেখি! যাবে কোথায় এখনি? তুমি যাও, ঐ পাশের ঘরে গিয়ে লুকাও। আমি না ডাকলে আসিও না।

—কথা কও না কেন বৌ? বাইরের দালান থেকে কথা বললে দাসী। ঝাঁঝালো সুরে। বললে,—পূজারীকে আনবো না কি এখানে?

—আনবি বৈ কি। আমি যে পাঠ নেবো তাঁর কাছে। আমাকে যে তিনি কাজ দেবেন লেখাপড়ার। রাজকুমারী স্পষ্ট সুরে বললেন দাসীর উদ্দেশে। বললেন,—যা তুই, সঙ্গে ল'য়ে আয়।

আনন্দকুমারী আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। তার কণ্ঠলগ্ন ও বক্ষলীন পুষ্পমাল্য থেকে একটি আধটি যুঁইয়ের পাপড়ি খসে পড়লো। ফুলের সুরভি বুকে নিয়ে পাশের কক্ষে যায় চৌধুরাণী। বাসর রাতের নববধূর মত থেকে থেকে সে কাঁপছে যেন যখন তখন। অনাগত দয়িতের চরণধ্বনি শুনেছে কানে, তাই উৎকণ্ঠায় তার বক্ষ দুরু-দুরু করছে। হাত আর পা দু'খানি শিথিল হয়ে আছে যেন।

দাসী দালান ত্যাগ করলো দুমদামিয়ে। তার পদশব্দ মিলিয়ে গেল অন্ধকার সিঁড়িতে। বিন্ধ্যবাসিনীও একবার পাশের কক্ষে গেলেন। তাঁর হাতে একটি তালপাতার আসন। চৌধুরাণীর হাতে সেই আসন ধরিয়ে দিয়ে বললেন—এখানে তোমার কোন ভয়ের কারণ নাই। এই ঘর আমার শয়নঘর, অন্যান্য ঘর অপেক্ষা অনেক পরিচ্ছন্ন। এই আসনে বস তুমি। টুঁ শব্দটি ক'র না যেন। চন্দ্রকান্ত যেন কোন মতে না জানেন যে আমি ছাড়া অন্য কেউ আছে এ তল্লাটে। দেখো, শ্বাস ফেলার শব্দও যেন না শোনা যায়।

জড় পুতুল যেন আনন্দকুমারী। যেন চেতনাশূন্য সে। রাজকুমারী যা যা

বলেন তাতেই সায় দেয় মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে। সম্মতি জানানোর চাঞ্চল্যে কানের ঝুমকো দুলে দুলে ওঠে। ক্ষীণমধ্যা কটি থেকে লাল রেশমী রুমাল টেনে নিয়ে ঘামেভেজা মুখ মুছে নেয়। কত যতনের প্রসাধন, মুখে-মাখা শাঁখের গুঁড়ি ধুয়ে-মুছে গেছে কখন।

—বৌ, এ ঘরে থাকবো, যদি বিছায় কাটে ?

অলীক ভয়ে বাষ্পরুদ্ধ স্বরে কথা বললে চৌধুরাণী। পার্শ্ববর্তী কক্ষের দীপের আলো আর এই ঘরের আঁধারে বিন্ধ্যবাসিনী দেখলেন, চৌধুরীকন্যার ভীরুচোখ। হয়তো কানে শুনলেন, উৎকণ্ঠায় তার কম্পিতবক্ষের দুরু-দুরু ধ্বনি। তার চিবুক ধরলেন জমিদারনন্দিনী। বললেন,—বিছায় যদি কাটে তবুও মুখে রা কাড়বি না।

—মনসার বাহন যদি দংশে ?

ম'রে যাবি, তবুও নয়। তবুও নয়—কথা বলতে বলতে চকিতের মধ্যে কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন বিন্ধ্যবাসিনী। চৌধুরাণীর চিবুকছোঁয়া হাত নিজের ওষ্ঠে ছোঁয়ালেন, চুমা খেলেন হাতে।

শ্বাস ফেলার শব্দ যদি ভাসে, সেই আশঙ্কায় একবুক শ্বাস টানলো আনন্দ-কুমারী। খোপেভরা ছুরিকা কাঁচুলীতে আছে না নেই, হাতের পরশে একবার অনুভব ক'রলো। আড় নয়নে দেখলো দীপের আলোয় যদি কারও ছায়া পড়ে পাশের ঘরের দেওয়ালে। চৌধুরাণী ভাবলো, ছায়া যদি যুগলমূর্তির দেখা দেয়, তখন কি উপায় হবে ? এ চোখে দেখতে পারবে না তখন সে, ঐ লুকানো ছুরিকায় চোখ দু'টিকে বিঁধে ফেলবে। তারপর রক্তঝরা চোখে অন্ধ হয়ে থাকবে এ জন্মের মত, আর দেখতে হবে না কিছু হিংসার চোখে; দেখতে পাবে না ঐ হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর চন্দ্রকান্তকে।

তালপাতার আসনে আসনপিঁড়ি হ'য়ে বসলো চৌধুরাণী। কক্ষটিতে বাতাসের লেশ নেই। হাতের লাল রুমাল তুলে মুখখানি মুছলো আর একবার। হাতের চুড়ি আর কাঁকণ তখনই রিণিঝিণি তুললো। চৌধুরাণী তৎক্ষণাৎ সভয়ে চুড়ি আর কাঁকণ চেপে চেপে হাতের উর্দ্ধে তুলে দেয়, পাছে

অলঙ্কারের মৃদুশব্দ ভাসে! কাঁচুলীর ফাঁস ঈষৎ আলগা ক'রলো। শ্বাস রোধ হয়ে আসে হয়তো।

কি এক অজানা মন্ত্রের অস্ফুট গুঞ্জরণ ভাসলো যেন কাছাকাছি কোথায়। জ্যোৎস্নার রাত্রি। শুক্লারজনী যেন বাকহীনা। অন্ধকারের তবু এক ভয়ের ভাষা আছে, নক্ষত্র আর চাঁদে-ধোয়া সোনালী রাতে যেন বড় বেশী নৈঃশব্দ। সবুজ পৃথিবী, চাঁদের রাতে বিরামবিহীন হাসি ধরে। মাটির সেই হাসিতে কোন সাড়া জাগে না, কোন ধ্বনি বাজে না। ছমছমে জ্যোৎস্নায় অভিসারিকা চুপিসাড়ে দয়িতের আশে যাত্রা করে, উৎসুক চরণে। লোক-নিন্দার ভয়ে কিঙ্কিণী খুলে ফেলে দেয় পথের পাশে, ফুলঝরা বিজনবনে।

তাই বলি, সামান্ত এক ছত্র মন্ত্র, শুক্লরাতের থমকে-থাকা নীরবতা ভেঙে যেন চুরম'র করে দেয়।

চন্দ্রকান্ত বিদ্যাকে পণ্য করেছেন। জ্ঞান-গরিমাকে বিক্রয় করছেন। বাকদেবীর মন্ত্রই তঁরে একমাত্র জীবিকা এখন। তাই বাণীর মন্ত্র বলতে বলতে পথ চলেন তিনি। প্রদীপ হাতে দাসীর পিছু পিছু চলেন। বলেন,—ওঁ তরুণশকলমিন্দোর্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ কুচভরনমিতাঙ্গী সন্নিষণ্ণা সিতাব্জে। নিজ-করমলোদ্যলেখনীপুস্তকশ্রীঃ সকল বিভব সিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্‌দেবতা নঃ।

দীপ-জ্বলা কক্ষের দুয়ার-প্রান্তে এসে সরস্বতীর ধ্যানমন্ত্র শেষ হয়ে যায়। চন্দ্রকান্ত সহজ ভাষায় কথা বলেন, কেমন যেন গম্ভীরকণ্ঠে বলেন,—দাসী, এই গৃহের অধিষ্ঠাত্রী আমার সম্মুখে আসার অগ্রে আমাকে জানিও।

—এই ঘরেই আছেন আমাদের জমিদারণী। আপনি থাকুন এখানে, আমি তাঁকে জানাই।

দাসীর কথা কক্ষ-অভ্যন্তর থেকে কানে যায় বিন্ধ্যবাসিনীর। কি যেন বলতে চাইলেন রাজকুমারী, কিন্তু মুখ বন্ধ হয়। কথা আর উচ্চারিত হয় না, জিহ্বাগ্রে থেমে যায়। পাশের ঘরের লুকিয়ে-থাকা চৌধুরাণীর মতই যেন তাঁরও শ্বাস পড়ে না আর। বিন্ধ্যবাসিনী ইশারায় কি জানালেন শেষে।

দাসী বললে,—এই আসন আপনার তরে পাতা হয়েছে। আসুন বসুন।

চন্দ্রকান্ত বললেন,—দাসী, আমাকে তুমি দিক-নির্দ্দেশ করিও। আমি চোখে কিছু দেখি না।

দাসী দেখলো, উত্তরীয়ধারী ব্রাহ্মণের চক্ষুর্দ্বয় যেন এক বস্ত্রখণ্ডে বাঁধা। কেবলমাত্র অনুমানের ভরসায় চন্দ্রকান্ত কক্ষে প্রবেশ করলেন। বিন্ধ্যবাসিনীও দেখলেন। অপাঙ্গে।

দাসী বললে,—মশায়ের পায়ের কাছেই আসন আছে। বসতে নিবেদন করি।

পদপ্রান্তে আসনের স্পর্শ পেয়ে চন্দ্রকান্ত সেই আসন গ্রহণ করলেন। ধীরে ধীরে বসলেন। পথশ্রান্তিতে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর, উত্তরীয় মোচন করলেন সামান্য। উপবীত দেখা দিলো। চন্দ্রকান্ত বললেন,—এ স্থানে, আমার সমুখে কি এক বালুকাস্তূপ আছে? লেখনী-যষ্টি আছে এক খণ্ড?

দাসী বললে,—হাঁ, তাই আছে। দুই-ই আছে।

চন্দ্রকান্ত আবার বললেন,—এই গৃহের অধিকারিণী, তিনিও কি আছেন?

দাসী বললে,—হাঁ, তাই আছেন। আমাদের জমিদারণী আছেন।

কথা বলতে বলতে পরিচারিকা যশোদা যেন অবাক মানলো ক্ষণেক। ইতি-উতি কা'কে যেন সন্ধান করলো চোখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে। বেণের মেয়ে গেল কোথায়! দাসীর চোখকে ফাঁকি দিয়ে! আনন্দকুমারী কোথায় গেল এরই মধ্যে! চৌধুরীর মেয়ে?

দাসীর সন্ধানী দৃষ্টি দেখে বিন্ধ্যবাসিনী ওষ্ঠে তর্জ্জনী তুললেন। ইশারায় কি যেন নিষেধ করলেন।

আবার কথা বললেন চন্দ্রকান্ত, খানিক স্তব্ধ থেকে। বললেন,—আমি যাহা যাহা লিখি, সেই সেই লেখাগুলি যদি পঠনে সক্ষম হন, তবেই বোঝা যাবে বিদ্যার দৌড়। শিক্ষামান যে কত, অনুমানে বুঝবো তখন।

—তাই হবে। আপনি লেখনী ধরুন।

এতক্ষণে কথা ফুটলো বিন্ধ্যবাসিনীর কণ্ঠে। তিনি ভাবলেন, পাঠ নেওয়ার মধ্যে লজ্জা-ভয়ের কি আছে! শঙ্কা কাটিয়ে ক'টা কথা বলে থামলেন।

দাসী বললে,—মশায়ের চোখ তো বাঁধা, অন্ধ কখনও অন্ধকে পথ দেখাতে পারে না কি!

হাসি সম্বরণ করতে পারলেন না চন্দ্রকান্ত। হেসে ফেললেন ঈষৎ। বললেন,—রাত্রে আমাদের নারীমুখ দর্শন নিষিদ্ধ। কি করি আমি!

কেমন যেন এক ব্যথার আঘাত বাজলো রাজকন্যার বুকে। দীর্ঘ দুই চোখে করুণ দৃষ্টি ফুটলো। ভুরু দু'টি সামান্য কুঞ্চিত হয়ে থাকলো। গালে ক'টা টোল ফুটেছে যেন। তবুও রাজকুমারী এক স্বস্তিশ্বাস ফেললেন। জড়তা ঘুচিয়ে বসলেন সুবাধ্য ছাত্রীর মত।

—দাসী, আরও দু'টি প্রদীপ দাও। আমার চোখে যেন ঝাপসা দেখি, দু'টি প্রদীপ আমার দুই পাশে জ্বালিয়ে দিয়ে যাও।

কাঁপা-কাঁপা সুরে কথা বললেন বিন্ধ্যবাসিনী। কক্ষের দুই দেওয়ালের এক তেকাঠা থেকে যশোদা না-জ্বলা প্রদীপ এনে জ্বালালো জ্বলন্ত দীপশিখা থেকে। জমিদারণীর দুই পাশে রেখে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল।

বালুকাশয্যায় কি যেন অক্ষর লেখা শেষ করলেন চন্দ্রকান্ত। বললেন,—মহাশয়া, পাঠ করুন যাহা লিখি।

এক জোড়া দীপ জ্বলছে দু'পাশে। সন্তজ্বলা সলিতার আলোর ছটায় কক্ষ যেন আলোকিত হয়ে উঠছে।

রাজকুমারী ধীরে ধীরে পড়লেন,—নমঃ সরস্বত্যৈ নমঃ।

পার্শ্বকক্ষে চৌধুরাণী কেমন যেন স্থাণুর মত ব'সে রইলো। অন্ধকার আড়কাঠে চোখ তুলে।

তিমির-বলয় মান্দারণের চতুর্দ্দিকে। শোকের কালো ছায়ার মত থমথমে অন্ধকার। আমোদরের তীরে নিবিড় বনরেখা, আঁধারে আঁধারে আর দৃষ্টিপথে পড়ে না। আকাশের বিক্ষিপ্ত তারাদলের মত দু'টি কি একটি আলোকবিন্দু বনমধ্যে দেখা যায়। খদ্যোতের আলো যেন। বন্যপশুর চোখ যেন! তেমন আলোয় কাজ হয় না, অন্ধকারকে আরও যেন গাঢ়তর করে।

অন্ধকার কক্ষের আড়কাঠ থেকে চোখ নামালো চৌধুরাণী। মুক্ত দ্বার-

প্রান্তে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। আনন্দকুমারীর কটাক্ষ যেমন স্থির, তেমনই মর্ম্মভেদী নীল বিদ্যুতের। কিন্তু তার মুখকান্তিতে এক অনির্ব্বচনীয় শোভা, আত্মগরিমায় আরও যেন সুন্দর দেখায় চৌধুরাণীকে। কক্ষের দেওয়ালের উর্দ্ধে গবাক্ষ। হঠাৎ আকাশ দেখলো চৌধুরাণী, ঠিক যেন এক বৃহৎ চক্ষুর আকার দেখলো। সোনালী তারা জলজল করছে।

আকাশ থেকে পুনরায় চোখ ফেরালো আনন্দকুমারী। নির্ণিমেষ শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকলো দ্বারমুখে। অস্বস্তি বোধ করছে যেন সে; ঘনঘন চঞ্চল হ'য়ে উঠছে তার সর্ব্বশরীর। পার্শ্বকক্ষে তিন তিনটি প্রদীপ জলছ। সেই আলোকরাশির দ্যুতিতে চৌধুরাণীর চোখ পড়ে আপন দেহাভরণে।

গহনা কাঁটা হয়ে বিঁধছে থেকে থেকে। যেন কাঁটালতার অলঙ্কার পরেছে আনন্দকুমারী। আসমানী ঢাকাই শাড়ী যেন সর্ব্বদেহে জ্বালা ধরায় আজ। জরি জড়ানো লতানো বেণী পড়ে আছে পিঠে, বিষধর ফণিনীর মত। তিনটি দীপের ছটায় অলঙ্কারসমূহ নজরে পড়তেই একটি তপ্ত শ্বাস ফেললো। চাহনি নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখ থেমে গেল যেন। দেখলো ফুলের মালা, যুঁই ফুলের মালা। মনে হয় কণ্টকমালা পরেছে। কীটের দংশন অনুভব করছে কণ্ঠগ্রীবায়। কোমর থেকে লাল রেশমী রুমাল টানলো আনন্দকুমারী সজোরে। কি এক বিতৃষ্ণায়! চৌধুরাণীর মুখ গম্ভীর। কি যেন ভাবতে ভাবতে আপন অঙ্গ থেকে একেকটি গয়না খুলতে লাগলো সে। ভূমিতে রুমাল পেতে এক্কেক অলঙ্কার রাখলো একে একে! ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে। ধীরে ধীরে সকল স্বর্ণভূষা মোচন করলো। এমন কি, সীমান্তের হীরক তারাটি পর্য্যন্ত। শেষে এক পুঁটলী বাঁধলো রুমালে। বুকভরা শ্বাস টানলো চৌধুরাণী। জ্বালা জুড়িয়েছে তার। উজ্জ্বল আলোকময় কক্ষে চোখ ফিরালো আবার, মুখখানি ঈষৎ এগিয়ে দ্বারের পাশ থেকে সাবধানে দৃষ্টি চালিয়ে দিলো আলোকময় কক্ষে।

বিন্ধ্যবাসিনীর পিঠে যেন অন্ধকার নেমেছে। অবদ্ধ নিবিড় কেশরাশি পিঠের পরে। সামান্য গুণ্ঠন টেনেছে রাজকুমারী, পাশ থেকে তার মুখাবয়ব

দেখা যায় না। চৌধুরাণী দেখতে পায় রাজকুমারীর মাত্র দু'ই শুভ্র বাহু। আর দেখতে প্রায় অঙ্গরেখা,বস্ত্রাবরণে ঢাকা।

বর্ষার লতা যেন বিন্ধ্যবাসিনী! পাতার ভারে দলমল করছে। পূর্ণচন্দ্র-কৌমুদীর মত দেহবর্ণ।

রাজকুমারীর ওষ্ঠাধরে কথা ফুটছে মিষ্টি মিষ্টি। চন্দ্রকান্তর কি এক প্রশ্নের উত্তরে বিন্ধ্যবাসিনী যেন সলজ্জায় কথা বলছেন।—তখন আমার পঞ্চম বর্ষ বয়স। তখন আমি বালিকা। এক বৈষ্ণবীর নিকট তখনই আমি অক্ষর শিক্ষা করি। তারপর রাজগৃহের একজন স্বস্ত্যয়নী ব্রাহ্মণের কাছে সংস্কৃত ভাষায় কয়েক গ্রন্থ শিক্ষা করি। তারপর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এটা সেটা পাঠ চলতে থাকে। এক সময়ে আমি প্রতি রাত্রে চারি ঘণ্টার পরে শয্যা থেকে উঠে পুরাণ পাঠ করতাম। তার পর একদিন রাত্রে, আমার বিবাহ হয়ে গেল আমাদের পিতাঠাকুর রাজার ইচ্ছায়। তারপর থেকেই আমার পাঠ-অভ্যাসে বিঘ্ন উপস্থিত হয়। তখন থেকে এখনও পর্য্যন্ত প্রায় এক অক্ষরও আর পড়ি না।

পূজারী ব্রাহ্মণের দুই চোখ বস্ত্রখণ্ডে আবদ্ধ। তবুও বোঝা যায় বেশ, তিনি যেন বিস্ময়ের অভিব্যক্তি ফোটালেন মুখে। বললেন,—এই লিখাটুকু পাঠ করেন জমিদারনন্দিনী!

বিন্ধ্যবাসিনী একাগ্র দৃষ্টিতে দেখে দেখে প'ড়লেন,—আপনা মাঁসে হরিনা বৈরী।

বাঙলা ভাষার আদিযুগের এক কণা। সংস্কৃত-প্রাকৃত বন্ধনমুক্ত বাঙলা ভাষার সাবেকী নমুনা এক ছত্র। চর্য্যাচর্যবিনিশ্চয়ের একটি পঙক্তি।

আবার খানিক বাকহীন হয়ে থাকেন চন্দ্রকান্ত। তাঁর পার্শ্বে রক্ষিত পেটিকা হাতে তুলে ধরেন ধীরে ধীরে। বলেন,—হস্তলিপি দেখার প্রয়োজন। রাজকুমারী; আপনার যা খুশী হয় দু'এক কথা লিখেন। লিখা শেষ হ'লে কিয়ৎক্ষণ এই কক্ষের বাহিরে অবস্থান করেন, আমি দেখে লই বারেক।

লজ্জানম্র হাসি ফুটলো বিন্ধ্যবাসিনীর মুখে। শব্দহীন হাসি হাসলেন।

বললেন,—যথাজ্ঞা। কথার শেষে লেখনীদণ্ড ধারণ করলেন। চাকচিক্যময় বালুকায় লিখলেন দু'-এক কথা। আঁকা-বাঁকা লেখা অনভ্যাসের। বললেন এই আমি কক্ষ ত্যাগ করছি। লেখা শেষ হয়েছে।

রাজকুমারীর শ্বাসগতির শব্দ আর কানে আসে না। চোখে না দেখলেও, যেন অনুমানে বোঝেন, দ্বিতীয়া জন স্থান ত্যাগ করলো এই মাত্র। চোখের আবরণ উন্মোচন ক'রে মনে মনে চন্দ্রকান্ত পড়লেন,—পাষাণে লেখতি মুছিলে নাহি ঘুচে!

কবি চণ্ডীদাসের কোন্ এক পদাবলীর একটি মাত্র শব্দ। রাজকন্যার লেখা দেখে যেন বাক্ হারালেন চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত। আনন্দের আতিশয্যে কি যেন বলতে চেয়ে আর বললেন না। বস্ত্রখণ্ড আবার বাঁধলেন, চোখে যেন কিছু দেখা না যায়। একবার ভাবলেন, এই ভগ্নপুরীতে এত পুষ্পগন্ধ কোথা থেকে আসে! টাটকা যুঁই ফুলের সুবাস পান করেন তিনি। কাছাকাছি আছে নাকি কোথাও ফুলের মালঞ্চ। স্বগত করলেন নিজের মনে। বললেন, —কিমাশ্চর্য্যম্!

সত্যিই বিস্মিত হয়েছেন তিনি। রাজকুমারীর লিখন-পঠনের গুণ দেখে পৃথিবীর আরেক আশ্চর্য্য দেখতে পেয়েছেন যেন। নীরব দর্শকের মত ক্ষণেক স্তব্ধ থেকে বললেন,—যা যতটুকু জানি তাতে কি নকলনবীশের কাজ চালাতে পারবো, আপনি কি মনে করেন?

হাতের পেটিকার আবরণ খুলতে খুলতে চন্দ্রকান্ত বললেন,—যথেষ্ট, যথেষ্ট এই বা কে জানে! বৈষ্ণব পদাবলীও দেখি আপনার সুপঠিত!

মৃদু মৃদু হাসলেন রাজকুমারী। প্রসন্ন হাস্যরেখা তাঁর অধরকোণে। হাসি সম্বরণ করে বললেন,—বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস লোচনদাস প্রভৃতি পদকর্ত্তাদের রচনাবলী এককালে আমার কণ্ঠস্থ ছিল, এখন প্রায় সকল কিছুই স্মৃতির অতলে গেছে।

মেঘস্পৃষ্ট শীতল বাতাস বইছে থেকে থেকে। দূরে, বহুদূরে কোথায় হয়তো বর্ষণ চলেছে। বাতাস তাই হিমকণাবাহী। একেক দমকা হাওয়ায়

প্রদীপের শিখাগুলি কেঁপে কেঁপে উঠছে। দুই পাশের দু'টি দীপের প্রখর আলোয় জমিদারনন্দিনীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি আরও যেন সুন্দর দেখায়।

—মান্দারণের মধ্যে হরি বেণের দশকর্ম্ম ভাণ্ডারের নাম কারও অবিদিত নেই। চন্দ্রকান্ত কথা বললেন নিশ্চিত দৃঢ়তার সঙ্গে। বললেন,—হরি বেণের পণ্যশালায় তাবৎ সব কিছুই মিলে। তুলট কাগজও পাওয়া যায়। খাগের কলমও পাওয়া যায়। ভূসাকালিও পাওয়া যায়। আপনার পরিচারিকাকে হুকুম করলে সে তো গিয়া ক্রয় করতে পারে।

—হাঁ পারে। পরিচারিকা যশোদা কেনাকাটায় খুবই পটু। বিন্ধ্যবাসিনী ধীরকণ্ঠে কথা বলেন।

যশোদা ছিল বাইরের দরদালানে। ঘুমে ঢুলুঢুলু আঁখি তার। সন্ধ্যাসমীরণে কেমন যেন ঘুম নামে চোখে। পাহারা দেওয়ার কাজ করে সে। একজন অজানা অচেনা মানুষ, রাত-বেরাতে এসে হাজির হয়েছে, তাই যেন দুয়োর আগলে ব'সে থাকে সে। নিশ্চুপ বসে থাকতে থাকতে ঘুমে ঢ'লে পড়ে। দিনের শেষে আঁধার নামতে না নামতে চোখে তন্দ্রার ঘোর নামে।

চন্দ্রকান্ত পেটিকা থেকে একটি পুঁথি নিয়ে এগিয়ে ধরেন। বলেন,—এটা ধারণ করেন রাজকন্যা! কীটদষ্ট পুঁথি এক। অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারতের প্রথম দুই পর্ব্ব। দুই প্রস্থ নকল করতে হবে। প্রথম পর্ব্বদ্বয় শেষ হওয়ার সঙ্গে আরও কয়েক পর্ব্ব দেবো। ধীরে ধীরে নকল করা চাই, কিছু যেন ছাড় না হয়, সাবধান! লিপি অনুযায়ীর নকল করা চাই।

—আপনি যা আদেশ করেন। পুঁথি হাতে ধ'রে সানন্দে বললেন রাজকুমারী। খানিক থেমে বললেন,—এই নকল করার কাজে কিছু কি আয় হবে? অর্থকরী যদি-না হয় তবে এ তো পণ্ডশ্রম বৈ কিছুই নয়।

আনতমুখে বললেন চন্দ্রকান্ত,—হাঁ, তা হবে। আয় হবে সুনিশ্চিত। বংশবাটীর রাজবাটী থেকে এই কাজ পাই আমি। আমার সময় অত্যল্প, অবকাশ নাই বললেই হয়। অথচ দিন গুজরাণের জন্য আয়ের প্রয়োজন। বংশবাটী রাজবাটী অর্থদানে পেছপাও নয়। আমি যা পাবো তার তিন-

চতুর্থাংশ আপনার হবে, বাকী আমি নেবো। কেন না অনুকৃতির পর আমাকে দেখতে হবে আদি-অন্ত, যাতে কিছু ভ্রম না থাকে, কিছু ছাড় না হয়।

—সেই ভাল, সেই ভাল। বিন্ধ্যবাসিনী পুঁথি রাখলেন সযত্নে, আসন থেকে উঠে তেকাটায় রাখলেন।

চন্দ্রকান্ত বললেন,—সাবধান, উপদিকা না কাটে। ঐ একমাত্র প্রতিলিপি আমার সম্বল। আমি কখনও হাতছাড়া করি না এই পুঁথি। মহাভারতের আর কোন মূললিপি আমার নাই। অতি কষ্টে সংগৃহীত।

—আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য। হৃষ্টচিত্তে বললেন বিন্ধ্যবাসিনী। বললেন,—আপনাব দেওয়া এই কাজেই আমার ভরণ-পোষণ চলবে। নিশ্চিন্ত হলাম আমি। স্বস্তির শ্বাস ফেলে বাঁচলাম। কথা বলতে বলতে রাজকুমারীর কণ্ঠস্বর যেন কিঞ্চিৎ কম্পিত হয়ে উঠে। আপনি যদি সহায় থাকেন, আমি হাসিমুখে বাঁচতে পারি।

শিউরে শিউরে উঠলেন চন্দ্রকান্ত, রাজকন্যার ব্যথাতুর দীপ্ত কথায়। ভেবে ভেবে বললেন,—রাজকুমারী, অধীরা হবেন না। অধ্যবসায় আর অবিরাম চেষ্টায় মানুষই অসাধ্য সাধন করে।

—তার কিছু অভাব হবে না জানবেন। যথাসাধ্য চেষ্টার ক্রটী হবে না। কথা বলতে বলতে বিন্ধ্যবাসিনীর অধর কেঁপে উঠলো। বুকে যেন তাঁর আহোরাত্র কিসের জ্বালা! অব্যক্ত কোন্ এক দুঃখের অন্তর্দাহে জ্বলছেন যেন সদাক্ষণ। রাজকুমারীর অপরূপ মুখবিম্বে তারই প্রতিচ্ছবি হয়তো।

—এই কথা থাকলো জমিদারনন্দিনী, আমি তবে যাই এখন? অনেকটা পথ অতিক্রম করতে হবে আমাকে। পথ বড়ই দুর্গম, বড়ই ভয়ঙ্কর। বৌদ্ধরা ওৎ পেতে আছে।

—অভুক্ত যেতে নেই যে ব্রাহ্মণকে। বিন্ধ্যবাসিনী বললেন অনুরোধের সুরে। বললেন—সামান্য কিছু যদি মুখে দেন কৃতার্থ হবো আমি।

—জপ-তপ সবই বাকি আছে এখনও। ত্রিসন্ধ্যার জপ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত জলগ্রহণ করি না আমি।

—তবে উপায়? কথা বলতে বলতে রাজকুমারী বস্ত্রাঞ্চল খুললেন ধীরে ধীরে। ভূমিতে কপাল ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন। বললেন,—আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। আর এই যৎসামান্ত প্রণামী। কথার শেষে চন্দ্রকান্তর পদপ্রান্তে কি যেন রাখলেন। ধাতুর শব্দ শুনলেন ব্রাহ্মণ। হাতড়ে হাতড়ে তুললেন একটি মুদ্রা। একখানি বাদশাহী রৌপ্যমুদ্রা হাতের পরশে বুঝলেন হয়তো।

—শুভমস্তু! শুভমস্তু!

আশীষ বাচন উচ্চারিত হয়। হাতে রৌপ্যমুদ্রা পেয়ে হর্ষোৎফুল্ল হয়ে ওঠেন চন্দ্রকান্ত। অর্থের বিশেষ প্রয়োজন, নয়তো দিন গুজরাণ হয় নাই, চতুস্পাঠির পরিচালনায় কাজে কিছুই আর সঞ্চয় হয় না। যত্র আয় তত্র ব্যয়, হাতে কিছু থাকে না। চন্দ্রকান্তর কুটীরের চালে ফুটা, দুয়ারে কপাট নেই, বাঁশের মাচায় উই ধরেছে—সমুখে বর্ষাকাল আসন্ন। একখানি রৌপ্যমুদ্রা লাভ হওয়ায় কত কি ভাবলেন। সহাস্তে বললেন,—এই অর্থে অনেক কাজ হবে। আমার পর্ণকুটীরের সংস্কার কাজ হবে।

কান পেতে সকল কথাই শোনে আনন্দকুমারা। কখনও খুশী হয়, কখনও সহানুভূতির দুঃখ জাগে মনে। একবার ইচ্ছা হয়, বহুমূল্যের অলঙ্কার পরিপূর্ণ লাল রেশমী রুমালের পুঁটুলীটা চন্দ্রকান্তর পদপ্রান্তে রেখে আসে। পর মুহূর্তে মনে হয়, না থাক্। যার জন্য তার কষ্টভোগ, সেও দুঃখ পাক, কষ্টে থাক।

গবাক্ষপথে আকাশ দেখে উৎকর্ণা চৌধুরাণী। রাত্রি অন্ধকার, চারি দিক অন্ধকার। আকাশে ক্ষীণপ্রভ নক্ষত্রের ধুকধুকি, গাছে গাছে জোনাকির চাকচিক্য, তবুও অন্ধকার! ঘনকালো মেঘের অনুগামী কৃষ্ণমেঘ, পালতোলা নৌকার মত বায়ুবেগে ধীরে ধীরে এগিয়ে চ'লছে। চৌধুরাণী দেখলো, দূরে নারকেল গাছের পত্রশাখার ঝিলিমিলি! পাতার ফাঁক থেকে দেখা যায় একখানি কানাভাঙা সোনার থালা।

চৌধুরাণীর বুক দুর-দুর করে। চন্দ্রকান্তর কথাগুলি যেন তার মর্মে গিয়ে বিঁধে। চোখ ফিরিয়ে দেখলো বিন্ধ্যবাসিনীকে। রাজকুমারী কাছে এসে চুপি চুপি বললেন,—কি এত ভাবনায় মগ্ন, তা তো বুঝি না! মুখের এত ঘনঘটা কেন?

সাড় ফিরল যেন। আনন্দকুমারী অল্প হাসলো। ফিসফিসিয়ে বললো,—আমিও যাই। রাত কত হ'ল কে জানে! নৌকায় ফিরতে হবে এই গহিন রাতে!

—রাত বেশী নয়। সবে তো প্রথম রাত্রি এখন! আলোকপক্ষ এটা, তবে আর ভয় কিসে?

—রাজকুমারী, তুমিই ধন্য। তোমার কত জ্ঞান, তুমি কত জানো!

চৌধুরাণীর কথা শেষ হ'তে না হ'তে তার মুখে চাপা পড়ে। বিন্ধ্যবাসিনী তাঁর কোমল হাতে কথকের মুখ চেপে ধরেন। বলেন,—থাক থাক,আমার গুণকীর্ত্তনে কাজ নেই আর। চন্দ্রকান্ত চল্লেন তো, দেখা দিবি না? কথা ক'বি না?

স্তব্ধ হয়ে থাকলো আনন্দকুমারী। গৃহের ছাদে লক্ষ্মীপেঁচা হয়তো ডাকাডাকি করছে কাকে! করালবদনা নিশীথিনী কেঁপে উঠলো সেই ডাকে!

—কি লো, মুখে কথা নেই কেন?

রাজকুমারী কথা ব'লতে ব'লতে চৌধুরাণীর চিবুক তুলে ধরলেন উর্দ্ধপানে।

চোখ বড় করলো আনন্দকুমারী। ফিস-ফিস বললে,—জিজ্ঞেস করতে পারিস রাজকন্যে, বলতে পারিস, শুধোতে পারিস এক-আধটা কথা, আমার পক্ষে?

সম্মতির ইংগিত যেন বিন্ধ্যবাসিনীর সহাস মুখে! বললেন,—হাঁ খুব পারি! কথাগুলি কি তাই শুনি?

—শুধোতে পারিস, জাতি উঁচু না মানুষ উঁচু?

রাজকন্যা তৎক্ষণাৎ কক্ষ ত্যাগ করে পার্শ্বকক্ষে গেলেন। অধরে আঁচল চেপে ধরে বললেন,—একটা কথা শুধাই, জাতিশ্রেষ্ঠ মানুষ না মনুষ্যশ্রেষ্ঠ জাতি?

কি এক মন্ত্র বলছিলেন চন্দ্রকান্ত। অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠ স্পষ্ট শোনা যায় না। সন্ধ্যামন্ত্রের গুঞ্জন থেমে যায় বিন্ধ্যবাসিনীর কথায়!

যাজক ব্রাহ্মণ, কুলগর্ব্ব যে একেবারে নাই, তা নয়। তবুও কেন কে জানে চন্দ্রকান্ত যেন ক্ষণেক বিভ্রান্ত হলেন। মুখে যেন কথা ফুটলো না। কথা থামলো যেন জিহ্বাগ্রে।

বিন্ধ্যবাসিনী বললেন,—এ আমার জ্ঞাতব্য নয়। অন্য এক জন আছে এই কাছাকাছি তারই কথা।

বিচলিত হয়ে উঠলেন যেন চন্দ্রকান্ত। বৈশাখী হাওয়ায় স্খলিত উত্তরীয় যথাস্থানে রাখতে রাখতে বললেন,—রাজা আর বাদশাহদের সুশাসনে দেশের জাত-অভিমান খোয়া গেছে। বহিরাক্রমণে ধর্ম্ম-কর্ম্ম আর গোষ্ঠীশ্রেণীতে ভাঙন ধরেছে। জাত নেই আমাদের, তবে মানুষ আছে এ দেশে। সাধু-সন্ন্যাসী আর ধাম্মিক বহু আছেন।

—আসল প্রশ্নের উত্তর মিললো না। রাজকুমারী মৃদু-মৃদু হাসির সঙ্গে বললেন। মুখে তাঁর আঁচল চাপা। অধর লুকানো।

চন্দ্রকান্ত বললেন,—মানুষই শ্রেষ্ঠ, জাতি-বিচারে কাজ কি?

উৎকর্ণা আনন্দকুমারী। উত্তর শুনে দুই চক্ষু মুছলো আসমানী ঢাকাই-শাড়ীর আঁচলে। কি কারণে যেন চোখে জলের ধারা নেমেছিল। অশ্রুবন্যা বই-ছিল। আর চোখের জলের নাকি বাঁধ বাঁধা যায় না। চৌধুরাণী উঠে দাঁড়ালো ধীরে ধীরে। দ্বারের কাছে এগিয়ে দেখলো, তার এক শৈশব-সখাকে।

বেণের মেয়ে আনন্দকুমারী, তবুও যেন লক্ষ্মীস্বরূপিণী।

সাতমহলা বাস্তগৃহ। রাশি-রাশি ঐশ্বর্য্য। শত-শত মাটির জালাভর্ত্তি সোনারূপার দানা। কলসী কলসী মণিরত্ন। অলঙ্কার আর গহনায় সিন্দুক উপচে পড়ছে। চৌধুরী মশায়ের সদাগরী টাকায় কেনা বিশাল এক রাজত্ব যেন। আনন্দকুমারী বৈ আর কেউ উত্তরাধিকারিণী নেই সেই চাঁদ সদাগরের।

চৌধুরাণী জানে যে, সে-ই হবে একদিন একচ্ছত্র অধিরাজ্ঞী। কত কত দিন আদর-সোহাগের ছলে চৌধুরীমশাই এই কথাই শুনিয়েছেন মেয়ের কানে কানে। বলেছেন,—আনন্দময়ী, আমি একদিন থাকবো না। তোমার স্নেহের মা, তিনিও থাকবেন না। শুধু তুমি থাকবে। একা তখন তুমি, আমরা কেউ নেই। তুমি যাতে কোন কালে কষ্টভোগ না কর, তাই আমার এই সঞ্চয়। তুমি যাতে সুখে থাকো তাই।

শুনতে শুনতে হয় না, বরং দুঃখ পায়। চোখের জলের বাঁধ ভেঙে যায় তখন।

চৌধুরীমশাই আরও বলেছেন,—ব্যবসাবাণিজ্য পেশা আমার। ব্যবসার খাতিরে প্রচুর মিথ্যা বলেছি এ জীবনে। আরও কত বলতে হবে জানি না। তুমি যেন কখনও মিথ্যাচারে যেও না, সত্যকে ভুলো না। দেবদ্বিজে ভক্তি অক্ষুণ্ণ রেখো। আমার কুলদেবীরা কখনও যেন উপোসী না থাকেন। আমার সকল কিছুই তুমি রক্ষা করবে।

চৌধুরীদের দেবালয়ে নানাতন্ত্রের দেবীমূর্ত্তি। নিত্যপূজা হয় মহাসমারোহে। অন্নসত্রে পাত পড়ে শ'য়ে শ'য়ে। ভিখারী-ভোজন হয় প্রতিদিন।

রক্ষা করতে হবে আনন্দকুমারীকে। রাখতে হবে যা আছে তা। চৌধুরীমশাইয়ের নাম-ডাক যাতে ধুয়ে-মুছে না যায়, তৎপ্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। কিন্তু একা-একা চলতে পারবে না যে আনন্দকুমারী! মানুষের জীবনপথ কত যে দুর্গম তা মানুষই জানে! অন্ধকারে পথ দেখানোর আলো দেখাবে কে আনন্দকুমারীকে?

রাজকুমারীর কাছে গিয়ে কানে কানে কথা বলে চৌধুরাণী। বলে,—শুধাও তো, কথায় মিথ্যা নাই তো? অকপট কি না?

তৃতীয় জনের চুপিসাড়ে কথা চন্দ্রকান্তর কানে যায় হয়তো। বললেন,—মিথ্যা বলা আমার পেশা নয়। আমি বাণিজ্য করে খাই না।

চৌধুরাণী আবার কথা বললে,—শুধাও তো, স্ত্রীপুরুষের মালাবদলে কি কি হয়? হিন্দুর ঘরের এই রীতির অর্থ কি? মূল্যই বা তার কত?

—মাল্যদান! বললেন চন্দ্রকান্ত। আনন্দকুমারীর উক্তির উত্তরে বললেন,—মাল্যদান আমাদের শাস্ত্রে এক মঙ্গলসূচক বিধি। মাল্য বিনিময়ে পরস্পরের দেহ-মনের বিনিময় হয়। এক অন্যের সত্তায় মিশে যায়। প্রজাপতি ঋষির এক অখণ্ড বিধান এই মালা-বদল।

ঘন কালোমেঘে সহসা বিদ্যুতের লহরী খেলে যেন। চৌধুরাণীর স্তম্ভিত মুখখানিতে ক্ষীণ হাস্যরেখা দেখা দেয়। তার হাত যেন চঞ্চল হয় কেন?

রুমালের অলঙ্কাররাশির শব্দ ভাসে ঘরে। তিন তিনটি প্রদীপের আলোয় রাজকুমারী দেখলেন, আনন্দকুমারীর চক্ষু ভেজা-ভেজা। ওষ্ঠপ্রান্তে তবু হাসির আভাস। বললেন, চুপি চুপি বললেন,—তবে আর কালবিলম্ব কেন ?

চৌধুরাণীর আয়ত চোখে লজ্জার ঝিলিক। সদ্য-তোলা সদ্য-গাঁথা যুঁইয়ের মালা তার কণ্ঠ থেকে কাঁচুলি মধ্যে নেমেছে। ইতস্ততঃ চিন্তায় যেন মনের স্থৈর্য্য হারিয়েছে সে।

—গয়নাগাটি কোথায় গেল আনন্দকুমারী ? তোমার এমন বেশ কেন ?

কথায় কথায় চৌধুরাণীর দেহগাত্রে নজর পড়ে রাজকুমারীর। বিন্ধ্যবাসিনী খুঁটিয়ে দেখলেন তার আপাদমস্তক। সীমান্তে নেই হীরার তার। বাহুতে নেই চুড়ি কাঁকন তাবিজ। পায়ে নুপুর নেই, কণ্ঠহার নেই, আছে শুধু এক ছড়া ফুলের মালা। কটিতে মেখলা নেই।

আনন্দকুমারী মৃদু কণ্ঠে বললে,—গয়না খুলে রেখেছি। বলা যায় না, কখন কি বিপদ আসে! রাতের অন্ধকারে যেতে হবে এখন কতটা পথ! ডাকাতের দল যদি লুঠে নেয়! সেই ভয়ে—

বিন্ধ্যবাসিনী যেন মনঃক্ষুণ্ণ হন। বললেন,—নৌকায় তোমার যাতায়াত। লোক বলের অভাব নেই, মাঝিমাল্লা আর দেহ রক্ষীরা আছে তবে ভয় কেন ?

—হাঁ, তবুও ভয় হয়। এত গয়না, দেখার লোক কৈ ? কাকে দেখাবো ?

ক্ষোভের সুরে বললে চৌধুরাণী। কেমন যেন ব্যথাতুর কণ্ঠে, দুই ভুরু বাঁকিয়ে। আসমানী ঢাকাই শাড়ীর আঁচলে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে কথা বলে।

বৈশাখের বাতাসে যেন ঝড়ের ইশারা। দিকহারা দমকা হাওয়া বইছে থেকে থেকে। গাছে গাছে যেন কথা বলাবলি করছে, অস্ফুট শব্দে। মর্ম্মর-ধ্বনি ভেসে আসছে। প্রদীপের লেলিহান শিখা সর্পাকারে নেচে নেচে উঠছে। ছাদের আলসেয় লক্ষ্মীপেঁচা ডাকছে ঘন ঘন।

দু'জনের কথা-গুঞ্জনে চন্দ্রকান্ত যেন কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন হয়ে থাকেন। রাত্রি অন্ধকার, দুর্গম ভয়ঙ্কর পথ। শাণানো অস্ত্র হাতে হাতে, চন্দ্রকিরণে হয়তো

চিকচিকিয়ে উঠছে। আত্মগোপনকারী তান্ত্রিকদল আমোদারের দুই তীরে ওৎ পেতে বসে আছে বৈরীজ্বালায়। পরমত অসিহষ্ণু গুপ্তঘাতকদল হাসাহাসি করছে আঁধারে লুকিয়ে। অশ্লীল মন্তব্য করছে বিধর্মীদের। রক্তের লালসায় যেন বন্য পশুর রূপ ধরেছে। নদীর এক তীরে শাক্ততান্ত্রিক, অপর তীরে বৌদ্ধতান্ত্রিক। দুই দলের শাণিত অস্ত্র যেন বড় বেশী চঞ্চল আজ। আলোকপক্ষের স্বর্ণাভায় ক্ষণে ক্ষণে চকচকে কিরণ তুলছে।

—দাসী গেলেন কোথায়? বহির্গমনের পথটুকু দেখায়ে দিলে আমি যাত্রা করতে পরি। অধিক বিলম্বে ভয়ের আশঙ্কা আছে যথেষ্ট। রাত্রি গভীরতর হওয়ার ভয়ে অবশেষে কথা বলেন চন্দ্রকান্ত।

—আছে নিকটেই আছে দাসী।

বিন্ধ্যবাসিনী সম্ভ্রমের সুরে বললেন। কথার শেষে আর এক বার দেখলেন চৌধুরাণীকে। দেখলেন তার মুখে যেন হতাশা। চোখের চাউনিতে নির্লিপ্ততা। রুমালে লুকানো অলঙ্কার এক হাতে। লাল রেশমের মধ্যে থেকে ঝলমল করছে দীপেব তীব্র আলোয়।

—দাসীকে আদেশ দেন। আমি তার অনুগমন করি।

চন্দ্রকান্তের কথায় কর্ণপাত করে না আনন্দকুমারী। ম্লানহাসি হেসে বিন্ধ্যবাসিনীর কানের কাছে মুখ এগিয়ে ফিসফিস বললে,—বিদায় রাজকুমারী! পথে যদি কোন বিপদ না হয় আবার দেখা হবে। তোমার মঙ্গল হোক।

উত্তরের প্রতীক্ষায় থাকে না চৌধুরাণী। কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন ক্ষিপ্র গতিতে কক্ষ ত্যাগ ক'রলো। কস্তুরী আতরের সুগন্ধ রেখে গেল আনন্দকুমারী। যুঁই ফুলের গন্ধে যেন মিশে আছে মৃগনাভির উগ্র গন্ধ।

—দাসী! অ দাসী।

বিন্ধ্যবাসিনী ডাকলেন ঈষৎ উচ্চ সুরে। সন্ধানী চোখে দেখলেন কক্ষের বাইরে। সাড়া মিললো না। কোথায় গেল যশোদা এই রাতের আঁধারে, রাজকন্যাকে ফেলে? বিন্ধ্যবাসিনীর কেমন যেন ভয়-ভয় করে! গায়ে কাঁটা দেয় যেন।

সাড়া না পেয়ে কক্ষের বাইরে গেলেন রাজকন্যা। পায়ের তলায় ভূমি কাঁপছে যেন। কাল রাত্রি, এ তল্লাটে আর তৃতীয় জন কেউ নেই, পাত্র ও পাত্রী বলতে তাঁরা দু'জন। অলীক ভয়ে বিন্ধ্যবাসিনীর কাঁপন লাগে। শঙ্কা-জড়িত কণ্ঠ যেন। রাজকুমারী দেখলেন, দালানের এক পাশে যেন এক মৃতের শব। প্রথম দেখেই শিউরে উঠলেন। অনুমানে বোঝেন, দাসী গভীর নিদ্রায় জ্ঞানহারা। রাত্রি ঘন হাওয়ায় ঘুম এসেছে যশোদার চোখে। নিদ্রিত আর মৃতে যেন কোন পার্থক্য নেই।

—অ দাসী! এ কি তোমার কালঘুম?

চাপা কণ্ঠস্বর বিন্ধ্যবাসিনীর। দাসীর শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে সামান্য রোষের সঙ্গে বললেন রাজকন্যা।

ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লো পরিচারিকা। প্রথম ঘুমের আমেজ, চোখ মেলে উঠে বসতে যেন নিদ্রাজড়তা ভেঙ্গে গেল। ঘুমভাঙা চোখে দেখলো ইতি-উতি। ভয়ে ভয়ে বললে,—বৌ, তুমি কি ভয় পেয়েছো? চুরি-ডাকাতি হয়েছে নাকি? বেণের মেয়ে, আছে না গেছে? পূজারী, তিনিই বা কোথায়? তিনি লোক ভাল না মন্দ?

—চুপ, চুপ। বলতে বলতে দাসীর মুখে হাত চাপলেন বিন্ধ্যবাসিনী। লজ্জায় অধীর হয়ে উঠলেন যেন। বললেন,—তাঁকে এগিয়ে দিয়ে আয় আসমানের ঘাটে। ঐ পথে ফিরবেন হয়তো। তোমার অপেক্ষায় আছেন তিনি। চৌধুরাণী ঘরে ফিরলো। এই গেল সে।

ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়ালো যশোদা। বললে,—কোথায় পূজারী?

রাজকুমারী বললেন,—ঘরেই আছেন তিনি। আমি দালান ছেড়ে খানিক ছাদে যাই, তুমি তাঁকে বল। চোখের ঢাকা খুলতে বল। সঙ্গে নিয়ে যাও।

রাত্রি অত্যন্ত অন্ধকার! আকাশে অল্প অল্প মেঘ জমেছে। মেঘে ঢাকা চাঁদের আধখানা। যেদিকে মেঘ নেই, সেদিকের নীল নভে তারার চুমকি। দপ-দপ জ্বলছে। গাছে গাছে জোনাকির আলো। রাজকুমারী দেখলেন,

ছাদে যেন জ্যোৎস্না ছড়িয়েছে। ছাদের এক কিনারায় বসলেন বিন্ধ্যবাসিনী। মাথার গুণ্ঠন খুলে ফেললেন। বাতাসের চঞ্চলতায় আলুলায়িত কৃষ্ণকেশ উড়তে থাকলো। রাজকন্যাকে দেখতে পেয়ে ছাদের আলসে থেকে উড়ে পালালো এক জোড়া লক্ষ্মীপেঁচা। বিন্ধ্যবাসিনী নিরীক্ষণ করেন কি যেন। অপলক চোখে তাকিয়ে থাকেন। আসমানের তীর ধ'রে কে যায় এমন দ্রুতগতিতে! রাজকন্যা দেখেন, চন্দ্রকান্তর শুভ্র উত্তরীয় উড়ছে বাতাসে। চন্দ্রকান্ত বনপথ ধরলেন। গাছের ভীড়ে অদৃশ্য হলেন মুহূর্ত মধ্যে!

রাজকুমারী উঠলেন। ছাদ ত্যাগ করে চললেন নীরব পায়ে! গৃহের ফটকে একবার চোখ ফেরালেন। দেখলেন, ফটকের এক পাশে এক ভগ্ন-মূর্ত্তির পরে ব'সে আছে পাঠান-প্রহরী। তার লৌহ পোষাকে চাঁদের আলো পড়ছে। শিরস্ত্রাণে জৌলুস খেলছে!

দাসী বললে দেখা হতেই,—বৌ, মুখে জল দাও। দুধমিষ্টি দিই, খাও।

ক্লান্তকণ্ঠ যেন বিন্ধ্যবাসিনীর। শয়নকক্ষে প্রবেশ করতে করতে বললেন,—হাঁ তাই দাও, খাই। তৃষ্ণায় যেন বুক ফেটে যায়।

ক্লান্তি এসেছে, তবুও স্বস্তি পেয়েছেন রাজকন্যা। সুখের চেয়ে স্বস্তি অনেক ভাল। ভিক্ষা চাইতে হবে না আর। পরের দয়ার পাত্রী হয়ে থাকতে হবে না আর। ভরণপোষণের যা হোক একটা উপায় মিলছে যেন এতদিনে। উপার্জ্জনের পথ খুঁজে পাওয়া গেছে। নকলনবিশীর কাজ করতে পারলে বেশ দশ-বিশ কড়ি আয় হবে! কি এক স্বপ্নের আচ্ছন্নতা যেন বিন্ধ্যবাসিনীর জাগর-চোখে। ঘরের এক কুলঙ্গী থেকে দর্পণ তুলে নিলেন। প্রদীপের আলোয় একবার মুখখানা দেখলেন নিজের। কি দেখলেন কে জানে, দেখা শেষ হ'তে দর্পণ যথাস্থানে রাখলেন। কক্ষসংলগ্ন অলিন্দের ধারে এগোলেন। আমোদর কুলুকুলু শব্দে বয়ে চলেছে। নদীর বুকে সচল আলো কয়েকটি। আনন্দকুমারীর পত্রপুটা কোন্‌টি কে জানে! বিন্ধ্যবাসিনী গোপনে ইষ্টের কাছে প্রার্থনা জানালেন, চন্দ্রকান্তর গমনপথে যেন কোন বিঘ্ন না হয়। চৌধুরাণী যেন ভালয় ভালয় ঘরে ফিরে যায়।

আসমানের তীরে ফুলঝরা বনপথ। মহাবৃক্ষবর্গের ছায়াবীথিতে সারি সারি পুষ্পবর্গ। বট, বরুণ, অশ্বত্থ আর শিশু, শাঁই, শিমুলের তলায় তলায় গন্ধফুলের গাছ। ঘাস-বিছানো মাটির পরে বৃক্ষচ্যুত ফুল আর পাপড়ি। কনকচাঁপার কলি, অশোক আর টগরের ফুলদল। বাসি যুঁই আর বেলা।

দুরন্ত গতিতে চলেছিলেন চন্দ্রকান্ত। এই পথে ভয় খুব নেই, বৌদ্ধভক্তদের কেউ এ পথের ছায়া মাড়ায় না। তবে শাক্তজনেরা হয়তো আছে কেউ কেউ। পাহারা দানের কাজ করছে গাছের শিখরে থেকে বিধর্ম্মীরা যদি আক্রমণ করে দলে দলে। নদী পেরিয়ে যদি আসে রাতের আঁধারে! প্রতিহিংসা জানাতে আসে যদি, ক্ষুরধার তরোয়ালের ভরসায়! শক্তির উপাসকদের যদি উচ্ছেদ করতে আসে! মন্দির ধ্বংস করতে আসে! প্রতিমার অঙ্গচ্ছেদ করে যদি!

রাতের ফুল ফুটেছে আসমানের তীরে। গাছে গাছে রাশি রাশি ফুল ফুটছে। সন্ধ্যা-সমীরণে ফুটে উঠেছে ঝাঁক ঝাঁক কুঁড়ি। আসমানের তীরে তাই সুগন্ধের ছড়াছড়ি। চাঁপার শাখায় শাখায় গন্ধ-মাতাল সাপের বেষ্টন। শুক্ল-পক্ষের চাঁদের আলোয় উন্মত্ত সাপে-সাপে জড়াজড়ি লেগেছে, কোমল তৃণশয্যায়।

বেশ কিছুদূর এগিয়ে পথিকের দ্রুতগতিতে পূর্ণচ্ছেদ পড়লো সহসা। সমুখে কি যেন দেখে পাষাণমূর্ত্তির মত স্থির হয়ে গেলেন। অস্ত্রশস্ত্র, তেমন কিছু সঙ্গে নেই, ভয়ার্ত্ত শ্বাস ফেললেন তাই। দৃষ্টি প্রসারিত করলেন, কিন্তু তেমন যেন স্পষ্ট দেখা যায় না। গাছের শাখাভেদী একফালি জ্যোৎস্না কি! যেন এক ঝলক আলো দেখলেন চন্দ্রকান্ত।

চোখের ভুল হয়নো। পীতবস্ত্রধারী এক বৌদ্ধতান্ত্রিক হয়তো। চন্দ্রকান্ত স্থির করলেন, অপঘাতে মৃত্যু হওয়া অপেক্ষা পলায়ন শ্রেয়ঃ। ভাবলেন, পিছু হটবেন। যে পথে এসেছিলেন সেই পথ ধরে দৌড় দেবেন, মৃত্যু ভয়ের আত্মরক্ষায়।

—কস্তং?

পলায়নের পূর্ব্ব মুহূর্তে সাহসে বুক বেঁধে গম্ভীরকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন চন্দ্রকান্ত।

কিন্তু আর যেন দেখা যায় না সেই পীতবস্ত্রধারী বৌদ্ধ-ভিক্ষুকে। সেই শ্রমণকে চোখে যেন ধাঁধা লাগে। চন্দ্রকান্ত কি ভুল দেখলেন দৃষ্টির বিভ্রমে। মনের আশঙ্কাতে মিথ্যা দেখেছেন হয়তো, তাই আবার বললেন,—কে তুমি? কথা কও। লুকাও কেন?

ছায়ামূর্ত্তি যেন সমুখে। চাঁদের আলোর মত, এক ঝলক জ্যোছনা যেন। আকাশ থেকে নেমে-আসা মুঠো মুঠো চন্দ্রভস্ম, কাঁচা সোনা রঙের।

ছায়া নয়, ছায়ামূর্ত্তিও নয়, কেবল মূর্ত্তি। তার পদ পাতের শব্দ উঠলো সহসা। বনপথের শুষ্ক ঝরাপাতা মরমরিয়ে উঠলো। তুলসীর বনের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো ছুটতে ছুটতে। ঘনকালো কৃষ্ণতুলসীর বন। মূর্ত্তি আর দৃষ্টিগোচর হয় না, কেবলমাত্র একখানি মুখ নজরে পড়ে। একটি প্রস্ফুটিত শ্বেতপদ্ম যেন সেই মুখ, নীলসায়রে ফুটে আছে। মৃদু মৃদু হাসছে, চাঁদের হাসির মত। মুখ দেখিয়ে দেহ লুকিয়েছে তুলসীর ঝোপে।

চন্দ্রকান্ত আবার বললেন,—কে তুমি? উত্তর নাই কেন?

কে উত্তর দেয়, সেই চাঁদমুখে হাসি ফুটলো আবার। সেতারের ঝঙ্কার উঠলো যেন সেই হাসিতে।

চন্দ্রকান্ত অন্য দিকে চোখ ফেরালেন। দৃষ্টির ভ্রম যদি দূর হয়। আবার চোখ ফেরালেন সেই হাসিমুখে। দেখলেন, আবার সেই মূর্ত্তি, ছুটতে ছুটতে চললো আবার কোথায়, ঘাসফুল দিলে মাড়িয়ে? ফুল ঝরা পথ যেন আবার কথা বললে।

ভয় হয় যেন। মৃত্যু-ভয় নয়, এক ছায়া কুহেলিকা দেখে ত্রাস আসে মনে, আলেয়ার আলো নয়তো, ভাবলেন চন্দ্রকান্ত। ঐ ছুটন্ত আলেয়ার পিছু পিছু তাঁর দৃষ্টি ছুটলো যেন।

এক বৈজয়ন্তিকার ছায়াতলে আবার দেখা দেয় সেই এক ঝলক আলো। হলুদ-লাল আগুন যেন মুঠো মুঠো। কাছে নেই আর, অনেক দূরে।

আলেয়ার পিছু পিছু ছুটে যাওয়ার মত অবকাশ আর নেই! রাত্রি গভীরতর এখন। গড়মান্দারণ স্তব্ধ শান্ত।

আমোদরের অন্ত তীর থেকে মিহি শব্দ ভেসে আসে তবু। বহুদূর থেকে ভেসে আসা বাদ্যধ্বনি। বৌদ্ধদের সঙ্ঘারাম থেকে ভেসে আসে। ঢাকের বাজনা বেজে চলেছে অবিরাম। ঘণ্টা বেজে চলেছে। বুদ্ধমূর্ত্তির পদপ্রান্তে বাতি জ্বালার পর্ব্ব চলেছে। মঙ্গলদীপ জ্ব'লে উঠছে একে একে। ভিক্ষু আর শ্রমণরা গাথা গাইছে গানের সুরে। অগুরু ধূপ জ্বালছে সেবাদাসী নটীরা।

আসমানের তীর ধরে পুনরায় চললেন চন্দ্রকান্ত। আলেয়ার পিছু পিছু যাওয়ার মত অবকাশ নেই, পথের অনেক বাকী এখনও। চতুষ্পাঠীতে যেতে যেতে মধ্য রাত না হয়। চলার গতি দ্রুত হয় আরও। চাঁদের আলোয় পথ চলার কাজ হয়।

খিল-খিল অট্টহাসি ভেসে এলো ঐ বৈজয়স্তিকার ছায়া থেকে। বাতাস ভেসে এলো জয়ন্তীর পত্রগন্ধ। বাদ্যযন্ত্র বাজলো যেন। হাসির সুরে যেন সাত তার বাজলো সেতারের।

কপালে কুঞ্চনরেখা অচঞ্চল হয়ে থাকে। সেই মধুঝরা হাসি। থামতে চন্দ্রকান্ত আবার বললেন,—এই বনমধ্যে যেই থাকো, আমার যাত্রায় বাধা না দাও, এই মাত্র অনুরোধ।

আবার সেই হাসি। পরিহাসের হাসি যেন। হাসি শেষ হতেই মূর্ত্তি কথা বললে,—সর্প দংশনে আমি পীড়িতা। আমাকে রক্ষা করুন।

—দংশন জ্বালায় কৈ মানুষ তো হাসে না। চন্দ্রকান্ত বললেন নাতিউচ্চ কণ্ঠে। বললেন,—কে? কি-ই বা পরিচয়?

—নাম-গোত্র জানাতে চাই না দংশন জ্বালা, রক্ষা করুন।

চন্দ্রকান্ত শুনলেন এক সুমিষ্ট নারীকণ্ঠের কথা। শুনে যেন বেশ বিস্মিত হলেন। বললেন,—ঐ দিকে যে গহন বন। যদি এই চাঁদের আলোয় আসেন, তবে কিছু রহস্য উদ্ঘাটিত হয়।

—তথাস্তু।

আলোর ঝলক ধীরে ধীরে চলতে থাকে। যেন নেচে নেচে এগিয়ে আসে। মূর্ত্তি যত নিকটে আসে তত যেন চোখ ঝলসায়। হলুদ-লাল আগুনের

আভায় চোখে ধাঁধা লাগে। পলকের মধ্যে আবার দেখলেন, সেই আগুন তাঁর অতি নিকটে এসেছে। দেখলেন, সেই ফুটন্ত পদ্মমুখে কি মিষ্টি হাসি!

—কে তুমি? কাদের কুলবালা? চন্দ্রকান্ত ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলেন ধীর কণ্ঠে।

হাসতে হাসতে নাচতে নাচতে সেই ছায়ামূর্ত্তি এগিয়ে আসছে। কত কাছে এগিয়ে এসেছে! চাঁদের আলোয় তার নধর নরম শুভ্র বাহু দু'টি স্পষ্ট দেখা যায়। দেখা যায়, সেই হাতে যেন ফুলের মালা!

চন্দ্রকান্ত সহসা দেখলেন, সেই মালা তাঁর কণ্ঠে দিলো কে! বললেন, —তুমি আনন্দকুমারী! এ তুমি কি করলে?

—হাঁ আমি। ঠিকই চিনেছো। আমার যা অভিরুচি তাই করেছি।

চৌধুরাণী লুকিয়ে ছিল আসমানের তীরে, বনবীথিতে! মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা ক'রে সর্পাঘাতকে তুচ্ছ ক'রে এই পরম মুহূর্তের অপেক্ষায় ছিল। চৌধুরাণী হেসে হেসে কথা বলে। বলে,—জাত উঁচু নয়, মানুষই উঁচু, এ তোমারই মুখের কথা। খানিক আগেই শুনেছি। রাজকুমারীর কথার উত্তরে তুমিই শোনালে! মালা দেওয়ার অর্থ কি তাও শোনালে।

—হা হতোহস্মি! বিভ্রান্তের মত, হতচকিতের মত চন্দ্রকান্ত বললেন,— এখন উপায়? আমি কোথায় যাই? আমার কর্তব্য এখন? সমাজে যদি কেউ জানতে পারে? তুমি বণিককন্যা আর আমি—

উত্তরীয়ের এক প্রান্তে নিজের হাতে ধরলো চৌধুরাণী। বললে,—উপায় আমি জানাবো। তুমি এখন আমার সঙ্গে সঙ্গে চল।

চন্দ্রকান্তর উত্তরীয় চৌধুরাণীর হাতে। বললেন—কোথায় যাবে তুমি?

—আমার পত্রপুটা নৌকা বাঁধা আছে আমোদরের তীরে। আপাতত সেখানেই যাবো।

—আমি যে এখন চতুষ্পাঠীতে ফিরবো

—আমার নৌকা তোমাকে পৌঁছে দেবে। সে জন্য কোন কথা নেই।

চাঁদের আলোয় চন্দ্রকান্ত দেখলেন আনন্দকুমারীকে, আসমানী ঢাকাই

শাড়ীতে অপূর্ব্ব রূপ খুলেছে তার! চোখে চিন্তাকুল দৃষ্টি, তবুও দেখছেন আজ এই রাতের বেলায়।

নদীতীরের বালিয়াড়িতে পাশাপাশি চলতে চলতে আনন্দকুমারী বললে,—কি দেখছো তুমি? এত চিন্তা কেন?

—তোমাকে দেখছি আমি। তোমার মুখখানি কখনও দেখি নাই এত নিকট থেকে। যার মালা তারই কণ্ঠে শোভা পাক। কথার শেষে সেই মালা খুলে চৌধুরাণীর গলায় দিলেন।

আনন্দকুমারী হাসলো এক ঝলক। মুখখানি তুলে ধরলো নিজের। চন্দ্রকান্ত দেখলেন চৌধুরাণীর রাঙা অধর। ক্ষীণমধ্যা আনন্দকুমারীর ডমরুকটি ধরলেন চন্দ্রকান্ত, বাহু-বেষ্টনে তাকে বেঁধে এগিয়ে চললেন।

চৌধুরাণী বললে,—এই আমার গহনাপত্র। ধরো তুমি, আর আমি বইতে পারি না।

চন্দ্রকান্তর হাতে ধরিয়ে দেয় রেশমী রুমালের ঝুলি। আর এক ঝলক হেসে আবার চলতে থাকলো চৌধুরাণী। দেখলো, অদূরে আমোদর। শুক্লপক্ষের চাঁদের আলোয় ঝলমল।

চৌধুরাণীর নৌকার মাঝি-মাল্লারা সাবেকী লোক।

বহুকাল আগে থেকে, আনন্দকুমারীর জন্মের অনেক আগে থেকে তার পিতার অন্ন খেয়ে তারা প্রতিপালিত হয়েছে। মাঝিদের মধ্যে কেউ-কেউ লজ্জায় মুখ লুকিয়ে ফেলে। কেউ ক্রোধে আত্মহারা হয়। কেউ আবার হাসি চাপে, বেণের মেয়ের সঙ্গে এক পরপুরুষকে দেখে। চৌধুরীমশাইয়ের দূর-পাল্লার বাণিজ্যযাত্রায় বাঙলা দেশ থেকে বেরিয়ে, বাঙলা-সাগর ছাড়িয়ে মালাবার থেকে কুমারিকা, লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ থেকে সিংহল আর সুমাত্রায় পাড়ি জমিয়েছে মাঝিরা। কত ঝড়ের দিনে, বৃষ্টি আর বজ্রপাতের কালরাত্রে সদাগরের ময়ূরপঙ্খী যখন সাগরের ঠিক মাঝ-দরিয়ায়, ঐ মাল্লার দল তখন চৌধুরীমশাইকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে। মরণকে তুচ্ছ ক'রে নৌকার মাস্তুল শীর্ষে উঠে পালের দড়িদড়া খুলছে, যখন ঠিক মাথার পরে

বজ্র আর বিদ্যুতের মিলনলীলা চলেছে। কোটি কোটি তীরের মত বৃষ্টি-জলের আক্রমণ! প্রকৃতির করাল গ্রাস থেকে ছিনিয়ে এনেছে সদাগরকে; লক্ষ লক্ষ টাকার পণ্যসম্ভার বাঁচিয়ে দিয়েছে সামুদ্রিক তুফানের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে। আরাকানের জলদস্যুরা যখন দু'শো হাত গভীর জলের নীচ থেকে, ঝাঁক ঝাঁক হাঙ্গরের মত এসে নৌকা ঘিরে ফেলেছে, তখন ঐ মাঝিদের প্রতিরোধ বেঁচে গেছেন চৌধুরীমশাই।

—মাঝি-সর্দ্দার, নৌকার বাঁধন খুলে দাও।

আমোদরের ঠাণ্ডা জলে দুই ক্লান্ত পা ডুবিয়ে কেমন যেন হুকুমের সুরে কথা বললে চৌধুরাণী। চাঁদের জোরালো আলোয় মাঝির দল লক্ষ্য করে, তাদের অন্নদাতার মেয়ের মুখে আনন্দের চাপা-হাসি। তার অঙ্গবাস কেমন আলুথালু। বৈশাখী রাতের ঝড়ো-হাওয়ায় আসমানী ঢাকাই আঁচল উড়ছে। আলগা হয়েছে জরি-জড়ানো বিণুনী।

পৈঠায় পা দেয় আনন্দকুমারী। তার চরণাঘাতে পত্রপুটা দোদুল্যমান হয়। ফুলের মালা থেকে যুঁই খসে পড়লো নৌকার পট্ট-পত্তনে। নৌকায় একটি মাত্র কক্ষ। দুই পাশে সারি সারি বাতায়ন। দূর থেকে দেখা যায় কক্ষাভ্যন্তর সুসজ্জিত। স্ফটিক-দীপ জ্বলছে ভিতরে! মহার্ঘ আসন, চিত্র, পুতুল প্রভৃতি চোখে পড়ছে। শ্বেতপদ্ম-আঁকা লাল শালুর তন্দ্রাতপ শীর্ষে!

—ঘরে ফিরবে না কি হুজুরের মেয়ে?

মাঝি-সর্দ্দার নৌকার গলুই ধরে ঠেলা মারলো এক, আর বললে সম্ভ্রমের সুরে। হাঁটুভর জল থেকে একটু গভীর জলে ভাসলো পত্রপুটা। টলমলিয়ে উঠলো।

চৌধুরাণী কক্ষের দুয়ার থেকে বললে,—আসমান দীঘির শেষ বরাবর চল এখন, ঘরে ফেরার তাড়া নাই তত।

বৈশাখের জ্যোৎস্না আকাশে। যেমন উজ্জ্বল তেমনি মধুর! চাঁদের আলো ছড়িয়েছে, সোনার চাকচিক্য নদীজলে, এখানে-সেখানে। এখন

জলের গতি অতি তীব্র! ঝড় আর বৃষ্টিতে সামান্য স্ফীত হয়েছে আমোদর!

নৌকার ছাদের পরে গালিচা পাতা! নানাবিধ চিত্রে চিত্রিত। গালিচার এক পাশে কয়েকটি লৌহ-অস্ত্র, চন্দ্রকিরণে আভা ঠিকরোয়।

মাঝি-সর্দ্দার বললে,—রাত গহিন, নাই বা যাও আর। হুজুর স্থতোনটিতে গেছেন, ঘরে ফেরাই মঙ্গল এখন। পথ-ঘাটও ভাল নয়।

চৌধুরাণী খানিক স্তব্ধ থেকে বললে,—তোমার কোন ভয় নাই মাঝি। সন্ধ্যারামে যাবো, নৌকা সেদিকে চালাও। চাঁদের আলো আছে আজ।

এক কলকে তামাক খেয়েছে মাঝি-সর্দ্দার। তার বুড়িয়ে যাওয়া পেশী এখন বেশ তাই চাঙ্গা হয়ে আছে। গলুয়ে দু'হাত আর জলে পা, সর্দ্দার তার পিঠের পেশী ক'খানা ফুলিয়ে ফুলিয়ে শরীরের জড়তা ভঙ্গ করলো। আর এক ঠেলা দিতে যাবে, এমন সময় চৌধুরাণী আবার কথা বললে,—মাঝি, খানিক থামো।

চাঁদের আলো আনন্দকুমারীর কোমল দেহপ্রভায়। মিহি ঢাকাই শাড়ীতে জরির ফুল; বুকে যুঁইয়ের মালা; লাল-রাঙানো মিষ্টি অধর—চাঁদের আলোয় যেন চিকচিকিয়ে উঠছে একেক বার। চৌধুরাণী চিবুক নামিয়ে সঙ্গের সাথীকে ডাকলো। মুখ ফুটে বলতে পারলো না কথা, তাই ইশারায় ডাকলো।

—সন্ধ্যারামে আজ আর নাই যাও। মাঝি-সর্দ্দার কথা বললে আবার। বললে,—খানিক আগে ম্যালেট্ সায়েবের বজরাকে যেতে দেখেছি ওদিকে।

—ম্যালেট্ সায়েবের বজরা!

একবার যেন চমকে উঠলো আনন্দকুমারী কি এক অজানা আশঙ্কায়। বললে,—ম্যালেট্ সায়েবের বজরা! কোথায় যেতে দেখলে মাঝি?

—ম্যালেট্ চাঁদের আলোয় হাওয়া খেতে বেরিয়েছে হয়তো। গেছে ঐ দিকে।

হেসে-হেসে কথা বললে মাঝি-সর্দ্দার। ম্যালেটের বজরা যেদিকে গেছে সেই দিকে চোখ দেখালো। বললে,—ম্যালেটের সঙ্গে জন দশেক তেলেঙ্গী সিপাই।

চন্দ্রকান্ত দেখলেন নৌকার পাটাতনে যেন এক রূপবতী, মূর্তিমতী লক্ষ্মী

প্রতিমা! আজকের আমোদরের মত যেন কূলে কূলে পূর্ণ, যৌবন-বর্ষার চার পোয়া বন্যার জল সেই কমনীয় আধারে। আনন্দকুমারী আজ যেন কেমন চঞ্চল, ঐ অস্থির নদী-জলের মতই। ম্যালেটের নাম শুনে অবাক হওয়ার বিস্ময় কাটিয়ে চিবুক নামিয়ে নামিয়ে ডাক দেয় চৌধুরাণী। মুখে হাসি ফুটিয়ে ফুটিয়ে ডাকে।

অস্ফুট বাদ্যধ্বনি ভেসে আসছে আমোদরের অন্য তীর থেকে। সন্ধ্যারাম থেকে তাসা আর ঢাক বাজানোর শব্দ ভাসে উড়ন্ত বাতাসে। এক নাগাড়ে ঘণ্টা বেজে চলেছে মঠে। সারা মান্দারণে আর কোন সাড়া শব্দ নেই এই নিশীথ রাতে। তবুও কিছুক্ষণ আগে ফেউ ডেকেছে কাছাকাছি কোথায়। যেন এক জনশূন্য উপনগর এই মান্দারণ, মনুষ্য-বিরহে শুব্ধ শান্ত হয়ে আছে। চাঁদের আলো ভিন্ন আলোর চিহ্ন নেই কোথাও।

চন্দ্রকান্ত নৌকায় উঠতেই মাঝি-সর্দার বললে,—সাদা কাপড়ের মানুষকে সাথে লয়ে সন্ধ্যারামে যাবে হুজুরের মেয়ে? আমরা কেউ ধড়ে জান লিয়ে ফিরবো না আর। কেটে কেটে ভাসিয়ে দেবে এই আমোদরের জলে!

কক্ষমধ্যে গেলেন চন্দ্রকান্ত। অল্প হাসলো চৌধুরাণী। বললে,—ভয় নাই মাঝি। আমি বলছি, ভয় নাই।

—ভরসাও নাই হুজুরের-মেয়ে। রাত-বেরাত তাই বলছি। গলুই ধ'রে সজোরে এক ঠেলা দিতে দিতে বললে মাঝি। অন্যান্য মাঝিরা ততক্ষণে নৌকার আগে আর পিছনে উঠে পড়েছে। তবুও সর্দার ইতি-উতি দেখে মাঝিদের মাথা গুণে নেয়। নিজেও উঠে পড়ে নৌকা হেলিয়ে।

—ভরসা তুমি, তাই আমার ভয় নাই। হাসতে হাসতে বললে আনন্দকুমারী। কক্ষের দুয়োরে দাঁড়িয়ে কথা বললে।

জলের বুকে ছপ-ছপ শব্দ দাঁড় টানার। তীর ছেড়ে নৌকা এগিয়ে চললো মাঝ নদীতে। পেছনের গলুইয়ে বসলো সর্দার। বললে,—সাদা আর হলুদ রঙের মধ্যে লড়ালড়ি চলেছে তা জানো? খোলাখুলি যুদ্ধ নয়, চোরাগোপ্তা মারামারি!

মাঝির কথাগুলি চন্দ্রকান্তর কানে যায়। তিনি যেন শিউরে উঠলেন। অনুমানে বোঝেন, ব্রাহ্মণ আর বৌদ্ধতান্ত্রিকদের গুপ্তযুদ্ধের কথা কারও আর অবিদিত নেই। শ্বেত-বস্ত্র আর পীত-বস্ত্রধারীদের মধ্যে ধর্ম্মযুদ্ধ চলেছে পরমত-অসহিষ্ণুতায়! শক্তিতন্ত্র থাকে না বুদ্ধতন্ত্র থাকে, তারই কঠিন পরীক্ষা চলেছে। বাঙলা দেশের জেলায় জেলায় ছড়িয়েছে এই দাবানল। মঠ আর মন্দির বিধ্বস্ত হচ্ছে গ্রামে গ্রামে। মৃত্যুর ভয়ে কত লোক রাতারাতি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করছে। সন্ন্যাসী-সন্তানের দল ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন। ভিক্ষু আর শ্রমণরা মত্ত হয়ে আছেন। মঠ আর মন্দির পুড়ছে, বৈরী-বৈশ্বানরে! পুঁথির স্তূপে আগুন জ্বলছে। দেব-দেবীর অঙ্গচ্ছেদ হচ্ছে ধারালো অস্ত্রাঘাতে। কত বুদ্ধমূর্তি ধূলায় লুটিয়েছে।

—মাঝি যথার্থই বলেছে, চৌধুরাণী, দিন-কাল ভাল নয়। তুমি ঘরে যাও। কক্ষের মধ্যে থেকে বললেন চন্দ্রকান্ত। কেমন যেন ভয়ার্ত কণ্ঠে। বিপত্তারিণীর মন্ত্র থামিয়ে বললেন। কথার শেষে কক্ষের অভ্যন্তর খুঁটিয়ে দেখতে থাকলেন। দেখলেন কাঠের দেওয়াল বিচিত্র চিত্রিত। পট আর পুতুলে সাজানো। দশভুজা প্রতিমা, দশ অবতার, মহিষাসুর যুদ্ধ, অষ্ট নায়িকা, দশ মহাবিদ্যা; কৃষ্ণের বস্ত্রহরণলীলা—পাশাপাশি সাজানো—বুদ্ধের বরাভয় মূর্তি।

কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করে আনন্দকুমারী। এক ঝলক হাসি হেসে বলে,—মরতে হয় এক সঙ্গেই মরি, তাতে আর ভয় কি! মরণকে আমি ভয় করি না।

কক্ষের মেঝেয় পুরু গালিচা। মখমলের কামদার বিছানা, তাকিয়া বালিশ। সোনার আতরদান, গোলাব-পাশ, পুষ্পপাত্র। সুগন্ধি ফুল আর আতরের গন্ধে স্বপ্নের আবেশ আসে যেন।

—দুঃসাহস তো কম নয়! চন্দ্রকান্ত এটা-সেটা লক্ষ্য করেন আর বলেন। বলেন,—ম্যালেটকেও ভয় কর'না চৌধুরাণী? ম্যালেটের বন্দুকের বারুদকে?

—ঝাঁটা মারি ম্যালেটকে। সে মরুক না, আমি হরির লুট দেবো। তাচ্ছিল্যের সুরে বললে আনন্দকুমারী। মখমলের বিছানায় বসে পড়লো পথ ক্লান্তিতে।

—ম্যালেট কিন্তু আশা ত্যাগ করে নাই। তোমার আশায় সে এখনও মান্দারণেই আছে। জমি-জরীপের কাজ শেষ হয়েছে তবুও অন্যত্র যায় না।' শুনতে পাই, ম্যালেট তোমার জন্য জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারে।

—মুখে ছাই পড়ুক ম্যালেটের। তার মাথায় বজ্রঘাত হোক। ইংরেজদের কুঠিতে আগুন ধরুক। ম্যালেটের জ্বালায় আমি যে মলাম। খেয়ে-ঘুমিয়ে ঘুরে বেড়িয়ে সুখ নাই আমার। যেখানেই যাই ম্যালেট ঠিক পিছু পিছু আছে।

—কৃপা কর না তাকে। ম্যালেট যা চায় তাই দাও না।

—তার আগে আগুনে ঝাঁপ দেবো আমি; আমোদরের জলে ডুবে মরবো।

দাঁড় টানার ছপ-ছপ শব্দ আসে কানে। পত্রপুটা সবেগে এগিয়ে চলেছে জলপথে। আশ-পাশ দিয়ে আরও নৌকা যায় আসে। যাত্রিবাহী নৌকা, জেলেদের গহনা নৌকা যাওয়া আসা করে। নর্ত্তকীর দল এক সঙ্গে যেন পা ফেলছে। দাঁড় টানার শব্দ, ঐকতানের মত শোনায়। মাঝিদের ছাড়া-ছাড়া কথার টুকরো ভাসে হাওয়ায়।

—ম্যালেট কত সুখে রাখবে তোমাকে। সাগর পারে নিয়ে যাবে।

—ম্যালেট নাম মুখে আনাও পাপ। ম্লেচ্ছ দেশে যেতে চাই না আমি। আমার এই মান্দারণই ভাল। মান্দারণ আমার কাছে স্বর্গের সমান। কথা বলতে বলতে খানিক থেমে আবার বললে আনন্দকুমারী,—ম্যালেটের প্রসঙ্গ যেতে দাও, অন্ততঃ আজকের রাতে। আজ আমার খুবই সুদিন।

চন্দ্রকান্ত মৃদু হেসে বললেন,—তা না হয় যেতে দিলাম। কিন্তু আমার কি উপায় হবে এখন? সমাজে জানাজানি হবে, লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়বে। একঘরে হয়ে থাকতে হবে আমাকে। চতুষ্পাঠীতে ছাত্রশিষ্য মিলবে না আর।

—আমার ঘরে থাকবে তুমি। লোকের কথাকে ডরাই না তত। কথার শেষে চৌধুরাণী একটি তাকিয়া টেনে নেয়। বুক চিতিয়ে দেহ এলিয়ে বসে পথক্লান্তিতে।

—আত্মবন্ধুজন যে পরিহার করবে আমাকে! কোথাও ঠাঁই পাবো না।

হাতী-দাঁতের হাতপাখা তুলে নেয় আনন্দকুমারী। বাতাস খায় নিজে। কথার সুর নামিয়ে বলে,—সকলে তোমাকে ত্যাগ করুক, আমি তোমাকে গ্রহণ করবো। তোমার ঠাঁই এখানে। কথার শেষে নিজের বক্ষদেশ দেখিয়ে দেয় সে। দীপের আলোয় তার কাঁচুলী জৌলুস তোলে।

—উপবীত ত্যাগ করতে হবে। তন্ত্রমন্ত্র ভুলতে হবে। গ্রাসাচ্ছাদন চালাই কোথা থেকে ?

—এই লও আপাততঃ, ঘর বাঁধো, দিন চালাও। লাল রেশমী রুমালের পুঁটলীটা চৌধুরাণী এগিয়ে দেয় কথা বলতে বলতে।

—চৌধুরীমশাই জানতে পারলে যদি বিপদ আসে তোমার!

—সে ভাবনা আমার। আমি দান করছি, তুমি গ্রহণ কর হাসি মুখে।

চন্দ্রকান্ত চিন্তিত হয়ে আছেন। তাঁর চিন্তাজাল বারে বারে ছিন্ন হয়ে যায় চৌধুরাণীর কথায়। চন্দ্রকান্ত বললেন,—আনন্দকুমারী, তোমার জীদ বড় বেশী। যা মন চায় তুমি কর। ঈশ্বর তোমার সহায় হোন।

—তুমি আমার সহায় হও তো ঈশ্বরের পরোয়া করি না আমি।

কথা বলতে বলতে চৌধুরাণী এক বার কটাক্ষ হানলো দ্বারপ্রান্তে। চুপি চুপি বললে,—তোমার কাছে যাওয়ার অনুমতি দাও।

—দ্বার উন্মুক্ত যে। মাঝিরা যদি দুর্নাম দেয়, তখন কি হবে ?

উত্তরে কোন কথা বলে না আনন্দকুমারী। মখমলের শয্যা ছেড়ে উঠে পড়ে। দুয়ারের পাল্লা বন্ধ করে দেয় ধীরে ধীরে। ভেতর থেকে অর্গল তুলে দেয়। হেসে হেসে বলে,—মাল্লামাঝিরা আমাদের অন্নদাস, মরবে তবু কথা ছড়াবে না। কেটে ফেললেও গোপন কথা ফাঁস করবে না।

পান্সিটা গজেন্দ্রগমনে এগিয়ে চলেছে। কখনও স্থির থাকে, কখনও দু'লে দু'লে ওঠে জলের আবর্তে। কক্ষমধ্যে থেকে বোঝা যায় না, নৌকার অগ্রগমন। নৌকা স্থিতিশীল না গতিশীল ?

—আমার প্রতি তোমার এত দয়া কেন বুঝি না। তুমি ঐশ্বর্য্য আর

বৈভবে লালিত পালিত, আর আমি এক জন দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কায়ক্লেশে দিন কাটাই।

—দয়া নয় চন্দ্রকান্ত। তোমাকে আমি দেখছি জ্ঞান হওয়ার পর থেকে, সেই শিশুকাল থেকে। চৌধুরাণী কথা বলতে বলতে আবার বসলো মখমলের শয্যায়। তাকিয়ায় দু'হাত রাখলো। সমুখে ঝুঁকে বললে,—তুমি উদ্যমী, তুমি জ্ঞানবান, আত্মনির্ভর তোমার আছে। মানুষ তুমি ভালই, তাই তোমাকে শ্রদ্ধাভক্তি করি। এক দিন তুমি ছিলে আমার খেলার সাথী, আজ থেকে তুমি আমার জীবনের সঙ্গী হও।

—বিবাহ করবে তুমি, সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালন করবে, তোমার পিতার ভূসম্পত্তি রক্ষা করবে, আমি এস্থলে বাধা হই কেন ?

চোখ ছলছলিয়ে ওঠে আনন্দকুমারীর। তবুও ম্লান হেসে বললে—বিবাহ আমার হয়ে গেছে আজ, তুমি মানো আর না মানো। আমি যাকে মালা দিয়েছি, সেই আমার—

—চৌধুরীমশাই দেখো শেষে আপত্তি জানাবেন। তিনি কি চাইবেন আমার মত দরিদ্রের ঘরে তোমাকে পাঠাতে ? চালচুলো নেই আমার, তিন মহলা বাসগৃহ নেই, ডাইনে আনতে আমার বাঁয়ে কুলায় না, চৌধুরীমশাই কি রাজী হবেন তোমার এই খেয়াল-খুশীতে ?

—অধিক কথার কোন প্রয়োজন দেখি না চন্দ্রকান্ত! বৃথা বাক্য ব্যয় কর কেন ? তোমাদের চৌধুরীমশাইকে আমার অপেক্ষা কেউ বেশী জানে না। তিনি পাকা ব্যবসায়ী, কিন্তু মন তাঁর খুবই উদার। আমার কোন কথা তিনি এড়াতে পারবেন না। তাঁর স্নেহ-আদরে কোন ভেজাল নাই জানবে।

—তা একজন সৎপাত্র বাছবে না তুমি ? আমার মত সামান্য টুলো-ব্রাহ্মণকে শেষ পর্য্যন্ত বাছাই করবে ?

—মনটা আমার একেই ক্ষত-বিক্ষত হয়ে আছে চন্দ্রকান্ত। তুমি কোথায় ভাঙা মনে আশার আলো জ্বালাবে, তা নয় শুধুই আক্ষেপ জানাও।

—মন ভেঙেছে কেন ? কি এমন আঘাত পেয়েছো, জানতে চাই।

নিশ্চুপ হয় ে নত মস্তকে থাকে কতক্ষণ। শাড়ীর ঢাকাই আসমানী আঁচলের তারাফুল চিকন তোলে ক্ষণে ক্ষণে। একবার মুখ তুলে তাকায় স্থির দৃষ্টিতে। চোখ নামিয়ে বললে,—তুমি হয়তো ঐ জমিদার-গিন্নীকেই মনে মনে চাও।

—ছি ছি! এমন কথা মুখে এনো না। পাপ হবে তোমার। জমিদার কৃষ্ণরামের অর্দ্ধাঙ্গিনী তিনি, কৃচ্ছ্রসাধনে আছেন। তেমন মানুষ তিনি আদপেই নয়। দুঃখকষ্টে থেকে থেকে তিনি মর্ম্মাহত হয়ে আছেন।

—তার প্রতি তোমার কোন আসক্তি নাই বলতে চাও? নকল হাসি হেসে প্রশ্ন করে চৌধুরাণী। তার দীর্ঘ দুই চোখে যেন কত আকুলতা।

—তিলমাত্র নয়। ঈষৎ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন চন্দ্রকান্ত। বললেন,—এখনও পর্য্যন্ত তাঁর মুখখানিও আমার চোখে পড়ে নাই।

—সেজন্য কি তুমি দুঃখ পাও?

—কদাপি নয়।

কথায় কথায় কখন কাছে সরে এসেছে আনন্দকুমারী। হাতীর দাঁতের হাতপাখার বাতাস লাগে চন্দ্রকান্তের দেহে। চন্দ্রকান্ত দেখলেন চৌধুরাণীকে। বেশ কিছুক্ষণ ধ'রে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখলেন। চন্দ্রকান্তর চোখে বিহ্বলতা নেই, আছে বিস্ময়।

—আমার মুখে কি লিখা আছে, তাই শুনি? কি দেখো কি?

আনন্দকুমারী বললে ক্ষীণ হাসির সঙ্গে। চোখে যেন কৌতূহল ফুটলো। কথার সুরে যেন আগ্রহ।

মৃদু মৃদু হাসলেন চন্দ্রকান্ত। সহযাত্রিণীর একটি হাত নিজের হাতে ধারণ করলেন। করনিপীড়ন অনুভব করে চৌধুরাণী। তার তনুলতা যেন বসন্ত-বাতাসে কেঁপে-কেঁপে ওঠে। বিরহপাণ্ডুর মুখে হাসির আভাব উঁকি দেয়। চোখের দৃষ্টিতে যেন বিলাসলালসা ফুটে ওঠে।

মৃদু হেসে চন্দ্রকান্ত বললেন,—ব্রজসুন্দরী, তোমার মুখচন্দ্রের সুষমা দেখতে দেখতে তন্ময় হয়েছি আমি। মুখপদ্মসৌরভে নেশাচ্ছন্ন হয়েছি।

ভ্রূ-পল্লব নেচে উঠলো যেন। কি এক মর্ম্মব্যথার বিষাদ নামলো যেন মুখে। বিরহ-ব্যাধির রোগিণীর মত ক্ষীণ কণ্ঠে আনন্দকুমারী বললে,—আমার আশা কি পূর্ণ হবে? তুমি কি আমার হবে?

দীপের আলো কক্ষমধ্যে। বাইরে চাঁদের উজ্জ্বল আলো। আমোদরের সোনা-গলা জলে চোখ রাখলেন চন্দ্রকান্ত। খরস্রোতে বয়ে চলেছে আমোদর।

—চিন্তার অবকাশ মিলে নাই, তাই আমি এখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়! স্বজাতি আর সমাজকে ভয় হয়। চন্দ্রকান্ত বললেন কথায় চিন্তার জড়তা ফুটিয়ে। বললেন,—তুমি কুবের কন্যা, আমার কুটিরে কি শোভা পাবে? আমার ঐ চালা ঘরে?

চৌধুরাণী দন্তে অধর দংশন করে। হৃদয়মন ব্যথায় কাতর হয় যেন। ভ্রূ-ভঙ্গিমায় অন্তর্দাহ ফুটে ওঠে। চোখের উজ্জ্বল কাজলে দীপের আলোর চাক-চিক্য। জরি-জড়ানো বিনুনী এক হাতে সরিয়ে দেয় আনন্দকুমারী। বক্ষ থেকে পিঠে ফেলে দেয়। কণ্ঠের স্বর নামিয়ে বলে,—পাকা ঘর হবে তোমার। দালান উঠান বাঁধিয়ে দেবো! মূল্য যা লাগে আমিই দেবো। খানিক থেমে আবার বলে—বৈশাখ শেষ হ'লেই বিয়ের তারিখ স্থির করবো।

—আড়ম্বর ত্যাগ করতে পারবে আনন্দকুমারী? তারায়-ভরা আকাশ থেকে চোখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করলেন চন্দ্রকান্ত ঈষৎ হাসির সঙ্গে।

সুধামধুর ধ্বনিতে হাসলো চৌধুরাণী। কটাক্ষশর হানলো। প্রথম মিলন-লজ্জায় চোখের কটাক্ষ ফিরিয়ে নিয়ে আনত মুখে মৃদু হাসলো। বললে,—হাঁ, খুব পারি।

চন্দ্রকান্ত বললেন,—তবে আমিও সম্মত জানবে। কথা বলতে বলতে চৌধুরাণীর আর একখানি হাত ধরলেন। ফুলের মত কোমল হাত। সহাস্যে বললেন,—ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনম্—।

ঠিক তখনই কোথায় যেন বারুদ ফাটলো আকাশ-কাঁপা শব্দে!

গজেন্দ্রগামিনী পত্রপুটার গতি শিথিল হয়। মাঝিদের মধ্যে কে যেন

চিৎকার করলো। মরণ-চিৎকারের মত শোনালো যেন! আবার এক শব্দ, আবার সেই চিৎকার। আমোদরের জল চলকে উঠলো সশব্দে। নৌকা থেকে জলে ঝাঁপ দেয় কারা! আনন্দকুমারীর দুই হাত মুহূর্তের মধ্যে হিম হয়ে যায়। চোখের যেন পলক পড়ে না।

চন্দ্রকান্ত বললেন,—চৌধুরাণী, বিপদ আসন্ন। দীপ নিবাও সর্ব্বাগ্রে। তোমার নৌ আক্রান্ত হয়েছে!

সাপের মত লাফিয়ে উঠলো যেন আনন্দকুমারী। মখমলের শয্যা থেকে স্ফটিক-দীপের কাছে আছড়ে পড়লো। তার আঁচলের বাতাসে আলোর শিখা হঠাৎ নিবে গেল। কক্ষে অন্ধকার ছড়িয়ে পড়লেও চাঁদের আলো আছে। সোনার আতর-দান আঁধারে দেখা যায়। শয্যাপ্রান্তে এককালি জ্যোৎস্না।

—এখন উপায়? চৌধুরাণী কথা বলে শুষ্ককণ্ঠে।

আবার সেই বজ্রধ্বনি, কাছাকাছি কোথাও থেকে বন্দুক দাগার শব্দ আসে। মনুষ্যকণ্ঠের চিৎকার শোনা যায়। মাঝিদের চাঞ্চল্যে পত্রপুটা আড়াআড়ি দুলতে থাকে জলকল্লোলের মত।

আনন্দকুমারী চুপিসাড়ে বাতায়নের কাছে এগিয়ে চুরিয়ে চুরিয়ে দেখলো ইদিক-সিদিক। দেখলো, চন্দ্রালোকে দেখলো দূরে নদীতীরের এক বনানীর কালো অন্ধকারে ম্যালেটের বজরা। বজরার ছাদে তেলেঙ্গী সিপাইরা যেন আঁধারে মিশে আছে। অন্ধকারে বারুদ ঝলসানোর আগুন ঠিকরে ঠিকরে পড়ছে—একের পর এক বজ্রপাতের শব্দ তুলে।

ম্যালেটের শ্বেতমূর্তি স্পষ্ট দেখা যায়। সিপাইদের পেছনে ম্যালেট। তদারক করছে সিপাইদের কাজের। হো-হো শব্দে হাসছে। বিদেশী মদের নেশায় মত্ত এখন ম্যালেট। বজরার মধ্যে ম্যালেটের নীলাভ কাট গ্লাসের ভিনিশিয়ান ডিকেণ্টারে স্কচ পানীয় চলকে চলকে উঠছে। পানপাত্র উলটে পড়ে গেছে। ডিকেণ্টারের পাশে ম্যালেটের ব্যাঞ্জোটা প'ড়ে আছে। চাঁদের আলোকসুধা খেতে খেতে, বিদেশী মদে চুমুক দিতে দিতে, ম্যালেট তার ব্যাঞ্জোয় এতক্ষণ সেরিনেডের সুর বাজিয়ে চলেছিল।

অনেক দিনের লোভ ম্যালেটের। চাপা লালসা হঠাৎ আজ বিদ্রোহ করেছে। চৌধুরাণীকে ম্যালেট দেখছে বেশ কিছুদিন ধরে। এখানে সেখানে দেখেছে। দিনের আলোয় দেখেছে। আজ দেখবে জ্যোৎস্নারাতের অন্ধকারে।

—সাঁতার জানা আছে চৌধুরাণী? চল, জলে ঝাঁপ দিই। বারুদ-অস্ত্র আছে কি তোমার মাল্লাদের কাছে?

রুদ্ধশ্বাসে যেন কথা বলে আনন্দকুমারী। বললে,—সাঁতার জানা নেই। বারুদ-অস্ত্র নেই। আছে কয়েকটা লোহার অস্ত্র। বর্শা, ভল্ল আর তরোয়াল।

চন্দ্রকান্ত কক্ষের দ্বার মুক্ত করলেন সভয়ে। দেখলেন, নৌকায় মাঝিরা কেউ নেই। নৌকার অদূরে একটি মৃতদেহ ভেসে উঠেছে। চিৎ সাঁতার দিয়ে ভেসে চলেছে যেন কে এক যোগী। জলের বুকে উচ্ছ্বাস। আহত মানুষের বৃথা আস্ফালনে, মৃত্যুকে পিছিয়ে দেওয়ার অদম্য কামনায় কারা যেন ছটফট করছে জলে।

চন্দ্রকান্ত দেখলেন, চাঁদের প্রভা ঘন ঘন চিকচিকিয়ে উঠছে বিক্ষিপ্ত নদীতে।

ম্যালেট হো-হো শব্দে হেসে উঠলো তার বজরার ছাদে। বনানীর কালো ছায়ায় ম্যালেটের শুভ্র পোষাক স্পষ্ট দেখা যায়। বজরার ছাদ থেকে সিঁড়ি বেয়ে তরতরিয়ে নামলো ম্যালেট। ডিকেণ্টার আর পানপাত্র চাই। কড়া স্কচ হুইস্কি চাই। উত্তেজনায় ম্যালেটের কণ্ঠনালী শুকিয়ে গেছে। একেকটা মাল্লাকে বৃন্তচ্যুত ফলের মত গভীর জলে খ'সে খ'সে পড়তে দেখে প্রচুর হেসেছে সে।

চৌধুরাণী কাঁপছে ঠকঠকিয়ে। আঁৎকে উঠছে যেন। কাঁচুলীআঁটা বুক স্ফীত হয়ে ওঠে থেকে থেকে। দুই হাতে চোখ ঢাকলো চৌধুরাণী। আর যেন দেখতে ইচ্ছা হয় না এই পৃথিবীকে!

—চৌধুরাণী, ম্যালেটের বজরা এদিকেই অগ্রসর হয়েছে।

মুক্ত দুয়ার থেকে দেখে চন্দ্রকান্ত কথা বললেন শঙ্কিত কণ্ঠে। বললেন,—চৌধুরাণী, আত্মসমর্পণ ভিন্ন তোমার জীবনের কোন আশা দেখি না।

আনন্দকুমারীর কণ্ঠ কেঁপে উঠলো। বললে,—তার আগে একটুকু বিষ

ও আমাকে। ম্যালেট আমার দেহকে পাবে, আমাকে নয়। তুমি কোথায় চললে? আমাকে একা ফেলে যাও কেন?

নৌকার পাটাতন থেকে একটি দাঁড় টানলেন চন্দ্রকান্ত। নিজের শুভ্র উত্তরীয় বাঁধলেন সেই দাঁড়ে। শত্রুপক্ষের যাতে দৃষ্টিগোচর হয়, তাই বন্ধুত্বের, আত্মসমর্পণের শুভ্রচিহ্ন তুলে ধরলেন চাঁদের আলোয়। যুদ্ধ নয়, শান্তি। মৈত্রী।

ম্যালেটও অর্ডার দিয়েছে তখনই। তেলেঙ্গী সিপাইরাও বন্দুক নামিয়ে নিয়েছে। কিন্তু ম্যালেটের বজরার গতি থামলো না। বজরা এই দিকেই আসছে, অতি ধীরে ধীরে।

নীলাভ কাচের ভিনিশিয়ান পানপাত্র রেখে দিলো ম্যালেট। ডিকেণ্টার উঁচিয়ে ধরলো। স্কচ দেশের চোলাই, যেমন স্বাদ তেমনি কাজ। মাপামাপি নেই, তাই একটু বেশী গলাধঃকরণ করতে হয় ম্যালেটকে। সারা অঙ্গে নেশা ছড়িয়ে পড়ে। হাসতে ইচ্ছা হয়।

বজরা যত নিকটে আসে ম্যালেটের হাসিও তত স্পষ্ট হয়।

চৌধুরাণীর কানে যেন বিষ ছড়ায় সেই বিকট হাসি। কানে হাত চাপে চৌধুরাণী; মরণ-বরণের কাতরতা তার ভয়ার্ত মুখে। রুদ্ধশ্বাসে বললে চৌধুরাণী, আমাকে একা ফেলে তুমি কোথা যাও?

—তোমার জীবন রক্ষা পাবে আনন্দকুমারী। আমি রক্ষা পাবো না।

চন্দ্রকান্ত কথা বলতে বলতে কক্ষের বাইরে গেলেন আবার। বললেন,—ইংরাজের কাছে ন্যায় বিচারের মূল্য আছে। তুমি যীশুর নামে জীবনভিক্ষা চাও, ইজ্জৎভিক্ষা চাও, হয়তো মিলে যাবে। আমার মৃত্যু ছাড়া আর কোন গতি হবে না। তুমি নারী, তোমার প্রার্থনা হয়তো বৃথা যাবে না আমি—

জলে ঝাঁপ দেওয়ার শব্দ শুনলো আনন্দকুমারী! অর্দ্ধস্ফুট কথা শেষ হয় না আর। মখমলের শয্যায় লুটিয়ে পড়লো চৌধুরাণী, বিষম যন্ত্রণায়। অস্থিরতায় শিথিলবাস।

চন্দ্রকান্ত পাতাল মুখে চলেন। ডুব-সাঁতারে জলের গভীরে চললেন তীরের

বেগে। ম্যালেটের বারুদ যেন না স্পর্শ করতে পারে আর! চন্দ্রকান্ত গভীরতর জলে যেন মনুষ্যদেহের স্পর্শ অনুভব করেন। চন্দ্রকান্ত স্পর্শে বুঝলেন, সাড় নেই সেই দেহে। মাঝিদের এক জন হয়তো আঘাত সামলাতে পারলো না।

মৃতদেহ ত্যাগ করে আবার চললেন-কল্প-সাঁতারে। এখন একটি বার জল থেকে শূন্যে মুখ তুলতে হবে। এক বুক শ্বাস চাই। তারপর আবার নীচে নামতে হবে। তল থেকে অতলে যেতে হবে! জলের বেগ বিপরীত, সাঁতরাতে কষ্ট হয় বেশ। জল কাটতে বিলম্ব হয়। চন্দ্রকান্তর গতি যেন রুদ্ধ হ'তে থাকে বারে বারে। জলের বুকে মাথা তুলে শ্বাস ফেললেন অতি কষ্টে। পিছনে তাকিয়ে দেখলেন, ম্যালেটের বজরা কত দূরে? কান পেতে শুনলেন, বন্দুকের গগনভেদী শব্দ শোনা যায় কি না যায়। ঝাপসা দৃষ্টি চোখে দেখলেন, চৌধুরাণীর নৌকার অতি নিকটে পৌঁছেছে ম্যালেটের বজরা। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যায় তেলেঙ্গী সিপাইরা বজরার ছাদে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের নিকষ কালো দেহাকৃতি দেখা যায়।

চন্দ্রকান্ত তাঁর গৃহাভিমুখে এগোতে পারলেন না। পিছিয়ে আসতে হয়। এক বার ভাবলেন শাস্ত্রকথা, পথি নারী বিবর্জ্জিতা। চৌধুরাণীর আহ্বানে সাড়া না দিলেই ভাল ছিল। কুক্ষণে, তিনি সাড়া দিয়েছেন। আনন্দকুমারীর কাতর কথা শুনেছেন। তার কণ্ঠের মালা গ্রহণ করেছেন। শেষে তার সহযাত্রী হয়েছিলেন একই নৌকায়। অদৃশ্য বিধাতা তাই হয়তো অলক্ষ্যে হেসেছেন! বিপদের আবর্তে ঠেলে দিয়েছেন তাকে!

বজরা পত্রপুটার কাছাকাছি যেতেই ম্যালেট এক লাফ দেয় হনুমানের মত। বজরার ছাদ থেকে চৌধুরাণীর নৌকার ছাদে! বজরার মাঝিরা উল্লাসধ্বনি করলে। সিপাইরা ম্যালেটের জয়ধ্বনি শোনালে। মান্দারণের স্তব্ধতা, গাম্ভীর্য্য সেই কলরোলে ভঙ্গ হয় না তবু। রাতের মান্দারণ যেন মৃতবৎ। বজ্রপাতেও সাড় ফেরে না তার!

পত্রপুটার কক্ষমধ্যে নামলো ম্যালেট। এক জন সিপাই তেলের লণ্ঠন

ধরলে। সেই লণ্ঠনের আলোয় ম্যালেট দেখে কক্ষ সুসজ্জিত। মখমলের শয্যা! সাদা পদ্মকাটা লাল শালুর চন্দ্রাতপ। সোনার আতর-দান, গোলাব পাশ। পানীয় জলের পাত্র—রূপার কলস। মখমলের শয্যায় সাদা যুঁইফুল ছড়ানো। চৌধুরাণীর কণ্ঠমালা ছিন্নভিন্ন হয়ে ইতস্তত ছড়িয়েছে। শয্যার এক প্রান্তে লাল রেশমী রুমালে বাঁধা কয়েকখানি স্বর্ণালঙ্কার। পয্যার অপর প্রান্তে আনন্দকুমারী। যেন গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়ে আছে। নিদ্রা নয় মূর্চ্ছা, চৌধুরাণীর কোমল দেহে জ্ঞান নেই।

ম্যালেট সন্তর্পনে আনন্দকুমারীর কাছে এগিয়ে গেল। লণ্ঠনের আলোয় দেখলো তার আকাঙ্ক্ষিতাকে। তার কামনার হোমকুণ্ডকে! ম্যালেটের নেশাচ্ছন্ন চোখে আরও যেন নেশা ধরে। সাগ্রহে লক্ষ্য করে, আনন্দকুমারীর শ্বাস আছে না নেই। দেখলো, চৌধুরাণীর বক্ষদেশের উত্থান-পতন। আনন্দের হাসি ফুটলো ম্যালেটের লাল মুখে। শব্দহীন হাসি হাসতে হাসতে ম্যালেট রূপার কলস থেকে জল গড়িয়ে নেয় এক পাত্র। জল ছিটাতে থাকে চৌধুরাণীর অনিন্দ্য মুখে। নিমীলিত চোখেও জল দেয়। চৌধুরাণী যেন বরফ-ঠাণ্ডা!

মখমলের শয্যায় বসে পড়লো ম্যালেট। হাসি থামিয়ে আনন্দকুমারীর উর্দ্ধদেহ তুলে নেয় নিজের জানুতে। পদ্মের মত কোমল যেন চৌধুরাণী। ম্যালেট আবার জল দেয় তার মুখে-চোখে, সীমন্তে। হঠাৎ যেন হাতের পরশে কঠিন ঠেকলো চৌধুরাণীর অকঠিন বুকে। আর একবার হেসে ফেললো ম্যালেট। চৌধুরাণীর কাঁচুলীর মধ্যে থেকে টেনে বের করলো লুকানো অস্ত্র। ছোট একখানি ভোজালা। অস্ত্রটি সিপাইকে হস্তান্তরিত করলে হাসতে হাসতে।

সময়ের গতি আছে। নদীর যেমন গতি, নদী যেমন থামে না, মহাকালও তেমনি গতিশীল। ম্যালেট জাতিতে খাস-ইংরাজ, সময়ের মূল্য বোঝে। মুহূর্ত্ত মধ্যে ম্যালেট দুই হাতে তুলে নেয় চৌধুরাণীর অসাড় অঙ্গ। পুতুলের মত বুকে তুলে ধরে। চৌধুরাণীর মুখে মুখ ছোঁয়ায় ম্যালেট। তার নধর নরম

গ্রীবায় মুখ রাখে। জলের অতল থেকে যেন এক মৎস্ত-কন্যাকে পেয়ে গেছে ম্যালেট। পত্রপুটা থেকে বজরার পাটাতনে আবার লাফ দেয়। চুরি-করা পুতুল নিয়ে পালায়। চৌধুরাণীকে বজরার ভেতরে শায়িত রেখে ম্যালেট বললে,—সিপাইলোক লুঠ লেও বিলকুল!

সিপাইরা অর্থাভাবে পরাধীনে অস্ত্র ধারণ করেছে। দারিদ্র্যের কশাঘাতে দেশ ছেড়ে এসেছে। তেলেঙ্গী সিপাইদের মধ্যে যেন ছোটাছুটি লাগলো। আনন্দকুমারীর পত্রপুটার কক্ষমধ্যে যা যা ছিল মহার্ঘ্য, লুণ্ঠন করলো যার যা মন চাইলো।

ম্যালেট শুশ্রূষার কাজ করে। কাছেই লণ্ঠন জ্বলছে। তার অনেক আশার, অনেক লালসার কাম্যবস্তুকে পেয়েছে হাতের মুঠোয়। ম্যালেট ভাবছিল, ডিকেণ্টার থেকে এক ঝলক যদি কোন মতে খাওয়ানো যায় এই জ্ঞানহীনাকে! উগ্র মদের নেশায় জ্ঞান ফিরতে আর দেরী হবে না। কিন্তু ম্যালেট তো চৌধুরাণীর সত্তাকে চায় না, হয়তো যা চায়, তাকে ম্যালেট পেয়ে গেছে স্বাধিকারে।

হঠাৎ নজর পড়েছিল ম্যালেটের। দেখছিল আনন্দকুমারীর নৌকা-কক্ষের মখমলের শয্যার কি এক গ্রন্থ যেন। পরম অনাদরে পড়েছিল ছিন্ন অবস্থায়। ম্যালেট সেই গ্রন্থ তুলে নিয়ে দেখছিল, এক খণ্ড বাইবেল। মথি লিখিত সুসমাচার। লাতিন ভাষায় লেখা। বহির্ভারতের মুদ্রণলিপি! গ্রন্থটি পায়জামার পকেটে ভ'রেছিল ম্যালেট। এখন লণ্ঠনের আলোয় খুলে দেখলো বই। পৃষ্ঠা উল্টে-উল্টে দেখে। সূচীর শীর্ষে কার হস্তলিপি! দেশী কালিতে লেখা এক ছত্র। ম্যালেট পড়লে, Presented to revered Pundit Chandrakanta by one of his pupils, Macpherson.

অবাক মানে যেন ম্যালেট। ভেবে ভেবে ঠাওরাতে পারে না, কে চন্দ্রকান্ত, কে ম্যাকফার্সন!

সহসা চঞ্চল হয় চৌধুরাণী। জ্ঞান ফিরতেই চোখ মেলে তাকিয়ে আবার হয়তো মূর্ছা যায়! চমকে শিউরে ওঠে।

ম্যালেট হাসে, দেহে সজীবতার লক্ষণ দেখে। শব্দহীন হাসি হাসে। ডিকেণ্টারটা তুলে ধরে নিজের মুখেই। আকণ্ঠ পান।

বাইবেল উপহার পেয়েছিলেন চন্দ্রকান্ত। হিব্রু আর লাতিন ভাষা শিক্ষায় সম্প্রতি মন দিয়েছেন। ম্যাকফার্সন তাঁকে বিদেশী ভাষা শেখায়। তিনি দেবভাষার শিক্ষা দেন ম্যাকফার্সনকে।

আরও অনেক দূর এগিয়ে আবার জলের বুকে মাথা তুলেছিলেন চন্দ্রকান্ত। বুকভরা শ্বাস নিয়েছিলেন। সাঁতার দেওয়ার নিয়মিত অভ্যাসের অভাবে ক্লান্ত হয়েছিলেন যেন। চন্দ্রকান্ত দেখেছিলেন, বালুতীরের শেষে নিবিড় বনরেখা। আর যেন জমিদার কৃষ্ণরামের ভগ্ন-আলয়! জল থেকে ভয়ে ভয়ে তীরে উঠেছিলেন চন্দ্রকান্ত। আসমানের ঘাটে পৌছে ডেকেছিলেন কাকে যেন।

রাত্রি গভীর। অমাবস্যার আঁধার রাত নয়, জ্যোৎস্না প্লাবিত সোনালী রাত, পথে এখন মানুষ চলা দায়।

ডেকে ডেকে কারও সাড়া মিললো না। চন্দ্রকান্ত গৃহ মধ্যে গেলেন। সিঁড়ির কাছাকাছি আবার ডাকলেন! বিন্ধ্যবাসিনীর ব্রাহ্মণী পরিচারিকার নামটি তাঁর জানা ছিল। সেই নাম ধরে ডাক দিলেন। বাতাসে ভেসে গেল সেই ডাক বৈশাখের এলোমেলো বাতাসে।

তবুও সাড়া মিললো না। চন্দ্রকান্ত অনুমানে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চললেন। দোতলায় উঠে দেখলেন, দালানের অদূরে এক কক্ষে যেন আলো জ্বলছে। আলোকে সম্মুখে রেখে চন্দ্রকান্ত এগিয়ে চললেন দালান ধরে।

কক্ষের মুক্ত বাতায়ন দেখা যায়, ঘরের কোণে দীপ জ্বলছে। পরিচারিকা যশোদা ভূমিতে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। রাজকুমারী বিন্ধ্যবাসিনী একমনে পুঁথি পড়ছেন। নকল করতে হবে যথাযথ, তাই পড়ছেন আগেভাগে। বাঙলা অক্ষরে লেখা সংস্কৃত ভাষা পড়ছেন। মহাভারতের আদি পর্ব্ব পড়ছেন।

চন্দ্রকান্ত দালান থেকে ধীর কণ্ঠে ডাকলেন,—যশোদা আছেন?

চমকে উঠেছিলেন রাজকন্যা। কর্ণ কুহরকে যেন বিশ্বাস হয় না। বললেন,—কে?

—আমি চন্দ্রকান্ত। পথে বিপদ হওয়ায় প্রত্যাবর্ত্তনে বাধ্য হয়েছি। চৌধুরাণী অপহৃতা হয়েছে।

মাথায় গুণ্ঠন টানলেন বিন্ধ্যবাসিনী। পুঁথি রেখে উঠে পড়লেন। ডাকলেন,—যশো! যশোদা।

চন্দ্রকান্ত আবার কথা বললেন,—ম্যালেট সাহেব চৌধুরাণীর মাঝি-মাল্লাদের হত্যা করেছে। চৌধুরাণীকে জীবন্ত না মৃত অপহরণ করলো, তা জানি না।

বিন্ধ্যবাসিনী যেন ভয়ার্ত্ত হন। আবার ডাক দেন। বলেন,—কি সৃষ্টিছাড়া ঘুম। যশোদা—আ—আ।

ব্রাহ্মণীর ঘুম ভেঙ্গে যায় আচমকা। ডাকাত পড়েছে যেন, তেমন আশঙ্কা তার মুখে। ঘুম জড়ানো চোখ। বললে,—কি হয়েছে? চেঁচাও কেন?

—আনন্দকুমারী আর নেই। চুরি করেছে তাকে। ভয়ে ভয়ে ফিসফিস কথা বললেন বিন্ধ্যবাসিনী। বললেন,—চন্দ্রকান্ত এসেছেন। দালানে আছেন। যাও শোন তাঁর মুখে। কি হবে যশোদা?

—কি আবার হবে। কথা শুনে খেঁকিয়ে উঠলো যেন পরিচারিকা। বললে,—যেমন মেয়ে সে, ঠিকই হয়েছে। মেয়ে তো নয় যেন মর্দ্দা।

কথা বলতে চলতে যশোদা ঘরের বাইরে বেরোয়। দেখা দেয়! চন্দ্রকান্ত বললে,—ব্রাহ্মণী, আজকের রাতের মত নীচের এক ঘরে আমাকে আশ্রয় দাও।

যশোদা বললে,—বেশ কথা। তাই চল। বেণের মেয়েকে সায়েব চুরি করলে?

—হাঁ, তাই তো মনে হয়। কথা বলতে বলতে পরিচারিকাকে অনুসরণ করেন চন্দ্রকান্ত।

রাজকুমারীর বুক কাঁপতে থাকে যেন। বিন্ধ্যবাসিনী শিউরে শিউরে ওঠেন। চোখে আর পাতায় এক হয় না রাজকুমারীর।

তন্দ্রা আসে, দেহ অবশ হয়, কিন্তু আঁখি পাতে ঘুম নামে না। শয্যায় আশ্রয়, তবুও অধিকক্ষণ স্থির থাকতে পারেন না। কত-শত দুশ্চিন্তায় মন চঞ্চল হয় থেকে থেকে। ভয়-ভাবনায় বুকে কম্পন লাগে। চোখের দৃষ্টি চলে না ঘন অন্ধকারে, যার চোখ আছে তাকেও অন্ধ সাজতে হয়। কক্ষমধ্যে যেন সীমাহীন আঁধারের বিস্তার। রাজকুমারীর যুগল চোখের ব্যর্থ দৃষ্টিতে কিছুই ধরা পড়ে না। ভয়ের শ্বাস পড়ে ঘন ঘন। দুঃখের এই তিমির রাত কখন পোহাবে কে জানে! আনন্দকুমারীর জন্য থেকে থেকে মনটা যেন আনচান করতে থাকে। মেয়েকে হারিয়ে চৌধুরীমশাই কি করবেন কেউ বলতে পারে না। একমাত্র মেয়ে, চোখের মণি, আদরের দুলালী। চৌধুরী হয়তো বুকে শেলের আঘাত পাবেন। সহ্য করতে পারবেন না। তন্দ্রার আবেশ আর দুর্ভাবনায় বিন্ধ্যবাসিনী জড়সড় হয়ে থাকেন। রাজকুমারী যেন চমকে উঠলেন সহসা, এক মুক্ত বাতায়নে চোখ পড়তেই। দেখলেন আলোর আভাষ। বাইরে কার চোখ এমন জ্বল-জ্বল করছে আগুনের ফুলকির মত! জ্বলন্ত অঙ্গারের টুকরো যেন, দানবের চোখের মত!

চোখ কর-কর করে। চোখের পাতা জলে ভারী হয়ে থাকে। মনের কষ্ট আর বুকের ব্যথায় পৃথিবীর প্রাকৃতিক অস্তিত্বকে যেন ভুলে গেছেন আজকের রাতে। তারায় দীপ্ত একফালি আকাশ দেখে ভয়ে যেন আড়ষ্ট।

আর যেন ভাবতে পারছেন না রাজকন্যা। শয্যায় উঠে বসলেন চোখে আঁচল চেপে। কেমন ভয়-ভয় করে কালো অন্ধকারকে। মনে রামনামের মন্ত্র জপ করেন। অন্ধকারের অদৃশ্য বাহুর আলিঙ্গন অনুভব করেন যেন। ইতি-উতি দেখেন, শুধু আঁধার আর আঁধার। আলোর চিহ্ন নেই কোথাও। মুক্ত বাতায়ন থেকে শুধু অনেক দূরের আকাশ দেখা যায়। দানবের চোখের মত তারা জ্বলছে দপ দপ। যেন ডাকছে চোখের ইসারায়।

পরিচারিকা বাইরের দালান থেকে হঠাৎ কথা বললে চাপা কণ্ঠে। বললে—বৌ, তুমি জেগে আছো নাকি? ঘুমাও নাই এখনও?

বিন্ধ্যবাসিনী যেন আশার আলো দেখলেন চোখে। মিহি সুরে বললেন,

—না গো না। ঘুম কি আর আছে এ পোড়াচোখে! রাতটা জেগেই কেটে যাবে হয়তো। খানিক থেমে আবার বললেন,—চন্দ্রকান্ত থাকলেন না চলে গেলেন এই গভীর রাতে?

—থাকলেন গো, থাকলেন। যশোদা কথা বললে ঘুম-জড়ানো সুরে। বললে,—নীচের তলায় মাঝের ঘরে আছেন তিনি। বলছেন যে, সূর্য্য উঠলেই চলে যাবেন।

—অনাহারে থাকলেন? রাজকন্যার স্তিমিত কণ্ঠ।

যশোদা হয়তো ঘুমে কাতর। একটু যেন বিরক্ত হয়। বলে,—আমি ফল মিষ্টি দিয়ে এসেছি। খায় খাবে, না খায় না খাবে।

স্বস্তির শ্বাস ফেললেন রাজকুমারী। আকাশের তারা দেখতে থাকলেন। পরিচারিকার কথা শুনে যেন ভয়কে জয় করলেন এতক্ষণে।

ফেউ ডাকছে কোথায়, অনেক দূরে। বাঘ বেরিয়েছে হয়তো জঙ্গলের ঝোপ থেকে। মান্দারণের আকাশ কেঁপে কেঁপে উঠছে বন্যপশুর আর্ত চীৎকারে। খোলা জানালা থেকে সেই বিকট শব্দ ভেসে আসছে হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে।

—আনন্দকুমারীর জন্যে বড্ড কষ্ট হচ্ছে যশো! সে এখন কোথায় কে জানে!

ঘরের মধ্যে থেকে কথা শোনা যায় অস্ফুট শব্দে। সহানুভূতির কাতর সুরে। ঘুম আসে আর বাধা পড়ে। তন্দ্রা ছুটে যায়। যশোদা নীরব থাকতে থাকতে বললে,—কোথায় আবার! ম্লেচ্ছ অজাত কুজাতের আদর খাচ্ছে এখন। সায়েবের বিবি হয়েছে। শাড়ী ছেড়ে ঘাগরা পরেছে হয়তো। কত অখাদ্য-কুখাদ্য খাচ্ছে কে জানে!

—চৌধুরীমশাইয়ের তরেই যত ভাবনা!

আপন মনে কথা বলেন বিন্ধ্যবাসিনী। কেমন যেন চিন্তাকুল সুরে। বললেন—চৌধুরীমশাই হয়তো আর বাঁচবেন না। গণ্ডায় গণ্ডায় ব্যাটা-বেটী তো তাঁর নেই, ঐ একজনই ছিল। তাকেও হারালেন এই শেষ বয়েসে।

—যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল পেয়েছে চৌধুরীর মেয়ে। যশোদা বললে

রাগের সুরে। ঘুমের জড়তা যেন কথায়। পাশ ফিরে শুয়ে আবার বললে,
—মেয়ে তো মেয়ে নয়, সদাই যেন ঘোড়ায় জিন দিয়ে আছে। মেয়ে-মর্দ্দানী,
ঢেউ-নাচানী—

রাজকন্যা আর কথা বলেন না। ধীরে ধীরে শয্যায় এলিয়ে পড়েন। ঘুম আসে না ; চোখে-পাতায় এক হয় না। নীচের তলায় মাঝের ঘরে চন্দ্রকান্ত আছেন আজ রাতটুকুর মত, ভাবলেও শিহরণ লাগে যেন! এক অব্যক্ত আনন্দের ব্যথা বাজে যেন বুকে। রক্তের ধারায় সুখের নাচন লাগে। কত দিনের সুপ্ত অনুভূতি জেগে ওঠে আজ রাতের অন্ধকারে। কষ্টে জর্জ্জর কাহিল দেহটা যেন বিদ্রোহ করে সহসা। আগুনের জ্বালা ধরে। বুক দুরু দুরু করে। মাথা ঝিম-ঝিম করে।

বাঁধ-বাঁধা নদী বানের জলে ফুঁসতে থাকে! বর্ষাজলে উপচে ওঠে। বিন্ধ্যবাসিনীর ইচ্ছা হয়, এখনই গিয়ে একটি বার দেখে আসেন, দেখা দিয়ে আসেন। চন্দ্রকান্ত ঘুমন্ত না জাগ্রত কে জানে! আসমানে গিয়ে ক'টা ডুব দিয়ে এলে হয়তো দৈহিক শান্তি পাওয়া যাবে।

জমিদার কৃষ্ণরামকে মনে পড়ে রাজকন্যার। কঠিন প্রকৃতির মানুষ তিনি, দয়া-মায়ার ধার ধারেন না। অর্থলোলুপ, টাকা ছাড়া আর কিছুকে চেনেন না। বিন্ধ্যবাসিনীর মত ডাকসাইটে রূপসীকে সমাদর করলেন না কখনও! দূরে সরিয়ে রাখলেন অবহেলায়। আরও দশ জনকে নিয়ে মেতে থাকলেন!

অবাধ্য মন। কি সব এলোমেলো দুশ্চিন্তায় মন অস্থির হয় বারে বারে। রাজকুমারী ধিক্কার দেন নিজেকে। হরিনাম স্মরণ করেন। নিজের কাছে নিজেই যেন লজ্জা পান। জানালার বাইরে আকাশে চোখ তোলেন। দানবের জ্বলন্ত চোখ দেখছে শূন্য থেকে। কয়েকটা ফুটফুটে তারা জ্বলছে আকাশে। শয্যায় কণ্টক যেন, আবার উঠে বসলেন রাজকুমারী।

নীচের তলায় চন্দ্রকান্ত। তিনিও জেগে বসে থাকেন আকাশে চোখ তুলে! আনন্দকুমারী নিশ্চয়ই অপহৃতা হয়েছে, সেই ভাবনায় চন্দ্রকান্ত

অস্থির হয়ে আছেন। নৌকার মাঝি-মাল্লাদেব কেউ মৃত্যু বরণ করেছে, কেউ সাঁতরে পালিয়েছে। চৌধুরীর গৃহে এই দুঃসংবাদ পৌছলে বরাতে কি আছে কে বলতে পারে! চন্দ্রকান্তর নাম জড়িত হবে এই দুর্ঘটনায়। দুর্ণামে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠবে। মান্দারণে বসবাস করা চলবে না আর। 'পথি নারী বিবর্জ্জিতা', শাস্ত্রবচন মনে পড়ে চন্দ্রকান্তর। চৌধুরী-কন্যার আবেদনে সাড়া না দিয়ে চতুষ্পাঠীতে ফিরে যাওয়াই উচিত ছিল। এখন যতক্ষণ না সূর্য্যোদয় হয় ততক্ষণ প্রহর গুণতে হবে। কপালে করাঘাত করতে সাধ হয় বিপাকের জ্বালায়! আমোদরে ঝাঁপ দিয়ে আত্মবিসর্জ্জন করলে হয়তো রক্ষা পাওয়া যাবে। মৃত্যুভয়ে নৌকা ত্যাগ করেছিলেন চন্দ্রকান্ত। এখন যদি সেই মৃত্যু আসে, কলঙ্কের কালি আর গায়ে মাখতে হয় না। বিপত্তারিণীর মন্ত্র উচ্চারণ করেন ব্রাহ্মণ। কক্ষমধ্যে পায়চারী করতে থাকেন বিক্ষিপ্ত মনে। অসহায়া চৌধুরাণীর মুখখানি মনে পড়ে বার বার। ফেউ ডাকছে দূরে কোথায়, নয়তো এই মুহূর্ত্তে চতুষ্পাঠীর উদ্দেশে যাত্রা করতেন।

শুক্লপক্ষ। সোনালী জ্যোৎস্নার স্পর্শ যেন আমোদরের জল-কল্লোলে। জল-সোনা চিক-চিক করছে ঘূর্ণী আর আবর্ত্তে। চাঁদের আকর্ষণে আমোদর যেন আজ উচ্ছ্বসিত, উদ্বেলিত, উল্লসিত।

ম্যালেটের বজরা আমোদরের কিনারায় দাঁড়িয়ে। প্রবাহগতিতে বজরা দুলছে থেকে থেকে। চাঁদের আলো ছড়িয়েছে বজরার পাটাতনে। জানালার বাধা অমান্য করেছে চন্দ্রালোক! ম্যালেটের ব্যাঞ্জোটা যেন সজীব হয়ে উঠেছে সোনালী আলোয়। নীলাভ কাচের ডিকেণ্টার আর পেগ গ্লাস যেন হেসে হেসে উঠছে আলোর খেলায়। বজরার দোলায় রঙীন জল চলকে চলকে উঠছে। জল, কিন্তু বড় বেশী উগ্র আর জ্বালাময়। জল স্নিগ্ধকারী, কিন্তু এ জলে শুধুই উত্তাপ আর উত্তেজনা।

জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, চোখ মেলার সঙ্গে সঙ্গে বুকে হাত দেয় আনন্দ-কুমারী কি যেন মনে পড়লো চৌধুরাণীর, কাঁচুলীর মধ্যে হাত পুরলো। হাতের

পরশে বুঝলো অস্ত্র নেই বুকে। নেই সেই লুকানো ভোজালী। হতাশার শ্বাস ফেললো একটি। চক্ষু মুদিত করলো আবার। জ্ঞান হারালো হয়তো।

অট্টহাসি হাসলো ম্যালেট। বিলাতী মদের নেশা ধরেছে তার। কেমন যেন মাতালের মত হাসলো অসংযমের। অসহায়তার প্রতিমূর্তিকে দেখে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসতে হাসতে আবার ডিকেণ্টারটা তুললো কম্পিত হাতে। পানপাত্রের প্রয়োজন নেই, পানাধার মুখে তুলে ঢকঢকিয়ে পান করলো। লুপ্তজ্ঞান চৌধুরাণীর মুখে ঢাললো আরও খানিকটা। ক্রোধে আর উত্তেজনায় কণ্ঠ শুষ্কপ্রায়, তাই অবচেতন মনের অনিচ্ছায় সে-ও জল খায়। জলে বিস্বাদ, তাই মুখ বিকৃত করলো যেন পানের শেষে।

আনন্দকুমারীর উর্দ্ধাঙ্গে জ্যোৎস্নার প্রলেপ পড়েছে। ম্যালেট মনের আনন্দে দেখে আনন্দকুমারীর সুন্দর মুখশোভা। লাল অধর আর লালাভ মুখ। শিশির পাপড়ির মত টানা-টানা চোখ। কাজলের রেখা। ম্যাডোনার মত টোল-খাওয়া চিবুক। ভিনাসের মত গড়ন গঠন। ম্যালেট দেখলো, এই শায়িতা মূর্তি যেন ইতালী আর স্পেনের ভাস্কর্য্যকে হার মানায়!

মদিরায় জ্ঞান হারাতে হয়। আবার হতজ্ঞান ফিরে আসে নাকি ঐ রঙীন জলে। মৃতপ্রায় নাকি জীইয়ে ওঠে?

চৌধুরাণী আবার চোখ চাইলো ধীরে-ধীরে। চোখের তারা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলো ইদিক-সিদিক। ব্যথা না কষ্টের কাতরতা ফুটলো তার মুখে। ভ্রমরকালো দুই ভুরু নেচে নেচে উঠলো। ম্যালেট হাসি থামিয়ে ডিকেণ্টার নামিয়ে ব্যাঞ্জোটা তুলে নেয়। কালো রঙের বাদ্যযন্ত্র। ম্যালেটের শুভ্র আঙুলের ছোঁয়ায় যন্ত্রের তার কেঁপে-কেঁপে ওঠে। মৃদু-মন্দ সুর ভেসে ওঠে বজরার মধ্যে। গ্রেট-বৃটেনের প্রেম-সঙ্গীতের কি এক মধুমিষ্টি সুর বাজিয়ে চলে গুঞ্জনের সুরে।

চোখ মেলে ম্যালেটকে দেখেই চোখে বাহু রাখলো আনন্দকুমারী। চোখ ঢাকলো। ব্যাঞ্জো বাজাতে বাজাতে ম্যালেট মুখ এগিয়ে নিয়ে যায় তার মুখের কাছাকাছি। চৌধুরাণীর মুখে তপ্তশ্বাস পড়তে সে আর বাধা দেয় না।

হয়তো সাহসে কুলায় না। ব্যাঞ্জোর মিষ্টি সুরে ঘুমিয়ে পড়ে নাকি আনন্দ-কুমারী! ঘুমেরই বা দোষ কি, রাত্রি এখন গভীর।

মান্দারণের পথে-পথে নিশির ডাক বেরিয়েছে। ডাকছে একে-তাকে। নাম ধ'রে ডাকছে। আর দূরে কোথায় ফেউ ডাকছে অবিরত। বাঘ না নেকড়ে বেরিয়েছে হয়তো।

আমোদরের প্রায় কিনারায় ম্যালেটের তাঁবু পড়েছিল। লাল শালুর তাঁবু। ইউনিয়ন-জ্যাক উড়ছিল তাঁবুর চূড়ায়। তেলেঙ্গী সিপাইরা তাঁবু খুলে ফেলছে তাড়াতাড়ি। জিনিষপত্র বজরায় তুলছে। ম্যালেটের পোষাকের বাক্স, আহারের কাচের পাত্র, রান্নার সরঞ্জাম, নেয়ারের খাটিয়া, নথিপত্র, মানচিত্র। মদের বোতলের কাঠের কেশ।

হুকুম দিয়েছে ম্যালেট তাঁবু ওঠাতে। পাততাড়ি গোটাতে। রাতারাতি এই গ্রাম ত্যাগ করতে হবে। আমোদরের জলপথ ধরে দামোদরে পৌছে গঙ্গা নদীতে পৌছতে হবে। তার পর গোবিন্দপুরের উদ্দেশে পাড়ি জমাতে হবে এই রাত-বেরাতে। চুরি করেছে ম্যালেট। কিউপিডের ফুলবানে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে কেমন যেন বেসামাল হয়ে পড়েছিল। চৌধুরাণীকে প্রথম দেখেই প্রেমে পড়ে। পলকে প্রণয়, তাকে-তাকে থেকে আজ রাতের অন্ধকারে শিকারকে হাতের নাগালে পেয়েছে ম্যালেট। তার সভ্য মন চৌর্য্যবৃত্তিতে বিষিয়ে উঠেছে। স্বর্গের এক দেবীকে পেয়েছে যেন সে। তার জীবন-সঙ্গিনীকে পেয়েছে।

—মাই ডার্লিং!

অস্ফুটে বললে ম্যালেট। প্রিয়তমাকে ডাকলো নম্রকণ্ঠে। আনন্দ-কুমারীর চিবুক ধ'রে মুখ তুললো।

চৌধুরাণী সাড়া দেয় না। চোখ থেকে হাত সরিয়ে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকায়। অসহায় মুখভঙ্গী যেন। শুক্লা-রজনীর চাঁদের আলোয় মুখখানি তার আরও যেন সুন্দর দেখায়। শুভ্র দেহবর্ণ যেন শুভ্রতর হয়েছে। শ্বেত-চন্দন মেখেছে যেন আনন্দকুমারী।

—মাই বিলাভেড !

আবার কথা বললে ম্যালেট। ব্যাঞ্জো বাজিয়ে বাজিয়ে ডাক দেয় প্রেমিকের মত। ঠোঁটের কোণে খুশীর হাসি ফুটেছে। ভারী মিষ্টি এক সুর বাজিয়ে চলেছে পাকা হাতে। বজরার মধ্যে যেন এক স্বপ্নরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে।

শিউরে শিউরে ওঠে আনন্দকুমারী। ভয়ে যেন কেঁপে-কেঁপে ওঠে। রাঙা অধর থরথরিয়ে কাঁপতে থাকে। হাত দু'খানি যেন ঠাণ্ডা হয়ে আছে বরফের মত। রক্ত যেন হিম হয়ে গেছে।

গ্রেট বৃটেন থেকে ভারতবর্ষে এসেছে ম্যালেট ভূ-বিদ্যায় দক্ষতা অর্জ্জনের পর। ইংরাজের পক্ষ থেকে বাঙলা দেশের জল আর স্থলভাগ জরীপ করতে এসেছে। রিপোর্ট তৈরী করছে পাতার পর পাতা। কোম্পানীর কাছে দাখিল করতে হবে লিখিত ফলাফল। শুধু লেখালেখির কাজ নয়, আঁকা-আঁকির কাজ। চিত্র, রেখা, লেখা চিহ্ন আঁকার কাজ। দেশের মানচিত্র আঁকছে ম্যালেট। দেশের বায়ুমণ্ডল পরীক্ষা করছে, আবহাওয়া লক্ষ্য করছে,। কোথায় গ্রীষ্ম, কোথায় হিমমণ্ডল, কোথায় নাতিশীতোষ্ণ। মৌসুমী হাওয়া বইছে কোথায়। অঞ্চল আর নদীগর্ভ দেখছে। কোথায় সম, কোথায় ঢাল আর কোথায় অতল! পরীক্ষ-চালনার যন্ত্রপাতি সঙ্গে এনেছে ম্যালেট। জ্যামিতিক যন্ত্র।

ফ্যাল-ফ্যাল তাকিয়ে থাকে চৌধুরাণী। মুমূর্ষুর মত, মরণাপন্ন রোগিণীর মত শূন্য দৃষ্টি চোখে। মধ্যরাতের স্নিগ্ধ হাওয়ায় তার রুক্ষ চূর্ণকুন্তল নেচে নেচে ওঠে। চাঁদের আলো আর কাজলের কালোয় চোখ দু'টি থেকে থেকে যেন স্পষ্ট হতে থাকে। আঁটসাঁট কাঁচুলীর জরি চিক্ চিক্ করে। আসমানী ঢাকাই শাড়ী, লাট হয়ে গেছে চাপাচাপিতে, ধ্বস্তাধ্বস্তিতে, তবুও ম্লান হয়নি। অনেক অলঙ্কার পরেছিল আনন্দকুমারী। চুড়ি, কাঁকণ, তাবিজ কাঁচা সোনার চুণী মুক্তার ঝালরের ঝুমকো। মুক্তার একনরী হার। মেদভারী নিতম্বে মেখলা। পায়ে নূপুর। এখন একটিও অলঙ্কার নেই শরীরে, নিরালঙ্কারা একেবারে। তবুও রূপ ঝলসে ওঠে তার, লাবণ্য ঠিকরোয় সোনালী আলোয়।

ব্যাঞ্জো হঠাৎ থামিয়ে ফেলে ম্যালেট। হঠাৎ দেখতে পায় যেন তার প্রেয়সীর চোখের কোণে জলের বিন্দু টলমল করছে। দু' টুকরো কমলহীরা যেন জলজলিয়ে উঠছে। ব্যাঞ্জো নামিয়ে রাখে ম্যালেট। বিরস ভূ-বিত্তার দক্ষ ম্যালেট বিজ্ঞানের ছাত্র ছিল একদা—কিন্তু মন নাকি তার রসসিক্ত। চাঁদের আলোয় তারের যন্ত্র বাজায়! স্পেন আর হাওয়াই দ্বীপের গানের সুর জানে সে। জাজ থেকে ওয়ালজ কিছুই তার অজানা নয়। সেই আদিম যুগের মনুষ্য জাতির দেহ-সৌন্দর্য্য ধরা পড়ে তার বৈজ্ঞানিক চোখে। প্রেম-প্রীতির সূক্ষ্ম অনুভূতি আছে না কি মনের কোণে।

ম্যালেট সহানুভূতির সুরে কথা বলে। চৌধুরাণীর একটি নরম হাত নিজের হাতের মুঠোয় ধরে। বলে,—মাই ডিয়ারেষ্ট! হোহাই ডু ইউ ক্রাই!

আমার প্রিয়তমা, তুমি কাঁদো কেন? ম্যালেটের আবেগভরা কথা যেন বোধগম্য হয় না চৌধুরাণীর! আবার ধীরে ধীরে চোখ বন্ধ করলো। জলের ধারা নামলো দুই চোখ থেকে। দু' ফোঁটা রূপা গড়ালো যেন লালচে গালে।

ম্যালেট অনুমানে হয়তো বুঝতে পারে। প্রেয়সীর মনে ব্যথা লেগেছে। আত্মীয় আর স্বজনদের ছেড়ে আসার দুঃখ বেজেছে বুকে। বিয়োগে কাতর হয়েছে। ভয় পেয়েছে হয়তো এক বিজাতীয়কে দেখে। এতক্ষণে হয়তো তার ঠাওর হয়েছে যে, সে এখন বন্দিনী এক বিদেশী প্রেমিকের বাহুবন্ধনে! সেই হিমশীতল মৃত্যু না আসা পর্য্যন্ত আর মুক্তি নেই।

চোখ ছলছলিয়ে ওঠে ম্যালেটের। কি যেন বকতে থাকে বিড়বিড়িয়ে আবৃত্তির ঢঙে। ফরাসী ভাষায় কাব্য আওড়ায় গুঞ্জনের সুরে। বহুকাল আগের এক কবির প্রেমের কবিতা ব'লে যায় নিজের মনে। পীয়েরে দে কবিয়াকের লেখা কবিতা বলে। সেই কবিতার ইংরাজীরূপ নিম্নরূপ—

"Lady, queen of the angels,

Hope of believers,

Since sense commandeth me

I sing of you in the "lenga romana,"

For no man, just or sinner,
Should keep from passing you,
As his wit befits him.
Be it in "roman" or in lenga "latina",
Lady, rose withhut thorns,
Fragrant above all flowers,
Dry branch giving fruit,
Land that gives grain without labor," * * *

সিপাইরা বজরায় মাল তুলছে। কাঠের বাক্স তুলছে আর রাখছে। তাদের পদাঘাতে জলযান দু'লে উঠছে থেকে থেকে। তেলেঙ্গী সিপাইরাও যেন আনন্দে উল্লসিত হয়ে পড়েছে আজ। লুঠের মাল পেয়েছে তারা চৌধুরাণীর নাগমুখী পত্রপুটা থেকে। সোনা-দানা পেয়েছে অনেক। সিপাইরা হাসা-হাসি করছে খুশীর প্রাবল্যে। তাদের মনিব, তাদের সাহেব, বিবি পেয়েছে মনের মত। রূপবতী এক নাগরীকে পেয়েছে এই বনজঙ্গলের দেশে। পাঁকের মধ্যে থেকে পেয়েছে একটি প্রস্ফুটিত লালপদ্ম, যেমন তাজা তেমনই গন্ধময়। সিপাইদের কলহাস্যের সঙ্গে আমোদরের কুলু-কুলু ধ্বনি এক হওয়ায় নদীর তীর যেন এক অস্থির চাঞ্চল্যে নাচানাচি করতে থাকে। রাত্রির স্তব্ধতা ভেঙ্গে খান খান হয় বিশৃঙ্খলায়।

আনন্দকুমারী আবার চোখ মেলে। সজল আঁখিতে মানসিক যন্ত্রণা প্রকাশ পায়। তার শরীরে যেন জ্বরের সন্তাপ। মধ্যরাতের হিমহাওয়া চৌধুরাণীর ললাট স্পর্শ করে। বজরার জানালা থেকে একবার আকাশে চোখ ফেরায় সে। নিশীথ আকাশে অজস্র নক্ষত্রাবলী দেখা যায়। সজল মেঘমালার আড়ালে অদৃশ্য হয় আবার দেখা দেয় তারার ঝিকিমিকি।

ম্যালেটের চোখে অনুরাগের আবেশ। কবিতা আবৃত্তির শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের হাত থেকে একটি আঙটি খুলে আনন্দকুমারীর ডান

হাতের আনামিকায় পরিয়ে দেয়। অনিচ্ছা, বাধা দেয় না চৌধুরাণী, মুখখানি শুধু একবার বিকৃত করে। আঙটিতে যীশুর ক্রুশ চিহ্ন।

বজারার অভ্যন্তরে তেলের লণ্ঠন জ্বলছে। ক্ষীণ আলো লণ্ঠনের। সেই আলোয় আনন্দকুমারী দেখলো একবার ম্যালেটকে। লুণ্ঠনকারীকে দেখলো যেন বিরাগের চাউনিতে। দেখলো, সে দেখতে অতি সুপুরুষ। তার শরীর নাতিদীর্ঘ। বক্ষ বিশাল, সর্ব্বাঙ্গ অস্থিমাংসের উপযুক্ত সংযোগে সুন্দর। বর্ণ যেন তপ্তকাঞ্চনের মত শুভ্রলাল ; ললাট অতি বিস্তৃত ; নাসিকা উন্নত ; চক্ষুর্দ্বয় যেন অসাধারণ ঔজ্জ্বল্য-সম্পন্ন। মুখকান্তিতে জ্ঞানগাম্ভীর্য। মাথার কেশ সোনালী।

আনন্দকুমারীর কুসুমকোমল করপদ্ম ম্যালেটের হাতের মুঠোয় পিষ্ট হ'তে থাকে। ম্যালেট কি যেন বলতে চায়, কিন্তু মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে না। তার প্রেমাস্পদ যে বিদেশী, ভাষা তার সে জানে না।

অজ্ঞান অবস্থায় চৌধুরাণীও অনেকটা জল পান করেছে। ডিকেন্টারের রঙীন পানীয়। বিলীতি মদ খেয়েছে জলের মত, নিজের অজ্ঞাতে। কি মনে পড়তে, সহসা উঠে বসলো আনন্দকুমারী। ইদিক-সিদিক দেখতে দেখতে আবার কাঁদতে থাকে অঝোরে। চোখে আঁচল চাপালো মনের দুঃখে।

ম্যালেট লজ্জা পায় যেন তার কান্না দেখে। বলে,—মাই ডার্লিং! মাই বিলাভেড!

তোমার মুখে ঝাঁটা! হঠাৎ কথা বললে চৌধুরাণী। ক্রোধান্ধের মত বলে,—পাষণ্ড, তুমি মর, তোমার মুখে আমি আগুন দেবো।

ম্যালেট বাঙলা ভাষা বোঝে না। অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে। বাইবেল গ্রন্থখানি দেখছে ম্যালেট। পেয়েছে আনন্দকুমারীর পত্রপুটা থেকে। ভেবে ভেবে ম্যালেট আবার কথা বলে,—হু ইজ চন্দ্রকাণ্ট? চন্দ্রকাণ্ট কৌন হায়?

—আমার স্বামী। তোমার যম!

তেজোদীপ্ত কথার সুর আনন্দকুমারীর। রাগের ভঙ্গিমা মুখে

মাথা চাপড়ায় ম্যালেট। তার প্রিয়ার কথা বোঝে না, সেই অন্তবেদনায়।

বজরার দুয়োরে একজন সিপাই দেখা দেয় সশরীরে। আলকাতরার মত কালো রঙ তার। চাঁদের আলোয় সিপাইদের সাদা দাঁতগুলি স্পষ্ট দেখা যায়। আর তার চোখের সাদা অংশ। সিপাই ইশারা আর ইঙ্গিতে কি যেন বলে যায়।

তার বক্তব্য শেষ হ'লে ম্যালেট বললে,—অল রাইট, লেট আস্ ষ্টার্ট ফর রিভার ডামোডর!

সিপাই ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয়, মালামাল বজরায় ওঠানোর কাজ শেষ হয়ে গেছে, কিছুই আর বাকী নেই। এখন হুকুম পেলেই হুকুম মত যাত্রা করা যেতে পারে।

ম্যালেট তাই বললে,—তথাস্তু, এখন দামোদর নদীর উদ্দেশে যাত্রা করা হোক।

বজরা সচল হয় আবার। মাঝিরা দাঁড় ফেললো নদীর জলে। সিপাইরা মাঝি-সর্দ্দারকে ব'লে দিয়েছে গন্তব্য কোথায়। কোন পথে এগোতে হবে।

নেশা ধরেছে কি! আনন্দকুমারীর মুখভাবে যেন নেশার উত্তেজনা। জলভরা চোখে যেন নেশাতুর দৃষ্টি। অঙ্গ অবশ হয়ে আছে। লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোকে চৌধুরাণী দেখলো তার অনামিকায় এক স্বর্ণাঙ্গুরীয়। দেখা মাত্র আঙটি খুলে ফিরিয়ে দিলো সক্রোধে। অসম্মতি প্রকাশ করলো মুখভঙ্গীতে। বজরা এগিয়েছে নদীর মাঝ বরাবর। দাঁড় টানার শব্দ খেলছে জলে। রাশি রাশি সোনার ঢেউ খেলছে যেন।

কি খেয়াল হয় কে জানে, আনন্দকুমারী উঠে দাঁড়ালো। দেহ যেন তার টলছে। বজরার দোলায় না নেশায় বোঝা যায় না যেন। কক্ষ থেকে বেরিয়ে পাটাতনে যায় টলটলায়মান অবস্থায়। ইতিউতি দেখে চোখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে। বজরা গজেন্দ্র গমনে আগুয়ান। মান্দারণকে পাশে ফেলে এগিয়ে চলেছে। চোখে আবার আঁচল চাপলো চৌধুরাণী। নেশাচ্ছন্ন হ'লে কি হয়, তার মনে পড়ে চৌধুরীমশাইকে, মনে পড়ে তার স্নেহময়ী মাকে। জমিদারণী

বিন্ধ্যবাসিনীকে আর চন্দ্রকান্তকে মনে পড়ে। সারা মান্দারণ যেন চোখে ভেসে ওঠে। দরদর অশ্রুপাত হয় তার চোখ থেকে। চৌধুরাণীর ইচ্ছা হয়, আমোদরের জলে ঝাঁপ দেয়। জ্বালা জুড়ায়। এক ম্লেচ্ছর জীবনসঙ্গিনী হওয়ার চেয়ে মৃত্যু বরণ শ্রেয়ঃ। সত্যিই জলে ঝাঁপ দিতে উদ্যোগী হয় আনন্দ-কুমারী। কিন্তু পিছন থেকে কে যেন তাকে জড়িয়ে ধরলো হটাৎ। পুতুলের মত তাকে টেনে নেয়। বুকে তুলে নেয় সজোরে। ম্যালেট ধরেছে তাকে। হসেছে মৃদু মৃদু।

সিপাইরা সেই দৃশ্য দেখে একসঙ্গে হেসে ওঠে অট্টহাসির স্বরে। জ্যোৎস্নাশুভ্র রাত্রিও যেন খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো। আমোদরের জলতরঙ্গ, তারাও বুঝি হাসলো।

ভোর-রাত্রে তন্দ্রা নেমেছে চোখে। গভীর সুখনিদ্রা নয়, ঘুমের আমেজ।

আলো জাগার আশায় এক মুক্ত জানলার ধারে যেন প্রতীক্ষায় বসেছিলেন চন্দ্রকান্ত। বিনিদ্রায় রাত্রি যাপন করবেন, এই ছিল প্রতিজ্ঞা। রাত্রির শেষাশেষি সেই অবাধ্য ঘুম নামলো চোখে। ক্লান্তি আর অবসাদে নিজের অজ্ঞাতেই যেন কখন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। চিন্তা আর তন্দ্রার দ্বন্দ্বযুদ্ধে, প্রথমারই জয় হয়। চন্দ্রকান্ত চোখ মেলতেই দেখলেন আকাশের এক প্রান্তে যেন আলোর চিকণ। সাদা আর লাল রঙ যেন ছড়িয়ে আছে এখানে-সেখানে। অদৃশ্য শিল্পী যেন এই দুই রঙের রেখা টেনেছে আকাশের পটভূমিতে। পাখী ডাকছে গাছে গাছে। কাক আর শালিক। ঘুম-ভাঙা ডাক ডাকছে।

আসমানের তীর থেকে এক ঝলক বাতাস উড়ে আসে। কনকচাপার সৌরভ ভাসিয়ে আনে। আলো ফুটলো, পাখী ডাকলো, ফুল ফুটলো—তবুও খুশী হলেন না চন্দ্রকান্ত! চোখে ভয়ার্ত্ত দৃষ্টি তাঁর।

এমন সময়ে মনুষ্যকণ্ঠের অস্পষ্ট কলরোলে শুনলেন যেন কানে। একদল

মানুষ যেন যুদ্ধ করতে চলেছে। মত্তকণ্ঠে চিৎকার করছে থেকে থেকে। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া কেঁপে উঠছে যেন কলধ্বনিতে।

দিগন্তের আলোকপরিধি ধীরে ধীরে বর্দ্ধিতায়তন ও উজ্জ্বলতর হ'তে থাকে। কক্ষের জানলা থেকে দেখা যায় খরস্রোত আমোদরের জলরাশিতে যেন লালের আভা।

চন্দ্রকান্ত সহসা দেখলেন, এক গগনচুম্বী তালগাছের শীর্ষ দুলে উঠলো। গাছের পাতার মর্ম্মরধ্বনি শোনা যায়। চন্দ্রকান্ত দেখেন, গাছের চূড়া থেকে এক জোড়া শকুনি উড়লো। তাদের চাঞ্চল্যে গাছটী নড়ল, উড়তে উড়তে নদীর তীরে তারা নামলো। হয়তো তৃষ্ণায় কাতর হয়েছে, নদীর জল পান করবে তাই। চন্দ্রকান্ত আবার দেখলেন, আমোদরে তীরে একটি শবদেহ প'ড়ে আছে। কোথা থেকে ভাসতে ভাসতে এসেছে কে জানে! ব্রাহ্মণের স্মরণে আসে কাল রাত্রির ঘটনা! চৌধুরাণীর পত্রপুটার মাঝিদের একজন হয়তো, মৃত অবস্থায় নদীর চড়ায় আটকেছে। ম্যালেটের বন্দুকের বারুদের জ্বালা সহ্য করতে পারেনি আর। শকুনিদের মোচ্ছব চলবে আজ, ঐ দেহকে ঘিরে। যাই হোক, চন্দ্রকান্ত আরও যেন ভীত হলেন। মনুষ্যকণ্ঠের চিৎকার যেন নিকটতর হয়।

কক্ষের এক দুয়ারে মৃদু করাঘাত হয়। চমক লাগে যেন। চন্দ্রকান্ত অস্ফুট স্বরে সাড়া দেন। বলেন,—কস্ত্বং? কে তুমি?

—আমি রাজকুমারী বিন্ধ্যবাসিনী।

জমিদারপত্নীর কথায় মিষ্টি সুর, কিন্তু যেন ঈষৎ ভীত কণ্ঠ! দুয়ারে আবার করাঘাত পড়ে। পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক জোরালো আঘাত।

অগত্যা চন্দ্রকান্ত বদ্ধ দ্বারের অর্গল মোচন করলেন। দ্বার মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখলেন এক দৈবী মূর্ত্তি যেন। লজ্জানম্র, কিন্তু যেন কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন। ব্রাহ্মণ দেখলেন ভোরের আলো-আঁধারে, রমণী সুন্দরী বটে। সৌন্দর্য্যের সকল সুলক্ষণ যেন ঐ দৈবমূর্ত্তিতে একত্র দেখা যায়। রাজকন্যার পরিধানে লাল পাড় পট্টবস্ত্র। মাথায় অল্প গুণ্ঠন। আলুলায়িত কেশরাশি তৈলহীন ও রুক্ষ। বিশাল চক্ষুর দৃষ্টিতে যেন বিশেষ উদ্বেগ।

—কিছু বক্তব্য আছে কি ?

চন্দ্রকান্ত বিস্ময় থেকে যেন মুক্ত হয়ে প্রশ্ন করলেন। বললেন,—এত কলরোল কেন ? কাদের এই চিৎকারধ্বনি ?

বিন্ধ্যবাসিনী গুণ্ঠন টানলেন আরও। সীমন্ত থেকে কপালে। বললেন, আপনি অবিলম্বে এই স্থান ত্যাগ করুন। বিপদের আশঙ্কা, তাই এই অনুরোধ। চৌধুরীমশাইয়ের লেঠেলরা এসেছে আনন্দকুমারীর খোঁজে। তাদের প্রত্যেকেই অস্ত্রসজ্জিত। কথা বলতে বলতে ক্ষণেক থেমে বললেন,—হয়তো এই ভগ্নপুরী তল্লাস করতে চায়।

বক্ষ ঘন ঘন স্পন্দিত হতে থাকে চন্দ্রকান্তর। আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় কিংকর্ত্তব্য স্থির করতে পারলেন না। বলেন বিচলিত স্বরে,—আমার তো সমূহ বিপদ ! আপনি যেন না বিপন্ন হ'ন, এই প্রার্থনা জানাই।

নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে আছেন রাজকুমারী। উদ্বেগের উপশম হয় যেন ; মৃদু হাসির সঙ্গে বিন্ধ্যবাসিনী বলেন,—আমার আর বিপদ কি ? আমি তো সর্ব্বহারা। মৃত্যুকে ভয় করি না। দুঃখ পাই আনন্দকুমারীর কথা ভেবে। সে সত্যই আপনাকে—

—বিদায়। বললেন চন্দ্রকান্ত। কথার শেষে আর একবার যেন দেখলেন রাজকন্যাকে। বললেন,—হয়তো আর সাক্ষাৎ হবে না কখনও। অনাগত ভবিষ্যতে কি দশা হবে জানি না। বিদায় !

বিন্ধ্যবাসিনী আর বাক্যব্যয় করেন না। অপলক চোখে চেয়ে থাকেন। ব্রাহ্মণ বিদায় কালে দেখলেন, রাজকন্যার চক্ষু অশ্রুসিক্ত। ছলছল আঁখিপ্রান্ত। বস্ত্রাঞ্চলে চোখ ঢাকলেন বিন্ধ্যবাসিনী।

আসমানের ঘাটে পৌঁছে চতুর্দ্দিক একবার নিরীক্ষণ করেন চন্দ্রকান্ত। পরমুহূর্তেই আসমানের জলে ঝাঁপ দিলেন। দীঘির জল আলোড়িত হয়ে ওঠে সশব্দে।

ঐদিকে কৃষ্ণরামের ভগ্নপুরীর সমুখে এক ক্ষুব্ধ জনতা জমায়েৎ হয়েছে। তারা যেন ক্রুদ্ধ, ক্ষিপ্ত। অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। কারও হাতে তৈলাক্ত লাঠি,

কারও হাতে বর্শা, কারও হাতে ভল্ল। প্রথম সূর্য্যালোকের রূপালী কিরণে অস্ত্রসমূহ আলোকচ্ছটা ছড়ায়।

আঁচলে চোখ মুছে মুছে চোখ দু'টি ঘোর লাল হয়ে ওঠে। বিন্ধ্যবাসিনী এত বিপদেও ধৈর্য্যহারা হন না। শুধু অশ্রুপাত হয় তাঁর। অবাধ্য ক্রন্দনের বেগ যেন সামলাতে পারেন না কোন মতে। আবার চোখ মুছলেন। তারপর ধীরে ধীরে দ্বিতলে গেলেন। সোপানশ্রেণী অতিক্রমণের ক্লান্তিতে ঘন ঘন শ্বাস ফেলতে ফেলতে দ্বিতলের ছাদে গিয়ে দেখা দিলেন জনতাকে। ফটক তোরণের একদিকে একা পাঠান প্রহরী, অন্যদিকে প্রায় বিশ-পঁচিশ জন কৃষ্ণকায় মানুষ। তাদের হাতে হাতে উদ্যত অস্ত্র। তাদের কণ্ঠ শোনা যায়, কিন্তু ভাষা বোঝা যায় না এত দূর থেকে।

পাঠান প্রহরী, বন্দুক উঁচিয়ে আছে। সাফ কথা জানিয়ে দিয়েছে প্রহরী, জনতা আর এক পা এগোলেই বন্দুক দাগবে সে।

গৃহের ছাদে গৃহকর্ত্রীকে দেখে জনতা আবার চিৎকার করলো। প্রহরা দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখলো জমিদারনন্দিনীকে। বিন্ধ্যবাসিনী সঙ্কেতে ডাকলেন প্রহরীকে। ভোরের হাওয়ায় রাজকন্যার রুক্ষ এলো চুলের রাশি উড়ছে কৃষ্ণপতাকার মত।

পাঠান ছুটতে ছুটতে আসে। আরবী ঘোড়ার মত লাফাতে লাফাতে আসে যেন। পর পর ক'টা কুর্নিশ ঠুকে বলে,—বন্দেগী বেগমসাহেবা! হুকুম দেন, কাফেরের বাচ্চা ক'টাকে বন্দুকের তোপে বেহেসতে পাঠিয়ে দিই।

গুণ্ঠনে ঢাকা মাথা দোলালেন জমিদারণী। অসম্মতি জানালেন। বললেন,—না, বন্দুক নামিয়ে রাখো। ওদের আসতে দাও। আমিই কথা বলবো ওদের সঙ্গে।

—বরখিলাপি বরদাস্ত করবো না বেগমসাহেবা! লৌহ শিরস্ত্রাণে লুকানো মুখ থেকে কথা ভেসে আসে পাঠান প্রহরীর।

—ওদের বক্তব্য আগে শুনতে দাও। ওদের বাধা দিও না তুমি। ছাদ থেকে কথা বলেন বিন্ধ্যবাসিনী। মনিবানী হুকুমের সুরে কথা বলেন না,

বরং বিনম্র স্বরে বলেন,—বিপদে পড়েছে ওরা, তাই এসেছে। ওদের মেয়ে যে হারিয়ে গেছে !

আবার কুর্নিশ ঠুকে প্রহরী একবার, দু'বার, তিনবার। টাটু ঘোড়ার মত ছুটতে ছুটতে এগোয় ফটকের দিকে। তার নাগরার নাল খটাখট শব্দ তোলে।

একদল বাগদী। মিশ কালো রঙ, পেশীবহুল বলিষ্ঠ আকৃতি। মাথায় ঝাবরি চুল। খাটো কাপড় এঁটে বাঁধা। কোমরে কোমরে লাল গামছা জড়ানো। বাঙলা দেশের লড়াইয়ে জাতের মধ্যে বাগদীদের নামডাক খুব। বন্দুকের বারুদ আর কামানের তোপকেও ভয় করে না। সামনাসামনি লড়তে পারে, আবার গুপ্তযুদ্ধেও ওয়াকিবহাল। বাঙলার নবাবরা পর্য্যন্ত তাদের সাহায্য চান মধ্যে মধ্যে। মাইনে দিয়ে পোষেণ, শত্রুদের সায়েস্তা করতে।

ওদের দলকে দল এগিয়ে আসে দ্রুত পদক্ষেপে। ছাদের পরে প্রতিমার মত এ নারী মূর্তিকে দেখে হাতের অস্ত্র নামিয়ে নেয় সসম্ভ্রমে। মন্দিরের চূড় দেখছে যেন, চোখে চোখে দৃষ্টি উঁচিয়ে আছে তেমনি।

রাজকুমারী মিহি মিষ্টি স্বরে বলেন,—তোমরা কি আনন্দকুমারীর খোঁজে এসেছো ?

দলের সকলে একই সঙ্গে বলে,—হাঁ হুজুরণী !

—রাতে সে ঘরে ফিরে যায় নি ?

—না আমাদের মশাইয়ের মেয়েকে ফিরিয়ে দেন, আর আমরা কিছু বলতে চাই না। ভালয় ভালয় ফিরে যাই।

দলের একজন বললে উচ্চকণ্ঠে ! বললে,—মশাই তো ঘরে নাই, বাণিজ্য করতে গেছেন গ্রামের বাইরে। ঠাকরুণ আমাদের কেঁদে কেঁদে হয়রাণ হচ্ছেন।

চোখ ছলছলিয়ে ওঠে রাজকুমারীর। কি উত্তর দেবেন, ভাবতে পারেন না। বুক দুরদুরিয়ে ওঠে। কণ্ঠ শুকিয়ে যায়। ভোরের আবছা আলোয়

অন্ধকার দেখতে থাকেন। কত কষ্টে যেন কথা বললেন। বললেন,—তোমাদের মেয়ে তো রাতের বেলায় গেছে এখান থেকে। প্রথম প্রহরেই চলে গেছে! তার পর—

—তার পর হুজুরণী? তার পর কোথায় গেলো মেয়ে? ঘরে তো ফেরে নাই!

—তার পর কোথায় গেল জানি না তো!

বিন্ধ্যবাসিনী হতাশ স্বরে বললেন। মিথ্যাকথনে অনভ্যস্ত তিনি, তবুও বাকীটুকু চেপে গেলেন, না-জানার অছিলায়।

—কি উপায় হবে হুজুরণী? গুমখুন করলে না তো কেউ?

—তোমরা নদীতে খোঁজাখুঁজি কর, হয়তো সন্ধান পাবে। আনন্দর নৌকা যাবে কোথায়?

দলকে দল নিরাশায় ভেঙ্গে পড়লো যেন! ওদের মিশ কালো শরীরে হলুদ রঙয়ের কাঁচা রৌদ্র ছড়িয়েছে। রাজকন্যা দেখলেন, ওদের মুখে মুখে হতাশা। অবিশ্বাসের চাউনি যেন চোখে চোখে।

দুঃখের হাসি হাসলেন বিন্ধ্যবাসিনী। ক্ষণেক ভেবে বললেন,—ভাল কথা, আপত্তি নেই আমার। তবে তোমাদের এখানে তল্লাস করাই সার হবে, আগে ভাগে জানিয়ে দি। তার চেয়ে নদীতে যদি খোঁজ করতে যেতে আনন্দর সন্ধান মিলতো, নৌকা যাবে কোথায়! নৌকার মাল্লারাই বা যাবে কোথায়?

দলের চাঁই বললেন,—আগে আপনার চৌহদ্দীটা একবার দেখে নিই, তার পর নদীতে যাব আমরা। আপনি অনুমতি দেন হুজুরণী।

—বেশ কথা। তোমাদের যেমন ইচ্ছা তেমনি হোক। দেখো এসো, কোথাও যদি দেখা পাও তোমাদের মেয়ের।

রাজকুমারীর কথার শেষে ছাদ ত্যাগ করলেন। একবার যেন বিরক্তির দৃষ্টি হানলেন জনতার প্রতি।

দলের সকলে নয়। দলপতির সঙ্গে আরও জনা পাঁচ ছয় একতলার ঘরে ঘরে হানা দেয় আর বেরিয়ে আসে ব্যর্থ মনে। একতলা থেকে দোতলায়

ওঠে দুপদাপিয়ে। এ ঘরে সে ঘরে তল্লাসী চালায়। এটা সেটা নাড়াচাড়া করে। তক্তাপোষ তোলা-পাড়া করে। ওদের সঙ্গে সঙ্গে ফেরে যশোদা। মনে মনে গাল পাড়ে। গজরাতে থাকে রাগে। তারপর এক সময় চিবিয়ে চিবিয়ে বললে,—ভোজবাজি তো আর নয়! ভানুমতীর খেলাও নয় যে তোমাদের মেয়ে আর এতগুলো মাঝিকে লুকিয়ে ফেলবো আমার আঁচলের তলায়!

দলপতি বললে—আমাদের মা ঠাকরুণ যেমন হুকুম দিয়েছেন, আমরা কি করতে পারি! ঠাকরুণ যে কান্নাকাটি করতে লেগেছেন মেয়ের বিহনে। মশাই শুনলে হয়তো আর বাঁচবেন না। দম আটকেই মারা যাবেন।

ঘরের মেঝেয় রোদ পড়েছে, ত্রিকোণ আর চতুষ্কোণ আকারে। পুবের গবাক্ষ পথে সূর্য্যকিরণ এসেছে হলুদ রঙের। বিন্ধ্যবাসিনী দাঁড়িয়ে থাকেন পাষাণমূর্ত্তির মত। জলে ভারী আঁখিপল্লব। অপলক তাকিয়ে আছেন রাজকন্যা। তাঁর মুখে আর বুকে সোনার প্রলেপ যেন, কাঁচা রোদের নিস্তেজ আলো। কূলপ্লাবী আমোদরকেই দেখছেন হয়তো। নদীর জলের গতি ধরা পড়ে না চোখে, দূর থেকে। ব'য়ে চলেছে, না গতি হারিয়েছে। আর একবার আঁচলে চোখ মুছলেন রাজকুমারী—কান্নায় লাল চোখ।

ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা দেয় রাজকন্যার মুখে। বললেন,—পুঁথি নকলের কাজ করবো আমি, যাতে দু'দশ কড়ি ঘরে আসবে।

যশোদা একখানি ধোয়া শাড়ী এগিয়ে দেয় রাজকন্যার হাতে। সুতোর কাপড়, তাঁতের লালপাড় শাড়ী। ফরাসডাঙ্গার তাঁতবস্ত্র।

পট্টবস্ত্র ছেড়ে সুতোর কাপড় পরেন বিন্ধ্যবাসিনী। শুভ্র শাড়ীতে আরও যেন বিষণ্ণ দেখায় তাঁকে। মুখের মালিন্য যেন প্রকট হয়ে ওঠে। রাজকুমারী বললেন,—নদী থেকে ঘুরে এসো তাড়াতাড়ি! তোমাকে একবার বেণের দোকানে যেতে হবে। কালি আর কলম কিনে আনতে হবে। তুলট কাগজ আনতে হবে।

—মুখে জল দেবে না তুমি? কিছু দাঁতে কাটবে না?

—আগে তুই ঘুরে আয় যশো, তারপর। রুচি হয় না কিছু খাই।

—সত্যি সত্যিই যাই তবে, নারায়ণকে দিয়ে আসি আমোদরের জলে? ভেবে-চিন্তে দেখো এখনও।

—হাঁ গো হাঁ। ভাবনার কিছু নাই আর। তুমি কিন্তু যাবে আর আসবে।

—হুকুমের দাসী আমি। যেমন হুকুম করবে তেমন করবো আমি। কথার শেষে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল পরিচারিকা। চোখে তার ক্রোধের চাউনি। সশব্দ পদক্ষেপ!

দেহমনে যেন অবসন্নতা! রাজকুমারী পালঙে ব'সে পড়লেন। ক্লান্ত দেহ যেন অবশ হয়ে পড়ছে ক্রমেই। কি এক চাপা কষ্ট যেন গুমরে গুমরে উঠছে বক্ষমাঝে। চোখে শূন্য দৃষ্টি ফুটিয়ে নীরবে বসে থাকেন বিন্ধ্যবাসিনী। এ জীবনে তিনি অনেক কিছুই হারিয়েছেন। স্বামী, সংসার, সুখ, শান্তি—কিছুই তাঁর নেই এখন। বাঘের মত প্রতাপশালী দুই ভাই আছেন, বৃদ্ধা মা আছেন,—কিন্তু তাঁদের আদর-যত্ন থেকে তিনি বঞ্চিতা। কৃষ্ণরামের দুর্ব্যবহারে দুই ভাই হয়তো রুষ্ট হয়েছেন রাজকন্যার প্রতি। বৃদ্ধা মা আছেন, রাজমাতা বিলাসবাসিনী—তিনিই বা আর কত কাল বেঁচে থাকবেন?

একা থাকতে কত সময়ে ভয় হয়। শ্বাস রোধ হতে থাকে যেন শূন্যতার চাপে। আকাশ থেকে চোখ ফিরিয়ে পালঙে এলিয়ে পড়লেন বিন্ধ্যবাসিনী। চৌধুরাণীর দুঃখে যেন জ্বরের জ্বালা ধরে শরীরে।

ম্যালেটের বজরায় আনন্দকুমারী। বজরা আমোদর পেরিয়ে দামোদরের জল ছুঁয়েছে তখন। অরণ্যে রোদন কেউ শুনতে পায় না। অথৈ জলের মাঝেও কাঁদলে কারও কানে যায় না সেই কান্নার সুর। দিনের আলো নজরে পড়তেই চৌধুরাণীর চোখে জল দেখা দিয়েছে। বজরা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে গঙ্গানদীর দিকে। দামোদরের মাঝ-দরিয়া ধরে এগিয়ে চলেছে।

সারা রাত কত প্রেম জানিয়েছে ম্যালেট। সান্ত্বনা দিয়েছে কত। এ দেশের ভাষা জানে না ম্যালেট, তাই ইসারা আর ইঙ্গিতে কত বুঝিয়েছে।

তবুও তিলমাত্র খুশী হ'ল না চৌধুরাণী। ম্যালেট যত বার তার কাছে এগিয়ে যায়, তত বার প্রত্যাখ্যান করে অনিচ্ছায়। হাতের আঘাতে সরিয়ে দেয় বিদেশীকে।

তাজা ফলের ডালি এগিয়ে ধরেছিল ম্যালেট। অনাহারে রাত কাটাতে চায়নি সে! তার প্রেয়সীকে অভুক্ত রাখতে চায়নি। দুধের পাত্র এগিয়ে দিয়েছিল, মুখে তোলেনি চৌধুরাণী। মাছের রেকাবী দিয়েছিল—সিদ্ধ মাছ আর লবণ। ফিরেও দেখেনি বণিককন্যা। ব্যাঞ্জো শোনাতে চেয়েছিল ম্যালেট, কর্ণপাত করেনি আনন্দকুমারী! মূক আর বধিরের অভিনয় করেছে সে যেন রাতের আঁধারে।

শেষ রাতে নিদ্রা এসেছিল চোখে। ভয় আর উত্তেজনায় কাহিল হয়ে সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিল চৌধুরীর মেয়ে বজরার বদ্ধ ঘরে। তখন জ্বলন্ত লণ্ঠনটা কাছে এগিয়ে নিয়েছিল ম্যালেট। সেই লণ্ঠনের আলোয় কতক্ষণ যে ঘুমন্ত প্রিয়াকে দেখেছে ম্যালেট, কেউ জানে না। স্পর্শ করেনি, শুধু দেখেছে চোখের তৃপ্তিতে। মনের চোখে দেখা! দেখতে দেখতে স্বর্গলাভ হয় যেন। সৌন্দর্য্য—রাশি রাশি টাটকা ফুলের মত।

এক লুপ্তকাব্যকে উদ্ধার করতে চায় ম্যালেট। মূক মুখে কথা ফোটাতে চায়। রুদ্ধকণ্ঠে গানের সুর জাগাতে চায়।

কিন্তু জাগে কে! আনন্দকুমারী ধীরে ধীরে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়। গভীর রাতের গভীর ঘুমে সে ডুবে যায় যেন। সাড় থাকে না তার, মনে পড়েনা জলে ভেসে চলেছে সে। রাতের নদীর বুকের ঠাণ্ডা বাতাসে সে নিদ্রায় অচৈতন্য হয়ে পড়ে। কালরাত্রি—খেয়াল থাকে না চৌধুরাণীর। ভুলে যায় যেন, অতীতকে মুছে ফেলতে হবে তাকে। এখন শুধু অজানা ভবিষ্যৎ সম্মুখে। অন্ধকারের গর্ভে লুকানো না-জানা ভবিতব্য।

শেষ রাতে স্পর্শ করলো ম্যালেট। সংযমের ভিত্তিহীন বাঁধ ভেঙ্গে ফেললো। বাহুশাখার বলিষ্ঠ বন্ধনে গাছ জড়িয়ে ধ'রলো লতাকে। আকাশে তখন শুকতারা জ্বলছে মিটি মিটি। জলে-ভাসা বজরার সঙ্গে সঙ্গে যেন চলেছে ঐ

দূর আকাশের শুকতারা আর শুক্লা পক্ষের ভরাট চাঁদ। সোনার একটি বিন্দু আর একটি গোলক। চৌধুরাণীকে বুকে টেনে নেয় ম্যালেট। লণ্ঠনটা এক ফুঁয়ে নিবিয়ে দিয়ে ম্যালেটও হয়তো ঘুমিয়ে পড়ে উগ্র নেশায়। পাছে হারিয়ে যায় আবার, তাই বাহুপাশ যেন শিথিল হয় না ম্যালেটের।

চোখ মেলতেই আবার যে কে সেই। জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নিজমূর্তি ধরেছে আনন্দকুমারী। বশ মানছে না কিছুতেই, অবাধ্যতা করছে কথায় কথায়! ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে শেষে, নিরুপায়ের মত। অরণ্যে রোদনের মত মাঝ-দরিয়ার কান্না—কারও কানে তা যায় না।

সেই কান্নার ধ্বনি, এত দূরে থেকেও যেন অন্তরের কানে শুনতে পেয়েছেন একমাত্র বিন্ধ্যবাসিনী। ধৈর্য্য হারিয়েছেন তিনি, জ্বরের জ্বালা ধরেছে যেন তাঁর কোমল অঙ্গে। চোখ জ্বলছে থেকে থেকে, তাই জল ঝরছে যখন তখন, শাড়ীর আঁচল ভিজে গেছে।

—তোমার কথাই পালন করেছি বৌ, মঙ্গল অমঙ্গল তোমার। কতক্ষণ পরে ফিরে আসে পরিচারিকা। আমোদরে ডুব দিয়ে এসেছে। তাই সিক্ত কেশ। অবগাহনের স্নানে যেন যশোদার রুক্ষতা ধুয়ে গেছে। চোখের পাতায় এখন জলের আভাস।

কথা শুনে উঠে বসলেন বিন্ধ্যবাসিনী। বীতস্পৃহের মত শূন্য দৃষ্টিতে দেখলেন একবার। বললেন,—হাঁ ভাই। তোমার কোন অপরাধ নেই। মঙ্গল অমঙ্গল আমার।

—আমার গলা টা টা করছে। মাথায় জল পড়েছে কি না। পেছনের চুলে গামছার ঝাপটা দেয় পরিচারিকা সম্মুখ চিতিয়ে। জল ঝাড়ে আর কথা বলে; বললে,—বৌ, তুমি খাওতো খাই, নয়তো যাই এখন ক্ষিধেতেষ্টায় জ্বলতে জ্বলতে সেই বেণের দোকানে, কাগজ-কলম কিনতে।

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে রাজকুমারী বললেন,—আমিও খাই, তুমিও খাও। কিছু দাও, খেয়ে জল খাই এক ঘটি।

খুশীর হাসি হাসলো যশোদা। বললে,—লক্ষ্মী মেয়ে, আমি এনে দিই জল-খাবার!

—তৃষ্ণায় আমারও কণ্ঠ শুকিয়েছে।

রাজকুমারী কথা বলতে বলতে আবার বসলেন পালঙে। পা মুড়ে বসলেন। ক্লান্ত শরীর, পায়ে যেন বল নেই; সর্ব্ব অঙ্গ অবশ যেন। শান্ত চোখে ঘুমের ঘোর। ঘরের মেঝেয় দৃষ্টি আবদ্ধ। কি এক অজানা ভয়ে বক্ষস্পন্দন যেন দ্রুত। ভোরের আবছা আলোয় কাকে দেখেছেন বিন্ধ্যবাসিনী, মানসস্মৃতি যেন আচ্ছন্ন হয়ে আছে এখনও। সমাজের শাসনের ভয়ে মনের কল্পনাবিলাস থেমে যায় মধ্যপথে। চন্দ্রকান্তকে দেখেছিলেন রাজকন্যা। দু'টো কথাও বলেছিলেন। তাঁরই চিন্তা বারে বারে উদয় হয় মনে। কখনও বিরক্তি আসে, আত্মতৃপ্তিতে কখনও বা প্রসন্নতা।

কৃষ্ণরাম কখনও সমাদর করেননি! একটা মিষ্ট কথা, তাও বলেননি। স্বামীর স্নেহ প্রেম কাকে বলে, বিন্ধ্যবাসিনী জানেন না। খর বাতাসের সঙ্গে তাঁর পরিচয়, বসন্ত সমীরণের স্বাদ মেলেনি কখনও। তাই দিনে দিনে রাজকুমারী যেন রুক্ষ হয়ে উঠেছেন; মনের সূক্ষ্ম অনুভূতি যেন লুপ্ত হয়ে গেছে। কতকাল পরে আজ এত দিনে জেগে উঠেছে যেন সুপ্ত মন। শুষ্ক উদ্যানে সহসা ফুলের সমারোহ যেন!

পালঙ থেকে নেমে আসনে বসলেন বিন্ধ্যবাসিনী। আলুম্বিত রুক্ষ চুলের এলো খোঁপা জড়াতে জড়াতে রাজকুমারী বললেন,—আঁচল পাতো দেখি।

আঁচলে পড়লো কদমা আর নারকেলের ছাঁচ। কড়া পাকের মিষ্টি। জাম আর লিচু কয়েকটা।

হাসি ফুটেছে যশোদার তৈলাক্ত মুখে। কেমন হৃষ্টচিত্তে কথা বলে যেন। বললে,—তোমাদের ঘরে কত ভাল-মন্দ খাওয়া, আমি কি আর জানি কিছু! সামান্য যা জানি, তোমার তরে তৈরী করি। তোমাদের সোনা-দানা খাওয়া মুখ। রাজার মেয়ে তুমি!

বিন্ধ্যবাসিনীব ভুরু বেঁকে উঠলো, ক্ষণেক রাজাকে মনে পড়লো হয়তো,

পরিচারিকার কথায়। স্বর্গগত রাজা, রাজকন্যার ছেলেবেলায় দেখা সেই সিংহমূর্তি। রাজা যখন কথা বললেন, তখন সত্যিই যেন সিংহনাদের মত শোনাতো। বিনা অস্ত্রে বাঘের সঙ্গে না কি লড়ায়ে জিতেছিলেন রাজা। রাজকুমারীর বেশ মনে পড়ে, রাজার জানুর নিম্নভাগে বাঘের থাবার ছিল ক্ষতচিহ্ন।

ম্লান হাসি হাসলেন রাজকুমারী। বললেন,—রাজা একটা গোটা পাঁঠা একাই খেতেন। প্রতিদিন আট থেকে দশ সের দুধ। পঞ্চাশ ব্যাঞ্জনে ভাত খেতেন প্রত্যহ। রাজমাতা নিজে রাজার রান্না রাঁধতেন। রান্নায় মা আমার খুব দড় ছিলেন। আমিষ নিরামিষ কিছু তাঁর অজানা ছিল না। মিষ্টিও খুব ভাল পাক করতেন। মায়ের হাতের মনোহরা, তার স্বাদ ভুলে গেছি এখন।

মেয়ের খেলনাপাতি গোছাতে বসেছিলেন রাজমাতা বিন্ধ্যবাসিনী।

এ যেন তাঁর অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। মেয়ের হাতের স্পর্শমাখা পুতুলের রাশি তাদের সাজশয্যা। রাজকন্যার পুতুলের সাজ সোনা-জহরতের, হাতীর দাঁতের খাটে কিংখাপের বিছানা। মুক্তার ঝালর খাটের ছতরীতে। পোড়া-মাটির পুতুলের আদর-কদর কত!

গঙ্গায় স্নান সেরে এসেছেন বিলাসবাসিনী। রক্তচাপের রোগিণী, তাই মাথায় জল পড়তেই চক্ষু যেন রক্তবর্ণ হয়ে থান কাপড় আলুথালু হয়ে উঠেছে। নিজের মহলে আছে, তাই আর লজ্জার বালাই নেই। মেয়ের খেলার স্মৃতি ফেলে ছড়িয়ে যেন খেলতে বসেছেন কিশোরীর মত। একজন দাসী এগিয়ে দিচ্ছে এটা সেটা। আর একজন দাসী হাতীর দাঁতের খাট পরিষ্কার করছে অতি সাবধানে। অলঙ্করণ আছে অনেক, তাই অতি সাবধানে মোছামুছি করছে।

বিলাসবাসিনী আজ যেন বেশ খুশী খুশী। না বলতেই মুখে জল দিয়েছেন পূজার ঘর থেকে এসে। কতদিন মুখে পান তোলেন নি, আজ ছাঁচা পান খেয়েছেন। রাঙিয়ে আছে হাসি-মাখা ওষ্ঠাধর। পোড়ামাটির পুতুলের মুখে

চুমা খেলেন রাজমাতা। যেন নিজের মেয়ের গালে চুমা খেলেন। সাজানো পুতুলকে কোলে শুইয়ে রেখে বললেন,—আমার মেয়ে পুতুলের চেয়েও মিষ্টি। কুমোরবাড়ীর প্রতিমা হার মেনে যায় আমার বিন্ধ্যর মুখের কাছে।

—রাজকন্যে আসছেন, শুনছি লোকমুখে। রাজবাড়ীতে কানাঘুষা চলছে কাল থেকে।

একজন দাসী কথা বললে ভয় ভেঙে। সুখের কথা, আনন্দের কথা, তাই বললে নিশ্চিন্তায়। কথাটি সত্য না মিথ্যা, ঝালিয়ে নেয় যেন একবার।

রাঙা মুখে হাসি ফুটলো। রাজমাতা শব্দহীন হাসি ফোটালেন মুখে। বললেন,—তোদের মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। মা জগদ্ধাত্রীর কাছে প্রার্থনা জানা তোরা, যেন আমার মেয়ে আমার কাছে আবার ফিরে আসে। কথার শেষে কিছুক্ষণ থেমে থাকলেন কেন কে জানে? আবার কথা বললেন,—আমার কাশীশঙ্কর যাবে বিন্ধ্যকে আনতে। আমার পা ছুঁয়ে শপথ করে গেছে আজ। হাসি হাসি মুখ রাজমাতার। শিশু সরল হাসি যেন। বললেন—কাশীশঙ্কর শতায়ু হোক। মান্দারণে যাওয়াই কি সুখের কথা! কাশী বললে যে এই বাবদে অনেক যোগাড়যন্ত্র করতে হবে! অনেক লোকলস্কর সঙ্গে নিতে হবে। বজরায় যাবে আসবে। হাঁটা পথেই না কি বিপদ বেশী।

অশান্তির আগুন ধিকিধিকি জ্বলবে, অস্বস্তির কাঁটা বিঁধবে যখন তখন। চলাফেরায় সুখ থাকবে না! খেয়ে ঘুমিয়ে দিন কাটবে না। মুখের হাসি মিলিয়ে যাবে! এই সকল কিছুতে পূর্ণচ্ছেদ না টানলে কাজকর্ম্মে মন বসবে না। দুশ্চিন্তা পুষে রেখে স্বচ্ছন্দে কাজ করা চলে না। অন্ততঃ কুমার বাহাদুর তাই চান। এক কাজ শেষ না করে অন্য কাজে যেন হাত দিতে পারেন না!

টাকা দিয়ে টাকা খাটানোর কাজে নেমেছেন কাশীশঙ্কর। শুধু টাকা খাটানো নয়, মাথা খাটানোর কাজ। মাল কিনে মাল বিক্রী করতে হবে চড়া দামে,—কাশীশঙ্করের একটি চোখ এখন ওজনের মানদণ্ডের তীরে, অন্য একটি

:চাখ টাকার অঙ্কে। কড়াক্রান্তির ভুলচুক না হয় হিসাবে। এই দুরূহ কাজের অন্ত চিন্তার অবকাশ নেই। বাণিজ্যের কাজে শুধু লক্ষ্মীর চিন্তা।

কাশীশঙ্কর এখন বদ্ধপরিকর। একবার শেষ চেষ্টা করবেন, যদি উদ্ধার করা যায় রাজকুমারী বিন্ধ্যবাসিনীকে।

দক্ষিণমুখে বৈঠকখানায় ফরাসের উপর বসেছিলেন কুমারবাহাদুর। মাতৃ-দর্শন হয়েছে আজকের সুপ্রভাতে, প্রাতরাশ হয়ে গেছে, তাই একটু বিশ্রামে বসেছিলেন কাশীশঙ্কর। তাকিয়ায় হেলান দিয়ে তিনি বসেছিলেন।

—হুজুর সেলাম! দ্বারে কার ছায়া। দেখা যায় না, শুধু তার কথা শোনা যায় মাত্র। কাশীশঙ্কর হাসি থামিয়ে বললেন,—কে? কামতার না কি?

—জা-হাঁ। হুজুরের গোলাম।

—কামতার খাঁ! কাশীশঙ্কর ডাকলেন।

—জী-হুজুর!

—আমি কাল মান্দারণে যাত্রা করবো কামতার। সেই বাবদে কিছু কথা আছে তোমার সহ। শলা-পরামর্শ আছে! তরোয়ালখেলা জানা আছে, না ভুলেছো?

—পয়দা হওয়ার পর থেকে হুজুর আজও ঐ তরোয়াল ধ'রেই খেলা করছি। কার গর্দান চাই, হুকুম দেন?

—তুমি আমার সঙ্গে যাবে কামতার খাঁ। অপেক্ষা কর সদরে।

—যো হুকুম হুজুর।

সেলাম জানিয়ে বিদায় নেয় কামতার খাঁ; সেলাম জানাতে জানাতে কক্ষ ত্যাগ করে। কামতার কুমারবাহাদুরের দেহরক্ষী। কুমারের শৈশব থেকে তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই আছে। যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী কামতার, তরবারি যুদ্ধে ওস্তাদ। কত লোকের জান নিয়েছে, সে নিজেই জানে না!

কামতারের ছায়া অদৃশ্য হয়।

গড়-মান্দারণের ঘরে ঘরে মেয়ে হারানোর অশুভ বার্তা ছড়িয়ে পড়েছে।

অবিশ্বাস্য এক দুর্ঘটনার কথা কানে কানে ভেসে চলেছে কাল-বৈশাখীর হাওয়ার মত। রাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পরে দিনমানেও যখন মেয়ের দেখা মিললো না তখন কেউ আর স্থির থাকতে পারে না। বিশেষতঃ চৌধুরী-মা যেন কেঁদে কেঁদে সারা হয়ে গেলেন। চৌধুরীর পালিতজন আর অন্নদাসেরা এখানে সেখানে ছুটেছে মেয়ের খোঁজে। সিপাই আর পাইকরা ঘোড়া ছুটিয়েছে যেদিকে চোখ যায়। বাগদী লেঠেলরা ছুটেছে দলে দলে। কোমর বেঁধে।

কূল-ছাপানো আমোদরের বালিয়াড়ি ধরে এগিয়ে চলেছিল লেঠেলরা। হাতে হাতে শাণানো-অস্ত্র, ঝলমল করছে রৌদ্র কিরণে। তীক্ষ্ণধার অস্ত্র গাছ কাটে, মাটি কাটে, মানুষের গলা কাটে—কিন্তু জলের বুকে আঘাত করতে পারে না। তাই হয়তো বিদ্রূপের হাসি হাসতে হাসতে ছুটে চলেছে আমোদরের স্বচ্ছ-স্নিগ্ধ জল। দর্পিতা রঙ্গিণীর মত হাসতে হাসতে নাচতে নাচতে এগিয়ে চলেছে যেন। ঘূর্ণাবর্ত যেন নর্তকীর ঘাঘঁরার মতই বৃত্তাকারে ঘুরপাক খায়।

হঠাৎ উল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে লেঠেলরা। অকূলে কূল দেখলো যেন। পারাপারহীন অথৈ জলে ভাসতে ভাসতে যেন পারের সবুজ রেখা চোখে পড়েছে সহসা—জয় মা রক্ষাকালীর জয়! বহুজনের মিলিত কণ্ঠে সজোর প্রতি-ধ্বনি ভাসলো আমোদরের তীরে। আকাশমণ্ডল থেকে যেন বাজের শব্দ ভাসলো। ক'জন লেঠেল হাতের অস্ত্র আর লাঠি ফেলে দিয়ে একে একে নদীতে ঝাঁপ দিলো সশব্দে।

—জয় মা মনসার জয়!

শক্তির একেক প্রতিমূর্তি; শক্তির উপাসক, পরমানন্দে ডাকছে শক্তির দেবীদের। সন্তানের দল ডাকছে শক্তিদায়িনী মাকে। আকাশের উড়ন্ত কাক-চিল চমকে চমকে উঠছে।

—জয় মা শীতলার জয়! উদাত্তকণ্ঠ আবার বজ্রপাতের শব্দ তুললো যেন। বুক-সাঁতরে এগিয়ে চলেছে ক'জন লেঠেল। স্রোতের মুখে ভেসে

চলেছে তারা। মাঝ-দরিয়ায় নৌকাডুবির পর যেন হঠাৎ তীরের রেখা দেখতে পেয়েছে।

ঐ যে অদূরে নোঙরবিহীন নৌকা ভেসে চলেছে জলের স্রোতে। আনন্দকুমারীর চিত্রবিচিত্র ও বাহারী পত্রপুটা, চোখে পড়েছে লেঠেলদের। তাই পরিত্রাহি চীৎকার করছে অতিমাত্রা উৎফুল্লতায়। শক্তির দেবীদের ডেকে চলেছে একে একে।

কিন্তু পত্রপুটা জনশূন্য। নৌকা যদিও মিললো, নৌকার আরোহীকে মেলে না। নৌকার সাজসজ্জা তছনছ হয়ে আছে। লেঠেলের দল দেখলো, নৌকা মধ্যে কারা যেন খণ্ডযুদ্ধ চালিয়েছে। নৌকাগাত্রে বন্দুকের বারুদের কালো দাগ। দগ্ধচিহ্ন যেন। সন্ধানী-মানুষের দল হতাশায় ভেঙে পড়ে আবার। বৃথাই জয়ধ্বনি দিয়েছে তারা। শূন্য পত্রপুটা, আনন্দকুমারী তবে কোথায়! নৌকার গায়ে বারুদের চিহ্নই বা কেন? কোন শত্রুর অপকীর্তিতে আহত হয়েছে নাগমুখী পত্রপুটা, কে জানে! চৌধুরীকন্যা হয়তো আর জীবিত নেই।

একজন মাঝি, অতি কষ্টে চৌধুরীগৃহে হাজির হয় দিনের আলো ফুটতে। অব্যর্থ মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেয়েছে সে। পালিয়ে বেঁচেছে। নৌকা থেকে জলে ঝাঁপ দিয়ে রক্ষা পেয়েছে। নদীতীরের এক বৃক্ষশীর্ষে উঠে রাত কাটিয়েছে কাঁপতে কাঁপতে।

—মাঠাকরুণের জয় হোক, আমি তাঁর সাক্ষেৎ চাই। মাঝি তার আর্জি পেশ করলো সদরের জনমানুষকে।

—আমাদের মেয়ে গেল কমনে? বেঁচে আছে না মরে গেছে?

চৌধুরীমশাইয়ের নায়েব আর গমস্তারা সোৎসুক প্রশ্ন করেন একে একে। পাইকরা মাঝির হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেয়। বলে,—বন্দী থাকো এখন। মেয়ের খোঁজ পাওয়া যায়তো দেখা যাবে তখন।

মাঝি বললে,—মাঠাকরুণের দেখা পাইতো বলতে পারি সকল বৃত্তান্ত। হুজুর যখন মান্দারণে নাই, তখন হুজুরণীকেই বলবো।

আনন্দকুমারীর পত্রপুটার একজন মাঝি ফিরেছে। চৌধুরী-মা আর অন্দরে থাকতে না পেরে সদরে এসে হাজির হন। উন্মাদিনীর মত রূপ হয়েছে তাঁর। লাজলজ্জা যেন ভুলে গেছেন বিপদের দিনে। একজন দাসী সঙ্গে আসে। তার হাতে বাঁশকাটির পর্দা! চৌধুরীমার সামনে চিক ধরলো সে।

মা বললেন,—আমার মেয়ে কোথায়? মাঝির বাঁধন খুলে দেওয়া হোক।

মৃত্যুকে যার ভয় নেই, সেই মাঝিও ডুকরে কেঁদে উঠলো হঠাৎ। কাঁদতে কাঁদতে বললে,—মেয়েকে হুজুরণী ম্লেচ্ছ ডাকাত ধরে নিয়ে গেছে। রাত-বেরাতে নদীতে সে কি তুলকালাম কাণ্ড! ম্লেচ্ছ ডাকাতরা গোলাগুলী চালিয়েছিল। আমাদের ক'জন মাঝি ঘা খেয়ে মারা পড়েছে। আমি পালিয়ে বেঁচেছি।

—তারপর? চৌধুরী-মা কম্পিতকণ্ঠে শুধোলেন। রুদ্ধশ্বাসে কথা বললেন।

মাঝি ইদিক সিদিক দেখে বললে,—চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত সবই জানেন। তিনিও ছিলেন আমাদের নাওয়ে।

—চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত! আপন মনেই চৌধুরী-মা বললেন,—নৌকায় তিনি ছিলেন কেন? কি কারণে?

—তা তো হুজুরণী জানি না। সেই পণ্ডিতকে পরে আর দেখি নাই।

চৌধুরী মশাইয়ের দর-দালান ইট-চুণের। বাঁধানো উঠান। টালির সিঁড়ি। চুণারের পাথরের মন্দির-মণ্ডপ। মন্দিরে সারি সারি দেবীমূর্তি। তন্ত্রশাস্ত্রসম্মত গঠিত প্রতিটি মূর্তি। সোনা-জহরতের অলঙ্কারে সাজানো। রেশমের পোষাক।

চৌধুরী-মা একবার মন্দিরের দিকে চোখ ফেরালেন। অশ্রুপূর্ণ দুই চোখে কাতর দৃষ্টি। প্রদীপের আলোয় মূর্তিগুলি সজীব দেখায় যেন। চোখে চোখে যেন স্থির চাউনি। চামরের হাওয়ায় মূর্তির লাল চেলীর বস্ত্রাঞ্চল দুলে দুলে উঠছে। চৌধুরী-মা লুটানো আঁচল তুলে সিক্ত চোখ মুছলেন। বললেন, —দাসী, তোমাদের গমস্তাদের বল চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের কাছে পাল্কী পাঠাবে। তিনি যদি না আসেন আমিই যাবো।

কথাগুলি শুনে নায়েব-গমস্তারা একে একে স্থানত্যাগ করে।

চৌধুরী-মা আবার কথা বললেন,—দাসী, মাঝিকে সদরে অপেক্ষা করতে বল। মাঝিকে যেন বকশিশ দেওয়া হয় সদর থেকে। আমি অন্দর থেকে চিঁড়ে-মুড়ি পাঠাই, মাঝিকে খেতে দেওয়া হোক।

মাঝি ভূমিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে ভক্তিভরে। বলে,—তোমার মেয়ে আগে আসুন, তখন বকশিশ যত পারো দিও।

চৌধুরী-মার কানে যায় না মাঝির আবেদন। তিনি নীরব পায়ে অন্দরের দিকে ফিরে চলেছেন চোখ আঁচল চেপে।

দ্বাদশ জন কাহারে পাল্কী ব'য়ে নিয়ে যায়। চৌধুরীর গৃহ থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামে রূপার পাতে-মোড়া পাল্কী। বারো জন বাহক, যেন হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যায় শূন্য পাল্কী। চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতকে চাই এখনই।

যেদিকে চোখ পড়ে, দেখা যায় শুধু জল আর জল। গৈরিকবর্ণা ভাগীরথী।

ম্যালেটের বজরা আমোদর ছেড়ে গঙ্গায় পড়েছে। হাল টেনে টেনে কাহিল হয়েছে মাঝিরা। তবুও ক্ষণেকের তরে থামে না তারা। বৈতরণীর যাত্রী যেন, স্বর্গে না পৌঁছে থামবে না হয়তো। হাল টানার ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ শোনা যায় শুধু। বৈশাখের বেলা, মাঝিরা ঘামছে তাই। বজরার মাস্তুলে মাছ-রাঙা পাখী উড়ে এসে বসেছে।

ম্যালেট কাগজ-কলম টেনে নিয়ে কি করছে কে জানে। একেকবার দেখছে চৌধুরাণীকে। সাগ্রহে লক্ষ্য করছে যেন। বিস্তীর্ণ জলরাশিতে চোখ রেখে আনন্দকুমারী বসে আছে চুপচাপ। প্রতিবাদ, বাধাদান, আপত্তি—কিছুতেই যখন কিছু ফল হয়নি, তখন চৌধুরাণী নীরবতা অবলম্বন করেছে। গাম্ভীর্য্যে যেন মূক হয়ে গেছে। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে দেখছে তো দেখছেই। যে দিকে চোখ পড়ে শুধু অথৈ জল।

ছবি আঁকছে ম্যালেট। তার মানসপ্রতিমার মূর্তি আঁকছে অন্তরের দরদে। বিরস কারবারী ম্যালেট, শিল্পচর্চা করছে আপন প্রেরণায়। বিবাদ-

মানা প্রেয়সীর ছবি আঁকছে অতি সন্তর্পণে। আনন্দকুমারীর সকল শক্তি লুপ্ত হয়ে গেছে বাদ-প্রতিবাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধে। উত্তপ্ত ও জ্বলন্ত অঙ্গার যেন হিম হয়ে গেছে সহসা!

চৌধুরাণী হঠাৎ আছড়ে পড়লো ম্যালেটের পায়ে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললে,—আমাকে মুক্তি দাও সায়েব! আমার জন্যে কত কষ্ট পাবেন আমার মা! হয়তো আর বাঁচবেন না। তোমার পায়ে ধরছি আমি।

কাগজ-কলম পাশে রেখে দেয় ম্যালেট। শুষ্ক হাসি হাসে। বলে,—ডার্লিং, মাই বিলাভেড, আই উইল নট্ লেট্ ইউ গো।

কথা বলতে বলতে ম্যালেট দুই বাহুর আলিঙ্গনে চৌধুরাণীকে বক্ষে টেনে নেয়। বুকে চেপে ধরে। আনন্দকুমারীর মুখে আর চোখে চুমু খায় ঘন ঘন।

চৌধুরাণী সজল চোখে বললে,—তোমার নেশা কেটে গেলেই তো আমাকে ত্যাগ করে যাবে, তখন আমার কি হবে? কে দেখবে আমাকে? কোথায় যাবো আমি?

—আই উইল ম্যারী ইউ। হামি টোমাকে সাঠি করবো।

—সাধি করবে! চোখ বড় করে আনন্দকুমারী। বলে,—আমার সাধি যে হয়ে গেছে? তবে?

—ডুসরা সাধি হোবে টোমার। খুশীর হাসি হেসে কথা বলে ম্যালেট। তার বাহুপাশ আরও যেন দৃঢ় হয়। বলে,—হোয়াই ডু ইউ ওয়ারী? ঘাবড়াও কেন টুমি?

কেমন যেন হতাশ চোখে তাকায় চৌধুরাণী। অনন্যোপায়ের মত কি বলতে যায়, কিন্তু বলতে পারে না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে। তার জলভরা চোখ বন্ধ করে। ম্যালেটের বুকে মুখ রেখে কাঁদে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

চোখ মেলে তাকায় না চৌধুরাণী। বলে,—আমি একটু জল খাবো বড় তৃষ্ণা আমার। বুক শুকিয়ে যায়।

সহজ সুরের কথা শুনে খুশীর অন্ত থাকে না ম্যালেটের! মনে মনে উল্লসিত হয়ে ওঠে। হাসিমুখে বললে,—পানি পিয়েঙ্গী?

মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানায় আনন্দকুমারী। তৃষ্ণায় কাতর যেন সে। ভয় আর উত্তেজনায় তার কণ্ঠ শুষ্ক হয়ে গেছে। মুখ থেকে যেন কথা সরছে না। এক অব্যক্ত কষ্টের ব্যথা ধরেছে বুকে। ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে। চোখে আর মুখে যেন ক্লান্তি ফুটেছে!

কাগজ আর কলম সরিয়ে রেখে উঠে পড়লো ম্যালেট। হাসি ফুটেছে মুখে! চৌধুরাণীর চোখে পড়লো কাগজের ছবি। দেখে দেখে বুঝলো যে তারই প্রতিকৃতি—কত যত্নে এঁকে চলেছে ম্লেচ্ছ ডাকাত। ঠিক যেমনকার তেমনি। দেখে যেন বিস্মিত হয় আনন্দকুমারী। একদৃষ্টে দেখে তার নিজের ছবি।

বজরার জানলা থেকে ঝুঁকে পড়েছে ম্যালেট। হাতে তার জলের পাত্র। নদীর জল তুলছে পাত্র জলে ডুবিয়ে। খুশীর হাসি হাসছে থেকে থেকে। জলপূর্ণ পাত্র ধরলো সহযাত্রিণীর সামনে। যেন পুষ্পার্ঘ্য ধরেছে এক দেবী-প্রতিমার সম্মুখে। পরম ভক্তিভরে।

পাত্র হাতে ধরে চৌধুরাণী খানিক পান করে। এক আঁজলা জল মুখে আর চোখে ছিটিয়ে নেয়। মুখে কালিমা। চোখে এখনও ঘুমের জড়তা। আসমানী ঢাকাই শাড়ীর আঁচল চেপে চেপে মুখখানি মুছলো ধীরে ধীরে। তারপর বললে,—কোথায় আমাকে নিয়ে চললে সায়েব?

ম্যালেট বাঙলা ভাষা বোঝে না। হিন্দুস্থানী আর উর্দ্দু ভাষা বোঝে যৎসামান্য। জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে রইলো সে। ক'জন মাঝি হেসে উঠলো হঠাৎ, হয়তো সাহেবের দুরবস্থা দেখে।

চৌধুরাণী আবার বললে,—কোথায় যেতে হবে সায়েব? যমপুরীতে?

ম্যালেট সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না। দেশী কথা দুর্বোধ্য ঠেকে তার কানে। বলে,—মাই ডার্লিং, মাই বিলাভেড!

—তোমার মুখে আগুন লাগে না কেন! মর' না কেন তুমি!

চৌধুরাণী যেন নিরুপায়ের মত কটু কথা বলে। মাঝিরা আবার হেসে উঠলো তার কথা শুনে। ম্যালেট অবাক চোখে দেখে আনন্দকুমারীকে।

দিনের আলোয় তার আসল রূপ যেন দেখতে পেয়েছে ম্যালেট। যেমন দেহগঠন, তেমনি অপূর্ব্ব মুখশোভা। কাজলকালো চোখ দু'টিতে কি গভীর দৃষ্টি! কালো পশমের মত রাশি রাশি চুল মাথায়।

চৌধুরাণী আবার বললে,—একখানা শাড়ী দাও, বাসি কাপড়খানা ছেড়ে ফেলি। সঙ্গে এনেছো, ভাত-কাপড়ের ভার নিয়েছো, খেতে-পরতে দাও।

বজরার মাঝিদের মধ্যে সর্দার মাঝি এগিয়ে আসে। ম্যালেটের কানে কানে কথা বলে। চৌধুরাণীর অবোধ্য কথাগুলি হয়তো বুঝিয়ে দিয়ে যায়। কেমন যেন লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে ম্যালেট। মাঝিকে যা বলে তার সারমর্ম্ম এই যে,—বজরা তীরে লাগাও, আমি সব কিছুর ব্যবস্থা করছি।

বজরার গতি ফিরলো। সোজা চলেছিল, আড়াআড়ি চললো এখন। চোখে দূরবীণ তুললো ম্যালেট। নদীর তীরে চোখ রাখলো। দেখলো কি যেন বেশ কিছুক্ষণ ধ'রে। তারপর হঠাৎ সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলো আপন মনে। গঙ্গানদীর তীরে হয়তো মানুষের পদচিহ্ন দেখতে পেয়েছে। হাট-বাজার দেখতে পেয়েছে। দূরবীণে দেখা যায়, গাছের ছায়ায় ছায়ায় বাজার বসেছে। বাজারে মানুষের ভীড়। বিকিকিনি চলেছে।

—বাজার!

ম্যালেট চেঁচিয়ে কথা বললে, যেন নিজেকে শোনাতেই।

দূর নিকটে আসে, তীরের কাছাকাছি তরী এগোয়। হাল চলছে না আর ডাঙ্গার কাছে। দু'জন মাঝি লাফিয়ে জলে নামলো। বজরার দড়ি ধরে টানতে টানতে তীরের দিকে চললো।

টাকার থলি হাতে নিয়ে ম্যালেট তীরে নামলো এক লাফে। একজন মাঝিকে সঙ্গে নিয়ে তীর ধরে এগিয়ে চললো দ্রুত পায়ে। অন্য মাঝিদের চোখের ইশারায় সজাগ থাকতে বলে গেল। খাঁচা থেকে পাখী না উড়ে পালিয়ে যায়! হাতের শিকার যেন না ফসকে যায়।

—সাহেব, বহুৎ আচ্ছা আদমী আছে বিবিজান! বললে মাঝি-সর্দার।

—একটু বিষ দিতে পারো আমাকে? এক চিলতে সেঁকো-বিষ কিম্বা

একটুখানি আফিং? আনন্দকুমারী কেমন যেন করুণ সুরে ভিক্ষা চাইলো। দুই হাত পাতলো ভিক্ষা-প্রার্থনার মত। শিউরে উঠলো মাঝি-সর্দার। চোখে যেন তার হাসি আর অশ্রু ফুটলো একই সঙ্গে। বললে,—সাহেব যে বড্ড দাগা পাবে তবে! ঐ ফিরিঙ্গী সাহেব সত্যিই তোমার প্রেমে পড়েছে বিবিজান! তোমার চোখ নেই তাই দেখতে পাও না।

কাজলকালো চোখ বন্ধ করলো আনন্দকুমারী। চোখে অন্ধকার না আলো দেখলো, কে জানে! বুক কেঁপে উঠলো থরথরিয়ে।

—তোমাদের সায়েব কোথায় চলেছে তাই শুনি?

চৌধুরাণী মিহি সুরে কথা বলে। বজরার জানলা ভেদ করে একটুকরো রোদ্দুর পড়েছে তার মুখে আর বুকে। মাঝি-সর্দার দেখতে পায়, বিবির বুকে ঘন ঘন ওঠা-নামা। শ্বাসের গতি কত দ্রুত!

—কাছে নয় বিবিজান, যেতে হবে অনেক দূরে। সেই সুতানুটি-গোবিন্দপুরে। হুগলী নদী ধ'রে, এই মা গঙ্গার বুক ধরে যেতে হবে সোজা।

—কত দিনের পথ মাঝি-সর্দার? আমার বাবামশাই আছে সেখানে।

—দু'রোজ তো বটে। জোয়ারের ক্ষণেতে আর যাওন চলবে না।

—সায়েবের ঘর আছে সুতানুটিতে?

—সুতানুটিতে নয়, গড়-গোবিন্দপুরে। কোম্পানীর কুঠি আছে। সাহেব সেখানেই থাকে।

—ঐ তো সাহেব ফিরে আসছে। পেছনে মাঝির মাথায় ঝাঁকা। তোমার তরে কত কি সওদা করেছে দেখো।

চৌধুরাণী আবার চোখ বন্ধ করলো। চোখ ফিরালো না বারেকের তরে। একটা কষ্টকাতর দীর্ঘশ্বাস ফেললো। চোখে আঁচল চাপলো।

পাটাতনে ঝাঁকা নামিয়ে রাখে মাঝি। বজরাখানা একবার সজোরে দু'লে উঠলো। চমকে উঠলো আনন্দকুমারী। তার চোখে পড়লো সওদার ঝুড়িতে কত কি রয়েছে। ক'জোড়া শাড়ী। গামছা। আহারের পাত্র জলের কলসী। মাটির বাসন। চাল, ডাল, শাক সব্জী। ঘি, তেল, দুধ।

ম্যালট বললে,—তাম্বু লাগাও।

কেমন যেন হুকুমের স্থর তার কথায়। মুখে যেন আনন্দের আভাস। খাঁচার পাখী খাঁচাতে আছে দেখে নিশ্চিন্ত হয় যেন। স্বস্তি না তৃপ্তির শ্বাস ফেলে।

চটের তাঁবু তোলাপাড়া করে সিপাইরা। দড়ি আর খুঁটি। বাঁশ আর লোহার হাতুড়ী। সংসার পত্তনের তোড়জোড় চলে। একজন মাঝি মাটির উনানে আগুন দিতে লেগে যায়। গাছের শুকনো পাতা আর ডালে আগুন ধরায় চকমকি ঘষে।

চৌধুরাণীর একটি হাত ধরলো ম্যালেট। হাত ধ'রে উঠালো তাকে। বললে,—আও, হামরা সাথ চল। কাম্, লেট আস গো টু দি ব্যাঙ্ক।

নেশা ধরে আছে যেন। আনন্দকুমারীর পা কাঁপছে, দেহ টলছে। চোখের কালো অঞ্জন কালিমা ছড়িয়েছে মুখে। লজ্জা ভুলে গেছে হয়তো বা। কেমন যেন বেহায়ার মত ম্যালেটের হাতে হাত ভিড়িয়ে বজরা থেকে তীরে নামলো টলতে টলতে। ম্যালেট তার কোমর জড়িয়ে আছে এক হাতে।

তবুও যেন রাগ ধরে চৌধুরাণীর। একের প্রাপ্য অন্যকে অনিচ্ছায় দেওয়ার ক্ষোভে ভুরু বাঁকিয়ে থাকে। তীরের ভিজে মাটিতে পা পড়তে কাদামাটিতে পা বসে যায়।

ম্যালেট দুই বাহুর ভরে তুলে নেয় চৌধুরাণীকে। বুকে তুলে নেয় একেবারে। কর্দ্দমাক্ত তীর পেরিয়ে নিয়ে যায় তাঁবুর ভেতর। আনন্দকুমারীর চিবুকে একটি চুমা খেয়ে তাকে পুতুলের মত নামিয়ে রাখে যেন!

—দিস্ ইজ মাই ড্রিমল্যাণ্ড। ম্যালেট কথায় কবিত্ব ফুটিয়ে বলে।

—তুমি এখন আমার নজরছাড়া হও। আমি নদীতে ক'টা ডুব দিয়ে নিই।

চৌধুরাণী এক পাশে সরে দাঁড়ায় কথা বলতে বলতে। বিনুণীর ফিতা খুলতে থাকে।

ঘর বাঁধছে, বাসা বাঁধছে, তবুও মুখে হাসি ফোটে না চৌধুরাণীর। ধনুকের

মত বাঁকা ভুরু আর সোজা হয় না। থেকে থেকে কটাক্ষ হানে যেন। তাঁবু থেকে বেরিয়ে যায় ম্যালেট হাসতে হাসতে। কাব্য আওড়ায় সুরেলা ছন্দে।

তাঁবুতে এখন আনন্দকুমারী একা। বিনুণীর বন্ধন খুলতে খুলতে আবার চোখ ফেটে জল আসে। তাঁবুর বাইরে ম্যালেট কবিতা গাইছে, শুনতে পাওয়া যায়। অর্থ বোঝা যায় না কিছুই। চৌধুরাণী কাঁদতে থাকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, শিশুর মত।

তাঁবুর ভেতরে খাটিয়া পড়েছে। একজন সিপাই আসে তাঁবুর মধ্যে। শাড়ীর স্তূপ রেখে দিয়ে যায় খাটিয়ায়। চৌধুরাণীর চোখে আঁচল, তাই দেখতে পায় না!

ম্যালেট শুনতে পায়, কোথা থেকে ফোঁসফোঁসানির শব্দ আসছে। অনুমানে বোঝে, তার প্রিয়তমা কাঁদছে বিয়োগ ব্যথায়! ম্যালেটের মত দুরন্তের চোখও যেন ছলছলিয়ে ওঠে মুহূর্তের জন্য।

মান্দারণের ভগ্নপুরীতে সমব্যথী বিন্ধ্যবাসিনীও থেকে থেকে চোখের জল ফেলেন। ভিজে চুল শুকাতে বসেছেন রাজকুমারী। সূর্য্যের দিকে পিছু ফিরে আছেন। ছাদের এক কিনারায় বসে আছেন। ভিজে চুলের রাশি ছড়িয়ে আছে পিঠে। কোন ফাঁকে আসমানে ডুব দিয়ে এসেছেন কে জানে! রাজকুমারী ভাবছিলেন, হাজার হোক চৌধুরাণীই সুখী। তাঁর মত একা নয় সে। দেশী হোক, বিদেশী হোক, প্রেম আর ভালবাসা পাবে। অবহেলা সহ্য করতে হবে না জীবনভোর, পাবে সেবা-যত্ন। আদর আর কদর হবে তার। ইংরাজরা নাকি প্রেমে কপট নয়। তাদের ভালবাসায় নাকি ছল-চাতুরী নেই।

—এই নাও তোমার কাগজকলম আর ভূশোকালি। যেতে আসতে জিভ বেরিয়ে গেছে আমার! পরিচারিকা কেমন যেন ক্ষুব্ধকণ্ঠে কথাগুলি বললে। খানিক থেমে আবার বললে,—সারা মান্দারণে তো ঢি ঢি পড়ে গেছে! কান পাতা দায় হয়ে উঠলো!

—কেন ? কি হয়েছে ? সাগ্রহে শুধোলেন রাজকুমারী। কথা বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন।

যশোদা বললে,—আনন্দকুমারীকে পাওয়া যাচ্ছে না, তাই। দিকে দিকে লোক ছুটেছে। চন্দ্রকান্তর চতুষ্পাঠীতে পাল্কী পাঠিয়েছে আনন্দর মা। হনহনিয়ে পাল্কী ছুটেছে, নিজের চোখে দেখনু যে!

একবার যেন শিউরে উঠলেন বিন্ধ্যবাসিনী। কি যেন বিপদের আশঙ্কায়। খানিক নিথর হয়ে থাকতে থাকতে ফিসফিসিয়ে বললেন,—চন্দ্রকান্ত কি করবেন ? তাঁর কাছে পাল্কী ছুটলো কেন ?

—নৌকায় তিনিও যে ছিলেন আনন্দর সঙ্গে। তিনি না কি সবই জানেন।

—আমার মন যেন আঁকুপাঁকু করেছে। কথা বলতে বলতে আপন কক্ষে প্রবেশ করলেন রাজকন্যা। তাঁর মুখে-চোখে যেন ভীতিবিহ্বলতা।

তুলট কাগজ, খাগের কলম আর ভুশোকালি নামিয়ে রেখে দিয়ে যায় পরিচারিকা। ঘর থেকে বেরিয়ে যায় কথা বলতে বলতে।

বিজন ঘরে বিরহের দীপ জ্বালেন যেন রাজকন্যা। ভাবেন, আসমানেই তাঁর ঠাঁই হওয়া উচিত। বেঁচে থাকাই অন্যায়। কত আঘাত আর শ্লেষ হেনেছেন জমিদার কৃষ্ণরাম। আর সব স্ত্রীদের সম্মুখে কত অপমান করেছেন। কত কটু কথা শুনিয়েছেন। তাতেও যখন মন ভরেনি তখন একজন দাসীকে সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন গড়-মান্দারণের এই ভগ্নপুরীতে। নজরবন্দিনী করে রেখেছেন। এত অসম্মানের চেয়ে আসমানে ডোবাই ভাল। তার ওপর সহোদর ভাইরা রাজা-বাদশাহ হ'য়েও যখন কৃষ্ণরামের দাবী মিটালেন না, তখন মরণ-বরণ ছাড়া গতি কি আর।

শিউরে উঠলেন বিন্ধ্যবাসিনী। জলে ঝাঁপ দেওয়ার ভয়ে নয়, কেমন যেন মৃত্যুভয়ে ভীতা হয়ে পড়লেন। বুক দুরু-দুরু করতে থাকে।

রাজকন্যার ধারণা সত্য নয়। তাঁর এই দুরবস্থায় রাজগৃহের সকল শান্তিও

বিনষ্ট হতে চলেছে। রাজমাতার চোখে ঘুম নেই। রাজাবাহাদুরের আহারে-বিহারে মন নেই। কুমারবাহাদুর কাশীশঙ্করও সুস্থির হতে পারছেন না। রাণীমায়েদের মুখে হাসি নেই। রাজপুরীতে আর কোন আনন্দ নেই।

কাশীশঙ্কর দস্তুরমত শলা-পরামর্শ চালিয়েছেন রুদ্ধকক্ষে। সদরে পাছে জানাজানি হয়, তাই অন্দরের এক গুপ্তকক্ষে বসেছেন গোপন আলোচনায়। কক্ষের মধ্যে কুমারবাহাদুর আছেন। আর আছে কামতার খাঁ। আছে জগমোহন লেঠেল।

মধ্যদিনের রূপালী-শুভ্র আকাশে চোখ তুলে, রুদ্ধ কক্ষের বদ্ধ দুয়ারে হেলান দিয়ে পাষাণমূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছেন মহাশ্বেতা। দীর্ঘ চোখের পলক পড়ছে না। কেমন যেন আশাহতার মত তাকিয়ে আছেন। কম্পিত-বক্ষে শুনছেন ঘরের কথা।

জগমোহন বলছে,—পাঠানটাকে হুজুর ঘায়েল করতে পারলেই কেল্লা ফতে হয়ে যাবে।

কাশীশঙ্কর বললেন,—সেই ভার আমার। আগ্নেয়াস্ত্র আমারও আছে। আমার লক্ষ্য একেবারে অব্যর্থ জানবে। আকাশে উড়ন্ত পাখীও আমার টিপ এড়ায় না।

কামতার খাঁ বললে,—তবে জাঁহাপনা, আমাকে আর সঙ্গে নেবেন কেন? আমার তরোয়াল ফাঁকায় আবার চলে না!

কাশীশঙ্কর হো-হো শব্দে হেসে উঠলেন। বললেন,—কামতার, তুমিও তরোয়াল চালাবে, আমরা যদি নাচার হই তখন। আগামী কল্য যাত্রা সুনিশ্চিত জানবে।

চমকে উঠলো পাষণমূর্তি। কেমন যেন বিচলিত হয়ে উঠলেন মহাশ্বেতা। আকাশ থেকে চোখ নামালেন না। চোখের পলক পড়ে না। মহাশ্বেতা স্থির দৃষ্টিতে কি দেখছেন আকাশে কে জানে।

চতুষ্পাঠী যেন জনশূন্য, এমনই স্তব্ধতা সেখানে। ছাত্রশিষ্যদের পাঠ, ছড়া

আর আবৃত্তি আজ আর শোনা যায় না। আর্য্যভাষায় শাস্ত্রমন্ত্রের গুঞ্জন যে: থেমে গেছে চিরদিনের মত। মণ্ডপবেদীতে অধ্যক্ষের মৃগচর্ম্মের আসন শূন্য রয়েছে! ব্রহ্মচারীরা ষড়রিপুকে জয় করেছে, তবুও তাদের মুখে মুখে আজ যেন ভয় আর দুশ্চিন্তা ফুটেছে। কারও মুখে কথা নেই। চতুষ্পাঠীর পুণ্যতীর্থরজ: কি কারণে যেন অপবিত্র হয়েছে, মাহাত্ম্য হারিয়েছে। চতুষ্পাঠীর চতু:সীমায় অদৃশ্য পাপের ছায়ানৃত্য চলেছে যেন। পুঁথিপাঁজি যেমনকার তেমনি পড়ে আছে অস্পৃশ্যের মত। সরলমতি নাবালক ব্রহ্মচারীর দল সারা রাত জেগে বসে থাকতে পারে না। যে যেখানে ছিল সে সেখানে থেকেই নিদ্রায় অচেতন হয়। কেবল বয়:প্রাপ্ত সাবালকের দল বিনিদ্রায় রাত্রি যাপন করেছে। জেগে বসে থেকেছে। কান পেতে শুনেছে যেন রাত্রির পদধ্বনি। গহন রাতে কত কত বার চমকে উঠেছে তারা।

তারপর কখন কাক ডেকেছে, রাত্রি আর দিনের সন্ধিমূহূর্তে। আকাশের পূর্ব্বভাগে রক্তচন্দনের ঢেউ নাচিয়ে সপ্তঅশ্ববাহী সূর্য্যের উদয় হয়েছে। তখন এক দমকা হাওয়ার মত অকস্মাৎ এসে পড়েছেন চন্দ্রকান্ত। ঘুম-জড়ানো চোখে দেখতে দেখতে যেন বিশ্বাস হয় না ছাত্রদের। গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করে তারা—ঐ উন্নতবক্ষ, ভয়জয়ী ও সদাহাস্যময় চন্দ্রকান্ত যেন কেমন ভীত আর সন্ত্রস্ত হয়েছেন। বিমর্ষতার রেখা তাঁর মুখে। চন্দ্রকান্ত দ্রুতপদে আসেন কোথা থেকে? একদৃষ্টিতে সকলের মুখপানে তাকিয়ে আপন কক্ষে প্রবেশ করলেন। মৃত্যুভয়ে যেন আত্মগোপন করলেন। তাঁর বেশবাস যেন অবিন্যস্ত। উত্তরীয় নেই দেহে।

'মা দিবা সাপ্সী!' আর ঘুম নয়, দিবানিদ্রা ত্যাগ করাই শ্রেয়:, নয়তো অযথা আয়ুক্ষয় হবে। পুকুর তীরে চললো ছাত্ররা দলে দলে। নিমের দাঁতন হাতে। অন্য দিন গান গাইতে গাইতে স্নানযাত্রায় যায়, আজ চললো নীরবে। শোকের শোভাযাত্রায় চলেছে যেন।

—ইন্দ্রজিৎ!

মেঘগম্ভীর কণ্ঠে কে ডাকলো কোথা থেকে। অতি পরিচিত কণ্ঠ, তবুও যেন বিশ্বাস হয় না। যাকে আহ্বান, সে দেখে ইদিক-সিদিক। স্বকর্ণে শুনেও যেন বিশ্বাস করতে পারে না।

—ইন্দ্রজিৎ, ব্যস্ততা না থাকে তো একবার আইস। কিছু কথা আছে গোপনীয়। রুদ্ধকক্ষের মধ্যে থেকে কথা শোনা যায়। শিষ্যদের মধ্যে বয়ঃজ্যেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎ। পড়ুয়াদের মধ্যে জ্ঞানগরিমায় শ্রেষ্ঠ। চন্দ্রকান্তর অবসর সময়ে ইন্দ্রজিৎ পাঠ দেয়, পাঠ নেয়। চতুষ্পাঠীর অন্যান্য ছাত্র তাকে মান্য করে যথেষ্ট। সে নাকি সর্দার-পড়ুয়া।

—দ্বার মুক্তই আছে, নিকটে আইস। একটা কথা আছে। আবার কথা বললেন চন্দ্রকান্ত। ব্রতধারী ব্রহ্মচারী ইন্দ্রজিৎ সসম্ভ্রমে দেখা দেয়। ভূমিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে।

—শুভমস্তু! চন্দ্রকান্ত স্মিত হেসে বলেন। শিষ্যের কপাল স্পর্শ করেন। বলেন,—ইন্দ্রজিৎ, তুমি এই চতুষ্পাঠীর পরিচালনভার লও, আমি কার্য্যকারণে মান্দারণ ত্যাগ করবো কিছুকালের নিমিত্ত।

—আমার সামর্থ্য কি? চতুষ্পাঠী পরিচালনায় মত দক্ষতা নাই আমার। ভোরের সদ্যফোটা ফুলের মাধুরী-গন্ধভরা বাতাসে ইন্দ্রজিতের বিনম্র কথা ভেসে যায়। নত মস্তকে কথা বলে সে।

স্মিত হাসি ফুটলো চন্দ্রকান্তর অধরপ্রান্তে। একরাশ ধূপ জ্বলছে তাঁর এক পাশে। চন্দন দগ্ধ হচ্ছে, তারই পুঞ্জ-পুঞ্জ ধূম্ররেখা চন্দ্রকান্তর আশ-পাশে। পুঁথির রাশি ছড়িয়ে আছে ভূমিতে। চন্দ্রকান্ত কি সব বাঁধাছাঁদার কাজ করছেন। হাতের কাজে বিরত হয়ে বললেন,—আমি জানি তোমার সামর্থ্য কতটা। সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী তুমি, শিক্ষাদানের কাজেও তুমি সুদক্ষ। আমার আদেশ আশা করি অমান্য হবে না।

—যথাজ্ঞা। আপনার স্থানত্যাগের কি কারণ? গন্তব্যস্থলই বা কোথায়? বিদ্যা বিনয় দান করে। ইন্দ্রজিৎ বিনয়াবনত সুরে একেকটি প্রশ্ন করলো। ভূমিতে চোখ রেখে কথা বললে।

চন্দ্রকান্ত কি এক আবেগে খানিক ঈষৎ চঞ্চল হন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন,—আমি তীর্থ দর্শনে যাবো পদব্রজে। বঙ্গদেশ পরিক্রমা শেষ হওয়ার পর যাবো উত্তরকাশী। ততঃপর কোথায় যাই, কিছুই ঠিক নাই।

—কত কালের জন্য আপনার অনুপস্থিতি?

—তার কোন স্থিরতা নাই। যদি আর না আসি, তাতেই বা বাধা কি? আমার যাত্রার সময় সন্নিকটে। তুমি এই চতুষ্পাঠীর সুনাম অক্ষয় রাখিও। ন্যায়পথে থাকিও, বাধাবিঘ্নকে উপেক্ষা করিও, কর্তব্যপালনে ত্রুটি করিও না। শত বিপদেও মিথ্যার আশ্রয় লইও না।

চোখ ছলছল করে ইন্দ্রজিতের। নতমস্তক, তাই তার অশ্রুসজল চোখ আর নজরে পড়ে না। বাষ্পরুদ্ধ স্বরে কথা বলে—আজ আমাদের অনধ্যায় আর অরন্ধনের দিন।

—তথাস্তু ইন্দ্রজিৎ! তোমার মঙ্গল হোক। বেশ কিছু দুষ্প্রাপ্য পুঁথি আমার পাঠাগারে আছে, তাদের সযত্নে রক্ষা করিও। কীটদষ্ট না হয় যেন।

—যথাজ্ঞা মহাশয়!

চন্দ্রকান্ত বলেন,—মঙ্গলমস্তু। তুমি শিক্ষিত, দীক্ষিত, তোমার কোন ভয় আর চিন্তার কারণ নাই।

ছলছল চোখে পর্ণকুটীর ত্যাগ করলো ইন্দ্রজিৎ। আসন্ন বিয়োগ-বিরহের কাতর অনুভূতি তার মনে। বিবশ পায়ে পুকুরতীরে চললো সে। স্নান সেরে এখনই ফিরতে হবে। বিদায় দিতে হবে আচার্য্যকে। ততঃপর শিক্ষাদানের কাজে বসতে হবে। কর্তব্য অনেক, তাই পা চালালো ইন্দ্রজিৎ।

হাতে-গড়া চতুষ্পাঠী, ত্যাগ করে চলে যেতে হবে মান্দারণের বাইরে। লজ্জা আর ভয়ে সঙ্কোচ আসে চন্দ্রকান্তর মনে। এখানে থাকলে বিপদ অনিবার্য্য। আনন্দকুমারীর আত্মীয়-স্বজন সহজে নিস্তার দেবে না। কোতোয়াল থেকে ডাক আসবে, পেয়াদা আসবে। তারপর সমাজে আর মুখ দেখানোর উপায় থাকবে না।

জ্বরের জ্বালা ধরেছে যেন চন্দ্রকান্তর বুকে। অস্বস্তির কাঁটা বিঁধছে থেকে

থেকে। চন্দ্রকান্ত ভাবলেন পথ দুর্গম। বিপদে আত্মরক্ষার উপায় কি? বৌদ্ধতান্ত্রিকদের শাণিত অস্ত্রাঘাত রুখতে হবে, নয়তো অপঘাতে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। অস্ত্র-ঘরে প্রবেশ করলেন চন্দ্রকান্ত। একটি ধারালো তরবারি সঙ্গে নিতে হবে।

গভীর ঘনরজনীতে শোনা যায় অস্ত্রের ঝনঝনা। তরবারি-যুদ্ধ চলেছে জ্যোৎস্না রাতের সোনালী আলোয়। রাজ্যজয়ের নেশায় এই হানা-হানি নয়, ধর্ম্মের বৈরিতায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে হিন্দু, মুসলমান আর বৌদ্ধ সম্প্রদায়। বাঙলা আর বিহারের মঠ, মন্দির আর মসজিদের দাহপর্ব্ব চলেছে যেন। স্থাপত্য আর শিল্পশোভা ভস্মে অঙ্গারে ঝরে পড়ছে। মাতৃমূর্তি বুদ্ধমূর্তি পদদলিত হয়েছে। ধর্ম্মান্তরের ফাঁস গলায় জড়াও, নয়তো বিধর্ম্মীর পাওনা গ্রহণ কর।

একটি তীক্ষ্ণধার তরবারি একখানি পুঁথির মধ্যে রেখে বেঁধে ফেললেন চন্দ্রকান্ত। স্বপ্নচ্ছবির মত গতরাতের দুর্ঘটনা চোখে ভাসছে যখন তখন। আনন্দকুমারীর বর্ণভূষা, দেহালঙ্কার, পোষাক-পরিচ্ছদ, কেশ-বিন্যাস—সবই একে একে মনে পড়ে। কি দুঃসাহস চৌধুরীকন্যার! সমাজকে ভয় করে না, মানুষকে পরোয়া করে না, বনাঞ্চলের সর্পভীতি পর্য্যন্ত তার নেই।

স্নান শেষে ফিরে এসেছে ইন্দ্রজিৎ। বেদীর এক পাশে দাঁড়িয়ে গান ধরে সুরেলা ছন্দে। প্রার্থনা-সঙ্গীত গাইতে থাকে। শিশুদের পেছনে এসে বসে সকল ছাত্র। ইন্দ্রজিতের সুরে সুর মিলায়। ঐক্যতানে গান ধরে সকলে। গাছের পাখীও যেন সঙ্গে সঙ্গে গান গায়।

ভক্তিগদগদ গায়কদের চোখ এড়িয়ে চন্দ্রকান্ত ধীরে ধীরে চতুষ্পাঠী ত্যাগ করেন। তাঁর হাতে এক নাতিবৃহৎ পুলিন্দা। পুঁথি পানপাত্র আর পরিধেয়। দ্রুতপদে চলতে থাকেন অধ্যক্ষ। ধরা পড়ার ভয়ে চোর যেমন পথ চলে তাড়াতাড়ি। অনেক দূরে গিয়েও গান শোনা যায় মিহিসুরে। প্রার্থনার গান নয়, যেন বিদায়-সঙ্গীত গাইছে শিষ্যদল। চন্দ্রকান্ত একবার পিছু ফিরে দেখলেন। চতুষ্পাঠীর মণ্ডপশীর্ষ চোখে পড়লো। মাটির প্রাচীরে

দৃষ্টি ব্যাহত হয় তাঁর। আবার চলতে থাকেন। বিভীষিকার নিশ্বাস থমথম করছে যেন।

আর কালবিলম্ব করেন না চন্দ্রকান্ত। তাঁর গতি দ্রুত হয় হাঁটাপথে। রৌদ্রতেজ অঙ্গে লাগে না! পথ বৃক্ষচ্ছায়াচ্ছন্ন। আকাশস্পর্শী গাছের সারি পথের দুই পাশে। আম্রবৃক্ষ আর বাঁশের বন। সম্মুখে চোখ যায়, পথের সর্পিল বিস্তার ছাড়া কিছুই দেখা যায় না।

পাশেই বনাঞ্চলের ফাঁকে এক সঙ্ঘারাম। সাড়া দিতে ভয় হয় চন্দ্রকান্তর। তিনি পথ চলা থামিয়ে অপেক্ষায় থাকেন।

সঙ্ঘারাম বুদ্ধের শীল আর মঙ্গল গাইছে ভক্তজন। এক স্থর, এক তান, এক কথা। চন্দ্রকান্তর কানে যায় শুদ্ধমন্ত্রের একেক উক্তি। গানের কলির মত ভেসে আসে যেন। মুক্তিপথের পাথেয়, মোক্ষলাভের মহামন্ত্র, বুদ্ধপ্রাপ্তির স্তোত্রগান গাইছে ভক্তরা। তারা বলছে,—পাণং ন হানে!

মনে মনে ঐ উক্তি বঙ্গভাষায় রূপান্তর করেন চন্দ্রকান্ত। পালি আর প্রাকৃতে তাঁর জ্ঞানের অভাব নেই। মন্ত্র শুনে ঈষৎ হাসলেন তিনি। প্রাণীকে হত্যা করবে না,—মুখে শীল আওড়ায় কিন্তু কাজে কি করে বৌদ্ধতান্ত্রিকরা! শীলের অপমান করে। বিধর্মীর রক্তপাত করে।

তারা বলছে,—ন চ দিন্নমাদিয়ে।

যা তোমাকে দেওয়া হয়নি তা যেন তুমি গ্রহণ করবে না। চন্দ্রকান্ত মনে মনে ভাবলেন, হিন্দুর মন্দির ধ্বংসের পর মাতৃমূর্তির স্বর্ণালঙ্কার কারা আত্মসাৎ করে। মন্দিরের রূপার তৈজস কোথায় যায়। প্রণামীর অর্থ কোথায় উধাও হয়!

তারা বলছে,—মুসা ন ভাসে।

মিথ্যা কথা বলবে না। চোরের দলের কথায় কথায় মিথ্যা। বুদ্ধের বাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তারা। সদাচার মানে না আর।

তারা বলছে,—ন চ মজ্জপো সিয়া।

মদ খাবে না। আবার মনে মনে হাসলেন চন্দ্রকান্ত। শোনা যায়,

সঙ্ঘারামের ভিক্ষু আর শ্রমণদের জন্য মদ চোলাই হয়। ধ্বংসে মত্ত হওয়ার আগে তারা আকণ্ঠ মদ্যপান করে। মধ্যরাতে না কি নটীদের নৃত্য-উৎসবে যোগ দেয়।

ছুটন্ত এক মনুষ্যদল এসে থেমে যায় অপেক্ষমান চন্দ্রকান্তর সমুখে। লক্ষ্য করা যায়, ওরা বহন করে এনেছে এক শূন্য পালকী। বিচিত্র কারুকাজ পালকীতে, রূপার পাতের। দেবদেবীর চিত্র আঁকা পালকীর দুয়োরে।

—ঠাকুরমশাই! পথের ধূলা কপালে মাখতেই যেন প্রণাম করলে একজন।

চন্দ্রকান্ত বিস্ময় বোধ করেন। সাগ্রহে দেখতে দেখতে বললেন,—মহাশয়দের বক্তব্য কি? আমাকে কি প্রয়োজন?

—মা ঠাকরুণ ডাক পাঠিয়েছেন, ঠাকুর মশাই! পালকী পাঠিয়েছেন।

—আমার তো চেনা নাই! কোথায় বসতি! পরিচয় কি?

—আনন্দকুমারীর মা।

বক্তার কথা শেষ হয় না। মাথা নত করলেন চন্দ্রকান্ত। চিন্তার রেখা ফুটলো কপালে। বললেন,—কারণ কি শুনতে পাই?

—ঠাকুরমশাই, আমাদের রাজলক্ষ্মী আনন্দকুমারীর সন্ধান মিলছে না গত রাত্রি থেকে।

—তজ্জন্য আমার কি করণীয়? আমি কি করতে পারি? আমাকে রেহাই দেন। আমি যাওয়ায় কোন সুফল হবে না। আনন্দকুমারী বর্তমানে কোথায়, সে জীবিতা না মৃতা, কিছুই আমার জানা নাই।

—কথায় কাজ হবে না। সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না।

লেঠেলদের মধ্যে থেকে কার ব্যঙ্গ-মিশ্রিত কথায় চন্দ্রকান্ত ফিরে দেখলেন একবার। সহাস্যে বললেন,—শক্তি প্রয়োগেও কোন লাভ হবে না, তোমাদের মেয়েকে মিলবে না। তবে চৌধুরাণী ঠাকরুণ যখন ডাক পাঠিয়েছেন তখন তাঁর আদেশ অমান্য করা অনুচিত মনে করি।

একান্ত অনিচ্ছায় পালকীতে উঠে বসলেন চন্দ্রকান্ত। হাতের পুলিন্দা

রাখলেন এক পাশে। পালকী ছুটতে থাকলো দ্রুতগতিতে। পালকীর মুক্ত-দ্বার থেকে জমিদার কৃষ্ণরামের ভগ্নগৃহের একপ্রান্ত অস্পষ্ট দেখা যায়। কৃষ্ণরামের সহধর্ম্মিণী বিন্ধ্যবাসিনীর রূপলাবণ্য মূর্ত হয়ে মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে। শুধু রাজকুমারী নয়, আনন্দকুমারীও দেখা দেয় যেন। দুই নারী যেন দুই পৃথক ধাতুতে গঠিত। একজন শান্তশিষ্টা, অন্যজন যৌবনচঞ্চলা। একজনের রূপ স্নিগ্ধসুন্দর, অন্য জন যেন জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড। চাঁদের আলোর মত কমনীয় একজন, অন্য জন যেন সূর্য্যের তীব্র রশ্মি। প্রথমা আকর্ষণ করে, দ্বিতীয়া দগ্ধ করে।

রাজকন্যা বিন্ধ্যবাসিনী কেঁদেই সারা হন। কেমন শোকার্তের মত অনুক্ষণ চোখের জল ফেলেন। নির্ব্বাসনের দণ্ড ভোগ করছেন তিনি, তাতে যেন দুঃখ নেই। আনন্দকুমারীর বিরহ-অনলে বুক জ্বলছে তাঁর। পুঁথি নকল করতে বসেছিলেন, কিন্তু লেখায় যেন মন বসে না কিছুতে। এক পঙক্তি লেখেন, আর কালির দাগে নিশ্চিহ্ন করেন সেই লেখা।

পরিচারিকা বললে,—কাটাকুটি করবে, না লেখালেখি করবে?

জলভরা চোখ তুললেন রাজকুমারী। বললেন,—মন লাগে না লেখায়। আনন্দকুমারীর কথা মনে পড়ে কেবলই। সে এখন কোথায় কে জানে? ইচ্ছা হয়, ছুটে গিয়ে একবার তাকে চোখের দেখা দেখে আসি! আনন্দর মা না জানি কত ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন!

আবার লেখায় মন দেন বিন্ধ্যবাসিনী। কিন্তু লেখনী যেন চলে না আর। কালি শুকিয়ে যায়। নতমস্তকে ব'সে থাকেন চুপচাপ। আনন্দকুমারীর হাসির শব্দ যেন কানে ভাসতে থাকে। তার অনাবিল হাসিতে কোন খাদ নেই। এমন মিষ্টি হাসি কখনও শোনা যায়নি। এমন স্পষ্ট কথা। নির্লাজ ভাবভঙ্গী চৌধুরীকন্যার। বেপরোয়া গতিবিধি। ভয় কাকে বলে জানে না।

বিন্ধ্যবাসিনী আর বাক্যব্যয় করেন না। লেখায় মন দেন। কিন্তু লেখনী চলে না যেন। কালি শুকিয়ে যায়। পরিচারিকা দূরে থেকে লক্ষ্য

করে জমিদার-পত্নীকে। অফুরাণ রূপ-ঐশ্বর্য্যের অধিকারী বিন্ধ্যবাসিনী। শূন্য দেহ, অলঙ্কারের লেশ মাত্র নেই। তবুও তাঁর অবয়বের অলঙ্কার দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করে। রাজকন্যার গড়ন আর গঠন দেখতে দেখতে মুগ্ধ হয়ে যায় যশোদা। লেখনী থামিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে আছেন তিনি। তুলট কাগজের শুভ্রতার মাঝে কি লেখা আছে কে জানে, বিন্ধ্যবাসিনী একাগ্র-চিত্তে যেন পড়ছেন সেই রহস্যকথা। পরিচারিকা স্থিরচোখে দেখছে তাঁর বর্ণভূষা।

ঐশ্বর্য্যের ছড়াছড়ি সর্ব্বত্র। যেদিকে চোখ যায় সেদিকেই দৃষ্টি আবদ্ধ হয়। লক্ষ্মীর এমন অকৃপণ কৃপা দেখা যায় না সচরাচর। যেমন পরিচ্ছন্ন, তেমন সাজসজ্জা চৌধুরীগৃহের। তামা, পিতল, কাঁসা আর রূপার আসবাব। ঘরে ঘরে জাজিম আর ফরাস—আবলুসের চৌকীতে। চাঁদোয়া-ঢাকা আড়কাঠ থেকে নানা রঙের রকম বেরকম ঝাড়-লণ্ঠন ঝুলছে। দেওয়ালে দেবদেবীর পট, পশুদের মাথা আর শিং। ঢাল আর তরোয়াল। কস্তুরী আতরের সুগন্ধ ছড়িয়ে আছে গৃহময়। চন্দ্রকান্ত দেখে দেখে বিস্মিত হন। খুঁটিয়ে দেখেন সকল কিছু। ঢালাও লম্বা দালানে মূর্ত্তির সারি। পাথর আর ধাতুর শিল্পশোভা—ভাস্কর্য্যের যাদুঘর দেখছেন যেন চন্দ্রকান্ত!

দালানের শেষ-প্রান্তে সূর্য্য-আলো পৌঁছায় না। তাই আঁধার-কালো।

—মাম অনুসর! আমাকে অনুসরণ করুন।

কার অনুরোধের সুর শুনলেন চন্দ্রকান্ত। কোন মূর্ত্তি কথা বলছে এমন মনুষ্য-কণ্ঠে! চতুর্দ্দিকে চোখ ফিরালেন চন্দ্রকান্ত। সহসা দেখলেন এক যাজক ব্রাহ্মণকে। চন্দ্রকান্ত তাকে বিলক্ষণ চেনেন, ব্রাহ্মণ এই চৌধুরীগৃহের মূল-পুরোহিত। কাশ্যপ গোত্রীয়, রাঢ়ী শ্রেণী।

—প্রাতঃপ্রণাম।

ব্রাহ্মণকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বললেন চন্দ্রকান্ত। অবিন্যস্ত উত্তরীয় সামলালেন। করজোড় কপালে ছোঁয়ালেন। চন্দ্রকান্ত চোখের তারা,

অচঞ্চল, স্থির। কথা শুনছেন, কিন্তু যেন শূন্য দৃষ্টি ফুটেছে চোখে। ব্রাহ্মণের পিছনে চললেন অবাধ্য পদক্ষেপে। অনিচ্ছা, তবুও চললেন।

ব্রাহ্মণ বলেন,—শুনা যায়, গত রাত্রে চৌধুরীকন্যা আনন্দকুমারী সপ্তগ্রামের জমিদার কৃষ্ণরামের ভগ্নালয়ে যায়। ততঃপর সেই স্থান থেকে নৌকা যাত্রা করে।

শব্দ এমন জ্বালাময়, তা যেন জানা ছিল না চন্দ্রকান্তর। ইচ্ছা হয়, ঐ ব্রাহ্মণের মুখে হাত চেপে কথা বলা থামিয়ে দেন এখনই। চন্দ্রকান্তর মুখে দুঃখানুভূতির কাতরতা পরিস্ফুট হয়। ঈষৎ নত কণ্ঠে বললেন,—আনন্দ-কুমারীকে পাওয়ার আশা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।

ব্রাহ্মণ চলতে চলতে হঠাৎ যেন স্তব্ধ হয়ে পড়েন। তাঁর পদক্ষেপে বিরতি পড়ে। খানিক চিন্তামগ্ন থেকে বললেন,—এই চরম সিদ্ধান্তের কিছু কারণ আছে?

—হাঁ মহাশয়! চন্দ্রকান্ত বললেন কৃত্রিম হাসির সঙ্গে। বললেন,—আপনারা জ্ঞাত হোন, আনন্দকে আমরা সকলে চিরদিনের মত হারিয়েছি। সে আছে, তবুও নাই। মহাশয়, আরও কতটা পথ? পা যে আর চলে না।

ব্রাহ্মণ বলেন,—এটি দেবত্রভুক্ত। এই স্থান থেকে সদরে পৌছাতে হবে। সদরের শেষে অন্দরমুখে যাওয়া হবে। চৌধুরীগৃহিণী সেই স্থলেই অপেক্ষমানা। আপনি অবশ্যই অবগত আছেন হিন্দু-বণিক-কুলরমণীগণ প্রায় অসূর্য্যম্পশ্যা। চৌধুরীপত্নী আপন মহল ত্যাগ করেন না।

চন্দ্রকান্ত হাসলেন মৃদুমন্দ। বললেন,—কেবল আনন্দই যত বাধাবিঘ্নকে অমান্য করে! নিষেধ মানে না।

—হাঁ, চৌধুরী-কন্যা স্বাধীনচেতা। এমন মেয়ে আমি তো আমার এই দীর্ঘ জীবনে কখনও দেখি নাই। ব্রাহ্মণ এক দালানের বাঁক ঘুরে কথা বললেন।

দেবত্র মন্দির, মণ্ডপ, দালান ও উঠানের সংলগ্ন ফুলবাগান। অন্য গাছের স্থান নেই, আছে মাত্র গন্ধপুষ্পের গাছ আর লতা। দেবদেবীর পূজায় বৃথা-ফুলের ঠাঁই নেই।

সদরের তোরণদ্বারের মস্তকে সঙ্কটনাশন গণেশমূর্তি। সাম্রাজ্য দেন তিনি,—আয়ু, কাম, অর্থ আর সিদ্ধি দান করেন। সম্রাটের দেবতা তিনি, অনাথের বন্ধু। গৌরীপুত্র গণেশকে প্রণাম জানালেন চন্দ্রকান্ত। পরব্রহ্মরূপ গণেশ গণেশকে—সর্ব্ববিদ্যা আর সর্ব্বসিদ্ধির দেবতাকে।

ব্রাহ্মণ প্রশ্ন করলেন নত কণ্ঠে। বললেন,—মহাশয়ের সঙ্গে কি চৌধুরী-কন্যার পূর্ব্ব-পরিচয় আছে?

ঈষৎ হাসলেন চন্দ্রকান্ত। ক্ষণেক যেন অন্যমনা থাকলেন। বললেন,—হাঁ, আনন্দ আমার খুবই পরিচিতা। সে আমার বাল্যসহচরী। শৈশবসঙ্গিনী।

—মহাশয়ের কর্ম্ম কি?

—একটি চতুষ্পাঠী পরিচালনা করি। দান আর সিধায় উদর চালাই। কোনক্রমে দিন গুজরাণ করি।

—আপনার সহ আনন্দকুমারীর শেষ সাক্ষাৎ হয় কবে?

—গত রজনীতে।

চন্দ্রকান্ত মিথ্যা বলেন না। মিথ্যার আশ্রয় ফল শুভ হয় না, তা তিনি জানেন।

ব্রাহ্মণ একবার চক্ষু ফিরিয়ে দেখলেন অনুসরণকারীকে। তাঁর আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করলেন। বললেন,—মহাশয়, আর কিছু জানতে চাই না আমি। চৌধুরী-গৃহিণী এখন যা জানতে চান জানাবেন।

—তথাস্তু।

ব্রাহ্মণ আবার কথা বললেন। বললেন,—বিষয়টি খুবই রহস্যজনক মনে হয়।

এক দ্বারমুখে পৌঁছে ব্রাহ্মণ গতি রহিত করলেন। বললেন,—মহাশয়, এই স্থানেই আমি আপনাকে ত্যাগ করি। আমি যাই, আপনি থাকেন। চৌধুরী-গৃহিণীর মহলের এই প্রবেশদ্বার।

চৌধুরাণী আকুল নয়নে অপেক্ষায় ছিলেন। কান্নার আবেগে তিনি যেন বাক্যহীনা। দূর থেকে তিনি লক্ষ্য করেছেন, দুয়োরে একজন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর পুরুষ এসে উপস্থিত হয়েছেন। চৌধুরাণী সজলচোখে দেখেন আগন্তুক

অতি সুপুরুষ। তাঁর শরীর দৃঢ়; বক্ষ বিশাল; ললাট বিস্তৃত; বর্ণ কাঞ্চন-সন্নিভ, মুখকান্তি জ্ঞানগাম্ভীর্য্যপূর্ণ।

কান্নার বেগ সামলে চৌধুরী-গৃহিণী বললেন,—আমার একমাত্র মেয়েটাকে হারিয়ে আমি সর্ব্বহারা হয়েছি। তাকে ফিরিয়ে দাও আমার কাছে। বল সে এখন কোথায়? কেমন আছে? বেঁচে আছে না মরেছে?

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন চন্দ্রকান্ত। কি বলবেন উত্তরে, ভাবতে থাকেন যেন। কপালে কর স্পর্শ করেন। ভেবে ভেবে বললেন,—আনন্দকুমারীকে এক বিধর্ম্মী হরণ করেছে গত রাতে।

—কে সেই পাষণ্ড? কি নাম তার? চৌধুরাণী কথা বলতে বলতে ব্যস্ত হয়ে উঠেন যেন। ধৈর্য্য ধারণ করতে পারেন না আর।

চন্দ্রকান্ত বললেন,—ইংরাজপক্ষের এক কর্ম্মচারী। তার নাম ম্যালেট। জরীপের কাজ করে সে। গত কয়েক মাস যাবৎ মান্দারণের আশে-পাশে ঘোরাঘুরি আর মাপামাপির কাজ করছে। ইংরাজের কুঠীতে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে, যদি কোন উপায় হয় এই আশায়। চৌধুরী মহাশয় আগে আসেন, তিনিই এই কাজ করতে পারেন। তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি অনস্বীকার্য্য। ইংরাজদের সঙ্গে তাঁর ব্যবসায়সূত্রে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। আমি জানি, ইংরাজ, ওলন্দাজ আর ফরাসী কুঠীতে তিনি মাল সরবরাহ করেন। সমগ্র বাঙলা দেশে বাণিজ্য চালনার অধিকার তাঁর আছে। চৌধুরী মশাইয়ের খুব নামডাক বিদেশী মহলে।

চৌধুরাণী প্রৌঢ়ত্ব অতিক্রম করেছেন, কিন্তু বার্দ্ধক্যের সীমায় যান নি এখনও। ভারী ওজনের ক'খানা সোনার গয়না তাঁর দেহে। পাটিহার গলায়; কোমরে মোহরগাথা। সাপ-ভাগা ওপর হাতে। খাড়ু, চুড়ি আর বালা প্রায় কনুই পর্য্যন্ত। পায়ে রূপার আঙট, কপালে সিঁদুরের টিপ নয়, টপ্পা।

—মাঝি তো বলে যে আপনিও নাকি ছিলেন আনন্দর বজরায়। চৌধুরাণী প্রায় যেন ফিসফিসিয়ে কথাগুলি বললেন।

—মিথ্যা কথা বলে নাই মাঝি। হাঁ আমিও ছিলাম।

আবার সেই ফিসফিস সুরের কথা। চৌধুরাণী বললেন,—আমরা জানি, অনন্দকুমারী কেন বিবাহে সম্মত হন না। আমরা জানি তার কি মনের বাসনা। আমরা জানি সে আপনাকেই—

কথা আর শেষ হয় না। শেষ-শেষি গিয়ে বাক সংযত করলেন চৌধুরী-গৃহিণী।

—গত রাত্রে আমাদের উভয়ের মধ্যে মাল্য-বিনিময় হয়েছে।

—কোথায়?

—আসমান দীঘির তীরে। জমিদার গৃহলগ্ন পুষ্প-উদ্যানে।

—সাক্ষী কে ছিল?

—আকাশের চাঁদ আর তারকারাজি। উদ্যানের বৃক্ষসমূহ। আসমান দীঘি। রাত্রির অন্ধকার।

—মানুষ কোন কেউ?

—না, কেহ নয়।

—তবে আপনি রক্ষা করলেন না কেন আনন্দকে? আমার বাছাকে?

—রক্ষার কোন উপায় ছিল না। ইংরাজপক্ষের গুলী-বারুদের সঙ্গে লড়াই চালনার মত যোগ্য অস্ত্র ছিল না কাছে।

—আবার যদি আনন্দকে কখনও ফিরে পাই, আপনি তাকে গ্রহণ করবেন কি? চৌধুরাণী আর ধীর কণ্ঠে কথা বলেন না। শেষ কথাগুলি বললেন যেন স্বর উঁচিয়ে।

—ঠিক এই মুহূর্তে আমি আমার বক্তব্য জানাতে পারি না। আমাকে চিন্তার অবকাশ দেওয়া হোক। কয়েক দিনের সময় দেওয়া হোক।

এমন বিষম এক সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে কল্পনায় ছিল না যেন চন্দ্রকান্তর। কপালের দুই পাশে ঘামের বিন্দু ফুটছে একে একে। নতমাথা আর উঠছে না। আনত দৃষ্টি ফিরছে না আর কোথাও। মুখের সৌম্যতা মুছে যায় যেন। মাঝ-কপালে আকুঞ্চন।

—আগে আপনার কথা পাই, তারপর অন্য কাজ আমার। কথা যদি না পাই, মিথ্যা আর তাকে ফিরিয়ে মুখ পুড়াবো না।

কান্নার সুরে বললেন চৌধুরাণী। তাঁর কোরা শাড়ীর চওড়া লাল পাড় দুয়োরের পাশ থেকে একবার দেখা দেয় যেন। দেখা যায় দুখানি পা। আলতায় লাল।

চৌধুরাণী আবার বলেন,—বিন্ধ্যবাসিনী মানুষটা কেমন? আমার আনন্দকে কি সেই এই বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে?

—আপনার অনুমানে বিন্দুমাত্র সত্য নাই। রাজকন্যার তুলনা খুঁজে মেলে না। আনন্দের প্রতি তাঁর স্নেহ-ভালবাসা অপার। এই দুর্ঘটনায় তিনিও খুবই ব্যথা পেয়েছেন।

আকাশ থেকে পড়লেন যেন চৌধুরী-গৃহিণী। বিস্ময় প্রকাশ করলেন মুখে। বললেন,—রাজকন্যার প্রশংসায় আনন্দ যেন পঞ্চমুখ ছিল।

—বিদায় মা ঠাকরুণ!

—আপনার সিদ্ধান্ত না জানা পর্য্যন্ত আমার চোখে ঘুম নেই জানবেন।

—আপনি অধীর হবেন না। শীঘ্র আসছি আমি।

—আপনার জয় হোক।

—বিদায়!

আকাশে অনেক তারা। গ্রহ আর উপগ্রহ। রাত্রির অন্ধকারে পৃথিবীর মাটি থেকে জ্যোতিষ্কের আকৃতি ঠাওরানো যায় না। আয়তন বোঝা যায় না। গুণাগুণের মান নির্ণয় সম্ভব হয় না। শুধু দেখা যায়, নক্ষত্রমণ্ডলী ম্লান হয়ে থাকে চাঁদের আশ-পাশে। উজ্জ্বল চন্দ্রের কাছে দেখায় যেন নিবু-নিবু দীপালোক। দপ করে কখন হয়তো নিবে যাবে!

বিন্ধ্যবাসিনী যেন চাঁদের সমতুল্য। আর আর সকলের সঙ্গে তাঁর তুলনা চলে না যেন। চন্দ্রকান্ত পথ চলতে চলতে গভীর চিন্তায় যেন আচ্ছন্ন হয়ে যান। আকাশের চাঁদের মত তাঁর মন-আকাশে বিন্ধ্যবাসিনীর মুখচন্দ্র ভেসে ওঠে বার বার। পবিত্র এক অনুভূতির আবেগে রাজকন্যাকে অন্তরের শ্রদ্ধা জানাতে ইচ্ছা হয়। বিন্ধ্যবাসিনীর মত সহনশীলতা সহসা যেন দেখা যায় না। কিন্তু চৌধুরী-গৃহিণীর কথা আর আবেদনের ভাষা যেন কানে বিষ

ছড়ায় এখনও। কি কথা বললেন তিনি! কি অসম্ভব কথা! বৈশাখের প্রখর সূর্য্যতাপে পথের মাটি উষ্ণ হয়ে উঠেছে। চন্দ্রকান্ত চলার গতি দ্রুত করেন। পথের পাশের ঘাস-মাটি ধরে এগিয়ে চললেন। অনেক দূর থেকে দৃষ্টিপথে পড়ে কৃষ্ণরামের ভগ্ন-আলয়। জরা আর ব্যাধিগ্রস্ত ইটের কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে ধ্বংসের পথ চেয়ে। পাঁকের পদ্মের মত ঐ ভাঙা দেউলে যেন ফুটে আছেন লক্ষ্মীস্বরূপা বিন্ধ্যবাসিনী।

আকাশের চাঁদের মত তাঁর মন-আকাশে বার বার উদয় হয় সেই চাঁদ-মুখের। মনে মনে লজ্জানুভব করতে হয়। একবার যদি তাঁর দেখা পাওয়া যায়! তাঁর মুখের মিষ্টি মিষ্টি কথা শোনা যায়! পথে জন-মানুষ নেই, তবুও লজ্জায় যেন অধীর হয়ে ওঠেন চন্দ্রকান্ত। আরও দ্রুত চলতে থাকেন তিনি।

অনভ্যাসের ফল। হাত চলে না যেন। এক পঙক্তি লিখতে কাটাকুটি করতে হয় কত। পুঁথি নকলের কাজ পেয়ে যেন সব দুঃখ-জ্বালা ভুলে গেছেন রাজকুমারী। তুলট কাগজের বুকে কালির আখর জমতে থাকে সারি সারি। লেখার আড়ষ্টতা আর না থাকলেও অত্যন্ত সন্তর্পণে লেখনী চালনা করেন তিনি।

চুপচাপ থাকতে পারে না যশোদা। কেমন যেন আনচান করে। বিরক্তির সুরে কাটা-কাটা কথা বলে। বললে,—রান্না জুড়িয়ে যাচ্ছে যে ওদিকে। খাওয়া-দাওয়া সেরে যা খুশী কর না, বলতে আসবো না তখন।

মৃদু মৃদু হাসির ঝিলিক খেললো বিন্ধ্যবাসিনীর লাল অধরপ্রান্তে। হেসে হেসে বললেন,—এই পাতা লেখা শেষ না হলে উঠবো না আমি, তুমি যাই বল না কেন।

লেখা না থামিয়ে কথা বলেন রাজকন্যা। অসাবধানে তাঁর পিঠের কাপড় সরে গেছে। দুগ্ধশুভ্র পৃষ্ঠদেশে এলোকেশের বোঝা নেমেছে। রুক্ষ কুন্তল উড়ছে মাঝে মাঝে। লেখায় ক্ষণেক বিরত হয়ে মধ্যদিনের আকাশে চোখ তুললেন বিন্ধ্যবাসিনী। রূপার চাঁদোয়া যেন মহাশূন্যে। সূর্য্যের আলোয়

ঝলমল করছে শুভ্রমেঘ। আকাশে চিল আর শকুনি উড়ছে। তৃষ্ণার্ত কাক ডাকছে কোথায়। অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে যেন কোন্ অদৃশ্যে, বাতাসে যেন আগুনের পরশ লাগে।

পরিচারিকাও বললে,—এত যে লেখা-লেখি করছো, ভাইদের দু-চার ছত্র লিখতে পারছো না?

—কি লিখতে হবে তাই শুনি?

—লিখতে হবে যে, আমাদের জমিদার যা চাইছেন যেন দিয়ে দেওয়া হয়।

যশোদার কথা শুনে আবার খিল-খিল হাসি ধরলেন রাজকুমারী। আলগা শাড়ীর আঁচল ঠিকঠাক করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন ফাঁকা হাওয়ায়।

আমোদরের দেহরেখা দেখলেন ঘরমুখের দালান থেকে। কাঁচা রূপার প্রবাহ বইছে যেন। মধ্যাকাশের সূর্য্যের প্রতিচ্ছায়া আমোদরের বুকে। দিগ্বলয়ে বনরেখা স্তব্ধ হয়ে আছে। আকাশস্পর্শী গাছরা যেন দাহনজ্বালায় ক্লান্ত। পত্রশাখা হয়তো তাই নিষ্কম্প।

—দাবী যদি ভিত্তিহীন হয় যশোদা? দালান থেকে কথা বললেন রাজকুমারী। এক জলপাত্র থেকে এক আঁচলা জল তুলে চোখে-মুখে ছোঁয়ালেন।

—জানি না বাছা অত-শত।—-কথা বলতে বলতে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে চলে পরিচারিকা। সিঁড়ির ধাপে ধাপে শব্দ তুলে নীচে নেমে যায়।

দুই ভায়ের মুখ দুটি মনে পড়ে রাজকুমারীর। রাজাবাহাদুর আর রাজকুমারকে। রাজা কালীশঙ্কর আর কুমার কাশীশঙ্করকে। বেশ ভুলে ছিলেন এতক্ষণ, হঠাৎ যেন মনে পড়লো আর বুকটা হু-হু করে উঠলো। চোখে জলের চিকণ খেললো। সিঁড়ির দিকে চললেন বিন্ধ্যবাসিনী।

রাজাবাহাদুর তখন নেশায় আচ্ছন্ন। মজলিস ঘরের ফরাসে এলিয়ে পড়েছেন। দুজন খানসামা মুক্তার ঝালর-দেওয়া বড় হাতপাখা খেলিয়ে

খেলিয়ে বাতাস বওয়াচ্ছে। দরবার ভেঙে গেছে আজ অসময়ে। দালাল আর জহুরীদের দল এসে ফিরে গেছে রাজার সাক্ষাৎ না পেয়ে। কাগজে ইজার চুক্তিতে সই হল না আজ আর। রাজাবাহাদুরের হাত চললো না। ময়ূরপেখমের কলম খসে পড়লো হাত থেকে। কালীশঙ্কর কিছুতেই চোখ মেলে তাকালেন না। দেওয়ানের বারম্বার নিষেধ অনুরোধ সত্ত্বেও রাজা আসবের পাত্র হস্তান্তর করতে চাইলেন না। নেশায় যেন সমধি-মগ্ন হয়ে থাকলেন।

তবুও দেওয়ান ডাক দিলেন রাজার কানে কানে। বললেন,—হুজুর, কুমারবাহাদুর দর্শন প্রার্থনা করছেন। আপনি প্রকৃতিস্থ হোন।

—কুমারবাহাদুর কাশীশঙ্কর। কর্ণকুহরে নামটি পৌছতেই পূরা চোখ খুললেন কালীশঙ্কর। জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন,—কোথায় তিনি?

—দরবারে অপেক্ষা করছেন।

—শুয়োর, গাধা! সে কি অপেক্ষার ধার ধারে?

দেওয়ান প্রায় ছুটলেন মজলিস ঘরের বাইরে। অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুয়োরে দেখা দিলেন কুমার কাশীশঙ্কর। সত্যস্নাত তিনি মজলিসে আসামাত্র সুগন্ধি কেশতৈলের গন্ধ ভাসলো। গরদের জোড় পরিধানে। কুঁচানো ধুতি আর চাদর। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা।

—রাজা, আমি তো কাল প্রাতেই যাত্রা করতে মনস্থ করেছি।

চুপি চুপি কথা বলেন রাজাবাহাদুর। বললেন,—কোথায় ভাই?

—আমাদের রাজকুমারী সহোদরাকে হরণ করতে।

—তোমার জয় হোক। লোক-লস্কর সঙ্গে লবে তো?

—হাঁ।

—অস্ত্রশস্ত্র?

—হাঁ।

—রক্ষা কবচ?

—হাঁ।

—আহা?

—হাঁ।

—যাত্রা নদীপথে না অশ্বারোহণে ?

—নদীপথেই যাওয়া স্থির করেছি।

—দেখিও কিছু না প্রকাশ পায়। ঘুণাক্ষরেও যেন কেউ না জানে। আর কি চাও তাই বল ?

—আর কিছুই নয়, তোমার পদধূলি ভিক্ষা করি।

কথা বলতে বলতে কাশীশঙ্কর জ্যেষ্ঠের পাদস্পর্শ করলেন। সেই হাত নিজের কপালে ছোঁয়ালেন।

রাজাবাহাদুর অবশ হাত তুলে আশীষ জানালেন। বললেন—তিষ্ঠ, যাইও না। এই অঙ্গুরীয় তোমাকে আমি দান করলাম। তোমার হাতে স্থান পাক। অত্যন্ত সুফলদায়ী এই অঙ্গুরীয়টি।

কুমার কাশীশঙ্কর আঙটি হাতে পেয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। নবরত্নের পদ্ম আঙটিতে। বললেন,—প্রাতে যাত্রার পূর্বে আর সাক্ষাৎ হবে না।

—তথাস্তু।

গরদের চাদরের আঁচল উড়িয়ে কুমার কাশীশঙ্কর মজলিস ত্যাগ করলেন। ঘরে সুগন্ধি তেলের গন্ধ ভাসিয়ে রেখে গেলেন। চোখ আবার বন্ধ করলেন রাজাবাহাদুর। কত যেন চিন্তা তাঁর! ভাবনার জ্বালা নেই আর। যেন নিদ্রায় অচেতন হলেন রাজাবাহাদুর। তৃপ্তির শ্বাস ফেললেন।

অপরাহ্নের আকাশ যেন করালমূর্তি ধারণ করে।

একদিকে অস্তগামী সূর্য্যের শুভ্রলাল আলোর বিস্তার, অন্য দিকে শ্যাম-গভীর মেঘের জটলা। কে যে কাকে গ্রাস করবে বোঝা যায় না। আমোদরের জলে বহুরূপী আকাশের প্রতিছায়া কাঁপছে। বজ্রপাতের আশঙ্কায় দ্রুত পথ চলে পথিক জন। কাল-বৈশাখীর ঝড় আসছে কি মহা উল্লাসে নাচতে নাচতে ? মাটির বুক থেকে ধুলো উড়ছে সর্পিল গতিতে।

ঠাণ্ডা এক ঝলক বাতাস এসে বিন্ধ্যবাসিনীর কপাল স্পর্শ করে। কেমন এক পরিতৃপ্তির সঙ্গে দুই চোখ বন্ধ করলেন রাজকুমারী। নিমেষহীন নিশ্চল চোখে মেঘের বৈচিত্র্য দেখছিলেন না গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন—তা তাঁর মনই জানে! উন্মুক্ত ছাদের এক প্রান্তে মৌন স্তব্ধতায় ডুবে থাকেন। পৃষ্ঠের কেশভার যেন এক খণ্ড কালো মেঘ। কপালের পরে কুঞ্চিত কুন্তল উড়ছে। রাজকুমারীর সমস্ত দেহ যেন অতৃপ্ত হয়ে আছে। আজ অঙ্গে যৌবনের তরঙ্গ—কেই বা দেখে! অনাদৃত কুসুম, হয়তো কোন দিন ঝরে যাবে প্রতিকূল হাওয়ায়। আবার আকাশে চোখ তুললেন বিন্ধ্যবাসিনী। বন্দিনীর চোখে আকাশের আহ্বান যেন মুক্তির আস্বাদ। অবাধ্য মন যেন আর একা থাকতে চায় না। অন্য কোন মনে সমর্পণ করতে চায় নিজেকে। মনে মনে মিলতে চায়।

দেখতে দেখতে সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে আসে। দূরের বনরেখা মিলিয়ে যায় অন্ধকারে। বিদ্যুতের আলো যেন অশ্রান্ত। ঘন ঘন চমকে উঠছে। অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার দেখা দেয় বক্রগতিতে। গাছের পাখীরা সন্ত্রাসে শিউরে ওঠে।

দেখতে দেখতে কখন আঁধার ঘন হয়েছে, নজরে পড়ে না যেন। রাজকুমারী চোখ ফিরিয়ে দেখলেন দূরান্ত। কিছু আর দেখা যায় না। আমোদরের জলও নয়।

—পাল্কী এসেছে বৌ। তোমাকে নিতে এসেছে।

আচমকা হঠাৎ কথা বললে পরিচারিকা, ছাদের দুয়োরে দাঁড়িয়ে। থামলো না এক কথায়, বললে,—যা দুর্য্যোগ, কোথায় বা যাবে এখন।

পাল্কী এসেছে, শিউরে উঠলেন যেন বিন্ধ্যবাসিনী। ভয়ে যেন শ্বাস বন্ধ হয়। মুখে যেন কথা আসে না। অস্ফুটে বলেন,—কোথা থেকে পাল্কী এলো? সাতগাঁ থেকে?

—সাতগাঁ থেকে পাল্কী আসবে! কথা বলতে বলতে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলো পরিচারিকা। বললে,—না গো না, চৌধুরী-বাড়ী থেকে পাল্কী এসেছে। চৌধুরীগিন্নী পাঠিয়েছে। কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুয়োর

ত্যাগ করলো যশোদা। চোখের বাইরে গিয়ে বললে,—যাই আমি, সাঁঝের বাতি জ্বেলে আসি।

বুকে কাঁপন লাগলো। বিন্ধ্যবাসিনী কেমন যেন নিরুৎসাহিত হয়ে ভেঙে পড়লেন। খানিক নিশ্চুপ বসে থেকে উঠে পড়লেন ধীরে ধীরে। ছাদ ত্যাগ করে ঘরে চললেন। বুকের কম্পন যেন থামতে চায় না।

রাজকুমারী দালান থেকে আকাশে চোখ তুললেন। ঘনকালো মেঘের জটলা হাওয়ার দাপটে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেছে। মাথার আকাশ থেকে ভেসে গেছে অনেক দূরে, সেই যেখানে মান্দারণ শেষ হয়েছে সেই দিকে।

চাঁদ উঠেছে কখন। মেঘ মলিনতার আড়াল থেকে হেসে হেসে দেখা দেয় একেকবার। ভেসে-যাওয়া মেঘের আঁচলে ঢাকা ছিল এতক্ষণ। ঝড়ের রাতের চাঁদ, সোনা রঙে তাই যেন আজ আর তেমন জৌলুশ নেই।

—পাল্কী ফিরিয়ে দিই বৌ?

ঘরের কোণের কুলুঙ্গীতে জলন্ত পিদিম রাখতে রাখতে কথা বললে পরিচারিকা। তৈল-দীপের আলোর কাছাকাছি পতঙ্গ নাচতে থাকলো।

—না। বিন্ধ্যবাসিনী ভাঙা গলায় বললেন,—আমি যাবো যশো, তুমিও আমার সহ যাবে। আনন্দের মা বিপদের সময় ডাক পঠিয়েছেন, না যাওয়া অন্যায় নয়, পাপ। আমি পাপের ভাগী হতে চাই না। ঘরের কোণের দালান থেকে রাজকন্যা কথা বলেছেন। তাঁর কথার সুর যেন বিষণ্ণ। চোখ ফিরিয়ে আছেন অন্য দিকে। আমোদরের জল-কল্লোলের আছাড়ি পিছাড়ি শব্দ শুনছেন।

—এই ঝড়ের রাতে ঘরের বার হবে কোন সাহসে! মরতে চাও না কি? না তুমি আমার সহায় তো সাহসের অভাব হবে না, কথার শেষে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন রাজকন্যা। বললেন, দোহাই যশোদা, অমত করিস না আর।

প্রহরী ডাকি তবে?

হাঁ, এখনই, আর দেরী নয়।

কুঙ্গীর পিদিমের আলোয় সহসা নিজের দিকে চোখ পড়লো রাজকুমারীর।

দেখলেন বেশ তাঁর ম্লান, কেশ বন্ধনহীন। জটা পড়েছ হয়তো এলোচুলের গোঝায়। নিজের হাত দুখানি দেখলেন। অলঙ্কারের লেশ নেই, মাত্র লোহা আর শাঁখা, লাল রঙের কড়, গালার বালা। পালঙের বিছানায় হাত-আয়না ছিল একখানা। অভ্রের আয়না তুলে দেখলেন অনিচ্ছায়। দুধবর্ণ যেন আর নেই আগের মত। কোথায় সেই রূপসায়র! ভোরের ফ্যাকাশে চাঁদের মত যেন, স্বর্ণাভার চিহ্ন নেই।

কি মনে পড়লো কে জানে, আয়নাখানা আবার নামিয়ে রাখতে হল। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন বিন্ধ্যবাসিনী। দড়ির আলনা থেকে বদলের শাড়ী নামালেন। লালপাড় পাটের শাড়ী। তসরের গা-ঢাকা চাদর। গায়ে যে অলঙ্কার নেই, আর কারও চোখে পড়বে না। রাতের বেলায় আয়নায় মুখ দেখতে নেই, তাই হয়তো দর্পণের এই মানের হানি। নিজেকে আর দেখলেন না রাজকন্যা। সরিয়ে রাখলেন তাকে। রাতে আয়নায় মুখ দেখলে না কি কলঙ্ক রটনা হয় তার নামে, যে দেখে। মিথ্যা অপবাদ রটে। দুর্নাম দেয় শত্রুলোকে।

শাড়ী বদলের পর বিন্ধ্যবাসিনী চাদরে উর্দ্ধাঙ্গ ঢাকলেন। তাঁর চলনের ভঙ্গীটি বেশ। চলনের সঙ্গে-সঙ্গে দেহরেখা বিকশিত হয়ে ওঠে; কেমন এক রাজসিক সদর্প পদক্ষেপে চলেন তিনি। বাঘ আর কুকুরের চলায় না কি অনেক পার্থক্য। রাজার মেয়ে বিন্ধ্যবাসিনী, বাঘের বাচ্ছা! মেলের ঘরের মেয়ে নয়, কুলীনকন্যা।

—তোমার প্রহরী আজ তাড়ি টেনে বেহুঁস হয়ে আছে বৌ! আর ডাকা-ডাকি করতে ভরসা পাইনি তাই।

—নেশায় অচৈতন্য!

—হাঁ গো হাঁ। হুঁস নেই তার। পাশে তাড়ির কলসী উপুড় হয়ে পড়ে আছে! মাংসের কাবাবে বেড়ালে মুখ দিচ্ছে। একদল মানুষ এসেছে, চৌধুরীদের পাল্কী এসেছে, জানেও না।

—ঘরে শেকল তুলে দাও যশো? দীপের আলো জ্বলুক। চল আমরা বেরিয়ে পড়ি।

—তুমি এগোও, আমি জানলা-দরজা বন্ধ করি। ঘরের শেকল তুলতে তুলতে কথা বলে যশোদা। হাতের কাজ সারতে সারতে, সাবধানী দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে।

বাইরে হাওয়া চলেছে এলোমেলো। রাজকুমারী দালানে এসে দাঁড়াতেই তাঁর কেশ-বাস চঞ্চল হয়ে ওঠে। দিনের শেষে এতক্ষণে বাতাসে যেন হিমস্নিগ্ধতা ভেসেছে। কাছাকাছি কিম্বা দূরে কোথায় হয়তো আকাশ থেকে ধারা বর্ষণ হয়েছে।

গৃহপ্রাঙ্গণে মশাল জ্বলছে। পাল্কীর বাহকরা খানিক ফুরসুৎ পেয়ে গাঁজার কলকেয় আগুন ধরিয়েছে। মশালের জোরালো আলোয় বাহকদের তৈলাক্ত কালো আকৃতি চিকণ তুলছে। মশালের উর্দ্ধগামী শিখা সতেজ বাতাসের সঙ্গে যেন যুদ্ধ চালিয়েছে।

বিন্ধ্যবাসিনী এক লহমায় দেখলেন, চৌধুরীগৃহের মূল্যবান পাল্কী। রূপার পাতে মোড়া। পাল্কীগাত্র চিত্রবিচিত্র। লাল শালুর পর্দা ঝুলছে পাল্কীর দুয়োরে। দ্বাদশ জন বাহক আর পাইক পেয়াদা—যাত্রীদের দেখে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালো তারা। মশালচি মশাল ধরলো হাতে।

লাল শালুর পর্দা সরিয়ে পরিচারিকা পাল্কীর ভেতর থেকে ফিসফিসিয়ে বললে,—পা চালিয়ে যেতে হবে। ঢিমে তালে গেলে চলবে না।

পাল্কী থামে না। দুলতে দুলতে নাচতে নাচতে এগিয়ে চলে মেঠো পথ ধরে। গন্তব্যে স্থানে না পৌঁছে যেন থামবে না। বাহকরা ছড়া কাটতে কাটতে বয়ে চলেছে। সমুখ ছাড়া কোন দিকে দৃক্‌পাত নেই তাদের।

গঙ্গানদীর খরস্রোতে দ্রুতগতিতে ভেসে চলেছে ম্যালেটের বজরা মাঝ-গঙ্গা ধরে। প্রথম রাত্রির আঁধার-প্রলেপে তীরভূমি অদৃশ্য হয়ে গেছে। ঠাণ্ডা বাতাস চলছে উত্তর মুখে। মাঝিদের সর্দার লণ্ঠন জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে কখন। রেড়ীর তেলের আলো।

পুরো একটি রাত ঘুম নেই চোখে, তাই হয়তো আনন্দকুমারী ঘুমে অচেতন হয়ে আছে। যেন এক যুগ ঘুম হয়নি, এমনই তার ঘুমের ঘোর।

ম্যালেট বসে আছে চৌধুরাণীর পাশে। বজরার কাঠের দেয়ালে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে আছে আনন্দকুমারীর মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। তারা-ভরা আকাশে চোখ তুলে অন্ধকারে কি দেখছে ম্যালেট! আকাশের পটে নক্ষত্র-অক্ষরে কি যেন লেখা আছে—এক পাশে পানপাত্র। ডিকেণ্টার আর পেগ-গ্লাস। খাঁটি স্কচ হুইকি খায় ম্যালেট। এ যেন তার প্রাত্যহিক অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে।

—বজরা লাগাই সায়েব? মাঝিদের সর্দ্দার বজরার গলুই থেকে কথা বললে।

এপাশে ওপাশে মাথা দোলায় ম্যালেট। বলে,—নো, নো, নো। কথার শেষে আবার চোখ তুললো আকাশে। নক্ষত্র-অক্ষরে লেখা পড়তে থাকলো। নেশার ঘোরে কি না কে জানে, ম্যালেট বিড়বিড়িয়ে বকতে থাকে। থেমে থেমে বলে আপন মনে। আকাশে যত তারা, তাদের সঙ্গে যেন কত দিনের পরিচয়। ম্যালেট থেমে থেমে বলে,—ক্যাপ্রিকর্ণ! জেমিনি! নেপচুন! সেমি-সেক্সটাইল! লিবরা! ইউরেনাস্!

সন্ধ্যালোক ছড়িয়েছে গঙ্গার বুকে। এই মাত্র যেন দেখা দিয়েছে চাঁদ। মেঘের আড়াল থেকে মুখ দেখিয়েছে। নববধূ যেন সলজ্জায় গুণ্ঠন সরিয়েছে। আকাশের কোথাও নীহারিকা, কোথাও ছায়াপথ। কোথাও যুগ্মতারা, কোথাও সপ্তর্ষিমণ্ডল।

ম্যালেটের পাশে সোনামুখী চাঁদ যেন। আকাশ থেকে কখন নেমে এসেছে। চোখে পড়তেই ঝুঁকে দেখলো ম্যালেট। চাঁদের কপালে একটি চুমা দিলো অত্যন্ত সন্তর্পণে।

চোখ চাইলো চৌধুরাণী। খানিক বিস্ময়ের চোখে তাকিয়ে দেখলো ম্যালেটকে। তার পর ক্ষীণ হাসি হেসে আবার চোখ বন্ধ করলো! তার কপালে হাত বুলিয়ে দেয় ম্যালেট। কোঁকড়া চুলের রাশিতে আঙুল চালায়। আনন্দকুমারী ধীরে ধীরে ম্যালেটের হাতখানি কপাল থেকে

সরিয়ে নিজের বুকের 'পরে রাখলো। ধরে রাখলো নিজের হাতে। চেপে রাখলো।

ম্যালেট দেখছিল যেন সাগ্রহে, ঘুমালে তাকে কত সুন্দর দেখায়! চৌধুরাণীর আপাদমস্তক সে দেখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। ফুলের মত কোমল যেন আনন্দকুমারীর দেহ। নধর নরম গঠন। শিল্পীর দৃষ্টি ম্যালেটের চোখে। শ্বেত প্রস্তরের মূর্তির মত দেখে যেন চৌধুরাণীকে। বটিসেলী, ম্যানটেগ্‌না কিংবা লিওনার্দোর আঁকা নারী মূর্তির সমতুলনীয়।

কাছে কাছে থেকে থেকে দ্বিধা-সংশয় যেন ঘুচে গেছে চৌধুরাণীর। মনের দ্বন্দ্ব কেটে গেছে। রাগের বদলে যেন অনুরাগে মন ভিজেছে। মৌন স্তব্ধতা মুছে গেছে মুখ থেকে। হাসি ফুটেছে লাল অধরে।

আবার বকতে শুরু করলো ম্যালেট। গান গাইতে থাকলো যেন সুরেল ছন্দে।

মুহূর্তের জন্য সাবধান হয় যেন ম্যালেট। তৎক্ষণাৎ আবার যেমনকার তেমনি। চোখে নেশা না ভালবাসা ফুটিয়ে আনন্দর মুখের কাছে মুখ এগিয়ে নিয়ে যায়।

চৌধুরাণী ইশারায় জানায় ঘরের বাইরে আরও মানুষ আছে। মাঝিরা আছে। ম্যালেট তাদের মানে না। শুধু যে গোপনেই প্রেম হয়, বিশ্বাস করে না ম্যালেট। ভালবাসাকে চেপে রাখতে পারে না সে।

আধ-ঘুম আধ-জাগার মধ্যে থেকে ম্যালেটের আবেদনে-নিবেদনে আরও যেন অনেক বেশী সুখী হয় চৌধুরাণী। স্বর্গসুখের মত পৃথিবীতে এমন আর কি আছে?

জলের গতির সঙ্গে সঙ্গে বজরা ভেসে চলেছে। হাল বাইতে হয় না তাই। মাঝিরা জিরেন পেয়েছে।

মান্দারণে তখন বৈশাখী ঝড়ের তাণ্ডব চলেছে। গাছের ডাল খসে খসে পড়ছে বাতাসের দাপটে। বিদ্যুৎ চমকে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে। হাওয়ার

ঘুর্ণীতে শুষ্কপত্র উড়ছে। রাত্রির অন্ধকার ধূলিধূসর। ভাঙা-ঘরের চাল উড়ে গেল কত!

ঝড়ের গতিতে পাল্কী এগিয়ে গেছে মেঠো-পথে ধরে। চৌধুরীগৃহের অন্দরে পৌঁছে দিয়ে তবে থেমেছে বাহকরা। পাল্কী দুয়োরে লাগাতেই কোথা থেকে ছুটে আসলেন চৌধুরীগৃহিণী। বিন্ধ্যবাসিনী পায়ে মাথা রাখলেন। তাঁর হাত ধরে পাল্কী থেকে নামালেন।

রাজকুমারী বললেন,—আপনি আমার মান্যজন। আমি তো আপনাকে প্রণাম করবো।

—এসো মা রাজলক্ষ্মী—বললেন চৌধুরাণী। কান্নার সুরে বললেন,—তুমি যে ব্রাহ্মণ মা! আমরা তোমাদের চরণের দাসী।

চৌধুরাণী কথা বলতে বলতে অন্দরে চললেন। রাজকুমারীর হাত ধরে তাঁকেও নিয়ে চললেন সঙ্গে।

রাজকন্যা দেখলেন, অন্দরের দালানে বেলোয়ারী বেল-লণ্ঠন জ্বলছে নানা রঙের। কোথাও লাল, কোথাও নীল, কোথাও হলুদ রঙের আলোর আভা। বিন্ধ্যবাসিনীর দুধবর্ণে রঙের খেলা চলে। তিনি ইতিউতি দেখেন, অন্দরের সাজ আর শোভা দেখেন। দালানে সারি সারি রূপার ঘড়া। মুখ-বাঁধা লাল শালুতে। হয়তো গঙ্গাজল আছে। চৌধুরাণীর পূজা আর পানের জল আছে।

—তুমি তো মা আমার মেয়ে। তুমিও তো আমার আনন্দকুমারী। তুমি তো সাক্ষাৎ দুর্গাপ্রতিমা। তোমাকে আমি প্রণাম করবো না!

রাজকুমারীর মুখে বাক্য সরে না। চৌধুরাণীর স্নেহ-আহ্বানে চোখে জল ঝরে। দুঃখের জীবন তাঁর, সম্বল একমাত্র অশ্রুপাত, তাই রাজকন্যার চোখ ছলছল করে।

—শুনেছি তুমি রাজার মেয়ে। এক কুলাঙ্গারের ঘরে পড়ে তোমার না কি কপাল পুড়েছে!

ছলছল চোখ, তবুও ক্ষীণ হাসলেন বিন্ধ্যবাসিনী। বললেন,—বাদ দিন আমার কথা, আমার ভাগ্য মন্দ।

রূপার পালঙে রাজকন্যাকে বসিয়ে দিলেন চৌধুরাণী। নিজেও বসলেন ঘরের মেঝেয়, রাজকন্যার পায়ের কাছে। বললেন,—কি খাবে মা ব'ল? পান-জল দিক।

—কিছু নয়। আপনার দর্শন পেয়েছি, আবার কি চাই!

—তোমার বাপের বাড়ী কোথায় মা?

—সুতানুটিতে। এখান থেকে অনেক দূরে।

উঠে পড়লেন চৌধুরাণী। বললেন,—ঘরের দুয়োর কটা ভেজিয়ে দিই মা। তোমার সঙ্গে কথা আছে আমার। খুব গোপন কথা, কেউ যেন না শোনে।

কথা বলতে বলতে চৌধুরীগৃহিণী ঘরের একেকটি দ্বার বন্ধ করেন। ঘরের এক দিকে লম্বা পিতলের পিলশুজ। মানুষ-প্রমাণ উঁচু। পিতলের দীপ জ্বলছে। এই আলোকে রাজকুমারীর মুখ আরও যেন স্পষ্টতর দেখায়।

গঙ্গার অন্য এক প্রান্ত ধরে তখন অন্য একখানি বজরা সুতানুটির দিক থেকে আসছে এই দিকে। কুমার কালীশঙ্করের ভারী বজরা আসছে দলবল সমেত। কুমারবাহাদুর বগলামুখীর পূজায় বসেছেন নৌকামধ্যে। শত্রু-দলনীর পূজা করছেন। ওঁ হ্লীং বগলামুখী—

রাজপুরীতে খুশীর হাওয়া বইতে থাকে আজ।

দুঃখের আঁধার-রাত্রি অতিক্রান্ত হওয়ার পর ভোরের মিষ্টি আলো ফুটেছে রাজ-অন্তঃপুরে। রাজপুরীর প্রতিটি মানুষের মুখে হাসি দেখা দিয়েছে আজ কত কাল পরে। নাটমন্দিরে সানাইয়ের সুর যেন আজ আর থামতে চায় না। একের পর এক সুর বেজে চলেছে ধীর মন্থর গতিতে। মন্দিরে পূজা আর হোমের পালা চলেছে। রাজমাতা বিলাসবাসিনীর আদেশে নানা দেবদেবীর পূজার ব্যবস্থা হয়েছে।

অনাচ্ছাদিত নৈবেদ্য রাক্ষসের ভোগ্য হয়, এই নিমিত্তে ভোগের পাত্রে পুষ্প আর বিল্বপত্র নিক্ষিপ্ত হয়েছে। সুবর্ণ, রজত, তাম্র আর কাংস্যপাত্রে ভোগ দান করা হয়েছে। প্রস্তর আর যজ্ঞ-কাষ্ঠময় পাত্রে ফল আর চিনি-

সন্দেশ। অন্য ফুল অচল আজ, কেবল মাত্র রক্ত-জবা ও রক্ত-পদ্মই উপচার। দেবীর শ্রীঅঙ্গে নতুন বস্ত্র পরিয়েছেন রাজমাতা। ঘোর রক্তবর্ণের চেলী। মুগার ফুল আর কলকা বস্ত্রাঞ্চলে। দেবী যেন আজ যুবতী রমণীর বেশ ধারণ করেছেন। বিলাসবাসিনী আভরণ দান করেছেন আজ। অন্য দিন পুষ্পা-ভরণে সজ্জিতা হন দেবী। রাজমাতা ভূষণ আর উপভূষণ দিয়েছেন আজ।

যুবতী রমণী নয়, মা যেন আজ অষ্টমবর্ষীয়া কন্যার রূপ ধারণ করেছেন। বিলাসবাসিনী তাঁকে সাজিয়েছেন মনের সুখে। চরণাভরণ, নিতম্বাভরণ, হস্তাভরণ, কণ্ঠ-নাসা-সীমন্তাভরণ দিয়েছেন নিজের সিন্দুক থেকে। সমুদায় অলঙ্কারই হিরণ্ময় ও মণিময়। ছত্র, চামর ও চন্দ্রাতপ উপভূষণ।

কারণে-অকারণে রাজমাতা আজ হাসছেন। সহচরী পরিচারিকাদের সঙ্গে নিয়ে দেখে গেছেন পূজার আয়োজন। ভূমিষ্ঠ হয়ে অর্থাৎ ভূমিতে কপাল ছুঁইয়ে প্রণামের বদলে কত বার মাথা খুঁড়েছেন কে জানে? উপবাসে আছেন আজ। পূজা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত জলগ্রহণ করবেন না। দেবীর চরণামৃত পানের পর উপোস ভঙ্গ করবেন।

রাজপুরীতে হৈ-হৈ। দানসত্র খুলেছেন না কি রাজমাতা বিলাসবাসিনী। ভাণ্ডার খুলে বসেছেন। আসরফী মোহর আর রৌপ্যমুদ্রার গামলা পাশে নিয়ে বসেছেন। যে যেমন, তাকে তেমন দান করছেন। সোনা-রূপা আর বস্ত্র দান করছেন।

প্রথমে ডাক পড়েছে রাজরাণীদের। উমারাণী, সর্ব্বমঙ্গলা আর সর্ব্বজয়া তিন জনেই এসেছেন। বড়রাণীর আঁচল ধরে এসেছে কিশোর রাজকুমার শিব-শঙ্কর। কনিষ্ঠপুত্র কাশীশঙ্করের ধর্ম্মপত্নী মহাশ্বেতার সঙ্গে এসেছে তাঁর একমাত্র কন্যা বনবালা।

—তোমাদের কে কি চাও বল। যে যা চাও, তাই দেবো—বধূমাতাদের উদ্দেশে বললেন বিলাসবাসিনী। কথায় স্নেহের সুর ফুটিয়ে বলছেন। জলচৌকিতে বসেছেন। আশপাশে মোহর আর মুদ্রার ছড়াছড়ি। শালকাঠের সিন্দুকের ডালা খুলেছেন।

বড়রাণী উমারাণী স্বভাবসুলভ হাসি হেসে বললেন,—রাজমাতা, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন আমাদের। আপনার আশীর্ব্বাদই আমাদের শ্রেষ্ঠ পাওনা।

উমারাণী আবার অধরে হাসি মাখালেন। বললেন,—আপনি যা দেবেন মাথা পেতে নেবো। দিতে কিছু কি বাকী রেখেছেন আপনি?

সর্ব্বমঙ্গলা, সর্ব্বজয়া আর মহাশ্বেতা নীরব দর্শকের মত দাঁড়িয়ে আছেন এক পাশে। তাঁদের যেন কোন বক্তব্য নেই। তাঁদের মুখপাত্রী যেন উমারাণী—তাঁদের পক্ষ থেকে যেন বড়রাণী আমমোক্তার পেয়েছেন।

—আজ আমার সুদিন এসেছে বড়রাণী। ডাকাডাকি আর মাথা খোঁড়াখুঁড়ির পর মা আমার মুখ তুলে চেয়েছেন। কথা বলতে বলতে কথার সুর যেন কেমন সিক্ত হয়ে যায় আনন্দের উচ্ছ্বাসে। চোখের প্রান্ত ভিজে যায়।

—এসো মা তোমরা। বধূদের ডাকলেন বিলাসবাসিনী—এই নাও একে একে।

বিলাসবাসিনীর হাতে একনরী একরাশি। লালাভ মুক্তার একনরী। এক মুঠোয় যা উঠেছে তুলেছেন। বধূমাতারা এগিয়ে একে একে প্রণাম করলেন রাজমাতাকে, কণ্ঠে আঁচল জড়িয়ে। প্রত্যেকের গলায় বিলাসবাসিনী মুক্তার একনরী পরিয়ে দিলেন। তারপর সহাস্যে বললেন,—আজ আমার সুখের দিন এসেছে। মা জননীরা আনন্দ কর তোমরা। মুখে হাসি ফোটাও। সঁীথির সিঁদুর অক্ষয় হোক তোমাদের।

কথার শেষে মহাশ্বেতার চিবুক ধরে তুললেন। প্রণামরতা মহাশ্বেতার মুখে যেন হাসি নেই, কেমন যেন মনমরা তিনি। চোখের দৃষ্টিতে যেন চিন্তামগ্নতা।

—মুখে হাসি নেই কেন মা? রাজমাতা শুধোলেন। চাপা কণ্ঠের গাম্ভীর্য্য ফুটলো তাঁর কথার সুরে। বললেন,—কাশীশঙ্করকে ছেড়ে দিয়ে মনে সুখ নেই তোমার, তা আমি বুঝেছি।

কাশীশঙ্কর যাত্রা করেছেন সদলবলে। গঙ্গা নদীর বুক ধরে গড়মান্দারণের

উদ্দেশে গেছেন। মহাশ্বেতার মনের সকল সুখ কেড়ে নিয়ে গেছেন যেন। দিনের আহার আর রাতের ঘুমও কেড়ে নিয়ে গেছেন। মহাশ্বেতা পাষাণের মত স্থির আর নীরব হয়ে আছেন। এত ঐশ্বর্য্য দেখছেন, তবুও চোখে যেন অন্ধকার দেখছেন। রাজমাতার সান্ত্বনা শুনেও বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। মুখে যেন কুলুপ এঁটেছেন মহাশ্বেতা।

উমারাণী বললেন,—ছোটকুমার পয়মন্ত মানুষ, তিনি যে কাজে হাত দেন সে কাজ ঠিক সমাধা হয়। তুমি দুঃখ পাও কেন ভাই?

মহাশ্বেতা অবশেষে বললেন,—বলা কি যায় দিদি? কি হতে কি হয় কে জানে! শুনেছি মান্দারণে বিনা লড়াইয়ে কোন কাজ হবে না। ঠাকুরজামাই শুনতে পাই বন্দুকধারীদের পাহারা রেখেছেন। রাজকুমারী একা থাকলে ভাবনা ছিল না।

শিউরে শিউরে উঠলেন রাজমাতা। কুমারের সৌভাগ্যকে মানলেও তিনিও যেন ক্ষণেকের মধ্যে ভীতা হয়ে পড়লেন। কি এক চাঞ্চল্যে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন একটি।

বড়রাণী আবার বললেন,—মন্দ ভাবলে মন্দ হয়। তুমি তোমার আরাধ্যকে ডাকো, তাঁকে জানাও। আমরাও জানাই! কুমারবাহাদুর ঠিক কাজ উদ্ধার করবেন; তা আমি বেশ ভালই জানি।

চোখের প্রান্ত আঁচলে মুছে কথা বললেন রাজমাতা।

মহাশ্বেতার হাত ধরে ফিরে চললেন বড়রাণী। মেজ আর ছোটরাণী তাঁদের পিছনে চললেন। রাজকুমার শিবশঙ্কর সোনার কলম-দোয়াত লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে রাজাকে দেখাতে গেছে কখন।

—রাজমাতা, আমাকে যে ডাক দাওনি?

কে যেন ব্যস্তকণ্ঠে কথা বলতে বলতে ঘরে এসে উপস্থিত হয়। বলে,—আমি কোন দুঃখে বাদ যাই!

—আয় শিবানী আয়! তোকে কখনও বাদ দিতে পারি মা?

বিলাসবাসিনী কি যেন খুঁজতে খুঁজতে কথা বলেন। বলেন,—যা দেবো তাই নিয়ে খুসী হোস যদি, তবে তাই দিই।

—হাঁ গো হাঁ, যা দেবে তাই মাথা পেতে নেবো।

শিবানীর কেশবেশ যেন বৈরাগিনীর মত। এলো চুল আর আলগা আঁচল উড়ছে বাতাসে! চোখে হয় তো টাটকা কাজল দিয়েছে। কপালে শ্বেতচন্দনের টিপ।

—রূপ যেন তোর দিন দিন খুলছে, শিবানী। কথার শেষে খানিক থেমে আবার বললেন বিলাসবাসিনী,—হয়তো বিয়ের নামেই তোর এত রূপ হয়েছে।

—এ পোড়া রূপের দাম কি! হাসতে হাসতে বললে শিবানী। রাজমাতার সামনে সে বসে পড়লো। বললে,—রূপ নিয়ে কি ধুয়ে খাবো?

ক্ষীণ হাসি ফুটলো বিলাসবাসিনীর মুখে। বললেন,—কেন, শশিনাথ আর কি ফিরে দেখে না তোকে? লজ্জায় অধোবদন হয় শিবানী। বলে,—রাজমাতা, তোমার অনুমান সত্যি নয়। সেই মানুষটা আমার জন্য সব করতে পারে।

হা হা শব্দে হেসে উঠলেন বিলাসবাসিনী। হাসতে হাসতেই বললেন,—তোকে বিয়া করতে পারে?

আসনপিঁড়ি হয়ে বসলো শিবানী। বললে,—হাঁ তাও পারে। আমার জন্য মরতেও সে পারে।

—তোর ভাগ্যিটা ভাল বলতে হবে। হাসির জের টেনে বলেন রাজমাতা। বলেন,—এখন কি চাই তাই বল।

—তুমি যা দেবে তাই নেবো! আমি মুখে কিছু চাইবো না।

—তবে তুই এই কণ্ঠহারখানা নে। তোকে বেশ মানাবে।

—বেশ কথা, ঐ কণ্ঠহারই দাও। কথা বলতে বলতে হাত পাতলো শিবানী। তার হাতে আলগোছে ফেলে দিলেন রাজমাতা, এক ছড়া স্বর্ণহার।

হঠাৎ কথার সুর নামিয়ে তামাসার ছলে রাজমাতা বললেন,—হ্যাঁরে শিবানী, একটা সত্যি কথা বলবি?

—হ্যাঁ। মিথ্যা আমি বলি না। মিথ্যা বলায় পাপ হয়, তা আমি জানি।

—হ্যাঁরে শিবানী, আমাদের শশিনাথেরে সঙ্গে তোর দেখাসাক্ষাৎ হয় না?

—দু'বেলা দেখা হয়।

—কথাবার্তা হয়?

—হ্যাঁ, তাও হয়।

—পাকা কথা কয়েছে সে?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ।

—তবে তো তুই কেল্লা মেরে দিয়েছিস।

—খান দুই চার মোহর দেবে না, রাজমাতা?

—মোহর পেয়ে কি হবে তোর? কি করবি, যা দিয়েচি তাতে মন উঠলো না?

—তোমায় পায়ে পড়ি রাজমাতা! সারা জীবন তোমর নাম করবো।

মুখে কৃত্রিম বিরক্তি ফুটিয়ে বিলাসবাসিনী বললেন,—এত যখন তোর খাঁই, তবে নিয়ে যা দু'খানা মোহর। কা'কেও যেন মুখ ফসকে বলে দিস না।

স্বর্ণমুদ্রা আর কণ্ঠহার আঁচলে বেঁধে ঢিপ করে একটা প্রণাম করলো শিবানী। নিমেষের মধ্যে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল মুখে হাসি মাখিয়ে।

এক খানসামা দেখা দেয় কক্ষের দুয়ারে। তার পিতলের তকমা ঝলমলিয়ে ওঠে। তার হাতে খাপযুক্ত বাঁকা তরোয়াল উঁচিয়ে আছে।

ভ্রূ বাঁকিয়ে খানিক দেখলেন বিলাসবাসিনী। বললেন,—কি? কি চাই তোমার?

—রাজাবাহাদুর আসছেন হুজুরাণী!

—কে? কালীশঙ্কর আসছে?

—হ্যাঁ হুজুরাণী, খোদ রাজাবাহাদুর আসছেন।

কথা বলতে বলতে খানসামা দ্বারমুখ থেকে সরে যায় সৈনিকী কায়দায়। তরোয়াল খাপে ভরে সেলাম জানায় অর্দ্ধনত হয়ে। আগন্তুক রাজার উদ্দেশে কুরনিস করে।

পাদুকার শব্দ এগিয়ে আসে। পেশোয়ারী কাবুলীর মচ মচ শব্দ।

ব্যাকুল চোখে দ্বারের দিকে তাকিয়ে থাকেন বিলাসবাসিনী। দুজন পরিচারিকা দুই পাশ থেকে হাত-পাখার হাওয়া খেলায়, তবুও তিনি দরদরিয়ে ঘামছেন। গোলাপ পাশ থেকে গোলাপজল দেওয়া হয় রাজমাতার মাথায়। গোলাপের মিষ্টি গন্ধ ভাসে ঘরে।

—তোমরা এক দণ্ড যাও ঘর থেকে। রাজা আসছে আমার কাছে। আমার ছেলে আসছে! বিলাসবাসিনী কথা বললেন সানন্দে। ঠিকঠাক হয়ে বললেন। তাকিয়ে থাকলেন দুয়ারের দিকে চোখ রেখে।

—মা! •

অদৃশ্য থেকে ডাকলেন রাজাবাহাদুর। দালানে সেই ডাকের প্রতিধ্বনি ভাসলো।

—রাজমাতা কৈ ?

—এই যে আমি। এসো, আমার বাছা এসো। মঙ্গল হোক তোমার।

—এসো একটু পায়ের ধুলা দাও।

দ্বারের কাছে পৌঁছে স্থির হলেন রাজাবাহাদুর। আজ তাঁর পোষাকের ভিন্নতা লক্ষ্যণীয়। ঘি-রঙের রেশমের পেশোয়াজ পরেছেন। আঁটসাঁট পাজামা। মাথার উষ্ণীষে হীরার তাজ জ্বলজ্বল করছে। মসলিনের রুমাল হাতে। কালো মুক্তার মালা ঝলমল করছে, কণ্ঠ থেকে বুকে নেমেছে। মাথায় একটা ধুকধুকি—একখানি আট রতির পদ্মরাগমণি। সুগন্ধি মেখেছেন রাজাবাহাদুর। রুমাল থেকে মন-পছন্দ আতরের গন্ধ ভাসচে হাওয়ায়। হাতের আঙুলে নৌকাকৃতির হীরার আংটি।

রাজমাতার রঙ্গমহল ছিল এই কক্ষ। যখন তিনি রাণীর পদে অভিসিক্ত ছিলেন তখন এই কক্ষ ব্যবহার করতেন—সে অনেক কাল আগের কথা। অতি মনোহর এই বিলাস কক্ষ, শ্বেতকৃষ্ণ প্রস্তরের হর্ম্যতল। শ্বেতমর্মরের কক্ষ প্রাচীর। পাথরের রত্নের লতা, রত্নের পাতা, রত্নের ফুল, ফল পাখীর ভ্রমর। প্রাচীরের কিছু উর্দ্ধে সোনার কামদার বীটের মধ্যে মধ্যে বিচিত্র

আকারের দর্পণ। ওপরে রূপার তারের চন্দ্রাতপ, মতির ঝালর ঝুলছে। মেঝেয় কোমল তৃণ অপেক্ষাও কোমলতর সবুজ গালিচা পাতা।

বহুদিন এই কক্ষ চোখে পড়ে না রাজাবাহাদুরের। বড় একটা উন্মুক্ত হয় না এই বিলাসকক্ষ। কালীশঙ্কর কক্ষমধ্যে লক্ষ্য করেন সাগ্রহে। দেওয়ালের মতির কারুকাজ দেখেন—দেখে দেখে বিস্মিত হন যেন। কি অপূর্ব্ব শিল্পশোভা!

বিলাসবাসিনী উঠে আসেন রাজার সুমুখে। বলেন,—পেশোয়াজ আর পায়জামা কেন? কোথায় চললে নাকি?

—নাঃ, তেমন কোথাও যাওয়ার নাই। মাতৃপদে হাত ছুঁইয়ে সেই হাত কপালে ঠেকালেন রাজাবাহাদুর।—একই পোষাক প্রত্যহ ভাল লাগে না। তাই এই বেশ পরিবর্ত্তন। শুধু তাই নয়, আজ নবাবের ক'জন মনসবদার দরবারে আসছে দেখা করতে। কিছু কাজের কথা আছে আমার জমিজমা সম্পর্কে। কোন জমি-বিক্রি নয়। বিলি বন্দোবস্তের কথা কইব। কথার শেষে ইদিক সিদিক দেখে কালীশঙ্কর বললেন,—তুমি তো দেখি কুবেরের ভাণ্ডার খুলেছো। যাকে যা ইচ্ছা দান করছো।

—কাশীশঙ্কর যাত্রা করেছে সেই আনন্দে। বিন্ধ্য এলে আরও কিছু দান করবো, মনস্থ করেছি। আমার যা আছে বিলিয়ে দেব বিলকুল। আমার মেয়েকে নিয়ে থাকবো।

হেসে ফেললেন রাজাবাহাদুর। রুমালে মুখ মুছতে মুছতে বললেন,—তবে আমরা কোথায় যাব? তোমার ছেলে দুটোকে ত্যাগ করবে না কি?

—বালাই ষাট। এমন কথা বল কেন! তোমরা ছাড়া আমার আর কে আছে! বিন্ধ্যর গায়েও তোমাদেরই রক্ত বইছে।

—প্রার্থনা জানাও কুমারবাহাদুর যেন ভালয় ভালয় ফিরে আসে।

—সে আর বলতে! আমি তো কত কি মানত করেছি। পুজো-পাঠের ব্যবস্থা করেছি। জোড়া সত্যনারায়ণ করবো ভেবেছি। হরির লুট দেবো।

রাজমাতার কথা শেষ হওয়ার আগেই কালীশঙ্কর দ্বার ত্যাগ করলেন। যেতে যেতে বললেন,—এখনও একবিন্দু জলপান পর্য্যন্ত হয়নি। আমি যাই, ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে যেন।

—মঙ্গল হোক তোমার। পরমায়ু অক্ষয় হোক।

মন-পছন্দ আতরের সুগন্ধ ভাসিয়ে রেখে গেলেন রাজাবাহাদুর।

সকলে হাসছে শুধু মহাশ্বেতা নয়। তাঁর মুখে যেন আষাঢ়ের মেঘ জমেছে। চোখে শূন্য দৃষ্টি, কেমন যেন জবুথবু হয়ে আছেন। মুখ খুলছে না, কথা বলছে না। রূপের এত বাহার, তাও যেন ম্লান হয়ে আছে।

উমারাণী তাঁর হাত ধরে নিয়ে চললেন নিজের মহলে। বললেন,—আয় মেজরাণী, আয় ছোটরাণী, মহাশ্বেতার কাছে তোরা বসবি। ওর সঙ্গে দু'দণ্ড গল্প করবি। ওকে ভুলিয়ে রাখবি।

বড়রাণী আবার বললেন,—আমি তোদের জলখাবারের ব্যবস্থা করি। সত্যিই আজ আমাদের শুভদিন এসেছে। ছোট কুমারবাহাদুর যখন গেছেন, তখন কাজ উদ্ধার হবেই। আমাদের ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে আসবে। কেউ রোধ করতে পারবে না মহাশ্বেতার স্বামী দেবতাটিকে, তিনি এমনি কৌশলী আর বুদ্ধিমান। কি বলিস মহাশ্বেতা?

অল্প একটু হাসলেন মহাশ্বেতা। গর্ব্বের ভাবটুকু লুকিয়ে ম্লান হাসি হাসলেন যেন।

—আয় বনবালা, আমার সঙ্গে আয়। কি লক্ষ্মী মেয়ে এই ফুলের মত মেয়েটা! উমারাণী স্নেহপূর্ণ স্বরে কথাগুলি বললেন। বললেন,—আমি বনবালা বলবো না, ওর নাম হোক আজ থেকে বনরাণী।

সলাজ হাসি ফুটলো বনবালার কচি কোমল মুখে। মাকে ছেড়ে সে বড়রাণীর আঁচল ধরলো। পায়ের অলঙ্কারের ঝমাঝম শব্দ তুলে চললো উমারাণীর সঙ্গে।

মহাশ্বেতার মন যেন কোথায় উড়ে গেছে। তিনি তখন কুমার বাহাদুরের ভাবনায় মগ্ন হয়ে থাকেন। বিপদের আশঙ্কা অপেক্ষা বিরহের অনলে যেন

দগ্ধ হয়ে আছেন সদাক্ষণ। সিঁথিতে সিঁদুর ওটার পর থেকে একটি রাতের তরেও তাঁকে কখনও ছেড়ে থাকেননি মহাশ্বেতা। আদর্শ কাকে বলে জানা ছিল না তাঁর। অনভিজ্ঞতার কষ্ট যেন একটু জোরালো হয়। এও ঠিক তাই। কুমার বাহাদুর কাশীশঙ্করের টিকালো সুন্দর মুখখানি যেন কিছুতেই ভুলে থাকা যায় না! তাঁকে ছেড়েও যেন এক মুহূর্ত বাঁচা যায় না।

গঙ্গানদীর বুক ধরে তখন একখানি বজরা এগিয়ে চলেছে বরাহনগর, বালি আর উত্তরপাড়াকে পাশে ফেলে। কুমারবাহাদুর চোখে দূরবীণ লাগিয়ে লাগিয়ে দেখছেন ইদিক সিদিক। একজন খানসমা তাঁর মাথায় ছাতা ধরে আছে। রূপার ছাতার চতুষ্পার্শ্বে মণিমাণিক্যের ঝালর। কাশীশঙ্কর গঙ্গার দুই তীরে লক্ষ্য করছেন সাগ্রহে। নদীর দুই তীরে ঘন সবুজ রঙের পাহাড় যেন। দূরবীণের চোখে ধরা পড়ে এই ভুল—স্পষ্টতর হয়ে দেখা দেয় গাছ আর গাছ। সবুজের আড়াল থেকে, গাছের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় মন্দির আর মসজিদ। কোথাও বা একটি চার্চ। চূড়ায় যীশুখৃষ্টের ক্রুশ। কোথাও দু'চারটি চালাঘর। ধনীজনের পাকাবাড়ী।

জলের বুকে দূরবীণ ফেললেন কুমারবাহাদুর। এধার ওধার দেখতে থাকলেন। দেশী নৌকা আর বিদেশীদের বাণিজ্যপোত। পতাকা উড়ছে দেশ বিদেশের জাহাজের মাস্তুলে মাস্তুলে।

আর্ম্মাণী, পর্তুগীজ, ফরাসী আর ইংরাজদের বাণিজ্যপোতের শীর্ষে নিশান উড়ছে দুরন্ত হাওয়ায়। গঙ্গার বুকে ঢেউ উঠছে সারি সারি। কাশীশঙ্করের বজরাখানা পর্য্যন্ত টলমলিয়ে উঠছে।

মটিতে পা পড়লে আগুনের ছোঁয়া লাগে। ওপরে সাদা আকাশ আর নীচে কালো মাটি। দ্বিপ্রাহরিক সূর্য্যতাপ আসমান জমি মহাকালের চিতার মত জ্বলছে। আগুনের বর্ণ হলুদ-লাল নয়, রৌপ্য-শুভ্র। মাঠ-ঘাট জ্বালিয়ে দেয়। জল শুকিয়ে যায় ইঁদারার। পুকুর আর দীঘির চতুর্দ্দিকের অস্থিপঞ্জর দেখা দেয়।

গাছের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে চুপিসাড়ে দাঁড়িয়ে আছ শিবানী। গাছ-কোমর বেঁধেছে পরনের সাড়ীর আঁচলে। শুধু মাত্র লালপাড় পাৎলা তাঁতের শাড়ীখানা এঁটেসেঁটে পরা। নজর ফাট-ধরা মটিতে, পায়ের বুড়ো আঙুলে শুকনো মাটি ভাঙছে। স্নান সেরেছে কখন, ভিজে চুল ছড়িয়ে দিয়েছে পিঠে। কোমর ছাপিয়ে নেমেছে কেশের রাশি। ডান হাতের মুঠোয় গন্ধরাজের একটা শক্ত ডাল। মাটি থেকে চোখ তুললো শিবানী। ঠেঁটের কোনে হাসির ঝিলিক তুলে চোখ-ইশারায় ডাকলো যেন কাকে।

নিরালা এখন এ অঞ্চল। কেউ আসে না। চোখে টাটকা কাজল। ঘি-মনসার গভীর কালো কাজলের রেখায় শিবানার চোখ যেন দীর্ঘতর দেখায়, চোখের সাদা স্পষ্ট হয়। তারা দুটি চঞ্চল যেন।

নিভৃত-নির্জ্জন। শুধু কটা শালিখ ডাকাডাকি করছে করবীর ডালে সভা সাজিয়ে। করবীর-শাখা নুয়ে পড়েছে।

শব্দ নেই চলনের। চোখের ইঙ্গিত না পান-রাঙা ঠোঁঠের ইসারা ঠিক ধরা যায় না। শিবানীর লাল অধরও কিছু চঞ্চল। কথাফোটার মুখ; টকটকে লাল ওষ্ঠে যেন কত অস্ফুট কথা নাচানাচি করছে। কেমন বিমুগ্ধের মত ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে শশিনাথ।

শিবানীর চোখে যেন সম্মোহন। শশিনাথ থমকে দাঁড়াতেই আবার এক বার ডাকলো শিবানী। চিবুক বুকে ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে।

—ভয় হয়, কেউ যদি দেখে ফেলে কোথাও থেকে। সত্যিই ভয়ে ভয়ে কথা বললে শশিনাথ। ইদিক সিদিক বক ফুলের গাছের মগ ডাল পর্য্যন্ত দেখলো।

খিল খিল শব্দে হঠাৎ হেসে উঠলো শিবানী! মুখে দুই হাত চাপলো তৎক্ষণাৎ। হাসি থামিয়ে বললে,—এসো, একটা প্রণাম করি।

শশিনাথ বললে,—কেন?

দেহ এলিয়ে হাত ছোঁয়ালো শিবানী। মোহর দু'খানি মাটিতে রেখে বললে,—এই নাও বরপণ। আমি তোমাকে দিলাম। কথা বলতে বলতে শশিনাথের পায়ের ধূলি তুলে কপালে ঠেকায় শিবানী!

আকবরী মোহর। ফার্সী ভাষায় লেখা হিজরা সাল। দুপুরের সূর্য্য অলোয় জ্বলজ্বলিয়ে ওঠে। শিবানী মোহর তুলে শশিনাথের হাতে ধরিয়ে দেয়। শশিনাথ সেই হাত আর ছাড়ে না। শিবানীর নরম হাত, ধরে রাখে নিজের হাতে।

—তোমার অনেক রূপ, দেখা যায় না এমনটা।

শশিনাথ মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে। কথা বলছে চুপি চুপি। কথার শেষে শিবানীর চিবুক ধরে তুলে ধরলো তার লজ্জারাঙা মুখ।

—তোমার পায়ে ঠাঁই হবে তো? না আমার আশায় বজ্রপাত হবে?

—হাঁ, তুমি আমার হবে।

এক ঝলক মিষ্টি হাসি হাসল শিবানী। বললে,—এ তোমার মুখের কথা না মনের কথা?

—আমার অন্তরের কথা। এতটুকু মিথ্যা নাই।

—চল এখান থেকে পালাই। শিবানী মিনতির সুরে বলে। বলে,—কেউ যদি দেখতে পায় কোথাও থেকে! চল ঐ দিকে, যেদিকে বাঁশের বেড়া। কারও চোখ পড়বে না।

বুকের আঁচল সামলায় শিবানী। দক্ষিণের হাওয়ায় আঁচল ঠিক থাকে না হয়তো। বলে,—আজ শুক্ল তিথির রাতে থাকবো আমি এখানে। তোমার অপেক্ষায় থাকবো। আসবে তুমি তখন?

—সাহস হয় না আমার, ভয়ে ভয়ে বললে শশিনাথ। বললে,—রাজপুরীতে কত লোক! জোড়া জোড়া চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না যে! কার কখন নজর পড়ে!

—আমি ভয় পাই না। কেমন যেন বেপরোয়ার মত বললে শিবানী। নিজের হাতখানি শশিনাথের হাতে রেখে কথা বলছে। বললে,—রাতের বেলায় এসো, সারা রাত বসে বসে কথা কইবো। তোমার কাছে গল্প শুনবো। চাঁদের জ্যোৎস্নায় দেখবো তোমাকে।

—দেখা যাক, যদি পারি তো আসবো। ফিসফিসিয়ে বললে শশিনাথ।

ইদিক সিদিক নজর হেনে বললে,—লালশাড়ীখানা পরবে ব'ল, তবে আমি আসতে পারি।

মৃদু হাসির সঙ্গে খানিক অবাক চোখে চেয়ে থাকে শিবানী। বললে,—লালশাড়ীতে কি মানায় আমাকে?

—হাঁ, খুব মানায়।

—তবে রাখবো তোমার কথা—

শিবানী কথা বলতে বলতে বাঁধানো ঘাটের দিকে চোখ ফেরায়। কাকে যেন সহসা দেখতে পেয়ে হাসি চাপে মুখের। বলে—এখন তবে যাই আমি। পাকশালের জানলা থেকে আমাদের বড়রাণী দেখছেন। আড়ি পেতেছেন।

শশিনাথের মুখ যেন বিবর্ণ হয়ে ওঠে। তার চোখের সন্মুখের পৃথিবী যেন অদৃশ্য হয়ে যায় চকিতের মধ্যে। শিবানী কিন্তু হাসতে থাকে খিলখিল শব্দে। হাসতে হাসতে ছুটে পালিয়ে যায়।

বড়রাণী! ভাবতেও চমক লাগে শশিনাথের। উমারাণী স্বচক্ষে দেখেছেন! অজানা ভয়ে আশাঙ্কিত হয়ে ওঠে সে। বড়রাণী যদি জানিয়ে দেন রাজ-বাড়ীতে, যা দেখেছেন তা যদি ব্যক্ত করেন অন্দরে! রাজাবাহাদুরের কানে যদি তুলে দেন!

—পোড়ামুখী মেয়ে, আমি সব দেখতে পেয়েছি।

শিবানী কাছে আসনেই উমারাণী হেসে হেসে বললেন। তামাসার হাসি তাঁর মুখে। সহাস্যে বললেন,—কি বলে শশিনাথ? এতক্ষণ কি কথা কইলি।

মুখে আঁচল চাপলো শিবানী। চোখ ঢাকলো। কিন্তু হাসি তার থামতে চায় না যেন। খিলখিল হাসছে শিবানী।

উমারাণী হাত চেপে ধরলেন শিবানীর। সজোরে চেপে ধরে বললেন,—চোর ধরেছি, চল তোর সাজা হবে আজ। রাজমাতার কাছে নিয়ে যাবো। ফাঁস করে দেবো সব।

—দোহাই বড়রাণী! হাসির জের টেনে শিবানী অনুরোধ জানায়। বলে—তোমার দুটি পায়ে পড়ি।

খানিক চুপ করে থাকে শিবানী। কি যেন ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বললে,—আচ্ছা বল দেখি, রাজাবাহাদুর এখন কোথায়? কি করছেন?

একরাশ কালো মেঘ, কোথা থেকে যেন উড়ে এসে চাঁদের রূপকে ম্লান করে দিয়ে যায়। তেমনি লজ্জা, অভিমান না কালো ছায়া উমারাণীর মুখে নামে। সুখের হাসি মিলিয়ে যায় ক্ষণিকের মধ্যে। চোখের তারা স্থির হয়ে যায়। অনেক দূরে আকাশে দৃষ্টি রেখে বললেন,—রাজা এখন হয়তো নেশায় মত্ত হয়েছেন। হয়তো মুসলমানীদের সঙ্গে রসালাপে ব্যস্ত আছেন। হয়তো তাদের নানা অলঙ্কার পরিয়ে তাদের রূপসুধা পান করছেন।

—আর তুমি কি করছো? অন্দরে লুকিয়ে থেকে সহ্য করছো বিরহ যন্ত্রণা! শিবানী বললে,—চল তোমার মহলে যাই। এ সব কথা থাক এখন। কথা বলতে বলতে সে দালান ধরে এগিয়ে চলে। উমারাণীর একটি হাত তার হাতে। শিবানী এগোয় মন্থর গতিতে। বড়রাণীর মুখে থমথমে গাম্ভীর্য। ঠাট্টা-তামাসায় স্পৃহা নেই আর। সুপ্ত ক্রোধ প্রকাশ পায় তাঁর চলনে। নিবে যাওয়া তুষের আগুন জ্বলতে থাকে।

নবাবের মনসবদাররা এসেছে দরবারে। সঙ্গে এসেছে নবাবের আমীল-গুজার। দরবারে বন্দুকধারী প্রতিহার। দু'জন দু'দিক থেকে আসা-যাওয়া করছে। রাজা কালীশঙ্কর একমনে আলাপ আলোচনা চালিয়েছেন। তাঁর সমুখে তুলট কাগজের স্তূপ। জমির নক্সা, ফার্সী ভাষায় লেখা পরিমাপ।

সেলামী লক্ষ টাকা; নগদ চাই। ততঃপর জমির বিষয়ে কথা হবে। মুখ থেকে মুখনল নামিয়ে রাজাবাহাদুর বললেন। নিজের ডান হাতের আঙুল-গুলিতে চোখ বুলালেন। পঞ্চাশ বাতির ঝাড়লণ্ঠন জ্বলছে দরবারের চাঁদোয়ায়।

হীরার আঙটি জ্বলজ্বল করে সেই আলোয়। কমল হীরার শোভা দেখেন কালীশঙ্কর।

আমীলগুজার আর মনসবদার পরস্পরের দিকে একবার দেখাদেখি করে। কেউ সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করতে পারে না।

রাজাবাহাদুর আবার বললেন,—আমার গঙ্গামহলের প্রজারা মুসলমান নবাবের ফৌজী খাতায় নাম দেখাতে পারে না। নবাবের পক্ষে তারা অস্ত্র ধারণ করবে তেমন আশা দেখি না।

মনসবদাররা মনে মনে হতাশ হয়ে পড়ে। একজন বললে,—হুজুর, তাই যদি হয় তবে তো আপনার গঙ্গামহলে পর্তুগীজের রাজত্ব হবে। তখন আর নবাবকে দুষতে পারবেন না।

—পর্তুগীজ রাজত্ব, মুসলমান রাজত্বের সঙ্গে তুলনা হয় না। কালীশঙ্কর সাহাস্যে বললেন। বললেন,—পর্তুগীজরা অশিক্ষিত বর্ব্বর নয়। তাদের অর্থলিপ্সা থাকতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মবিদ্বেষ নাই!

মনসবদারদের মধ্যে থেকে আবার কথা আসে। একজন বললে,—হুজুরের অনুমান ঠিক নয়। গঙ্গামহলের প্রজারা দেখবেন একদিন বিলকুল খ্রীশ্চান হয়ে গেছে।

—খ্রীশ্চানদের তবু সহ্য করতে পারি। নীতি মানে তারা, অন্যায় অধর্ম্ম করে না। হাসতে হাসতে কথা বলছেন রাজাবাহাদুর। কথার শেষে মুখে মুখনল তুললেন। বাম হাতে গোঁফের প্রান্ত পাকাতে থাকলেন। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে বললেন,—যাই হোক গঙ্গামহলের প্রজাদের আশা পরিত্যাগ করেন।

আমীলগুজার বললে,—হুজুর, জমির কথা কি স্থির করলেন!

রাজাবাহাদুর ভ্রূ কুঁচকে বললেন,—ঐ তো বললাম। সেলামী চাই নগদ এক লক্ষ টাকা। অতঃপর কথা হবে।

খানসামা আসে সোনার থালা হাতে। সুরার পেয়ালা সাজানো সারি সারি। থালা এগিয়ে ধরে খানসামা, একেকজনের সমুখে। যে যার পেয়ালা

তুলে নেয়। রাজাবাহাদুরের প্রতি সম্মান দেখিয়ে পেয়ালা কপালে ঠেকায় কেউ কেউ। বিড়বিড়িয়ে কামনা করে রাজার সৌভাগ্য, সুস্থদেহ।

কালীশঙ্করের জন্য পৃথক পাত্র। লাল বেলোয়ারী কাচের সুরাপাত্র। টকটকে লাল রক্ত যেন টলমল করছে। আলবোলার ফরসি রেখে লাল পাত্র তুললেন রাজাবাহাদুর।

—নবাব এই টাকা দিতে সমর্থ নয়। আমীল-গুজার কথা বলে মুখে পেয়ালা তুলতে তুলতে।

—তবে, এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন না আর। এস্থানেই চাপা থাক। কালীশঙ্কর কণ্ঠ ভিজিয়ে নিয়ে বললেন অনুরোধের সুরে।

—বিবেচনা করুন, রাজাবাহাদুর। পঞ্চাশ হাজারের অধিক না ওঠেন।

একজন কাননগো কথা বলে মিনতির সঙ্গে। বলে,—আপনি হুজুর এক-জন রাজার মত রাজা, আপনি যদি দর কষাকষি করেন, আমরা কোথায় যাই!

আর এক চুমুকে পাত্র শূন্য করে কালীশঙ্কর বললেন—আপনার কথায় প্রতিবাদ জানাই আমি। দর কষাকষি আপনারা চালিয়েছেন, আমি এক দর বলেছি। সেলামী নগদ এক লক্ষ টাকা। অগ্রিম দেয়।

—নবাবের সামর্থ্যে কুলাবে না হুজুর। আমীল-গুজার কথা বলে আর পাকা দাড়িতে হাত বুলায়।

হো হো শব্দে হেসে উঠলেন রাজাবাহাদুর। গগন-বিদারক হাসি হাসলেন যেন। হাসতে হাসতে বললেন,—আর হাসাবেন না মিঞা সাহেবরা, বাঙলার নবাবের দপ্তরে লাখ টাকা মিলবে না?

—পরিহাস নয় রাজাবাহাদুর, নবাব এই টাকা সেলামী দিতে পারবেন না।

—তবে কত দিতে পারবেন? কালীশঙ্কর প্রশ্ন করলেন একচোখ বন্ধ করে।

আমীল-গুজার বললে,—বিশ পঁচিশ হাজার তক দিতে পারা যাবে।

আবার হাসলেন রাজা। হো হো শব্দে হাসতে থাকেন। হাসতে হাসতেই বললেন,—বিশ পঁচিশ নয়, তবে আমি যা বলি তাই শুনেন। মাত্র এক টাকা

সেলামী দিন নবাব। কথা শেষ হতে না হতে আবার হাসি ধরলে
রাজাবাহাদুর। হাসি যেন কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গমিশ্রিত।

—তাই হবে হুজুর? আপনার খুশী রাজাবাহাদুর। আপনি যেমন বলবেন

—না না। এপাশে ওপাশে মাথা দুলিয়ে কালীশঙ্কর বললেন,—না না,
তাহা হয় না। নবাবের মত একজন গণ্যমান্য আমাকে সেলামী দিবেন কেন
সেলামী আমি চাই না। এখন কততে জমা হবে তাই বলেন।

—বাৎসরিক ত্রিশ হাজার টাকার কড়ারে।

—ওটাকে চল্লিশ করেন। আর আপত্তি করবেন না।

—তথাস্তু হুজুর। রাজাবাহাদুর, আপনার কথাই থাকবে।

শূন্য পাত্রটা ভর্তি করলেন কালীশঙ্কর। এক চুমুক খেয়ে পাত্র নামিয়ে
রেখে ফরসি তুললেন মুখে। বললেন,—জমিটায় নবাব কি কাজ করবেন?

—খাজনাখানা বানাবেন নবাব। অমীল, ফৌজদার-কোতোয়ালের
কাছারী বসাবেন। খাজাঞ্চী, সিকদার আর পায়েকের ঘর তৈয়ারী হবে।

—বেশ ভাল কথা, বললেন রাজাবাহাদুর। দরবারের শীর্ষে চাঁদোয়ায়
চোখ রেখে বললেন,—দু কিস্তি বন্দোবস্তের টাকাটা আগাম চাই কিন্তু।

—আলবৎ, আলবৎ।

—একসঙ্গে চাই। এক কিস্তিতে।

—আলবৎ। আগামী কাল এই টাকা দেওয়া হবে।

—হাঁ, ততঃপর কাগজ-পত্রে সই হবে। কথার শেষে মুখনল তুললেন
কালীশঙ্কর। আলবোলায় গর্জ্জন তুললেন। তামাকের সুগন্ধ ভাসালেন

রাজার মন থেকে থেকে চঞ্চল হয়ে ওঠে যেন! কেমন যেন আনচান
করতে থাকেন। চিন্তামগ্ন দেখায় তাঁকে। মনে মনে প্রার্থনা জানান,—
কালীশঙ্কর যেন নির্বিঘ্নে ফিরে আসে সুস্থ দেহে।

রৌদ্রদগ্ধ বৈশাখের দীর্ঘদিন এখন শেষের দিকে।

তবুও এখনও ডুবন্ত সূর্য্যরশ্মির তর্জ্জনী এসে স্পর্শ করছে মুক্তদ্বার পাল্কীর ভেতরে, রাজকুমারীর ঠিক কপালটিতে। যেন এক মৃত মানুষের শান্ত কপাল। বিন্ধ্যবাসিনী মেঘ-মুলুকে চোখ মেলে বসে আছেন নির্জীব পাষাণের মত।

গড়-মান্দারণের পথপ্রান্তর বড়ই দুর্গম। খটখটে দিবালোকেই পথিকজন দল বেঁধে পথ চলে। একা কাকেও দেখা যায় না। উপলখণ্ডে আকীর্ণ আঁকাবাঁকা পথের দুই ধারে শাস্তিশঙ্কাহীন চৌর্যবৃত্তি উঁকি দেয় বনাঞ্চল থেকে। শুধু তাই নয়, হিংস্র জানোয়ারের উৎপাত কে এড়ায়?

এক দমকা হাওয়ায় চোখ চাইলেন যেন বিন্ধ্যবাসিনী। খানিক দেখে দেখে বললেন—ব্রাহ্মণি, পাল্কীর দুয়ারটা বন্ধ কর। সুমুখে রাত্রি, ভুলে যাও কেন?

পরিচারিকা ভয়ার্ত্ত চোখ ফিরিয়ে বললে—রাত্রি নয় রাজকুমারী, যেন কালরাত্তির! আমি তো কোন উপায় দেখি না বৌ! পরিচারিকা কথা বললে যেন আপনার মনে। বললে,—আমি তো দশ দিক অন্ধকার দেখছি।

—আমিও তাই যশোদা! বিন্ধ্যবাসিনী ক্ষীণ কণ্ঠে বলেন,—রক্ষা পাওয়া কঠিন।

চৌধুরীগৃহিণী প্রথমে কেঁদেছিলেন, ককিয়েছিলেন। মেয়ের দুঃখে অধীর হয়ে বুক-কপাল চাপড়েছিলেন। বিন্ধ্যবাসিনীর পায়ে মাথাও খুঁড়েছিলেন। আনন্দকুমারীর নিরুদ্দেশের সঠিক কারণ শেষ পর্যন্ত জানতে না পাওয়ার পর শাসানির সুরে কথা বলেছিলেন। দশমহাবিদ্যার মত একেক বার এক মূর্ত্তি ধরেছিলেন যেন। শেষে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন,—আনন্দকে না পাওয়া যায় ক্ষতি নেই, জমিদার কেষ্টরামের স্ত্রী গুমখুন হবে! আমার লোক লস্করের অভাব নেই, অর্থবলও সামান্য নয়। আমি নবাবের এজলাসে নালিশ পেশ করবো!

বিন্ধ্যবাসিনী প্রায় কম্পিতদেহে চৌধুরীগৃহ ত্যাগ করে উঠে এসেছেন। কাঁপতে কাঁপতে পাল্কীতে উঠে সংজ্ঞাহীনের মত বসে পড়েছেন। চৌধুরীর ক্রোধের সুর কাণে বাজে যখন-তখন। বাঘিনীর মত তার রূপ যেন মনে পড়লেও ভয় হয়।

—চল বৌ, সাতগাঁয়ে ফিরে যাই আমরা। পরিচারিকা খানিক ভাবনার পর বললে অনুরোধের সুরে। মাথা দোলালেন রাজকুমারী। আঁচলে মুখ মুছতে মুছতে বললেন, মান্দারণ ত্যাগ করলেই কি পরিত্রাণ পাওয়া যাবে? আমার তা মনে হয় না। বিন্ধ্যবাসিনী বললেন সন্দিগ্ধকণ্ঠে। কয়েক মুহূর্ত্ত থেমে আবার বললেন—এক চন্দ্রকান্ত ইচ্ছা করলে আমাদের রক্ষা করতে পারেন। তিনি এখন কোথায় কে জানে। চন্দ্রকান্তকে চাই, নচেৎ রক্ষা নাই আর। কেমন যেন আতঙ্কের সঙ্গে বললেন রাজকুমারী। এক বুক শ্বাস টেনে নিয়ে বললেন,—তাঁকে আমাদের পক্ষে রাখতে হবে। সালিশী মানতে হবে। তাঁকে এখনই আমাদের চাই।

—এই রাতের বেলায় ব্রাহ্মণকে কোথায় পাবে তুমি? পরিচারিকার কথায় বিস্ময়। চোখে জিজ্ঞাসার চাউনি।

বিন্ধ্যবাসিনী বললেন—তুমি দয়া করলেই তাঁকে পাওয়া যায়।

বৈশাখ রাত্রির ঝিরঝিরে হাওয়া চলেছে। গাছের পাতার মর্ম্মর ভেসে আসছে। শুষ্কপত্র উড়ছে বাতাসের সঙ্গে। পাল্কীর মুক্ত দ্বার, রাজকুমারীর ঘর্ম্মাক্ত কপালে হাওয়ার স্পর্শ লাগে। তিনি আবার কথা বললেন,—মিথ্যা দোষারোপ কে মেনে নেয়! চুরি করলে একজন আর তার শাস্তিভোগ করবো আমরা? অল্প হাসলেন রাজকুমারী। শুষ্ক হাসি হেসে বললেন,—তুমি যদি কষ্ট কর, তবেই তাঁকে পাওয়া যায়।

—কি করতে হবে তাই বল?

—আমাকে জমিদার বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে তুই যা এই পাল্কীতে। বিন্ধ্যবাসিনী ফিস ফিস কথা বললেন, পরিচারিকার কানের কাছে মুখ এগিয়ে বললেন,—পাল্কীবেহারাদের পাঁচ দশ কড়ি বকশিস দিলেই—

কথা শেষ হয় না। যশোদা বললে—তিনি যদি আমার কথায় না আসে?

হঠাৎ এক রাশ জোরালো বাতাস দাপাদাপি করতে করতে মাটির বুক থেকে আকাশের দিকে ছুটলো। সামুদ্রিক তরঙ্গ-উচ্ছ্বাসের মত হাওয়ার ঢেউ উঠলো। গাছের শাখা ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ তুললো। নির্জ্জন প্রান্তর ধরে পাল্কীও

ছুটেছে অনুকূল বাতাসের ঘায়ে। মশালচির হাতের নতমুখী অগ্নিশিখা কাদের যেন প্রণাম করতে থাকে। মশালের আলো চলেছে সর্ব্বাগ্রে। বাঁশের লাঠি ঠুকতে ঠুকতে পাইক-পেয়াদা চলেছে মশালচির পেছনে। তারপর পাল্কী চলেছে। পাল্কীর শেষে আরও কজন পাইক।

বেশ কিছুক্ষণ নিশ্চুপ ছিলেন রাজকন্যা। কত শত চিন্তায় ডুবে ছিলেন যেন। নিজের কোমল বক্ষে হাত রাখলেন ক্ষণেক, স্পর্শে অনুভব করলেন হৃদয়ধ্বনি। ঘন ঘন বেজে চলেছে। শ্বাসের কষ্ট হয় বিন্ধ্যবাসিনীর। কি এক অস্বস্তির জ্বালায় থেকে থেকে অধৈর্য্য প্রকাশ পায়। কেমন যেন কষ্টের সঙ্গে কথা বললেন রাজকুমারী। অস্ফুট স্বরে বললেন,—আমার নাম লয়ে বললে অমান্য করবেন না।

কথা বলতে বলতে রাজকুমারী অনামিকার আঙটি খুললেন। যশোদার হাতে দিয়ে তার মুঠি বন্ধ করে দিলেন। বললেন—আমাদের দেউলে পাল্কী পৌঁছেছে, তুমি যা বলার ওদের বল। আমি ঘরে যাই।

—একা থাকতে তোমার ভয় হবে না বৌ? তুমিও চল না?

—পাল্কীতে একেই স্থানাভাব। আমি ঘরে ফিরি, একা থাকায় ভয় পাই না আমি। একাই তো আছি। খানিক থেমে আবার বিন্ধ্যবাসিনী বলেন, —দেখো, বিফল যাত্রা না হয়।

জমিদারগৃহের তোরণ-ফটক পেরিয়ে পাল্কী ততক্ষণ প্রবেশ-দ্বারের কাছে। পাল্কী নামাতেই বিদ্যুতের শিখার মত এক পলকের মধ্যে রাজকুমারী প্রায় ছুট দিয়ে চলে গেলেন যেন। যশোদা শুধু নামলো না। বসে থাকলো যেমনকার তেমনি। বললে,—চৌধুরী-গিন্নীর একটা হুকুম আছে। তামিল করতে হবে আমাকে।

পাইকরা শুধালো,—কি হুকুম?

যশোদা গম্ভীর স্বরে কথা বলে। কেমন যেন মান্যগণ্যের ঢঙে। বললে, —আসমানদীঘির ঐ তীরে পাল্কী নিয়ে যেতে হবে, চৌধুরীগিন্নীর দু'টো গোপন কথা জানিয়ে দিয়ে আসতে হবে।

—আমাদের গিন্নীমার হুকুম ?

—হাঁ গো হাঁ। আনন্দকুমারীর সন্ধানে যাবো।

আর কিছু বলতে হয় না। আবার পাল্কী উঠলো আর চললো নতুন উদ্যমে। কপালের ঘাম মোছার ফুরসৎ পায় না বাহকরা।

অন্দরের এক চোরা ঘুলঘুলি থেকে রাজকন্যা এক চোখে দেখলেন, পাল্কী-খানা আবার চললো। আর দেখলেন প্রাঙ্গণে-প্রান্তরে জ্যোৎস্না থৈ-থৈ করছে। গাছের শীর্ষে শীর্ষে সোনার প্রলেপ। আকাশ থেকে যেন মুঠো মুঠো জ্যোৎস্না ঝরছে। চাঁদের ভস্ম পড়ছে সোনালী চিকণ তুলে।

রুদ্ধশ্বাসে সোপান-শ্রেণীতে উঠলেন বিন্ধ্যবাসিনী। ঘনকালো অন্ধকার, শুধুমাত্র পরিচয়ের ভরসায় নির্ভয়ে চললেন যেন। নিজের কক্ষে কোন রকমে পৌঁছানো, ততঃপর আর কোন ভয় নাই। ঘরের ভেতর থেকে অর্গল তুলে দিয়ে থাকলেই যথেষ্ট। রাজকুমারীও তাই করলেন। ঊর্দ্ধ দেহের বস্ত্র আলগা করলেন। কক্ষলগ্ন দালান থেকে আমোদরকে দেখা যায়। নদীতে চোখ রেখে দাঁড়ালেন বিন্ধ্যবাসিনী। মুক্ত বাতাস আসছে নদীর বুক থেকে। জ্বালাহর ঠাণ্ডা বাতাস। সোনার চাদর বিছানো নদীতে। চাঁদের আকর্ষণে কিছু যেন উচ্ছ্বসিত। লক্ষ লক্ষ বাহু মেলছে আকাশের দিকে। যৌবনের জোয়ার এসেছে যেন আমোদরের। তাই ডাকাডাকি করছে আকাশের চাঁদকে।

যুঁই ফুলের গন্ধ আনে হাওয়া। আসমান দীঘির তীরে অজস্র যুঁই ফুটেছে সান্ধ্য বাতাসের চুম্বন স্পর্শে। কতকাল আগের এক মধুরাত মনের কোণে স্মৃতির রেখা তুললো। অচেনা অজানা অনাগত সেই রাত্রিটায় ভীষণ ভয় পেয়ে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলেছিলেন নাবালিকা কিশোরী বিন্ধ্যবাসিনী। বেশ মনে পড়ে, বাসরশয্যায় যুঁই আর বেলফুলের ছড়াছড়ি। ঘরের কোণের জ্বলন্ত দীপশিখাটির মত সারা রাত জাগতে পারলেন না রাজকুমারী। ফুলশয্যার ভোর রাতে ঘুমে ডুবে গেলেন। যুঁইয়ের গন্ধ রাজকন্যার অঙ্গ থেকে যেতে কত কাল সময় লাগে।

কলসী থেকে এক ঘটি জল গড়ালেন বিন্ধ্যবাসিনী। মুখে-পায়ে জল দিলেন। আর এক পাত্র গড়ালেন। পান করলেন আকণ্ঠ। তারপর চকমকি ঘষে দীপ ধরালেন। আলো জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের সকল কিছু চোখে পড়লো। তুলট কাগজের রাশি, মসীপাত্র, লেখনীদণ্ড। চন্দ্রকান্তর দেওয়া সেই জরাজীর্ণ কীটদষ্ট পুঁথিখানি। মহাকাব্যের মূল লেখা আছে ঐ পুঁথিতে। একান্তই দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য।

পায়ের তলায় ভূমি কাঁপছে থেকে থেকে। ভয়ে আর ভাবনায় বুক কাঁপছে। অস্বস্তির কাঁটা বিঁধছে যেন বুকে। পালঙে বসলেন বিন্ধ্যবাসিনী। অবসন্নতায় শুয়ে পড়তে ইচ্ছা হয় দেহ এলিয়ে দিয়ে। চিন্তা-জ্বরের জ্বালায় তাও যেন পারলেন না।

চৌধুরীকন্যা কোথায় এখন কে জানে! রাজকন্যার চোখে ভয়াবহ দৃশ্য ভাসতে থাকে। অত্যাচার আর উৎপীড়নের ছবি। আনন্দকুমারী এখন বিদেশীর কবলে। তার খেয়াল-খুশী চরিতার্থের সামগ্রী। চোরাই আর লুঠের মাল।

গঙ্গানদীর এক কিনারায় এক ভাঙ্গা ঘাটে ম্যালেটের তরী নোঙর বেঁধেছে। তীরের একেবারে কাছাকাছি নয়, কিছু দূরে। হিংস্র জানোয়ারের ভয়। বিশেষতঃ বাঘের ভয়। ক্ষুধার জ্বালায় কত গহিন রাতে তীরলগ্ন নৌকার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঘ।

বাঘের গর্জ্জনে ভীতা আনন্দকুমারী। ম্যালেটকে জড়িয়ে ধরে আছে সজোরে। ম্যালেট তো হেসেই খুন। কৃষ্ণকন্যার ভয় পাওয়া দেখে। নদীর এক প্রান্তে হাসির প্রতিধ্বনি ভাসিয়ে অট্টহাসি হাসছে ম্যালেট। তার হাসির চাঞ্চল্যে বজরা দুলে দুলে উঠছে।

জানলা থেকে জ্যোৎস্না ঠিকরে পড়েছে বজরার মধ্যে। গঙ্গার ছোট ছোট ঢেউগুলি এসে নৌকার আশ-পাশে আছড়ে পড়ছে। কলকলিয়ে হাসছে যেন রাতের গঙ্গা।

মরণপথের যাত্রীর মত চৌধুরাণীর মুখখানি রুক্ষ আর বিবর্ণ হয়ে উঠেছে, চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পায় ম্যালেট। ভয় পেয়েছে, তাই হয়তো থেকে থেকে কেঁপে উঠছে দেহলতা। ম্যালেটের বাহুবন্ধনে বাঁধা তবু।

—ভয় নাই। ম্যালেট আবার বললে হাসতে হাসতে। বজরার ভিতরে এক কোণে কি দেখিয়ে বললে,—ভয় কেন? বন্দুক আছে হামাদের।

বজরার এক প্রান্তে তোলা-উনুন জ্বলছে রাঙা আগুনের আভা ছড়িয়ে। সাহেবের রান্না চেপেছে। সিপাইরা রান্নার কাজে লেগেছে। দুধের পাত্রে দুধ ফুটছে টগবগিয়ে। খাঁটি গোদুগ্ধের সুগন্ধ বইছে হাওয়ায়। দুধ নামলেই সব্জী সিদ্ধ হবে। তারপর মাছ ভাজার পালা। একটা ভেটকী মাছ কিনেছে ম্যালেট, হাট-বাজার থেকে। এক কুড়ি আম কিনেছে।

গঙ্গার বুকে ঠাণ্ডা বাতাস চলেছে। চৌধুরাণীর আলুলায়িত রুক্ষ কেশের রাশি উড়ছে। চুলে চিরুণী পড়ে না কত দিন। এক ফোঁটা তেলও নয়। আনন্দকুমারীর এলোচুল যেন কালো রঙ হারিয়ে সোনালী হয়ে উঠেছে। তার মাথায় পর পর কয়েকটা চুমা খায় ম্যালেট। আরও কাছে টেনে নেয় তাকে। বলে,—কোথায় যাবে বজরা?

ম্যালেট মাঝে মাঝে দেশী ভাষায় কথা বলে। স্পষ্ট বাঙলা ভাষা বলে। ম্যালেট ল্যাটিন, ইংরাজী, ফরাসী আর স্পেনের ভাষা জানে! কথ্য বাঙলা ভাষাও দিনে দিনে রপ্ত করছে। শুনে শুনে শিখছে। যেটা জানে সেটা আওড়ায় যখন তখন। ল্যাটিন আর ইংরাজীর সঙ্গে বাঙলা ভাষার যোগসূত্র খোঁজে মনে মনে।

আনন্দকুমারী বললে,—এখানে থাকবো না আমি। কিছুতেই নয়। আরও এগিয়ে চল।

ম্যালেট মিষ্টি হেসে বললে,—পর্টুগীজ পাইরেটদের ভয় আছে। ক্যানেলে লুকিয়ে আছে ওরা। বজরা দেখলেই হামাদের এ্যাটাক্ করবে। তখন আমরা মারা যাবো। বাঘ একা এ্যাটাক করে, পাইরেট আসবে দল বেঁধে।

শিউরে শিউরে উঠলো চৌধুরাণীর স্তব্ধ চোখের তারা। মুখে তার কথা ফুটলো না। ম্যালেটের মুখপানে তাকিয়ে থাকলো ভীরু পাখার মত।

ম্যালেট আবার হেসে হেসে বললে,—পর্টুগীজরা হামাদের মারবে না, ধরবে না। আনন্দকুমারীকে ওরা ছাড়বে না। কিড্ন্যাপ করবে।

চৌধুরাণীর ভয়ার্ত চোখ বন্ধ হয়ে যায় সহসা। নিজের মুখখানি সে ম্যালেটের বুকে চেপে ধরে। সাদা মলমলের পাতলা সার্ট ম্যালেটের গায়ে। জিনের সাদা পায়জামা। সার্টের বোতাম খোলা। ম্যালেটের বুকে রূপার চেনে বাঁধা ছোট্ট লকেট। সোনার ক্রশ, যীশুর কাঠামো। চাঁদের আলোয় সেই স্মৃতিচিহ্ন চিকচিক করছে।

মুখ লুকিয়ে চুপি চুপি কথা বলে চৌধুরাণী। বললে,—সাহেব, তুমিও তাই করেছো। ইংরাজের সঙ্গে পর্তুগীজের তফাৎ কোথায়?

এক ঝলক লজ্জা নামলো ম্যালেটের শুভ্র লাল মুখে। সলজ্জায় বললে,—বাট আই লাভ ইউ। আমি টোমাকে ভালবাসি। আই ওয়াণ্ট ইউ। আমি টোমাকে চাই।

নিশ্চুপ থাকলো আনন্দকুমারী। কতক্ষণ কে জানে! ম্যালেটের বুকে কান পেতে শুনলো যেন তার অন্তরের কথা।

—আমার শেষ পর্য্যন্ত কি গতি হবে সাহেব?

চৌধুরাণী কথা বললে হঠাৎ। হিসাব কষে কি বুঝলো কে জানে, পরিণাম জানতে চাইলো কেমন ভাঙা মনে। চোখ তুলে তাকালো। চোখে যেন নেশার ঘোর। বললে,—ঘরে-বাইরে কোথাও যে আর আমার ঠাঁই মিলবে না। মরণ ছাড়া আর গতি কি! কথার শেষে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো ম্যালেটের লোমশ বুকে। তারপর আবার বললে,—আমাকে ফেলে রেখে পালিয়ে যাবে তো?

—নো, নো। নেভার। কথায় আন্তরিকতা মাখিয়ে বললে ম্যালেট। শিথিল বাহু-বাঁধন কঠিন করলো। চোখে কাতর দৃষ্টি ফুটিয়ে বললে,—আমি টোমাকে ছাড়বো না। নেভার ইন মাই লাইফ।

—সত্যি কথা? পুরুষকে বিশ্বাস নাই। চন্দ্রকান্ত আমাকে বিপদে ফেলে পালিয়ে যায়।

—হাঁ, সত্য কথা। মেরীর নামে বলছি। কালীর নামে বলছি! মাদার গডেশ কালী।

—তোমার কে আছে?

—কেউ নাই হামার। ফাদার ছিলেন, সেও মারা গেল!

—বৌ নেই? স্ত্রী নেই?

—না। টুমি হামার স্ত্রী।

—দেশ কোথায়?

—ইংল্যাণ্ডে।

সব কিছু যেন জানা হয়ে গেছে চৌধুরাণীর। আবার সে স্তব্ধ নীরব হয়। চুপচাপ থাকে। মন্থর শ্বাস ফেলে একেকটা। বজরার আনাচে-কানাচে জলের ঢেউ আছড়ানোর শব্দ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চৌধুরাণীর উড়ন্ত কেশরাশিতে হাতের কোমল পরশ বুলায় ম্যালেট।

—আমার মা আছে। বাবা আছেন। অনেকক্ষণ থেমে থাকার পর আবার কথা বললে আনন্দকুমারী।

ম্যালেট সহানুভূতির সঙ্গে বলে,—হামি জানি।

চাঁদের ছায়া খেলছে নদীর জলে সোজাসুজি। ছায়াপথ সৃষ্টি হয়েছে যেন। জলের স্রোতে ছায়াপথ ধিকিধিকি কাঁপছে। ঐ সোনালী ঝিলিমিলিতে চোখ রেখে কথা বলছে ম্যালেট। সার্টের আস্তিনে কপালের ঘাম মুছলো একবার। চাঁদের ঝিলিমিলি থেকে চোখ ফিরিয়ে নিজের বুকে চোখ নামালো। চৌধুরাণী মুখ উঁচিয়ে বললে,—কোথায় নিয়ে চললে আমাকে?

—টুওয়ার্ডস সুতানুটি-গোবিন্দপুর। ম্যালেট বললে কেমন যেন গম্ভীর সুরে। বললে,—আই উইল গো টু মাই ওয়ার্কিং সেণ্টার।

হঠাৎ যেন দুলে উঠলো বজরাখানা। জলের ঢেউয়ে টলমলিয়ে উঠলো। ম্যালেট দেখলো আরও একখানি বজরা কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে।

আসছে এই দিকেই, তীরের কাছে। হয়তো নোঙর বাঁধবে। ম্যালেটের চোখে সভয় চাউনি। চোর চুরি করেছে, তাই তার ভয় পাওয়া। হয়তো বামাল সমেত গ্রেপ্তার করতে আসছে কারা। ম্যালেট দেখে নেয় তার বন্দুকটা কোথায়!

মাঝি-সর্দ্দার মুখে হুঁকো ধরে কথা বলে পরিহাসের সুরে। বললে,—সাহেব, বজরাখানা দেখো একবার। চক্ষু জুড়িয়ে যাবে।

ম্যালেটের লক্ষ্য চলন্ত বজরার সঙ্গে সঙ্গে চলে। সাগ্রহে দেখে বজরার গতিবিধি; অনেক মাঝি-মাল্লা বজরার দুই মুখে। বজরার ঘরে সারি সারি গবাক্ষ। ছাদে ধৌতশুভ্র বিছানা-তাকিয়া। মশাল জ্বলছে ছাদের মাথায়, সুউচ্চ বাঁশের শীর্ষে। সেই আলোয় দেখা যায় নৌকাগাত্রে নানা রঙের চিত্র-বিচিত্র। বজরাখানি ব্যাঘ্রমুখী। আর যেন স্থির থাকতে পারে না ম্যালেট! বাহুপাশ আলগা হয়ে যায় ধীরে ধীরে।

বজরা এখনও দোদুল্যমান। জলের স্বাভাবিক ধারা যেন হঠাৎ ব্যাহত হয়েছে। চৌধুরাণীও মাঝি-সর্দ্দারের কথা শুনে চোখ ফিরিয়ে দেখছে। উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আনন্দকুমারীর হাত ধরে তাকে বসিয়ে ম্যালেট ঘরের বাইরে যায় মাথা নামিয়ে। চুরি করেছে ম্যালেট, তাই হয়তো ভয় হয়েছে।

চোখের যেন পলক পড়ে না। চৌধুরাণীর লক্ষ্যে ধরা পড়ে ঐ বজরার যাত্রীরা সকলেই দেশীয়। দেখে যেন সে আশ্বাস পায় মনে।

—সুতানুটি-গোবিন্দপুরের বজরা। ঐ তল্লাট থেকে আসছে।

মাঝি-সর্দ্দার দেখে দেখে চিনতে পারে। বজরার গঠন, আকৃতি আর যাত্রীদের দেখতে দেখতে কথা বললে অটুট আত্মবিশ্বাসের সুরে।

—ফ্রেণ্ড অর্ ফো! নিজেকে যেন প্রশ্ন করলে ম্যালেট। বললে,—শত্রু না মিত্র?

মাঝি-সর্দ্দার বললে,—জানি না সায়েব, তবে মনে হয় আমাদেরই মত রাতটুকু কাবার করতে নোঙর ফেলছে।

কথা কানে যায় আর বুকের মধ্যে যেন গুমরে গুমরে ওঠে। আনন্দকুমারী ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো। 'সুতানুটি-গোবিন্দপুরের বজরা' এই কথাটি শোনামাত্র তার শোণিতধারায় কেমন এক উত্তেজনা নাচানাচি করতে থাকে। ম্যালেটের পিছনে দাঁড়িয়ে অবাক-চোখে সে তাকিয়ে আছে। নিষ্পলক চোখে দেখছে সুচিত্রিত বজরাখানি আর তার যাত্রীদের। বজরার ছাদে মশাল জ্বলছে কম্পমান শিখায়। গঙ্গাবক্ষের মুক্ত হাওয়ায় মশালের আলো থর-থর কাঁপছে। বজরার ছাদে শুভ্রশয্যায় কে যেন বসে আছেন তাকিয়ায় হেলান দিয়ে। বন্দুকধারী সিপাইরা চলাফেরা করছে মাঝে মাঝে। চাঁদের অকৃপণ আলোয় বন্দুক স্পষ্ট দেখা যায়।

—ডার্লিং, ভয় পাইও না। ডান হাতে চৌধুরাণীর কোমর জড়িয়ে ধরলো ম্যালেট। বুকের কাছে টেনে নিলো তাকে।

বাঘ গর্জ্জে উঠলো আবার, অনেক দূরে কোথায়। হুঙ্কারের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। ফেউয়ের ডাক শুরু হয় সঙ্গে সঙ্গে।

ম্যালেট যেন কেমন নিরাশ হয়ে ফিরে আসে। চৌধুরাণীকে ছেড়ে চলে আসে; বসে পড়ে নিজের জায়গায় ফিরে এসে। ডিকেণ্টারটা টেনে নেয় নিজের কাছে। তৃষায় কাতর হয়েছে সে! কণ্ঠ প্রায় শুকিয়ে গেছে।

এত আদর যত্নেও মন উঠছে না আনন্দকুমারীর! বজরার ঘরে তার মন বসছে না, বাইরে ছুটে চলেছে বারে বারে। কে কোথায় এলো গেল নজর সেই দিকে যেন। খাঁচার বন্দী পাখী যেমন দেখে আকাশ-বিস্তার।

পানপাত্র মুখে তুললো ম্যালেট। স্কচ হুইস্কি এক পাত্রে—যা কখনও না কি বিশ্বাসঘাতকতা করে না। বরং অনুরাগিণী প্রেয়সীর মত আনন্দ দান করে।

—চৌধুরাণী! হঠাৎ কি মনে হতে ম্যালেট ডাক পাড়লো সিক্তকণ্ঠে।

আনন্দকুমারী সাড়া দেয় না। যেদিকে তার চোখ সেদিকেই চেয়ে থাকে। ডাক যেন কানে যায় না তার। শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

ম্যালেটের মনের আশার আলো যেন নিবু নিবু হয়। অবজ্ঞার আঘাত

লাগে তার। পানপাত্র মুখে তোলে আবার। এক চুমুকে শেষ হয়ে যায় পাত্র। গঙ্গার বুকে চাঁদের ঝিলিমিলি দেখতে থাকে ম্যালেট। তার কপাল আর ভুরুতে কুঞ্চন দেখা দেয় কেন কে জানে! শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে হয়তো। ব্যাকুল প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে চৌধুরাণী। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে বহু বিচিত্র বজরাখানা আর তার যাত্রীদের। সুতানুটি-গোবিন্দপুরের নাম দু'টি তার পরিচিত। চৌধুরীমশাই বছরে বেশ কয়েক বার মান্দারণ থেকে যাত্রা করেন সুতানুটির উদ্দেশ্য, ব্যবসার প্রয়োজনে। গোবিন্দপুরের কোলে গঙ্গার তীরে আছে বুড়োশিবের বাজার-হাট। সেই হাটে মাল বিকাতে যান চৌধুরী, সওদাও করেন। নাম দুটি শুনে জমিদার-নন্দিনী বিন্ধ্যবাসিনীর মুখখানি মনের পটে ভেসে ওঠে। তাঁর পিত্রালয় ঐ দেশে। আনন্দকুমারী ভাবলো, এখন রাজকুমারীর সঙ্গে আর কোন পার্থক্য নেই তার। তিনি গৃহে বন্দিনী, চৌধুরাণীও বজরায় বন্দিনী।

বাঘ ডাকছে ঘন ঘন। ফেউও ডাকছে। কিন্তু চৌধুরাণীর যেন কান নেই! ভয় নেই। বজরা আর দেশী যাত্রী দেখে মনে মনে কি সে আঁচতে থাকে কে জানে! লাল অধর দংশন করে দাঁতে। চোখের পাতা পড়ে না। পাষাণ-মূর্তির মত অবিচল দাঁড়িয়ে থাকে।

তোলা-উনুন জ্বলছে। সাহেব আর বিবির রান্না চেপেছে রাতের। মাছ ভাজার গন্ধ ভাসছে হাওয়ায়। খাঁটি সরষের তেলের উগ্র গন্ধ।

ম্যালেট জলের বুকে লম্ববান ঝিলিমিলি দেখছে তো দেখছেই। চৌধুরাণীর দিকে আর যেন কখনও ফিরে তাকাবে না। রাগ না অভিমানের গাম্ভীর্য্য তার চোখে-মুখে। দ্বিতীয় পাত্র মুখে তুলেছে ম্যালেট। পান করেছে কয়েক চুমুক!

চৌধুরাণীর মুখের হাসি কৃত্রিম। ঘরে ফিরে আসে। মনে কি যেন আঁচতে থাকে সে। নকল হাসি হেসে আর একটু ঘেঁষে বসে। তার কোমল দেহ অনুভব করে উষ্ণতা। ম্যালেটের রাগের গরম হয়তো। চোখে-মুখে হাসি মাখিয়ে ম্যালেটের হাত থেকে পাত্র কেড়ে নেয় আনন্দকুমারী। টলমল করছে সোনালি-রঙের হুইস্কি! নিজের হাতে ম্যালেটের মুখের কাছে

এগিয়ে ধরে চৌধুরাণী। কি কারণে কে জানে হঠাৎ যেন অদ্ভুত লাস্যময়ীর ভাব সে দেখায়। নিজের মুখ তুলে ধরে ম্যালেটের মুখের কাছে।

বাইরে জ্যোৎস্না আর অন্ধকারে প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। কে কাকে হারাতে পারে। সিপাই আর মাঝিরা কি এক দৃশ্য দেখতে পায় বজরার ভিতরে। কি লজ্জাহীনা ঐ বেনের মেয়ে! তারা চোখ ফিরিয়ে নেয় অন্য দিকে।

সুধাপানের লোভে ম্যালেট আবার হাসলো মুখের গাম্ভীর্য্য ঘুচিয়ে। নেশার প্রথম উগ্রতায় কেমন যেন আত্মজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

কতক্ষণ অতীত হয়ে যায়, কথা বলার অবকাশ পায় না চৌধুরাণী। যখন মুক্তি পায় তখন বলে,—খুশী হয়েছো সায়েব ?

মাথা দুলিয়ে ম্যালেট নেতিবাচক ইঙ্গিত করে। মিষ্টি হাসি ম্যালেটের মুখে।

আবার মুখ তুলে ধরলো আনন্দকুমারী। কি এক আবেশে চোখ দুটি বন্ধ করলো। ম্যালেটের হাতের বলিষ্ঠ আঙুল কটা চৌধুরাণীর পিঠে যেন কামড়ে ধরে। কত কোমলদেহ, তবুও এতটুকু আপত্তি জানায় না আনন্দকুমারী।

বাঘের গর্জ্জন ভেসে আসে অনেক দূর থেকে। খেয়াল নেই কারও। হুইস্কির নেশায় যেন বিভোর হয়ে আছে ম্যালেট।

নিজেকে মুক্ত করে আনন্দকুমারী। বলে,—ছেড়ে দাও এখন। সিপাইরা সব ঘোরাফেরা করছে যে!

ফিস-ফিস কথা, তবু অমান্য করতে পারে না ম্যালেট। চৌধুরাণীকে ছেড়ে পানের পাত্র মুখে তুললো খুশী মনে।

এক রাশ হেসে আনন্দকুমারী বললে,—দেখি, আকাশের চাঁদ এখন কোথায়। কথা বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালো সে। লম্বা পা ফেলে ফেলে তিন কদমে ঘরের বাইরে চলে গেল। আকাশের এদিক সেদিক দেখতে থাকলো।

মাঝি আর সিপাইরা সারাদিনের ক্লান্তিতে এখন শান্ত হয়ে আছে। এখানে সেখানে তারা বসে আছে দলে দলে আর খোসগল্প করছে।

হঠাৎ কি এক শব্দে চমকে উঠলো সকলে। এমন কি ম্যালেট পর্য্যন্ত।

তার হাত থেকে পানপাত্র খসে পড়লো। মাঝিদের দলে হৈ হৈ পড়লো। সিপাইরা ছোটাছুটি করতে থাকে।

ঘরের বাইরে এসে এধার ওধার তাকিয়ে ম্যালেট দেখলো, আনন্দকুমারী নেই। অতাকতে জলে ঝাঁপ দিয়েছে সে। দু'জন মাঝিও ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে। কোথায় সায়েবের বিবি! ম্যালেট ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো।

জল আর জল। সাঁতরে চলেছে দু'জন মাঝি, যদি একবার ভেসে ওঠে। দেখা যায় যদি দেহের কোন অংশ। আনন্দকুমারীর শাড়ীর আঁচল কিম্বা তার মাথার কালো কেশ! চৌধুরাণী ডুব-সাঁতারে এগিয়ে যায় ছুটন্ত সাপের মত; যেদিকে বজরাখানা দাঁড়িয়ে আছে সেই দিকে সে সাঁতরায়। সুতানুটি-গোবিন্দপুর থেকে গড়-মান্দারণের দিকে যাবে বজরা, তবে আর দ্বিধা কেন?

ম্যালেটের রুষ্ট চাউনি আহত হয় নদীর জলে। চৌধুরাণীর চিহ্ন দেখা যায় না কোথাও। ম্যালেটের তর্জ্জন গর্জ্জনে সিপাই আর মাঝিরা ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

চৌধুরাণীর ডুব-সাঁতার কারও চোখে পড়ে না। চাঁদের আলোয় একবার শুধু তার একখানি শুভ্র হাত ভেসে উঠতে দেখা যায়। জলের আবর্তে আবার কোথায় হারিয়ে যায় চৌধুরাণী। চাঁদের ছায়া খেলছে জলে। সোনালী ঝিলিমিলি নয়, জলের হাসি যেন!

মৎস্যকন্যার মত এঁকে বেঁকে সাঁতরে চলেছে অদৃশ্য আনন্দকুমারী।

অফুরন্ত জ্যোৎস্নার আলোয় কখন দেখা যায় তার শুভ্র দু'খানি হাত, কখনও মাথার কৃষ্ণকেশ, কখনও শাড়ীর আঁচল বা তার বস্ত্রপ্রান্ত। স্বচ্ছ চন্দ্রালোকে ম্যালেট দেখতে পায় ঝাপসা চোখে, তার প্রিয়সঙ্গিনী·জলে ভেসে চলেছে। ক্রোধের আতিশয্যে বন্দুকটা তুলে নিয়েছে কখন, কিন্তু হাত আর উঠলো না যেন। একটা বুক-জ্বলা দীর্ঘশ্বাস ফেললো ম্যালেট। সার্টের বোতাম খুলে তপ্ত বুকখানা উন্মুক্ত করলো। চোখের দৃষ্টির দোষ, না ভুল দেখছে নিজেই সে বোঝে না। মাঝির দল চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে আছে। হুকুম পাওয়া মাত্র তারা জলে ঝাপ দেবে কিন্তু ম্যালেটের মুখে কোন কথা নেই,

অবাক যেন। খাঁচা থেকে পাখী পালিয়েছে, চলে গেছে হাতের নাগালের বাইরে। শূন্য বজরার কক্ষের দিকে একবার ব্যর্থ দৃষ্টিতে দেখলো ম্যালেট। তারপর ধীরে ধীরে বসে পড়লো নিজের জায়গায়। ডিকেণ্টারটা হাতে তুলে নিয়ে নিশ্চুপ বসে থাকলো কতক্ষণ।

ঘরের খাটো দরজায় দেখা দেয় মাঝি-সর্দার। নিম্নকণ্ঠে বললে,—হুজুর, গোলা-বারুদ আর এতগুলো বন্দুক থাকতে শিকার পালিয়ে যাবে চোখে ধূলো দিয়ে?

ম্যালেট নিরুত্তর। অভিমানে যেন সে স্তব্ধ হয়ে আছে। চোখের পলক পড়ছে না। মুখে নিরাশার কালোছায়া ফুটেছে। তবুও অস্ফুট ক্ষীণ হাসলে ম্যালেট। ডিকেণ্টার মুখে তুলে ঢকঢকিয়ে পান করলো খানিকটা, তৃষ্ণা মিটাতে। ক্রোধ আর উত্তেজনায় তার কণ্ঠ শুকিয়ে গেছে। মাঝির কথা যেন কানে ওঠে না। ম্যালেট হয়তো জানে, ভালবাসার তত্ত্বে জোর-জুলুম অচল। শক্তির প্রয়োগে দেহ যদিও কারও পাওয়া যায়, ভালবাসার খনি মনটা পাওয়া যায় না। সাহেবের আশার আলো যেন চিরদিনের মত নিবে গেছে। প্রেমের কণ্ঠহার ছিঁড়ে গেছে অতর্কিতে।

মাঝি-সর্দার দেখতে পায় তার মনিব পান করছে অতি-মাত্রায়। এই অসংযমের পরিণাম তার অজানা নয়। দেখতে দেখতে এখনই জ্ঞান হারাবে, আর বসতে বা দাঁড়াতে পারবে না। জ্ঞান ফিরতে ফিরতে হয়তো আকাশ ফর্সা হয়ে যাবে।

বজরার কক্ষে তৈলদীপ জ্বলছে এককোণে। সাহেবের নীলাভ-চোখের আহ্বান দেখতে পেয়ে কক্ষমধ্যে ঢুকলো মাঝি।

ম্যালেট মৃদু হাসির সঙ্গে বললে,—বজরা চালাও।

—কোথায় যাবে সাহেব এই মাঝ রাতে? মাঝি যেন কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের সঙ্গে কথা বললো। বললে,—পর্টুগীজদের হাতে পড়লে কেউ বাঁচতে পারবে না। খালের ধারে লুকিয়ে থাকে তারা।

—ভয় নাই কিছু! কেমন যেন অস্বস্তির সঙ্গে বললে ম্যালেট। বললে,—হামাদের বন্দুক আছে। ভয় কেন? নোঙর খুলতে বল।

অগত্যা মাঝি-সর্দ্দার ঘর থেকে বেরিয়ে যায় ক্ষুব্ধমনে। এত সাধের বিশ্রাম আর কপালে সহ্য হয় না। সারাদিন হাল টেনে টেনে মাঝির দল ক্লান্ত হয়ে আছে। তোলা-উনুন জ্বেলে ভাত তরকারী চাপিয়েছে। সাহেবের রান্না চেপেছে।

সাঁতারে পাকাপোক্ত চৌধুরাণী। কতদিন পাড়ার সঙ্গিনীদের সঙ্গে নিয়ে সায়রদীঘি পারাপার করেছে। চৌধুরীমশাইয়ের গৃহলগ্ন সায়রদীঘি যেমন গভীর তেমন বিশাল। একপাল হাঁসের মত আনন্দকুমারীর দল দীঘি তোলপাড় করেছে সকাল ও সন্ধ্যায়।

আর কি দেখতে পাওয়া যাবে তাকে! আনন্দকুমারীর কুসুম কোমল দেহের স্পর্শ এখনও যেন অনুভব করা যায়। ম্যালেট ভাবছে, কুসুমের মত যে এতই মৃদু, সে কেন এমন বজ্রের মত কঠিন হবে!

—কোন দিকে যাব হুজুর? উত্তরে না দক্ষিণে?

মাঝি-সর্দ্দার নৌকার একমুখ থেকে সজোরে কণ্ঠ ছাড়লো। শন-শন বাতাস চলছে মধ্য-গঙ্গায়, কথা শোনা যায় কি না যায়, তাই কথার সুর জোরালো।

ইষ্টওয়ার্ড হো! ওয়েষ্টওয়ার্ড হো!

ম্যালেটের নিজের দেশের মাঝিদের কথা মনে পড়ে। মনটা যেন ফাঁকা হয়ে আছে তার। টেমস নদীর বাঁধাঘাট ভেসে উঠছে তার নেশাচ্ছন্ন চোখে।

ডিকেণ্টার আবার মুখে তুলতে যাবে, হঠাৎ যেন ঘরের ফরাসে চোখ পড়তেই একটু খুশীর হাসি ফুটলো লাল ঠোঁটের ফাঁকে। নজর পড়তেই নিজের হাতে তুলে নিলো ম্যালেট, কয়েকটা শজারু-কাঁটা। আনন্দকুমারীর কবরীবন্ধনের কাঁটা।

সামান্য মাথার কাঁটা ক'টায় বার বার চুমা খায় ম্যালেট। আলোয় ধরে

দেখে। শেষে অতি যত্নে কাঁটাগুলি জামার বুক-পকেটে রেখে দেয়। মুখের হাসি মিলিয়ে যায় আবার। কাঠিন্য ফোটে মুখে। ঈষৎ জলসিক্ত চোখ।

নৌকার এক শেষে মাঝি-সর্দারের হাতে জ্বলন্ত হুঁকা। বজরা মধ্য গাঙে ভাসিয়ে দিয়ে তারা তামাক খেতে বসেছে। ফুটফুটে জ্যোৎস্না থৈ থৈ করছে নদীর জলে। মাঝি-মাল্লারা দেখছে পেছনে-ফিরে আসা তীরে বাঁধা চিত্রবিচিত্র বজরা-খানি। বিরাট বজরার ছাদে মশাল জ্বলছে। মশালের আকাশমুখী লেলিহান শিখাটিতে যেন নর্ত্তকীর দেহভঙ্গিমা। বাতাস চলেছে, তাই নেচে চলেছে মশালের আগুন। বজরার পাটাতনে বন্দুকধারী সিপাই পাইচারী করছে।

সার্টের আস্তিনে চোখ মুছে নেয় ম্যালেট। লক্ষ্যহীন শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে! নিজের মনে বিড় বিড় বকে চলেছে জানলায় মাথা হেলিয়ে।

জ্যোৎস্না রজনীর গভীর গাম্ভীর্য্য নেই! অফুরন্ত যৌবন-সম্ভার, যার কালাকাল নিরূপণ হয় না। পূর্ণ যৌবনার মত সময়ের হিসাব ভুলিয়ে দেয়। আনন্দকুমারী তীরের নিকটে এসে চারিদিকে চক্ষু ঘুরিয়ে দেখলো অস্পষ্ট দৃষ্টিতে। জ্যোৎস্নার জোয়ার তার চোখে। বোঝে না রাত্রি এখন গভীর। অবিরাম সন্তরণের ক্লান্তিতে হাঁপ ধরেছে, তদুপরি বুকে পলাতকার ভয়, শিহরণ। এক বসনে সংসার-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছে চৌধুরাণী। এখন কে বলে দেবে পথ কোথায়? মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করবে কে? কে দেখাবে জীবনের আলো।

গঙ্গার তীরে জঙ্গলের অন্ধকারময় কায়া। দেখলে ভয় হয়। অসংখ্য খদ্যোত জ্বলছে গাছের শাখায় শাখায়। পিশাচ আর পিশাচীরা হাসাহাসি করছে। তীরে উঠে দেহের সিক্ত বাস ঠিকঠাক করে নেয় আনন্দকুমারী। শ্বাসকষ্ট হয় হয়তো, নিটোল বক্ষ ঘন ঘন ওঠানামা করে।

মশালের আলো ছড়িয়েছে তীরে। আনন্দকুমারীর সিক্তবসন। এক অপরূপ মৎস্যকন্যাকে দেখতে পেয়েছে বজরার মাঝিরা। সত্যি না মিথ্যা দেখছে, ঠাওরাতে পাচ্ছে না।

আনন্দকুমারী ছুটলো বুকের ভেজা আঁচল সামলে। মৃত্যুভয়ে ভীতা যেন সে। এত ক্লান্ত, তবুও সে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটলো বজরার দিকে। জানে না, এক খাঁচা থেকে আর এক খাঁচায় বন্দী হবে কি না।

ম্যালেট ভালবাসা জানিয়েছে নরম সুরে, চৌধুরাণীর দেহটাকে আন্তরিক-ভাবে চেয়েছিল। এ খাঁচার অধিকারী যদি নরদানব হয়! আনন্দকুমারী ভবিষ্যৎ জানতে চায় না। রাবণের হাতে মৃত্যু অপেক্ষা রামের হাতে মরণ না কি অনেক সুখের, অনেক আনন্দের।

বজরার অধিকারীও দেখতে পেয়েছেন অপ্সরীনিন্দিতা মৎস্যকন্যাকে। ছাদের ফরাসে লাল ভেলভেটের তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে তিনি নিশ্চিন্তায় বসেছিলেন, এই দৃশ্য দেখে বিন্দুমাত্র বিস্মিত হলেন না।

একজন তাঁবেদার তাঁর সেবায় রত ছিল। দেহ মর্দ্দন করার কাজ। পদ-সেবার দাস একজন কাছে ছিল। তাকেই ফিসফিসিয়ে বললেন,—হয়তো ভাগ্যবিড়ম্বিতা, আশ্রয়প্রার্থিনী। কি প্রার্থনা জানায় শুনা চাই।

জগমোহন লেঠেলের বুকে সুপ্ত সিংহ জাগলো যেন। বজরার ছাদ থেকে নৌকার তীরে এক লাফে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ঝাঁপ দেওয়ার পূর্ব্ব মুহূর্তে বললে,—কুমারবাহাদুর, আপনার অনুমানই যথার্থ। দেখি এ কি বলে।

ভয়ে বুক দুরদুরিয়ে ওঠে। আনন্দকুমারী কয়েকবার শিউরে শিউরে উঠলো। ক'হাত পিছিয়ে দাঁড়ালো।

জগমোহন বললে,—ঠাকরুণ, আপনি কে? এই ভয়ের স্থানে এমন অসময়ে?

অধর থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে। ভিজে চোখে অশ্রুর আভাস দেখা যায়। আনন্দকুমারী সাবগুণ্ঠনে নতমুখী। নির্লজ্জতার আত্ম-প্রকাশ যেন না হয়। আনন্দ ভীতি-কম্পিতকণ্ঠে বললে,—উদ্ধার চাই আমি। আমাকে উদ্ধার করতে হবে। একজন ইংরেজ আমাকে—

আঁ! কৃত্রিম স্বরে আঁতকে উঠলো জগমোহন। তারপর সহাস্যে বললে,—ঘর কোথায়? দেশ কোথায়? কি জাতের মেয়ে?

নতমাথা তোলে না চৌধুরাণী। গুণ্ঠনের আড়াল থেকে কথা বললে,—ঘর মান্দারণে। আমি একজন বণিককন্যা। পিতার নাম গোপীমোহন চৌধুরী।

আনন্দের উচ্ছ্বাসে অট্টহাসি ধরলো জগমোহন। তীরের জঙ্গলে তার সজোর হাসির প্রতিধ্বনি ভাসলো। হাসতে হাসতে বললে—ঠাকরুণ, সিঁড়ি বেয়ে বজরায় ওঠ, তার পর দেখা যাবে; খানিক থেমে আবার বললে,—আমরাও ঐ মান্দারণে চলেছি।

জগমোহন সোৎসাহে আগে আগে চললো। তার ছায়া ভয়ে ভয়ে অনুসরণ করলো চৌধুরাণী। আশার আলো দেখলো যেন ভরাডুবির পর। তবু এখনও তার ভয় ভয় করছে। বজরায় উঠতে পা চলছে না যেন। দেহ কাঁপছে থরথরিয়ে।

—কুমারবাহাদুর আছেন বজরায়। মানুষের মধ্যে দেবতা তিনি। জগমোহন সিঁড়িতে উঠতে উঠতে বললো।

আনন্দকুমারী কথা বলে না আর। সে যা বলতে চায় তা যেন বলা হয়েছে। আত্মরক্ষা পাওয়ার প্রার্থনা জানিয়েছে, আর কিছু বক্তব্য তার নেই। সহসা চোখে পড়লো বজরার ঘরে স্তূপীকৃত অস্ত্রশস্ত্র। শেষ পর্য্যন্ত ডাকাতদলের হাতে স্বেচ্ছায় নিজে ধরা দিলো না কি চৌধুরাণী?

সিক্তবাস, ঠাণ্ডা হাওয়ায় শীতের স্পর্শ লাগে। ভয়ে ও সঙ্কোচে পা দুটি কেঁপে কেঁপে ওঠে। ভবিষ্যৎ কেউ জানতে পারে না, কে জানে এখনও কত বিপদ বরণ করতে হবে!

জগমোহন আবার কথা বলে খুশীর হাসি হাসতে হাসতে। বললে,—ঠাকরুণ, তোমার কোন ভয় নাই। আমাদের কুমারবাহাদুর তোমাকে আশ্রয় দেবেন। এই বসতরখান (বস্ত্র) নিয়ে তুমি ভিজে কাপড়টা ছেড়ে দাও। ভয় পাও কেন মিথ্যে মিথ্যে! ঘরের ভিতরে যাও, কেউ সেথায় নাই।

হলুদ রঙে ছোপানো একখানি নতুন কাপড় আনন্দকুমারীর হাতে দেয় জগমোহন। বজরার ঘরের দরজা দেখিয়ে দেয়।

কুমারবাহাদুর চোখের ইশারায় কাছে ডাকলেন জগমোহনকে। চুপি

চুপি বললেন,—কাদের মেয়ে? কি বলতে চায়? অভি ন্ধি নাই তো কিছু?

এক ঝলক হেসে নেয় জগমোহন। হাসি চেপে বললে,—মান্দারণের এক বেণের মেয়ে। ইংরেজ ধরে নিয়ে কোথায় চলেছিল, মেয়েটা নৌকা থেকে ঝাঁপ দিয়ে পালিয়ে এসেছে।

প্রশংসার হাসি হাসলেন কাশীশঙ্কর। বললেন,—বেণের মেয়ের বুদ্ধির তারিফ করতে হয় তবে।

—হাঁ হুজুর! দেখে মনে হয় বেশ চালাকচতুর। জগমোহন হেসে হেসে বলে। বললে,—ধূর্ত ইংরেজদের চোখে ধূলো দিয়েছে যখন। মেয়েটি হুজুর যাকে বলে আপনার পরমাসুন্দরী।

কাশীশঙ্কর বললেন,—খেতে পরতে দাও এখন। মান্দারণে ফিরতে চায় নাকি?

—হাঁ, মান্দারণে ফিরতে চায়। জগমোহন ফিসফিস করে কথা বলে।

স্বর আরও নামালেন কুমারবাহাদুর। বললেন,—বিন্ধ্যবাসিনীকে জানে না কি? জমিদার কৃষ্ণরামের নাম?

—শুধাই নাই হুজুর এ সব কথা। বলেন তো যাই গিয়ে একবার বলি।

মাথা দোলালেন কাশীশঙ্কর। বললেন,—না না, এখন নয়। এই সকল কথা এখনই জিজ্ঞাসাবাদ করা সমীচীন হবে না। অহেতুক সন্দেহ হবে।

বজরার জানলা থেকে চৌধুরাণী দেখতে পায়, ম্যালেটের বজরা অনেক দূরে এগিয়ে গেছে। উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে চলেছে। আনন্দকুমারীর বুকের ওপর থেকে যেন এক গুরুভার পাথর সরে যাচ্ছে।

হাতের কর গুণতে গুণতে কথা বলছিলেন কুমারবাহাদুর। হয়তো ায়ত্রী মন্ত্র জপ করেন। মন্ত্রজপের সঙ্গে সঙ্গে কথা বললেন, জপ থামালেন না।

—মা ঠাকরুণ!

বজরার দুয়োরে দেখা দেয় জগমোহন। একান্ত নিকট জনের মত ঘনিষ্ঠ রে ডাকে। বলে,—মিঠাই খেয়ে জল খাও এখন।

—হ্যাঁ তাই দাও। ক্ষুধায় আমি কাতর। তোমাদের কত দয়া!

ক্ষীণকণ্ঠের কথা আসে ঘর থেকে। চৌধুরাণী ঘরের এক কোণে আত্ম-গোপন করেছে। মুখ দেখানোর মত যেন মুখ নেই। কত পাপ করেছে। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক দোষ হয়েছে তার। নিজের দেহটার প্রতি কেমন যেন বিরাগ হয় তার। এই দেহ নিয়ে খেলা করেছে ম্যালেট। ছোঁয়াছুঁয়ি করেছে মনের আনন্দে। গঙ্গায় ডুব দিয়েছে আনন্দকুমারী, মনটা তবু কেন পবিত্র হয় না কে জানে?

মিঠাই আর জলের পাত্র এগিয়ে দেয় জগমোহন। বলে,—খেয়ে-দেয়ে দু'দণ্ড জিরেন নাও। কুমারবাহাদুর যখন আশ্রয় দিয়েছেন তখন আর চিন্তা কি! ঘরের মেয়েকে ঘরে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

—কুমারবাহাদুরকে আমার সহস্র প্রণাম জানাও। তিনিই আমার রক্ষাকর্তা।

চৌধুরাণীর কাঁপা কাঁপা স্বরে যেন প্রচ্ছন্ন ব্যথা। বুকভরা শ্বাস টেনে আবার সে বললে,—তোমাদের মান্দারণে যাওয়ার কারণ কি? সেখানে কোথায় যাওয়া হবে?

জগমোহন মনে মনে খুশী হয়। শব্দহীন হাসি হাসে। বলে,—সে-কথা ঠাকরুণ পরে বলবো, তুমি এখন মিষ্টিজল খেয়ে চাঙ্গা হও। কেমন যেন দুঃখের হাসি হাসলো চৌধুরাণী। অতীত ঘটনার ছবি দেখতে পায় সে। কি দুর্ব্বিসহ সেই মুহূর্ত্তগুলি। ম্যালেটের দুঃসাহসের সমুচিত শাস্তি দেবে কে? ক্রোধের আতিশয্যে মধ্যে মধ্যে অধর দংশন করে আনন্দকুমারী।

নদীর তীরে চুল্লী জ্বলছে কয়েকটা। ভাতের হাঁড়ি চেপেছে মাঝিদের। কুমারবাহাদুরের রাতের আহার তৈরী হয়। মশালের আলো আর চুল্লীর আগুনে গঙ্গার তীরভূমির একাংশ আলোকিত হয়ে আছে।

—জগমোহন! গম্ভীর কণ্ঠের ডাক আসে বজরার ছাদ থেকে। কাশী-শঙ্করের কণ্ঠ যেন গুরু-গম্ভীর।

আনন্দকুমারী কান পাতলো কথা শুনতে। বজরার অধিকারী কি বলে

কে জানে! ভয়ে যেন আড়ষ্ট হয়ে থাকতে হয়। কুমারবাহাদুরকে এখনও চোখের সম্মুখে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়নি। তিনি কেমন ধরণের মানুষ কে জানে!

—ডাকছেন কুমারবাহাদুর? আহ্বান শুনে ব্যস্ত হয়ে ওঠে জগমোহন। সাড়া দেয় বজরার পাটাতনে দাঁড়িয়ে।

কাশীশঙ্কর বললেন,—কাছে এসো, একটা গোপন কথা আছে।

চৌধুরাণী চমকে চমকে ওঠে। কুমারবাহাদুরের বক্তব্য কি, কেন ডাকাডাকি করছেন—ভয়ে তার বুক কাঁপতে থাকে যেন। অজানা আশঙ্কায় আনন্দকুমারী রুদ্ধশ্বাসে বসে থাকে। মিঠাই আর খাওয়া হয় না। মুখে তা ওঠে না। সজাগ কানে অপেক্ষা করতে হয়। কুমার কি আজ্ঞা করেন কে জানে?

জগমোহনকে কাছে পেয়ে কাশীশঙ্কর ফিসফিস কথা বললেন। বললেন —পরস্ত্রীকে সঙ্গে লয়ে যাওয়া অন্যায় হবে না কি? লোকে যদি আমার চরিত্রে দোষ দেয়? কুকথা রটনা হবে না তো?

হো হো শব্দে হেসে উঠলো জগমোহন। বললে,—হুজুর, লোকে আড়ালে রাজা-বাদশাকেও গালমন্দ করে, কারণ থাক আর না থাক। লোকের কথার মূল্য কি?

—তবে বণিককন্যাকে ছাদে পাঠাও। আমি তার সহ কটা কথা কহি। কাশীশঙ্করের মুখে অমূলক আশঙ্কা ফুটেছে। কথার সুর যেন রহস্যময়। —আর একটি কথা বলি। সর্দ্দার-মাঝিকে শুধাও দেখি মান্দারণ আর কতদূর? কুমারবাহাদুরের শেষের কথায় যেন ঈষৎ অধৈর্য্য প্রকাশ পায়। জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকেন।

—হুজুর আমিই বলি, রাতভোর বজরা চালিয়ে সেই ভোর নাগাদ পৌছানো যায়।

—তোমার অনুমান ঠিক?

—হ্যাঁ হুজুর, বিশ্বাস করতে পারেন। কথা বলতে বলতে জগমোহন বজরার ঘরে অদৃশ্য হয়। তার চলাফেরায় বজরা হেলছে দুলছে।

ঘরে তৈলদীপ জ্বলছে এক কোণে। চৌধুরাণী যেন রুদ্ধশ্বাসে বসে আছে। কুমারবাহাদুরের কণ্ঠস্বর শুনে তার ভয় ভয় করে।

—ভয় করছে না কি? বললে জগমোহন। কুমারবাহাদুর যে ডাকছেন।

অল্প হাসি ফুটলো আনন্দকুমারীর মুখে। বললে,—না ঠিক ভয় নয়, তবে ভয়ও বটে। তোমাদের কুমারবাহাদুর মানুষ কেমন তাই শুনি?

—মাটির মানুষ। আকাশের দেবতার সঙ্গে কোন তফাৎ নাই তাঁর।

—গড় মান্দারণে চলেছেন কি কাজে?

—হুজুরের মুখেই শুনা যাবে। তাঁকেই শুধাও কেন যা বলতে চাও।

—তা পারবো না। সাহস হয় না যে। কথা বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালো চৌধুরাণী। হলুদ রঙ ছোপানো সুতির পাতলা বস্ত্র তার পরিধানে। আঁচল টানতে টানতে সিঁড়ি বেয়ে সলজ্জায় ছাদে ওঠে ধীরে ধীরে।

ফিরে দেখলেন না কুমারবাহাদুর। জ্যোৎস্নাধবল আকাশ দেখছেন তিনি। কাপড়ের খসখসানি শুনে বুঝলেন রাজকন্যা এসেছে। চৌধুরাণী ফরাসের এক পাশে বসলো সন্তর্পণে।

জগমোহন বললে,—হুজুর, তিনি এসেছেন।

কথায় কর্ণপাত করলেন না কাশীশঙ্কর। আকর্ণবিস্তৃত চক্ষু ফিরিয়ে একবার দেখলেন মাত্র। বললেন,—নাম কি?

—আমার নাম আনন্দকুমারী।

—পিতার নাম? তিনি করেন?

—গোপীমোহন চৌধুরী। বাণিজ্যকর্ম্ম করেন।

আনন্দর পিতার নাম শুনে কুমারবাহাদুর খানিক স্তব্ধ হয়ে থাকলেন। তারপর বললেন,—তাঁর নাম আমি শুনেছি। গোবিন্দপুরের ইংরেজের কুঠিতে তিনি মাল-মসলা সরবরাহ করেন। আমি কুঠীর নামের তালিকায় তাঁর নাম দেখেছি।

—হ্যাঁ, আপনি ঠিকই দেখেছেন। চৌধুরাণী এতক্ষণে সহজ সুরে কথা বলে। তবুও যেন তার হাবেভাবে ভয়ার্ততা। কণ্ঠ কম্পমান।

—তবে তোমার এই দুর্ভোগ কেন? কুমারবাহাদুর সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন।

চৌধুরাণী মাথা নত করে। বলে,—আমার দুর্ভাগ্য।

কাশীশঙ্কর বললেন,—মান্দারণে কত কালের বাস?

—শুনতে পাই তিন পুরুষের বসবাস আমাদের। বস্ত্রাঞ্চল পাকাতে পাকাতে কথা বলে আনন্দকুমারী।

হঠাৎ গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করলেন কুমারবাহাদুর। নিশ্চুপ বসে থাকলেন কতক্ষণ। কি এক গভীর চিন্তায় যেন মগ্ন হয়ে পড়লেন।

চৌধুরাণী আড় নয়নে দেখে একেকবার। কুমারবাহাদুরের অনিন্দ্য আকৃতি দেখতে দেখতে বিস্মিতা হয়। পেশাবহুল বলিষ্ঠ দেহ—যেমন বর্ণ তেমন গঠন। পুরাণে বর্ণিত রাজচিহ্ন যেন শরীরে।

একবার চারি চক্ষুর দৃষ্টি বিনিময় হয়। আবার চোখ নামিয়ে নেয় চৌধুরাণী। এক লক্ষ্যে দেখে নেয়, কুমারের মুখাবয়বে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যেন।

হঠাৎ আবার কথা বললেন কাশীশঙ্কর। বললেন,—জমিদার কৃষ্ণরামের নাম কি জানা আছে? কৃষ্ণরামের গৃহ আছে মান্দারণে। যদিও কৃষ্ণরাম নিজে সপ্তগ্রামে বাস করেন।

—হাঁ আমি জানি। জমিদারপত্নী আমার বন্ধু। সম্প্রতি পরিচয় হয়েছে। তার নাম কি বিন্ধ্যবাসিনী?

সানন্দে বললেন কাশীশঙ্কর,—হাঁ, নামটা ঠিক। ঐ তার নাম।

—বিন্ধ্যবাসিনী মানুষটার তুলনা হয় না। এত কষ্টভোগ, তবু তার মুখ থেকে হাসি মিলায় না। আনন্দকুমারী চোখ তুলে কথা বলতে যেন সাহসী হয় না। বলে,—বন্দিনী হয়ে আছে সে। শুনতে পাই কৃষ্ণরাম না কি অবিবেচক, অত্যাচারী।

নীরব হলেন কাশীশঙ্কর। মনে মনে প্রসন্ন হাসি হাসলেন। আকাশে চোখ তুলে একদৃষ্টে চেয়ে থাকলেন কতক্ষণ। তারপর বললেন,—কৃষ্ণরাম আমার পরিচিত। মিথ্যা কথা শুন নাই। কৃষ্ণরাম একটা অমানুষ! ধীরকণ্ঠে

কথা বলতে বলতে হঠাৎ স্বর সপ্তমে উঠলো। কুমারবাহাদুর ডাকলেন,—জগমোহন!

নদীর বুক থেকে তীরের জঙ্গলে এই ডাকের প্রতিধ্বনি ভাসলো।

জগমোহন সাড়া দেয় না, এসে হাজির হয় বজরা দুলিয়ে। বলে,—ডাকছেন হুজুর?

আরও কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকলেন কাশীশঙ্কর। কি যেন ভাবতে ভাবতে বললেন,—রাতের আহার প্রস্তুতের বিলম্ব কত জগমোহন?

—আর এক দণ্ড হুজুর। ভাত ফুটছে। মাংসটা আরও কিছুক্ষণ ফুটবে।

—সর্দ্দার-মাঝি! উচ্চস্বরে ডাকলেন কুমারবাহাদুর। আবার প্রতিধ্বনি ভাসলো তীরের জঙ্গলে।

বজরার শেষ প্রান্তে বসেছিল সর্দ্দার। মাঝি আর মাল্লাদের দলপতি সে, তাই উচ্চাসনে বসে। সাড়া দেয়, বলে,—হাজির আছি।

—কোথায় তুমি? দেখতে পাই না কেন?

মুহূর্ত্তের মধ্যে মাঝি-সর্দ্দার এসে উপস্থিত হয়। তিনটে সেলাম ঠুকে বসে,—কিছু বলবেন কুমারবাহাদুর?

কাশীশঙ্কর কি যেন নিক্ষেপ করলেন অতর্কিতে। তৎক্ষণাৎ লুফে নেয় মাঝি-সর্দ্দার। একটি শালুর থলি। এক থলি টাকা। নবাবের ট্যাঁকশালে তৈরী।

—এখনই মান্দারণে যাত্রা করবো। তোমরা তৈয়ার হও। কেমন যেন হুকুমের সুরে বললেন কুমারবাহাদুর। লাল ভেলভেটের তাকিয়া কোলে টেনে নিয়ে স্থির হয়ে বসলেন। জগমোহন কাছেই ছিল। তার উদ্দেশে বললেন,—চুল্লীতে টাটকা কাঠ দেও জগমোহন। মাংসটা যেন সুসিদ্ধ হয়।

গোবিন্দভোগ চালের ভাত আর কচি পাঁটার মাংস। আম আর ক্ষীর। বাতাসে এক মিশ্রিত সুগন্ধের ভার। ভাত, মাংস আর ক্ষীর চেপেছে উনুনে। মাটি খুঁড়ে চুল্লী বানানো হয়েছে।

কি এক গুপ্তমন্ত্রে যেন মাঝিরা চঞ্চল হয়ে ওঠে। সর্দ্দার-মাঝি কি এক মন্ত্র দেয় যেন তাদের কানে কানে আর দেখায় হাতের লাল শালুর থলি।

মাঝিদের ব্যস্ততায় সাড়া পড়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। দোলনার মত দুলতে থাকে বজরা।

রাত্রি গভীর। গঙ্গার উত্তরপ্রান্তে চোখ মেলে মাঝি-সর্দ্দার। যতদূর দৃষ্টি যায় চোখে পড়ে সোনালী নদী—চক্রাকারে বেঁকে গেছে। নগদানগদি টাকার কাছে দূরত্ব কিছু নয়, কিছু নয়।

সর্দ্দার মাঝি বললে,—জগমোহন, তোমার হাঁড়ি কড়াই বজরায় তুলে লও। বজরা ছাড়বে এখনই। নোঙর খোলা হবে এখনই।

বজরার ছাদে দুই জোড়া চোখ বিস্ময় আর আনন্দে প্রায় স্তব্ধ হয়ে আছে। আনন্দকুমারীর মুখখানি হঠাৎ যেন চোখে পড়ে। লাবণ্যে ঢল ঢল মুখশ্রী দেখতে দেখতে কুমারবাহাদুরও যেন কিঞ্চিৎ বিস্মিত হয়েছেন! দুই যুগল আঁখির দৃষ্টিমিলন আকাশের চাঁদ আর তারারা ছাড়া আর কেউ দেখতে পায় না।

উপলঘাতিনী গঙ্গার জলকল্লোলের একটা অস্ফুট শব্দ যেন কখন ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তীরের জঙ্গলে অবিশ্রান্ত ঝিঁঝি ডেকে চলেছে। পূর্ণ শুক্লাতিথির জ্যোৎস্না-আলোয় জঙ্গলের দুর্ভেদ্য আঁধার ঘোচে না। অরণ্যচারী পশুর উজ্জ্বল চোখ সহসা আলোর ঝিলিক তুলে অদৃশ্য হয়ে যায়।

বাঘ না বাঘিনী! কুমারবাহাদুরের সংযত মনটা মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে; চোখের রাশ আলগা হয় থেকে থেকে। প্রথম দেখায় যেন দেখতে পেয়েছেন কাশীশঙ্কর, এ মেয়ের মুখে যেন সম্রাজ্ঞীর লক্ষণ। এই ঘোর বিপদের রাতেও তার চোখে যেন ভয় বা আশঙ্কার চিহ্ন নাই।

—সর্দ্দার, দেরী কত আর? কথার সুরে হুমকি দিলেন কুমারবাহাদুর। সারা বজরার লোকজন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো সহসা। হঠাৎ যেন এক দৈব প্রেরণায় তিনি চঞ্চল হয়েছেন অতিমাত্রায়, তাঁর পেশীবহুল দীর্ঘদেহে খুশীর জোয়ার নাচতে থাকে যেন। কি এক পণরক্ষার কাঠিন্য ফুটেছে সূক্ষ্ম চিবুকে। মাঝে মাঝে চিবুক স্পর্শ করছেন। চিন্তায় আকুল চোখে রহস্যময় চাউনি ফুটে আছে।

বজরার কাঠের পাটাতনে খটাখট আঘাতের শব্দ ওঠে। হাল আর দাঁড় তোলাপাড়া করছে মাঝিরা। সর্দ্দারও চেঁচিয়ে উঠলো। বললে,—দেরী নাই হুজুর!

হলুদ-ছোপানো কাপড়ে মানিয়েছে বেশ আনন্দকুমারীকে। মাথায় সামান্য ঘোমটা দিয়ে কাপড়ের আঁচল এঁটেসেঁটে কোমরে জড়িয়েছে। ভিজে চুলের বোঝা এলিয়ে দিয়েছে পিঠে। ডুব-সাঁতারের কষ্টে এখনও যেন থেকে থেকে সে হাঁপিয়ে উঠছে।

পানের ডাবরটা ঠেলে এগিয়ে দিলেন কুমারবাহাদুর। বললেন,—ইচ্ছা হয়তো দু'টা একটা পান—

কথা অসমাপ্ত থেকে যায়। আয়েসের হাসি হেসে দু'টি তাম্বুলমাখা পান মুখে দেয় চৌধুরাণী। বলে,—মহাশয়ের আসল পরিচয়টা শুনা হয় নাই এখনও।

মশালের আলোয় আর একবার দেখলেন কাশীশঙ্কর। মুখখানি দেখতে দেখতে বললেন,—আমি তেমন কেউ খ্যাতিমান নই। পরিচয়টা আপাততঃ গোপন থাক।

এক থলি টাকা পেয়েছে মাঝি-সর্দ্দার। হাতে হাতে পেয়েছে শালুর থলি ভারী ওজনের। রাতের আবেশে তন্দ্রা-নামা চোখে ঘুমের বদলে উৎফুল্লতা ফুটেছে। ঘুমন্ত মাঝিদের লাথি মেরে মেরে ঠেলে তুলছে। যারা ক্লান্তি আর ঘুমের ঘোরে উঠতে চায় না, তাদের চোখের সামনে লাল শালুর থলি ধরছে।

জগমোহন লেঠেল মুখ উঁচিয়ে বললে,—কুমারবাহাদুর, মাংসটা সিদ্ধ হতে আরও একটুক বিলম্ব হবে।

তিনটে চুল্লীতে ভাত, ক্ষীর আর মাংস চেপেছে। কাঠের আগুন জ্বলছে লেলিহান শিখা ছড়িয়ে। গন্ধে গন্ধে আশেপাশে শিয়ালের দল এসে জুটেছে। তারা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে গোঁফ চাটছে লোভে লোভে।

কাশীশঙ্কর বললেন,—একটা আটসেরী ছাগ সিদ্ধ হতে রাত্রি কাবার হবে না কি? চুল্লীতে টাটকা কাঠ দেও। ভাত আর দুধটা নেমেছে কি বলতে পারো?

—এখনই নামবে হুজুর!

আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন কুমারবাহাদুর। বজরার ছাদে পায়চারী করতে থাকেন। আনন্দকুমারীর উদ্দেশ্যে বললেন,—তোমার পিতার সঙ্গে কোথায় দেখা হয় বলতে পারো?

কয়েক মুহূর্ত স্থির বসে থাকে চৌধুরাণী। সভয়ে মিহি কণ্ঠে বললে,—কি প্রয়োজন জানতে পারি কি?

আপন মনে হাসতে থাকেন কাশীশঙ্কর। তাঁর মনে কি এক ভাবের উদয় হয় যেন। পায়চারী থামিয়ে হাসি লুকিয়ে বললেন,—বিপদের ভয় নাই কিছু, প্রয়োজন আমার ব্যক্তিগত।

মুখের পান আর তাম্বুল বিস্বাদ লেগেছিল যেন। ব্যক্তিগত প্রয়োজনের কথাটি শুনে স্বস্তির শ্বাস ফেললো আনন্দকুমারী, বললে,—বাবামশাই সুতানুটি থেকে ফিরে আসেন তো দেখা হবে।

অল্প হাসির জের টেনে কাশীশঙ্কর বললেন,—ব্যবসায় নেমেছি আমি। চৌধুরীমশাই যদি কিঞ্চিৎ কৃপাদৃষ্টি বর্ষণ করেন তো আমাদের মত মানুষ ধন্য হয়ে যায়।

নম্রমিষ্টি হাসি হাসলো চৌধুরাণী। আনত চোখে বললে,—আপনারা রাজা বাদশাহ, আপনাদের কাছে বাবামশাই তো নেহাৎ নগন্য।

কৌতূহলী হাসি চাপলেন কাশীশঙ্কর। বললেন,—তক্ত-সিংহাসন নাই, তথাপি রাজা বাদসাহ!

আনন্দকুমারী বললে,—মহাশয় যদি পরিচয় গোপন করেন আমি আর কি বলতে পারি? বিন্ধ্যবাসিনী শুনেছি রাজার মেয়ে। আপনি তো রাজকন্যার সহোদর?

কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে মুখে তর্জ্জনী চেপে কাশীশঙ্কর বললেন,—চুপ! কাকপক্ষীও যেন টের না পায়। মান্দারণের বাসিন্দা আমার পরিচয় জ্ঞাত হলে কার্য্য উদ্ধার হবে না। কথা বলতে বলতে খানিক থেমে আবার বললেন,—চৌধুরীর মেয়ে, তোমাকে একটা কাজে নিযুক্ত করতে চাই।

যুক্তকর বুকে ঠেকিয়ে চৌধুরাণী বললে,—হুকুম করুন জাঁহাপনা। সামর্থ্যে যদি কুলায় আমি পেছপাও হবো না।

—না না, পরিহাস নয় আনন্দকুমারী! কথা বলতে বলতে আবার পায়চারী করতে থাকেন কুমারবাহাদুর। বললেন,—তোমার দ্বারা কাজ উদ্ধার হয় তো রক্তপাত হয় না আর। তোমার উদ্দেশ্যটা এখন ব্যক্ত কর, তুমি কি স্বগৃহে যেতে চাও?

—না না জাঁহাপনা, গৃহে ঠাঁই হবে না আমার। চৌধুরাণীর মুখের হাসি মিলিয়ে যায় কথা বলতে বলতে। বলে,—আমার মা ঠাকরুণ আর কি আমার মুখ দেখবেন?

—তবে গন্তব্য কোথায় তাই বল! ঈষৎ বিস্ময়ের সঙ্গে কাশীশঙ্কর শুধোলেন।

—মান্দারণেই ফিরবো আমি। তবে গৃহে আর ফিরবো না।

—কে আশ্রয় দেবে? সাগ্রহে বললেন কুমারবাহাদুর।

আনন্দকুমারী স্তব্ধ হয়ে যায়; মুখে কথা ফোটে না। আকাশের চাঁদের দিকে সলাজ চোখ তুললো। চন্দ্রকান্তকে মনে পড়লো। একবার তাঁর কাছে শেষ-আশ্রয় চাইতে দোষ কি? চৌধুরাণীর সুপ্ত মনে সহসা প্রতিহিংসার জ্বালা ধরে যেন। ঘোর বিপদের মধ্যে ঠেলে ফেলে দিয়ে মৃত্যু আর সমাজের ভয়ে পালিয়েছেন চন্দ্রকান্ত। ক্রুদ্ধা সর্পিণীর মত ফণা তুলে একবার তাঁকে দংশাবে না আনন্দকুমারী! কেমন যেন নেশাচ্ছন্নের মত চৌধুরাণী বললে,—দেখা যাক, কে আশ্রয় দেয়! মরি কি বাঁচি।

কাশীশঙ্কর বললেন,—আমি যে এখন তোমার সাহায্যপ্রার্থী। কার্য্য উদ্ধার না হওয়া পর্য্যন্ত কে তোমাকে মুক্তি দিবে?

ইদিক-সিদিক দেখলো চৌধুরাণী। স্তিমিতকণ্ঠে বললে,—যদি বলি একটা আশ্রয় না হয় মহাশয় আপনিই দেন? আমার দ্বারা কোন উপকার হয় তো, আদেশ অবশ্যই পালন করবো।

পায়চারী থামিয়ে কেমন যেন নিকটে এগিয়ে আসেন কাশীশঙ্কর।

আনন্দকুমারীর কাছে এসে বললেন,—বিন্ধ্যবাসিনীকে চাই আমি। কৃষ্ণ-রামের অত্যাচার থেকে তাকে রক্ষা করতে চাই। বিন্ধ্যকে পাই তো তোমাকেও আশ্রয় দিতে পারি।

খিল খিল শব্দে হঠাৎ হেসে উঠলো আনন্দকুমারী। হাসতে হাসতে বললে,—আশ্বস্ত হলাম কুমারবাহাদুর! আশার আলো দেখতে পেলাম।

স্নেহের সুরে কাশীশঙ্কর বললেন,—বিন্ধ্য আর তুমি একত্রেই থাকতে পারো সুতানুটিতে, আপত্তি হবে না কারও। কিন্তু তুমি চৌধুরীর মেয়ে, তুমি কোন দুঃখে অন্যের ঘরে বাস করবে ?

চৌধুরাণী হেসে হেসে বলে,—মান্দারণে ঠাঁই না পাই তো সুতানুটিতে যাবো আমি। আপনাদের চরণে থাকবো। যাই হোক, মনে হয় আপনি এখন খুবই বিচলিত। স্থির হোন আপনি, উদ্দেশ্য আপনার সফল হবেই। আমি সাহায্য করবো সাধ্যমত।

আসনে বসলেন কুমারবাহাদুর। পাণের ডাবর থেকে কটা পাণ তুলে মুখে দিলেন। বললেন,—এতক্ষণে আমি স্বস্তি বোধ করছি। মান্দারণের সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় নাই। অজ্ঞাত স্থান থেকে একজন বন্দীকে মুক্ত করা সহজ কর্ম্ম নয়।

—তাই বলি, আপনি এত ব্যস্ত হন কেন ?

—আর ব্যস্ত হওয়ার কারণ নাই! তোমার সহায়তা পেয়েছি, আর কিছু চাই না আমি।

—আপনি আমাকে রক্ষা করেছেন মৃত্যুর হাত থেকে। এই পৃথিবীতে কে কাকে রক্ষা করে ?

এক-থলি টাকা পেয়েছে মাঝির দল। এই ঘোর নিশীথে নৈশ অভিযানে তাদের উৎসাহের অভাব হয় না। মাঝির দলকে গাঁজা খাইয়ে দিয়েছে জগমোহন লেঠেল। তামাকের কলকেয় গাঁজা ভরে ভরে খাইয়েছে।

বজরা জলে ভাসলো প্রচণ্ড ঠেলা খেয়ে। তীর থেকে গভীর জলে

ভাসতেই চৌধুরাণী বললে,—কুমারবাহাদুর, একটা যদি প্রশ্ন করি, উত্তর দিবেন কি ?

—আলবৎ দেবো। কথা বলতে বলতে একটি তাকিয়া টেনে নিয়ে ঠেস দিয়ে বসলেন কাশীশঙ্কর। বললেন,—আমার জীবনে গোপনীয় কিছুই নাই।

সম্মতি পেয়ে ইদিক সিদিক দেখতে থাকে চৌধুরাণী। ফিস-ফিস কথা বললে,—মহাশয় কি বিবাহ করেছেন ?

হঠাৎ অট্টহাসি হাসলেন কাশীশঙ্কর। হাসতে হাসতে বললেন,—আজ নয়, বহুকাল পূর্ব্বেই এই গর্হিত কাজটা সমাধা করেছি।

মনে মনে আহত হলেও মুখে শুষ্ক হাসি ফোটায় আনন্দকুমারী। বলে,—তিনি কোথায় আছেন এখন ?

—সুতানুটিতেই আছেন। আমার পিত্রালয়ে।

—তাঁর নাম কি ?

ইতস্তত বোধ করেন যেন কুমারবাহাদুর। খানিক থেমে বললেন,—তাঁর নাম মহাশ্বেতা। আমি নাম দিয়েছি রাতরাণী।

আঘাতটা বুকে লাগলো যেন। চৌধুরাণী অপলক চোকে তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে। অস্ফুটকণ্ঠে বললে,—তাঁর সিন্দুর অক্ষয় হোক। তিনি খুবই ভাগ্যবতী।

কেমন যেন আশাহতের মত একদৃষ্টে চেয়ে আছে আনন্দকুমারী। মনের সকল আনন্দ আর উৎসাহ যেন দপ করে নিবে যায়।

ভাসমান মেঘের আড়ালে কখন লুকিয়েছে পূর্ণাকার চাঁদ। জ্যোৎস্নার আলো যেন ক্ষীণপ্রভ হয়ে আছে। কাশীশঙ্কর একবার লক্ষ্য করলেন আলো-আঁধারিতে। দেখলেন চৌধুরাণীর উজ্জ্বল চোখ দু'টিও যেন নিষ্প্রভ হতে থাকে। তার মুখের হাসির আভাস অদৃশ্য হয়।

বজরা গজেন্দ্র গমনে নদীর দক্ষিণ থেকে উত্তরে চলেছে। জলে হালের আঘাতের ছপাছপ শব্দ ওঠে। একসঙ্গে অনেকগুলি হাল চলেছে।

চোখ নামালো চৌধুরাণী। কোমরে জড়ানো শাড়ীর বেষ্টন খুলে আঁচল টেনে পিঠে ফেললো। বললে,—বিন্ধ্যবাসিনী যদি ফিরতে না চায়?

ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয় কাশীশঙ্করের। বললেন,—তবে তো রাজমাতার জীবন রক্ষা হওয়া অসম্ভব।

—দেখা যাক কি হয়, কথার শেষে সহাস্যে উঠে পড়লো চৌধুরাণী। বললে—আমি ঘরে যাই, আপনি বিশ্রাম করুন কুমারবাহাদুর!

কাশীশঙ্কর দেখলেন, নবযৌবনা মেয়েটি ঠিক সাধারণ মেয়ের মত নয়। তার কথা আর হাবে-ভাবে ফুটে ওঠে এক ব্যক্তিত্ব—যা সচরাচর দেখা যায় না। তার রূপ-বৈচিত্র্য চক্ষুকে যেন প্রলুব্ধ করে! তার চালচলনে আভিজাত্য প্রকাশ পায়।

—আনন্দকুমারী! কুমারবাহাদুর ডাকলেন নাতিউচ্চকণ্ঠে। একটা কথা আছে।

মুখে হাসি মাখিয়ে সিঁড়িতে দেখা দেয় চৌধুরাণী। সম্রাজ্ঞীর ভঙ্গীতে বুক চিতিয়ে বলে,—কুমারবাহাদুর, ব্যক্ত করুণ কথা।

—নিকটে আইস। কথাটি গোপন, সরবে ব্যক্ত করা যায় না। কথার শেষে চোখ-ইশারায় ডাক দেন কাশীশঙ্কর। বললেন,—তুমি কি খুবই শ্রান্ত-ক্লান্ত?

বজরার ছাদে উঠে কুমারবাহাদুরের কাছাকাছি গিয়ে আবার বসলো আনন্দকুমারী। বললে,—আপনার অনুমান ঠিক। সত্যিই আমি ক্লান্ত। নিদ্রায় চোখ জড়িয়ে আসছে।

—রাত্রির আহারটা তবে সেরে নাও। কাশীশঙ্কর কথা বলতে বলতে আবার আসনপিঁড়িতে বসলেন তাকিয়া সরিয়ে দিয়ে। বললেন,—আহারান্তে নিদ্রাই সুখকর।

একটু হাসলো চৌধুরাণী। বললে,—আপনি অভুক্ত থাকবেন আর আমি রাক্ষসীর মত গোগ্রাসে গিলতে বসবো? তা হয় না কুমারবাহাদুর!

নৈকট্যের আবেগে বিমুগ্ধ হয়েছেন কাশীশঙ্কর। বললেন,—তবে তুমি আর

আমি একত্রে আহারে বসতে পারি। কিন্তু আরও খানিক সময় উত্তীর্ণ হোক। ক্ষুধার তত তীব্রতা বোধ করছি না ঠিক এখনই।

—কথাটি ব্যক্ত করুন। গোপন কথাটি কি, তাই শুনি।

কথা বলতে বলতে চৌধুরাণী একটি তাকিয়া টেনে নেয়। দেহটা ঈষৎ এলিয়ে দেয়।

কাশীশঙ্কর বললেন,—আমাদের শাস্ত্রে গান্ধর্ব্ব বিবাহটা কি, তুমি কি জ্ঞাত আছো?

এ পাশে ও পাশে মাথা দুলিয়ে আনন্দকুমারী বললে,—আমি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ নই কুমারবাহাদুর, মার্জ্জনা করবেন।

নিরাশ হলেন কাশীশঙ্কর। মৃদু গম্ভীর সুরে বললেন,—গান্ধর্ব্ব বিবাহে জাতবৈষম্য রক্ষা হয় না।

খিল-খিল শব্দে আবার হাসি ধরলো চৌধুরাণী। হাসতে হাসতে বললে,—আপনার এ চিন্তা কেন তাই প্রশ্ন করি।

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থাকেন কাশীশঙ্কর। তার পর বলেন,—তোমার জন্য আনন্দকুমারী।

হাসি থামে না। চৌধুরাণীর হাসির শব্দ নদীর বুকে ছড়িয়ে পড়ে। কেমন যেন ব্যঙ্গমিশ্রিত হাসি হাসতে হাসতে বললে,—বিবাহে আর রুচি নেই কুমারবাহাদুর! পুরুষজাতির প্রতি আমার ঘৃণার শেষ নাই।

ঠিক এই ধরণের স্পষ্টোক্তি শোনার অভ্যাস নেই কুমারবাহাদুরের। তিনি যেন কেমন অস্বস্তি বোধ করলেন। কথার প্রত্যুত্তর দিতে পারলেন না।

আনন্দকুমারী আবার বললে,—আমার কথায় আপনি কি আহত হয়েছেন?

হাঁ না কিছুই বললেন না কাশীশঙ্কর। আকাশের দিকে চোখ মেলে বসে থাকলেন নিশ্চুপ।

চৌধুরাণী আবার সহাস্তে বললে,—কুমারবাহাদুর, প্রসঙ্গটা এখন চাপা থাক। চলুন আগে আহার শেষ করি। আমাদের খাওয়ার পাত্র সাজিয়েছে নীচের ঘরে।

কাশীশঙ্করের মুখের আকৃতির কোন বিকার দেখা যায় না। কেবল একটা গাম্ভীর্য্য প্রচ্ছন্ন হয়ে ফুটে আছে। তিনি শুধু বললেন,—তাই চল, আনন্দকুমারী।

কিন্তু ফরাস ত্যাগ করে উঠলেন না কুমারবাহাদুর। তিনি সংযমের পক্ষপাতী। পদস্খলন কাকে বলে তিনি জানেন না। কিন্তু আজ এই জ্যোৎস্নার রাতে কেমন যেন স্থির থাকতে পারলেন না কিছুতেই। মোহময়ী আনন্দকুমারীকে মুখ ফসকে বলে ফেললেন কথাগুলি। কাজটা কি গর্হিত হয়েছে, ভাবতে থাকলেন মনে মনে।

—কৈ, আসুন। কথা বলতে বলতে চৌধুরাণী একখানি হাত আগিয়ে ধরলো।

কাশীশঙ্কর সেই নরম হাত ধরলেন নিজের হাতে। ধরেই উঠলেন তিনি। আনন্দকুমারীর মুখপানে তাকিয়ে ঈষৎ হাসলেন যেন। খুশীর হাসি। রাত্রি তখন বেশ গভীরতর হয়েছে।

অথৈ জল থেকে দ্বীপে উঠেছে আনন্দকুমারী, তবুও তার ভয়ের কাঁপুনি ধরে থেকে থেকে। ম্যালেটকে যতবার মনে পড়ে আতঙ্কে শিউরে উঠতে হয়। ম্যালেট শিল্পী, বিদ্বান আর বৈজ্ঞানিক হলে কি হবে, তার অপহরণের স্পৃহা যেন ভয়াবহ। তার পৈশাচিক লালসা—ভাবতে ভাবতে আনন্দকুমারী কেমন যেন স্থির হয়ে যায়। সিঁড়ির মধ্যপথে দাঁড়িয়ে পড়ে বিকল যন্ত্রের মত।

কাশীশঙ্কর বললেন,—শরীরগতিক কি ভাল নয় তোমার?

চৌধুরাণীর চোখের দৃষ্টিও থমকে থাকে। কুমারবাহাদুর দেখলেন মশালের আলোয়, আনন্দকুমারীর অনিন্দ্য মুখকান্তি যেন বিবর্ণ। কি এক অত্যাচারের ক্লেশে যেন জর্জ্জরিত হয়েছে। কায়-ক্লেশের চিহ্ন স্পষ্ট হয়েছে মুখে।

আঁচলে মুখ মুছলো চৌধুরাণী। কাশীশঙ্করের চোখের বিস্ফারিত চাউনি বেশীক্ষণ যেন দেখা যায় না। চোখ নামিয়ে নেয় আনন্দকুমারী।

চৌধুরাণীর একখানি হাত ধরলেন সস্নেহে। বললেন,—আহারে বসতে চল। অন্ন আর মাংস শীতল হলে বিস্বাদ লাগবে। আমিও ক্ষুধার্ত্ত।

কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লো চৌধুরাণী। বললে,—চলুন আপনি; আমিও যাচ্ছি।

নীচের ঘরে এসে আবার বিস্মিত হয় সে। দু'খানি আসন পড়েছে পাশাপাশি। আহার্য্য সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। একজন খানসমা রামপাখা ধরে দাঁড়িয়ে আছে এক পাশে। রঙীন লণ্ঠন জ্বলছে বজরার মধ্যে। ছাঁকা কাঁসার বাসনের সোনা-আভা ঠিকরোচ্ছে।

চৌধুরাণীর চোখের বিস্ময় দেখে হো-হো শব্দে হেসে উঠলেন কুমার-বাহাদুর। হাসতে হাসতে বললেন—আমার খাওয়ার ব্যবস্থা দেখে আশ্চর্য্য হয়েছো তুমি! কথার শেষে আবার উচ্চতর কণ্ঠে। অবাক হও কেন?

সত্যিই এক গামলা মাংস দেওয়া হয়েছে কাশীশঙ্কর আসনের সমুখে। থালায় যেন পর্বতপ্রমাণ ভাত, গোবিন্দভোগ চালের।

কুমারবাহাদুর আসনে বসলেন। গণ্ডুষের জল ঢাললেন হাতে। আনন্দ-কুমারীও সলজ্জায় বসলো পাশের আসনে। পাশের ঘরে চোখ পড়লো সহসা। চৌধুরাণী দেখলো কক্ষের দুই পাশে পৃথক দু'টি শয্যা রচিত হয়েছে। তৎক্ষণাৎ চোখ ফিরিয়ে নেয় চৌধুরাণী। কাশীশঙ্কর দেখতে পান না কিছুই—তিনি তখন মুদিত চোখে গণ্ডুষের মন্ত্র বলছেন।

গঙ্গার বুক থেকে এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস এসে আনন্দর কপালে যেন শত শত চুমা খেতে থাকে।

কিন্তু আজকের রাত জাগিয়ে রেখেছে রাজগৃহের প্রতিটি মহলকে।

ফিসফিস গুঞ্জন, গোপন পদধ্বনি, চোরাহাসির চাপা শব্দ ভাসাভাসি করছে। ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে এখনও। চাঁদোয়া থেকে ঝুলানো বেলোয়ারী লণ্ঠনের রঙীন আলোর আভা দেখা যায় অনেক দূর থেকে। ঘুম নেই কারও চোখে, জাগরণের পালা চলে তাই। কি একটি দুর্ঘটনার কথা বাতাসের ভারে ছড়িয়ে পড়েছে এক মহল থেকে অন্য মহলে।

রাজমাতা বিলাসবাসিনী প্রথমটায় স্তম্ভিত হয়েছিলেন। তারপর ধীরে ধীরে

অনেক ভাবাভাবির পর তিনি আশ্বস্থ হন। মুখে হাসি বললেন,—ইচ্ছাবরী হতে সাধ হয়েছে পোড়ামুখীর! দেখা যাক রাজা শুনে কি বিচার করে।

রাণীদের মুখেও আজ লুকানো হাসির ঝিলিক খেলে যেন। মুখে আঁচল চাপতে হয়, হাসি লুকাতে হয়। সকলের মধ্যে সবচেয়ে উৎসাহী হয়েছেন বড়রাণী উমারাণী। চোর ধরা পড়েছে, কিন্তু উমারাণী চোরের অপরাধ অস্বীকার করতে চান।

অন্দরের দাসী আর পরিচারিকার দল চোর ধরেছে। অন্দরের পিছনে পুকুরধারে সচল ছায়ামূর্তি দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরবে চিৎকার করতে লেগে গিয়েছিল তারা। যুগল ছায়ামূর্তি পুকুরতীরে, গন্ধরাজ ফুলের গাছের আড়ালে।

পূর্ণিমার আর দেরী নেই। তাই চাঁদের আলোয় দিগ্বিদিক উদ্ভাসিত। তাই আজকের শুক্লারজনীতে লোকচক্ষু এড়াতে পারলো না চোরের দল। ধরা পড়লো দাসীদের চোখে। ভূত-প্রেতের আশঙ্কায় হৈ-হল্লা তুললো তারা। সত্যিকার মানুষ না ছায়ামূর্তি সঠিক ঠাওরাতে পারলো না যেন, প্রথম দেখায়।

শশিনাথ লজ্জায় মুখ নত করে। শুধু শিবানী যেন বেপরোয়া। ভয়ডরের বালাই নেই যেন। ধরা পড়ছে, তবুও বুক চিতিয়ে আছে নির্ভয়ে। মিটিমিটি আসছে।

দাসীদের একজন বললে,—রাজবাড়ীতে কুলদেবী আছেন, ইষ্টমূর্তি আছেন। এখানে এই অনাচার কি সহ্য হবে কারও! এই বেলেল্লাপণা!

সাজের ঘটা দেখে কে শিবানীর! লাল রঙের শাড়ীতে বেশ দেখায় তাকে, বিয়ের কনের মত। খোঁপায় কটা চাঁপাফুল দিয়েছে। আঁটসাঁট শাড়ীতে গাছ-কোমর বেঁধেছে। কপালে সিঁদুর-টিপ আর পায়ে আলতা রাঙিয়েছে। শশিনাথ তাকে বলেছিল লাল শাড়ী পরতে।

যদিও বিধি বাম হয়। লোক জানাজানিতে লজ্জার সীমা থাকে না। শশিনাথ কাঁপতে থাকে ভয়ে ভয়ে।

কেবল উমারাণী ওদের পক্ষ নেন। দাসীর প্রতি রুষ্ট হন, কোপ প্রকাশ করেন। তাদের ধমকানি দেন।

সদরের রঙমহল থেকে কালীশঙ্কর যখন পাল্কীতে ফিরলেন তখন রাত্রি বেশ ঘন হয়েছে। গুলাব আতরের সুগন্ধি ভাসিয়ে রাজা আসেন। বৈশাখের তপ্ততা স্নিগ্ধতায় ভরিয়ে দিলেন যেন। রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণের গাছে গাছে শাখা আর পাতা স্থির অকম্প হয়ে আছে। বাতাস আর চলছে না হঠাৎ। রাজার পাল্কী অন্দরে পৌছতেই রাজমাতার পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয় তাঁকে।

—বিলাসবাসিনী দেবী একবার সাক্ষাৎ চান রাজাবাহাদুর!

কথা শুনে কেমন যেন জড়কণ্ঠে বললেন,—কেন? এ-হেন সময়ে?

—বিশেষ প্রয়োজন আছে। তবে তিনি স্বয়ং আপনার মহলে আসতে পারেন, যদি হুকুম করেন তবেই।

—এবমস্তু। তাই হোক। আমি এখন পদচারণায় অক্ষম। মাতৃদেবী যেন ক্ষমা করেন।

কথার শেষে আবার চোখ বন্ধ করলেন রাজা। পাল্কীমধ্যে জরিদার তাকিয়ায় এলিয়ে পড়লেন। সোনার পাতে মোড়া একটি থেলো হুঁকা ধরিয়ে দেয় খানসমা, রাজার হাতে। অম্বুরী তামাকের গন্ধে মিশে যায় গুলাবী আতরের সৌগন্ধ।

একজন অবলা নাকি আজ রাতের মত রঙমহলে এসেছিল। প্রতিবেশিনী একজন, গৃহস্থকন্যা। রাজার পেয়ারের খোসামুদেরা কোথা থেকে তাকে যে আনে, কেউ বলতে পাবে না। যৌবনগর্ব্বিতা দর হেঁকেছিল রাজার কাছে। বলেছিল,—হাতে হাতে টাকা না পাওয়া যায় তো কিসের আশে এসেছি?

রাজা এক মুঠো মোহর সশব্দে ছুঁড়ে দিলেন। তারপর বললেন,—দেওয়ানজী এই শুয়ারের বাচ্চীকে ফটকের বাইরে পৌছে দিয়ে আসেন। খানিক থেমে বললেন,—পারেন তো এর দুই গালে দগ্ধলোহার দুটা ছাপ দিয়ে দেন। দাগী থাক, লোকে চিনবে তবে।

—মার্জ্জনা করবেন রাজাজী! ধৃষ্টতা ধরবেন না। অভাবের তাড়নায় স্বভাবটা নষ্ট হয়েছে। কাতর সুরের কথা ভাসে রঙমহলে।

—একটা জোয়ান পাইকের হাতে ওকে সঁপে দেন দেওয়ানজী! সিংহের গর্জ্জন যেন রাজার ক্রুদ্ধকণ্ঠে! হেলান দেহ তুলে বীরাসনে বসলেন তিনি। বললেন,—যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! আমার মুসলমান সিপাইরা কেউ বাহিরে আছে?

—ক'জন আছে কাছেই। রঙমহলের দুয়োর আগলে আছে। দেওয়ানজী ভয়ের সুরে বলেন। কেমন যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত হকচকিয়ে ওঠেন।

দু'হাতে সজোর তালি ঠুকলেন কালীশঙ্কর। ঈষৎ ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললেন,—তবে তো ঠিক আছে।

মোসায়েবরা নড়ে-চড়ে বসলো। খেয়ালী রাজার কি ইচ্ছা হয় কে জানে! হয়তো এখনই যা হয় একটা শাস্তি দিয়ে দেবেন। কিংবা গারদে পুরে রাখতে হুকুম দেবেন।

কালীশঙ্কর হেসে হেসে বিদ্রূপের সুরে বললেন,—ওকে দিয়ে দেওয়া হোক দু'টা সিপাইএর কাছে। ভোরের আলো ফুটলে ছেড়ে দেবে।

মোসায়েবরা বললে সমস্বরে,—মরে যাবে হুজুর!

—তাই যাক! আবার ক্রূর হাসি হাসলেন। রাজা বাহাদুর বললেন, ওকে অর্থ দিয়েছি, তবে আর বিনিময়টা বাদ যায় কেন?

একজন মোসায়েব বললে,—মূর্খ নারী রাজাবাহাদুর, অপরাধ ধার্য্য করবেন না।

—মূর্খের জ্ঞান হোক। কালীশঙ্কর সহাস্যে বললেন,—দেওয়ানজী, ওকে ত্যাগ করেন, সিপাইদের দু'টাকে ডাকেন। অধিকক্ষণ আমি আর নাই রঙমহলে। অন্দরে যেতে চাই।

—তথাস্তু। কথার শেষে দেওয়ানজী বৃহৎ কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন তাড়াতাড়ি।

গর্ব্বিণী নারী ক্রোধে যেন ফুলছে থেকে থেকে। ক্রুদ্ধা ফণিনীর মত

পলকহীন চোখে তাকিয়ে আছে। কোমরে হাত। হিংস্র দেহভঙ্গিমা। হঠাৎ কথা বললে সে। ভুরু বাঁকিয়ে বললে,—চাই না আমার টাকা। আমাকে যেতে দিন।

হো-হো শব্দে হেসে উঠলেন রাজা। তাঁর উর্দ্ধ বপু হাসির তোড়ে নেচে নেচে উঠলো। শ্বেতপাথরের থালিতে সাজানো নীলাভ মিনাকাজের রূপার পানপাত্র। হাসতে হাসতে পিয়ালায় মদিরা ঢালতে থাকেন। টইটম্বুর পাত্র মুখে তুলে আর একবার রোষদৃষ্টিতে দেখলেন ঐ সাহসিনীকে।

একজন তুর্কী সিপাই এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়ালো। তার কটি থেকে ঝুলছে বাঁকা তরোয়াল।

পাত্র নামিয়ে রেশমী রুমালে মুখ মুছতে মুছতে কালীশঙ্কর বলেন,—দেওয়ানজী, টাকা ফেরৎ লবো না। যা দিই তা আর ফেরৎ লই না আমি। মর্দ্দানী মেয়েটা. কোন কথার ঠিক নাই। বিপরীত কথা কয়।

পানপাত্র শেষ করলেন কালীশঙ্কর। আবার মুখ মুছলেন রেশমী রুমালে। বললেন,—দেওয়ানজী, সিপাইকে বাৎলে দিন। ওদের বিদায় করেন। আমিও উঠি।

বাতাস নেই আজ। গুমোট গরমে রাজা ঘর্ম্মাক্ত হয়ে উঠেছেন। দু'পাশ থেকে বিচিত্রবর্ণের রামপাখা চলেছে তবু।

থতমত খেয়ে যায় মোসায়েবের দল। একে অন্যের মুখপানে তাকায়। রেশমী রুমালে গুলাবী আতর মাখানো। রঙমহলের জানালায় ভিজে খসখসের পর্দ্দা। কালীশঙ্কর আর কোন দিকে দৃকপাত করিলেন না। মহল থেকে বেরিয়ে পাল্কীতে উঠলেন অসংলগ্ন পদক্ষেপে।

মহেশনাথের কানেও কথা উঠলো। সেজের আলো জ্বালিয়ে পরম ভক্তিভরে রামায়ণ পাঠ করছিলেন তিনি আপন কক্ষে। কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুঁথি সুরে ও ছন্দে পড়ছিলেন। সেজের উজ্জ্বল আলোয় তবুও এক রাশ কালো, কিছুতেই যেন চোখে দেখা যায় না। নিরেট কাগজের মূর্তি

যেন মহেশনাথের—শুধু তাঁর চক্ষু আর বস্ত্রের শুভ্রবর্ণ চোখে পড়ে। কপালের মাঝে সিঁদুরের লাল টিপ্পা। শিখায় একটি জবাফুল।

শিবানী আর শশিনাথ অন্দরের পুকুর-তীরে রাতের অন্ধকারে মনের কথা বলাবলি করতে এক হয়েছিল—দেখতে পেয়েছে দাসী আর পরিচারিকার দল।

মন্থরার মত একজন দাসী অদৃশ্য থেকে কথা বলে। ফিসফিসিয়ে বলে,—শিবানী কুল মজাতে চায়। লোকের কাছে সে মুখ দেখাবে কি ভরসায়?

মহেশনাথের মুখাকৃতি আরও যেন বীভৎস হয়ে যায়। মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটেছে। ক্রোধের আতিশয্যে বিকলাঙ্গ দেহ কাঁপছে থরথরিয়ে। খানিক নিস্তব্ধ থেকে মহেশনাথ বললেন,—তবে শশী যদি শিবানীর পাণিগ্রহণ করে, আমার কিছু বলার নাই। শিবানী তবু পাত্রস্থ হয়।

দাসী আড়ালে থেকে বললে,—শশিনাথ যদি তাতে একমত না হয়?

বিকট সুরে হাসলেন মহেশনাথ। তাঁর ছায়া চঞ্চল হয় হাসির বেগে। ক্রুর হাসি হেসে বললেন—শশিনাথের মৃত্যুভয় নাই! আমি তাকে রেহাই দেবো না। স্বহস্তে খুন করবো। শিবানীর সম্মুখেই।

দাসীর কথা নয়, অন্য এক নারীকণ্ঠ বাহির থেকে কথা বলে। মিহি-মিষ্ট কণ্ঠে। বলে,—শিবানীর দোষ নাই। আমরা শশিনাথের সঙ্গে শিবানীর বিবাহ দেবো।

রামায়ণ থেকে চোখ তুললেন মহেশনাথ। নরম সুরে বললেন,—কে কথা বলে? বড়রাণী কি?

—হাঁ মহেশঠাকুরপো! আমিই সেই অভাগী।

—প্রণাম লও বড়রাণী! যা মন চায় তেমন ব্যবস্থা তুমি কর, আমি সম্মত আছি এ বিবাহে। শিবানীর পাত্র মেলা দুষ্কর।

—এই বিবাহে তুমি সম্মত আছো কি? উমারাণী মৃদুকণ্ঠে শুধালেন।

মহেশনাথ বললেন,—হাঁ সম্মত আছি, তবে অনাচারের প্রশ্রয় দিতে চাহি না। বিবাহ হয় হোক।

—তাই হবে।

মহেশনাথের মৌখিক সম্মতি শুনে উমারাণী যেন ছুটতে থাকলেন।

কেন কে জানে মহেশনাথ অট্টহাসি ধরলেন হঠাৎ। হাসতে হাসতে স্বগত করলেন—নারী আর পুরুষের মিলন অনস্বীকার্য্য বড়রাণী! কেবল সাবধান হও, আমাদের মুখে যেন চুণ-কালি না পড়ে। কলঙ্ক রটনা যেন না হয়। রাজমাতা আর রাজাবাহাদুর যেমন বলবেন তেমন হবে।

উমারাণী ছুটে পালিয়েছেন। গেছেন বিলাসবাসিনীর মহলে।

রাজমাতা বললেন,—শশিনাথকে গ্রহণ করতে হবে শিবানীকে। নয়তো তার বিপদ হবে। রাজাকে বলবো উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে।

—আমারও এই এক কথা। বড়রাণী বললেন ইতি-উতি দেখে। বললেন,—এ সুযোগ হেলায় হারালে আর ফিরে আসবে না রাজমাতা! শিবানীর বিয়ে দেওয়া অসম্ভব হবে।

—আমিও তাই বলি। বিলাসবাসিনী বললেন দৃঢ়তার সঙ্গে। বললেন,—দেখি কালীশঙ্কর কি বলে।

সর্ব্বমঙ্গলা আর সর্ব্বজয়া দুয়োরে দেখা দেন। সর্ব্বমঙ্গলা বললেন,—রাজা তাঁর মহলে আপনার উপস্থিতি প্রার্থনা করেন।

চুপি চুপি রাজমাতা বললেন,—নেশার ঘোর নাই তো মেজ আর ছোট-রাণী? সাদা চোখে কথা বলবে তো?

সর্ব্বজয়া বললেন,—মনে তো হয়। রাজা বেশ সহজ ভাবেই আছেন।

—তবে আর ভাবনা কেন? চল, তোমাদের সঙ্গেই যাই। আমাকে তোমরা ধরে নে চল। কথা বলতে বলতে পালঙ ছেড়ে উঠলেন রাজমাতা।

খাস-কামরায় সোনার কেদারায় রাজা বসে আছেন।

উমারাণী তাঁর মাথায় গোলাপজল ছিটিয়ে দিলেন গোলাবপাশ থেকে। বললেন,—রাজমাতা আসছেন এখনই।

—কেন

—শিবানী আর শশিনাথের কথা জানাতে আসছেন। তারা দু'জনে অন্দরের পুকুরতীরে একত্রে ধরা পড়েছে। দাসীরা দেখতে পেয়ে চোর-ডাকাত বলে ভুল করেছে। রাজবাড়ীতে জানতে আর বাকী নাই কারও।

উমারাণীর ক্ষীণকটি বাহুবেষ্টনে ধরলেন রাজাবাহাদুর। বললেন,—তোমার অভিপ্রায়টা কি তাই শুনি?

খানিক স্তব্ধ থাকেন বড়রাণী। ভেবে ভেবে বললেন,—দু'জনের বিয়েতে আমার সায় আছে। আপনি সেই মত ব্যবস্থা করেন। তা যদি না হয় দু'টোকে বিদায় করেন রাজগৃহ হতে। যা ইচ্ছা হয় করুক ওরা। শিবানীকে পাত্রস্থ করলে লোকলজ্জা থেকে বাঁচা যায়।

—তবে তোমার কথাই থাক। শশী তাকে লয়ে যাক।

কালীশঙ্করের সম্মতি পেয়ে খুশীর হাসি হাসলেন বড়রাণী। বললেন,—ঐ রাজমাতা আসছেন ডুলীতে। আপনার বক্তব্য তাঁকে জানায়ে দেন তবে।

—কাশীশঙ্কর যদি কিছু মনে করেন? রাজাবাহাদুর আলবোলার নল মুখে তুলে বললেন জড়িতকণ্ঠে।

উমারাণী বললেন,—তাঁকে রাজী করানোর ভার আমার পরে দিন। আপনি অবিচলিত থাকেন, এই অনুরোধ।

কথার শেষে উমারাণী রাজার কক্ষ থেকে বেরিয়ে আবার ছুটলেন যেন। নেশার মুখে বেশ সুস্বাদ লাগে যেন লবণ-ঠিকরি। আরও কথানা মুখে তুললেন কালীশঙ্কর।

গঙ্গার বুকে চাঁদের ছায়া—জলপ্রবাহে ঝিলিমিলি খেলে। তরল সোনা যেন গঙ্গার এই জল। কাশীশঙ্করের সুবৃহৎ বজরা মন্থরগতিতে এগিয়ে চলেছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে। তীরভূমিতে অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে এখানে সেখানে। হোম-কুণ্ড জ্বলছে তান্ত্রিকদের। যেন চিতা জ্বলছে শ্মশানে!

আহার শেষে আবার বজরার ছাদে উঠলেন কাশীশঙ্কর মুখশুদ্ধি চিবাতে চিবাতে। চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় আহার করেছেন কুমারবাহাদুর। মেজাজ খুশী হয়ে গেছে তৃপ্তিকর সুখাদ্যে। জ্যোৎস্নাধবল ফরাসে বসলেন তাকিয়া টেনে নিয়ে। বললেন,—খানসামা, আনন্দকুমারীকে বল সে-ও ছাদে আসুক।

হঠাৎ যেন একখানি অনিন্দ্যসুন্দর মুখকান্তি ভাসলো কুমারের মানসপটে। রাতরাণীকে মনে পড়লো তাঁর। মহাশ্বেতাকে। সহধর্ম্মিণীর কথা ভাসলো যেন কর্ণকুহরে।

চৌধুরাণী এসে বসলো ফরাসের এক পাশে। বললে,—কুমারবাহাদুর, আপনার বিশ্রামে ব্যাঘাত না হয়।

আনমনা কাশীশঙ্কর বললেন—দেখো, চৌধুরীর মেয়ে, তুমি তো আমার সহোদরার বান্ধবী।

—হাঁ তাইতো, পান চিবানো স্থগিত রেখে আনন্দকুমারী ক্ষীণ হাসির সঙ্গে বললে।

—তবে তুমি তো আমারও ভগিনীতুল্যা।

—হাঁ তাইতো। আবার বললে আনন্দকুমারী। রাতের অনাবিল হাওয়ায় তার আলুলায়িত রুক্ষ কেশ উড়ছে। আঁচলও উড়ছে।

—তুমি কি নিদ্রায় কাতর হয়েছো?

—না না, আদপেই নয়। মান্দারণে যতক্ষণ না পৌছাই ততক্ষণ আমার নিদ্রা নাই চোখে।

—আমারও তদ্রূপ। তাই বলি, গল্পগুজবে রাত্রিটা অতিবাহিত করা যাক।

—বেশ কথা। আপনার যেমন অভিরুচি।

হেসে হেসে কথা বলে আনন্দকুমারী। আকাশে চোখ তোলে একবার। তার দীর্ঘ দুই চোখে আকাশের আর পূর্ণচাঁদের প্রতিচ্ছায়া খেলে।

—চুপি চুপি একটা কথা বলি তোমাকে। চৌধুরাণী, আমাকে ক্ষমা করবে?

—কেন কুমারবাহাদুর? এমন কথা বলেন কেন?

—আমি হয়তো অসংযত হয়েছিলাম তোমার প্রতি।

খিল-খিল শব্দে হেসে উঠলো আনন্দকুমারী। হাসতে হাসতে বললে,—কৈ? কখন? আমার তো মনে পড়ে না।

স্বস্তির শ্বাস ফেললেন কুমারবাহাদুর। আকাশের চাঁদসম রাতরাণীর মুখখানি যেন চোখে ভাসছে যখন তখন। চক্ষু মুদিত করলেই সেই মানসীকে দেখতে পাওয়া যায় যেন। তাঁর মধুমিষ্ট কথা কানে ভাসে যেন। মহাশ্বেতা যেন কানে কানে কথা বলছেন কুমারের।

কুমারবাহাদুর বললেন,—মান্দারণের গল্প বল তুমি। আমি শুনি।

মৃদু-মন্দ হাসলো চৌধুরাণী। বললে,—আপনি আগে সুতানুটির গল্প শোনান। তারপর আমি বলবো।

—বেশ কথা। কাশীশঙ্কর বললেন ইদিক-সিদিক দেখতে দেখতে। বললেন,—সুতানুটিতে আমাদের তিন পুরুষের বসবাস।

রাত্রির হাওয়ার গতি অবাধ। শোঁ-শোঁ শব্দে বাতাস চলেছে। তীরের গাছ-গাছড়ার চাঞ্চল্যের একটা অদ্ভুত শব্দ ভেসে আসছে মধ্যগঙ্গায়। যেন শত শত লোক, একসঙ্গে কথা বলছে!

মাঝিরা সোৎসাহে হাল টেনে চলেছে। তবুও বজরার গতি ধীর। চৌধুরাণী একবার লক্ষ্য করলো; আকাশের চাঁদ যেন তাদের সহযাত্রী। বজরার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদ এগিয়ে চলেছে আকাশপথে। একজোড়া রাত্রিচর পাখী কর্কশ সুরে ডাকতে ডাকতে বজরার ছাদের ওপর দিয়ে উড়ে গায় তীব্র গতিতে।

কাশীশঙ্কর থামলেন না। সুতানুটির কাহিনী কি এক কথায় শেষ হয়? কুমারবাহাদুরের কথা একাগ্রচিত্তে শুনতে থাকে চৌধুরাণী। যদিও রাতের স্নিগ্ধশীতল বাতাসে তার ঘুম-ঘুম পায়। চক্ষু জড়িয়ে আসে। মনে মনে নিদ্রালস্য ত্যাগ করে আনন্দকুমারী। সাগ্রহে শোনে কুমারবাহাদুরের কথা। চোখে তন্দ্রার ঘোর, উপেক্ষা করে সে।

রাম-মশালের জোরালো আলোয় বজরার ছাদ উদ্ভাসিত হয়ে আছে। চলন্ত বজরা দ্রুতগতিতে উত্তরপথে এগিয়ে চলেছে। বৃহৎ গোলাকার চন্দ্রমণ্ডল সৌরাকাশে। অগণিত নক্ষত্র, কোনটি স্থির, কোনটি দপ দপ জলছে ধুকধুকির মত থরথর কাঁপনে। গঙ্গার অন্য তীরে অনেক দূরের আকাশ থেকে হঠাৎ একটি তারা খসে পড়লো প্রায় বিদ্যুৎ-গতিতে। মাধ্যাকর্ষণে তীব্রগতি উল্কাপাত দেখে মনে মনে গন্ধপুষ্পের নাম বলে আনন্দ-কুমারী। কেমন যেন শঙ্কাকুল চাউনি ফুটেছে চৌধুরাণীর চোখে। মনে মনে বলতে থাকে,—জাতী, চম্পক, সেঁউতি, মাধবী, কেতকী, পারুল, বকুল—

কাশীশঙ্করে দৃষ্টি গঙ্গার এক তীরে প্রসারিত। তিনি যেন সবিশেষ চিন্তামগ্ন। চক্ষু উন্মুক্ত, কিন্তু যেন দৃষ্টিশক্তিহীন। তীরে ঘন বনাঞ্চল, দিনমানেও আঁধার দেখায়। মনে মনে যেন অন্ধকারের প্রাচীর, সদম্ভে দাঁড়িয়ে আছে শত্রুর পথ আগলে। কুমারবাহাদুর হয়তো ভবিষ্যতের ভাবনায় ডুবে আছেন। রাজকুমারী বিন্ধ্যবাসিনী কি তবে চিরজন্মের মত স্বামিগৃহ ত্যাগ করবে! অসহায়ের মত একা-একা দিন কাটাবে! শয্যায় একাকিনী হবে!

—কুমারবাহাদুর, গড়মান্দারণে এখন রক্তারক্তি চলছে, তা কি জানেন?

বস্ত্রাঞ্চলে আঙুল জড়াতে জড়াতে হঠাৎ যেন কথা বললে আনন্দকুমারী। একবার লজ্জাভরা চোখ তুলে তাকালো ভীতদৃষ্টিতে। বললে,—মান্দারণে খুনোখুনি চলেছে।

ধীরে ধীরে আসনপিঁড়িতে বসলেন কাশীশঙ্কর। সোনালী জরিদার তাকিয়া তুলে নিলেন কোলে। কপালে কয়েকটি ক্ষণপ্রকাশ রেখা ফুটলো তাঁর। কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন,—হাঁ চৌধুরাণী, আমার তা অজানা নয়। আমি জানি। খানিক থেমে আবার বললেন,—সমগ্র বঙ্গদেশেই এই রক্তপাত চলেছে। ব্রাহ্মণবর্গ বৌদ্ধতন্ত্রকে নির্মূল করতে বদ্ধপরিকর। বুদ্ধের নাম লুপ্ত করতে চায় তারা দেশ হ'তে।

ঈষৎ হাসল আনন্দকুমারী। ম্লান হাসির সঙ্গে নিম্নকণ্ঠে বললে,—কেবল ব্রাহ্মণ নয়, হিন্দুমাত্রেই বুদ্ধের নামে ক্ষিপ্ত হয়। শ্রমণ দেখলেই তারা অস্ত্র ধরে।

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললো আনন্দকুমারী। বললে,—তবে আমার কোন ভয়ের কারণ নাই।

কৌতূহলের সঙ্গে কুমারবাহাদুর বললেন,—কেন? তুমি কি হিন্দুও নও, বৌদ্ধও নও?

অপ্রতিভ স্বরে চৌধুরাণী বলে,—না না, পরিহাস করবেন না। বুকভরা শ্বাস নেয় সে। কয়েক মুহূর্ত থেমে থাকে। তারপর বলে,—আমার পিতাকে দুই দলই মানে। তিনি নাকি পক্ষপাতশূন্য। দুই মতেরই পূজা করেন।

বজরার গতি উত্তরোত্তর যেন বেগময় হয়। হাল টানার জলজ ধ্বনি আরও যেন ঘন ঘন শোনা যায়। দড়ির বাঁধন আর হালকাঠের ঘষাঘষিতে ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ ভাসে গঙ্গার বুকে।

কাশীশঙ্কর দু'দিকের তীর দেখতে থাকেন চোখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে। কালো আকাশে বিরল তারার মত তামস-তীরের এখানে-সেখানে ছাড়া ছাড়া অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে। তপস্যার হোমানল জ্বলছে। তাই হয়তো মাঝে মাঝে বাতাসে ঘৃতাহুতির গন্ধ ভাসছে। দগ্ধ চন্দনকাঠের তীব্র সৌরভ আসছে। মঙ্গলফলের আশায় পূজাযজ্ঞ চলেছে। সাধক আর সাধিকারা সিদ্ধিলাভ করছে।

—চৌধুরীমশায় বিচক্ষণ মানুষ, তাই তাঁর পরমসহিষ্ণুতা আছে। কাশীশঙ্কর বললেন তীর থেকে চোখ ফিরিয়ে। বললেন,—যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ পারম্পর্য্যং বিধিয়তে।—তবে আমিও ভীত নই। কাশীশঙ্কর দৃঢ়কণ্ঠে বললেন। বললেন,—আমার কাছে আগ্নেয়াস্ত্র আছে। আমি একাই শতেক আক্রমণকারীকে পরাস্ত করতে পারি।

প্রতিকূল প্রবাহে বজরার গতি মধ্যে মধ্যে ব্যাহত হয়। মাঝির দল যেন হিমসিম খায় হাল টেনে টেনে, তবুও থামে না। লক্ষ্যে না পৌঁছে তারা যেন ক্ষান্ত হবে না।

মনের সঙ্গোপনে আতঙ্ক জাগে থেকে থেকে। আনন্দকুমারী শিউরে

শিউরে ওঠে। ম্যালেটকে মনে পড়ে যখন তখন। কি দুর্দ্দান্ত দুঃসাহস সে তার! তার উদ্দেশ্য অসৎ, ম্যালেট নারীমাংসলোভী। চৌধুরাণী এক অবাঞ্ছিতের ইচ্ছা-অনলে নিজেকে বিসর্জ্জন দিতে চায় না। এখন মনে পড়লে লজ্জায় অধোবদন হয় আনন্দকুমারী। ভয়ার্ত চোখে চেয়ে থাকে।

পবিত্র গঙ্গাধারায় আস্নাতা, তবুও যেন মনের কলুষ-কালি ধৌত হয় না আনন্দকুমারী এক সুপ্ত জ্বালায় জ্বলতে থাকে ক্ষণে ক্ষণে। মনে মনে ভাবে, এই দেহ দগ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত আর দোষমুক্ত হবে না।

—তুমি কোথায় যাবে চৌধুরাণী? সাগ্রহে শুধোলেন কুমারবাহাদুর বললেন,—তুমি কি স্বগৃহে যেতে চাও? সেখানে কি আশ্রয় মিলবে?

—জানি না কুমারবাহাদুর। তবে আপনি নিশ্চিন্ত হোন, আমি চৌধুরী-গৃহের কৃপাপ্রার্থী নই। চৌধুরাণী দীপ্তকণ্ঠে কথা বলে যেন। বলে,—মান্দারণে আমার এক পরিচিত ব্রাহ্মণ আছেন, তিনি নিশ্চয়ই দয়া করবেন। তাঁর চরণে ঠাঁই দেবেন।

—কে সেই ভাগ্যবান? কাশীশঙ্কর বললেন জিজ্ঞাসু স্বরে। বললেন,—তিনি অবশ্যই একজন সজ্জন! উদার মনোবৃত্তির মানুষ।

—হাঁ সজ্জন, তবে জানি না বর্তমানে কি তাঁর অভিলাষ। তাঁর মতের পরিবর্তন হবে কি না তাও জানি না।

কি যেন বলতে চাইছেন কুমারবাহাদুর, অথচ মুখ ফুটে বলতে পারছেন না। ইতস্ততঃ বোধ করছেন হয়তো। মুখে কথা যোগায় না কুমারবাহাদুরের। তিনি নিশ্চুপ বসে থাকেন। গভীর চিন্তায় মগ্ন যেন তিনি। বজরার আলো-উজ্জ্বল ছাদে এক নৈঃশব্দ বিরাজ করে। চৌধুরাণী আনত চোখে আঁচলের পাক দেয় আঙুলে। পাক দেয় আর খুলে ফেলে। তার চোখে ঘুমের আবেশ ফুটেছে। ক্লান্তি আর বিনিদ্রার জড়তা।

পূর্ণিমা আসন্ন, তাই রাত্রির আকাশে গ্রহাণুপুঞ্জের ছড়াছড়ি। দূরদিগন্

সোনালী ছায়াপথ সৃষ্টি হয়েছে। কাশীশঙ্কর ঊর্দ্ধচোখে দেখেন, নীরব সাক্ষীর মত সংখ্যাতীত আকাশ-তারা মিটি-মিটি দেখছে যেন। আর হাসছে কেঁপে কেঁপে। মধ্যরাতের ঠাণ্ডা বাতাস বইছে উড়ু উড়ু। আনন্দকুমারীর কপালে রুক্ষকুন্তল থেকে থেকে চঞ্চল হয় নির্মল হাওয়ায়।

সর্দ্দার-মাঝির হঠাৎ কথায় চৌধুরাণী যেন একবার চমকে উঠলো। আনত চোখ তুললো।

মাঝি হঠাৎ সরবে বললে,—রাজামশায়, বজরা গঙ্গা ছেড়ে দামোদর নদীতে যাবে ভোরের আগেই।

প্রসন্নহাসি হাসলেন কুমারবাহাদুর। সহাস্যে বললেন,—সর্দ্দারজী, তুমিই এখন আমাদের রক্ষাকর্তা। সমুচিত পুরস্কার দেবো তোমাকে।

মাঝি বললে,—দু'দণ্ড ঘুমিয়ে লেন রাজামশায়। রাত ফুরুতে বিলম্ব আছে এখনও।

কাশীশঙ্কর বললেন,—আমার চক্ষু থেকে নিদ্রা দেবী পলায়ন করেছেন। নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না যে। বিন্ধ্যবাসিনীকে দেখতে না পাওয়া পর্য্যন্ত স্থির হতে পারি না।

সলাজ চাউনি তুললো আনন্দকুমারী। আঁচল ত্যাগ করে বললে চুপি চুপি,—বিন্ধ্যর জন্য বৃথা চিন্তিত হবেন না, আমি যতক্ষণ আছি। আমার সাহায্যে বিন্ধ্যকে পাওয়া যাবে জানবেন।

বুকে যেন বল পান কাশীশঙ্কর। মনে সাহস। বললেন,—তবে দু'দণ্ড নিদ্রা ভোগ করা যাক। খানিক থেমে আবার বললেন,—আনন্দকুমারী, তুমি তোমার নির্দ্দিষ্ট শয্যায় যাও, আমি ছাদেই থাকি। প্রহরী হই তোমার।

—আপনি যেমন বলেন তাই হোক।

কথা বলতে বলতে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো চৌধুরাণী। কেমন যেন বিদগ্ধ-চোখে কুমারবাহাদুরকে দেখলো কয়েক মুহূর্ত। বললে,—আপনি তবে বিশ্রাম করেন, আমি নীচে যাই।

—হাঁ হাঁ, বিশ্রামের প্রয়োজন আমাদের উভয়ের। কাশীশঙ্কর সানন্দে বললেন। বললেন,—নির্ভয়ে নিদ্রা যেও তুমি, দ্বিধা নাই কিছু।

—প্রণাম কুমারবাহাদুর! মৌখিক প্রণতি জানিয়ে সিঁড়ি বেয়ে বজরার পাটাতনে নামতে থাকে আনন্দকুমারী। একবার চোখ ফিরিয়ে দেখে নির্দ্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করলো সে। কাশীশঙ্করের চোখে স্বপ্নের জড়িমা ছড়িয়ে দিয়ে গেল যেন।

জড়পুতুলের মত চুপচাপ বসে থাকেন কুমারবাহাদুর। আনন্দ সমুখে নাই, খেয়াল হয় না যেন। তাঁর মনে হয়, চৌধুরাণী এখনও যেন পূর্ব্ববৎ বসে আছে নতদৃষ্টিতে। অদৃশ্য হয়েছে সে, চোখের আড়ালে গেছে—তবুও যেন চোখে ভাসছে তার দেহ-অবয়ব। কর্ণকুহরে ভাসছে তার মধুমিষ্ট কথার সুর। মদিরার নেশার মত কুমারের চোখে যেন রূপের নেশা ধরে।

রাত্রি সার্দ্ধ-দ্বিপ্রহর। নদীর দুই তীরে ঝিল্লী ডাকছে অবিরাম। এক কক্ষ থেকে অন্য কক্ষে দৃষ্টি যায় চৌধুরাণীর। বিস্মিত স্থিরনেত্রে কক্ষমধ্যস্থিত দীপালোকের প্রতিচ্ছায়া ফুটে ওঠে। সেই কক্ষে রাশি রাশি অস্ত্র। তীর, তরবারি, খড়গ, ভল্ল, বর্শা, বর্ম্ম, ঢাল আর শৃঙ্খল। কয়েকটি ধনুক কক্ষের এক কোণে সঞ্চিত।

অস্ত্রের আড়ৎ যেন। ক্ষীণ দীপালোকে চাকচিক্য খেলে লৌহসারে। আপন ধারে হাসছে তারা।

দেহ টলটলায়মান। বজরার বেগ দ্রুত। আনন্দকুমারী আর ক্ষণমাত্র দাঁড়াতে পারে না, শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করে। শয্যার পাশে রূপার জলপাত্র। পানের ডিবা। গন্ধসার। চৌধুরাণী তার শরীরে যেন ব্যথা অনুভব করে অনভ্যাস জল-সাঁতারের অঙ্গ-সঞ্চালনে। কক্ষে সে একা, পুরুষ-চোখের চাউনি নেই এখানে। লজ্জা নেই। ঝড়-ঝঞ্ঝার শেষে শান্ত-প্রকৃতির মত সে এখন।

বজরা দুলে দুলে উঠলো কার যেন পদাঘাতে। কে হয়তো চলাফেলা করছে যেন একদিকের পাটাতনে। কুমারবাহাদুরকে একা পেয়ে জগমোহন লেঠেল ছাদে উঠছে।

নিশীত-নদীর জল থেকে চোখ ফিরালেন কাশীশঙ্কর। বললেন,—কে ?

—আপনার দাস কুমারবাহাদুর। জগমোহন একটু যেন চাপা স্বরে সাড়া দেয়।

—কিছু বক্তব্য আছে ? কাশীশঙ্কর কিঞ্চিৎ ব্যস্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

—হাঁ, কথা আছে হুজুর! জগমোহন বসে পড়লো ফরাসের এক কিনারায়। কুমারের একখানি পা টেনে নেয়। বলে,—পদসেবা করি কুমারবাহাদুর।

অনিচ্ছার সঙ্গে যেন কাশীশঙ্কর বলেন,—চলাফেরা নাই, শরীর-যন্ত্র বিকল হ'তে চায়। গ্রন্থিসমূহে কেমন যেন বেদনা অনুভব করি।

দুই সবল হাতের পেষণে কুমারের পদসেবা করতে থাকে জগমোহন। পা টিপে দেয় সযতনে। হাত চালায় আর কথা বলে,—হুজুর, আমাদের মেয়ে উদ্ধার না হওয়াতক চৌধুরীর মেয়েকে যেন ছেড়ে না দেন। এই মেয়েটা সবই জানে।

কাশীশঙ্কর অর্দ্ধশায়িত। বললেন,—মনে হয় চৌধুরীকন্যা স্থিরবুদ্ধিশালিনী। সেও আমাকে একপ্রকার কথা দিয়েছে, বিন্ধ্যকে রক্ষা করবে বিপদ থেকে।

—কথা দিয়েছে মেয়েটা ? আরেকবার শুধায় জগমোহন সহাস্যে।

কুমারবাহাদুর বললেন,—হাঁ, কথা দিয়েছে। তবে চৌধুরীকন্যাও বিপদ-গ্রস্তা। সে-ও যাতে রক্ষা পায় তজ্জন্য আমিও সচেষ্ট হবো।

ফিসফিসিয়ে বললে জগমোহন, পদসেবায় ক্ষণেক বিরত হয়ে। বললে, —সত্য বলেন কুমারবাহাদুর, আমার অনুমান মিথ্যা কি না ?

আবার হাসলেন কুমারবাহাদুর। অস্ফুট, অল্প হাসি। বললেন,—চৌধুরীকন্যাকে আমিও পরীক্ষা করেছি, তার মন জেনেছি। মেয়েটার প্রকৃতি সরল, স্বভাবটা কিঞ্চিৎ চঞ্চল।

জগমোহন কথা বলতে ইতস্ততঃ করে। বলে,—হুজুর, আপনি কি চৌধুরীর মেয়েকে আপনার চরণে ঠাঁই দেবেন ?

এপাশে ওপাশে মাথা দুলিয়ে কাশীশঙ্কর বললেন,—না, না। তোমার

ধারণা ঠিক নয়। আনন্দকুমারী আমাদের সহ মান্দারণে যাবে। ততঃপর আমাদের করণীয় কিছু নাই। তার ভাগ্যে যা থাকে তাই হবে।

স্বস্তির শ্বাস ফেললো জগমোহন। চিন্তামুক্তির প্রসন্নতা ফুটলো মুখে। তার শরীরের ঘুমন্ত পেশীসমূহ যেন জেগে উঠতে থাকে। বক্ষ বিস্তারিত হয় ক্ষণে ক্ষণে। আর কোন কথা বলে না, পদসেবার কাজে লাগে হৃষ্টচিত্তে।

কুমারবাহাদুরের চোখে নিদ্রার আবেশ। আর যেন জেগে বসে থাকতে পারেন না। তাঁর বিশাল চোখ দুটি মুদিত হয় ধীরে ধীরে। তন্দ্রাজড়িত কুমারের মুখে কথা শোনা যায় মিহি সুরে। কাশীশঙ্কর বললেন,—যদি নিদ্রামগ্ন হই, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই আমাকে ডাকিও।

ঘুম-জড়ানো সুরে কাশীশঙ্কর আবার বললেন,—তোমার দৈহিক শক্তি দিনে দিনে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে না কি! ঠিক মনে হয় আমার দেহে হাত বুলাও তুমি। দলাই মলাই করবে কোথায়, তা নয়—

—মার্জ্জনা করেন কুমারবাহাদুর, আমার আর শক্তি নাই। জগমোহন সলজ্জায় বললে। বললে,—আপনার দেহ লোহার তুল্য হুজুর!

হয়তো নিদ্রায় ডুবে গেছেন কাশীশঙ্কর। তবুও হেসে হেসে কথা বলেন ঘুম-জড়ানো সুরে। বললেন—শরীরচর্চ্চা ত্যাগ করি নাই আমি। সপ্তাহে ক'টা দিন এখনও মল্লভূমিতে যাই। ক'টা পালোয়ানের সহ লড়ালড়ি করতে হয়।

—আমি তা জানি কুমারবাহাদুর। জগমোহন পরাস্ত ভঙ্গীতে বললে,— আপনার দেহের গঠন দেখলেই ধরা যায়।

লেঠেল জগমোহনের কথা কানে যায় কি না যায়। কাশীশঙ্করের নাসিকা গর্জ্জাতে থাকে সহসা। তিনি গভীর নিদ্রায় ডুবে যান ক্ষণিকের মধ্যে।

নীচের কক্ষে একজনের চোখে কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসে না। সে আনন্দকুমারী। দুগ্ধফেননিভ শয্যায় চৌধুরাণী তবুও জেগে থাকে। জ্যোৎস্না ধবল আকাশে চোখ চেয়ে থাকে। বজরার জানলা উন্মুক্ত। দাঁড়ী-মাঝিদের হাল টানার শব্দটা যেন প্রকট হয়ে কানে বাজে। দড়ি আর বাঁশে সংঘর্ষের ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ।

আনন্দকুমারী বিপন্মুক্ত, তবুও মাঝে মাঝে তার বক্ষ দুরু দুরু করে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হিমশীতল হয়। সমাজের ভয়, সমাজপতিদের রোষদৃষ্টি আর শাস্তি-শাসন, আত্মজনদের কটুক্তি—চৌধুরাণীর চোখের চাউনি স্থির হয়ে থাকে আকাশে। আশঙ্কার ধিকি-ধিকি আগুন জ্বলে যেন বক্ষমাঝে। ভয় ভয় করে—যদি সমাজ স্থান না দেয়। অগ্নি-পরীক্ষায় যাচিয়ে নিক সমাজ, সেই ভাল হয়। চৌধুরাণী রাজী আছে। আপত্তি জানাবে না কখনও।

চন্দ্রকান্ত ব্রাহ্মণের প্রতি মনে মনে বিরক্ত হয় আনন্দকুমারী। তাঁর প্রতি কি এক জাতক্রোধে প্রতিহিংসা গ্রহণের স্পৃহা জাগে যেন মনে।

বজরার গতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আনন্দকুমারীর বক্ষস্পন্দনও যেন দ্রুততর হতে থাকে। দুশ্চিন্তা নিদ্রাকে গ্রাস করে। কণ্টকহীন শয্যা, তবু ঘুম নেই চোখে। দৈহিক ক্লান্তিতে শুধু নিশ্চুপ সে। জ্বর রোগের পর যেন দেহ ঝিমিয়ে থাকে।

মাঝি আর মাল্লাদের ছেঁড়া ছেঁড়া কথা, জলে হালচালনার ছপাছপ শব্দ, দুই তীরভূমিতে ঝিল্লীর ডাকাডাকি—গভীর রাত্রির জ্যোৎস্নালোকিত রূপ দেখে ভীতা হয় যেন আনন্দকুমারী।

নাসিকা গর্জ্জনের ক্ষণকাল পরেই জগমোহন কুমারবাহাদুরের পদসেবায় বিরত হয়। পাছে তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত হয় সে জন্য পা টিপে টিপে ছাদ থেকে নীচে নামল সে। কৌতূহলের বশে একবার সন্ধানী-চোখে দেখলো বজরার কক্ষমধ্যে। জ্বালিত দীপালোকে দেখলো যে, শুভ্র শয্যায় কে যেন রাশি রাশি শ্বেতপুষ্প ঢেলেছে। শয্যায় শয়ানে চৌধুরাণী যেন এক স্থির-শোভা। দেখতে দেখতে জগমোহনের মত কঠিন মানুষও চোখ ফিরাতে পারে না। জ্ঞানশূন্য বিমুগ্ধের মত স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে।

সিঁড়ির ধাপে বসে পড়লো জগমোহন। ঘুমে তার চক্ষু আর মুক্ত থাকতে পায় না। তার দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে জঙ্গলাকীর্ণ বিরল বসতির গড়-মান্দারণ। দু'কূল প্লাবিত খরস্রোতা আমোদর নদীর তীরে বীরেন্দ্রসিংহের দুর্গতোরণ দণ্ডায়মান। দুর্গের পাদমূল নদীগর্ভে নিমজ্জিত। কিন্তু দুর্গ না কি জনশূন্য

—পশু আর পক্ষীর আবাসে পরিণত। দুর্গ-প্রাচীরে বট আর অশ্বত্থের চারা, বন্য আগাছার আস্তরণ। দুর্গতোরণ ভগ্ন হওয়ায় দুর্গের রূপ যেন আরও ভীতিপ্রদ দেখায়। পরিত্যক্ত বাস্তগৃহসমূহে শৃগাল আর কুকুরের আস্তানা।

কিন্তু মান্দারণ-বাসিনী যেন ভয়লেশহীন।

যে-দেশে মনুষ্যের বাস দিনে দিনে লুপ্ত হতে চলেছে, সেখানে রাজকুমারী পরম নিশ্চিন্তায় কালাতিপাত করেছেন। তিনি যেন হিংস্র পশুকে পরোয়া করেন না, দুর্বৃত্ত দস্যুদানবকেও মানেন না।

তিনিও জাগরূক। তাঁরও চোখে ঘুমের চিহ্ন নেই। জাজ্বল্যমান বাতির আলো তাঁর দুই পাশে। সমুখেও একটি বাতি জ্বলছে।

ঘুম নামে না চোখে; তাই রাজকন্যা লিখনকার্য্যে ব্যাপৃতা। তাঁর হাতে লেখনী। একাগ্রচিত্তে বিন্ধ্যবাসিনী শাস্ত্রপুঁথি নকল করেছেন পাতার পর পাতা। শুভ্র তুলট কাগজ ক্ষণমধ্যে কৃষ্ণকালির আখরে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। জ্বলন্ত বাতির আশপাশে কীটপতঙ্গের জটলা, অগ্নিদগ্ধ হতে চায় উড়ন্ত কীট। আগুনের দাহিকায় আত্ম-বিসর্জ্জন দিতে চায়।

—রাজকুমারী!

নিঃশব্দ রাত্রির মৌনতা সহসা ভঙ্গ হয়। কিন্তু রাজকন্যার একাগ্র মনোনিবেশ টুটলো না। বিন্ধ্যবাসিনী পূর্ব্ববৎ লিখনকার্য্যে রত থাকেন।

আহ্বানকারী পুনরায় ধীরকণ্ঠে ডাকলো,—রাজকন্যা! রাজকুমারী!

এই গহন রাতে এই ভগ্নপুরীতে কোন প্রেতাত্মা ব্যতীত কে আর কথা বলবে! তাও পুরুষকণ্ঠের সন্ত্রস্ত আহ্বান।

বিন্ধ্যবাসিনী ধারণা করেন হয়তো পাঠানপ্রহরী প্রহরার কাজে ক্ষান্ত হয়ে অন্দরে এসেছে, কিছু বক্তব্য আছে তার। কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজের

কর্ণেন্দ্রিয়কে অবিশ্বাস করেন। পাঠানের কণ্ঠস্বর কি এতই শ্রুতিমধুর! পাঠানের কথার সুর কর্কশ, কণ্ঠ যেন গর্দ্দভনিন্দিত।

রাজকন্যা তিলমাত্র বিচলিত হন না। লেখনীও থামে না। যদিও তিনি মনে মনে আশঙ্কিত হতে থাকেন। পরিচারিকা অন্য ঘরে ঘোর নিদ্রামগ্না।

আবার ডাক শোনা যায়—রাজকন্যা!

—কে? বিস্ফারিত চোখের প্রসারিত দৃষ্টি ফিরিয়ে বিন্ধ্যবাসিনী বললেন,—কে তুমি? পরিচয় না জানা পর্য্যন্ত সাড়া দিতে পারি না।

কক্ষের বাহিরে অদৃশ্য কে যেন কথা বলছে অপরিচিত সুরে। আবার তার কথা শোনা যায়। সে বলে,—রাজকুমারী, আমি চন্দ্রকান্ত।

চন্দ্রকান্ত! অস্ফুটে এই নামটি সবিস্ময়ে উচ্চারণ করেন বিন্ধ্যবাসিনী। মসীপাত্রে লেখনী স্থাপিত করে পরিধেয় বস্ত্র বিন্যস্ত করেন ঊর্দ্ধদেহে। কেমন যেন সলজ্জায় আসন ত্যাগ করেন। মাথায় গুণ্ঠন টেনে উঠে দাঁড়ালেন। মৃদুকণ্ঠে বললেন—আপনি এই অসময়ে কেন? কোন বিপদের আশঙ্কা আছে কি?

—হাঁ, তা আছে বৈ কি। চন্দ্রকান্ত অন্ধকারেই থেকে কথা বলেন। আত্ম-প্রকাশ করেন না আলোর আভায়! বললেন,—আনন্দকুমারীর মা পৌররক্ষাকারীদের কাছে অভিযোগ পেশ করেছেন। শুনলাম বাঙলার নবাবের সমীপে একজন দূতকে পাঠিয়েছেন। চন্দ্রকান্ত হয়তো পথশ্রমে শ্রান্ত। খানিক থেমে আবার বললেন,—তাঁর কন্যাহরণের ষড়যন্ত্রে আপনার ও আমার নামও যুক্ত করেছেন।

আমার দুর্ভাগ্য আর কি!

অবিন্যস্ত বস্ত্র ঠিকঠাক করতে করতে কথা বললেন রাজকুমারী বিষণ্ণ কণ্ঠে। বললেন,—আমার অপরাধ কি তাই শুনি?

—তা অজ্ঞাত। চন্দ্রকান্ত ধীরে ধীরে বললেন। অন্ধকার থেকেই বললেন,—মিথ্যা অভিযোগ লিখানো হয়েছে কোতোয়ালে। নগররক্ষক শুনা যায় হিন্দুবিদ্বেষী, তজ্জন্যই ভয়। বর্ত্তমানে নগররক্ষকের কার্য্যে একজন মুঘলকে নিযুক্ত করেছেন বঙ্গের নবাব।

—আমি তো নিরুপায়। বললেন রাজকুমারী, কাঁপা-কাঁপা সুরে। বললেন,—যাই হোক, এখন রক্ষা পাওয়ার কি উপায় তাই বলুন। আত্ম-হত্যায় কি রেহাই পাওয়া যাবে ?

চন্দ্রকান্ত আর কথা বলেন না। দর-দালানে দাঁড়িয়ে থাকেন অপরাধীর মত।

রাজকুমারী বললেন,—আপনি কক্ষে প্রবেশ করুন। আমার অনুরোধ, দ্বিধার কিছু নাই।

—বিনা অনুমতিতে কক্ষ-প্রবেশে সাহসী হই না—চন্দ্রকান্ত ক্লান্ত সুরে বললেন। কথার শেষে দ্বারে দেখা দিলেন। রাজকন্যা আড়নয়নে দেখলেন ব্রাহ্মণ সত্য সত্যই পথশ্রান্ত। ভয়ের আবেগ তার মুখাবয়বে। চোখে চিন্তাকুল চাউনি।

গুণ্ঠন ঈষৎ টেনে কথা বলেন বিন্ধ্যবাসিনী। বললেন,—যা সত্য তা কি মিথ্যা হয় ? ভিত্তিহীন অভিযোগের মূল্য কি ?

—নগররক্ষক সজ্জন নয়। যে-কোন অছিলায় আমাদের ব্যতিব্যস্ত করতে পারে। বিপদে ঠেলতে পারে। সেই মত আশঙ্কা আমার। কথা বলতে বলতে চন্দ্রকান্তর শ্বাস রুদ্ধ হয় যেন।

যৌবন টলমল করছে। সৌন্দর্য্য ও প্রভাপ্রাচুর্য্যে প্রদীপ্ত মূর্তি রাজকন্যার। যদিও অবহেলা ও অনাসক্তিতে বিন্ধ্যবাসিনীর রূপ বর্তমানে কিঞ্চিৎ ম্লান। চূর্ণ অলকগুচ্ছে আবৃত রাজকন্যার মুখখানি চন্দ্রকান্তর নজরে পড়ে না। কি যেন লজ্জায় বিন্ধ্যবাসিনী অলকগুচ্ছ বক্ষপরে নামিয়ে দিলেন।

—আমার মৃত্যুই মঙ্গলের। স্বগতঃ করলেন রাজকুমারী, সকাতরে—বৃথা বিড়ম্বনা আর সহ্য হয় না। অকারণ দোষারোপ আমার প্রতি কেন ?

—কিংকর্তব্য রাজকন্যা ? চন্দ্রকান্ত মৃদুকণ্ঠে শুধোলেন। আমি বলি এই গ্রাম ত্যাগ করাই উচিত।

—বিচারবোধ নাই আর আমার। মৃত্যু ছাড়া গতি দেখি না। কথা বলতে বলতে বিন্ধ্যবাসিনী আঁখিপ্রান্ত আঁচলে মুছলেন! বললেন,—সপ্তগ্রামে এই সকল ভিত্তিহীন সংবাদ যায় তো আপদের অন্ত থাকবে না। তিনি আর রক্ষা রাখবেন না।

চোখাচোখি হতেই ইশারায় ডাকলেন চন্দ্রকান্ত। মুখে যেন তার অনুরোধের ভঙ্গিমা। তাঁর আহ্বান-ইঙ্গিতে সাড়া দেওয়া সমীচীন কি না এক মুহূর্ত বিন্ধ্যবাসিনী ভাবলেন, তারপর যন্ত্রচালিতের মত ধীরপদক্ষেপে অগ্রসর হলেন। রাজকন্যার মুখে-চোখে যেন সম্মোহিতার ভাবাবেগ।

চন্দ্রকান্ত দুঃখের হাসি হাসলেন যেন। রাজকুমারী কাছে আসতেই সন্ত্রাসে ইদিক-সিদিক দেখলেন যেন। তারপর বিন্ধ্যবাসিনীর একখানি নধর-নরম হাত নিজ করে ধারণ করলেন। ফিস-ফিস বললেন—আমার সহ আইস। কথায় কথায় পরিচারিকা যদি জাগ্রত হয়!

—কোথায় যাবো? আবেশ-আকুল কণ্ঠে বললেন রাজকন্যা। বললেন, —মরণের পথে কি?

ক্ষীণ হাসির সঙ্গে চন্দ্রকান্ত বললেন,—না। এখানে বাতির আলো, পার্শ্বকক্ষ অন্ধকার। কথা বলতে বলতে ব্রাহ্মণ সেই আঁধার ঘরে প্রবেশ করলেন। রাজকুমারীও বন্দিনীর মত তাঁকে অনুসরণ করলেন। ব্রাহ্মণ আবার বললেন,—উষার আলো ফুটুক, তারপর যা হয় একটা স্থির করা যাবে।

বিন্ধ্যবাসিনীর আত্মজ্ঞান যেন লোপ পেয়েছে। মুখের কথা হারিয়েছেন। চন্দ্রকান্তর করচাপে তাঁর হাত পিষ্ট হতে থাকে। রুদ্ধশ্বাসে ও ভয়ে ভয়ে রাজকন্যা বললেন,—আমি ভীতা হই, পরিচারিকা যদি সহসা জেগে ওঠে।

চন্দ্রকান্তর আকর্ষণ যেন চাঁদের মতই। তিনি রাজকন্যার অন্য হাতও নিজ হস্তে ধারণ করলেন। চুপি চুপি বললেন,—আমার দুঃসাহস মার্জ্জনীয়। শত বিপদেও কেন যে আমার মানস-চক্ষু প্রবোধ মানে না কি জানি! অসংযম আজ আমার মনকে অধিকার করেছে।

রাজকুমারী বিন্ধ্যবাসিনী যেন নীরব নিস্পন্দ। দুরু দুরু বক্ষ, ঘন ঘন শ্বাসপতন হয় সশব্দে। জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কারে একবার ইচ্ছা হয়, এই কক্ষ ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ এই মুহূর্তে। পদচারণায় সচেষ্ট হন রাজকুমারী, কিন্তু তাঁর গতি বাধা পায়। দিব্যজ্ঞান লুপ্ত হলেও অনুভবে বোঝেন, তিনি যেন কার বাহুপাশে আবদ্ধ।

বৈশাখী-রাতের এলোমেলো মত্ত-বাতাস চলেছে বাইরে, শনশনিয়ে। রাত্রির নিস্তব্ধতায় আমোদরের প্রবাহধ্বনি ভেসে আসছে। শুক্লাতিথির চন্দ্রাকর্ষণে নদী যেন আজ উর্দ্ধগামী। চাঁদের দিকে মাথা তুলছে জল-কল্লোল। প্রগলভার খিল-খিল হাসির মত জলের ধারা সশব্দে এগিয়ে চলছে।

মুক্তির আশায় বিন্ধ্যবাসিনী আরেকবার যেন উন্মুখ হয়ে ওঠেন। কিন্তু বাহুবন্ধন কত যে কঠোর! বৃথা চেষ্টায় ক্ষান্ত হয়ে একটি তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ফেললেন রাজকন্যা। অনুমানে বুঝলেন, মুক্তি নেই। পুরুষের কাছে নারীর মুক্তি কোথায়?

দেওয়ালগিরির আলো সারারাত জ্বলতে থাকে আজ।

সুড়ঙ্গের মত দীর্ঘ দালানে দালানে তৈলদীপের আলোকশিখা বক্ররেখায় নাচতে নাচতে কখন যে স্থির হয়ে গেছে কারও নজরে তা পড়ে না। হয়তো তেল ফুরিয়েছে, সলতে শেষ হয়েছে। বাইরে শেষরাত্রির নিবিড় আঁধার। রাজ-অন্তঃপুরে আজ আর ঘুম নামে না কারও চোখে। মহলে মহলে জাগরণের পালা চলেছে।

রাজমাতা বিলাসবাসিনী যেন কিছু বেশী ব্যস্ত হয়েছেন। এই মধ্যরাতে তাঁর গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া যায় অন্দরমহলে। বিলাসবাসিনীর দুই পাশে দুই পরিচারিকা চামর দুলিয়ে দুলিয়ে বাতাস খেলায়। শ্বেতপ্রস্তরের একটি জলচৌকিতে আসনপিঁড়ি রাজমাতা। পায়ের কাছে স্থান পেয়েছেন রাজবধূর দল। লাল ভেলভেটের গালিচায় আসর বসেছে যেন। গালিচার মাঝে সোনার পানদানি; মুক্তার ঝালর ঝুলছে গোলাপপাশে। উগ্র তাম্বুলের সুগন্ধ রাজমাতার আসরকক্ষে। ডাক পড়েছে মহাশ্বেতার, তিনিও এসে একত্র হয়েছেন।

ঘুম-ঘুম-চোখ বধূঠাকরুণদের। কেশবিন্যাস ঠিক নেই কারও। মুখে মুখে

চাপা হাসির আভাস খেলছে। চোখে চোখে লাজুক চাউনি। একে একে এসে জড় হয়েছেন চার বধূ, শাশুড়ীকে ঘিরে বসেছেন। রাণীদের মুখে কথা নেই, শুধু মৃদু মৃদু হাসি।

—তোমাদের দরকার আছে, তাইতো ডেকে পাঠিয়েছি। শুধু কি তোমাদের রূপ দেখতে ডেকেছি? কাজ আছে, কথা আছে। তোমাদের মতামত জেনে তবে আমি কাজে হাত দেবো।

উমারাণী হেসে হেসে বললেন,—ঠাকুরঝিকে ফিরে পাওয়া যায় তো ভাবনা কি আর!

কৃত্রিম হাসির সঙ্গে বিলাসবাসিনী বললেন,—দেখো বড়রাণী, না আঁচালে আমার বিশ্বাস নেই। তবে আমার কাশীশঙ্কর সদলে গেছে, একটা কোন সুরাহা সে করবেই। কাশীশঙ্কর আমার যা-তা নয়। অনেক গুণের আধার সে।

মহাশ্বেতার বক্ষ গর্ব্বে স্ফীত হয়। কিন্তু তাঁর মুখে কোন প্রকাশচিহ্ন দেখা যায় না। তবুও মুখখানি যেন মলিন, মনে যেন সুখ নেই। আলুলায়িত রুক্ষ কেশ একরাশি পৃষ্ঠে নেমেছে। মহাশ্বেতা মনে মনে পণ করেছেন, তিনি ফিরলে তবে চুল বাঁধবেন, সাদাসিধা বস্ত্র ত্যাগ করবেন। গায়ে নিয়মরক্ষার জন্য নামমাত্র অলঙ্কার। পায়ে অলক্তকচিহ্ন লুপ্ত হয়ে গেছে।

—তুমি এমন মনমরা কেন মহাশ্বেতা? রাজমাতা অন্য দিকে তাকিয়ে কথা বললেন ভারী কণ্ঠে। আরও যেন কি বলতে চাইলেন রাজমাতা। বলতে গিয়ে থামলেন, কালো পাথরের বাটি মুখে তুললেন! পাতকুয়ার শীতল জল, কাগ্‌চি লেবুর সরবৎ পান করলেন খানিকটা। বিলাসবাসিনীর মুখ মুছিয়ে দিতে হয় পরিচারিকাকে। হাতে পাত্র ধরে রাজমাতা বললেন,—আঃ, বুকটা জুড়ালো এতক্ষণে।

হাতে সোনার কড়ায় বাঁধা চাবির গোছা। নাড়াচাড়া করেন মহাশ্বেতা। ঘরদোর ছেড়ে এসেছেন তিনি, মন ফেলে এসেছেন। স্মিতহাসি উঁকি দিয়ে মিলিয়ে যায় মুখে।

বিলাসবাসিনী হঠাৎ ঝাঁঝালো সুরে বললেন,—মর্দ্দ ব্যাটাছেলে ঘরের বার হয়েছে তো অযথা মেজাজ খারাপ করবে কেন ?

মহাশ্বেতার নতমুখ আরও আনত হয়। লজ্জায় রাঙিয়ে ওঠে। চাবির গোছা হাতে, শিশুর মত খেলা করেন যেন। মহাশ্বেতার কানে কানে পাট-রাণী উমারাণী বললেন সহাস্যে,—বলতে কি পারবে, চোখের আড়ালে গেলে কি কষ্ট হয়! বিরহ-বেদনায় অস্থির হতে হয়, একা রাত কাটাতে হয়। জ্বররোগের জ্বালা ধরে যেন, তাই নয় ?

মৃদু হাসির তরঙ্গ খেলে মহাশ্বেতার মুখে। বললেন,—মহাশ্বেতা, কথা কও না কেন ? মৌন নিয়েছো না কি ?

কাশীশঙ্করের সহধর্ম্মিণী সত্যিই যেন কথা বলতে ভুলে গেছেন! তবুও কথা বললেন,—রাজমাতা, মন আমার ভালই আছে।

উমারাণী আবার সহাস্যে ফিস ফিস করলেন মহাশ্বেতার কানে। বললেন, —বিরহীর দুঃখ কাকে বোঝাবো বল! কেউ বুঝবে না।

রাজমাতা বললেন,—এখন কেন তোমাদের ডাক পাঠিয়েছি, তাই বলি। কথার শেষে খানিক থেমে আবার বললেন,—শিবানীকে তো আর রাজপুরীতে রাখতে পারি না আমি। কেলেঙ্কারীর একশেষ হবে কি! তার চেয়ে মানে মানে সরিয়ে দেওয়াই ভাল।

উমারাণীর চোখের পল্লব পড়ে না। বিস্ময়াবিষ্টের মত তাকিয়ে থাকেন তিনি। রাজমাতার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বললেন,—ওদের বিয়ে যদি হয় তবে আর ভাবনা কেন ?

বিলাসবাসিনী বললেন,—যা ইচ্ছে হয় করুক, কিন্তু রাজবাড়ীতে আর ঠাঁই হবে না। শিবানী মজতে পারে, তাই বলে আমি আমার বাস্তু অপবিত্র করতে পারি না।

চার বধূ মাথা নত করলেন সলজ্জায়। লাল ভেলভেটের গালিচায় দৃষ্টি বদ্ধ করলেন। বড়রাণী বললেন,—আহা, বেচারী কোথায় আর যাবে! বিয়ে দিয়ে দিন শিবানীর।

বিলাসবাসিনীর রুষ্টকণ্ঠ কক্ষের দেওয়ালে দেওয়ালে ঘা খায় যেন। বললেন,—পেটে যদি হঠাৎ একটা বাচ্ছা আসে তখন কে রক্ষে করবে! না, সাবধানের মার নেই।

লজ্জারাঙা মুখ আবার নামালেন উমারাণী। নিরুপায়ের মুখভঙ্গী যেন তার। বড়রাণী মনে মনে ভাবলেন, রাজমাতা এত কঠোর আর নিষ্করুণ কেন! দয়ামায়ার লেশ নেই তাঁর বুকে। পাষাণে গঠিত যেন।

—শিবানীর ভাই মহেশনাথ ঠাকুরপো কি বলেন? ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন উমারাণী। বললেন,—তাঁকে কি জানিয়েছেন কিছু?

আবার ঠোঁট উলটে রাজমাতা কেমন যেন বিরক্তির সঙ্গে বললেন—মহেশনাথ সবই শুনেছে। মহেশনাথ আর কখনও শিবানীর মুখদর্শন করবে না। সে বিকলাঙ্গ হতে পারে, তবু তার জ্ঞানবুদ্ধির তুলনা হয় না। মহেশনাথ একটা দস্তুরমত পণ্ডিত।

কথা শুনে যেন খুশী হতে পারলেন না উমারাণী। রাজমাতার কাছে যুক্তি আর তর্ক চলবে না, তাই যেন নীরব হলেন তিনি।

মহাশ্বেতা বললেন,—শিবানীকে ক্ষমা করুন রাজমাতা!

বিলাসবাসিনী অসম্মতি জানিয়ে মাথা দোলাতে থাকেন। বলেন,—ক্ষমার যোগ্যা নয় শিবানী। সে দূর হয়ে যাক রাজপুরী থেকে। আমি কারও কথা শুনতে চাই না। তোমাদের জানিয়ে দেওয়া কর্ত্তব্য তাই বলছি।

মেজরাণী আর ছোটরাণী, সর্ব্বমঙ্গলা আর সর্ব্বজয়া গালিচা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। মহাশ্বেতাও উঠলেন; উমারাণী বসে থাকেন শুধু, যদি রাজমাতার মন কিঞ্চিৎ দ্রব হয়, সেই আশায়।

দুয়োরে একজন পরিচারিকার দেখা পাওয়া যায়। তার চোখে-মুখে যেন ব্যস্ততা। দাসী বললে,—শিবানী নিখোঁজ হয়েছে রাজমাতা। সন্ধানে মিলছে না তার।

কক্ষের সকলেই পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকেন। বিলাসবাসিনীর

দীর্ঘ চোখের তারা স্থির হয়ে থাকে। তিনি বললেন, পুকুরে ডুব দিয়েছে না কি! শশিনাথ কোথায়?

দাসী ইতি-উতি দেখে বললে,—তেনার কোন খোঁজ নাই। তাঁকেও পাওয়া গেল না।

—তবেই হয়েছে। রাজমাতার মুখাকৃতি আরও যেন স্তব্ধ-গম্ভীর হয়। তিনি বলেন,—এখন উপায়? রাজাবাহাদুরের কানে উঠেছে কি না কে জানে!

উমারাণী শুধু হাসলেন যৎসামান্ত। ঈষৎ ব্যঙ্গ যেন তাঁর হাসিতে। তিনিও গালিচা ছেড়ে উঠে ধীরে ধীরে কক্ষ ত্যাগ করলেন।

বিলাসবাসিনী থামলেন না। বললেন,—গেছে যখন চিরকালের মত যাক, আমি তো তাই চাই। একরত্তি একটা মেয়ে আমার মুখে চুণ-কালি মাখিয়েছে!

শেষ-রাতের ঘন আঁধার স্তিমিত এখন। পূর্ব্বাকাশে শুভ্রতা ফুটেছে, দিগন্ত দেখা দিয়েছে বক্র আকারে। আলো আর আঁধারের প্রতিযোগে সূতানুটি যেন এক বিশেষ রূপ পেয়েছে—ঘুমন্ত মানুষের চোখে পড়ে না। এক-জোড়া শঙ্খচিল কোথা থেকে শূন্যে উড়লো। উড়তে উড়তে চললো কি এক উদ্দেশে যেন!

শশিনাথ আগে আগে চলেছে। পেছনে শিবানী। যত দূর চোখ যায় তৃতীয় জনের দেখা মেলে না। শিবানী বললে,—ডর লাগছে আমার। তোমার সঙ্গে চলতে পারছি না যে।

শশিনাথ থমকে দাঁড়ালো। বললে,—পা চালাও বৌ! প্রথম নৌকা ধরা যাবে না। লোক জানাজানি হবে। তোমাতে আমাতে আবার যদি ফারাক হয়?

—তবে আমি বাঁচবো না আর। তুমি বিনা আমি, ভাবতে পারি না যে।

ভোরের বাতাস ছাড়া আর কেউ শোনে না শিবানীর আবেগময় কথা। তৃতীয় জন নেই এখানে, জোড়া জোড়া চোখের দৃষ্টিবাণ নেই এখানে। লোক-লজ্জা নেই। সমাজ এখানে মূল্যহীন।

আনন্দের উল্লাস-হাসি ফুটলো শশিনাথের মুখে। পরিতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস ফেললো একটা। জনহীন পথের ধারে একটি দেবদারু গাছের আড়ালে শশিনাথ হাসতে হাসতে শিবানীকে জড়িয়ে ধরলো কোমল বন্ধনপাশে। হাসির জের টেনে শশিনাথ বললে—আমি তোমার কে?

শিবানী মুখ রাখলো শশিনাথের বুকে। বললে,—তুমি আমার জন্ম-জন্মান্তরের। যমেরও সাধ্যি নেই আমাদের তফাৎ করবে। আমার পুণ্যির জোরে তোমাকে পেয়েছি।

—কোথায় যাবে এখন? শিবানী ভাবালু কণ্ঠে প্রশ্ন করলো।

শশিনাথ বললে,—ঘরে ফিরবো আমরা। ত্রিবেণীতে ফিরে যাবো। ঘর-সংসার পাতবো। রাজকীয় সুখ আমি চাই না। পরের ঘরেও থাকতে চাই না!

—আমাকে ছেড়ে যাবে না তো কখনও?

না, কদাপি নয়।

—রূপ যৌবনের আয়ুষ্কাল বেশী নয়, মনে রেখো। কথা বলতে বলতে তার সাপের মত এক জোড়া বাহুর বাঁধন যেন আরও কঠিন হয়ে ওঠে। কথার শেষে নিজের মুখ তুলে ধরলো শিবানী।

দুই দেহ যেন এক হ'য়ে যাবে, পরস্পর প্রতি এমনই আকর্ষণ। দুই সত্তা একত্রে মিলবে। একাকার হবে। শশিনাথ আর শিবানী অবার ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় ক্ষণেকের মধ্যে।

—মাথায় কাপড় দাও তুমি। গুণ্ঠন টেনে দাও। হনহনিয়ে পথ চলতে চলতে বললে শশিনাথ। হাসিমুখে তাকালো একবার, পিছু ফিরে। বললে,—দিনের আলো ফুটবে এখনই। চেনাশুনা মানুষ যদি দেখতে পায়!

গাছে গাছে পাখীর ডাক শুরু হয়। আকাশ আরও যেন লাল হয় পূর্ব দিকে। মতিবেলফুলের গন্ধ ভেসে আসে ভোরের হাওয়ায়।

আ-কপাল ঘোমটা টানলো শিবানী। বললে,—পা যে চলে না গো, আর কতটা পথ?

—আর পোয়াটাক পথ বাকি আছে! চিৎপুরের ঘাট থেকে নৌকা পাবো। শশিনাথ ফিরে ফিরে দেখে আর কথা বলে। বললে,—একবার নৌকায় উঠতে পারলে তবে আমার নিশ্চিন্তা। পা চালাও জোরকদমে।

—বড়রাণীর তরে মনটা আমার হাঁকপাঁক করছে। শিবানী স্মৃতির ব্যথায় কথা বলে। বললে,—বড়রাণী মানুষটার খুব দরাজ দিল! যেমন প্রতিমার মত রূপ তেমন দেবীর মত প্রকৃতি।

—ওই দেখো নৌকার মাস্তুল। শশিনাথ অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখিয়ে দেয় সমুখপানে। গঙ্গার অপর তীর দেখা যায়, পলি আর বালুময় চড়া।

শিবানী পা চালায়। বলে,—রাজমাতার কাছে আমার গয়নাপত্র আছে। তার কি হবে? কে আদায় করবে?

—ভাগ্যে যদি থাকে পাবে, না থাকে পাবে না। আমার কোন লাভ নাই সোনাদানায়। শশিনাথের পথ চলার সঙ্গে সঙ্গে কথা আর থামতে চায় না যেন। সে বললে,—তুমিই আমার সোনা, আমার হীরামাণিক।

শিবানী হাসলো মিষ্টহাসি। নিজের গৌরবে অহঙ্কার আসে তার মনে। মুখে হাসি মাখিয়ে বললে,—রাজমাতা দিয়ে দেবেন আমার গয়নাগাটি। কে চাইতে যায় তাঁর কাছে!

শশিনাথ বললে,—আমি আর সুতানুটির রাজগৃহে ফিরবো না কখনও। লাখো টাকা দিলেও নয়।

—কেন? সাগ্রহে ও সহাস্যে বললে শিবানী। বললে,—রাজা যদি ডাক পাঠান?

—তথাপি নয়। শশিনাথ কথা বললে সুর নামিয়ে। বললে, তুমি যেখানে নাই আমিও সেখানে নাই।

শশিনাথ হাসলো। হাসতে হাসতে বললে,—রাজমাতা এখন রাজকুমারীর ভাবনায় অস্থির হয়ে আছেন। তোমাকে কি তাঁর মনে পড়বে আর। মনে তো হয় না।

ঘাটে যাত্রীদের ভীড়। খেয়াপারের মাঝিরা সরবে ডাকছে যাত্রীদের।

গঙ্গার বুকে প্রতিধ্বনি ভাসছে যেন। শিবানী ভয়ে ভয়ে বললে,—লোক দেখলে আবার ভয় পাই আমি। ভীড় দেখলে যেন হাঁফ ধরে আমার। তুমি আমার কাছ থেকে দূরে যেও না। কাছে কাছে থাকবে।

জীবনসঙ্গিনীকে খুঁজে পেয়েছে শশিনাথ। মনের মত একটি মেয়েকে পেয়েছে। আনন্দে দিশাহারার মত পথ চলেছে হনহনিয়ে। শশিনাথ ঘাটের ইদিক-সিদিক দেখতে থাকে—কোন পরিচিত জন আছে কি না, দেখে নেয় যেন দৃষ্টি বুলিয়ে।

মনের সুখে ঘর বাঁধতে চলেছে সাহসিকার মত। তবুও তার মন যেন সায় দিতে পারে না। পেছনে ফেলে-আসা রাজগৃহের অদৃশ্য আহ্বান শুনতে পায় যেন। রাজমাতার মুখখানি বারে বারে স্মৃতিপটে ভাসতে থাকে। বিলাস-বাসিনী যেন তার নাম ধরে ডাকছেন, কানে শুনতে পায় শিবানী। বড়রাণী উমারাণী তাকে হয়তো এখন কত খোঁজাখুঁজি করছেন! সেই মিষ্টিমুখ রাজবধূকেও চোখের সামনে দেখতে পায়। উমারাণীর হাসি-ভরা মুখ, কখনও হয়তো বিস্মৃত হওয়া যাবে না।

শিবানীর আঁখির কোণে ভোরের আলোর রূপালী ছায়া নাচে থরথরিয়ে। পিছটানের মায়া, বিয়োগের দুঃসহ ব্যথায় শিবানীর বুকে কেমন একটা দম-আটকানো কষ্ট হয় যেন। বাঁধ-না-মানা চোখের জল দেখতে পায় না শশিনাথ।

—কৈ গো, গেলে কম্‌নে?

যাত্রীর জনারণ্য গঙ্গার তীরে। কলকোলাহলে কান পাতা দায়। তাড়া-হুড়ায় ছুটাছুটি করছে খেয়াপারের যাত্রী। একে অন্যকে ডাকাডাকি করছে। সঙ্গের লোক আর পুঁটুলি-প্যাটরা হারানোর ভয়ে অস্থির, যাত্রীরা দল বেঁধে তীর থেকে ঘাটে নামছে। বজরায় বজরায় মাল বোঝাই চলেছে। ঘাটের ধাপে ধাপে দুই পিপিলিকাশ্রেণী ওঠা-নামা করছে। এক সারি ওপর থেকে নীচে নামে, আরেক দল নীচে থেকে ওপরে যায়। মূক আর বধির যেন তারা। বিমর্ষ মুখাকৃতি। ঠিকাভাড়ার মালবাহী মানুষ, বজরা পূর্ণ করে আর খালাস করে, উদয় থেকে অস্তকাল। ঠিকাদার মধ্যে মধ্যে লক্‌লকে

বেত চালায়। সে ধীরে চলে, তার গতি মন্থর হয়। যার গতি মন্থর, সে দ্রুত চলে।

শশিনাথ যেদিকে তাকায়, সেদিকে শুধু বিচালির দেওয়াল। রাশি রাশি খড়-বিচালি আর চালের বস্তা। নৌকার ছইয়ের ভেতরে স্থান পায় শিবানী। শশিনাথ কেন কে জানে, দূরে দূরে থাকে! চার চোখের মিলন হ'লে মৃদু-মন্দ হাসে। অন্যান্য যাত্রীরা পাছে লক্ষ্য করে, তাই শিবানী যখন-তখন ঘোমটা টানে। অনভ্যাস, তবুও মুখের হাসি লুকাতে হয় ঘোমটার আবরণে।

নৌকা ছাড়লো ঠেলা খেয়ে। দুলতে দুলতে জলে ভাসলো। শিবানী যেন হঠাৎ দেখতে পায় ফেলে-আসা তীরভূমি। সুতানুটি গ্রাম। চোখে ধূলিকণা পড়লো না কি! ছলছল চোখে শিবানী দেখে সুতানুটির গ্রামাঞ্চল। ছইয়ের ভেতরে একজোড়া সজল চোখ। যাত্রিপূর্ণ নৌকায় কে কার খোঁজ নেয়? শশিনাথ কিন্তু ঠিক চোখ রেখেছে। যখন-তখন দেখছে ছইয়ের ভেতরে একটি কাতর মুখ, বড় করুণ চাউনি যেন ঐ দুই চোখে। দুরু দুরু বুকে অজানার উদ্দেশ্যে ব'সে আছে।

গড়-মান্দারণ। উষার আলোর প্রথম স্পর্শ লেগেছে গাছের শিখরে শিখরে। মঠ, মন্দির আর মসজিদের চূড়ায়। যদিও রুদ্ধদ্বার ঘরে ঘরে এখনও অন্ধকার বিরাজ করছে। মুরগী ডাকাডাকি করছে মুসলমানের গেরস্থালী আঙিনায়।

রাজকুমারী ভাবছিলেন, দিনের আলো ফুটলে লজ্জার অবধি থাকবে না। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢেকে বসে থাকেন বিন্ধ্যবাসিনী। সুখের অনুভূতির পর কি এক অনুশোচনায় স্থির হয়ে আছেন যেন! রাজকন্যার বেশবাস অবিন্যস্ত, কেশের বোঝা এলোমেলো। বিনিদ্রার জ্বালা ধরছে চোখে। দেহ মন অবশ হয়েছে।

গবাক্ষপথে দৃষ্টি অন্য এক জনের। আমোদরের জলে রূপালী চিকণ খেলছে; আলোর প্রতিচ্ছায়া। নদীর অপর তীরে ঘন বনাঞ্চলে এখনও আঁধারের লেপন দেখা যায়। দুর্ভেদ্য জঙ্গল, আলোর প্রবেশ নেই।

চন্দ্রকান্ত বললেন,—কোথায় যাওয়া যায় বলতে পারেন রাজকন্যা? এমন কোথাও যেতে চাই, যেস্থানে সমাজ নাই, পরিচিত মানুষ নাই। শাসক সম্প্রদায় বলতে কিছু নাই।

বস্ত্রাঞ্চলে আবৃত মুখ। বিন্ধ্যবাসিনীর কথা তবু শোনা যায়। রাজকুমারী স্বল্প হেসে বললেন,—হিমালয়ের পাদদেশ, নয়তো বঙ্গ-সাগরে মধ্যস্থল ব্যতীত আর কোথাও আপনার তেমন ঠাঁই দেখি না।

—পরিহাস নয় রাজকন্যা, এ আমার অন্তরের কথা। চন্দ্রকান্ত গবাক্ষ থেকে চোখ না ফিরিয়ে কথাগুলি বলছেন। খানিক থেমে আবার বলেন,—আনন্দকুমারীর মা চৌধুরী-গৃহিণী আমাকে কি আর মান্দারণে বসবাসের সুযোগ দেবেন? মনে তো হয় না। চৌধুরী-গৃহিণী মেয়েকে হারিয়ে যদি প্রতিহিংসার পথ ধরেন, মান্দারণ আমাকেই ত্যাগ করতেই হবে।

—আমার অবস্থাও তদ্রূপ। বিন্ধ্যবাসিনী বললেন ধীরকণ্ঠে। বললেন,—মুক্তির কোন উপায় দেখতে পাই না। জানি না, এই অবস্থা আরও কত কাল চলবে! অসহ্য ঠেকছে যেন আমার। আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা হয় মাঝে মাঝে। চিরকালের মত জ্বালা জুড়ায়।

চন্দ্রকান্ত কখন নিকটে এসেছেন দেখতে পাওয়া যায় না। রাজকুমারীর একখানি হাত নিজ হাতে ধারণ করলেন। কোমল করপল্লব চন্দ্রকান্তর মুষ্টিমধ্যে পিষ্ট হতে থাকে। চন্দ্রকান্ত বললেন,—আত্মনিপীড়ন শাস্ত্র-বহির্ভূত জানবেন।

—যে সমাজচ্যুত, তার কাছে শাস্ত্রের মূল্য কি? সংসারে যার ঠাঁই হয় না, তেমন নারীর জীবনের কোন দাম নাই। মরণই তার মঙ্গলের। বিন্ধ্যবাসিনী কথা বলেন যেন ব্যথাতুর কণ্ঠে। তাঁর কথার সুরে বেদনা পরিস্ফুট। রাজকুমারীর মুখ অদৃশ্য, শুধু কথা শোনা যায়। মুখনিঃসৃত কথা।

হাতে হাত। চন্দ্রকান্তর যুক্তি টিঁকে না। শাস্ত্রের নজীর তোলায় কোন ফলোদয় হয় না।

রাজকন্যা বলেন,—আমাকে এখন আর স্পর্শ না করেন, এই অনুরোধ। পরিচারিকা যশোদা যদি দেখে তো বিপদে পড়বো আমি। আমার দুর্নাম

রটনা করবে সে। জমিদার মশায়ের কাছে খবর চলে যাবে, তখন আর রক্ষা থাকবে না।

কণ্ঠস্বর নামালেন চন্দ্রকান্ত। মৃদুকণ্ঠে বললেন,—আমি যে কোন মতেই মতি স্থির করতে পারছি না। ভোগ না ত্যাগ, কাকে আশ্রয় করি?

কথা খুঁজে মেলে না যেন। রাজকুমারী নীরব থাকেন। চন্দ্রকান্তর বজ্রমুষ্টিতে বিন্ধ্যবাসিনীর কোমল হাত বন্দী। হঠাৎ নারীকণ্ঠের অট্টহাসিতে দু'জনেই চমকে উঠলেন যেন। চন্দ্রকান্ত ইদিক-সিদিক দেখলেন, কোথায় যেন অদৃশ্য শ্বেত মূর্তি অট্ট হাসতে থাকলো। আঁচল নামিয়ে বিন্ধ্যবাসিনীও দেখলেন। অস্ফুটস্বরে বললেন,—কে:?

অট্টহাসি থেমেও যেন থামে না। নারীকণ্ঠ হাসতে হাসতে বললে,—আমি তোমার সতীন। একা একা মজা লুটতে দেবো না তোমাকে।

চন্দ্রকান্ত আর বিন্ধ্যবাসিনী—দু'জনেই হতবাক যেন। অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে দেখছেন তাঁরা ইতি-উতি। কিন্তু কারও দেখা মিলছে না।

রাজকন্যা স্বগত করলেন,—আনন্দকুমারীর কণ্ঠস্বর কি?

চন্দ্রকান্ত বললেন,—হ্যাঁ তাইতো বটে। চৌধুরাণী।

কক্ষের বাহির থেকে কথা শোনা যায়। অট্টহাসি থামিয়ে কে যেন বললে, —রাত্রি শেষ হয়েছে, খেয়াল আছে? দিবালোকে মিলনের অবকাশ নেই রাজকন্যা!

বুকের মাঝে কম্পন লাগে বিন্ধ্যবাসিনীর। রাজকন্যা উঠে দাঁড়ালেন কক্ষের বাহিরে এসে দেখলেন বণিককন্যা চৌধুরাণীকে। আনন্দকুমারীর পরিধানে ছুবানো পীতবস্ত্র। রুক্ষকেশ। তার মুখবিম্বে কষ্টের কাতরতা যেন। রাজকুমারীর চোখে চোখে পড়তেই চৌধুরাণী গাম্ভীর্য অবলম্বন করেন। অভিমানী দৃষ্টি তার চোখে।

—কোথা থেকে এসেছো এই অসময়ে? সাগ্রহে শুধালেন রাজকুমারী। বললেন,—সত্য না মিথ্যা! আপন চক্ষুকে বিশ্বাস হয় না আমার।

আবার খিল খিল শব্দে অট্টহাসি ধরলো চৌধুরাণী। হাসতে হাসতে বললে,

—ব্যাঘাত ঘটিয়েছি আমি, বেশ বুঝেছি। কিন্তু আমি উপায়হীনা। আমোদরে এক বজরায় সুতানুটির রাজগৃহের ছোটকুমার তোমার জন্য অপেক্ষায় আছেন। অবিলম্বে তিনি তোমার সাক্ষাৎ চাইছেন।

—কে? আমার সহোদর কাশীশঙ্কর এসেছেন? ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন রাজকুমারী। বললেন,—তুমি তাঁর পরিচয় কোথা থেকে অবগত হয়েছো তাই শুনি?

খিল খিল হাসির বেগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। চৌধুরাণী সহসা কক্ষদ্বারের শিকলি তুলে দেয়। বলে,—চন্দ্রকান্ত, তোমার আর মুক্তি নাই জানাবে। কথার শেষে রাজকুমারীকে বললে,—হাঁ, তোমার অনুমান অভ্রান্ত। তুমি নদী তীরে চল এখন। সহোদর এসেছেন।

—পাঠন প্রহরী যদি বাধা দেয়? সভয়ে বললেন বিন্ধ্যবাসিনী। বললেন, —সুতানুটির সমাচার কিছু জানো চৌধুরাণী?

—না। জানার কোন প্রয়োজন দেখি না। হাসি থামিয়ে বললে চৌধুরাণী —চল, এখন নদী তীরে। বেলা অধিক হলে সমূহ বিপদ সম্ভাবনা আছে। পাঠান এখনও তাড়ির নেশায় বিভোর।

রুদ্ধ কক্ষ থেকে চন্দ্রকান্ত বললেন,—আনন্দ, দুয়ারের শিকল বন্ধন মোচন কর। আমাকে মুক্তি দাও।

—দেহে প্রাণ থাকতে আর মুক্তি নাই জানবে।

—আমার অপরাধ কি, তাই শুনি?

—অপরাধের বিচার পরে হবে। আপাততঃ থাক সে প্রসঙ্গ।

—তোমার নামে অখ্যাতি ছড়াবে যে!

—তার আর বাকী আছে কি! মান্দারণে কুলত্যাগিনী আনন্দকুমারীর নাম কেউ আর উচ্চারণ করে না, এজন্য আমি ভীত নই। কথার শেষে রাজকন্যার একখানি হাত ধরে প্রায় টানতে টানতে সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হয় রাণী। বলে,—ভয় নাই রাজকন্যা, মিথ্যা বলায় আমার অভ্যাস নাই। কুমারবাহাদুরের হাতে তোমাকে সঁপে না দেওয়া তক আমার আর কোন কাজ নাই।

—কুমারবাহাদুরকে কোথায় দেখলে তুমি? রহস্য ভাল লাগে না চৌধুরাণী! বিন্ধ্যবাসিনী ঈষৎ রোষের সঙ্গে বললেন! বললেন,—তুমি কোথায় ছিলে ক'দিন, ক'রাত্রি? কোথা থেকে এলে তাও জানি না।

—এত জানাজানিতে কি লাভ আছে? তুমি ত্বরায় চল। মান্দারণের মানুষ জানলে কার্য্য বিফল হবে। পাঠান প্রহরীর বন্দুককে বড় ডরাই আমি।

—সত্য বলছো কি? না অন্য কোন অভিসন্ধি আছে তোমার? ক্ষণেক স্থির দাঁড়িয়ে আনন্দকুমারী বললে,—মিথ্যা আমি বলি না। অভিসন্ধি, তুমি রক্ষা পাও। তোমার মুক্তি হোক এই ভগ্নদেউল থেকে! শৈলেশ্বরের দিব্য গালছি।

আর বাক্যব্যয় করলেন না রাজকুমারী। চৌধুরাণীকে অনুসরণ করলেন ভীতচকিত পদক্ষেপে। বিন্ধ্যবাসিনী লক্ষ্য করলেন, আনন্দকুমারীর দুই বাহুতে, কণ্ঠে ও কপোলে কালসিটার কৃষ্ণাভ চিহ্ন। মনে মনে ভাবলেন ম্লেচ্ছর প্রেমালিঙ্গনে হয়তো এই দশা চৌধুরাণীর। অনুমান ভিত্তিহীন নয়। বিন্ধ্যবাসিনী নারী, তাই হয়তো দেখেই চিনে নিয়েছেন, অনুরাগের রেখা চৌধুরাণীর দেহে। ম্যালেটের প্রীতি-পরিচয় আঁকা রয়েছে এখনও।

নদীর তীরে বালুময় পায়ে-চলাপথ ধ'রে আনন্দকুমারী। কিছুদূর পৌঁছে তিনি দেখলেন অদূরে একটি বজরা অপেক্ষা করছে। বজরা গাত্রে চিত্র বিচিত্রিত শিল্পকার্য্য।

—ঢিমেতালে নয় তাড়াতাড়ি চল। দিনের আলোয় ভয় আর বিপদের সম্ভাবনা আছে। কথা বলতে বলতে আনন্দকুমারী খঞ্জনা পাখীর মত ছুটতে থাকে যেন লাফ দিয়ে দিয়ে।

রাজকন্যা পা চালালেন। ফণিমনসার কাঁটা পথের এখানে সেখানে। কণ্টক উপেক্ষা করে চললেন তিনি।

বজরার কাছাকাছি যেতেই চৌধুরাণী বললে,—কি গো রাজার দুলালী, বিশ্বাস হয়েছে?

বজরার পাটাতনে কুমার কাশীশঙ্কর। সাহোদরাকে হাত ধরে তুললেন বজরায়। তাঁর মুখে জয়ের হাসি যেন। কাশীশঙ্কর বললেন,—আয় বিন্ধ্যবাসিনী

রাজকন্যা কি স্বপ্ন দেখেছেন। কেমন যেন আচ্ছন্ন তিনি। সিক্তকণ্ঠে বললেন,—কোথায় যাবো ভাই ?

রাজমাতার কাছে। সুতানুটিতে ফিরে যাবি। কাশীশঙ্কর বললেন খুশী মনে। বললেন,—রাজমাতা তোর জন্য আহারনিদ্রা ত্যাগ করেছেন।

স্বামীর ঘর। বিন্ধ্যবাসিনী যেন অসহায়ের কথা বলেন। বললেন,—তিনি কি মনে করবেন ? কথার শেষে অগ্রজকে প্রণাম করেন রাজকন্যা।

কাশীশঙ্কর সহাস্যে বলেন,—চুলোয় যাক স্বামীর ঘর। কৃষ্ণরামকে ত্যাগ করতে হবে। সাতগ্রামকে ভুলতে হবে তোকে।

তখনও হাসছে চৌধুরাণী। নদীতীরে তার খিল-খিল হাসি মুক্তাবলীর মত ছড়িয়ে পড়ছে যেন।

কুমারবাহাদুর আবার বললেন—এসো আনন্দকুমারী, তুমি এসো। বজরায় ওঠ।

হাসি থামিয়ে অনন্দকুমারী বললে,—না কুমারবাহাদুর! আমাকে মার্জ্জনা করুন। আমি মান্দারণেই থাকি। আপনার অশেষ কৃপা, কখনও ভুলবো না! জানবেন।

বজরা চঞ্চল হয়ে উঠলো যেন। তীর থেকে মধ্যজলের দিকে বজরা এগোতে থাকে ধীরে ধীরে।

কাশীশঙ্কর দেখলেন নিষ্পলক দৃষ্টিতে, বিদ্যুতের বেগে ছুটতে ছুটতে ফিরে চলেছে আনন্দকুমারী। তার চলার গতিতে শুষ্ক পলি-বালি উড়ছে। কুমার-বাহাদুরের চোখের পলক পড়ে না যেন। তিনি দেখলেন, যেন এক অভি-সারিকা ছুটে চলেছে দয়িতের সন্ধানে।

জলে বজরা এগিয়ে চলেছে ধীর গতিতে। তীরে চৌধুরাণী ছুটছে যেন তুরঙ্গীর মত। অভিসারিকা ছুটছে—কাশীশঙ্করের অনুমান মিথ্যা নয়। রাজ-কন্যার চোখে যেন স্বপ্নঘোর নামে।

আশ্রমে যেন শোকের ছায়া।

আচার্য্য কোথায় গেছেন কেউ জানে না। নিরুদ্দেশের পথে। কিশোর ব্রহ্মচারীর দল বিনিদ্রায় রাত্রি যাপন করেছে, প্রতীক্ষায় থেকেছে। দ্বিধাগ্রস্থ মনে এখানে সেখানে সন্ধান করছে, কিন্তু ফলাফল হয় না। তিনি জীবিত, না মৃত, মান্দারণে আছেন, না গেছেন দেশান্তরে, এই প্রসঙ্গের জল্পন-কল্পনা চলতে থাকে।

আকাশের নক্ষত্রমণ্ডল এখনও দেখা যায়। কজন ব্রহ্মচারী আসনে এক স্থানে দণ্ডায়মান, সূর্য্যোদয় পর্যন্ত গায়ত্রী জপ করবেন, প্রাতঃসন্ধ্যার উপাসনায় রত। যাঁদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত, যাঁরা চিন্তাগ্রস্ত তাঁরা নির্জ্জনে গেছেন। নদীজল সমীপে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম সমাপনান্তে তাঁরা অনন্যমনে প্রণবব্যাহৃতি-সহকৃতি গায়ত্রী অধ্যয়ন করেছেন। দেখতে দেখতে নক্ষত্ররাজি অদৃশ্য হয়, সূর্য্যোদয়ের আভা দেখা দেয় আকাশের পূর্বাঞ্চলে।

চন্দ্রকান্ত অনুদার নয়; ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে শিক্ষাদান করেন। জাতি-বৈষম্য তেমন মানেন না। তাই আশ্রমস্থ ব্রহ্মচারীদের মধ্যে কারও কৃষ্ণসার চর্ম্মের উত্তরীয়, শণবস্ত্রের অধোবসন,—কারও মৃগচর্ম্মের উত্তরীয় ও ক্ষৌমবসন, কারও কারও বা ছাগচর্ম্মের উত্তরীয় ও মেষলোমের অধোবাস। প্রথমোক্তগণ ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয় ক্ষত্রিয় এবং শেষোক্তগণ বৈশ্য ব্রহ্মচারী। ব্রাহ্মণের সুখস্পৃশ্য মুঞ্জময়ী মেখলা, ক্ষত্রিয়ের মেখলা মৌর্ব্বীময়ী ধনুকছিলার ন্যায় ত্রিগুণিত, বৈশ্যের শণতন্তুর মেখলা। ব্রাহ্মণের হাতে কেশ পর্য্যন্ত প্রমাণ বিল্ব অথবা পলাশের দণ্ড। ক্ষত্রিয়ের ললাট পর্যন্ত বট কিম্বা খদিরের দণ্ড, বৈশ্যের নাসিকা পর্যন্ত পীলু বা উডুম্বরের দণ্ড। ভিক্ষার প্রারম্ভে সূর্য্য-উপাসনা করণীয়, অতঃপর অগ্নি প্রদক্ষিণ এবং তদন্তর ভিক্ষার্থে যাত্রা।

মান্দারণের পথে পথে ব্রহ্মচারীদের সুললিত কণ্ঠ শোনা যায়। দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হন তাঁরা। ব্রাহ্মণ বলেছেন, ভবতি ভিক্ষং দে। ক্ষত্রিয়গণ বলেছেন, ভিক্ষাং ভবতি দেহি। বৈশ্যরা বলেছেন,—ভিক্ষাং দেহি ভবতি।

কোথায় আচার্য্য চন্দ্রকান্ত, কে জানে? বনচারী বাঘের গর্ভে গেছেন হয়তো। বৌদ্ধতান্ত্রিকেরা কি হত্যা করেছে তাঁকে? ব্রহ্মচারীর দল তবু আশা ত্যাগ করেন না। আশায় থাকেন।

একজন ব্রহ্মচারী বললেন চুপি চুপি,—আচার্য্য পাতক হয়েছেন। জমিদার-গৃহে গতায়াত আছে তাঁর। সপ্তগ্রামের জমিদার পত্নীর সহ তাঁর কি সম্পর্ক কে জানে! অন্যান্য শিষ্যবর্গ কানে হাত চাপালেন তৎক্ষণাৎ। আচার্য্যের দোষ কথন বা নিন্দা শ্রুতিগোচর না হয় যেন।

—ক্ষান্ত হও, গুরুভ্রাতা। এমন কথা উচ্চারণ করাও মহাপাপ। শিষ্যদের একজন বললে সভয়ে। নিরুদ্দিষ্ট আচার্য্যের সম্মান-রক্ষার্থে দুই কর কপালে স্পর্শ করলো।

কিন্তু বিরত হয় না নিন্দাকারী। আবার বললে সে,—স্বভাবো এষ নারীনাং নরানামিহ দূষণম্। জমিদারপত্নী আমাদিগের আচার্য্যকে তুষ্ট করতে চান কি?

—গুরুনিন্দা অনুচিত, অশাস্ত্রীয়। গুরুর পরীবাদে মৃত্যুর পর নিন্দুক গর্দ্দভযোনি প্রাপ্ত হয়, নিন্দাকথনে পরজন্মে কুক্কুর হয়, তা কি জ্ঞাত আছো?

এই প্রসঙ্গ পরিত্যক্ত হয়। কথক এবং শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই নীরব হয়। গাছে গাছে ঘুমভাঙ্গা পাখীর কলকাকলী ব্যতীত অন্য কোন শব্দ আর শোনা যায় না। ভিক্ষাপ্রার্থী ব্রহ্মচারী যে যার পথ ধরে।

অতিক্রান্ত-প্রায় ব্রাহ্মমুহূর্ত। রাত্রি ও দিনের সন্ধিক্ষণে আমোদরের জলে আলো-আঁধারের প্রতিচ্ছায়া খেলছে। নদীর উপকূলে বৃক্ষশ্রেণী ও বনাঞ্চলে এখনও অন্ধকারে লিপ্ত হয়ে আছে। পূর্বাকাশে লাল সিঁদুর ছড়িয়েছে যেন। আকাশভেদী মন্দিরচূড়ায় আর মসজিদ-মিনার শীর্ষ স্পষ্ট দেখা যায় না। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয় যেন কুয়াশা জাল বিস্তার করেছে।

—ভবতি ভিক্ষাং দেহি।

মান্দারণের ধূলিধূসর পথে পথে কিশোরকণ্ঠের প্রার্থনা পাখার কলগানের মত শোনায় যেন। গৃহস্থের দ্বারপ্রান্ত থেকে ডাক দেয় তারা নাতিউচ্চ মধুর কণ্ঠে। অন্নদান করেন গৃহবধূরা, ফলমূল শাকসজী। তৈল আর ঘৃত। লবণ, মিছরী।

আশ্রম যেন শূন্য, আচার্য্যের অভাবে। শিষ্যবর্গের মনের সুখশান্তি ঘুচে গেছে যেন; পথ চলায় অকারণ ক্লান্তি দেখা দিয়েছে। ম্লানমুখ সকলের, ভগ্ন-মনের ছায়া ফুটেছে মুখমুকুরে। চোখের তারকা অচঞ্চল আজ।

তিনি কোথায়! শিষ্যদের চোখ সাগ্রহে সন্ধান করে পথপ্রান্তে, বনের অঞ্চলে। সেই তেপান্তরের দিকে দৃষ্টি চালিত হয়, দূরদূরান্তরে। কিন্তু বৃথাই অন্বেষণ।

আমোদরের জল দিনরাত্রি মানে না। কুলু-কুলু রবে হাসতে হাসতে ভাসছে সদাক্ষণ। গঙ্গামুখে ছুটে চলেছে ঢেউয়ের দোলায়, বিপুল বেগে। নদীর অন্য তীরে রাঙামাটি গ্রাম। মিথ্যা নামের বড়াই তার, মাটির বর্ণ রাঙা নয়, ঘন কালো। রাঙামাটির সজ্বারামে জয়ঢাকের বাদ্য ধরলো হঠাৎ। বাতাস-কাঁপা গুরু-গুরু ধ্বনি, নদীর অন্য তীর থেকে—মান্দারণে প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

আমোদরের জল থেকে উঠে একটি মৎস্যকন্যা, যেন ডানার ভরে উড়ে চলেছে। বালি আর পলিমাটির নরমেও যেন সে স্পর্শকাতর,—দূর থেকে দেখায় যেন উড়ন্ত প্রজাপতি উড়তে উড়তে চলেছে।

বণিককন্যা আনন্দকুমারী! আঁচল উড়িয়ে ছুটছে বিদ্যুতের বেগে। বিজলী-রেখা খেলছে যেন ভোরের বেলাভূমিতে। তার মুক্ত কেশ উড়ছে পিছনে ধূমকেতুর মত। পায়ের তলে মনসার শুষ্কশাখা, কঙ্কর, প্রস্তর। পথের কাঁটা অগ্রাহ্য করে আনন্দকুমারী। জীবন-মরণ সমস্যা এখন তার। অন্ধকার ভবিষ্যৎ।

মরুভূমিতে মরুদ্যান দেখতে পেয়েছে যেন। অকূলে কূল দেখেছে। চৌধুরাণী দ্রুতবেগে ধাবমানা, কোন দিকে দৃক্‌পাত নেই তার। আসমান-দীঘির তীরে উঠে ক্ষণেক অপেক্ষা করে। হাঁফ ধরে হয়তো অনভ্যাসে। আবার ছুটতে থাকে ক্ষিপ্রগতিতে। জমিদার কৃষ্ণরামের ভগ্ন-দেউলে প্রবেশ করে। বিদ্যুতের শিখা যেন চকিতে অদৃশ্য হয়।

আনন্দকুমারীর পদক্ষেপের শব্দে বিচরণশীল উরগজাতি সভয়ে ছুটাছুটি করতে থাকে। ঘরের কবাটসমূহ চোরে কবে চুরি করেছে। চৌধুরাণী থমকে

থাকে যেন, একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সোপানশ্রেণীর দিকে অগ্রসর হয় ধীরে ধীরে। পদধ্বনি যেন না শোনা যায়। পাঠানপ্রহরীর নজরে পড়লে আর রক্ষা নেই আজ। একেই জমিদারপত্নীর বন্দিত্ব মোচন হয়েছে প্রহরীর অজ্ঞাতে। তিনি এখন পলাতকা।

পা টিপে টিপে দ্বিতলে উঠলো আনন্দকুমারী। কেবল প্রহরী নয়, রাজকুমারীর পরিচারিকা আছে নিদ্রামগ্না। যদি জেগে ওঠে সে! কুলবধূকে দেখতে না পেয়ে পরিত্রাহি চীৎকার করবে সে। লোক জড় করবে হয়তো গলা-ফাটানো কান্নায়।

বদ্ধঘরের শিকল অতি সন্তর্পণে মুক্ত করে চৌধুরাণী। কক্ষের মধ্যে বন্দী চন্দ্রকান্ত। নতমস্তকে বসে আছেন! দেখে মনে হয়, গভীর চিন্তাকুল তিনি।

প্রথমে মুখ টিপে টিপে হাসতে থাকে আনন্দকুমারী। পরিহাসের হাসি যেন তার মুখে। মুখাকৃতি ক্লেশে কাতর। এক রাশ রুক্ষকেশ পৃষ্ঠে আলুলায়িত। চোখের কোলে কালিমা। বস্ত্রাঞ্চল ভূমিতে লুণ্ঠিত।

—সুখের ব্যাঘাত হয়েছে না কি? হেসে হেসে কথা বললে চৌধুরাণী। ফিসফিসিয়ে বললে,—চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা।

—চৌর্য্যবৃত্তিতে প্রবৃত্তি নাই আমার। চন্দ্রকান্ত বললেন কেমন যেন নিরাশার সঙ্গে। বললেন,—তুমি কোথা থেকে আসছো এই অসময়ে? আপন চক্ষুকে যেন বিশ্বাস করতে পারি না।

মুখে আঁচল চেপে খিলখিল হাসি ধরলো·আনন্দকুমারী। হাসতে হাসতে বললে,—এসো, এই স্থান পরিত্যাগ করি। দাসীর ঘুম ভাঙলে বিপদের সম্ভাবনা আছে। কথা বলতে বলতে চৌধুরাণী কয়েক পা এগিয়ে চন্দ্রকান্তর একখানি হাত ধরলো। বললে,—চৌর্য্যবৃত্তিতে প্রবৃত্তি নেই, এমন কথা শুনিয়ে আর হাসিও না। কথা বলতে বলতে ইতি-উতি দেখলো একবার। আবার বললে,—জমিদারণীর মন কে চুরি করেছে তাই শুনি?

অধোবদন হলেন চন্দ্রকান্ত। সলজ্জায় বললেন,—আমাকে মার্জনা কর চৌধুরাণী।

সহসা ক্রোধের লাল আভা ফুটলো আনন্দকুমারীর মুখে। চোখ ছলছলিয়ে ওঠে। ওষ্ঠাধর থরথর কাঁপতে থাকে। কথার সুরের পরিবর্তন হয় যেন। চৌধুরাণী বললে,—তোমাতে আমার মন-দেহ সমর্পণ করেছি জানবে। কিন্তু তুমি আমাকে বঞ্চিত কর কেন জানি না! ঘোর বিপদে ঠেলে দিয়েছিলে আমাকে। বহুকষ্টে আমি ঐ ম্লেচ্ছ সাহেবের কবল থেকে পালিয়ে এসেছি।

চন্দ্রকান্ত বললেন,—আমি এক্ষণে কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

অশ্রুধারা আঁচলে মুছলো আনন্দকুমারী। কেমন যেন বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললে,—অবিলম্বে এই স্থান ত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়। চল আমরা যাই। অধিক বিলম্বে বিপদের সম্ভাবনা আছে। একেই রাজকন্যা নেই। পাঠানের হাতে বন্দুক আছে, ভুলে যাও কেন?

—কোথায় যাবে? প্রশ্ন করলেন চন্দ্রকান্ত। বললেন,—কোথায় আমাদের স্থান হবে?

—তা জানি না। আপাততঃ এই ভিটা ত্যাগ করাই উচিত।

—গন্তব্য জানি না, কোথায় যাই!

—চল যেদিকে দু'চোখ যায় সেদিকে যাই। কথার শেষে কক্ষ থেকে বেরিয়ে পড়লো চৌধুরাণী। তাকে অনুসরণ করেন চন্দ্রকান্ত। যেন ছায়ার মত অনুগামী তিনি। আনন্দকুমারী যেন কি এক বিপদ-ভয়ে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ভোরের আলো স্বচ্ছ হওয়ার আগে এই তল্লাট ছেড়ে যেতে হবে। মান্দারণের মানুষ জাগবে ঘুম থেকে, দেখতে পাবে তাদের গ্রামের মুখপোড়া কলঙ্কিনীকে। চৌধুরাণী সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকে তরতরিয়ে, শব্দহীন পদক্ষেপ তার।

ফুল-ফোটানো, পাতা-কাঁপানো বাতাস চলেছে মৃদুমন্দ। ঘাসের বনে ঢেউ উঠছে থেকে থেকে। বৈশাখী-ফুলের গন্ধে বাতাস যেন ভারাক্রান্ত। আসমান দীঘির কাকচক্ষু জলে ক্ষীণ প্রবাহ খেলছে।

দীঘির তীরে এসে স্বস্তির শ্বাস ফেললো চৌধুরাণী। খানিক দাঁড়িয়ে পড়লো। হাঁফিয়ে হাঁফিয়ে কথা বললে। বললে,—তোমার মনুষ্যত্ব ঘুচে গেছে, অস্বীকার করবে? রাজকুমারী তোমার ব্রতভঙ্গ করলেন না কি?

চন্দ্রকান্ত নিরুত্তর। হতবাক যেন। হতাশ চাউনি তাঁর চোখে। এলো-মেলো হাওয়ায় তাঁর উত্তরীয় উড়ছে।

আবার কথা বললে আনন্দকুমারী। বললে,—তোমার আশায় বাদ সাধলুম, কিন্তু আমি নিরুপায়।

—চরিত্র আর ব্রত থেকে আমি বহুকাল ভ্রষ্ট হয়েছি, যতদিন তোমার সংস্পর্শে এসেছি। চন্দ্রকান্ত বললেন দুঃখকাতর স্বরে। বললেন,—আশ্রম আর শিষ্যবর্গের জন্য আমি চিন্তিত হই।

আনন্দকুমারী বললে,—গৃহস্থাশ্রমধর্ম পালন কর, সবই রক্ষা পাবে।

বিরক্তির সঙ্গে চন্দ্রকান্ত বললেন,—না তা হয় না। আশ্রমে আর নয়। আমি ধর্মচ্যুত হয়েছি।

—যাই হোক, তোমার আর মুক্তি নেই জানবে। আমার মরণ না হওয়া পর্য্যন্ত তোমাতে আমাতে বিচ্ছেদ হবে না। কথার শেষে এক ঝলক হাসলো চৌধুরাণী। বললে,—এখন চল আমাদের গৃহে। মা যেমন বলবেন তেমন হবে। কথা বলতে বলতে পা চালায় সে। হাসির জের টেনে বললে,—রাজকন্যের স্মৃতি এখন ভুলে যাও, আর নয়। তিনি তো মান্দারণ ত্যাগ করেছেন। সহোদরের সঙ্গে সুতানুটি যাত্রা করেছেন।

মুখে বিস্ময় প্রকাশ করলেন চন্দ্রকান্ত। বললেন—মান্দারণ ত্যাগ করেছেন!

—হাঁ গো হাঁ। আনন্দকুমারী হেসে হেসে কথা বলে। বললে,—মনে ব্যথা পাও না কি! বিরহের জ্বালা ধরছে বুকে!

মনোভাব আর প্রকাশ করেন না চন্দ্রকান্ত। বললেন,—ইতিমধ্যে তোমার মাতৃদেবীর সহ আমার আলাপ হয়েছে। তিনিও বলেছেন, আমি যেন তোমাকে গ্রহণ করি, তবেই তিনি আমাদের উভয়কে স্থান দেবেন তাঁর গৃহে।

নদীর তীরে পায়ে-চলা-পথ ধরে এগিয়ে চললো মেয়ে। চন্দ্রকান্ত তার সঙ্গে

চললেন। আনন্দকুমারী বললে,—রাজকন্যার জীবন আমি রক্ষা করেছি। তাঁকে বজরায় পৌঁছে দিয়েছি, বাধাবিপত্তি মানিনি। নির্বিঘ্নে তারা মান্দারণ ছেড়ে গেছে।

লাল সূর্য্য পূর্ণাকারে দেখা দেন পূর্বাকাশে। দুধে-আলতায় পূর্ণ একখানি সুবৃহৎ থালা যেন। রৌদ্রালোকের বর্ণ যেন সোনালী। তেজহীন, কিন্তু দীপ্তিময়। নদী-তীরে পায়ে-চলা-পথ ধরে দুজনে চলতে থাকে। যেন দুজনের এক দেহ, যুগলমূর্তি। চন্দ্রকান্ত বাম বাহুতে চৌধুরাণীর কটিদেশ জড়িয়ে ধরেন। স্বগত করলেন আপন মনে,—গতস্য শোচনা নাস্তি—

নবারুণের স্বর্ণাভ আলো তাদের মুখে। চৌধুরাণীর মুখে তৃপ্তির হাস্যরেখা। চন্দ্রকান্ত কেমন যেন স্তব্ধ, বাক্যহারা।

বজরা তখন আমোদর থেকে গঙ্গায় পৌঁছেচে।

কাশীশঙ্করের বক্ষ স্ফীত হয়ে উঠছে থেকে থেকে, গর্ব আর আনন্দে। আবার কয়েক থলি অর্থ বিলিয়েছেন মাঝিদের। শ্রান্তি ক্লান্তি ভুলে মাঝিরা সোৎসাহে হাল টেনে চলেছে। গজেন্দ্রগমন নয়, ত্বরায় এগিয়ে চলেছে বৃহৎ বজরা।

বজরার এক কক্ষে বিন্ধ্যবাসিনী। বিষণ্ণতা ফুটেছে তাঁর মুখে। তিনি হয়তো ভাবছেন নিজের অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ। কিছু যেন স্থির করতে পারছেন না এখনও। স্বামীগৃহ ত্যাগ করেছেন; অতঃপর কপালে কি আছে কে জানে!

কুমার কাশীশঙ্কর কাছে আসেন। সহোদরার মাথায় হাত রাখেন সস্নেহে। ধীরকণ্ঠে বললেন,—ভগিনী, বৃথা চিন্তা কর কেন?

জমিদার কৃষ্ণরাম আর আচার্য্য চন্দ্রকান্তর মুখচ্ছবি ভেসে উঠেছে তাঁর স্মৃতিতে। মিহি মিষ্ট সুরে বিন্ধ্যবাসিনী বললেন,—ভাই, আমার কপালে আরও কি দুঃখ আছে জানি না। তুমি বলতে পারো, স্বামী-সম্পর্ক ত্যাগ করা উচিত না অনুচিত?

আকাশ-দিগন্তে দৃষ্টি প্রসারিত করলেন কাশীশঙ্কর। কয়েক মুহূর্ত ভাবালু থাকলেন। বললেন,—স্বামী যদি পঙ্গু অথর্ব্ব হয়, জন্মান্ধ কিম্বা বিকলাঙ্গ হয়, স্বেচ্ছাচারী অত্যাচারী হয়, তবে তাকে পরিত্যাগ করাই স্ত্রীর পক্ষে শ্রেয়ঃ। ইহাতে অধর্ম্ম নাই।

চোখে অশ্রুর প্লাবন দেখা যায়। রাজকুমারী সাশ্রুলোচনে বললেন,—কষ্টে কষ্টে আমি জর্জ্জরিত হয়ে আছি। সুখের মুখ কখনও দেখতে পাইনি সাতগ্রামে। স্বামীসোহাগ কাকে বলে জানি না। তাই সধবার ধর্ম্ম আর পালন করি না। সীঁথিতে সিঁদুর দিই না। নিরামিষ খাই।

—আজ থেকে তোমার মুক্তি হয়েছে জানিও। কাশীশঙ্কর কথা বলেন আর ভগিনীর রুক্ষ মাথায় হাত বোলাতে থাকেন সস্নেহে।

কৃষ্ণরামের জন্য নয়, চন্দ্রকান্তর জন্য মনে মনে বিরহতাপ ভোগ করেন বিন্ধ্যবাসিনী। মেঘাবৃত চাঁদ যেমন থেকে থেকে দেখা দেয়, তেমনই চন্দ্রকান্তর মুখখানি এত দুশ্চিন্তার মধ্যেও মাঝে মাঝে মনশ্চক্ষুতে দেখতে পান। তখন বক্ষ মধ্যে যেন এক অসহনীয় জ্বালা অনুভব করেন। কিন্তু প্রকাশ করতে পারেন না মুখে।

বিন্ধ্যবাসিনা চোখ মুছলেন আঁচলে। বললেন,—রাজমাতার পাছে কষ্ট হয় তাই এই যাত্রায় আমি অসম্মত হয়নি। কতদিন দেখতে পাই না মাকে। জ্যেষ্ঠ ভাই ভাল আছেন তো? রাজবধূদের সমাচার কি?

—সকলেই ভাল আছেন শারীরিক। কাশীশঙ্কর বললেন,—তবে তোমার জন্য সকলেই মানসিক অশান্তি ভোগ করছেন।

—শিবশঙ্কর আর বনবালা কেমন আছে?

—ভালই আছে! তারা এখন মাথায় বৰ্দ্ধিত হয়েছে।

—মহেশনাথ ভাই আর শিবানী?

—তারাও ভাল আছে। শিবানীর বিবাহ আসন্ন। তোমার আগমন প্রতীক্ষায় শিবানীর বিবাহনুষ্ঠান স্থগিত আছে।

কথার ফাঁকে ফাঁকে বজরার হাল টানার স্পষ্টতর ঝপ ঝপ শব্দ শোনা

যায়। গঙ্গার কুলু কুলু ধ্বনি কর্ণগোচর হয়। মাঝির দল সোৎসাহে হাল চালনা করছে। তাদের মেয়েকে ফিরে পেয়ে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে যেন।

—আনন্দকুমারীর সাহায্য কোন্ উপায়ে পাওয়া গেল, জানতে পারি?

কাশীশঙ্কর সহাস্যে বললেন,—সকলই বিধাতার ইচ্ছাধীন। গতরাতে আনন্দকুমারী আমার বজরার সমীপে এসে জীবন-রক্ষার প্রার্থনা জানায়। কে এক ম্লেচ্ছর অধীন থেকে পালিয়ে আসে সে। আমার সাহায্য চায়। আনন্দ অবলা নারী, তাই এই প্রত্যাখ্যান করতে পারি না।

—এখন আমাদের গন্তব্য কোথায়?

—সুতানুটি অভিমুখে। তবে যতক্ষণ না ত্রিবেণী আর সপ্তগ্রামের সীমানা অতিক্রম করতে না পারি, ততক্ষণ আমাদিগের বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার নাই।

কাশীশঙ্কর কেবল বহুদশা নয়, দূরদর্শীও বটে। তাঁর অনুমান মিথ্যা হয় না। পাঠান প্রহরী অশ্বপৃষ্ঠে যাত্রা করেছে রাজকন্যার অদর্শনে। তার কর্তব্যের অবহেলায় জমিদারপত্নী তার চোখে ধূলা দিয়ে পলায়ন করেছে। তীরের বেগে অশ্ব ছুটে চলেছে সপ্তগ্রামের পথে। জমিদার কৃষ্ণরামকে জ্ঞাত করাতে হবে সকল সমাচার। তিনি যদি কোন বিহিত করতে পারেন। শাস্তির ভয়, জীবননাশের ভয়—পাঠান প্রহরী অশ্ব ছুটিয়েছে শব্দগতি অপেক্ষা দ্রুততম গতিতে। তিলেক বিরতি নয়, অশ্ব ছুটে চলেছে ধূলি উড়িয়ে পিছনে। মৃত্যুর ভয় আছে, পাঠান তাই অশ্বকে পদাঘাত করছে থেকে থেকে। ঘর্মাক্ত হয়ে উঠেছে অশ্বগ্রীবা। মুখের ফেনা হাওয়ায় উড়ছে।

গড় মান্দারণ থেকে সপ্তগ্রামে যেতে হবে তাকে। কত দুর্গম পথ অতিক্রম করতে হবে, খাল-বিল-নালা পার হতে হবে। মনিব কৃষ্ণরামের কাছে জানাতে হবে এই অলৌকিক দুঃসংবাদ। অশ্বের পদশব্দ প্রতি মুহূর্তে দূর থেকে দূরান্তে পৌছায়। পথিকজন সভয়ে পথ ছেড়ে দেয়। পাঠানের পদাঘাতে গতিবেগ আরও যেন দ্রুত হয়। পাঠানের কপালে স্বেদবিন্দু সূর্যের আলোয় হীরার মত জ্বলছে!

মহাশ্বেতা আহার নিদ্রা প্রায় ত্যাগ করেছেন বললেই হয়। বিরহ বেদনা যত না হোক, দুশ্চিন্তার সীমা নেই তাঁর। ভেবে ভেবে কূলকিনারা খুঁজে মেলে না যেন। ডান চোখের পাতা কাঁপে, যখন তখন বুক দুর দুর করে, উঠে দাঁড়ালে চোখে আঁধার দেখেন—ভাগ্যে কি লেখা আছে কে জানে! কুমার-বাহাদুর কাশীশঙ্কর নেই, গৃহ যেন শূন্য হয়ে আছে। ঘর-সংসারে মন লাগে না তাঁর। বিপত্তারিণীকে ডাকেন মনে মনে,—তিনি যেন অক্ষত শরীরে ফিরে আসেন। তাযদি না হয় অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেবেন তিনি। বিষপান করবেন স্বেচ্ছায়। এ দেহ আর রাখবেন না কোন মতে। মনের সঙ্গোপনে ক্রোধের জ্বালা ধরে মাঝে মাঝে। রাজমাতা বিলাসবাসিনীর আর ননদিনী বিন্ধ্যবা-সিনীর প্রতি বিরূপ হন। কিন্তু মহাশ্বেতা যে নিরুপায়, তাঁর কথা আর প্রতিবাদ কে শুনছে!

—মাগো!

কুমারীকন্যা বনলতা ডাক দেয় ভয়ের সুরে। মহাশ্বেতার পাশটিতে বসে থাকে পোষা বিড়ালের মত। মা গবাক্ষ-পথে দৃষ্টি চালিয়ে কি ভাবছেন অন্য মনে। মা নিরুত্তর, তাই আবার ডাক দেয় সে। বলে,—মাগো,—বাবামশাই কোথায় গেছেন মা? বনলতা শুধোয় সাগ্রহে। ড্যাবা ড্যাবা কাজলপরা চোখে ব্যাকুলতা যেন। আবার বললে সে,—যুদ্ধ করতে গেছেন?

মেয়ের মুখে হাত চাপেন মহাশ্বেতা। বললেন,—ছিঃ এমন কথা বলতে নেই। যুদ্ধ করতে যাবেন কেন! তিনি গেছেন তোমার পিসীকে আনতে।

—পিসীকে আনতে! কথা দুটি নিজেই আবার বলে, স্বগত করে। বলে,—পিসী কবে আসবে মা? কতদিন পিসীকে দেখিনি আমি।

—জানি না মা। কিছুই বলতে পারি না।

বনলতা থামতে জানে না যেন। বললে,—পিসী আমাকে খুব ভালবাসে। কত পুঁতি দিয়েছে তার ঠিক নেই। কত পুতুল দিয়েছে, পুতুলের সাজ দিয়েছে। কথা-বলার সঙ্গে পিসীর ভাবনায় আকুল হয় যেন। কথার শেষে সে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

বেলা বহে যায়, খেয়ালই নেই মহাশ্বেতার। সূর্য্যের তেজ বৰ্দ্ধিত হতে থাকে। গাছের শীর্ষ থেকে ভূমিতে নেমেছে রৌদ্ররেখা। বৈশাখের দিন, বাতাস তপ্ত হয়েছে। রসুই-ঘরে চুল্লী জ্বলছে অযথা। সংসারের কাজে মন লাগে না যেন। মহাশ্বেতা বললেন,—বনলতা, তুমি ব্রাহ্মণীকে ডেকে আনো। রান্নার কথা বলে দিই। আমি আর পারি না উনুন ধারে যেতে।

মনিবের হুকুমের অপেক্ষায় ছিল ব্রাহ্মণী, কক্ষের বাহিরের দালানে। ব্রাহ্মণী দুয়োরে দেখা দেয়। বলে,—এসো বনলতা, দুধ খাবে চল।

ব্রাহ্মণীর কথায় কান নেই বনলতার। মহাশ্বেতার চিবুক তুলে ধরে সে। আকুলকণ্ঠে মিনতি জানায় মাকে। বলে,—তুমি খাবে না মা?

—না মা, খেতে রুচি নেই আমার। মনটা ভাল নেই। মহাশ্বেতা কথা বলেন আকাশপানে চোখ ফিরিয়ে। বললেন,—যাও তুমি, খাওগে।

—উঁহু। অহম্মতি জানায় বনলতা। মার কাছে শিখেছে সে মাথা দুলিয়ে কথা বলতে। তার কোঁকড়া চুলের রাশি দুলতে থাকে। আবদারের সুরে বললে,—তুমি খাবে না, আমিও খাবো না।

স্নেহের আতিশয্যে হেসে ফেললেন মহাশ্বেতা। বললেন,—লক্ষ্মী সোনা আমার, যাও খেয়ে এসো, আমি গল্প শোনাবো তোমাকে। রূপকথা শোনাবো। ব্যঙ্গমা—ব্যঙ্গমীর গল্প বলবো।

নত মাথায় নিশ্চুপ বসে থাকে বনলতা। মুখে যেন তার গাম্ভীর্য্য ফুটেছে। দুই গালে দুটি টোল। ছোট ভুরু দুটিতে কুঞ্চন ধরেছে।

ব্রাহ্মণী বললে সহাস্যে,—মেয়ের কথাই থাক রাণীমাঠাকরুণ, দুজনেই খাও। খেয়ে দেয়ে যত পারো গল্প শোনাও মেয়েকে। আমার বনলতা কিছু অন্যায় বলেনি।

—আচ্ছা সৃষ্টিছাড়া মেয়ে বটে! ঈষৎ ক্রোধের সঙ্গে বললেন মহাশ্বেতা। যেন নাচার হয়েই বললেন,—তবে তাই হোক। জলখাবার এখানেই দিয়ে যাও ব্রাহ্মণী।

—আমার বনলতা তেমন মেয়েই নয়। ব্রাহ্মণী হেসে হেসে বললে। বললে,—কি রান্না হবে কিছুই তো বললে না রাণীমাঠাকরুণ।

খানিক স্তব্ধ থেকে মহাশ্বেতা বললেন,—তোমার যা মন চায় তাই কর। খাওয়ার মানুষ যখন নেই, তখন আর কার জন্যে কষ্ট করবে তুমি এটা সেটা রাঁধবে! খানিক থেমে বললেন,—ভাতে ভাত চাপিয়ে দাও মাছের রেলা এখন কটা দিন থাক।

—তুমি যেমন বলবে তেমন করবো। কথার শেষে ব্রাহ্মণী বিদায় হয়ে যায়। তার মুখের খুশীর হাসি কখন মিলিয়ে গেছে।

ব্রাহ্মণী সোনার রেকাবী এনে বসিয়ে দেয় সমুখে। রেকাবীতে খাবার সাজানো। মিষ্টি আর নোনতা। মোরব্বা আর আচার। বাদাম আর পেস্তা। দুধের ফুলকাটা বাটি। ব্রাহ্মণী বললে,—বেলা নেই আর, জলখাবারের পালা এখনও চুকলো না। কখন যে কি করবো তার ঠিক নেই। ওদিকে গোটা তিনেক উনুন জ্বলে যাচ্ছে।

দালান থেকে রাজপ্রসাদের প্রাচীর চোখে পড়ে। ছাদের চিলেকোটা দেখতে পাওয়া যায়। নাটমন্দিরের চূড়া। ছাদের শীর্ষে নিশানা উড়ছে হাওয়ার গতিতে। নিশানায় রাজবাহাদুরের ব্যক্তিগত পরিচয়ের আখর-চিহ্ন। কালীশঙ্কর হিন্দুমতের উপাসক, তাই পতাকার রঙ গৈরিক। আকৃতি ত্রিকোণ। বাঘের গর্জ্জন ভেসে আসছে ঐ দিক থেকে। মাঝে মাঝে চন্দনা, ময়না আর কাকাতুয়ার কলস্বর শোনা যায়। রাজার সখের চিড়িয়াখানার বাসিন্দারা সকালের আলো দেখে ডাকাডাকি করছে। বাঘ ক্ষুধার্ত হয়েছে হয়তো। এক খণ্ড কাঁচা মাংস না পাওয়া পর্যন্ত এই গর্জ্জন থামবে না।

চোখে ফিরিয়ে নিতে হয়। রাগ গোপন করতে হয়, বিরক্তি মুখে প্রকাশ করা যায় না। মহাশ্বেতা অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরালেন। রাজমাতার প্রতি বিরূপ হয়েছেন তিনি। শিশুর মত বায়না ধরেছেন যেন বিলাসবাসিনী। আকাশের চাঁদ চায় শিশু, রাজমাতা তাঁর একমাত্র কন্যাকে ফিরে চেয়েছেন।

—রাজকুমারীর বিয়ে না দিলেই পারতেন রাজমাতা। আপন মনে কথাগুলি বললেন মহাশ্বেতা। বললেন,—ঘর-জামাই রাখলেই পারতেন: এদিক ওদিক দুদিকই রক্ষা হতো।

—যা বলেছো রাণীমাঠাকরুণ। ব্রাহ্মণী সায় দেয়। বলে,—রাজকুমারী সোয়ামীর ঘর ছেড়ে এলে লোক হাসবে বৈ তো নয়। নানা জনে নানা কথা বলবে। সোমত্থ মেয়ে একা এক থাকলে দুর্নাম রটবে, নিন্দের কথা উঠবে। এক মুহূর্ত থেমে বুকভরা শ্বাস টেনে নেয়। আবার বলে,—আমাদের ছোটমুখে বড়দের কথা কথা শোভা পায় না। থাকতেও পারি না, মুখ ফসকে কথা কই।

—রাজমাতার খেয়ালে তোমাদের ছোটরাজাকে ঘরছাড়া হতে হয়েছে! মহাশ্বেতা ক্ষোভের সঙ্গে কথা বলেন। বললেন,—তিনি এখন সুস্থ দেহে ফিরলে বাঁচি। কপালে আমার কি আছে কিছুই জানি না।

ব্রাহ্মণী দুধের বাটি তুলে ধরে বনলতার মুখের কাছে। বলে,—ইষ্টকে ডাকো যত পারো, দুর্গানাম জপ কর। দুর্গতি মোচন হবে ঠিক।

সহসা যেন নজরে পড়লো মহাশ্বেতার, তিনি দেখলেন, রাজপ্রসাদের ছাদে এক পরম রূপবতী। শুভ্রবর্ণ, দীর্ঘনেত্র, আলুলায়িত কেশ। লাল পাড় সাদা ঢাকাই শাড়ীতে ঠিক প্রতিমার মত দেখায় যেন। কে? প্রথম দৃষ্টিতে চিনতে পারলেন না মহাশ্বেতা। খানিক দেখায় পর ঠাওরালেন, ছাদে বড়রাণী উমারাণী পায়চারী করছেন, যেন ভগ্নমনে। বিষাদের রেখা তাঁর ঢলঢল মুখে। বিশাল চোখে যেন হতাশা।

শিবানী নেই। কোথায় গেছে কে জানে। নিরুদ্দেশ শিবানী। কত খোঁজাখুঁজি হয়েছে, তবুও তার হদিশ মিললো না। শিবানী নেই, শশিনাথও নেই। রাজপ্রসাদের মুখে চুণ-কালি মাখিয়ে কোথায় ভেগেছে তারা দুটিতে। বড়রাণীর মনে লেগেছে। শিবানীকে তিনি মন থেকে সত্যিই ভালবাসেন, স্নেহ করেন। তার কোন মূল্য দিলো না শিবানী। যৌবনের জ্বালায় যা মন চাইলো করলো—পালিয়ে গেল স্বেচ্ছায়, স্বৈরিণীর মত। সকালের কাঁচা রোদের সোনালী আলো পড়েছে উমারাণার মুখে আর বুকে। বিস্তৃত ছাদের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত পায়চারী করেন তিনি।

জানালার ধারে গেলেন মহাশ্বেতা। খাবার নামমাত্র মুখে দিয়েছেন, দাঁতে

কেটেছেন। উপোষ ভঙ্গ হয়েছে, কিন্তু ক্ষুধা পরিপূর্ণ মেটেনি। খেতে আর সাধ নেই তাঁর।

চোখাচোখি হয় পরস্পরে। উমারাণী আর মহাশ্বেতা দৃষ্টি-বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গে দুইজনেই মৃদু হাসলেন। মহাশ্বেতা হাতছানি দেন, ডাকেন ইশারায়। বক্তব্য আছে কিছু, না জ্ঞাতব্য আছে—ডাকের ধরণ দেখে বোঝা যায় না।

—কি গো ছোট বৌ? কিছু বলবে না কি? ম্লানমুখে শুধোলেন বড়রাণী। পিঠের আঁচল টানলেন, বুকে জড়ালেন। কথা বললেন কেমন যেন স্তিমিত কণ্ঠে।

মহাশ্বেতা একবার ইদিক-সিদিক দেখলেন। বললেন,—শিবানীর সন্ধান মিলেছে? কোথায় গেল তারা ছুটিতে?

—জানি না দিদি, কোথায় যে গেছে। উমারাণী স্পৃহাহীন সুরে কথা বলেন। বুক-উঁচু পাঁচিলের ওদিকে তিনি, মুখখানি শুধু চোখে পড়ে। রাত্রি জাগরণের কালিমা আঁখির কোলে। রুক্ষ কেশরাশি বাতাসে উড়ছে। বললেন,—শিবানীর জন্যেই যত কষ্ট আমার। কত কাল একসঙ্গে কাটিয়েছি। মেয়েটা সাদাসিধা, কি করবে, কোথায় যাবে, কিছুই ভেবে পাই না।

—রাজমাতা কি বলছেন? রাজামশাই কি বলেছেন? সাগ্রহে বললেন মহাশ্বেতা। কণ্ঠে ব্যাকুলতা ফুটলো যেন।

দুঃখের হাসি হাসলেন উমারাণী। মুক্তার মত দাঁতের সারি, ক্ষণেক উঁকি দিয়ে আবার অদৃশ্য হয়। বড়রাণী বললেন,—রাজমাতা, সত্যি কথা বলতে কি এক রকম খুশীই হয়েছেন। বংশের কলঙ্কমোচন হয়ে গেল ভাবছেন। ঘাড় থেকে বোঝা নামলো তাঁর।

—বড়ঠাকুর কি বলছেন? রাজামশাই?

—তিনি আর কি বলবেন! সদাক্ষণ তিনি নেশায় বিভোর থাকেন। শুনে বললেন, যে গেছে তাকে যেতে দাও। শিবানী যদি এতেই খুশী হয়, তবে আর বাধা দিয়ে লাভ কি। আমাদের সমাজে কেউ কি ঠাঁই দেবে শিবানীকে! শুনে-শুনে কেউ কি ঘরে নেবে তাকে!

—যথার্থই বলেছেন বড়রাজা। উচিত কথাই বলেছেন। কে ঠাঁই দেবে শিবানীকে! মহাশ্বেতা ধীরে ধীরে বললেন কথাগুলি। যেন অনেক চিন্তার পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তিনি।

উমারাণী বললেন,—মনটা আমার মানতে চাইছে না। শিবানীকে যেন কিছুতেই ভুলতে পারছি না। সাহস বটে মেয়ের! বুকের পাটা আছে বলতে হবে।

মহাশ্বেতা বলেন,—শিবানীকে দেখছি চিরকালই সে বেপরোয়া, স্বাধীন-চেতা, মুখফোঁড়। যা মন চায় করে, যা মুখে আসে বলে।

—আমাদের ছোটরাজা কবে ফিরছেন, জানা কিছু? বড়রাণী বললেন অনুসন্ধানী স্বরে। বললেন,—তাঁর তরে চোখে আমার ঘুম নেই।

এপাসে-ওপাসে মাথা দোলালেন মহাশ্বেতা। মুখ ফুটে কথা বলতে পারলেন না, অধর কেঁপে উঠলো যেন অভিমানে। আবার একরাশ ভাবনার জটলা ধরে তাঁর মনে। পায়ের তলায় ভূমি যেন কাঁপতে থাকে। চোখ ছল-ছলিয়ে ওঠে। বুক দুরু দুরু করে ভয়ে।

—আমাদের ভাগ্যে কি আছে কি জানি! উমারাণী বললেন কাঁপা কাঁপা স্বরে। বললেন,—তিনিই তো এ বংশের সম্বল।

আকাশে চোখ তুললেন মহাশ্বেতা। নিরাশ চাউনি তাঁর চোখে আকাশের বুকে কি যেন লেখা আছে। অদৃশ্যলিপি পড়তে থাকেন যেন।

উমারাণী বললেন,—তিনি আমার ছেলেবেলার খেলার সাথী ছিলেন অমন মানুষ আমি আজ পর্য্যন্ত দুটো দেখলাম না। যেমন উঁচু মন, তেমনি স্বভাব। তাঁর দোষ একটা ধরতে পারবে না কেউ। একেবারে নিষ্কলঙ্ক তিনি। শিবানী তাঁর মন জয় করতে কম চেষ্টা করেছে! এ সব গোপন কথা, কাকেও ব'ল না। সাড়া না পেয়েই শিবানী এমন ধারার হয়ে গেল।

—আমি তা জানি বড়রাণী। কৃত্রিম হাসির সঙ্গে কথা বললেন মহাশ্বেতা বললেন,—তিনি আমাকে সবই বলেছেন, একদিন রাত্রে।

—হাঁ, তুমি যে তার রাজরাণী। উমারাণী ঈষৎ হাসলেন কথার শেষে।

লজ্জা বোধ করলেন মহাশ্বেতা। মুখখানি রাঙিয়ে উঠলো যেন। কি বলতে চেয়ে থামলেন তিনি। রাতরাণী কথাটি শুনে তাঁর মনের অন্তস্থলে যেন একটা চাপা আলোড়ন শুরু হয়। এ নামে আর কেউ ডাকে না তাঁকে, এ নাম আর কেউ উচ্চারণ করে না এই পৃথিবীতে। কাশীশঙ্করের দেহমূর্তি যেন-ভেসে ওঠে চোখের সমুখে। তাঁর সৌম্য মুখের প্রশান্ত হাসি মনে পড়ে। কানের কাছে গুনগুন করে কুমারবাহাদুরের কণ্ঠ, মিষ্টি নামের ডাক—রাতরাণী।

জলে সোনা জ্বলছে। ভাগীরথীর জলকল্লোলে কুমারবাহাদুরের বজরা ভেসে চলেছে ক্ষিপ্রগতিতে। হাল পড়ছে ছপাছপ, জলের পরে মাঝিদের কুচ-কাওয়াজ চলেছে যেন। বজরার পেছনে ঢেউ খেলছে দুই সারি। আশপাশে পানসী, ছিপ আর নৌকা ঢেউয়ের মত দুলছে আড়াআড়ি। গঙ্গার দুই তীরে দুর্ব্বাশয্যা। কোথাও ঘন ঘন ডাকে আকাশ কাঁপিয়ে এক জোড়া পাপিয়া উড়ে গেল। গঙ্গার তর তর রব সেই পাখীর ডাকে মিলিয়ে যায়।

বজরার ছাদে কাশীশঙ্কর। দিগন্তে চোখ রেখে বসে আছেন ফরাসে। তাকিয়ায় দেহ হেলানো, উর্দ্ধাঙ্গের ভার রেখেছেন বাম বাহুতে। গালে হাত দিয়ে কি যে ভাবছেন কে জানে? চোখের পলক পড়ছে না যেন। একাগ্র চিন্তায় কাশীশঙ্করের বিস্তৃত ললাটে কয়েকটি রেখা ফুটেছে। একজন ছাতা-বরদার রূপার ছত্র ধরেছে মাথায়। বজরার হেলাদোলায় ছত্রে ঝুলানো মুক্তার ঝালর দুলছে। ঝালরের মুখে মুখে চুনী আর পান্না।

—'ওঁ সবিতুর্বরেণ্যং!'

মধ্যে মধ্যে গ্রহমন্ত্র বলছেন কুমারবাহাদুর। মহামতি সূর্য্যকে প্রণাম করছেন। ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে পৈতার পাক জড়ানো, কর গণনা করছেন। গায়ত্রী জপ করছেন মনে মনে! মানসজপের রীতিই নাকি সর্ব্বাধিক ফলপ্রসূ।

মাঝিদের দলে আনন্দের হৈ হল্লা লেগেছে। হারানো মাণিক খুঁজে মিলেছে এতদিন পরে, বরাতে এখনও কত সুখ আছে কে বলতে পারে। রাজার মেয়ে রাজার ঘরে ফিরে চলেছে আজ— তাদেরই হেফাজতে। পুরস্কার

আর বকশিশের কথা ভাবছে মাঝিরা, টাকাকড়ি আর সোনাদানার স্বপ্ন দেখছে তারা।

—জগমোহন!

গম্ভীর কণ্ঠে ডাকলেন কুমারবাহাদুর। দিগন্ত থেকে চোখ ফিরালেন না। কপালের রেখাগুলি কিছুতেই যেন সোজা হতে চায় না। চোখের পলক যেন পড়ে না।

ফরাসে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলো জগমোহন। উঠে দাঁড়িয়ে বললে,—কুমারবাহাদুর!

—আমি কিন্তু খুশী হই নাই জগমোহন।

কেমন যেন অসন্তোষের সঙ্গে বললেন কাশীশঙ্কর। দিগন্ত থেকে এখনও দৃষ্টি ফিরালেন না। গম্ভীর মুখাকৃতিতে অনাসক্তি যেন।

—অখুশীর কারণ কি কুমারবাহাদুর? হাসি থামিয়ে বললে জগমোহন। সেও যেন গাম্ভীর্য্য ধরলো। কর্পূরের মত হাসি মিলিয়ে গেল তার মুখ থেকে। বললে,—কিছু ত্রুটি হয়েছে কি?

—অপহরণের দায়ে না পড়ি। ভয় হয় আমার, কৃষ্ণরামের অসাধ্য কিছু নাই। কথা বলতে বলতে কাশীশঙ্কর তাকিয়া ছেড়ে আসনপিঁড়ি হয়ে বসলেন। বললেন,—আইনের চক্ষে হয়তো আমার কৃতকার্য্য অপরাধের পর্য্যায়ে পড়বে। তখন কি হবে! কে আমাকে রক্ষা করবে!

—আমরা কুমারবাহাদুর অজ্ঞ অশিক্ষিত। লেখাপড়া শিখি নাই। জগমোহন বললে নতকণ্ঠে। আইনের কথায় সেও যেন ভীত হয়েছে! তার পেশীবহুল বলিষ্ঠ দেহের সকল শক্তি যেন লুপ্ত হয়ে গেছে। সে আরও বললে,—আইন-কানুন জানি না আমরা, বুঝি না। বুদ্ধিশুদ্ধি নাই আমাদের, গায়ের জোরে যা করতে হয় করি।

কণ্ঠস্বর নামিয়ে প্রশ্ন করলেন কাশীশঙ্কর। বললেন,—বিন্ধ্যবাসিনী কি করছে নীচে? কাঁদাকাটা করছে কি?

—হাঁ হুজুর। তিনি মুখে আঁচল চেপে বসে আছেন। হয়তো কাঁদছেন।

জগমোহন প্রায় চুপি চুপি কথা বললে,—তাঁকে হেথায় ডাকবো কি কুমার-বাহাদুর।

—না। সে যেমন আছে তেমন থাকতে দেও তাকে। স্বামীর ঘর ছেড়ে চলেছে সে, কাঁদাকাটা করবেই তো। কথা বলতে বলতে বেশ খানিক থেমে থাকলেন কাশীশঙ্কর। চিন্তাপ্লুত চোখে দেখলেন ইদিক সিদিক। বললেন,—জগমোহন, আমি বড় ক্ষুধার্ত বোধ করছি। কিছু আহার্য দেও, খাই।

—বজরা তীরে ভিড়াতে বলি তবে? কিছু টাটকা খাদ্য এনে দিই।

—না না। বজরা থামবে না আজ যতক্ষণ না সপ্তগ্রাম, বংশবাটী অতিক্রান্ত হয়। কাশীশঙ্কর হঠাৎ দৃঢ়কণ্ঠে বললেন। ক্ষীণ হেসে বললেন,—কৃষ্ণরামের চৌহদ্দীটা পার হতে দাও!

—তবে হুজুর কিছু মিষ্টি-মিঠাই সেবা করুন। বজরাতেই আছে।

—তাই লয়ে এসো। ক্ষুধা আর তৃষ্ণায় কাতর হয়েছি আমি। বিন্ধ্যবাসিনী যেন কোন মতে বিব্রত না হয়, খেয়াল রাখিও।

জগমোহন ছাদ থেকে এক লাফে পাটাতনে নামলো। বাঘ যেন শিকারে ঝাঁপ দিলো। বজরা দুলে উঠলো।

মাঝিদের উল্লাস ধরে না যেন। হাসাহাসি করছে তারা। তামাসা আর পরিহাস করছে পরস্পরে। বরাত খুলেছে তাদের। ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে চলেছে। রাজমাতা হারানো মেয়েকে ফিরে পেয়ে তাঁর ভাণ্ডার উজাড় করে দেবেন। দান করবেন কত কি, বিলিয়ে দেবেন তাঁর যতেক সঞ্চয়।

চোখ থেকে আঁচল নামিয়ে জলপ্রবাহ দেখছেন রাজকুমারী। কল কল রবে গঙ্গা ছুটে চলেছে মহাসাগরের দিকে। সসীম অসীমের দিকে ধেয়ে চলেছে, বন্দিদশা থেকে মুক্তিলাভের পর। হাসির পরিবর্তে কেন যে কান্না—জগমোহন ঠাওরাতে পারে না। দুঃখের তিমির রাত্রি শেষ হয়েছে, তবুও অশ্রুপাত কেন? সুখের কান্না কি!

মান্দারণের মায়া কাটাতে পারেন না রাজকন্যা। কতদিন ছিলেন সেই

ভগ্ন গৃহে! ললাটলিখন মেনে নিয়েছিলেন যেন। মান্দারণের আকাশ বাতা তাঁর সঙ্গে যেন মিতালী পাতিয়েছিল। আসমান-দীঘি আর আমোদর নদী সুগভীর জলরাশি দেখতে দেখতে কত কুক্ষণে মনের ব্যথা ভুলে যেতেন অবগাহন স্নানে দেহের জ্বালা শীতল করতেন। সর্ব্বোপরি চন্দ্রকান্তকে কাছে পেয়েছিলেন অভাবনীয়রূপে। ভেবেছিলেন, তাঁর অপূর্ণ আশা আকাঙ্ক্ষা কামনা বাসনা সাধ আর ইচ্ছা পরিপূর্ণ হবে হয়তো। কৃষ্ণরাম তাঁকে ত্যাগ করেছেন, চন্দ্রকান্ত হয়তো গ্রহণ করতেন। কৃষ্ণরাম যেন দ্বিপ্রাহরিক সূর্য্য তাঁর সংস্পর্শে ঝলসে যায় সব কিছু,—চন্দ্রকান্ত যেন সত্যিই চন্দ্রতুল্য, ঔজ্জ্বল্য আর দ্যুতি আছে, কিন্তু দাহিকা নেই তাঁর। কৃষ্ণরাম যেন আগ্নেয়গিরি চন্দ্রকান্ত যেন শান্ত স্নিগ্ধ গিরিনির্ঝর।

—সর্দ্দার, ত্রিবেণী বংশবাটী আর কত দূরে? ছাদ থেকে কাশীশঙ্কর বললেন। কথার শেষে গলা খাঁকরে উঠলেন আবার।

হাঁড়িয়ার নেশা ধরেছে মাঝিদের। কুমারবাহাদুরের কথায় প্রায় সকলেই সমস্বরে হেসে ওঠে। যেন কি এক পরিহাসের কথা শুনিয়েছেন তিনি সর্দ্দার-মাঝির অট্টহাসি যেন থামতে চায় না। হাসতে হাসতেই বললে,—রাজামহাশয় বেশ কিছু দূরে। যেতে যেতে দুপুর গড়িয়ে যাবে।

—হাত চালাও তোমরা। ঢিমে তালে চললে রাত্রিটাও কাবার হবে যে কাশীশঙ্কর হুকুমের সুরে বললেন। দিগন্তে চোখ ফেরালেন আবার। বললেন —আজ আর দেরী সহ্য হয় না যে! ঘর-সংসার ফেলে এসেছি, মনটা হাঁকপাঁক করছে।

—বজরাতো হুজুর পক্ষীরাজ ঘোড়া নয়। সর্দ্দার-মাঝি বললে সহাস্যে।

—তোমাদের মত এতগুলো মরদ থাকতে এত বিলম্ব হবে কেন?

—রাজামশাই, বিরাম বিশ্রাম নাই, হাত যে আর চলে না। কালঘা ছুটেছে আমাগোর। মুখে জল নাই, পেটে খাওয়া নাই, হাতে জো পাই না।

—জগমোহন! ডাক দিলেন কাশীশঙ্কর জোরালো কণ্ঠে।

ভাণ্ডারকক্ষ থেকে সাড়া দেয় জগমোহন। বললে,—হুজুর!

কাশীশঙ্কর বললেন,—দুধের ঘড়া একটা মাঝিদের দাও। দুগ্ধ পান রুক ওরা। বুকে বল পাবে তবে।

—কিছু কিছু মিঠাই দেওয়ার হুকুম হোক রাজামশাই। সর্দার খুশী য়ে বললে অনুরোধের সুরে।

—জগমোহন! মিঠাইয়ের চুবড়ী একটা দাও মাঝিদের!

—জয়, কুমারবাহাদুর কাশীশঙ্করের জয়! মাঝির দল সোল্লাসে জয়ধ্বনি ালে গঙ্গার বুকে। উড়ন্ত কাক চিল চমকে ওঠে এই কলস্বরে।

জগমোহন আহারের পাত্র বসিয়ে দেয় কাশীশঙ্করের সুমুখে। মিষ্টান্ন, ঙ্গাজল আর দুধের ঘটি। বলে,—সেবা হোক কুমারবাহাদুর। আমি তার্থ হই।

কাশীশঙ্কর চুপি চুপি শুধোলেন,—হাঁরে জগমোহন, বিন্ধ্যবাসিনী এখন কি রছে?

চুপচাপ বসে আছেন রাজকন্যা। যেন পাষাণের মূর্ত্তি। মুখে কথা ই তাঁর, আঁচল চাপা।

মান্দারণের মায়া কাটে না যেন। আনন্দকুমারী আর চন্দ্রকান্ত, যশোদা ার পাঠান-প্রহরী—কাকেও যেন ভুলতে পারেন না। মান্দারণের গাছ- লা, দীঘি-পুকুর, মন্দির, মসজিদ আর সঙ্ঘারাম—ছবির মত ভাসছে যেন াখে। রাজকুমারী তাঁর ভাগ্যকে মেনে নিয়েছিলেন। মান্দারণ ত্যাগ রতে হবে—কখনও ভাবতে পারেন নি। চন্দ্রকান্ত আর আনন্দকুমারী— জনের পথের কাঁটা সরে গেছে। রাজকন্যা আর নেই দুজনের মাঝে। াশায় পূর্ণ দীর্ঘশ্বাস। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বিন্ধ্যবাসিনী।

মৌনী হয়ে পাষাণ মূর্ত্তির মত অবিচল বসে আছেন বিন্ধ্যবাসিনী। অতীত ার ভবিষ্যৎ ভাবছেন। ফেলে আসা অতীত আর অনাগত, অজ্ঞাত ভবিষ্যৎ।

দুধ আর মিঠাইয়ের লোভে মাঝিরা আবার সোৎসাহে হাল চালনা করতে াকে। বজরার গতিবেগ কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হয় যেন। ছিপ, পানসি আর

ভগ্ন গৃহে! ললাটলিখন মেনে নিয়েছিলেন যেন। মান্দারণের আকাশ বাতাস তাঁর সঙ্গে যেন মিতালী পাতিয়েছিল। আসমান-দীঘি আর আমোদর নদীর সুগভীর জলরাশি দেখতে দেখতে কত কুক্ষণে মনের ব্যথা ভুলে যেতেন। অবগাহন স্নানে দেহের জ্বালা শীতল করতেন। সর্ব্বোপরি চন্দ্রকান্তকে কাছে পেয়েছিলেন অভাবনীয়রূপে। ভেবেছিলেন, তাঁর অপূর্ণ আশা আকাঙ্ক্ষা কামনা বাসনা সাধ আর ইচ্ছা পরিপূর্ণ হবে হয়তো। কৃষ্ণরাম তাঁকে ত্যাগ করেছেন, চন্দ্রকান্ত হয়তো গ্রহণ করতেন। কৃষ্ণরাম যেন দ্বিপ্রাহরিক সূর্য্য, তাঁর সংস্পর্শে ঝলসে যায় সব কিছু,—চন্দ্রকান্ত যেন সত্যিই চন্দ্রতুল্য, ঔজ্জ্বল্য আর দ্যুতি আছে, কিন্তু দাহিকা নেই তাঁর। কৃষ্ণরাম যেন আগ্নেয়গিরি। চন্দ্রকান্ত যেন শান্ত স্নিগ্ধ গিরিনির্ঝর।

—সর্দ্দার, ত্রিবেণী বংশবাটী আর কত দূরে? ছাদ থেকে কাশীশঙ্কর বললেন। কথার শেষে গলা খাঁকরে উঠলেন আবার।

হাঁড়িয়ার নেশা ধরেছে মাঝিদের। কুমারবাহাদুরের কথায় প্রায় সকলেই সমস্বরে হেসে ওঠে। যেন কি এক পরিহাসের কথা শুনিয়েছেন তিনি। সর্দ্দার-মাঝির অট্টহাসি যেন থামতে চায় না। হাসতে হাসতেই বললে,—রাজামহাশয় বেশ কিছু দূরে। যেতে যেতে দুপুর গড়িয়ে যাবে।

—হাত চালাও তোমরা। ঢিমে তালে চললে রাত্রিটাও কাবার হবে যে! কাশীশঙ্কর হুকুমের সুরে বললেন। দিগন্তে চোখ ফেরালেন আবার। বললেন,—আজ আর দেরী সহ্য হয় না যে! ঘর-সংসার ফেলে এসেছি, মনটা হাঁকপাঁক করছে।

—বজরাতো হুজুর পক্ষীরাজ ঘোড়া নয়। সর্দ্দার-মাঝি বললে সহাস্যে।

—তোমাদের মত এতগুলো মরদ থাকতে এত বিলম্ব হবে কেন?

—রাজামশাই, বিরাম বিশ্রাম নাই, হাত যে আর চলে না। কালঘাম ছুটেছে আমাগোর। মুখে জল নাই, পেটে খাওয়া নাই, হাতে জোর পাই না।

—জগমোহন! ডাক দিলেন কাশীশঙ্কর জোরালো কণ্ঠে।

ভাণ্ডারকক্ষ থেকে সাড়া দেয় জগমোহন। বললে,—হুজুর!

কাশীশঙ্কর বললেন,—দুধের ঘড়া একটা মাঝিদের দাও। দুগ্ধ পান করুক ওরা। বুকে বল পাবে তবে।

—কিছু কিছু মিঠাই দেওয়ার হুকুম হোক রাজামশাই। সর্দ্দার খুশী হয়ে বললে অনুরোধের সুরে।

—জগমোহন! মিঠাইয়ের চুবড়ী একটা দাও মাঝিদের!

—জয়, কুমারবাহাদুর কাশীশঙ্করের জয়! মাঝির দল সোল্লাসে জয়ধ্বনি তোলে গঙ্গার বুকে। উড়ন্ত কাক চিল চমকে ওঠে এই কলস্বরে।

জগমোহন আহারের পাত্র বসিয়ে দেয় কাশীশঙ্করের সুমুখে। মিষ্টান্ন, গঙ্গাজল আর দুধের ঘটি। বলে,—সেবা হোক কুমারবাহাদুর। আমি কৃতার্থ হই।

কাশীশঙ্কর চুপি চুপি শুধোলেন,—হাঁরে জগমোহন, বিন্ধ্যবাসিনী এখন কি করছে?

—চুপচাপ বসে আছেন রাজকন্যা। যেন পাষাণের মূর্ত্তি। মুখে কথা নাই তাঁর, আঁচল চাপা।

মান্দারণের মায়া কাটে না যেন। আনন্দকুমারী আর চন্দ্রকান্ত, যশোদা আর পাঠান-প্রহরী—কাকেও যেন ভুলতে পারেন না। মান্দারণের গাছ-পালা, দীঘি-পুকুর, মন্দির, মসজিদ আর সজ্বারাম—ছবির মত ভাসছে যেন চোখে। রাজকুমারী তাঁর ভাগ্যকে মেনে নিয়েছিলেন। মান্দারণ ত্যাগ করতে হবে—কখনও ভাবতে পারেন নি। চন্দ্রকান্ত আর আনন্দকুমারী—দুজনের পথের কাঁটা সরে গেছে। রাজকন্যা আর নেই দুজনের মাঝে। হতাশায় পূর্ণ দীর্ঘশ্বাস। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বিন্ধ্যবাসিনী।

মৌনী হয়ে পাষাণ মূর্ত্তির মত অবিচল বসে আছেন বিন্ধ্যবাসিনী। অতীত আর ভবিষ্যৎ ভাবছেন। ফেলে আসা অতীত আর অনাগত, অজ্ঞাত ভবিষ্যৎ।

দুধ আর মিঠাইয়ের লোভে মাঝিরা আবার সোৎসাহে হাল চালনা করতে থাকে। বজরার গতিবেগ কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হয় যেন। ছিপ, পানসি আর

নৌকা পথ ছেড়ে সরে যায়। দাঁড়ের জলে সোনা জ্বলছে না আর, রূপা জ্বলছে সূর্য্যের ছটায়। চোখে দেখা যায় না সেই ঔজ্জ্বল্য, চোখ ঝলসে যায়। দৃষ্টি ব্যাহত হয়।

চোখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখছেন কাশীশঙ্কর। সাধুরা তপস্যায় বসেছেন গঙ্গার জনহীন তীরে, বৃক্ষছায়ায়। হোমকুণ্ড জ্বলছে তাপসের। বাতাসে যেন গব্যঘৃত আর চন্দন দাহনের সুগন্ধ ভাসছে। ঘাটে ঘাটে গ্রাম্য বধূর দল আর স্নানার্থীরা ডুব দেয় আবক্ষ জলে। চোখ ফিরিয়ে নিলেন কাশীশঙ্কর। দেখবেন না। দেখতে নাই অসংবৃতাদের। পাপ হয় না কি দেখলে।

মান্দারণের চৌধুরীগৃহে উৎসব লেগেছে আজ। অপহৃতা চৌধুরাণী আবার ফিরে এসেছে সশরীরে। চৌধুরীগৃহিণী নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করতে পারলেন না একমাত্র কন্যাকে দেখতে পেয়ে। এ স্বপ্ন না সত্য! আনন্দ-কুমারী তার মাতৃবক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়লো, ডুগরে ডুগরে কাঁদলো খানিক। জলভরা চোখ তুলে বললে,—মা, আমাকে ফেলে দেবে না তো? ঘরে ঠাঁই দেবে খুশী মনে?

আনন্দাশ্রু চৌধুরী-গৃহিণীর চোখে। তিনি বললেন,—তুমি আমার হারানো মানিক, কোথায় ফেলবো তোমাকে! তাই কি পারি মা! কথার শেষে কানের কাছে মুখ এগিয়ে বললেন,—হ্যাঁরে আনন্দ, চন্দ্রকান্ত তোকে নেবে তো? ফেলে পালাবে না কি?

হেসে হেসে চৌধুরাণী বললে,—হাঁ নেবে, কথা দিয়েছে। পালাবে কোথায়?

—হাঁ ছাড়বি না তাকে। কর্তা দেশে ফিরলেই তোমাদের বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করবো। চন্দ্রকান্ত কোথায় রে?

—সদরমহলে আছে, বিশ্রাম করছে। ফটকের পাহারাওলাদের বলে দিয়েছি, আমার বিনা অনুমতিতে তাকে বেরুতে দেবে না। কথা বলা বলতে খিল খিল হাসি ধরলো চৌধুরাণী। তার স্বভাব-সুলভ হাসি।

—বেশ করেছিস। খুব করেছিস। কর্তা এলেই তোদের দুই হাত এক করে দেবো।

সদর মহলে চন্দ্রকান্ত এক রুদ্ধদ্বার কক্ষে ধ্যানগম্ভীর হয়ে বসে আছেন, এক চৌকীর 'পরে। খানসামা তাঁর হুকুমের অপেক্ষায় দুয়োরে অপেক্ষা করছে। ঘৃণার উদ্রেক হয় তাঁর মনে—আনন্দকুমারীর দেহটার প্রতি। কিন্তু উপায় কি? যে অবদমিত, যে পতিত, তাকে গ্রহণ করাই ব্রাহ্মণের কর্তব্য। হিন্দু-জাতির বৈশিষ্ট্য এই—ঠাঁই দাও সকলকে। বরণ কর অস্পৃশ্যকে। যে নীচু তাঁকে উচ্চে স্থান দাও। ক্ষয় নয়, সঞ্চয়। ব্যয় নয়, আয়। তবেই ধর্ম্ম আর সমাজ রক্ষা হবে।

রুদ্ধদ্বারে ক্ষীণ করাঘাতের শব্দ হয়। টোকা পড়ে দুয়োরে। দ্বার উন্মোচন করলেন চন্দ্রকান্ত। দেখালেন সদ্যোস্নাতা আনন্দকুমারী। মিষ্ট হাসি তার মুখে। হাতে আহারের পাত্র। সাজানো থালিকা আর জলপাত্র। কক্ষে সিঁদিয়ে ভিতর থেকে অর্গল তুলে দেয় চৌধুরাণী।

দুয়োরে প্রতীক্ষমান দুজন খানসামা হাসাহাসি করে পরস্পরে। চোখের ইশারায় কথা বলাবলি করে কি যেন। ব্যঙ্গের হাসি হাসে। টিটকারী কাটে। দুয়োরে কান রাখে।

মহেশনাথের বিকট রূপ আরও যেন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে।

কষ্টিপাথরের মত কৃষ্ণমূর্তি, বিধাতার কোন্ অভিশাপে শিথিল, বিকলাঙ্গ। চণ্ডাল-ক্রোধে মহেশনাথ ঠক ঠক কাঁপছেন। নেহাৎ পঙ্গু আর অপটু, তাই রাগের বশে গতিহীন স্থাবর দেহটা কেঁপে কেঁপে ওঠে। তালু আর কণ্ঠের জড়তায় মুখের কথা স্পষ্ট উচ্চারিত হয় না। মহেশনাথের ওষ্ঠ অস্ফুট কথার আবেগে থর থর। সম্পূর্ণ একটি কথা তিনি অতি কষ্টেও মুখে প্রকাশ করতে পারছেন না। শুধু মাত্র একটি শব্দ শোনা যায় এক টানা—আহত মানুষের কাতর গোঙানি যেন। চোখের শুভ্রতায় দুটি মিশকালো তারা চক্রাকারে

পাক দেয় ঘন ঘন। ক্রোধ যেন কিছুতেই দমন করতে পারছেন না মহেশনাথ। শিরা আর ধমনীতে হয়তো রক্ত ফুটছে টগবগিয়ে। বুকের মাঝে কিসের জ্বালা ধরেছে। অসহ্য এক কষ্টে যেন অস্থির চিত্ত তিনি। সকলেই জানে মহেশনাথকে। কেউ কেউ দেখে শুনে শিউরে শিউরে ওঠে। চোখা-চোখি হলে আর রক্ষা নেই, মহেশনাথ হাতের কাছে যা পাবেন সহসা নিক্ষেপ করবেন।

ঘর এলোমেলো। পুঁথি আর কোষ্ঠির রাশি যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে। মসীপাত্র কখন উল্টে গেছে, কালির রেখা গড়িয়েছে। ঘরে যেন এক খণ্ডযুদ্ধ শেষ হয়েছে খানিক আগে। মহেশনাথের একটানা গোঙানির মত শব্দটা ভেসে ভেসে বেড়ায় যেন।

—মহেশনাথ!

এক জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর হঠাৎ ডাক দিয়ে থেমে গেল। কক্ষের দুয়োরে কে যেন এসে দাঁড়িয়েছেন।

দুই চোখে দুই হাত। কি এক গভীর চিন্তায় ডুবে আছেন মহেশনাথ। জড়পিণ্ডের মত দেখায় যেন তাঁকে। দরদর বেগে অশ্রুপাত হয় তাঁর চোখ থেকে। শোকাহতের মত কাঁদছেন তিনি। নীরব কান্না। বিক্ষোভ থেমেছে, ক্রোধের মাত্রা কমেছে—কিন্তু চোখের জল যেন বাধা মানতে চায় না। ডাকে সাড়া দিলেন না। শুনেও শুনলেন না যেন।

—ভাই মহেশনাথ!

আবার ডাক আসে ঘরের বাহির থেকে। দ্বিতীয় ডাকে যেন দুঃখের সুর শোনায়।

—কে? চোখ থেকে হাত সরিয়ে ঘোর বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন মহেশনাথ। চোখ মেলে যাঁকে দেখলেন তিনি যেন প্রস্তরমূর্তির মত অবিচল। পলকহীন চাউনিতে তাকিয়ে আছেন। ক্ষণেক দেখে দেখে মহেশনাথ বললেন,—রাজাবাহাদুর!

—হাঁ ভাই। রাজা কালীশঙ্কর ধীরে কথা বললেন। স্মিত হাসির রেখা তাঁর অধরশেষে। রাজা বললেন,—মন-মেজাজ কি ভাল নাই না কি?

এপাশে ওপাশে মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানালেন মহেশনাথ। বললেন,—শশিনাথকে আমি খড়ম পিটবো রাজাবাহাদুর! বাধা দিবেন না আপনি। তার রক্ত দেখবো আমি, তবে ছাড়বো।

—ছিঃ! এমন কথা ব্যবহার করা সমীচীন নয়। ভুলিও না, শশিনাথ ব্রাহ্মণ। শত সহস্র অপরাধেও ব্রাহ্মণ অবধ্য জানিও। কালীশঙ্কর কক্ষমধ্যে পায়চারী করতে করতে কথা বলছেন। হাসির জের টেনে টেনে কথা বলছেন।

মহেশনাথের ওষ্ঠাধর থরথরিয়ে কাঁপছে। মুখের কথা যেন অস্ফুট থেকে যায় অতি অধিক ক্রোধে। চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন,—শিবানীকে ফুস্‌লে লয়ে গেল শশী, কেউ একটা প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করলে না। আমি তাকে ছাড়বো না জানবে।

—বৃথা রুষ্ট হও কেন ভাই! শিবানী সরল প্রকৃতির মেয়ে। তিলমাত্র বুদ্ধি নাই তার। তদুপরি শিবানীর ভরাযৌবন। প্রলোভন ত্যাগ করতে পারে নাই শিবানী।

কালীশঙ্কর পায়চারী থামিয়ে বললেন,—কর্ম্ম যার কর্ম্মফলও তার। তুমি অযথা ব্যস্ত হও কেন বুঝি না।

সহসা দুই বাহু বিস্তারে রাজবাহাদুরের পদযুগলকে আলিঙ্গন করলেন মহেশনাথ। বললেন—দোহাই রাজাবাহাদুর, তুমি শিবানীর সন্ধান কর। তাকে দিনান্তে একবার না দেখে আমি মনে বেদনা পাই। শশিনাথ যদি ত্যাগ করে শিবানীকে, কোথায় যাবে অনাথা মেয়েটা! গঙ্গার জলে ডুব দেবে!

—তুমি এমন মনে কর কেন? কথা বলতে বলতে মহেশনাথের মাথায় হাত রাখলেন কালীশঙ্কর, বললেন,—ত্রিকালদর্শী তুমি। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তোমার নখদর্পণে, তবে এত অস্থির হও কেন?

এত দুঃখের মাঝেও হঠাৎ হো হো শব্দে হাসি ধরলেন মহেশনাথ। গুরু গুরু মেঘ ডাকলো যেন। হাসির তোড়ে বীভৎস রূপ আরও যেন ভয়াল দেখায়। স্থাণুর মত শরীর, হাসির চাঞ্চল্যে ঈষৎ কম্পমান। অদ্ভুত হাসি, সহজে থামতে চায় না। অস্বাভাবিক দেহাকৃতির মত হাসির ধ্বনিও যেন

বেসুরো। মহেশনাথ হাসতে হাসতে বললেন,—রাজাবাহাদুর, তুমি আর হাসিও না। ত্রিকালদর্শী, কিন্তু সে নিজের জন্মবৃত্তান্তটাই জানে না। কি হাস্যকর! কি হাস্যকর!

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার বেসুর হাসির ঝর্ণা ছুটলো যেন পাহাড় পথে।

রাজাবাহাদুর কালীশঙ্কর কিন্তু হাসিতে যোগ দিতে পারলেন না। কি এক গোপন লজ্জায় রাজার মত পুরুষসিংহ একবার যেন চমকে উঠলেন। মহেশ-নাথের জন্মবৃত্তান্ত—ভাবতেও যেন শিউরে চমকে উঠলেন তিনি। কল্পনাতীত যেন। রাজাবাহাদুর নিজেকে সামলে বললেন মিহি সুরে,—তুমি স্থির হও ভাই। দুশ্চিন্তা ত্যাগ কর। কাইল সারারাত্রিব্যাপী তোমার কাতর কান্না শুনেছি, তিলেক নিদ্রা যাই নাই।

—ঘুমের ব্যাঘাত হয়েছে, ক্ষমা হোক রাজাবাহাদুর। মহেশনাথ যেন সলজ্জায় কথা বলছেন অপরাধীর সুরে। বললেন,—কদিন শিবানীকে দেখতে পাই না, মনের বেদনায়—

কথা শেষ হয় না। কান্নার কারণ বলতে বলতে থামলেন মহেশনাথ। চোখের প্রান্ত চিকচিকয়ে ওঠে। শিশুর মত যেন ফুঁপিয়ে উঠলেন।

—আচ্ছা মহেশ, তুমি কি বলতে চাও শিবানী কদাপি শ্বশুরালয়ে যাবে না? রাজাবাহাদুর স্নেহসিক্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন। বললেন,—অনূঢ়াই থাকবে সে আমরণ? বয়স উত্তীর্ণ হবে অথচ বিবাহ হবে না, সমাজ যে হাসাহাসি করবে। পাতকী হতে চাও কি?

—আমরা দুই ভ্রাতা ভগিনী পাতকী হতে আর বাকী কি! কথা বলার সঙ্গে মহেশনাথের চোখ থেকে দুই ফোঁটা জল ঝরলো তাঁর লোমশ বুকে। দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বললেন,—আমাদের দুই জনার উদ্ধার কৈ? আমরা পাতকী। আমরা যে অজ্ঞাতকুলশীল।

কালীশঙ্করের সদা হাস্যময় মুখের স্মিত হাসি আবার ধীরে ধীরে স্তিমিত হতে থাকে। গাম্ভীর্য্য ফুটতে থাকে যেন। খানিক নীরব থেকে বললেন,—

আমাকে মার্জনা করিও মহেশ, আমি তেমন কিছুই জানি না। তবে কৈশোরের শেষে জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই তোমাদের দেখছি। বলতে কি, প্রায় একত্রেই লালিত পালিত হয়েছি আমরা ও তোমরা।

অট্টহাসি ধরলেন মহেশনাথ। হাসির স্বর ক্রমে ক্রমে সপ্তমে উঠলো। হাসি আর কথা এক সঙ্গে চললো। মহেশনাথ হাসতে হাসতে বললেন,—তোমরা ভাগ্যক্রমে রাজপুত্র আর আমি! হো হো হো—

—তুমি তো আমার অগ্রজপ্রতিম। শ্রেষ্ঠ, সহোদরতুল্য! রাজাবাহাদুর কথা বলছেন অতি ধীর কণ্ঠে, অন্যের কর্ণগোচর যেন না হয়।

—তুল্য! আমি তুলনামূলক? তুমি আসল আর আমি নকল! হো হো হো—

হাসিতে যোগ দিতে পারেন না কালীশঙ্কর। চিত্রার্পিতের মত অচল দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁর বিশাল চোখের দৃষ্টি অন্তঃসারশূন্য। হয়তো অনেক আগের অতীতে ফিরে গেছেন রাজাবাহাদুর। শূন্যদৃষ্টি, কিন্তু চোখের পলক পড়ছে না। স্বপ্নাচ্ছন্ন যেন। কি এক দুঃস্বপ্ন দেখছেন কি কালীশঙ্কর!

কালোরাণী! দুয়োরাণীর মত ভাগ্যহীনা নয়, চোখের মণি কালোরাণী। উড়িষ্যার কোনার্কের মন্দিরগাত্রে যেমন নারীমূর্তি তেমনই যেন পাথরকোঁদা নিখুঁত দেহ। শ্রাবণের ঘন মেঘের মত শ্যামাঙ্গিনী কালোরাণী। হাসির ছটায় বিদ্যুতের ঝিলিক খেলতো। শ্যামা মেয়ে, গ্রীষ্মে শীতলা আর শীতে উষ্ণ। কালোরাণী না কালিরাণী, ঠিক স্মরণে আসছে না।

আয়েশ আর আসকারায় কালোরাণী তার রক্ষাকর্তার সম্মান রক্ষা করতে পারলো না একদিন। হুকুম তামিল করতে পারলো না। হাসি আর রঙ্গে সাড়া দিতে পারলো না। কালোরাণী তখন আসন্ন-প্রসবা। প্রত্যাখ্যানের প্রতিবাদে রক্ষাকর্তা কালোরাণীকে সজোরে পদাঘাত করেছিলেন। আঘাতের বেগে কালোরাণী ভূমিতে লুটিয়ে পড়েছিল। মূর্চ্ছায় জ্ঞান হারিয়েছিল। কালোরাণীর আঘাত আরাম হয়, কিন্তু অনাগত শিশুর পরিণাম হয় অঙ্গবৈকল্যে। শিশুর মস্তিষ্ক ব্যতীত সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই গ্রন্থিহীন বিকল হয়।

রাজাবাহাদুরের অবিচ্ছিন্ন নীরবতা হঠাৎ যেন লক্ষ্য করলেন মহেশনাথ। চোখ তুলে দেখলেন কালীশঙ্কর গবাক্ষপথে দৃষ্টি প্রসারিত করেছেন। মুখে হাসির চিহ্নমাত্র নেই। স্বপ্ন বা নেশায় আচ্ছন্ন কে জানে, রাজাবাহাদুর যেন ইহলোকে আর নেই। অতীতের স্মৃতির ছায়া দেখছেন তিনি।

—রাজাবাহাদুর!

মহেশনাথ খুশীর সুরে ডাকলেন! সোজা বসতে চেষ্টা করলেন একবার, কিন্তু পারলেন না। সামর্থ্যে কুলালো না।

কালীশঙ্করের মেঘগম্ভীর কণ্ঠ সাড়া দেয় তৎক্ষণাৎ,—কিছু বক্তব্য আছে, ব্যক্ত করছি। আমি কিঞ্চিৎ বিক্ষিপ্ত হয়েছি মহেশনাথ, তাই অন্য মনে ছিলাম।

—আমার কথায় কি অপমান বোধ করলেন? সহাস্যে শুধালেন মহেশনাথ। বললেন,—তুমিই আসল, তোমার অধিকারই অগ্রগণ্য, তবে অযথা রুষ্ট হও কেন?

—আমি রুষ্ট হই না মহেশনাথ। কেমন যেন কাঁপা সুরে কথা বললেন রাজাবাহাদুর। বলেন,—আমার মনে এখন অন্য চিন্তা। কালোরাণীর স্মৃতি।

—কালোরাণী? কৌতুহলী হয়ে উঠলেন মহেশনাথ, বললেন—তিনি আবার কে তাই শুনি।

—তুমি তাঁকে চিনবে না মহেশনাথ। রক্ষাকালীর মত উগ্র সুন্দর রূপ ছিল তার। কালোরাণী ছিল রাজার চোখের মণি। কথা বলতে বলতে রাজা ধীর পদে দুয়োরের দিকে অগ্রসর হলেন। বললেন,—কালোই না কি জগতের আলো। কৃষ্ণ কালো, কালি কালো, কোকিল কালো, চোখের মণি, তাও কালো—

হো হো হাসতে হাসতে মহেশনাথ বললেন—একটা বাদ দিলে কেন রাজা। কাকও কালো, তোমাদের মহেশনাথও যে কালো—

নিজের রসিকতায় মহেশনাথ নিজেই হাসতে থাকলেন। অলস মধ্যাহ্নের থমকানো স্তব্ধতা হাসির আলোড়নে মূর্চ্ছনা তুললো যেন।

দুয়োর থেকে ফিরে আবার কথা বললেন কালীশঙ্কর। ইদিক সিদিক দেখলেন একবার। বললেন,—মহেশনাথ, আমার কি দুঃসময় পড়েছে,

বলতে পারো? অনুজ কাশীশঙ্করের বর্তমান রাশিফলই বা কিরূপ দেখতে পাও?

রাজার কথা শেষ হতে না হতে মহেশনাথ এলোমেলো কাগজের পাট খুলতে ব্যস্ত হলেন। বললেন,—তিষ্ঠ তিষ্ঠ, তিলেক তিষ্ঠ! মাথায় আবার দুশ্চিন্তা, তথাপি গণনা করবো।

—থাক্ থাক্ মহেশনাথ। রাজাবাহাদুর ফিস ফিস কথা বললেন। চারিদিকে লক্ষ্য বুলিয়ে বললেন,—চিন্তামুক্ত হও, তত:পরে গণনায় প্রবৃত্ত হইও। তাড়া নাই কিছু। আমি এখন যাই, পরে তোমার সুবিধামত শুনিও।

—তথাস্তু তথাস্তু।

মহেশনাথ রাজার কথায় সায় দিলেন, কিন্তু কোষ্ঠী খোঁজাখুঁজিতে নিবৃত্ত হলেন না। বরং তৎপর হলেন আরো। দুয়োরে চোখ ফিরিয়ে দেখলেন, রাজাবাহাদুর কক্ষ ত্যাগ করেছেন। বিড় বিড়িয়ে বললেন,—রাহুর দৃষ্টি পড়েছে রাজপুরীতে। ফলাফল পুরাপুরি অশুভ। ফলং মড়কম্। হো হো হো—

মহেশনাথের ফিসফিস স্বগতোক্তি যেন বিষধর সর্পের ফোঁসফোঁসানির মত শোনায়! মনের সুপ্ত আনন্দ হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করে। তাঁর মুখে এক বিশ্রী হাসির আভাব উঁকি দেয়। কেমন রহস্যময় এই হাসি। গুপ্ত অভিসন্ধির বহি:প্রকাশের মত দেখায় যেন। মহেশনাথ আবার আপন মনে কথা বলতে থাকেন। এটা সেটা নাড়াচড়া করেন আর বলেন,—তুমি আসল আর আমি নকল। বাহবা!

কার কোষ্ঠী দেখছিলেন কে জানে, কথা বলতে বলতে এবং দেখতে দেখতে হঠাৎ হাসি অদৃশ্য হয়ে যায়। সাগ্রহে দেখতে থাকেন কোষ্ঠীর লেখা। সুসংস্কৃত ভাষায় জাতকের বিচারের কয়েক সারি লেখা, বার বার পড়লেন তিনি। মনে মনে পড়লেন। তার পর শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে পড়লেন। পড়লেন, জাতকের জীবনাশঙ্কা আছে। কোন ক্রমে যদি জীবন রক্ষা পায় তো জাতক ভবিষ্যৎকালে দিগ্বিজয়ে সমর্থ হইবে। দৈবক্রিয়ায় শুভ ফলের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

নিজের চোখ দুটিকে বিশ্বাস হয় না মহেশনাথের। কয়েক সারি লেখা, আবার পড়লেন তিনি। আবার, আবার, আবার। পড়তে পড়তে তিনি নিজেই আশান্বিত হলেন। দুঃখের হাসি হাসলেন।

মধ্যাহ্নের মাটিফাটা রৌদ্রলোক সহ্য করা যায় না যেন।

মাথার ব্রহ্মতালুতে যেন আগুনের স্পর্শ লাগে। বজরার ছাদ জনশূন্য, শুভ্র ফরাশে কয়েকটি তাকিয়া ব্যতীত আর কিছু নজরে পড়ে না। গঙ্গার জলে কোটি কোটি রোদের টুকরো ছড়িয়ে আছে হীরকপিণ্ডের মত, ভেসে ভেসে এগিয়ে চলেছে। নদীতে নৌকার তেমন সমাবেশ নেই এই দ্বিপ্রহরে। বৈশাখের তপ্ত রৌদের কবল থেকে অব্যাহতির জন্য মাঝিরা হয়তো ছইয়ের আড়ালে অশ্রয় নিয়েছে। নদীর তীরে ভিড়েছে ছিপ, পানসি আর নৌকা। বেলা অধিক হওয়ার পর, সূর্য্যের তেজ হ্রাস পাওয়ার পর, মাঝিরা আবার হাল ধরবে। খেয়াপারের ঘাটে নৌকা বাঁধবে। চিৎকার করবে, ডাকবে খেয়াপারের যাত্রীদের।

কাশীশঙ্করের বজরায় মাঝিদের বিশ্রাম নেই একদণ্ড। মাঝ গঙ্গা থেকে হাল চালনার কঁ্যাচ কঁ্যাচ শব্দ ভেসে আসছে উষ্ণ বাতাসে। মাঝিরা মাথায় লাল শালুক টুকরো বেঁধেছে। বজরা বেশ ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে চলেছে উত্তর থেকে দক্ষিণ অভিমুখে।

বজরার কক্ষমধ্যে কাশীশঙ্কর। তাকিয়ায় দেহ হেলিয়ে দারুণ গ্রীষ্মের দাবদাহের কষ্ট লাঘব করছেন। দুজন খানসমা রামপাখার হাওয়া খেলায় বজরার ঘরে। কাশীশঙ্কর নিদ্রিত নয়, তাঁর চক্ষু নিমীলিত মাত্র। সহোদরা বিন্ধ্যবাসিনী আকাশ দেখেন খুপরি থেকে। রাজহংসের ডানার মত শুভ্রাকাশ অনেক উঁচুতে।

গুড়ুম্—গুড়ুম্—গুম্! পর পর কয়েকটি শব্দ। দুই তীরের বিশাল কানন কম্পিত করলো সহসা। নদীর বাঁকে বাঁকে ফিরে সেই শব্দ দূরের আকাশপ্রান্ত

থেকে প্রতিধ্বনিত হয়। গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম্! আবার সেই শব্দধারা বাতাসের গতিকে ব্যাহত করে যেন।

মাঝিদের মধ্যে কথা আর বাদ প্রতিবাদের কলরোল শুরু হয়। বন্দুকের গোলা ছুটে আসছে কোথা থেকে। গঙ্গার দুই তীর অতি বিস্তৃত অরণ্য। মিশামিশি গাছের অনন্ত শ্রেণী—যেন ছিদ্র ও বিচ্ছেদশূন্য। অরণ্যে আলোক প্রবেশের পথ নেই, সূচীভেদ্য অন্ধকার। পাতা ও পল্লবের মর্মর, পশুপক্ষীর রব ভিন্ন অন্য শব্দ অরণ্যে শোনা যায় না। ঘন ঘন বন্দুকের ধ্বনিতে ঐ অরণ্যে পশু-পাখীর আর্ত চিৎকার ভেসে উঠলো। আম কাঁটাল বাবলা তেঁতুলের শাখা কেঁপে কেঁপে উঠলো।

বজরার কক্ষমধ্যে কাশীশঙ্করের ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে উঠছে কখন। তিনি দেখছেন ইতিউতি। কোথা থেকে বন্দুকের জ্বলন্ত গোলা উড়ে আসছে। কুমারবাহাদুর ত্বরায় উঠলেন। অস্ত্র-ঘরে গেলেন। বন্দুক আর বারুদগাদার সরঞ্জামে হাত দিলেন।

—হুজুর, বজরা আক্রমণ করেছে। এখন উপায়? পেছন থেকে জগমোহন কথা বললে ত্রস্তকণ্ঠে। বললে,—আমাকে একটা বন্দুক দিন ছোটরাজা।

কাশীশঙ্কর বললেন,—আক্রমণকারীদের অবস্থিতি কোথায় জগমোহন?

—নদীর তীরে কুমারবাহাদুর। জগমোহন একটি বন্দুক হাতে তুলে নেয় আর কথা বলে। তার ভাবগতিক যেন বড়ই চঞ্চল। বললে,—শত্রুকে নজরে পড়ে না, জঙ্গলে তারা লুকিয়ে আছে।

আবার বললেন কাশীশঙ্কর,—শত্রুশিবিকাও কি দৃষ্টিগোচর হয় না?

—আদপেই নয় হুজুর। বন্দুকের শব্দ আর ধোঁয়া ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। আক্রমণের লক্ষ্য হুজুরের এই বজরা।

মাঝিরা চিৎকার করে সভয়ে, কিন্তু আপন আপন কার্য্যে বিরত হয় না। বজরার কয়েক হাত দূরে বন্দুকের গোলা এসে পড়েছে। জ্বলন্ত অগ্নিকণা কক্ষচ্যুত গ্রহাণুপুঞ্জের মত ছড়িয়ে পড়ছে যত্র তত্র।

কাশীশঙ্কর ঘরের বাইরে এসে দৃষ্টি প্রসারিত করলেন চতুর্দ্দিকে, কিন্তু

কিছুই দেখতে পেলেন না—শুধু মাত্র ধূম্ররেখা, এখানে সেখানে থমকে আছে খণ্ড মেঘের মত। নদীর বুকে বারুদের পিণ্ড এসে পড়ছে তড়িৎগতিতে।

জগমোহন বললে,—কুমারবাহাদুর, এই দুঃসাহসের উচিত জবাব দিন। বন্দুকের বদলে বন্দুক। দুটা চারটা তোপ দাগতে থাকেন! শত্রু না মনে করে আমরা অসহায়, অস্ত্র নাই আমাদের কাছে।

গুড়ুম গুড়ুম গুম্—আবার একরাশ অগ্নিগোলক ভাসলো নদীর বুকে। চলন্ত বজরা, তাই লক্ষ্য স্থির থাকে না। কুমারবাহাদুরও সাড়া দিলেন, জবাব দিলেন। তিনিও একের পর এক বন্দুক দাগলেন সশব্দে। তীরের দিকে ছুটলো অগ্নিপিণ্ড। কিন্তু বৃথা চেষ্টা।

এমন সময়ে বজরার ছাদে এসে ছিটকে পড়লো ছুটন্ত আগুনের তারাফুল। একজন মাল্লা, সে হয়তো মাথায় আঘাত পেয়েছে।

বজরা যেন জলকম্পে আড়াআড়ি দুলছে ঘন ঘন। তবুও বজরার গতি অব্যাহত।

—ভাই, এই বিপদে ঝাঁপ দিও না। ঘর থেকে কখন বেরিয়ে পড়েছেন রাজকন্যা বিন্ধ্যবাসিনী। বললেন,—বজরায় সাদা নিশেন তুলে দেওয়া হোক। আমি জানি এ কার ষড়যন্ত্র। আমার মুক্তি হয়তো বিধাতা লিখতে ভুলে গেছেন।

—তুমি ব্যস্ত হও কেন বিন্ধ্য? ঘরের অভ্যন্তরে যাও। অতর্কিতে যদি আঘাত লাগে কে রক্ষা করবে! আত্মসমর্পণ আমার কোষ্ঠীতে লেখা নাই।

রাজকুমারী বললেন,—আমার প্রাণের কোন মূল্য নাই। বজরা যদি রক্ষা পায় তো আমাদের সকলেই সসম্মানে ঘরে ফিরবে। নতুবা আমরা নিঃশেষ হব।

—দেখা যাক কি হয়। কথার শেষে আবার বন্দুক দাগলেন কুমারবাহাদুর। আকাশ কেঁপে উঠলো যেন বজ্রধ্বনিতে। বললেন,—বিন্ধ্য, তুই আর এক পলও এখানে থাকবি না। ঘরের মধ্যেই থাক আপাততঃ। দেখা যাক কি হয়।

বিন্ধ্যবাসিনী দীপ্তকণ্ঠে বললেন,—আক্রমণকারী যে কে আমি অনুমানে বুঝেছি। সাতগাঁয়ের জমিদারের কীর্তি। মান্দারণের প্রহরী হয়তো খবর দিয়েছে তাঁকে।

কোন কথায় কর্ণপাতের অবকাশ নেই কাশীশঙ্করের। তাঁর চোখে ধরা পড়েছে শত্রুর ঘাঁটি। তিনি সেই দিকে লক্ষ্য রেখে বন্দুক দেগে চলেছেন। জগমোহনও থামছে না। প্রভুর লক্ষ্য সেও অনুসরণ করছে। আর একবার বন্দুকের ঘোড়া টিপলো সে! বললে,—রক্তের বদলে রক্ত, বন্দুকের বদলে বন্দুক।

খানিক বিরতির পর আবার নদীতীর থেকে রাশি রাশি আগুনের ফুলঝুরি ছুটে আসতে থাকে। ঘন ঘন গুম গুম আওয়াজের সঙ্গে ঝাঁক ঝাঁক তীরের মত অগ্নিবর্ষণ চললো। বজরার একজন মাল্লা আহত হয় মাথায়।

রাজকুমারী বললেন,—ভাই, তোপ দাগাদাগিতে বিরত হও। সাদা নিশান দেখাও। নচেৎ রক্ষা পাওয়া কঠিন। বন্দুকের বদলে যদি কামান দাগে তখন কে রক্ষা করবে!

—উপায় নাই কুমারবাহাদুর। রাজকন্যার কথাই ঠিক। জগমোহন কথার শেষে আবার একবার বন্দুক দাগলো। তার চাঞ্চল্যে বজরা দুলে উঠলো।

—তবে তাই হোক। কেমন যেন নিরুপায়ের মত কাশীশঙ্কর বললেন। জোর গলায় বললেন,—মাঝি-সর্দার সাদা নিশান দেখাও এখনই। মাস্তলে পতাকা তুলে দাও।

দেখতে দেখতে শ্বেতপতাকা উঠতে থাকে মাস্তল শীর্ষে। শান্তির প্রতীকচিহ্ন শ্বেতবর্ণের পতাকা। সঙ্গে সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্রের আকাশফাটা শব্দ থেমে যায়। জগমোহন দেখতে পায়, একখানি ছিপ নদীর তীর থেকে এই দিকে আসছে সর্পগতিতে। জগমোহন বললে,—হুজুর, ছিপখানকে আগে আসতে দিন, বক্তব্য কি তাই শুনুন।

—তথাস্তু জগমোহন। তোমরা সকলে যেমন বলবে তেমন হবে। তবে আমার সহোদরাকে আর ফিরিয়ে দিতে পারবো না কোন মতে। কুমার-

বাহাদুর কথা বলছেন দৃঢ়কণ্ঠে। বললেন,—কোন সর্তেই আমি রাজী নই।

বিন্ধ্যবাসিনীর বক্ষ দুরু দুরু করে। রাজকন্যা বজরার ঘরে সিঁদিয়ে গেলেন। বললেন,—সাতগাঁয়ের জমিদারদের খেয়ালে আমি নিজেকে বিকাতে চাইনা। আত্মসমর্পণের চেয়ে গঙ্গায় আমার ঝাঁপ দেওয়া অনেক সুখের, অনেক মঙ্গলের।

ঘন ঘন আকাশফাটা শব্দের পর দুই পক্ষের নীরবতায় প্রাকৃতিক শান্তি আবার বিরাজ করে। পশুপাখীর আর্ত ডাকে কেউ কান দেয় না। অন্যপক্ষের ছিপখানি ছুটে আসছে ক্ষিপ্রগতিতে।

কাশীশঙ্কর সাগ্রহে অপেক্ষা করেন, শত্রুপক্ষের বক্তব্য শোনার আশায় অধীর হয়ে থাকেন। কুমারবাহাদুরের কপালে স্বেদবিন্দু ফুটেছে কায়ক্লেশে। এক ঝলক বাতাস এসে কুমারের ললাটে স্পর্শ বুলায় যেন। শ্রমের পর শান্তির প্রলেপ লাগে যেন।

শান্তি আর যুদ্ধবিরতির প্রতীকচিহ্ন শ্বেতনিশানা পৎ পৎ উড়ছে বজরার মাস্তুলে। বজরা যেন গতি হারিয়েছে। রাজকুমারী মৃত্যু বরণের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন। বিপদ ঘনীভূত হ'লেই তিনি গঙ্গায় ঝাঁপ দেবেন। বিন্ধ্যবাসিনী মনে মনে ইষ্টমন্ত্র আওড়ে চলেছেন। বিপত্তারিণীর বীজমন্ত্র বলছেন।

গঙ্গার জলের গতি আছে কিন্তু জ্ঞান নেই। জলপ্রবাহ হাসছে যেন খিল খিল। কুল কুল বয়ে চলেছে অবিরাম। গঙ্গা এগিয়ে চলেছে সমুদ্রের দিকে। বিন্ধ্যবাসিনীও কি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছেন? কে জানে!

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত নয়, কুমারবাহাদুরের আশাবৃক্ষে ফল ধরেছে। সেই ফলের বাস্তব রূপ যে এত ভয়ঙ্কর—তেমন আশা করেন নি। চিত্রার্পিতের মত স্থির কাশীশঙ্কর—দূরে বিস্তৃত অরণ্যময় তীরভূমিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ। মনে যেন দ্বিধা উপস্থিত হয়। চোখে যেন কুয়াশাজাল। গঙ্গার জলে তখনও শেষবেলার সূর্য্য-আলো। রূপালী রেখা এখানে সেখানে জলকল্লোলে হেসে হেসে উঠছে। গঙ্গার বুকের পরে তখনও ধোঁয়ার কুণ্ডলী থমকে আছে—

বন্দুকের অনন্ত বারুদ ছুটতে ছুটতে ফুরিয়ে গেছে। ধূম্ররেখা দূর থেকে দেখায় যেন কাশফুলের মত। আশে-পাশে কখানা ছিপ আর পানশি, মধ্যাহ্নের অবসরে তীরে বাঁধা। গোলাগুলীর ঘন ঘন বজ্রধ্বনি শুনে মাঝিরা সজাগ হয়ে ওঠে। ছিপ আর পানশি কখানা আরও দূরে পালিয়ে যায়। মানুষের কলরোল শোনা যায় মধ্যে মধ্যে। জোয়ারের তুফান-ঢেউ আসছে যেন, এমনই ভয়ার্ত্ত কলরব।

তীরে গভীর অরণ্য। আলোক প্রবেশের ছিদ্র নেই কোথাও। সবুজের গিরিশ্রেণী—যার সীমাশেষ খুঁজে মেলে না। মধ্যাহ্নের আলো অস্ফুট। ভয়ভীরু পশুপাখী ডাকাডাকি করে। কত অজস্র পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ ঐ বনমধ্যে বাস করে, কে জানে! অরণ্যানীর স্তব্ধতায় বন্দুকের দারুণ শব্দ স্তিমিত হয়ে যায়। ঐ বারুদের ধোঁয়া এক তীব্র বিষাক্ত গন্ধ ছড়িয়েছে বাতাসে।

পাষাণের মূর্তি যেন। কাশীশঙ্করের দীর্ঘ দুই চোখে পলক পড়ছে না কতক্ষণ! বজরা গতিহীন, কিন্তু চঞ্চল দোলা তার থামবে না কখনও।

—আমাকে এই স্থানেই পরিত্যাগ কর।

কম্পমান কণ্ঠস্বরের কথা শুনে কাশীশঙ্করের সম্বিৎ ফিরলো যেন। তিনি দৃষ্টি ফিরালেন। দেখলেন, বজরার দুয়ারের আড়াল থেকে বিন্ধ্যবাসিনীর থমথমে মুখখানি কথা বলছে। রাজকন্যা খানিক থেমে আবার বললেন,—ভাই, আমার জন্য তোমার বিপদ হয়, আমি তা চাই না। তোমরা ফিরে যাও সুতানুটিতে, আমি থাকি।

দুঃখের মধ্যে হাসি ফুটলো কুমারের ওষ্ঠপ্রান্তে। বললেন,—কোথায় থাকতে চাও ভগিনী!

ঠোঁট দুটি থরথর কাঁপছে ভয় আর আবেগে। বিন্ধ্যবাসিনী বললেন,—এই গঙ্গাগর্ভে ঠাঁই হবে আমার। তুমি আর কালবিলম্ব কর কেন কুমার-বাহাদুর?

আরও একটু হাসলেন কাশীশঙ্কর। তাঁর এই অর্দ্ধস্ফুট হাসি কেমন যেন

অর্থপূর্ণ, রহস্যময়। কুমারবাহাদুর বললেন,—স্থির হও তুমি। কক্ষমধ্যে থাকো, অধৈর্য্য না হও।

—মিছা অশান্তিতে তুমি কি শেষটায় মৃত্যু বরণ করতে চাও?

বিন্ধ্যবাসিনীর কাঁপা-কাঁপা কণ্ঠে প্রশ্নের কঠোরতা ফুটলো যেন। রাজকুমারী বজরার দুয়ার ত্যাগ করেন না। একটি পাল্লা ধরে আছেন, অবশ দেহের ভার লাঘব করেন হয়তো।

—তোমার জন্য তাই যদি করি ক্ষতি কি? হেসে হেসে কথা বলছেন কুমারবাহাদুর। বললেন,—একটা ঘোরতর অন্যায়ের প্রতিবাদে আমি এই মরদেহটাকে বিসর্জ্জন দিতে পিছপাও নহি। একটা মানুষের জীবনের কি মূল্য আছে?

রাজকুমারীর বুকে শিহরণ কাঁপতে থাকে। কুমারবাহাদুরের কথায় খানিক স্তব্ধ থেকে দৃপ্তকণ্ঠে বললেন,—তোমার স্ত্রী আর কন্যা আছে, সাজানো সংসার আছে, রাজমাতা এখনও জীবিত আছেন—ভুলে যাও কেন?

রাজকন্যা কথায় যুক্তি তুললেন। কুমারের পিছন টানের নাম-নজীর বললেন। প্রেমময়ী সহধর্ম্মিণী, স্নেহময়ী মা, পুতুলের মত একরত্তি মেয়েটা, তাদের যেন মন থেকে মুছে ফেলেছেন কাশীশঙ্কর। ভুলে গেছেন তাদের অস্তিত্ব। সুতানুটিকেই যেন বিস্মিত হয়েছেন। সামান্য হাসলেন কুমার-বাহাদুর। তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের হাসি যেন। আবার তৎক্ষণাৎ তাঁর মুখভাবের পরিবর্তন হয়, হাসি মিলিয়ে যায় ভ্রূ-কুঁচকানো চিন্তাজ্বরে। তীর থেকে তীরের বেগে, সর্পগতিতে শত্রুপক্ষের ছিপখানি ভেসে আসছে। বজরার যত নিকটে আসতে থাকে তত যেন উদ্বেগে অধীর হতে থাকেন কুমারবাহাদুর। বজরার অভ্যন্তরে অস্ত্রঘরে ঝন ঝন শব্দ চলেছে। লেঠেল জগমোহনের ব্যবস্থাপনায় মাঝির দল হাতে অস্ত্র তুলেছে। দূর আর সমুখ যুদ্ধের উপকরণের সাজ পরছে তারা। কোমরে অসি আর হাতে গাদা বন্দুক তুলছে।

ছিপখানি তীরের বেগে আসতে আসতে বজরার বুকে এক আঘাত করলো। তারপর একপাক ঘুরে বজরার পাশাপাশি ভাসলো। ছিপে আট

জন মাল্লা। তারা অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে অবিরাম হাত চালিয়েছে। বৈকালিক সূর্য্যের আলোর পেশীবহুল দেহে স্বেদবিন্দু চিকচিক করে। যেন বাদামতেল মেখেছে দেহে। মাল্লাদের পিঠে দেশী বন্দুক এক একটা। চামড়ার বন্ধনীতে বাঁধা। কোমরে ছোরা।

ছিপের এক প্রান্তে একজন। হয়তো কৃষ্ণরামের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি। জমিদারের দূত। গোলাপী রেশমের চাপকান, মাথায় সাদা গরদের পাগ, চাপ পায়জামা, পায়ে জরির নাগরা। বক্ষে বাহুতে আর দুই পায়ে লৌহসারের বর্ম্ম। একটা প্রতিনিধির কপালে লাল চন্দনের তিলক না জয়টিকা বলা যায় না। দুই কানে দু'টা হীরার টাপ। চোখে সুর্মারেখা। মুখে যেন ঈষৎ ব্যঙ্গের হাসি।

কৃষ্ণরামের প্রতিনিধি লাফাতে লাফাতে ছিপ থেকে নেমে এক লাফে বজরায় উঠে পড়লো। একটা নামমাত্র সেলাম ঠুকে বললে সহাস্যে,—আমাদের গৃহবধূকে আপনি কি কারণে হরণ করেছেন? আমাদের জমিদার মহাশয়ের এটা প্রথম প্রশ্ন।

কাশীশঙ্কর হাস্যভরা মুখে প্রতিনিধিকে অভিবাদন জানালেন। বজরার এক কক্ষে স্বাগতম্ জানালেন তাকে। হাসতে হাসতে বললেন,—কি সৌভাগ্য আমার! আপনার ন্যায় এক সজ্জনের পদার্পণ হয়েছে এই অধমের বজরায়।

কথায় কর্ণপাত করে না প্রতিনিধি। বজরার ঘরে একটি বেতের কেদারায় আসন নিয়ে ইদিক-সিদিক দেখতে দেখতে বললে,—মহামহিম কৃষ্ণরামের দ্বিতীয় প্রশ্ন, আমাদের কুলবধূ রাজকুমারী বিন্ধ্যবাসিনী, যিনি আপনার পিতা, মৃত রাজবাহাদুরের ঔরসজাত কন্যা, তাঁকে মহাশয় আপনি সঙ্গে লয়ে যেতে পারেন, তৎপূর্ব্বে কুলীন-কুলগুরু জমিদার কৃষ্ণরামের সহ দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হ'তে কি সম্মত ও প্রস্তুত আছেন?

মৃদু হাসির সঙ্গে কাশীশঙ্কর বললেন,—হাঁ, অবশ্যই অবশ্যই। তবে বিনা অস্ত্রে না অস্ত্রসহ সেই কথাটি জ্ঞাত হওয়ার প্রয়োজন।

প্রতিনিধি গোঁফের সূক্ষ্ম প্রান্তে পাক দিতে দিতে বললে ;—অস্ত্রধারণের বাধা নাই, কৃষ্ণরাম হাতাহাতি মল্লযুদ্ধের পক্ষপাত নন।

—অস্ত্রের পরিচয়টা ব্যক্ত করেন। কুমারবাহাদুর বুকভরা শ্বাস টেনে বললেন। একটা হাই তুললেন বিনিদ্রায় ; টুস্কি দিলেন কয়েকটা ওষ্ঠমুখে।

—অসিযুদ্ধ! প্রতিনিধি একটি শব্দ বলেই ক্ষান্ত হলেন। বেতের কেদারায় শরীর এলিয়ে দিলেন। পায়ের পরে পা তুলে পা নাচাতে থাকলেন।

—আমি প্রস্তুত আছি, কুমারবাহাদুর বললেন। সাবলীল কণ্ঠে কথার শেষে তিনি কক্ষমধ্যে পায়চারী করতে থাকেন সশব্দ পদক্ষেপে।

পার্শ্বকক্ষে রাজকন্যা বিন্ধ্যবাসিনী। রুদ্ধশ্বাসে কান পেতে শুনছেন দুই-জনের কথা বিনিময়। দ্বন্দ্বযুদ্ধ! সমুখযুদ্ধ! অসিযুদ্ধ! রাজকুমারীর শ্বাসগতি যেন থেমে গেছে চির দিনের মত। অঙ্গে অঙ্গে কম্পন ধরছে অব্যক্ত ভয়ে। দুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রুবিন্দু টল টল করছে দুই চোখের পাতায়।

—মহাশয় পুনরায় একবার মনে মনে খতিয়ে দেখুন, মহামান্য কৃষ্ণরাম অসিযুদ্ধে আজও অদ্বিতীয়। তবু তো কত কাল অসি ধরেন না হাতে।

—আমি যে অদ্বিতীয় এমন কথা সত্য নহে। আমারও অনভ্যাস। কাশীশঙ্কর পাদচারণা থামিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন,—তবে কৃষ্ণরামের আবেদন অগ্রাহ্য হোক, তাও চাহি না।

—আবেদন! ভুলকথা বলেন কেন? প্রতিনিধি ঘোর প্রতিবাদের সুরে বললেন। বললেন,—আবেদনের পরিবর্তে বলেন আদেশ।

—সেই কথাতেই যদি মহাশয় প্রসন্ন হন তবে ধরে লওয়া হোক কথাটা কৃষ্ণরামের আদেশ। সজোরে হাসতে হাসতে কুমারবাহাদুর বললেন।

—যুদ্ধক্ষেত্র কোন স্থানে হয়, কুমারবাহাদুর আপনার অভিলাষ ব্যক্ত হোক।

বাম হাতের মুষ্টিতে নিজের চিবুক ধরে ভাবতে ভাবতে বললেন কাশী-শঙ্কর,—যুদ্ধক্ষেত্র আমার এই বজরার ছাদেই হবে?

কক্ষে নীরবতা থমকে থাকে খানিক। প্রতিনিধি হাঁ এবং না কিছুই বলতে পারে না। কৃষ্ণরামের সম্মতি বিনা কথাও দেওয়া যায় না। বলেন,—নমস্তে কুমারবাহাদুর। বিদায়।

তীরে, অরণ্য মধ্যে হিংস্র বাঘের মত যেন ওৎ পেতে বসে আছেন কৃষ্ণরাম—উচ্চ গাছে বাঁধা মাচায়। শিকার ধরবেন তিনি আজ। চোখে দূরবীণ তুলে সাগ্রহে লক্ষ্য করছেন দূরের ছবি। কেমন যেন বিস্মিত হলেন কৃষ্ণরাম। কিছুই ঠাওরাতে পারলেন না। আবার দেখলেন, বজরা আর থেমে নেই, এগিয়ে চলেছে বেশ দ্রুতগতিতে দক্ষিণ অভিমুখে।

কপালে এক করাঘাত করলেন জমিদার কৃষ্ণরাম। ভেরী বাজাতে থাকলেন বারবার। দেশী বন্দুক্ আবার গর্জ্জে উঠলো—গুড়ুম্, গুড়ুম্, গুড়ুম্।

ভীত হয়ে উঠলো কাকের ঝাঁক। সভয়ে আকাশে উড়লো তারা আকাশ-ফাটা শব্দের তাড়নায়। বনের পশুপাখী ডাক দিয়ে উঠলো।

বজরা আবার এগিয়ে চলেছে। গুলীবারুদ উপেক্ষা করছে যেন সদম্ভে। রাশি রাশি আগুনের ফুলের স্তবক আবার ছুটতে ছুটতে আসছে আর গঙ্গা-গর্ভে পড়ছে। কাশীশঙ্কর কক্ষ থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

নর্ত্তকীর দল যেন জলনৃত্য নেচে চলেছে। বজরার মাঝিদের হাল চলেছে সমতালে। একটি ছন্দে বাঁধা সুরের লহরা খেলছে জলে। গঙ্গার ঘোলাটে জলে লাল আলতা ভাসছে। ঘোর লাল রক্ত। গুলীবিদ্ধ মাঝিদের দেহ থেকে রক্ত ঝরছে জলে। হোলী খেলায় মেতে উঠছে কারা যেন।

শ্বাসপতন থেমে আছে কুমারবাহাদুরের। আবার যদি আক্রমণ চলতে থাকে। তীর থেকে উড়ে আসে যদি রাশি রাশি অগ্নিপিণ্ড। নবাব-নাজিমের কাছে যদি নালিশ যায় রাজকুমারের বিরুদ্ধে! গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী হয় যদি কাশীশঙ্করের নামে, খুন আর অপহরণের দায় দেখিয়ে!

সর্দ্দার-মাঝি চিৎকার করছে আর মাঝিদের মাথার পরে শঙ্কর মাছের

চাবুকের পাক দিয়ে চলেছে। সর্দার বললে,—কিনারা বরাবর চল! বন্দুক লাগলে গায়ে লাগবে না আমাদের।

আকাশ-বাতাস থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠছে। গগন-বিদারক শব্দ গাদা বন্দুকের থামছে না আর। দ্রুতগামী বজরার আশে-পাশে ছুটে এসে পড়ছে আগুনের গোলা।

কৃষ্ণরাম যদি বাঙলার নবাবের কাছে ফরিয়াদ করে! যদি মকদ্দমা ঠুকে দেয় একটা—কালীশঙ্করের চিন্তার শেষ নেই যেন। কৃষ্ণরামের অসাধ্য কিছুই নেই।

—দুর্গা দুর্গতিনাশিনী, বিপদতারিণী মা আমার! বজরার নির্জন কক্ষে আপন মনে স্বগতঃ করেন বিন্ধ্যবাসিনী। দুর্গানাম জপ করতে থাকেন।

জগমোহন কৈ কোথায়! কুমারবাহাদুর চোখের দৃষ্টি চালিয়ে চালিয়ে সন্ধান করেন তার। জগমোহন চেঁচিয়ে উঠলো সহসা। বললে,—সর্দার, বজরা আরও জোরে চালাতে বল।

জগমোহন যেন ত্রাণকর্তা। সর্দার তার কথামত কাজে নির্দেশ দেয়। বজরার গতিবৃদ্ধি হতে থাকে।

রাজকুমারী কক্ষ থেকে মুখ দেখিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললেন,—জগমোহন, তোমাকে সোনার হার দেবো আমি। নগদ একশো মোহর।

—সবাই তো আমার রাজকুমারী। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে কথা বলে লেঠেল। হেসে হেসে বললে,—সুতানুটীতে না যাওয়াতক আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি না। তারপর দেওয়া-নেওয়ার কথা হবে। রাজমাতার কাছ থেকে আমি দুদশ কাঠা জমি ভিক্ষা করবো। ঘর তুলবো, বাসা বাঁধবো।

—বেশ কথা। আমি তখন তোমার পক্ষ নেবো। বিন্ধ্যবাসিনী কথা দিলেন। ভাণ্ডার ঘরে সিঁদিয়ে গেলেন।

—কি বল, জগমোহন, আমরা এক্ষণে বিপদের এলাকা ছেড়ে এসেছি, আর কোন ভয় নেই। কালীশঙ্কর কথা বলতে বলতে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করলেন। পড়ন্ত বেলায় সূর্য্যতাপে তিনি দরদর ঘামছেন! উত্তেজনার আধিক্যে যেন এখন কেমন নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়েছেন! ঘন ঘন শ্বাস ফেলেছেন।

নর্ত্তকীদের নৃত্যে তাল থামবে না আর। ঘন ঘন হাল চালনায় জলনৃত্যের ঘুঙুর বেজে চলেছে যেন।

বিন্ধ্যবাসিনী সহোদরের পাশে এসে বসলেন। হাতপাখা ধরলেন স্বহস্তে। বললেন,—ভাই, তুমি আর চিন্তা কর কেন?

কাশীশঙ্কর ফরাসে দেহ এলিয়ে দিয়েছেন। তাকিয়ায় ঠেস দিয়েছেন। মৃদু হাসির সঙ্গে বললেন,—চিন্তার কি শেষ আছে বিন্ধ্য? মাঝিদের পানা-হার দাও তুমি। তারা ক্লান্ত, অবসাদগ্রস্ত হয়েছে।

—তুমিও কিছু খাও। মিষ্ট সুরে মিনতি জানালেন রাজকন্যা।

কুমারবাহাদুর বললেন,—তুই আর আমি একত্রে একপাত্রে আহার করবো আজ। মাঝিদের তুষ্ট কর অগ্রে।

বিন্ধ্যবাসিনীর ম্লান বিষণ্ন মুখে আনন্দের হাসি ফুটলো। আবার ভাণ্ডারে গেলেন তিনি। বললেন,—তাই হোক। ভাই তোমার কথাই থাক।

সূর্য্য কখন অস্তাচলের পথে এগিয়েছে, কারও নজরে পড়ে না। গঙ্গার অন্য তীরে পূর্ব্ব-আকাশে সোনার সূর্য্য, দিগন্তে অবগাহনের জন্য চলে পড়েছে। রূপালী চিকণ আর দেখা যায় না জলে। গৈরিক রঙের রেখা ছড়িয়েছে গঙ্গায়। সূর্য্য যেন তার পোষাক বদল করছেন। লোহিত রূপ ধরছেন ধীরে ধীরে।

কাশীশঙ্কর কান পাতলেন একাগ্রচিত্তে, বজ্রধ্বনি আর শোনা যায় না। কুমারবাহাদুর একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন জানলার বাহিরে—শুভ্র লাল আকাশ দেখছেন। কুমারবাহাদুর মনে মনে বললেন,—ওঁ হ্লীং বগলামুখী—

সূর্য্যের শেষরশ্মি কুমারের ললাটে ছড়িয়েছে। আলোর জয়টিকা যেন।

আগুনের বন্যা বইছে দিকে দিকে। লেলিহান শিখা সর্পফণার মত থেকে থেকে ছোবল মারে। কোটি কোটি লকলকে জিহ্বা বিস্তার করেছে। তপ্ত হাওয়ার একটা একটা অশান্ত ঘূর্ণীঝড় উঠলো এখানে সেখানে, মাটি থেকে ঊর্দ্ধমুখে।

বৈকালী সূর্য্যের আলো পড়েছে জমিদার কৃষ্ণরামের প্রশস্ত কপালে। লাল-চন্দনের জয়তিলক, রক্তলেখার মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আলোর আভায়।

কৃষ্ণরামের ললাট যেন দপদপ করছে জ্বরের রোগীর মত। সুতাহুটির বজরা, দেখতে দেখতে বহু দূরে এগিয়ে গেছে। বুদ্ধির পরাজয়ের লজ্জায় কৃষ্ণরাম কেমন যেন অস্থির হয়ে আছেন। বজরা পালিয়ে যাবে চোখে ধুলা ছিটিয়ে, ভাবতে পারেন না যেন। দুই হাতের বজ্রমুষ্টি শিথিল হতে চায় না।

মাথা উঁচু কয়েকটি দেবদারু গাছ কাছাকাছি মাথা তুলেছে আকাশে। গাছের শাখায় শাখায় জমিদারের মাচা বাঁধা। বাঁশের কেল্লা, হোগলার ছাউনিতে ঢাকা। মখমলের চাদর বিছানো ফরাস, যেন কণ্টকশয্যার রূপ ধারণ করে।

কথা বললেন জমিদার কৃষ্ণরাম, কেমন যেন নিস্পৃহ কণ্ঠে। খানিক থেমে থেমে বললেন,—চল, এই স্থান ত্যাগ করা যাক। কথার শেষে অসি কোষে ভরলেন। বললেন,—আমার দূরবীণ, বন্দুক আর বারুদের আধার নীচে নামাও।

নীচে দেবদারুর ছায়ায় জমিদারের বাহিনী। পাইক, পেয়াদা, লেঠেল আর তীরন্দাজ। সব সমেত পঞ্চাশ জন হয়তো। ঢাল, তরোয়ালের তোলাপাড় শুনে ঘোড়াগুলো পা ঠুকছে মাটিতে। কৃষ্ণরাম অশ্বারোহণে এসেছেন সদলে—সপ্তগ্রাম থেকে বংশবাটীতে, গঙ্গার তীরে।

রাশের বাঁধন যেন মানতে চাইছে না আর। ওষ্ঠমুখ ঘষছে বুকের কাছে, গ্রীবা বাঁকিয়ে। সুসজ্জিত অশ্ব যত্র-তত্র ছড়িয়ে আছে। গাছের শাখায় কাণ্ডে, রাশের দড়ি বাঁধা। পা ঠুকছে ঘন ঘন, আর নাকে-মুখে শব্দ তুলছে অধৈর্য্যের।

বাঁশের সিঁড়ি মাচা থেকে মাটিতে নেমেছে। সেই মই বেয়ে নীচে নামলেন কৃষ্ণরাম। তাঁর মুখাকৃতি অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ। চোখের দৃষ্টিতে বিরক্তির চাউনি। এধার-সেধার দেখতে থাকেন, কাদের যেন খুঁজতে থাকেন। বললেন—লোক-লস্কর কোথায় সব?

—হাজির আছে হুজুর! দল-নায়ক কথা বললে সেলাম ঠুকতে ঠুকতে বললে,—এখন কি হুকুম তাই বলেন।

—যাত্রা করতে হবে এখনই। কৃষ্ণরাম বললেন,—সকলকে শুনিয়ে, জোরালো কণ্ঠে। বললেন,—পাততাড়ি গুটাও, আর বিলম্ব নয়। আমার অশ্ববাহন কৈ, কোথায়?

পাইক-পেয়াদার দলপতি ঘোড়ার রাশ ধরে এগিয়ে আসে। ধূসর-শাদা রঙ, নানা চর্ম্মসজ্জায় ঢাকা পড়েছে। কৃষ্ণরামকে চোখে দেখতে পেয়ে ঘোড়াটি সোল্লাসে পা ঠুকতে থাকে। ঘুন্টির মালা ঝুনঝুন শব্দ তোলে। কৃষ্ণরাম ব্যতীত অন্ত কাকেও সওয়ার নেয় না সে।

দলপতি বললে,—বেলা আর নাই বললেই হয়। যেথাতেই যান না কেন পৌছাতে রাত্রি কাবার হবে জানবেন। পথে বিপদের ভয় আছে।

—তা হোক। আমার সম্মান ক্ষুন্ন হয়, তা আমি চাহি না। কথা বলতে বলতে কৃষ্ণরাম লাগামে পা দিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে উঠে বসলেন।

—ভেবে দেখেন হুজুর! পথের কষ্ট স্মরণ করেন।

কৃষ্ণরাম বললেন,—তা হোক, বজরাকে ধরতেই হবে। কাশীশঙ্করের ধূর্ত্তামির সমুচিত জবাব দিতে চাই। আর সময়ক্ষেপ নয়।

দলপতি কি যেন ভাবতে থাকে। ভেবে ভেবে বললে,—বজরাকে ধরা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। দুই চার ক্রোশ ঘোড়া ছুটালেই বজরার পাত্তা মিলবে। তবে হুজুর, রাত-বেরাতে কাজ হবে কি?

আবার আশা-প্রদীপের আলো দেখতে পাওয়া যায় যেন। জমিদার কৃষ্ণরাম ক্ষীণ হাসির সঙ্গে বললেন,—তোমার কথা যদি সত্য হয়, তবে তুমি নিশ্চয়ই পুরস্কৃত হবে। আমার বাহিনীকে হুকুম দেও, আমাকে অনুসরণ করুক।

•

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কখন কৃষ্ণরাম অশ্বে কশাঘাত করলেন। তীরবেগে ছুটলো ঘোড়া। কাল-বৈশাখী মেঘের মত, জমিদার এক রুষ্ট মূর্তিতে পথ-প্রান্তর অতিক্রম করেন। অশ্বখুরোত্থিত ধূলিরাশিতে গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। অশ্বের পদশব্দ, অস্ত্রশস্ত্রের ঝনৎকার, লেঠেল আর তীরন্দাজের

হুঙ্কারধ্বনির সঙ্গে মিশে বনাঞ্চলে যেন এক বিভীষিকা সৃষ্টি করে। কৃষ্ণরাম প্রভঞ্জন-বেগে অশ্ব ছুটিয়েছেন। তাঁর পিছনে ছুটেছে তার অশ্ববাহিনী, রণসজ্জায় সজ্জিত। ধ্রুবতারাকে লক্ষ্য রেখে জলযান যেমন অগ্রসর হয়, তেমনই কাশীশঙ্করের বজরাকে লক্ষ্য করে অশ্বারোহীরা যেন বিদ্যুৎ-বেগে ছুটে চলেছে। রাত্রি আর যৎসামান্য ঘন হলেই বজরা আর দৃষ্টিগোচর হবে না। গ্রাম, জনপদ, জলা আর জঙ্গল একে একে অতিক্রান্ত হয়। ভয়ার্ত জনপদবাসী সভয়ে সরে দাঁড়ায় পথের পাশে অশ্বপদতলে পিষ্ট হওয়ার ভয়ে। কৃষ্ণরাম সমরকৌশলী। কিন্তু আজ যেন তাঁর কলাকৌশল আর টিঁকে না। অশ্বারোহণ ও অস্ত্রচালনায় তিনি সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ। হাত নিশপিশ করে, কিন্তু সাক্ষাৎ নাই যে প্রতিপক্ষের।

সাঁঝের আলো-আঁধার আকাশ প্রান্তে। বিদায়ী সূর্য্যের লালিমা ছড়িয়েছে গঙ্গার বুকে, মানুষের মুখে, বৃক্ষের চূড়ায়, গৃহস্থের গৃহশীর্ষে। যেন মুঠো মুঠো আবির ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। দ্রুতগতিতে বজরা ভেসে চলেছে। গানের সুরের মত, কাব্যছন্দের মত, সমানে তাল তুলছে বজরার মাল্লাদের হাতে, সারি সারি হাল। দেশায় মদ্যপান করেছে মাঝি-সর্দার। কাশীশঙ্কর একটি স্বস্তির শ্বাস ফেললেন। বললেন,—জগমোহন, আর কোন বিপদাশঙ্কা নাই তো?

লেঠেল জগমোহন, কুমার বাহাদুরের স্কন্দ-প্রতিম ও মনোমুগ্ধকর দেহ দলাই মলাইয়ের কাজে লেগেছে। গৃহ সুখ নেই বজরায়, দেহে যেন ব্যথা অনুভব করেন কাশীশঙ্কর। আরামের শয্যা যেন ভুলে গেছেন রাজকুমার।

খানিক নিশ্চুপ থেকে জগমোহন বললে—বলা কি যায় রাজামশাই, কখন কি হয়! জমিদার কৃষ্ণরামের যে কি অভিসন্ধি কে বলতে পারে! পুনরায় যদি আক্রমণ চালায় নদীর তীর থেকে! যতক্ষণ না রাত্রি গভীর হয় ততক্ষণ আমার ভাবনা ঘুচবে না। রাত্রিকালে বজরাকে দেখা যাবে না তীর থেকে। বন্দুকের গোলা আর ধনুকের তীর ফসকে যাবে। লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হবে।

—রাত্রির দেরী কত আর ? আকাশে চোখ তুলে বললেন কুমারবাহাদুর। বললেন,—মধ্যে মধ্যে মনে হয় দিবারাত্রের গতি যেন নাই আর। দুঃখের রাত্রি কি শেষ হয় শীঘ্র ?

কুস্তীর প্যাঁচ কষছে যেন জগমোহন। মল্লের মত কুমারবাহাদুরের বলিষ্ঠ দেহটা সঙ্গে যেন লড়াই করছে। কুমারের গা টিপছে সজোরে, সযত্নে।

বজরার এক কক্ষ মধ্যে সাধিকা তপস্বিনীর মত রাজকুমারী বিন্ধ্যবাসিনী যেন ধ্যানে বসেছেন। তিনি যেন মলিন ও কৃশ হয়ে পড়েছেন! যে মুখখানি সদাক্ষণ হাসিতে উৎফুল্ল থাকতো, তা এখন বিষাদ-কালিমায় আচ্ছন্ন। তাঁর মনের সুখ বিনষ্ট হয়েছে, বিলাস বিভ্রমকে তিনি ত্যাগ করেছেন। তাঁর জীবনের কালরাত্রি কি শেষ হবেনা। চিন্তাস্রোতে মগ্ন হয়ে আছেন রাজকুমারী। তাঁর অধর থেকে থেকে কাঁপছে।

—তোমার মঙ্গল হোক জগমোহন! কাশীশঙ্কর বললেন, ব্যথা লাঘবের আরামে। দেহকষ্ট সত্যই যেন দূর হয়ে যায়। আলস্য ভঙ্গ হয়। পুনরুজ্জীবনের মন্ত্র পড়ে যেন জগমোহন। কুমারবাহাদুর আবার বললেন,—জগমোহন নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছাবো কি সুতানুটিতে ?

—ঈশ্বর জানেন! লেঠেল আকাশের দিকে চোখ-ইশারা দেখিয়ে বললে, —কুমারবাহাদুর, যতক্ষণ না সুতানুটির মাটি দেখতে পাই ততক্ষণ বলা কি যায় কিছু ?

—বিন্ধ্য কোথায় ? আপন মনেই শুধোলেন কাশীশঙ্কর। বললেন—সে এমন লুকিয়ে আছে কেন ? কি করে কি ? কে জানে।

—মনের কষ্টে হুজুর! রাজকুমারী কি আর সুখের মুখ কখনও দেখেছেন! তাঁর ভাগ্যটাই যে পুড়ে গেছে বিয়ের রাত থেকে। জগমোহন কথা বলে সহানুভূতির সুরে। বলে—তাঁকে কি ডাকবো কুমারবাহাদুর ? দুটাকথা কইলে তবু তাঁর মনটা খুশী হয়।

চিন্তালু চোখে তাকিয়ে থাকেন কুমারবাহাদুর। ভেবে ভেবে বললেন,— তাই হোক। সে আসুক এই ছাদে। ভাবনা চিন্তার কি শেষ আছে মানুষের।

প্রসন্ন হাসি হাসলো জগমোহন। বীর হনুমানের মত লাফ দিয়ে দিয়ে বজরার ছাদ থেকে নামতে থাকে সে। ডাক দেয় রাজকন্যাকে। বলে,—রাজকন্যা, বলি ও রাজকন্যা। ভাই যে খুঁজে খুঁজে সারা হয়ে পড়ছে।

মুখে অকৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে দুয়োরে দেখা দিলেন বিন্ধ্যবাসিনী। নীরব সাড়া দিলেন যেন। স্মিত হাসির সঙ্গে বললেন,—ভাই আমাকে ডাকছে কেন জগমোহন? কিছু ভয়ের কারণ নাইতো?

এপাশে ওপাশে মাথা দুলিয়ে জগমোহন বললে,—না না ভয়-ডরের কিছু নাই। কুমার ডাকছেন দু'দণ্ড কথা কইবেন।

লাজুক হাসি হাসলেন রাজকন্যা। বললেন,—এই মুখখানা আর লোক-চক্ষে দেখাতে ইচ্ছা হয় না যে। পোড়া বরাত আমার।

সুবেশ, সুন্দর, প্রিয়দর্শন অথচ পৌরুষব্যঞ্জক কুমারের মূর্তি, প্রস্তরীভূত হয়ে আছে যেন। তাঁর বিশাল চোখের দৃষ্টি অস্তগামী সূর্য্যের প্রতি আবদ্ধ। তপ্তরৌদ্র আর নেই, লোহিত সূর্য্য যেন দাহিকা হারিয়ে স্নিগ্ধ রূপ ধরেছে।

সন্ধ্যাকে বন্দনা করছেন কাশীশঙ্কর। আহা, রাত্রি ঘনিয়ে এসে দিগ্‌দিক ভরে দিক অন্ধকারে। চোখের দৃষ্টিপথ থেকে মুছে যাক লক্ষ্য। দৃশ্যমান অদৃশ্য হোক। শত্রুর চোরাদৃষ্টি ব্যাহত হোক ঘন তমিস্রায়।

ধীরে ধীরে বজরার ছাদে উঠলেন রাজকুমারী। ফরাসের এক পাশে বসে পড়লেন ক্লান্তদেহে। সামান্য হাসির রেখা মুখে ফুটিয়ে বললেন,—ভাই, তুমি কি অসুস্থ বোধ কর? বিশ্রাম লও আরও খানিক।

কাশীশঙ্কর ঘুরে বসলেন। সহোদরাকে সাগ্রহে দেখলেন কতক্ষণ। বললেন,—মুখে হাসি নাই কেন তোমার?

অধোবদন হলেন রাজকন্যা। শাড়ীর অঞ্চল পাকাতে থাকেন আর বলেন—আমার জন্য তোমার কত কষ্ট। এতে লজ্জা পাই।

হাসতে থাকেন কাশীশঙ্কর সহোদরীর কথায়। বললেন,—তুমি তো আমার ভগিনী, এমন বিপদে যে কোন নারীকে আমি এই মহাবিপদ থেকে রক্ষা করতে পরাঙ্মুখ হতাম না। বিপদের অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতাম।

—তুমি যে মহান। তোমার অন্তরে তো কোন খাদ নাই। বিন্ধ্যবাসিনী কথা বলেন আর অঞ্চলপ্রান্ত পাকাতে থাকেন অধোমুখে। বলেন,—ছোট বধূঠাকুরাণী কতই না ভাবছেন। আমার জন্যই নিশ্চয়ই তিনি—

হো-হো শব্দে হেসে উঠলেন কাশীশঙ্কর। বললেন,—মহাশ্বেতা তেমন বিবেচনাহীন নয়। তোর প্রতি তার অগাধ স্নেহ ভালবাসা। তবে সে বড্ড অভিমানী, এই যা।

বিন্ধ্যবাসিনী বলেন,—আমার কথা বাদ দাও। তুমি অক্ষত দেহে সুতানুটিতে পৌঁছালেই আমার নিশ্চিন্তা।

আকাশের লালিমা ঘুচে যেতে থাকে অতি ধীর গতিতে। শুভ্রনীল আকাশে কালির লেপন পড়েছে। সাঁঝবেলার একটি কি দু'টি তারা ফুটেছে কখন। বাতাস চলেছে দক্ষিণের। দুই তীরে ঘন সবুজ বনে বনে ঢেউ খেলছে যেন। হাওয়ার বেগে। গাছের শীর্ষ নত হয়ে পড়ছে থেকে থেকে।

সন্ধ্যা মন্থরা। দিনের আলোর সঙ্গে তার চির দিনের দ্বন্দ্ব। একে অন্যকে সহ্য করতে পারে না। তবুও আঁধার-কালিমা স্পষ্ট হতে থাকে গঙ্গার তীরদেশে। ঘন সবুজ কখন কালো হয়েছে কে জানে! পর্ণকুটিরে আর দেবতার দেউলে দীপ জ্বলছে। আকাশের কয়েকটি তারা যেন খসে পড়েছে। কক্ষচ্যুত হয়েছে। সোনালী টিপের মত দপ দপ জ্বলছে মাটির বুকে।

সুতানুটিতেও সন্ধ্যা নেমেছে তখন। শুক্লা রজনীর চাঁদ ভেসে উঠেছে আকাশে। যেন মেঘের অবগুণ্ঠন সরিয়ে নিলাজ চাঁদ দেখা দেয় লোকচক্ষে। মন্দিরে মন্দিরে শাঁখ-ঘণ্টা বেজে চলেছে। মসজিদের মিনার থেকে আজানের সুর ভাসছে বাতাসে।

মহাশ্বেতা দিনের শেষে গৃহচুড়ায় হাওয়া মহলে উঠে বসেছেন। বৈশাখী হাওয়ায় তাঁর বন্ধনমুক্ত কেশদাম উড়ছে। ঢাকাই শাড়ীর পাৎলা আঁচল উড়ছে শ্বেতপতাকার মত।

বনলতা তারা দেখছে একদৃষ্টে মুখ উঁচিয়ে। চাঁদ দেখছে অপলক চোখে।

খোঁজাখুঁজি করছে হয়তো কোথায় সেই বুড়ীটা। ঘর্ঘর চরকা ঘুরিয়ে চলেছে চাঁদের মধ্যে একলা সঙ্গী, সুতা কাটছে হাসতে হাসতে।

মহাশ্বেতা বললেন,—বনরাণী, তুমিও আবার একদিন পরের ঘরে চলে যাবে।

কথা শুনে চমকে ওঠে বনলতা। বিষম দুঃসহ এক দুঃখ-আবেগে তার শ্বাস পড়ে না যেন। এ সব কি প্রলাপ বকছে মা! যত সব মনে কষ্ট হওয়ার কথা বলছে কেন আজ! চোখ বড় করে সে। তাকিয়ে থাকে ড্যাবা ড্যাবা চোখে। দুই সূক্ষ্ম ভুরুতে বিস্ময় ফুটেছে। বললে,—কোথায় যাবো মামনি? পরের ঘরে?

দুঃখ আর আনন্দের হাসি হাসলেন মহাশ্বেতা। মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন,—বিশ ঘোড়ার গাড়ীতে চ'ড়ে তুমি শ্বশুর ঘরে যাবে। কত বাজনা বাজবে, বাজী পুড়বে, সঙ নাচবে। আলো জ্বলবে কত, তার কি কিছু ঠিক আছে!

—তুমি আমার সঙ্গে যাবে? বাবামশাই? অবাক চোখে বললে বনলতা কেমন যেন কাঁদো-কাঁদো গলায়। ঠোঁট ফুলে উঠলো একবার।

কালো পশমের মত চুল বনলতার মাথায়। মাতৃস্নেহের স্পর্শ পেয়েছে। মহাশ্বেতার শুভ্র নিটোল করপল্লব মেয়ের কোঁকড়া চুলের রাশিতে।

—আমরা কেন যাবো তোমার ঘরে ঘর করতে? বুকের কাছে মেয়েকে টেনে নিয়ে মিষ্টি সুরে মহাশ্বেতা বলেন। বললেন—তোমার ঘরে তুমি যাবে। তুমি থাকবে। সংসার করবে।

কাজলপরা চোখ ছলছলিয়ে উঠে। বনলতা একবার যেন ফুঁপিয়ে উঠলো। কথা ফুটছে না মুখে। ভয় আর ভাবনায় যেন জড়সড় সে।

কন্যা যাবে শ্বশুরালয়ে। বসবাস সহবাসে অধিষ্ঠাত্রী থাকবে। লক্ষ্মীস্বরূপিণী তনয়া ঘরে ঘরে লক্ষ্মীশ্রী বর্দ্ধিত করবে। রাজকুমারী বিন্ধ্যবাসিনী স্বামীর ঘর ত্যাগ করবে। ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে আসবে। নিয়ম পালনের আর সুখ-সুবিধার জন্যে সীঁথিতে সিঁদুর দেবে হয়তো নামমাত্র।

মহাশ্বেতার মন যেন সায় দিতে চায় না। ভাল লাগে না যেন ভাবতে, শুধু কেবল নামের আয়তী হয়ে থাকা। মুখে প্রকাশ করতে পারেন না কোন দিন। বলতে পারেন না মনের কথা কারও সমুখে। যাঁর ভগিনী তাঁকেও নয়। কালীশঙ্কর স্নেহের আতিশয্যে আর বিন্ধ্যবাসিনীর অসহ অবস্থার কথা শুনে যেন চোখে কানে আর দেখতে পেলেন না। এক জিদের বশে উদ্ধার করতে গেলেন বোনকে।

মনের কষ্টে ছুটে পালিয়ে যায় মেয়ে। তার পায়ের তোড়া ঝমঝমিয়ে বেজে চললো পায়ে পায়ে। হাওয়া মহল থেকে এক ছুটে পালিয়ে যায় উড়ন্ত পরীর মত।

নিজ মনে হাসলেন মহাশ্বেতা। কেউ নাই, তবুও হাসি কেন কে জানে! যেন অব্যক্ত, অস্ফুট। ধীরে অতি ধীরে সেই না-ফোটা হাসি রাঙা অধর থেকে অদৃশ্য হতে থাকে! এখন তিনি একা। যতদূর চোখ যায়, কেউ নাই কোথাও।

ওপরে সন্ধ্যাকাশ। সমুখে পাশে পিছনে দীর্ঘ বৃক্ষশ্রেণী। কোথাও বা খড়ের চালা, মাটির ঘর, বসতি বা বস্তী। নারকেল গাছের পাতার আড়ালে চাঁদ উঠেছে কখন। পূর্ণিমা কাছে, চাঁদের শোভায় কেমন যেন পূর্ণতাপ্রাপ্তি হয়েছে।

শুক্লারজনীতে একা মহাশ্বেতা। শয্যা আজ কণ্টকশয্যায় পরিণত হবে। অদৃশ্য আলিঙ্গনের স্পর্শ নেই, কল্পনাই সার।

ঠিক এই মাত্র রাজগৃহের নাটমন্দিরে সন্ধ্যারতির শাঁখ-ঘণ্টা বেজে উঠলো। ঘড়ি-ঘণ্টা আর জগঝম্প বাজতে থাকে ঢিমে তেতালায়।

শ্বেতপ্রস্তরের আসন ছেড়ে উঠলেন মহাশ্বেতা। কপালে দুই হাত ছোঁয়ালেন। হাওয়া-মহলের নির্জ্জনতা ছেড়ে চললেন।

বৈকালী এসেছে এতক্ষণে, নাট-মন্দির থেকে। দেবীর বৈকালিক ভোগ এসেছে। উজাড় করতে হবে নৈবেদ্য-আধার। তারপর যেতে হবে রাজমাতার কাছে। দেখা দিতে যেতে হবে। রাজমাতার মহল থেকে ফিরতে ফিরতে রাত্রি ঘনিয়ে আসবে হয়তো।

ওপাশে রাজমহল যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। সাড়াশব্দ নেই। মনুষ্যকণ্ঠের সুর

শোনা যায় না। রাজাবাহাদুর এখনও দিবানিদ্রায় ডুবে আছেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে, রাজা কালীশঙ্কর জানেন না।

দিনে নিদ্রা, রাত্রে জাগরণ। কেমন যেন বলগাহীন মন রাজার; শক্তি মাদকতার ক্রীড়াপুতুল। অতিরিক্ত লালসায় তাঁর ন্যায়পরতা ও সুবুদ্ধি যেন লুপ্ত হতে চলেছে।

রঙমহলে আজ আবার কে বা কারা প্রতীক্ষায় বসে আছে। রাজার নিদ্রা ভঙ্গ হবে কতক্ষণে, সেই আশায় মুহূর্ত গুণছে।

অপ্সরীনিন্দিতা কে একজন। জাতকুল কেউ জানে না। চিৎপুরের ফুল বাগান থেকে এসেছে একটি ফুল। রূপে রসে গন্ধে অতুলনীয়া একজন। রাতটুকু রাজার কাছে কাটিয়ে ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে চলে যাবে সে। রঙমহলে আলো জ্বলছে যেন একশো বাতির রূপের আলো। রাজার তোষামুদে সঙ্গীরা মধুলোলুপ মৌ যেন। তাদের চোখের পলক পড়ছে না।

ফুলকে আস্বাদ করবেন স্বয়ং কালীশঙ্কর। দ'লে পিষে দেবেন বাসিফুলের, আর কোন মূল্য থাকবে না আগামী দিনে, রাজার কাছে।

এমন কেউ নেই এ দুনিয়ায় যে রাজার ঘুম ভাঙাবে। কালীশঙ্করকে তুলে দেবে এই অবেলার ঘুমঘোর থেকে। টানা-পাখা চলেছে রাজার কক্ষে অবিরাম, অবিশ্রান্ত। ঘরে যেন ঝড়ের হাওয়া বইছে। সুগন্ধের ঢেউ খেলছে ঘরে, খসখস আতরের।

বড়রাণী উমারাণী কক্ষে প্রবেশ করলেন শব্দহীন পদক্ষেপে। ঘুম-ভাঙানিয়া তিনি, রাজাকে ডাকলেন মৃদুমন্দ স্বরে। বললেন,—আর কত ঘুমাবেন আপনি? কথা বলতে বলতে রাজার কপালে হাত রাখলেন অতি সন্তর্পণে। বললেন,—রাত্রির বাকী নেই আর! শয্যা ত্যাগ করবেন না?

রাজবাহাদুর চোখ মেলার সঙ্গে বড়রাণীকে দুই বাহুতে টেনে নিলেন বুকের কাছে। নির্নিমেষ তাকিয়ে রইলেন ঘুমের জড়তায়। বললেন,—ছোটকুমারের কোন সংবাদ নাই?

—না রাজাবাহাদুর! আমি তো নি নাই কিছু। উমারাণী বললেন রাজার

সুপ্রশস্ত বুকে মাথা রেখে। বললেন,—আজ রাতে কি আর সাক্ষাৎ হবে? তেমন আশা আছে কি?

কালীশঙ্কর মৃদু মৃদু হাসতে থাকেন। বলেন,—আপাততঃ বলতে পারি না। সাক্ষাৎ না হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। কেন কিছু বিশেষ প্রয়োজন আছে কি?

—নাঃ। একটি শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে উমারাণী রাজার পালঙ্ক ত্যাগ করলেন। উঠে দাঁড়ালেন। চোখে অভিমানের চাউনি ফুটিয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন ধীরে ধীরে। সোজা ছাদে চললেন তিনি। শূন্য ছাদে একা থাকবেন গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত। মনের কষ্টে গুম্‌রে গুম্‌রে মরবেন। বিরহ-বেদনাকে দূর করবেন। আবেগ-উত্তপ্ত দেহকে অন্য মনে থেকে স্নিগ্ধ করবেন।

মেজ আর ছোট রাণীর মহল থেকে সপ্ততারের গুঞ্জন-ধ্বনি ভেসে আসছে। সেতার না বীণ কে জানে, বেজে চলেছে ঠুং-ঠুং। সান্ধ্য-অদৃশ্য নর্ত্তকী নেচে চলেছে যেন অনেক দূরে।

রাজার গলা-খাঁকারির আওয়াজে খানসামা এসে তুলে দেয় তাঁকে। একটি হাত ধরে টেনে তোলে ঘুম-কাতর কালীশঙ্করকে। টেনে তুলে বসিয়ে দেয় রাজাকে।

আলস্য ভেঙে কালীশঙ্কর অসংলগ্ন পদক্ষেপে স্নানাগারের দিকে এগিয়ে চললেন। জলের সংস্পর্শে নিদ্রার ঘোর দূর হয়ে যাবে। যেতে যেতে বললেন, —কাশীশঙ্করের সমাচার আছে কিছু?

খানসামা আর তাঁবেদারের দল নেতিবাচক উত্তর দেয়। না না, না, না কুর্ণিশ করে আর মাথা দোলায়।

স্নান-ঘর থেকে ফিরেই রাজাবাহাদুর সাজ-পোষাক বদল করবেন।

রাজার সাজঘরে পুষ্পাধারের পাত্র নামানো হয়। চন্দনতৈল বের করলে রাজভৃত্য। আতরের শিশিগুলিতে সোনালী টিপ, ঝাড়লণ্ঠনের আলোয় চিকচিক করে। রাজার মাথায় তৈল মাখাতে চললো খানসামা।

হাতীর দাঁতের পেঁটরা বেরুলো কাঠের সিন্দুক থেকে। রত্নাভরণের

পারিপাট্য ঝলসে উঠলো আলোয়। লাল মুক্তার পাঁচনরী, লকেট ঝুলছে হীরা-পান্নার। একখানি রৌপ্যথালিকায় আঙটির স্তূপ বিভিন্ন মণি-রত্নের।

বারোমাসা আতরের একেক সুগন্ধ ভুরভুর করে রাজার মহলে। কেশর-কস্তুরী আর মনপছন্দ সুগন্ধির হাওয়া বইতে থাকে দালানে আর কক্ষে। হাসনুহানার গন্ধ-আবেশে ঘুম-ঘুম পায়।

দ্বারপ্রান্তে চাপরাশী দাঁড়িয়ে আছে মাটির পুতুলের মত। কোমরবন্ধের এক প্রান্তে ঝুলানো তলোয়ার। চোগা আর চাপকান পরেছে। পায়ে লক্ষ্ণৌয়ের জরিদার নাগরা।

বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত রাজার পরিচ্ছদ, সাজঘরের জাজিমে জৌলুশ তুলেছে। বাতাসে দোদুল্যমান আলোয় কালীশঙ্করের বেশভূষা হেসে হেসে উঠছে যেন। কিংখাপের বুটিদার বেনিয়ান আকাশী রঙের। কালো ফুলপাড় ঢাকাই ধুতি পহেলা নম্বর সূতার। সাদা আলপাকার উষ্ণীষে একটা বিশরতি হীরার ধুকধুকি, সাদা পালকের সঙ্গে এঁটে আছে।

রাজার বসন আর ভূষণের প্রভাদীপ্তিতে সাজঘর যেন সদাই জ্বল জ্বল করছে। চার দেওয়ালে চারটে আয়না টাঙানো। প্রসাধন পাত্রে কালাঞ্জন, সুর্ম্মা, চন্দন আর চকের খড়ি। হাতীর দাঁতের চিরুণী। গোলাপজল গোলাপপাশে।

সাজ-পোষাকের পালা চুকিয়ে একবার রাজমাতা বিলাসবাসিনীর দুয়ারে দেখা দিতে যাবেন রাজাবাহাদুর। তারপর? তারপর সোজা রঙমহলে যাবেন দোল-বেদীতে চেপে।

চিৎপুরের ফুল-বাগান থেকে একজন ডানা-কাটা পরী এসেছে আজ রাতে। ডাকসাইটে সুন্দরী কে একজন, আঁট গড়নের।

রাজমাতা জপের মালা গুণছিলেন দেব-দেবীর নামে। কি এক উপসর্গ দেখা দিয়েছে বিলাসবাসিনীর। দিন-রাত্তির মালা জপেছেন আপন মনে।

মহাশ্বেতা কক্ষে প্রবেশ করলেন ধীর পদক্ষেপে। ধৌতবস্ত্র পরেছেন দুধে-আলতা রঙের। রাজমাতার পায়ের কাছে গড় করলেন মহাশ্বেতা। বললেন,—

রাজমাতা, আমি এসেছি।

—কে মা তুমি? কথার শেষে মুদিত চক্ষু খুললেন। দুর্গা প্রতিমার মত আকর্ণ চোখ বিলাসবাসিনীর। সস্নেহে বললেন,—এসেছো মা! এসো আমার কাছে, এই পাশটিতে আসন নাও।

—মান্দারণ থেকে কেউ ফিরলো রাজমাতা? সলজ্জায় শুধালেন মহাশ্বেতা, যেন ঈষৎ নিলাজ হলেন চিন্তাধিক্যে।

বিলাসবাসিনী হাসলেন সামান্য, নির্ভেজাল সহজ সরল হাসি। বললেন,—কেউ ফিরলে তোমাকে জানাবো না মা? সে কি একটা কথা হতে পারে। খানিক থেমে বললেন,—আমিও তো ছেলের পথ চেয়ে বসে আছি আর নামজপ করছি।

—কাজ মিটলে তিনি বৃথা দেরী করবেন না, তেমন মানুষ নন। অধোমুখে কথা বললেন মহাশ্বেতা।

আবার তেমনি হাসলেন রাজমাতা। বললেন,—তুমি তো সবই জানো, কাশীশঙ্করকে তোমার মত কে আর জানে! আমার পেটে-ধরা সেই ছেলেটা এখন ফিরলে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। মেয়ের যা হয় তা হোকগে।

—তা বললে কি হয়, রাজমাতা? তিনিও আসবেন, বিন্ধ্যও আসবে। মহাশ্বেতা বললেন প্রত্যয়ের সুরে।

কি এক কথা যেন হঠাৎ মনে পড়লো বিলাসবাসিনীর। জপের মালা রেখে দিয়ে বললেন,—জানলে বৌ, একটা মন্তর বলে দিই তোমাকে। সোয়ামীর কল্যাণ হবে। মন্তরটা শুনে নিয়ে যাও, আওড়াও। ঘর-দোর ফেলে এসেছো ভরা সন্ধ্যায়, ঘরের বৌ ঘরে ফিরে গিয়ে আগলাও। মেয়েটা কোথায়?

—তাকে আর সঙ্গে আনা হলো না। সে সেখানে আছে। মহাশ্বেতা বললেন কেমন যেন অন্যমনে। বললেন,—মন্তরটা বলুন আপনি।

বিলাসবাসিনী বলতে থাকেন,—

পাকা পান মত্তমান্,
আমার স্বামী নারায়ণ।

যখন যাবে রণে,

নিরাপদে ফিরে আসেন যেন ঘরে।

মনের মধ্যে ছড়াটি যেন লিখে নিতে থাকেন মহাশ্বেতা। মনে মনে আওড়াতে থাকেন। স্বামীর কল্যাণ হবে, নিরাপদে ফিরে আসবেন তিনি। একবার, দু'বার, তিনবার, বার বার নীরব উচ্চারণে যেন নিজের মনকে শুনিয়ে চলেন। নারায়ণের চক্রধারী মূর্তি ভাসে চোখে। নীলবর্ণ নারায়ণের বাসন্তী বর্ণের পরিধেয়। মহাশ্বেতার নধর নরম বক্ষমাঝে বন্দী হয়ে যায় বাঙলা দেশের একটা পুরানো ছড়া। তিনি রাজামাতার কুঠরী থেকে বেরিয়ে পড়লেন। ঘর দোর ফেলে এসেছেন। একমাত্র মেয়েটাকে রেখে এসেছেন।

দালানে বেরুতেই এক ঝলক বাতাস কোথা থেকে উড়ে আসে। মহাশ্বেতার মুখে-চোখে শান্তির প্রলেপ মাখিয়ে দিয়ে যায় যেন। রাতের কালে হাওয়ায় রাতরাণীর দুধে-আলতা রঙ শাড়ীর অঞ্চলপ্রান্ত উড়তে থাকে পেছনে।

স্বামী নারায়ণ। মহাশ্বেতার কানে কানে কে যেন কথা বলছে। চেনা-স্বরে ডাকছে এক গোপন নামে। রাতরাণী, রাতরাণী—

আলো প্রবেশের পথ নেই, বাতাসে গতিরোধ।

রুদ্ধকক্ষের দুয়ারে কান পাতলে এক মধুকণ্ঠের কলহাস্য আর মিষ্টি কথা শোনা যায়। হাসি আর কথায় যেন অনুরাগের সুর। কক্ষ মধ্যে না কি বৈচিত্র্য অনেক। বিলাসকক্ষ বা রঙমহালকে না কি হার মানায়, এমনই মনোহারী শোভা। ধবলপ্রস্তরের দেওয়ালের পাথরে পাথরে রত্নের লতাপাতা, রত্নের ফুল, রত্নের পাখী আর প্রজাপতি। কোথাও বা দর্পণ। কক্ষের ঊর্দ্ধে রূপার তারের চাঁদোয়া থেকে মতির ঝালর ঝুলছে। রত্নালঙ্কৃত পালঙ্কে জমির কামদার শয্যায় জরি-মখমলের বালিস। বিবিধ ফুলদানিতে রাশি রাশি গন্ধফুল ; পাত্রে পাত্রে আতর, গোলাপ-নির্য্যাস আর কেয়াসার। কক্ষতলে সুকোমল গালিচা বিছানো।

এক কোণে এক উজ্জ্বল দীপালোক জ্বলছে। নক্ষত্রখচিত আকাশ যেন ঐ রূপাতারের চাঁদোয়া আলোর আভায় ঝিকমিক করে।

পুষ্পরাশি কি খেলার সামগ্রী! ফুলখেলায় মত্ত যেন অবরোধবাসিনী। গোলাপের পাপড়ি দাঁতে কাটে আর ফেলে দেয়। ফুলের স্তবক ছোঁড়াছুঁড়ি করে আপন মনে। ফুলের আস্তরণে ঢাকা বিছানা। পুষ্পরেণুর ছড়াছড়ি যেন।

—তোমার আর মুক্তি নাই। এক পরিহাসপ্রিয়ার মিষ্টকণ্ঠ কথা বলে কক্ষের অভ্যন্তরে। বলে,—এখন হতে আমার এই বুকে তুমি বন্দী হলে। খানিক থেমে আবার বলে,—কি, কথাটি মনে রলো না?

উত্তরদাতা যেন বাকহীন। নিশ্চুপ থাকেন তিনি। প্রশ্নকর্ত্রীর মুখখানি এক লক্ষ্যে দেখতে থাকেন। চোখের পলক পড়ে না কতক্ষণ।

দীপের আলো পড়েছে আনন্দকুমারীর হাসিভরা মুখে, উন্নত বুকে। চৌধুরাণী উর্দ্ধাঙ্গের ভার রেখেছে দুই হাতে। মিটি মিটি হাসির সঙ্গে আবার বললে,—মনে মনে আমাকে কি অভিশাপ দিতেছ? কথা কও না কেন?

পলকহীন চাউনি। চন্দ্রকান্ত যেন কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ, বিমর্ষ। ক্ষণে ক্ষণে গাম্ভীর্য্য প্রকাশ পায় তাঁর মুখাকৃতিতে। পীড়াপীড়িতে তিনি বললেন,—অভিশাপ দেবো তেমন দৈবশক্তি আমার নাই। আশীর্ব্বাদ জানাই তুমি সুখী হও।

খিল খিল হাসি ধরলো আনন্দকুমারী। তার বুকের 'পরে স্বর্ণহার হাসির আবেগে নেচে নেচে উঠলো। হাসতে হাসতে বললে,—একা-একা কি সুখী হওয়া যায়? ভুলে যাও কেন আমিও নারী। একা থাকায় এ জাতের কোন সুখ নাই। তাইতো তোমাকে চাই।

চন্দ্রকান্ত যেন দুঃখের হাসি হাসলেন। বললেন,—আমি তো মূর্তিমান দুর্ভাগ্য, সুখের আশা করি না। দীনদরিদ্র আমি, সামর্থ্য নাই, সম্বল নাই।

—কিছু চাই না আমি। তোমাকে মাত্র চাই। সহসা হাসি থামিয়ে ফিস-ফিস কথা বললে চৌধুরাণী। একগুচ্ছ ফুল ছুঁড়লো চন্দ্রকান্তর প্রতি। বললে—তুমি আমার থাকো। তোমার জন্য আমি কত কষ্ট পেয়েছি। লোকনিন্দা

আর অপবাদকে তুচ্ছজ্ঞান করেছি।

—চৌধুরীমশাই কি বরদাস্ত করবেন চৌধুরাণী? আমার তো মনে হয় না তেমন। চন্দ্রকান্ত ধীরে ধীরে কথা বললেন,—তিনি জানেন আমি একজন অতি দরিদ্র, চালচুলা নাই আমার। দুই বেলা দুই মুঠা অন্ন জোটে, তেমন একটা পাকাপাকি সংস্থান পর্যন্ত নাই।

হাসির জের টানলো আনন্দকুমারী। বললে,—চৌধুরীমশাইয়ের জন্য তোমার চিন্তার কারণ নাই। সে ভাবনা আমার। বাবামশাইকে আমি শান্ত করবো।

ফুলখেলা থামে না কিন্তু। কথা আর হাসির সঙ্গে সঙ্গে ফুলের স্তবক লোফালুফি করতে থাকে চৌধুরাণী। চন্দ্রকান্ত দেখলেন, আলো ফুল আর কক্ষের সাজশয্যা। যেন ম্লান হয়ে গেছে আনন্দকুমারীর রূপের ছটায়। তার দেহবল্লরীতে যৌবন টলমল করছে। মধুপূর্ণ মৌচাক একটি যেন।

—আমি কি তবে এই কক্ষে বন্দী থাকবো? তোমার তাই ইচ্ছা? কেমন যেন অসহায় কণ্ঠে বললেন চন্দ্রকান্ত।

আবার স-উদ্যমে হাসি ধরে চৌধুরাণী। তার সেই স্বভাবসুলভ দেহ-দোলানো হাসি যেন থামতে চায় না সহজে। হাসতে হাসতে বললে,—হাঁ, তোমার আর মুক্তি নাই।

—লোকে যে নিন্দা রটাবে। ব্রাহ্মণ যেন ভয়ে ভয়ে বললেন।

চৌধুরাণী ঠোঁট উল্টে বললে,—আমি নিন্দার তোয়াক্কা করি না। লোকে যা বলে বলুক। তুমি যদি একমত হও আমি সারা মান্দারণে ঢেঁড়া পিটাতে বলে দিই।

—তার কোন প্রয়োজন নাই। কথার শেষে স্তব্ধতা ফুটলো চন্দ্রকান্তর মুখে। কিছুক্ষণের নীরবতার পর বললেন,—আমার নাম কাটা যাবে ব্রাহ্মণ-তালিকা থেকে। কাজে-কর্মে, শ্রাদ্ধ-শান্তিতে কেউ আর আমাকে ডাকবে না। পণ্ডিত-বিদায় থেকে বঞ্চিত হবো আমি। সমাজ আমাকে পরিত্যাগ করবে।

পরিহাসের কৌতুকপূর্ণ হাসি হাসলো আনন্দকুমারী। বললে,—আমি তো তাই চাই। তোমার কথা শুনে খুশী হলাম আমি। কথা বলতে বলতে চৌধুরাণী মতিবেলের একটি গোড়েমালা চন্দ্রকান্তর কণ্ঠে পরিয়ে দেয় সহসা। বলে,—এই মাল্যদানের মূল্য তুমি কি দিতে চাও না? আমার অন্তরের আশা-আকাঙ্খা কি ধূলিসাৎ করতে চাও?

কণ্ঠ থেকে মালা খুলে সেই মালা আনন্দকুমারীকে পরিয়ে দিলেন চন্দ্রকান্ত। বললেন,—আমি যদি অঙ্গীকার করি, তবুও কি তুমি মুক্তি দেবে না।

—অঙ্গীকার! সহাস্যে চৌধুরাণী বললে,—অঙ্গীকারের কোন মূল্য নাই আমার কাছে। তবুও শুনি কি অঙ্গীকার?

—আমি যদি আমরণ অকৃতদার থাকি, যদি পণ করি তোমাকে ভিন্ন অন্য কাকেও ঠাঁই দেবো না আমার বক্ষমধ্যে?

কথার শেষে চন্দ্রকান্ত সাগ্রহে উত্তরের প্রতীক্ষায় থাকেন।

কৃত্রিম গম্ভীর স্বরে আনন্দকুমারী বললে,—তাতে আমার সুখ কি? আমি তো আর আমরণ অনূঢ়া থাকতে পারি না। এত কাণ্ডের পর কে আমাকে গ্রহণ করবে তাই শুনি?

—তবে এখন উপায়? নিরুপায়ের মত কথা বলেন চন্দ্রকান্ত। বললেন,—তুমি এত নিষ্ঠুরা না হও। চৌধুরাণী, বিবেচনা কর আমার দুরবস্থার কথা।

আর নকল নয়। আসল গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে চৌধুরাণী বললে,—উপায় একটা আছে চন্দ্রকান্ত! বল, আমার অনুরোধ তুমি রক্ষা করবে? তাতে তোমারও মুক্তি হবে, তুমিও রেহাই পাবে এই অচ্ছ্যুতকন্যার কবল থেকে।

—তোমার অনুরোধ রক্ষা হবে জানিও। চন্দ্রকান্ত দ্বিধাহীন মনে বললেন।

ব্যথাতুর অস্ফুট হাসির আভাস দেখা যায় আনন্দকুমারীর লাল অধরপ্রান্তে। একটা গন্ধরাজ ফুলের পাপড়ি ছিঁড়তে ছিঁড়তে বললে,—আমাকে বিষ দাও তুমি। একটুকু সেঁকো বিষ দাও, খেয়ে সকল বালাই চুকিয়ে দিই।

এমন ধরণের কথা শুনতে হবে তেমন প্রত্যাশা করেননি চন্দ্রকান্ত। জিহ্বা

দংশন করলেন নিজের। বললেন,—ছি, ছি, আত্মহত্যা করবে তুমি ?

—হাঁ গো হাঁ। চোখ পাকিয়ে বললে আনন্দকুমারী। বললে,—মরণের আগে জানিয়ে যাবো বিষ পানের কারণ।

শিউরে শিউরে উঠলেন চন্দ্রকান্ত। বললেন,—তবে তো আমারও মৃত্যু অনিবার্য্য।

মিষ্টহাসির সঙ্গে চৌধুরাণী বললে,—এসো আমরা দুজনায় একত্রে মরি। ইহলোক ছেড়ে চলে যাই। পরলোকে আমাদের মিলন হবে। সেখানে লোকলজ্জা, সমাজ-ভয় থাকবে না।

চন্দ্রকান্ত আর কথা বলেন না। নতমুখে বসে থাকেন। চিন্তার রেখা ফুটেছে তাঁর প্রশস্ত কপালে। তিনি আনন্দকুমারীর বস্ত্রাঞ্চল পাকাতে থাকেন অন্যমনে।

আনন্দকুমারী আবার বললে সহাস্যে,—দেখো চন্দ্রকান্ত, আমি জানি তোমার হৃদয়মন্দিরে কার মূর্তি আসন পেয়েছে। আমি জানি, তুমি ঐ রাজকুমারী বিন্ধ্যবাসিনীকে—

—না না—সলজ্জায় অস্বীকার করলেন চন্দ্রকান্ত। বললেন তোমার ধারণা সত্য নয়।

—মিথ্যা হয়তো আমার জন্মই মিথ্যা জানবে। কথায় কথায় আনন্দকুমারীর কণ্ঠস্বর উগ্র হয়ে ওঠে যেন। চৌধুরাণী অধর কামড়ে ধরে নিজের। চিবিয়ে চিবিয়ে বললে,—তোমার আশাতে আমি ছাই দিয়েছি চন্দ্রকান্ত। তোমার সেই রূপের ডালি রাজকন্যেকে মান্দারণ থেকে বিদায় করেছি। বিন্ধ্যবাসিনীকে আর তুমি দেখতে পাবে না।

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন চন্দ্রকান্ত। বললেন,—তুমি অযথা অপবাদ দাও কেন ? আমি কাকেও চাহি না।

—মিথ্যা কথাটা শুনাও কেন আর ? চৌধুরাণী কেমন যেন কাঁপা-কাঁপা সুরে কথা বলছে। কেমন এক গোপন অভিমানের সুরে। বললে,—রাজকুমারী পরস্ত্রী, ভুলে যাও কেন ?

অনেক কাল আগের দেখা, গভীর ঘুমের ঘোরে দেখা, এক সুখস্বপ্নের

মত রাজকন্যা বিন্ধ্যবাসিনীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি চন্দ্রকান্তর মন-আকাশে ভেসে উঠলো। বিবেকের দংশনে যেন থেকে থেকে অধীর হয়ে ওঠেন তিনি। মানসিক অধঃপতন হয়েছে তাঁর। মিথ্যা বলেছেন একটা। বিন্ধ্য-বাসিনীকে কত কাছে পেয়েছিলেন সেই গহন রাতে! রাজকুমারীর নধর নরম হাত দু'খানি নিজের হাতে ধরেছিলেন। বক্ষপাশে বেঁধেছিলেন তাঁকে। সেই স্পর্শসুখ হয়তো কখনও ভুলতে পারবেন না।

আকাশের চাঁদ আর তারা সাক্ষী আছে। রাতের আঁধার সাক্ষী আছে। চন্দ্রকান্তর স্মৃতি সাক্ষী আছে।

চন্দ্রকান্ত বললেন,—তুমিও কি তাই নও?

ঠোঁট বেঁকিয়ে কপালে জিজ্ঞাসার বিরক্তি-রেখা ফুটিয়ে চৌধুরাণী শুধোয়,—কথাটার অর্থটা কি, তাই শুনি?

—ম্যালেটের সঙ্গে তোমার মিলনের প্রসঙ্গটা ভুলে যাও কেন? ম্যালেট সত্যই তোমাকে ভালবাসে। চন্দ্রকান্ত ধীরে ধীরে কথা বলেন,—তাই বলি তুমিও আর কুমারী নাই। ম্যালেট তোমাকে—

মধ্যপথে কথা থেমে যায়। চৌধুরাণী চোখে-মুখে আঁচল চাপলো, লজ্জা না ক্ষোভে কে জানে! বললে,—ম্যালেটের নাম আমাকে শুনিও না। তোমার জন্যই আমি তার কবলে পড়েছি। আমি জানি, তুমি আমার হবে, তাই জীবন তুচ্ছ করে পালিয়ে এসেছি সাহেবের বজরা থেকে।

—কাজটা ভাল কর নাই। চন্দ্রকান্ত বললেন ইদিক সিদিক তাকিয়ে। বললেন,—ব্যাচারা ম্যালেট! তার জন্য আমার দুঃখ হয়।

—আর আমার জন্য দুঃখ হয় না? চৌধুরাণী কথা বলে করুণ কণ্ঠে। দুই চোখে অশ্রু টলমল করে। কথার শেষে আবার মুখ ঢাকে আঁচলে। —তুমি কি হৃদয়হীন! তুমি কি পাষাণ?

—হয়তো তাই। তোমার অনুমানই সত্য হয়তো বা। চন্দ্রকান্ত ঈষৎ হাসির সঙ্গে বললেন। বললেন,—দেখো চৌধুরাণী, তোমার যথার্থ মূল্য দিতে পারি, তোমাকে সমাদর করতে পারি তেমন সাধ্য আমার নাই।

তাইতো সভয়ে পিছিয়ে আসি বারে বারে।

হঠাৎ পালঙ্ক ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো আনন্দকুমারী। রাগ আর তেজে জ্বলছে যেন সে। উগ্রসুন্দর মুখখানি ক্রোধ আর অভিমানে যেন রক্তবর্ণ ধারণ করেছে। চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে। এত রাগের আগুন, তবুও মিহি সুরে বললে,—চন্দ্রকান্ত, মুক্তামালার কদরটা যে সে জানে না। আমি তোমাকে এখনই মুক্তি দিতেছি, তুমি এই গৃহ ত্যাগ কর। ভুলে যেও আনন্দকুমারী নামে কেউ আছে এই পৃথিবীতে।

আশা করতে পারেননি চন্দ্রকান্ত, এই ধরণের কথা শুনতে হবে। বিস্ময়-বিহ্বল চোখে তাকিয়ে থাকেন চৌধুরাণীর মুখপানে। বলেন,—আনন্দ, তোমার কথাই রক্ষা হোক। আমি যাই, তুমি থাকো। তুমি সুখী হও, এই প্রার্থনা আমার।

—তোমার প্রার্থনার কোন মূল্য দিই না আমি, সক্রোধে বললে চৌধুরাণী। ঘরের দুয়োরের অর্গল খুলতে খুলতে বললে,—পুরুষমানুষ এমনই স্বার্থপর আমি জানি। আর সুখের প্রয়োজন নাই আমার। আমি জানবো আমি একজন বিধবা। আমার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে জানবো।

নির্ব্বাক চন্দ্রকান্ত। তিনিও শয্যা ত্যাগ করলেন। বললেন,—হাঁ চৌধুরাণী, আমি যাই। আমাকে যেতে দাও। আমার অনেক কাজ অসমাপ্ত আছে। চতুষ্পাঠীর জন্য মন আমার আনচান করছে।

—আমারও অনেক কাজ আছে। এটা তোমারই একচেটিয়া নয়। কথা বলতে বলতে জলসিক্ত চোখে কক্ষের দ্বার মুক্ত করলো আনন্দকুমারী। বললে,—আমিও আমার গৃহে টোল-চতুষ্পাঠী স্থাপনা করবো। যা অর্থ লাগে লাগুক। ত্রিবেণী, মূলাজোড় থেকে পণ্ডিতদের ডাকবো।

কেমন যেন হকচকিয়ে গেলেন চন্দ্রকান্ত। তবুও নিজেকে সামলে নিয়ে বললে,—শুনে সুখী হলাম চৌধুরাণী! এই দীনদরিদ্র দেশে, এই অজ্ঞান অশিক্ষার দেশে তোমার মহতী চেষ্টা ফলবতী হোক। কথা বলতে বলতে খানিক থেমে আবার বললেন,—তুমি জানবে আমি কখনও দারপরিগ্রহে

শ্মিত হব না। অবিবাহিত থেকেই দিন কাটিয়ে দেবো। তোমাকে কখনও বিস্মৃত হবো না।

—আমিও তাই থাকবো। আনন্দকুমারী ছলছল চোখে বললে,—তবে চেষ্টা করবো যাতে তোমার স্মৃতিটা মন থেকে মুছে যায়।

সামান্য হাসি ফুটলো চন্দ্রকান্তর মুখে। বললেন,—তথাস্তু! তুমি সুখী হও, তাই আমি চাহি। অনুমতি দাও, আমি তবে বিদায় লই।

গলায় বস্ত্রাঞ্চল জড়িয়ে ভূমিতে মাথা ছুঁইয়ে প্রণাম করলো আনন্দকুমারী। শেষ প্রণাম, তাই হয়তো কিছু দীর্ঘস্থায়ী! মাথা তুলে বললে,—যদি কোন অপরাধ হয়ে থাকে ক্ষমার চোখে দেখো।

কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন চন্দ্রকান্ত। কিয়দ্দূর যেতেই পিছু ডাক শুনলেন।

চৌধুরাণী কম্পিত ওষ্ঠে বললে,—একটা কথা বলি শোন।

বিদায়ী ব্রাহ্মণ পুনরায় কাছে আসতে চৌধুরাণী বললে,—রাজকুমারী বিন্ধ্যবাসিনীর প্রেম তোমার প্রতি অসীম। আমি তোমাদের পথের কাঁটা হতে চাই না। আমি তোমাকে পেলাম না, রাজকুমারী যেন পায়। তাতেই সান্ত্বনা।

—তিনি কোথায় গেছেন, কোথায় আছেন, কিছুই আমার জানা নাই। চন্দ্রকান্ত বললেন গম্ভীর স্বরে। বললেন,—কাকেও আমি চাহি না আর। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

—বিন্ধ্যবাসিনী সূতানুটিতে গেছেন। তুমি সেথায় যাও, তাঁর সাক্ষাৎ পাবে। কথার শেষে আর এক মুহূর্ত থাকে না চৌধুরাণী। চোখে-মুখে আঁচল চেপে ছুট দেয় একটা। অন্দরের দিকেই চলে যেন উর্দ্ধশ্বাসে।

চন্দ্রকান্ত দেখলেন, আনন্দকুমারী এক দালানের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে তিনিও চললেন বিপরীত দিকে। চৌধুরীমশাইয়ের প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পথে নামলেন। চললেন হনহনিয়ে, চতুষ্পাঠীর পথে।

সন্ধ্যা নেমেছে তখন মান্দারণের বুকে। আকাশে ক'টা জলজলে তারা

ফুটেছে। কালবৈশাখীর ঝড়ের বাতাস চলেছে এলোমেলো। পথে ধূলা উড়ছে গোধূলির মত। চোখ করকর করে, চন্দ্রকান্ত চোখ মুছলেন উত্তরীয়ে। তাঁর চোখ থেকে জলের ধারা নেমেছে। বিরহ বেদনায় চোখ দু'টি যেন জ্বলছে। কিন্তু উপায় নেই কিছু। চন্দ্রকান্তকে চতুষ্পাঠীতে যেতেই হবে। শিষ্যদল না কি তাঁরই পথ চেয়ে বসে আছে। তারা দিন গুণছে।

বজরার কক্ষমধ্যে থেকে থেকে যেন কেঁপে কেঁপে ওঠেন জমিদার-নন্দিনী বিন্ধ্যবাসিনী। ক্ষিপ্র গতিতে বজরা উত্তর থেকে দক্ষিণ মুখে এগিয়ে চলেছে, ঢেউ ভেঙে ভেঙে। অনুকূল হাওয়া বইছে জোরালো বেগে, তাই পাল তুলে দেওয়া হয়েছে বজরার মাস্তুলে। পালের দড়িতে গাঙ্ শালিকের ঝাঁক উড়ে এসে বসেছে। কিচমিচিয়ে ডাকাডাকি করছে।

লেঠেল জগমোহন ঘরে আসে। রাজকুমারীর কাছাকাছি এগিয়ে যায়। বলে,—রাজকুমারী, বিপদ এখনও কাটালো না!

—কেন জগমোহন? সভয়ে বললেন বিন্ধ্যবাসিনী।

দেহের পেশীগুলি যেন রাগের আধিক্যে স্ফীত হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে। দাঁতে দাঁতে চাপে সে। বললে,—যতক্ষণ সুতানুটিতে না যেতে পারছি ততক্ষণ ভয়-ভাবনা আছে। জমিদার কৃষ্ণরাম কি সহজে ছেড়ে দেবে মনে করেছো? কৃষ্ণরাম সে মানুষ নয়। জান থাকতে সে ছাড়বে না।

—তোমার অনুমান মিথ্যা নয় জগমোহন! ভয়ে ভয়ে রাজকন্যা বললেন। বললেন,—তাঁর স্বভাবটাই এমনি ধরণের। জেদের বশে সব করতে পারেন তিনি, আমি বেশ জানি।

—আমারও ঐ একই কথা রাজকন্যা! জগমোহন ফিসফিসিয়ে বললে,—আমাদের জামাইটা একটা আস্ত গণ্ডমূর্খ। ভণ্ডামিই সার তার। বিচার-বিবেচনার কোন বালাই নেই। যা মন চায় করেন, কারও নিষেধ মানতে চান না।

তার নাম মুখে আনাও মহাপাপ। কথার শেষে জগমোহন কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়।

বজরার ছাদ থেকে ডাক পড়েছে। কণ্ঠ সপ্তমে তুলে কাশীশঙ্কর ডাকলেন,—জগা! অ জগমোহন!

গুরু-গুরু মেঘ-ডাকার শব্দ শুনেছে যেন লেঠেল জগমোহন। বুক দুরু-দুরু করে তার। মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। সাড়া দেয় ভয়ে ভয়ে। বলে,—এই যে আমি হেথায় কুমারবাহাদুর।

—আয়, দেখবি আয়! কাশীশঙ্কর উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন। যেন কিছু ব্যস্ততার সঙ্গে। বললেন,—জগমোহন, গতিক সুবিধার নয়।

কুমারবাহাদুরের হাতে একটা বিদেশী দূরবীণ। পেতলের লম্বমান নলাকার বাম চোখ রেখেছেন। সাগ্রহে দেখছেন কি যেন।

অস্ত রবির পাণ্ডু কিরণ এখনও পশ্চিম আসমানের শেষে। রূপালী রেখার আভাস। মধ্য-আকাশে শুক্লা নিশার প্রথম তারাদল দেখা দিয়েছে। লাজুক হাসি যেন সদ্য উদিতাদের মুখে মুখে। সন্ধ্যার আঁধার আজ যেন একান্তই পরাজয় বরণ করেছে।

বজরা থেকে তীরের তরুসারি, তাই হয়তো দূরবীণে ধরা পড়ে। জগমোহনের হাতে দূরবীণটা ধরিয়ে দিলেন কাশীশঙ্কর। কেমন যেন ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললেন,—জমিদার কৃষ্ণরাম অশ্বারোহণে ধাবমান। পিছনে লোক-লস্কর। খানিক থেমে থাকলেন কুমারবাহাদুর। তাঁর নিজের দৃষ্টি সত্য না মিথ্যা যাচাই করিয়ে নিতেই জগমোহনকে দেখতে সময় দিলেন। বললেন,—কি গো লেঠেল, ভুল দেখি নাই তো?

—নাঃ হুজুর, ঠিকই দেখেছেন।

দূরবীণ থেকে চোখ সরিয়ে কেমন যেন ব্যাজার সুরে জগমোহন বললে। আরও একবার সঠিক দেখতে দূরবীণে চোখ রাখলো। বললে,—এখন কর্তব্য কি তাই বলেন। রাত ঘনিয়ে আসছে ইয়াদ রাখবেন।

আবার একবার ব্যঙ্গের হাসি হাসলেন কাশীশঙ্কর। পাক দেওয়া ঘনকৃষ্ণ

সূক্ষ্ম গোঁফের ফাঁকে হাসির ইঙ্গিত ফুটলো। বললেন,—বজরাখান তীরে ভিড়াতে বল। কর্ত্তব্য একটি মাত্র আছে।

—কি কুমারবাহাদুর? বিস্ময়ের ঘোরে জগমোহনের চক্ষু স্থির হয়ে যায়। বলে,—বজরা তীরে ভিড়ালে আর রক্ষা নাই জানবেন। আমাগোর লোকবল তেমন নাই যে সামনাসামনি—

—জগমোহন! দৃঢ়কণ্ঠে গর্জ্জে উঠলেন যেন কাশীশঙ্কর। নামটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বামপদ একবার ঠুকলেন! বজরার ছাদে যেন বজ্রপতন হয়। কুমারবাহাদুর সজোরে বললেন,—তুমি আমার শিক্ষাগুরু নহ। আমার হুকুম অমান্য করতো মৃত্যু অনিবার্য্য জানবে!

—ক্ষমা করবেন হুজুর! লেঠেল জগমোহন জানু বাঁকিয়ে ব'সে পড়লো। ফরাসে দূরবীণ রেখে দিয়ে কুমারবাহাদুরের দুই পায়ে হাত আর মাথা ছোঁয়ালো। বললে,—আমি হুজুর রামের হাতে মরতে প্রস্তুত। আপনি সাজা দিন, মৃত্যুদণ্ড দিন, মাথা পেতে নেবো। তবে হুজুর, ঐ রাবণের হাতে মরতে চাই না তীরে বজরা ভিড়িয়ে।

—জগমোহন! আবার সেই সিংহসুলভ গর্জ্জন ভাসলো মাঝ-গঙ্গায়। ক্ষণেকের মধ্যে কুমারবাহাদুরের মুখ রাঙিয়ে ওঠে। চোখ যেন রক্তবর্ণ হয়।

মৌনাচারিণী গঙ্গা, খরবেগে ব'য়ে চলেছে। ঢেউ নেই, গতি মাত্র। এখানে সেখানে নদীর বুকে চড়া দেখা দিয়েছে। শ্বেত-মরালের দল ছড়িয়ে আছে চড়ায়। বন্যার রোলে কূল ভেঙেছে কবে কে জানে। কাশফুলের ঝোপ মাথা তুলেছে চড়ায় আর তীরে। পুণ্যার্থীরা জলে নেমেছে গাহন সারতে। অশথ আর বটের ছায়ায় মঠ-মন্দিরে দীপারতির আলো জ্বলেছে। রুদ্র আর রতির সাধনায় হোমকুণ্ড জ্বলছে কোথাও কোথাও। তীর তরুর ফাঁকে ফাঁকে শীর্ণ সোপানশ্রেণী দেখা যায়। কোথাও বা পিছল পদরেখা।

—সর্দ্দারজী! কুমারবাহাদুর চীৎকার করলেন। বললেন,—বজরার গতি থামাও! হাল তুলে লও!

জগমোহন আবার মাথা নোয়ালো কালীশঙ্করের পাদমূলে। বলে,—কুমার-বাহাদুর, জিদ করবেন না। পড় করছি আমি। দোহাই আপনার।

বাম পায়ের আঘাতে জগমোহনকে এক ঠেলায় সরিয়ে দিলেন কালীশঙ্কর। বজরার ছাদ থেকে দ্রুতগতিতে পাটাতনে নামলেন। মাঝিদের কাছে এগিয়ে সক্রোধে বললেন,—সর্দার, বজরা তীরে ভিড়াও। অন্যথা না হয়।

মাঝি-সর্দার পচাই মদ খেয়েছে কখন। নেশার উত্তেজনায় অকারণে হাসছে হো-হো শব্দে। হাসতে হাসতে বললে,—রাজামশাই, আপনি যখন হুকুম করেছেন।

গতি থেমে যায় বজরার। হাল চলে না আর। বজরা মোড় নেয় ধীরে। তীরের দিকে মুখ ফিরায়। তারপর আবার হাল চলতে থাকে এক সঙ্গে। সমান তালে।

অস্ত্র ঘরে যাবেন কালীশঙ্কর, দুয়ারে দেখলেন রাজকুমারী বিন্ধ্যবাসিনী পাষাণমূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছেন। স্বল্প গুণ্ঠনের আড়ালে বিষাদভরা মুখ-খানিতে ভাদ্রের মেঘ নেমেছে যেন। চোখে জল টলমল করছে। হতাশায় ম্রিয়মাণ যেন তিনি। সহোদরকে বললেন,—ভাই, তুমি এই পাষণ্ডের হাতে ধরা দিও না। মনে রাখিও তোমার গৃহ-সংসার আছে। স্ত্রী আর কন্যা আছে। রাজমাতা আছেন। কিছু একটা হয়তো তখন আর আমি মুখ দেখাতে পারবো না। তার আগে আমি যেন মরতে পারি।

—তুই এখনও একটা অবোধ-শিশু আছিস। সহাস্যে কালীশঙ্কর বললেন। কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র ঘরে সিঁদোলেন।

বিন্ধ্যবাসিনী যেন অনড় অচল। তিনি স্থির দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁর আশাহত চোখে শূন্যদৃষ্টি ফুটেছে। মাঝে মাঝে ব্যর্থশ্বাস ফেলছেন একেকটি। লাল চুনীর মত রাঙা অধর যেন পাংশু হয়েছে। রাজকুমারী শুনলেন, অস্ত্রঘরে ঝন ঝন শব্দ। শিউরে শিউরে উঠলেন বিন্ধ্যবাসিনী। অজানা ভবিষ্যৎ, কি হয় কে বলতে পারে। হয়তো রক্তপাত হবে, ভাবতেও শিহর লাগে বুকে। দেহ কেঁপে ওঠে থরথরিয়ে।

ম্লান সায়াহ্ন আজকের। কখন পূর্ণিমার ঢেউ ভেসেছে আসমানে পূর্ণাকার চাঁদ উঠেছে কখন। আকাশ যেন সোনালী টিপ পরেছে কপালে জমাট আঁধার নেই আজ। হোমকুণ্ডের ঘূর্ণায়মান শিখা অগ্নিপতাকার মত ঊর্দ্ধমুখে উঠছে। শবভুক নিশাচরের পাল জলাজঙ্গলে বিচরণ করছে। শিয়াল, হায়না, খটাশ, নেকড়ের দল আঁধার-গহ্বর থেকে বেরিয়ে পড়েছে। তান্ত্রিকের দল কাজে লেগেছে। গলায় নর-কপালের মালা ঝুলিয়ে রক্তশোষণের মন্ত্রগান গাইছে। অদূরেই শ্মশান। চিতা জ্বলছে কয়েকটি। নরমাংস দাহনের গন্ধ ভাসছে বাতাসে। চুল-পোড়ার গন্ধ। মানুষের কত সুখের দেহ-দেউল জ্বলছে দাউ-দাউ।

কাল-নিশীথিনী ঘনিয়ে আসছে। প্রলয়ঙ্কর রাত্রি আসছে—রাজকুমারী ভাবতেও যেন ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়েন। বিন্ধ্যবাসিনী দেখলেন, কাশীশঙ্কর যোদ্ধার সাজে সেজেছেন। হাতে পায়ে আর বুকে লৌহসারের বর্ম্ম এঁটেছেন। বাম দিকের কটি থেকে ঝুলছে খাপে-ভরা দীর্ঘ তরোয়াল। কোমরবন্ধনীতে একটা ভোজালী। হাতে একটা গাদা বন্দুক। মাথায় লোহার জালের শিরস্ত্রাণ। দেখলে এখন সহসা চেনা যায় না কুমারবাহাদুরকে। ক্রোধের আবেগে মধ্যে মধ্যে তরোয়ালের হাতলে হাত পড়ে। খাপ থেকে যেন মুক্ত করতে চান তরোয়াল। হাত নিশপিশ করে হননেচ্ছায়।

গঙ্গার পূর্ব্ব তীরে বজরা অগ্রসর হ'তে থাকে। মাঝি-মাল্লাদের হাত চলে না যেন সন্ত্রাসে। কোথা থেকে এখনই বন্দুকের জলন্ত বারুদ ছিটকে আসবে কেউ বলতে পারে না। বৃষ্টিপাতের মত রাশি রাশি বিষমাখা তীর উড়ে আসবে। কিন্তু কুমারবাহাদুর হুকুমজারী করছেন, কে অমান্য করবে!

সরবে কাশীশঙ্কর বললেন,—সাদা নিশান উড়ানো হোক মাস্তলে।

ক'জন সিপাই শ্বেতপতাকা তুলে দেয় মাস্তল শীর্ষে। দুয়ারের কপাটের আড়ালে থেকে বিন্ধ্যবাসিনী ভয়ে ভয়ে লক্ষ্য করেন সকল কিছু। তিনি যেন নিতান্তই বিপন্না। দুরদৃষ্টের দোষে মুখ দেখাতেও যেন লজ্জা। দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপশালী সহোদর কাশীশঙ্কর, তবুও রাজকন্যা ভয়ে ভয়ে মুহূর্ত গুণতে

থাকেন। কম্পিত কলেবর এখনই যেন মূর্চ্ছাগ্রস্ত হবে। বিন্ধ্যবাসিনীর দিকে সহাস্তে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন কুমারবাহাদুর। বললেন,—বিন্ধ্য, আমি কৃষ্ণরামের প্রস্তাবেই সম্মত। দু'জনায় অসিযুদ্ধ হবে, দেখা যাক কে জয়ী হয়।

আশা-ভরসা লুপ্ত হয়ে যায় রাজকন্যার। ক্ষণে ক্ষণে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। বক্ষে কম্পন লাগে জ্বররোগিণীর মত। সহোদরের কথায় তিনি যেন চিন্তামুক্ত হতে পারেন না। আরও দুশ্চিন্তায় মন যেন আচ্ছন্ন হয়।

কুমারবাহাদুরের মুখে হাসির রেখা। প্রতিযোগিতায় নামতে হবে, তবু এতটুকু দ্বিধা নেই মনে। কাশীশঙ্কর অধীর আগ্রহে বজরার পাটাতনে পায়চারী করেন। ধৈর্য্য ধারণ করতে পারেন না যেন। বজরার ধীর গতি অসহ্য ঠেকে তাঁর।

আতশের রোশনাই আকাশে। একে একে কত তারা ফুটেছে। ভাসমান মেঘের অন্তরাল থেকে হঠাৎ আবার চাঁদ দেখা দিয়েছে। সূর্য্যের শেষ রূপালী রেখা সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়েছে কখন। আজ পূর্ণিমা, প্রকৃতির শোভা তাই ক্রমে ক্রমে বিকশিত হয়। চাঁদের আলোয় আজ প্রকৃতি উদ্ভাসিত।

বজরা তীরের কাছাকাছি যেতেই দূরাগত এক কণ্ঠসঙ্গীত ভেসে আসে। কাছাকাছি কোথাও আছে সরাইখানা। কে এক মাতাল মত্ত হয়ে গজলের সুর ধরেছে। খোশ-গানের আওয়াজ ভেসে আসছে। ভগ্নকণ্ঠের সুর।

কাল-নিশীথিনী ঘনায়মান—রাজকুমারী ভয়ে চোখ দুটিকে বন্ধ করলেন একবার। আতঙ্কের আধিক্যে চোখে কিছু দেখা যায় না। দৃষ্টি চলে না। একরাশ চুলের বোঝা যেন আর বইতে পারেন না বিন্ধ্যবাসিনী। বিরক্তির সঙ্গে এলো খোঁপা জড়িয়ে নিলেন।

জগমোহন নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে। তার কথা আর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তীরে বজরা ভিড়ালেন কুমারবাহাদুর। সে দরিদ্র, তাই হয়তো তার নিষেধ আবেদনে কর্ণপাত করলেন না কাশীশঙ্কর। মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে জগমোহন, কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করতে পারে না। মুখ ফুটে আর বলতে পারে না।

তীরে কসাড়-বন। কাশফুলের জঙ্গলে ঢেউ খেলছে ফুরফুরে সান্ধ্য-বাতাস।

শৈশ-গঙ্গার জলে চাঁদের প্রতিবিম্ব ভাসছে। কসাড়-বনের পাশেই আকাশ-স্পর্শী বাবলাগাছের সারি।

তীরে বজরা বাঁধা হয়। একমাত্র কাশীশঙ্কর ব্যতীত অন্যান্য সকলের হৃৎ-পিণ্ডের ধুকধুকি যেন থেমে আছে ভয়ে আর উত্তেজনায়। কুমারবাহাদুর লক্ষ্য করলেন নক্ষত্রালোকে—বাবলা-বনের কোলে এক দল অশ্বারোহী। হাতে তাদের বর্শা আর ধনুক। কাশীশঙ্কর অনুমানে বুঝলেন, অশ্বারোহীরা প্রস্তুত হয়ে আছে। শুধুমাত্র হুকুমের অপেক্ষায় আছে। তারা হুকুম পেলেই বন্দুকের ঘোড়া দাগবে, বর্শা ছুঁড়বে। কুমারবাহাদুর বুঝলেন, আসল শত্রু বনান্তরালে লুকায়িত আছে।

কৃষ্ণরামের একজন অনুচর লাফাতে লাফাতে নেমে আসে তীরভূমি থেকে, বজরার নিকটে। তারও হাতে একটি বন্দুক। কটিতে ছুরি। চোখের দৃষ্টিতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। কুমারবাহাদুর তাকে সাদর আহ্বান জানালেন। এক লাফে বজরা থেকে তীরে নামলেন। বললেন; সুস্বাগতম্! সুস্বাগতম্!

অনুচর বললে,—যুদ্ধ না শান্তি?

হেসে ফেললেন কাশীশঙ্কর। তাঁর বৃষস্কন্ধ হাসির তোড়ে নেচে উঠলো। হাসতে হাসতে বললেন,—যুদ্ধ! বিনা যুদ্ধে শান্তির আশা আমি করি না।

অনুচর বললে,—এখনো চিন্তা করেন, যুদ্ধে মহাশয়ের পরাস্ত হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। আবার হাসলেন কাশীশঙ্কর। বললেন, জমিদার কৃষ্ণ-রামকে জানাও, আমি মেষশাবক নহি। সে যেন প্রস্তুত হয়। তার কথায় আমি রাজী, প্রস্তাবে সম্মত। তাহাতে আমাতে অসিযুদ্ধ হোক, এই আমার কাম্য।

—তথাস্তু। কথার শেষে অনুচর খানিক থেমে বললে,—যুদ্ধস্থান কোথায় হবে, তাই শুনি?

কাশীশঙ্কর বললেন,—এই গঙ্গাতীরে; বনাঞ্চলে। কথা বলতে বলতে তিনি কটিতে ঝুলানো তরবারি স্পর্শ করলেন। বললেন,—কৃষ্ণরামকে জানাও বিলম্বে প্রয়োজন নাই।

অনুচর পিছু ফিরে ছুটলো বাবলা-বনের দিকে। পূর্ণিমার রাত, কিন্তু

অরণ্যভূমিতে আঁধার-গহ্বরের সৃষ্টি হয়েছে। খটাশ আর হায়না ছোটাছুটি করছে মানুষের ভয়ে। বসন্ত বিদায়গামী, তবুও কোকিলের ডাক শোনা যায়। পালাই পালাই ডাকাডাকি করছে কোকিল। একটি ডাকছে অন্যটি সাড়া দিচ্ছে।

মূর্চ্ছা যাওয়ার মত দেহ যেন টলে টলে উঠছে। বিন্ধ্যবাসিনী রুদ্ধশ্বাসে শুনছেন ভেসে আসা কথা। তিনি যেন এক দুঃস্বপ্ন দেখছেন।

কুমারবাহাদুর দেখলেন, হঠাৎ আলোর জৌলুস খেললো বাবলা-বনে। রামমশাল জ্বললো গোটাকয়েক। একটা আলোর রাজ্য সৃষ্টি হয় পলকের মধ্যে। কাশীশঙ্কর ধীরে ধীরে ঐ আলোর দিকে চললেন,—সাথ জগমোহন। জনা দশেক সিপাইকে সঙ্গে লয়ে আর।

দাঁড়ী-মাঝিরা ঠক ঠক কাঁপছে মৃত্যুভয়ে। সর্দার-মাঝির পচাইয়ের নেশা ছুটে গেছে। সে-ও ভীত হয়ে উঠেছে।

রাজকুমারী দুর্গানাম জপ করেন। দুর্গতিনাশিনী দুর্গাকে স্মরণ করেন। বিপত্তারিণীকে ডাকেন আকুলচিত্তে। কিন্তু মনের একাগ্রতা বিনষ্ট হয়। কত কথা মনে আসে। কত সূত্রহীন চিন্তা খেলে মনে। চোখ ফেটে জল ঝরে।

বাবলাবনে কাছে যেতেই কুমারবাহাদুরের চোখে পড়ল কৃষ্ণরামকে। তিনিও সুসজ্জিত। কারণবারি পান করেছেন তিনি, যুদ্ধের আগে হয়তো তৃষ্ণা নিবারণ করছেন। দেখে মনে মনে পুলকিত হলেন কাশীশঙ্কর। ভাবলেন, মদিরার নেশায় কৃষ্ণরামের হাত চলবে না; তাক ফসকে যাবে। লক্ষ্যচ্যুত হবে তার উদ্যত কৃপাণ।

দৃষ্টি-বিনিময় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কুমারবাহাদুর সহাস্যে হাত এগিয়ে দিলেন কৃষ্ণরামের দিকে। যুদ্ধের আগে এই না কি নিয়ম। করমর্দন করতে হয় পরস্পরে। শুভেচ্ছাসূচক বাক্য বলাবলি করতে হয়।

করমর্দনের শেষে কৃষ্ণরাম বিদ্রূপাত্মক হাসি হেসে বললেন,—কি হে কাশীশঙ্কর! তুমি আবার আমার বড়কুটুম। সম্পর্কটা খুবই মধুর। তোমার সহ অসিখেলায় পৃথক এক আহ্লাদের কারণ আছে।

—আমিও ঠিক এই একই কথা বলি। কাশীশঙ্কর সহাস্তে বললেন। হাসি বিলীন হয়ে যায় ক্ষণেকের মধ্যে। বলেন,—যুদ্ধের সর্তটা ভুলিও না।

কৃষ্ণরাম মুখে পাত্র তুললেন। অবশিষ্টটুকু শেষ করলেন এক চুমুকে। মুখ বিকৃত করলেন বিশ্বাদে। বললেন,—আমি বেজন্মা নই কাশীশঙ্কর! বাপ আর বাত আমার এক। বদল হয় না কথা।

—বহুৎ ধন্তবাদ! তবে এসো, খেলা শুরু হোক। কাশীশঙ্কর কথার শেষে কপালের ঘাম মুছলেন। বললেন,—তুমি কি প্রস্তুত?

—হাঁ গো শালা হাঁ। আমি সদাই প্রস্তুত আছি। শ্লেষের হাসি হেসে কৃষ্ণরাম বলেন। বললেন,—তোমার ভগিনীটি কোথায়, তাই শুনি?

সর্ব্বজনের সমুখে শ্যালক আহ্বান শুনে ভীষণ অপমান বোধ করলেন কুমারবাহাদুর। বললেন,—বিন্ধ্য আছে বজরামধ্যে। আমাকে পরাস্ত কর, অতঃপর বিন্ধ্যর নাম উচ্চারণ করিও।

রামমশালের আলোয় বাবলা-বনে দিবালোকের বাহার যেন। দুই দলের লোক দুই দিকে ভাগাভাগি দাঁড়িয়ে আছে সাগ্রহে। কি ফল হয় কে জানে! কে কাকে হারায় দেখা যাক। কারও নড়ন চড়ন নেই। কৃষ্ণরামের একেকটি তেজস্বী অশ্ব পা ঠুকছে মাটিতে। সওয়ার চাইছে হয়তো।

—অসিখেলার সর্তটা ভুলিও না কুমার কাশীশঙ্কর! জমিদার কৃষ্ণরাম তরোয়াল-খাপের ঝনন তুলে মিঠে হেসে বললেন। একটি চোখ ঈষৎ মুদিত করলেন পরিহাসের ভঙ্গিমায়। বললেন,—আর একবার সর্তটা খতায়ে লও। সময় দিতেছি খানিক।

—প্রয়োজন নাই দয়া দাক্ষিণ্যের। কাশীশঙ্কর কপালে রেখা ফুটিয়ে বললেন। কাছেই ছিল জগমোহন। ঠিক প্রায় পাশেই ছিল। ইশারায় কাছে ডাকলেন তাকে কুমারবাহাদুর। কানে কানে বললেন,—বজরায় রাজকুমারী একা নাইতো?

—না হুজুর! পাহারা আছে। আমার বিশ্বাসী লোক আছে। ক'জন সিপাইও আছে। মাঝিরা আছে।

বক্ষ স্ফীত হয়ে উঠছে কৃষ্ণরামের। যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্ত কি না কে জানে, ঘন ঘন শ্বাস টানছেন তিনি। মুষ্টি পাকিয়ে ধরছেন থেকে থেকে। কৃষ্ণরাম বললেন,—সর্তটা কি তা কি সঠিক জানা আছে রাজপুত্তুর?

—অসি আঘাতে প্রথম যে জয়ী হবে সেই কি বিজেতা? কুমারবাহাদুর শুধোলেন।

—না। তা নয়! অসি-আঘাতে প্রথম যার মৃত্যু হবে সেই বিজেতারূপে গণ্য হবে! জমিদার কৃষ্ণরাম ভ্রূ বাঁকিয়ে বললেন। কয়েক মুহূর্ত্ত থেমে আবার বললেন,—বন্দুকের একটা ফাঁকা আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে খেলারম্ভ হোক তবে?

—হাঁ তাই হোক।

—যা সর্ত তাতে রাজী?

—আলবৎ।

পরস্পরের বাক-বিনিময় শেষ হওয়ার পরক্ষণেই একটি বজ্রধ্বনি হয়! আকাশমুখে বারুদ দাগলো কে যেন।

মুখে হাসি ফুটিয়ে তরোয়াল চালালেন কাশীশঙ্কর। অস্ত্র প্রতিহত হয় কৃষ্ণরামের অস্ত্রে! একজনের অসির প্রতিবন্ধক হয়, অন্ত জনের অসিচালনায়। ধাতব শব্দ ছুটলো বাবলাবনে! আঘাতের তীব্রতা অনুভূত হয় ঘন ঘন ঝনৎকারে।

অন্ত যারা তারা দর্শকমাত্র। কেউ কাকেও সাহায্য করবে না। মুখে কথা বলবে না। সকলের বুকে যেন শ্বাস আটকে আছে।

কৃষ্ণরাম ক্ষিপ্র অস্ত্র চালনার সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখে এগিয়ে যেতে থাকেন আক্রমণের ভঙ্গীতে। কাশীশঙ্কর পিছু হটেন। তিনি মারমুখী হন যেন, শুধু মাত্র আঘাত ব্যাহত ক'রে চলেছেন! পিছু হটতে হটতেও মুখে হাসি কুমার-বাহাদুরের। মৃদুমন্দ হাসছেন তিনি! একেক লাফে পিছনে হটছেন আর সামলে চলেছেন কৃষ্ণরামের আক্রমণ। অস্ত্রে-অস্ত্রে আঘাতের শব্দ যেন এক বিলম্ব তালের বাদ্য। বনের গভীরে যেন নর্তকী নেচে চলেছে বিলম্বিত সুরে!

মনে মনে হাসলেন, কাশীশঙ্কর। স্থির করলেন, অগ্রে ক্লান্ত হোক জমিদার।

অসিচালনার ক্লান্তি আসুক আগে। তাই আক্রমণের পরিবর্তে কেবল নিজে
রক্ষা করে চলেন সন্তর্পনে।

বিলম্বিত তাল দ্রুত হয়। কৃষ্ণরামের আক্রোশ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হ'তে থাকে। এ-পাশে ও-পাশে ওপরে নীচে অসি চালিয়ে যান কৃষ্ণরাম। তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটতে থাকে। শ্বাসের গতিও যেন কিঞ্চিৎ দ্রুত।

সহসা মিথ্যা ভাণে ডান দিকে অসি চালিয়ে তৎক্ষণাৎ বাম দিক থেকে তীব্রবেগে হাত চালালেন কাশীশঙ্কর। তাঁর অব্যর্থ লক্ষ্যের দারুণ আঘাত লাগে কৃষ্ণরামের কণ্ঠ ও স্কন্ধের সংযোগে। বিকট এক চিৎকার করেন হঠাৎ আঘাতে। তাঁর হাত অবশ হতে থাকে ক্ষণিকের মধ্যে। তবুও তিনি অসি চালনায় বিরত হন না। তাজা রক্তের ধারা নামে কৃষ্ণরামের বক্ষে আর পৃষ্ঠে। চোখের দৃষ্টিতে ফোটে ব্যথা-কাতরতা। জ্বালা-যন্ত্রণায় কপালে কুঞ্চন দেখা দেয়।

অবশ হাত বিশ্বাসঘাতকতা করে। কেমন যেন হাত ফসকে যায়। হাত ওঠে না ঠিক সময়ে।

কাশীশঙ্কর সুযোগ গ্রহণ করেন। তীক্ষ্ণধার তরোয়ালের অগ্রভাগ সজোরে বসিয়ে একটি ঠেলা মারলেন সেই সঙ্গে। কৃষ্ণরামের বুকে পিঠে অনর্গল রক্ত-পাতের সিক্তচিহ্ন! তিনি আবার এক আর্তনাদের সঙ্গে ধরাশায়ী হয়ে পড়লেন। হাতের অস্ত্র খসে পড়লো। কাশীশঙ্কর সেই বিদ্ধ তরবারি তখন আরও গভীরে চালিয়ে দিলেন।

কুমারবাহাদুরের পক্ষ জয়ধ্বনি তুললো জ্যোৎস্নাধবল আকাশ ফাটিয়ে।

তরবারি টেনে নিলেন কাশীশঙ্কর। খাপে ভরলেন। ঘন ঘন শ্বাস ফেলছেন তিনি। হাঁফ ধরছে যেন বুকে। কি এক আনন্দে তবু অট্টহাসি ধরলেন তিনি। বক্ষ নাচিয়ে নাচিয়ে হাসলেন আপন শক্তির গর্ব্ববোধে।

সপ্তগ্রামের কুলীন-কুলতিলক স্বেচ্ছাচারী কৃষ্ণরামের চোখের দুই প্রান্তে বেদনাশ্রু। হীরার কুঁচির মত চিকচিক করে। একজন সহচর ভূমিতে লুণ্ঠিত কৃষ্ণরামের মাথা কোলে তুলে নেয়। অসহ্য জ্বালা ধরছে ক্ষতস্থানে। কাশী-শঙ্করের অসিতে বিষ ছিল কি!

কৃষ্ণরামের অনুচরবর্গের হাতে হাতে অস্ত্র, কিন্তু তারা উপায়হীন। দলে দলে দ্বন্দ্বযুদ্ধের সর্ত স্থির হয়নি আগে।

হাসির শেষে শ্রান্তি মোচনের জন্য কিছুক্ষণ অচঞ্চল থাকেন। বুকভরা শ্বাস টানছেন তিনি। হাঁফ ধরছে বুকে। অস্ত্রচালনার বিরতি হয়েছে, হাতের শিরা-উপশিরা থেকে থেকে কাঁপছে এখন। গর্বের হাসি কুমারের মুখে।

রাম-মশালের আলোয় বাবলাবনে যেন এক বিভীষিকার সৃষ্টি হয়েছে। কীট-পতঙ্গ ডাকছে। কসাড়বনে হায়না ওৎ পেতে আছে। নরমাংসের গন্ধ পেয়েছে দূর থেকে। আস্বাদে জিহ্বা থেকে জল ঝরছে।

কৃষ্ণরাম কি যেন বলতে চাইছেন, অথচ কণ্ঠ সাড়া দেয় না। কষ্টকাতর চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছেন। কাকে যেন খোঁজাখুঁজি করছেন। কৃষ্ণরামের কম্পমান ওষ্ঠে গঙ্গাবারি দেওয়া হয়। জলপানের শক্তি নেই, জল গড়িয়ে পড়ে মুখ থেকে। কুটো পড়লে শব্দ হয়, এমনই গম্ভীর স্তব্ধতা বিরাজ করে। সমবেত জনগন নিস্পন্দের মত দাঁড়িয়ে আছে।

হঠাৎ যেন ঘুমিয়ে পড়লেন কৃষ্ণরাম। মাথা নত হয়ে যায়। মুখের কষ্ট-চিহ্ন ধীরে ধীরে বিলীন হ'তে থাকে। শেষ শ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি। কষ্ট-জ্বালার অবসান হয়। বাতাসে সাঁই সাঁই শব্দ ভাসছে। নাই নাই শব্দ যেন।

বহুক্ষণের নীরবতা। শোক পালনের মৌনপ্রকাশ। মুখে কথা নেই কারও।

কাশীশঙ্কর শব্দহীন পদক্ষেপে এগিয়ে চললেন। কৃষ্ণরামের পাশে দাঁড়িয়ে নতজানু হয়ে বসলেন। সামরিক রীতিতে সেলাম জানালেন। তার পর উঠেই পথ ধরলেন গঙ্গাতীরের। শীর্ণ এক সোপানশ্রেণীতে পদার্পণ করলেন। সিঁড়ি বেয়ে নেমে চললেন নীচে তরতরিয়ে।

কে এক অবলা! শোকের প্রতিমূর্তি যেন! শুভ্রবস্ত্রধারিণী। কুমার-বাহাদুরের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই তিনি থমকে দাঁড়ালেন।—নীচে থেকে ওপরে উঠতে উঠতে। গুণ্ঠন ঈষৎ সরিয়ে কথা বললেন,—ভাই।

—কে? বিন্ধ্যাবাসিনী? সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন কাশীশঙ্কর। ভরাযৌবনের চাঁদ আকাশে। হাস্যময়ী পূর্ণিমার সোনা-রঙের ঢেউ ভাসছে দিকে দিকে। জ্যোৎস্নার জোয়ারে মিশে গেছে গঙ্গা। কুমারবাহাদুর স্পষ্ট দেখলেন রাজকুমারীর বিষাদ মুখ। বললেন,—বিন্ধ্য! তুমি কোথায় যাও এই বিপদের মাঝে?

—শুনেছি, তিনি আর নাই।

—হ্যাঁ, তা সত্য বটে। কৃষ্ণরামের মৃত্যু হয়েছে।

—তাই চলেছি আমি। ভাই, তুমি সুতানুটিতে ফিরে যাও। সেথায় যাওয়ায় আমার আর কাজ নাই।

—তুমি কোথায় যাবে?

—এক চিতায় জ্বলতে চলেছি। তাঁর সঙ্গে আমিও যাই। আমার তো কোন বালাই নাই। বিন্ধ্যবাসিনীর কণ্ঠস্বর বাষ্পরুদ্ধ। কেমন যেন করুণ। সিক্ত আঁখিপল্লব।

—আমি কি তবে পাতকী? তোমার মৃত্যুর কারণ কি আমাকে করতে চাও?

—না তা নয়। তুমি আমার জ্বালা জুড়ালে। কথা বলতে বলতে জ্যেষ্ঠকে প্রণাম করলেন বিন্ধ্যবাসিনী। কুমারের পাদস্পর্শ করলেন। বললেন—আশীর্ব্বাদ কর, যেন সুখে যেতে পারি।

রাজকুমারীর কপাল স্পর্শ করলেন কাশীশঙ্কর। বললেন,—এই কি শেষ কথা? বৃথা মৃত্যু বরণ করবি?

—বৃথা নয় ভাই? একচিতায় যাই। আমাকে যেতে দাও। আমি তাঁর কাছে যাই। কথার শেষে আর থাকলেন না রাজকন্যা। অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে চললেন। চোখে জল, মুখে মনোবেদনার রেখা। বিন্ধ্যবাসিনী কয়েক সোপান উঠে পিছু ফিরে বললেন,— ভাই, বিদায়।

সুতানুটিতে যখন কাশীশঙ্কর পৌঁছালেন, তখন ভোরের আলো ফুটছে গঙ্গার তীরে। সিঁদুর-মেঘ ছড়িয়েছে আকাশপ্রান্তে।

রাজপুরীতে কুমারবাহাদুরের সাক্ষাৎ পেয়ে হৈ-হৈ লাগে। ঘুম ভেঙে যায় গৃহস্থের।

রাজবাহাদুর উঠে পড়েন। রাজমাতা ব্যস্ত হয়ে আসেন। রাণীমায়েরাও দেখা দেন ঘুমভাঙা চোখে। রাজমাতা বিলাসবাসিনী সাগ্রহে বললেন,—কাশী, আমার মেয়েটা কৈ? সে কেমন আছে! তোমার সঙ্গে আসে নাই সে?

একসঙ্গে অনেক প্রশ্ন। কুমারবাহাদুর কা'কে যেন খুঁজতে থাকেন চোখের সন্ধানে। দেখা ত পেয়েছেন কি তাকে? হয়তো দেখেছেন। তিনি মহাশ্বেতা। রাতরাণী। দূরে এক দুয়ারের পাশে নিশ্চল দাঁড়িয়ে। মহাশ্বেতার মুখে কোন বিকার নেই।

ধৈর্য্য নেই রাজমাতার। তিনি আবার বললেন,—কি, কথা কও না কেন কুমারবাহাদুর?

হেসে ফেললেন কাশীশঙ্কর। তাঁর সেই স্বভাবসুলভ হাসি। বললেন,—সব মিথ্যা জানো তোমরা। মেয়ে তোমার পরম সুখে আছে। স্বামীর ঘর সে ত্যাগ করতে চাহে না। কৃষ্ণরামের কাছেই আছে। কথা বলতে বলতে মুখ থেকে হাসি অদৃশ্য হয় কুমারের। বলেন,—বিন্ধ্যার এমন সুখের অন্ত নাই। কৃষ্ণরামের সঙ্গে একত্রে স্বর্গসুখে আছে।

কথার শেষে স্থান ত্যাগ করতে উঠলেন কাশীশঙ্কর। দুয়ারের কাছে এগিয়ে বললেন,—চল রাতরাণী, স্বগৃহে যাওয়া যাক।

আকাশে পৌর্ণমাসী চাঁদ। পূর্ণিমার সোনালী ঢেউ ভাসছে আসমানে চন্দ্রালোকে কাশীশঙ্কর পথ চলেন। পিছনে রাতরাণী। কুমার মনে মনে ভাবছেন, সহোদরা বিন্ধ্যবাসিনী তাঁকে হারিয়ে দিয়েছে।

রাজমাতা বিলাসবাসিনী কিন্তু একটা স্বস্তির শ্বাস ফেললেন।

॥ শেষ ॥